নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রচনাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৫৭

মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

সম্পাদনা

আশা দেবী

অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র

পরিমল গোস্বামী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা /০

আমার কথা ।০

উপন্যাস

তিমির-তীর্থ ১

স্বর্ণ-সীতা ৯৯

উপনিবেশ (প্রথম খণ্ড) ২১১

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী ২৯৫

বৈতালিক ৪০৭

গল্প-গ্রন্থ

বীঅংস

বীতংস ৫৫৩

হাড় ৫৬৫

নীলা ৫৭৩

প্রদীপ ও প্রজাপতি ৫৮৬

তৃণ ৫৯৪

নিশাচর ৬০৫

সৈনিক ৬১৬

ভূমিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলীর প্রথম খণ্ড দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল। বিদ্যুৎ-সঙ্কট, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা, সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে স্বভাবতই বিলম্ব কিছু দীর্ঘ হয়েছে।

রচনাবলীতে গ্রন্থক্রম যথাসম্ভব বিষয়গত ভাবে ও রচনার সময় ধরে কালানুক্রমিক করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রতি খণ্ডের আকারের সমতা রাখতে গিয়ে কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব নয়।

প্রথম খণ্ডে পাঁচটি উপন্যাস—তিমির-তীর্থ, স্বর্ণ-সীতা, উপনিবেশ ১ম খণ্ড, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, বৈতালিক এবং একটি গল্পগ্রন্থ বীতংস সংকলিত হল।

"তিমির-তীর্থ" লেখকের প্রথম রচনা, যদিও এটি প্রকাশিত হয় উপনিবেশ ১ম খণ্ডের পরে। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের পটভূমিকায় তিমির-তীর্থের কাহিনী রচিত। সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল। তখন একই সঙ্গে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আর একদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় বঙ্গভূমি উত্তাল। এমনই সময় প্রফুল্ল—এই উপন্যাসের নায়ক—এল শিক্ষক হয়ে সেই গ্রামে, যেখানে স্বাধীনতা-আন্দোলনের দীপ্তি ছড়ায়নি এখনো। প্রফুল্লর প্রকৃত পরিচয়—সে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ছদ্মবেশী সৈনিক। সে এসেছে আন্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দিতে এই গ্রামে, তিমিরান্ধকার দূর করবার প্রদীপ জ্বালাতে। সেই সময়কার বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে এই উপন্যাসে। মাতব্বরদের রেষারেষি, তরুণদের রাজনীতিচর্চা, বিচিত্র স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী সমাজ, ন্যায়নীতিবোধহীন অপোগণ্ড যুবক, নর-নারীর অন্তর্জগৎ সমস্তই নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এই উপন্যাসে।

"স্বর্ণ-সীতা" উপন্যাস নারীর জীবন-যন্ত্রণার হৃদয়-বেদনার কাহিনী। ক্ষণিকের মোহ-মুগ্ধতায় অনুপমা জমিদার সোমনাথের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার নারী-হৃদয় সোমনাথের পাশব কাঠিন্যে ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ভাগ্যচক্রে সে তার প্রাক্তন শিক্ষকের সাক্ষাৎ পেয়ে মুক্তি খুঁজতে চাইল সেখানে। কিন্তু সেখানেও পেল বাধা। অবরুদ্ধ বেদনায় হতাশায় হয়তো ভাগ্যের প্রতি জিঘাংসায় সে পাগল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতি দিতে হল তাকে। এই উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার বাতাবরণ থাকলেও চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ন ও তাদের মনোবিশ্লেষণেই লেখকের বেশি আগ্রহ।

"উপনিবেশ" লেখকের প্রধান ক্লাসিক রচনাগুলির অন্যতম। কারও কারও মতে

শ্রেষ্ঠতম। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে, বা নিম্নবঙ্গে বললেই ভাল হয়, প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে মাঝে মাঝেই চর দেখা দেয়। কখনও পুরাতন চর মিলিয়ে যায় নদীগর্ভে, কখনও বা কোন চরের জীবদ্দশা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। চর ইস্‌মাইল এই রকমই একটি চর। এই চর, তার বিচিত্র অধিবাসীরা, তাদের বিচিত্রতর জীবনযাত্রা, চরের চার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খ্যাপাটে নদী তেঁতুলিয়া—এদের সকলকার কথা নিয়েই এই "উপনিবেশ" উপন্যাস। এই চরের অধিবাসীদের মধ্যে আছে যেমন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, তেমনি আছে আরাকানী মগ, পর্তুগীজদের অবলুপ্তমান বংশধরেরা। আছে কার্যোপলক্ষে শহরের সরকারী কর্মচারীদের সাময়িক উপস্থিতি, তেমনি আছে গাঁজা-আফিমের চোরাই চালান-কারীদের গোপন আসা-যাওয়া। উপন্যাসের ১ম খণ্ডে কাহিনীর গোড়াপত্তন। "উপনিবেশ" ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবার-কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ও বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মানুষদের নিয়ে এই চরের অধিবাসী সমাজের যে জীবন-প্রবাহ চর ইস্‌মাইলে অহরহ স্পন্দিত, তা-ই এই উপন্যাসের নায়ক বা প্রাণ।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতিনিধিরূপে যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারশ্রেণী গ্রামবাংলাকে কঠোর শাসনে সদাসন্ত্রস্ত রেখেছিল, ইংরেজ শাসনের অবসানের আগেই কালের অমোঘ নিয়মে, কিছু বা উচ্ছৃঙ্খল ভোগোন্মত্ততার অনিবার্য পরিণামে ধীরে ধীরে তাদের অবক্ষয় শুরু হয়। জমিদারশ্রেণীর ক্ষমতার শূন্যস্থান পূরণ করতে এক নূতন শ্রেণীর জন্ম হল। সরকারের শোষণনীতির পার্শ্বচর হিসেবে এল বণিক সম্প্রদায়—এদের পাইক লাঠিয়াল যত না সম্বল—অর্থবল এদের অনেক বেশী ভরসা। বিশ্বনাথ এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের শেষ প্রতিনিধি। আর অর্থবলে তেজীয়ান নূতন শ্রেণীর প্রতিনিধি লালা হরিশরণ—যার পূর্বপুরুষ একসময় ছিল বিশ্বনাথদেরই আশ্রিত। "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী" এই দুইজনের, বলা উচিত দুই শ্রেণীর সংঘর্ষের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপাখ্যান। দুই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কালে এদেশের মাটিতে তখন অঙ্কুরিত হচ্ছে শোষিত দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে নবচেতনার নব-জাগরণের অনুভূতি। মধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবী তাদের সেই চেতনার মশালে জ্বালিয়ে দিচ্ছে আগুন। অরুণা সেই বুদ্ধিজীবীদেরই প্রতিনিধি। "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী" সমাজের বিবর্তনের, এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের কাহিনী।

অতুল এক ছদ্মবেশী ফেরারী রাজনৈতিক আসামী। পরামাণিক পরিচয়ে শিক্ষকের ছদ্মবেশে সে আশ্রয় নিয়েছিল ব্রাত্যসমাজের একটি গ্রামে। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী, নবচেতনার আস্বাদ ছড়িয়ে দেবে, এই ছিল তার ব্রত। এই ভাবেই কেউ হয়তো ব্যর্থ হয়েছে, কেউ সফল হয়েছে, কারোর কর্মের সিদ্ধি এসেছে অনেক দেরিতে। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে সামগ্রিক আন্দোলন। 'বৈতালিক' অতুলের মত ঘর-ছাড়া সংসার-ছাড়া বিপ্লবীদের আত্ম-অবদানের দলিল।

বীভৎস গ্রন্থের বিভিন্ন গল্পে লেখকের সুগভীর মানববোধ ও সমাজচেতনার ছাপ স্পষ্ট। ধনী ব্যবসায়ীর দালালের প্রতারণা প্রবঞ্চনার নিষ্ঠুর নিদর্শন, দরিদ্র মানুষের প্রতি অভিজাত শ্রেণীর নিদারুণ অবহেলা, দরিদ্র হতাশ্বাস মানুষের ভাগ্য-বিরূপতা, বিপ্লবী তরুণের আদর্শনিষ্ঠা সবই নিখুঁতভাবে গল্পগুলিতে চিত্রায়িত।

বলা বাহুল্য, এই সব কথাই সংকলিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে সূচকমাত্র। সমালোচনা বা মূল্যায়ন নয়। সে যোগ্যতাও আমরা দাবি করি না। তার জন্য শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা আছেন। আর অনাগত কাল তো রইলই। রচনাবলীর শেষে গ্রন্থ-পরিচিতি সংযোজিত হল।

বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে বলে মুদ্রণ প্রমাদ এড়ানো সম্ভব হয়নি। মুদ্রণব্যয়বৃদ্ধি ও কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু রচনাবলীর মূল্য আরও সুলভ করা সম্ভব হল না। আশা করি সাহিত্যপ্রেমী পাঠক-পাঠিকারা এই ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন। লেখকের নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে একটি রচনা পাওয়ায় এই সঙ্গে মুদ্রিত হল। নিঃসন্দেহে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

লেখকের পূর্ণাঙ্গ জীবনী শেষ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

পরিশেষে এই রচনাবলী প্রকাশের কাজে যাঁর সহৃদয় সহযোগিতা এবং সতর্ক প্রহরী দৃষ্টি আমাদের এটিকে সার্থকতার দিকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, তিনি শ্রীযুক্ত সবিতেন্দ্রনাথ রায়। ত্রুটি যা কিছু থেকে গেল; সেজন্য শুভানুধ্যায়ী পাঠকদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। দ্বিতীয় সংস্করণে সে সব নিশ্চয়ই যথাসাধ্য সংশোধিত হবে।

আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কথা

জন্ম ১৩২৫ সালে। কি ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে এলাম— ; কে আমাকে অনুপ্রাণিত করলো, তার উত্তরে বলতে পারি সাহিত্য-প্রীতিটা আমার পৈতৃক উত্তরাধিকার। বাবা অত্যন্ত পড়তে ভালবাসতেন। পুলিসের দারোগা হলেও তাঁর লোভনীয় লাইব্রেরী ছিল। পড়া ছাড়া আর কোন নেশাই ছিল না তাঁর।

লেখার প্রেরণা বোধহয় আসে শৈশবের শিক্ষক কুড়নদার রচিত একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার দেখে। সেটাকে মডেল করে খান তিনেক কবিতা লিখে ফেলি। প্রথম লেখা বেরোয় কবিতা—"মাস-পয়লা" শিশু মাসিকের প্রথম সারির গ্রাহকদের পাতায়। মনে আছে বারো আনা পুরস্কারও পেয়েছিলাম। প্রথম বই বেরোয় অপর একজনের সহায়তায় একখানি শিশু 'থ্রিলার'—নাম "বিভীষিকার মুখে"। প্রকাশক দেব সাহিত্য কুটির। ছোট গল্প লেখবার প্রেরণা পাই বিভিন্ন লেখকের গল্প পড়ে, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু তাদের মধ্যে প্রধান। উপন্যাস লেখায় উৎসাহ যোগান "বিচিত্রা"র সম্পাদক উপেনদা—বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস "তিমির-তীর্থ" প্রকাশিত হয় অবশ্য দ্বিতীয় উপন্যাস রূপে। প্রথম পর্বে "উপনিবেশ" বেরিয়ে যায় তার আগেই।

খুব অল্প দিনের মধ্যেই কতগুলো বই দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকখানা আমার লজ্জার কারণ, সম্ভব হলে ভবিষ্যতে প্রকাশ বন্ধ করে দেব।

আমি মনে করি আমার শ্রেষ্ঠ বই এখনো লেখা হয়নি। নিজের কথা আজও সম্পূর্ণ করে বলা হয়নি—কবে যে হবে তাও জানি না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তিমির-তীর্থ

উৎসর্গ

কথাশিল্পী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুহৃদ্বরেষু

লেখকের ভূমিকা

'তিমির-তীর্থ' লিখেছিলোম ছাত্র-জীবনে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। নানা কারণে লেখাটি এতদিন তিমিরেই নিহিত হয়ে ছিল। কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক লেখাটিকে উদ্ধার করে 'শারদীয়া দৈনিক কৃষক' (১৩৫১)-এ পত্রস্থ করেন এবং শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী মনোজ বসু এই যুদ্ধের দুর্মূল্যতার বাজারেও বইটিকে শোভন ও সুন্দর করে প্রকাশিত করবার দায়িত্ব নেন। এঁদের দু'জনের কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আমি বন্দী।

বইটির নামকরণের জন্যে শ্রদ্ধাস্পদ সজনীকান্ত দাসের কাছে আমি ঋণী। পরিশেষে বক্তব্য এই, বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল আছে বলেই একে কোনো বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে আমার ওপরে অবিচার করা হবে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চক্রবাল

আশ্বিন মাসেই এবার বড় নদীর উপর দিয়া কুয়াশা নামিতে শুরু হইয়াছে। এ অঞ্চলে এমনটা বড় দেখা যায় না, তবু ইহার মধ্যেই বাতাসে শীতের আমেজ লাগিতেছে একটু একটু করিয়া। সকালে ঘুম ভাঙিয়া জানালা দিয়া শিশির-ভেজা মাঠেব দিকে চাহিলে মনে হয়, কেমন একটা ঝাপসা আচ্ছন্নতায় শিশিরসিক্ত পৃথিবীটা ডুবিয়া আছে। প্রথম রাত্রে বাতাস বন্ধ হইয়া অসহ্য গরমে ছটফট করিতে হইলেও অন্ধকারের রঙ ফিকে হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শিরশিরে ঠাণ্ডায় ভারী হইয়া ওঠে—কাপড়খানাকে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিতে হয়। শেফালির মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে শিশিরের মাটি-মিশ্রিত গন্ধও ভাসিয়া আসে।

আড়িয়ল খাঁ বর্ষায় যে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে জল এখন প্রত্যেকদিন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। বর্ষার সময় স্টিমারটা একেবারে সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড রাস্তাটার গায়ে আসিয়া লাগে, প্যাডলের মুখ উছলাইয়া-ওঠা জল আর তক্তার ঘা খাইতে খাইতে রাস্তাটা খাড়াখাড়িভাবে অনেকখানিই জলের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ঝুরো মাটি আর ঘাসের শিকড নদীর বাতাসে তির তির করিয়া দোলে। জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আর স্টিমারের নোঙর করিবার উপায় থাকে না। তখন বাঁ-হাতি আরো অনেকখানি সরিয়া আসিয়া একেবারে সাহেবপুর হাটের নিচে যেখানে পলিমাটির দীর্ঘ আস্তরণ ফেলিয়া নদী তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেছে, সেখানেই স্টিমারটাকে ভিড়িতে হয়।

শেষরাত্রির অস্পষ্ট কুয়াশায় অনেকগুলি মানুষ আসিয়া এখানে ভিড় করিয়াছে; স্টিমারের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে তাহারা। এ লাইনের এই জলযানগুলির আর যত ত্রুটিই থাকুক, নিয়মানুবর্তিতার অপবাদ তাহাদের অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারে না। যেদিন নদীর বুকে ঘন হইয়া হলদে কুয়াশা ছড়াইয়া পড়ে, সুকানির সন্ধানী আলো সেই নিবিড় জমাট আস্তরণ ভেদ করিয়া দুপাশের তীরতট তো দূরে থাক—সামনের দশ হাত পথ অবধি দেখিতে পায় না, সেদিন ঘডঘড় করিয়া মস্ত একটা লোহার নোঙর জলে নামাইয়া দিয়া হয়তো অনির্দিষ্ট সময়েব জন্য মধ্য নদীতে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অথবা 'এ বাঁও মিলে-এ না' বলিয়া সুর টানিতে টানিতে হঠাৎ যখন ডুবিয়া-থাকা বালুচরের গায়ে ঘস করিয়া স্টিমারের চাকা ডুবিয়া যায়, তখন জোয়ার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যাত্রীদের যতখানি বিড়ম্বনা তাহার চাইতেও বেশি বিড়ম্বনা যাহারা আগ বাড়াইয়া নিতে আসে তাহাদের।

এই কথাই আজও চলিতেছিল। মুকুন্দ বলিল: দেখছ হে, আবার কেমন বিশ্রী কুয়াশা

নামল। জাহাজ এ বেলা এসে পৌঁছয় কিনা কে জানে!

সনাতন শিহরিয়া বলিল: সে কি কথা! আজ মাল না এলে যে দোকানই খুলতে পারব না। পুজোয় পরে সব একেবারে সাফ হয়ে আছে, আজ তা হলে খদ্দের বিদেয় করব কী করে?

নলসিঁড়ির বাজারে সনাতনের কাপড়ের দোকান। গ্রামখানা বড় বলিয়াই বাজারটি মোটামুটি মন্দ নয়, সনাতনের ছোট দোকানটিও ইহারি মধ্যে ভালোয়-মন্দে বেশ একরকম চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য পূজার সময় বাবুরা যখন বিদেশ হইতে একটিবার করিয়া দেশে পদার্পণ করেন, তখন কাপড়ের বড় বড় গাঁটও তাঁহাদের সঙ্গেই আসে। কিন্তু সকলের অবস্থা তো আর সমান নয়। যে সমস্ত নিম্নবিত্ত বাসিন্দাকে গ্রামেই বারো মাস কাটাইতে হয়, সনাতনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের উপায় নাই। দুই-চার আনা বেশি লাভ যদি সে করে তো করুক কিন্তু মানুষের সব দিন এমন কিছু আর সমান যায় না। ধরো, পূজার সময় যেবার ছেলেপিলেকে কাপড় কিনিয়া দিবার সঙ্গতি থাকে না, সেবার তো ধারের জন্য বাধ্য হইয়া তাহার কাছেই আসিতে হয়। টিনের দোকান-ঘরটার কাঠের চৌকাঠের উপরে যদিবা কাঁচা অক্ষরে লেখা তোবড়ানো সাইন বোর্ড ঝুলিতেছে "স্বদেশী বস্ত্রালয়" তবুও পূজার এই সময়টাতে রেলি ব্রাদার্সের রূপালি ছবিওয়ালা ফুলপেড়ে ধুতি-গুলি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়; বিলাতী কাপড়ে বোম্বে মিল্‌সের ছাপ-মারা মিহি বড় পাড়ের শাড়িগুলি ঘরে ঘরে শারদীয়া উৎসব বর্ধনের সহায়তা করে।

তাহার কথার সূত্র ধরিয়াই মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল: এবার পুজোয় কত টাকা ঘরে তুললে, সনাতন কাকা?

সনাতন ভ্রূকুঞ্চিত করিল, মুখে তাহার স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া।

—ঘরে তোলবার আর উপায় রেখেছ তোমরা? কলকাতার দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে কাপড় কিনে তোমরা তিনশো মাইল পথ ঘাড়ে করে আনবে অথচ আমরা কী দোষটা করলুম শুনি? সস্তায় বাজিমাত করতে গিয়ে ওদিকে যে সব কাত হয়ে যাচ্ছে, সে খবর রেখেছ কখনও?

মুকুন্দ শুধু যে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল, তাহাই নয়। উপরন্তু মুখের এমন একটা ভঙ্গি করিল যেন সনাতন ঠিক তাহার পেটের কথাটি টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে।

দেখিয়া সনাতনের বক্তৃতা-স্পৃহা উদ্দীপিত হইল।

—আরে এই করেই না দেশটা উচ্ছন্নে গেল। বলে দেশ স্বাধীন করবেন! আমরা গাঁয়ের লোক—বচ্ছরকার দিনে দুটো পয়সা পাব—তা অবধি যাদের সয় না, তারা দেশ না ইয়ে স্বাধীন করবে—হুঁ।

অন্যান্য আরো দুইটি ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের চরিত্রগত ব্যবধান এই যে, তাহার

জীবনে সব প্রশ্নগুলি জটিল বলিয়া কোন প্রশ্নটাই জটিল নয়। সনাতনের দিক হইতে অন্তত কথাটাকে নিঃসন্দেহে যাচাই করিয়া নেওয়া যায়। সম্প্রতি দেশের দুর্গতি ও দুর্মতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সে যখন দস্তুরমতো অনুপ্রাণিত বোধ করিতেছে এবং তাহার গলার স্বরও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের অনুসারে ক্রমশ চড়া পর্দায় চড়িতেছে, ঠিক সেই সময় তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া রসময়, শশিকান্ত ও টোনা একটা অতি মুখরোচক সরস-প্রসঙ্গের চর্চায় ব্যাপৃত ছিল।

কথা বলিতেছিল টোনা।

ছেলেটির দৈর্ঘ্য কম, কিন্তু মাত্রাহীন প্রস্থ তাহার সে অভাব মিটাইয়া দিয়াছে। নানা দিক হইতে সে গ্রামের মধ্যে অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। গানের গলাটি তাহার চমৎকার। এই কিছুদিন আগেও এ সমস্ত অঞ্চলে চাঁদপুরী কীর্তনের ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। বরিশালের একান্ত নিভৃত বুকের মধ্যে এই যে নাতিদীর্ঘ বাসুদেবপুর গ্রামটি, এখানে পর্যন্ত তাহার ঢেউ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। দত্তবাড়ির ছোট নাতির অন্নপ্রাশনে বাটাজোড় হইতে কৃষ্ণযাত্রার একটি দল আসিয়া তিন রাত্রি নিমাই-সন্ন্যাস গাহিয়া চারিদিক একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সেই অবকাশে টোনার স্বাভাবিক সঙ্গীত-প্রতিভাও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে নাই। গ্রাম হইতে কৃষ্ণ-যাত্রার দলটি বিদায় লইবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই একটা কীর্তনের দল গড়িয়া ফেলিল। শাদা-রঙের চাদর চড়াইয়া, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা জড়াইয়া, ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত গ্রাম্য নরনারীর ছোট একটি আসরের একপাশে দাঁড়াইয়া যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার জবানিতে সুর ধরিত:

"খসিয়া পড়িল কানেরি সোনা মাগো
অমঙ্গলের চিহ্ন যায় গো জানা,—"

তখন আসরের ডান পাশে চিকের আড়ালে শুধু মেয়েরাই নন, মুহূর্তের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিধুর মুখখানি কল্পনা করিয়া বয়স্ক প্রবীণদের চোখও ছলছল করিয়া আসিত।

নিজের এই সঙ্গীত-ক্ষমতার গুণে টোনা একটা বিশেষ দিক দিয়া অত্যন্ত সাফল্যলাভ করিয়াছিল। লোকে বলিত, সমগ্র বৈরাগী পাড়ায় সে কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক রূপ বা মুরলীর পরিবর্তে গান—ইহাতে তাহার কৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কারণ ছিল না, কিন্তু কী যে সাধারণের মনোবৃত্তি, এতটাই যদিবা সহিতে পারিল, গোপিনী সম্পর্কিত ব্যাপারে কেন যে তাহাদের চোখ খাড়া হইয়া ওঠে, সেটা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না।

কিন্তু বলিতে বাধা নাই, বৃন্দাবন-লীলার প্রতিই টোনার আকর্ষণটা স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি। নানা দিক হইতেই নানা রূপে রঙে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। পরে সেটা

বিস্তৃত হইবে।

আপাতত এখানে আসিয়াও টোনা সেই-জাতীয় একটা প্রসঙ্গেরই জের টানিতেছিল।

—মাইরি বলছি ভাই, কী চোখ-মুখের গড়ন! প্রায় বাগিয়ে এনেছি—আর দু-তিন দিন কেত্তন গাইতে পারলেই ঠিক মজে যাবে।

রসময় রসটাকে পূর্ণ উপভোগ করিয়া অশ্লীল-ধরনে একটা শিস দিল। তারপর কহিল: কিন্তু ওর বাপ বড় কড়া লোক রে, দেখিস শেষকালে ঠ্যাঙা খেয়ে ঠ্যাং ভেঙে না আসিস!

শশিকান্তের চোখে ঈর্ষাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বয়স তাহার পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, কিন্তু বিকৃত পথ বাছিয়া নিয়া এই যৌবনেই তাহার দেহের উপর দিয়া যেন অক্ষমতার বার্ধক্য নামিয়াছে। এই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে যদি তাহার দিকে ভালো করিয়া তাকানো যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখা যাইত, কালিমাখানো কোটরের মধ্য হইতে ঘোলাটে চোখ ব্যর্থ লোভে চকচক করিতেছে তাহার। টোনাকে সে মনের দিক হইতে আদৌ পছন্দ করে না, প্রজাপতির মতো তাহার সহজ মধুলেহী জীবন শশিকান্তের বুকের মধ্যে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। সে মনে মনে হিংস্রভাবে কামনা করে, সত্যি সত্যিই কেউ একদিন ঠ্যাঙা মারিয়া টোনার ঠ্যাং ভাঙিয়া দিক, ডাণ্ডা বসাইয়া একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া রাখুক! ওই তো কালো মোটা কোলা ব্যাঙের মতো চেহারা, মেয়েরা উহারই মধ্যে এমন কী পাইয়াছে? না হয় মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করিয়া খানিক চেঁচাইতেই পারে। কিন্তু কাহারো যোগ্যতা বিচার করিতে এইটুকুই সব নাকি? শশিকান্তই বা এমন কী দোষটা করিয়াছে! চেহারা অবশ্য তাহারও খুব চিত্ত-চমৎকার নয়; তার উপর গত বৎসর বসন্ত হইয়া সমস্ত গালে কপালে কতগুলি বিশ্রী চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে। জীবনী-শক্তিহীন মেরুদণ্ডটায় একটা বিসদৃশ ভাঁজ পড়িয়া ঘাড়টা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া নামিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যি সত্যিই কি সে এত অবজ্ঞার যোগ্য? নাঃ, মেয়েগুলার রুচির উপর শ্রদ্ধা তাহার কমিয়া আসিতেছে।

শশিকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল: পূর্বজন্মে বিস্তর সুকৃতি ছিল তোর, কিন্তু মাঝখানে আবার আয়ান ঘোষ আছে রে—একটু সামলে-টামলে চলিস।

—আরে যায়্-যায়্-যাঃ—বিড়ির চিহ্নে কলঙ্কিত গোরুর ঠোঁটের মতো পুরু নিচের ঠোঁটটাকে নাকের দিকে প্রায় ইঞ্চিটাক ঠেলিয়া তুলিয়া টোনা কহিল: ডজন দু-তিন মেয়ে পার করে এলুম, বুড়া-বয়সে তুই আমায় আয়ান ঘোষের ভয় দেখাচ্ছিস! মেয়ে জাতটাকে আমি জানি, ওদের দায় কী করে ওদেরই ঘাড়ে চাপাতে হয়—তাও না জানি এমন নয়।

আড়িয়ল খাঁ নদীর বুকের উপর ঝিমাইয়া-পড়া অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, একটু একটু করিয়া শাদা রঙ পড়িতেছে নিচের কালো জলে। কুয়াশা নামিয়াছে বটে, কিন্তু খুব ঘন হইয়া নয়। দশ-বারো বছর আগে আড়িয়ল খাঁর ঠিক মাঝামাঝি মস্ত বড় একটা চড়া

জাগিয়াছে এবং ফলে স্টিমারের চলা-চলতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। সাহেবপুর স্টিমার ঘাটের ঠিক ওপারেই নীলগঞ্জের বাজার; কিন্তু চড়াটা থাকার দরুন জাহাজ আজকাল সোজাসুজি পাড়ি জমাইতে পারে না,—চড়াটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় তিন মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। তবু প্রভাতের স্নিগ্ধ স্বচ্ছতায় অনেক দূর হইতেই তিন-চারটি লাল নীল আলো ঝাপসা দেখিতে পাওয়া যায়—বাঁশির অতি গম্ভীর শব্দ শান্ত আকাশের তলা দিয়া ভাসিয়া আসে।

প্রতীক্ষমাণ জনতা একসঙ্গে সচেতন হইয়া ওঠে, বহু মানুষ একসঙ্গে নানা সুরে কলরব করিয়া ওঠে—জাহাজ আসছে—জাহাজ আসছে।

ইহার আগেই মুন্সী সাহেবের ঘুম ভাঙে। এই অখ্যাততর স্টিমারঘাটের সে অখ্যাততম কেরানী। শীর্ণদেহ মধ্যবয়সী লোকটি, বিনয়ে সর্বদা আনত হইয়াই আছে। বহুদূরের বাতাস বহিয়া স্টিমারের গম্ভীর বাঁশি ভাসিয়া আসে। বদনা হইতে চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটাইয়া মুন্সী সাহেব কাঠের একটি ছোট বাক্স লইয়া চড়ার উপর নামিয়া যায়। এই বাক্সটিই তাহার বুকিং অফিস। জনতার মাঝখানে বাক্সটি খুলিয়া বসিয়া সে টিকিট বিক্রি করে, ছাপানো ছককাটা হলদে কাগজে ভোঁতা কপিয়িং পেনসিল দিয়া অঙ্ক কষে, গোল একটা পাথরের টুকরো তাহার বাক্সে সঞ্চিত আছে, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি টুং করিয়া সেই পাথরখণ্ডে বাজাইয়া যাচাই করিয়া লয়।

বাড়ি তাহার চট্টগ্রাম অথবা কুমিল্লা—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একেবারে শেষপ্রান্তে। আগে সে নাকি কোথায় স্টিমারের ডকে কী একটা চাকরি করিত। তারপর একটা দুর্ঘটনায় হাতখানা তাহার কনুই ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। সেই হইতে সে এই স্টিমারঘাটের কেরানীগিরি পাইয়াছে। একটা হাত তাহার নাই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রতিকারবিহীন অভাবটাকে বহন করিতে করিতে অভাব বোধ করিবার মনোবৃত্তিই তাহার লোপ পাইয়াছে।

এদেশের সঙ্গে তাহার ভাষা মেলে না, আচার মেলে না, মনও মেলে না হয়তো। মুন্সী সাহেব সেই জন্য অসামাজিক। প্রতিবেশী অর্থাৎ সাহেবপুরের মুসলমান সমাজ মাঝে মাঝে কোরানের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাহারও সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সে নিজেও করে না, আর কেউ করিতে সাহসও পায় না। তা ছাড়া আর আছে এ অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর কয়েকঘর বৈরাগী, নিজেদের দলাদলি, গাঁজার কলকে, হরি-সংকীর্তন এবং বৈষ্ণবীতত্ত্ব লইয়াই খুব বেশি বিব্রত থাকে তাহারা। সুতরাং তাহাদের সঙ্গেও মুন্সী সাহেবের সংস্রব না থাকিবারই কথা।

অন্য দিনের মতো আজও মুন্সী সাহেব টিকিটের বাক্স লইয়া টিকিট বিক্রি করিতে আসিল এবং আড়িয়ল খাঁর মাঝখানে লম্বা চড়াটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবছায়া অন্ধকারে

স্টিমারের দীর্ঘ দেহটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কালো জলের উপর তিন-চারটি আলো লাল সবুজের দীর্ঘ বেপথু রেখা আঁকিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, চাকার মধ্য হইতে কাঠের বৈঠার জল টানিবার শব্দটা অত্যন্ত কাছে বলিয়া মনে হইতেছে। আর পাঁচ মিনিট, বড় জোর সাত-আট মিনিটের মধ্যে স্টিমার আসিয়া পড়িবে।

নদীর মধ্যে যে সমস্ত ইলিশ-মাছের নৌকা এলোমেলো ভাবে ঘুরিতেছিল, তাহাদের খানকয়েক এই সময় স্টিমারে কিছু বিক্রি করিবার আশায় একেবারে তীরের কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে। জনতার মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিল : কি গো কত্তা, মাছ আছে নৌকায় ?

পায়ে বৈঠা লাগাইয়া দু হাতে তামাক টানিতে টানিতে কত্তা জবাব দিল : আছে গোটা চারেক। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাহার এত নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত যে, মাছ বেচিবার জন্য একবিন্দুও আগ্রহ তাহার আছে বলিয়া মনে হইল না।

—জোড়া কত করে বেচবে ?

মাঝি নৌকা না থামাইয়া পায়ে বৈঠা টানিতে টানিতে তেমনি উদাসীনভাবে কহিল : ছ আনা।

—ছ আনা ! ওরে বাবা, ইলিশ মাছে আগুন লেগেছে নাকি ?

মাঝি উত্তর দিল না—বোধ হইল যেন দিবার প্রয়োজনই অনুভব করিল না। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে সে হুঁকাটাকে নামাইয়া হাতে বৈঠা তুলিয়া লইল এবং পরিপূর্ণ অবজ্ঞায় একবার ইহাদের দিকে তাকাইল মাত্র।

একজন মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল : ওরে আমার লাটসাহেব রে ! সোনার দরে ইলিশ মাছ বেচবে !

আর একজন কহিল : বুঝতে পারছ না, জাহাজী খালাসিদের কাছে করকরে কাঁচা পয়সা পায় যে ! জাহাজটা চলে যাক, তারপর তিন আনায় ঐ মাছের জোড়া বেচবার জন্যে ঝুলোঝুলি না করে তো কি বলে দিলাম—হাঁ !

এ পাশে তিন-চারটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া পলিটিক্‌স্ আলোচনা করিতেছে। বয়সে তাহারা সকলেই তরুণ, একজনের মাথায় আবার একটা খদ্দরের টুপি। সব চাইতে বেশি উত্তেজিত হইয়াছে সে-ই। মনে হইতেছে, দেশের দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত এমনি টগবগ করিয়াই ফুটিতেছে যে সে নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। প্রবলভাবে সে বলিতেছিল : প্রোগ্রাম তো আমাদের সামনে মেলাই আছে। এই কথাটাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে জানতে হবে, যারা অস্ত্রবলে দেশ জয় করে নেয়, আবেদন-নিবেদন বা অহিংসার নরম বক্তৃতায় তারা কখনও জয়ের সে অধিকার ছেড়ে দিতে চায় না। রেজোলিউশন তো বহু করেছ, দাবিদাওয়াও কম হয় নি, কিন্তু কি উত্তর পেয়েছ

তার? উত্তর পেয়েছ—জালিয়ানওয়ালা, উত্তর পেয়েছ—চৌরিচৌরা, উত্তর পেয়েছ—

মুকুল বলিয়া যে ছেলেটি এতক্ষণ নীরবে ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল, সে এইবার মৃদু হাসিয়া কহিল: থাম, রবি থাম। এটা স্টেশন ঘাট, বক্তৃতার প্ল্যাটফর্ম নয়। তার চাইতে ওই ত্যাখ স্টিমার এসে গেছে।

বাধা পাইয়া রবি একবার মুকুলের দিকে চাহিল। মুকুলকে সে পছন্দ করে না। বাহিরে প্রকাশ না থাক, তবু যেন রবি সর্বদাই মুকুলের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি দেখিতে পায়, যেন মনে হয়, সে তাহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ভঙ্গিকে অবধি অবিশ্বাস করিতেছে। কিন্তু তবুও রবি মুকুলের উপর কোন একটা কড়া কথা বলিতে সাহস পায় না —যেন তাহার চাইতে বৃহত্তর একটা ব্যক্তিত্বের কাছে সে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

মুকুলের কথার মধ্যে কী ছিল কে জানে, রবির শ্রোতারাও একসঙ্গেই চকিত হইয়া উঠিল:

—তাই তো, স্টিমার এসে পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ব্যস্ত হইয়া জলের দিকে আগাইয়া গেল। রবি এক মুহূর্ত থামিয়া দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল শুধু।

বহু-প্রতীক্ষিত স্টিমারটা এতক্ষণে তাহা হইলে আসিয়াই পড়িয়াছে। পিছনে আড়িয়ল খাঁর জল ফেনাময় হইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় ঢেউ উঠিয়া তীরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইলিশ মাছের নৌকাগুলি ঢেউয়ের মুখে মোচার খোলার মতো নাচিতেছে; একবার সম্মুখে, আর একবার পিছনে উঁচু হইয়া উঠিতেছে, যে কোনো মুহূর্তেই ডুবিয়া যাইতে পারে বা। কিন্তু ডুবিবে না যে, তাহা জেলেরাও জানে, দর্শকেরাও জানে।

স্টিমার একেবারে তীরের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সামনে নীল পোশাকপরা খালাসিরা আসিয়া ভিড় করিয়াছে, দোতলার ডেকে সদ্য ঘুম-হইতে-জাগা যাত্রীদের অলস দৃষ্টি।

তারপর কয়েক মিনিট ব্যস্ততা আর কোলাহল। নোঙর ফেলিয়া সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল, যাত্রীরা নামিতে শুরু করিল। একজন—দুইজন—তিনজন, চতুর্থজন নামিতেই এদিককার পলিটিক্স-আলোচনাকারী ছেলের দল গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

যে নামিয়াছিল, দশজনের মধ্য হইতেও তাহাকে সকলের আগে চোখে পড়ে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুশ্রী হয়তো বলা চলে না, কিন্তু সুপুরুষ বলা যায়। পুরু চশমার আড়াল হইতেও তাহার দৃষ্টি যেন ঝকঝক করিতেছিল।

মুকুলই প্রথমে কথা কহিল। দুই পা সামনে অগ্রসর হইয়া সে একটা নমস্কার করিল, তারপর মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল: মাপ করবেন, আপনিই প্রফুল্লবাবু তো?

—ধরেছেন ঠিক—যাত্রীটি হাসিয়া ফেলিল, আমারই নাম প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। আপনারা?

—সেক্রেটারি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এঁরা—

মুকুল দলের সকলের পরিচয় দিল।

প্রফুল্ল কহিল : নমস্কার। আপনারা এসে ভারি উপকার করেছেন আমার। এ অঞ্চলে আর কোন দিন আসি নি কি না, তাই পথ-ঘাট চিনি নে।

রবি জিজ্ঞাসা করিল : আপনার আর সব লগেজ কোথায়?

—লগেজ? আর লগেজ দিয়ে কী হবে? প্রফুল্ল এক হাতে ফাইবারের একটা সুটকেস এবং আর এক হাতে সতরঞ্চি-জড়ানো একটা ছোট বিছানা দেখাইয়া কহিল : এই লগেজেই সব রয়েছে। একা মানুষ মশাই, বেশি জিনিসপত্তর দিয়ে কী করব? ও বড় বালাই। শেষে নিজেকে সামলাব না লগেজ সামলাব, তাই নিয়েই সমস্যায় পড়তে হয়।

সকলেই হাসিল এবং সব চাইতে বেশি করিয়া হাসিল রবি। এমন ভাবেই হাসিল যে, জীবনে ইহার চাইতে হাসির কথা সে বুঝি আর কখনো শোনে নাই। স্টিমারঘাট চকিত হইয়া উঠিল এবং প্রফুল্ল অবধি বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

মুকুল কহিল : কিন্তু এখানে আর দেরি করে লাভ কী? যেতে যেতেই এক ঘণ্টা সময় কেটে যাবে যে। কিসে যেতে চান? নৌকায় না হেঁটে?

—কতদূর যেতে হবে বলুন দেখি?

—মাইল দুয়েক। ভালো রাস্তা আছে, হেঁটে যেতে অসুবিধে নেই। আর যদি নৌকোয়—

—পাগল! প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল, দু মাইল পথের জন্যে নৌকো করব, বলেন কী? ও রকম অভদ্র বিলাসিতা আমার নেই। চরণ দুখানা যতক্ষণ সুস্থ আছেন, ততক্ষণ আট-দশ মাইল পথের জন্যে ভাবনা নেই আমার। চলুন।

রবি কিন্তু ইহারই মধ্যে বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

—চলুন, সেই ভালো। সবাই মিলে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক্। কিন্তু বাক্স-বিছানা দুটো -

—বড় জোর বিশ সের। সেজন্যে ভাবনা নেই, চলুন হাঁটা যাক।

সবাই চলিতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ সকালের আলো তখন আড়িয়ল খাঁর বুকের উপর রঙ মাখাইয়া দিতেছে, গাছপালার আড়ালে আড়ালে রোদের টুকরো আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। পায়ের নিচে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা। সকালের শিশির-বিন্দু সে পথ ভিজাইয়া রাখিয়াছে, প্রথম প্রভাতের ঘাসের গন্ধ মন্থর বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পথের পাশ দিয়াই খাল। এখানে ওখানে বাঁশের 'চার', উবুড়-হইয়া-থাকা গাব-মাখানো ডিঙি, নারিকেল সুপারির ঘন বিন্যাস, গৃহস্থবাড়ির টিনের চাল। আর একপাশে ভাঁট ফুলের

ঘন জঙ্গল পথের উপরে ঝুঁইয়া পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে চলিতে লাগিল। তারপর মুকুলই আবার কথা কহিল।

—দেখুন, ইস্কুলটাকে আগাগোড়া নতুন করে গড়ে তোলা দরকার। এর আগে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন, তিনি নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরির লোক। সুতরাং ইস্কুলটাকে যা করে রেখে গেছেন তা মর্মান্তিক; আপনার কাছে নতুন কিছু একটা পাব বলেই আমরা আশা করি।

রবি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! বুড়ো আহাম্মুকটা ইস্কুলটাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেছে। আরে বাবা, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ কিংবা গড্ সেভ দ্য কিং—এ নিয়ে কী আর—

কিন্তু মুকুলের চোখের দিকে চোখ পড়িতেই রবি থামিয়া গেল। এই দৃষ্টিটাকেই কেমন সহ্য করিয়া উঠিতে পারে না সে। ইহার চাইতে মুকুল তাহার মুখের উপর কষিয়া একটা থাবড়া মারিলেও সে এতটা দমিয়া যাইত না। কথার প্রতিবাদ চলে কিন্তু চোখের প্রতিবাদ নাই।

কিন্তু প্রফুল্ল সে সব লক্ষ্য করিল না। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল: কি রকম?

মুকুল কটাক্ষে একবার রবির দিকে চাহিয়া কহিল: প্রথমত ছেলেগুলোকে ওভার-লয়্যাল করে তোলা হচ্ছে, তাদের কোনোরকম উন্নতির দিকেই ইস্কুল কমিটির দৃষ্টি নেই। দ্বিতীয়ত পার্টিগত ব্যাপারে—

প্রফুল্ল বিস্মিত হইয়া বলিল: পার্টি! ইস্কুলের আবার পার্টি কিসের?

মুকুল অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে হাসিল।

—সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ সব আভিজাত্যের কথা—সমাজের একেবারে গোড়াকার প্রশ্ন।

প্রফুল্ল আরো বিস্মিত হইয়া বলিল: আভিজাত্য?

—নিশ্চয়! আচ্ছা, সবটা বুঝিয়ে বলি আপনাকে। আমাদের গ্রামটা বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ প্রধান, কয়েক ঘর সাহা সম্প্রদায়ের বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন। প্রতি বছর গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়ে আসছেন। কিন্তু এবার এক সাহা ভদ্রলোক প্রস্তাব করেছিলেন, তাকে প্রেসিডেন্ট করলে তিনি ইস্কুল-বাড়িটা পাকা করে দেবেন। লোকটিও নিতান্ত অযোগ্য নন—গ্র্যাজুয়েট, বিশিষ্ট ধনী—

—তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে নিশ্চয়ই?

—ক্ষেপেছেন আপনি! বাসুদেবপুর গ্রামে তিনশো ঘর প্রবল পরাক্রান্ত বামুনের বসতি থাকতে এত বড় একটা সামাজিক কদাচার ঘটাব আপনি কী করে অনুমান করেন? তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরে থাক, বিবেচনাই করা হয় নি।

—সর্বনাশ! বলেন কি!

—যা বললাম। ফলে কী হল জানেন? দু দলে লাঠালাঠির উপক্রম, শেষ পর্যন্ত এক নিরক্ষর মাতাল মুসলমান জমিদারকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিয়ে দুই প্রতিপক্ষ ক্ষান্ত হয়েছেন।

প্রফুল্ল হাসিল: এতে আপনি ক্ষোভ করছেন কেন? শূদ্রের দানে আপনাদের পবিত্র ইস্কুল কলঙ্কিত হল না—খাঁটি আর্যতন্ত্র আর কাকে বলে!

দলের একটি ছেলে আগাইয়া আসিয়া কথা কহিল।

—জানেন না, এককালে আমাদের গাঁয়ের নাম নিয়ে নবদ্বীপ ছিল যে। ছিয়ানব্বুইটা টোল ছিল এখানে—মহা মহা পণ্ডিতও ছিলেন অজস্র। কবিরাজী নিদান লেখক মাধব করের নাম শোনেন নি?

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল: তাই নাকি! একেবারে ছিয়ানব্বুইটা টোল! এখনো আছে?

মুকুল হাসিয়া বলিল: আছে, তবে অত নেই, সবে তিনটেতে ঠেকেছে।

পথ খুব যে বেশি তা নয়, কিন্তু কথায় কথায় ওদের অজ্ঞাতেই বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বৈরাগীপাড়া, মাটির দোলমঞ্চ, তারপর রাধাশ্যামের অঙ্গন পার হইয়াই মুসলমানদের বস্তি। কিন্তু বৈরাগীদের চাইতে ইহারা সমৃদ্ধ। টিনের বড় বড় আটচালা—গোবর-লেপা মরাইগুলি আউশ ধানে স্ফীত হইয়া আছে। একপাশে প্রকাণ্ড খড়ের পালা, তাহার ঠিক মাঝখান দিয়া লম্বা সুপারি গাছ ধ্বজার মতো মাথা তুলিয়াছে। সোনালি খড়ের উপর শিশির-কণা সূর্যের আলোয় জ্বলিতেছে। ঝুঁটিওয়ালা একটা ধাড়ী মোরগ মাথা তুলিয়া গম্ভীরভাবে চাহিয়া আছে, একটু দূরেই তিন-চারটা ছোট ছোট বাচ্চা টুকটুক করিয়া কী খুঁটিয়া খাইতেছে।

পৃথিবী সুন্দর—পরিমণ্ডলটা আরও সুন্দর, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে পচা পাটের গন্ধে প্রায় দমবন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। এক পাশে ছোট একটা ডোবার মধ্যে রাশীকৃত পাট ভিজানো, বাঁশবনের ছায়ায় জমাট খানিকটা টকটকে ঘন লাল জলের উপর দিনের বেলাতেই ভনভন করিয়া মশা উড়িতেছিল।

সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রফুল্ল আবার আগের কথাটাই টানিয়া আনিল।

—ইস্কুলের অবস্থা সবই শুনলাম। কিন্তু আমাকে কী করতে বলেন আপনারা?

মুকুল কী ভাবিতেছিল। অন্তর্মুখী চোখ দুইটা তুলিয়া অন্যমনস্কের মতো বলিল: আপনার কী মনে হয়?

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। সে যেন শুনিবার জন্যই প্রস্তুত ছিল, বলার জন্য নয়। তাহার কপালের গোটাকতক রেখা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। মনে মনে যেন সমস্ত জিনিসগুলিকেই একবার বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিল: এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার বই কি। কিন্তু ইস্কুল কমিটির সেন্টিমেন্ট না জেনে আগে থেকে কী করতে পারি, বলুন?

রবি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলে নাই। স্বভাববিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক সংযমে সে মনে মনে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মুকুলের এই ধরনের মুরুব্বিয়ানা সে চোখ পাড়িয়া দেখিতে পারে না। না হয় এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াই ঘরে ফিরিয়াছে—কিন্তু তাহাতে এমন কী আসিয়া গেল! আজকালের দিনে এম. এ. পাস না করিতেছে কে? আর ফার্স্ট ক্লাস? ওঃ, তাহাতেই একেবারে খাপ্পা খাঁ বনিয়া গেল মুকুল! ওরকম ফার্স্ট ক্লাস আজকাল কলিকাতার পথেঘাটে গড়াগড়ি যায়। আচ্ছা আচ্ছা, দিন সেও একবার পাইবে। তখন যদি—

কিন্তু এ চিন্তাটা তাহার এই মুহূর্তের নয়, বা এতগুলো কথা যে সে একসঙ্গে ভাবিয়া লইল তাহাও নয়। ইহারা তাহার মনের মধ্যে এমন ভাবেই জড়াজড়ি করিয়া আছে যে, চিন্তার সূক্ষ্ম সুতাটিতে একবার টান পড়িলেই এগুলি বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া যায়। নাঃ, মুকুলের নিঃশব্দ শাসন সে আর নীরবে মানিয়া লইবে না, দস্তুরমতো বিদ্রোহ করিবে। রবি মনে মনে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে যেন।

—আরে রাখুন মশাই আপনার ইস্কুল কমিটি! ও কমিটি ভাঙতে কতক্ষণ? যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে কমিটিতে, বুঝলেন না! বললে বিশ্বেস করবেন না, দুখু সেন ইস্কুলের টাকা ভেঙে নিজের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ বানিয়েছে। আর গিয়ে দেখুন, বিশ্বেশ্বর চাটুজ্জের বাড়ি ইস্কুলের যত ভালো চেয়ার-টেবিল তার বৈঠকখানার শোভা বাড়াচ্ছে।

প্রফুল্ল মৃদু হাসিল। বলিল: দেখুন যতক্ষণ প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ সব কথা বলে লাভ নেই। গ্রামের দশজনের ইস্কুল, যতটা পারা যায় সকলের সঙ্গে মানিয়ে—

রবি উত্তেজিত হইয়া কহিল, আর মশাই মানিয়ে! চুরির প্রমাণ নেই বলতে চান? বঙ্কিম মুখুজ্জের বাপের শ্রাদ্ধে এই যে রাজ্যির টাকা—

কিন্তু কথাটা রবি সামলাইয়া লইল। ওপাশের বাঁশের 'চার'-টার* উপর বড় বড় পা ফেলিয়া বঙ্কিম মুখুজ্জের ভাইপো নন্তু পার হইয়া আসিতেছে। হাতে বাজারের একটা থলি, নলসিঁড়ির বাজারে মাছ কিনিতে চলিয়াছে। বাজারে আজকাল মাছ আর বেশি ওঠে না, অধিকাংশই গৌরনদীর গঞ্জে অথবা বরিশালে চালান হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা মৎস্য-লোভী, তাহাদের সকালে উঠিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাজারের পথে ছুটিতে হয়।

ইহাদের দিকে চাহিয়া নন্তু থমকিয়া দাঁড়াইল; একবার সে প্রফুল্লের সর্বাঙ্গ ভালো করিয়া দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইল, যেন তাহাকে চিনিবার বা তাহার সম্বন্ধে কিছু একটা নিশ্চিন্তভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। চোখের দৃষ্টিতে তাহার নির্বোধ কৌতূহল। বুদ্ধিমান বলিয়া সুখ্যাতি তাহার নাই, ইস্কুলের গণ্ডিও সে পার হইতে পারে নাই, ম্যাট্রিক ক্লাসে বার কয়েক ঘা খাইয়াই পড়াশোনার অব্যাপারটাকে সে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কাজের মধ্যে

*সাঁকো

আজকাল সে খেপলা জাল লইয়া খালের চুনোপুঁটি হইতে শুরু করিয়া গেঁড়ি-গুগলি অবধি চষিয়া বেড়ায় ; পাড়ার কাহারো বাড়ি ক্রিয়াকর্ম হইলে কোমর বাঁধিয়া ভূতের মতো খাটে এবং রাক্ষসের মতো খায় ; নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে পরের নারিকেল-বাগান উজাড় করিয়া আনে, আর গ্রামের কোথাও মানুষ মরিলে সবার আগেই সে কাঁধ দিবার জন্য আগাইয়া যায়। গ্রামের লোকের সে শ্রদ্ধাভাজন নয়, তাহার নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়া যায়। তাহাকে না হইলে কাহারো ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণ হইবার জো কি !

নন্তু প্রশ্ন করিল : জাহাজঘাটে গিয়েছিলে নাকি রবিদা ?

কথার মধ্যে বাধা পড়ায় রবি চটিয়া গিয়াছিল। তাই সংক্ষেপেই উত্তর দিল, হুঁ।

—ইনি কে এলেন ?

রবি বিরক্তভাবে ঘাড় ফিরাইল।

—তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? সবারই পরিচয় দিতে হবে নাকি তোমাকে ?

নন্তু রাগ করিল না। নির্বোধ মুখের উপর অপরূপ একটা ভঙ্গি টানিয়া আনিয়া সে ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভঙ্গিটা হাসির না কৌতুকের, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া আবার প্রশ্ন করিল, মাইরি বলো না রবিদা, রাগ করছ কেন ? নতুন লোক দেখছি, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—

রবি চড়াস্বরে কহিল, না, এমন জিজ্ঞেস করতে নেই। ইনি ইস্কুলের নতুন হেড-মাস্টার, হল তো ? সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কটা তো অনেককাল কাটিয়েছ। এখন আবার এমন কৌতূহল কেন ?

আর কেউ হইলে হয়তো লজ্জা পাইত, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই পাইত ; কিন্তু নন্তু সে ধাতের ছেলেই নয়। তেমনি অপরূপ কৌতুকময় মুখেই সে রবির এত বড় কথাটাকেও নীরবে হজম করিয়া লইল। তারপর ইহারা কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গেলে সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করিল, ইঃ, মেজাজ দেখ না একবার ! যেন শায়েস্তাবাদের নবাব আর কি !

সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—রবির মর্মে গিয়া সেটা বিঁধিল। অস্পষ্টভাবে সে শুধু বলিল : 'ইডিয়ট' ! তাহার বেশি কিছু বলিয়া বসিতে তাহার সাহস হইল না। নন্তুটা যা গোঁয়ার ! গায়েও বিলক্ষণ শক্তি রাখে—একবার রাগ হইয়া গেলে লঘু-গুরু মানিবে না। তাহাকে ঘাঁটানোটা নিরাপদ নয়।

দলের কেউ কেউ হাসিল। একজন বলিল : ভারী ঠোঁটকাটা হয়ে উঠেছে হতভাগা।

বহুক্ষণের নীরবতা ভাঙিয়া মুকুল এতক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। বলিল : কিন্তু যেচে ঝগড়া করা ওর স্বভাব নয়।

রবি উগ্রভাবে কহিল : তুমিই ওকে অতিরিক্ত আস্কারা দাও কিনা।

মুকুল উত্তর দিল না।

এতক্ষণে পথ শেষ হইয়া সকলে শিববাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিববাড়িই গ্রামের কেন্দ্র। বাবুগঞ্জের বড় নদী হইতে বাহির হইয়া যে খালটি বামুনদিয়ার নিচ দিয়া সরিকলের হাট পার হইয়া, ঘণ্টেশ্বরের পুল একপাশে রাখিয়া একেবারে সোজা বাসুদেবপুরের বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সহিত এইখানে আড়িয়ল খাঁ হইতে বহিয়া আসা কাটি-খালের সঙ্গম ঘটিয়াছে; তারপর শিববাড়ি ছোট বাজারটিকে সাপের মতো একটা পাক দিয়া গাঙ্গুলিদের বাড়ি ও বাগানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সোজা মাহিলাড়া বাটাজোড়ের দিকে বহিয়া গিয়াছে। খালের তিন দিকের তিন মুখ বাহিয়া নানা অঞ্চলের ছোট বড় বহু নৌকা শিববাড়ির ঘাটে আসিয়া ভিড় করে। তাদের মধ্যে 'কেরায়া'* নৌকার সংখ্যাই বেশি। মহাজনী নৌকাও না আসে তা নয়, কিন্তু তাহারা প্রধানত আসে বর্ষার সময়ে। তখন এতটুকু এই শুকনো খালটির চেহারা রীতিমত বদলাইয়া যায়। শিববাড়ি বাজারের একেবারে তলা পর্যন্ত হলদে জল উঠিয়া আসে, জোয়ারের সময় কান্ত নাগের দোকান-ঘরের মাচা পর্যন্ত জল থলথল করিতে থাকে। শিববাড়ির ঠিক পিছনে আর গাঙ্গুলিদের বাড়ির বাঁকের মুখে বড় বড় ঘূর্ণিতে জল আর কচুরিপানা ঘুরিতে থাকে, হারান আর হুরো জেলেরা দুই ভাই মাছের আশায় খালের মধ্যে বড় বড় বাঁশ পুঁতিয়া 'ভেসাল'† খাড়া করিয়া তোলে। গয়নার নৌকা বহু দূরের দত্তবাড়ির ঘাট ছাড়িয়া— ঠিক শিববাড়ির নিচে আসিয়া ভিড়িতে পারে, সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের ডঙ্কার ডুম ডুম শব্দে গ্রাম মুখর হইয়া ওঠে।

শিববাড়ির উপরেই গ্রামের পোস্টঅফিস। সুশীল মাস্টার এই সময়ে ডাক বাঁধিতে আসে। যাঁহাদের অসময়ে চিঠিটা-আসটা গছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাঁহারাও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া দাতন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের জন-কয়েক আজও এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন।

এ দলটিকে প্রথমে যিনি দেখিলেন তিনি নরেশ কর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি জেলার একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বয়স কিছু বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি সব ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু কাজ ছাড়িলেও রাজনীতিতে অনুরাগ তাঁহার প্রচুর। এবং সেই অনুরাগ হইতেই যেন কেমন করিয়া তাঁহার নিঃসংশয় ধারণা জন্মিয়া গেছে যে, গ্রামে তাঁহার মতো রাজনৈতিক বোদ্ধা আর দ্বিতীয়টি নাই; আরো বিশেষত্ব এই যে, নিজের সম্বন্ধে এ ধারণাটাকে ঢাকিয়া বা চাপিয়া চলিবার চেষ্টা তিনি কোন দিনই করেন না। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের প্রত্যেকটি লীডার হইতে আরম্ভ

* ভাড়াটে

করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়েন, দরকার হইলে কোন কোন বিশেষ 'সম্পাদকীয়' ঝরঝর করিয়া টানা মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন পর্যন্ত। পলিটিকস্ সম্বন্ধে বলিতে গেলে তিনি এমনই উত্তেজিত হইয়া ওঠেন যে, শ্রোতারা তাঁহার ব্লাড-প্রেসারের কথা স্মরণ করিয়া রীতিমত শঙ্কা বোধ করে।

একটা ভেরেণ্ডার দাঁতন সজোরে সামনের দুইটা বাঁধানো দাঁতের উপর ঘষিতে ঘষিতে তিনি সুশীল মাস্টারকে বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটির সমস্যা বুঝাইতেছিলেন। সুশীল মাস্টার বুঝিতেছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু শুনিতে যে ছিলেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেক কাজ। দুই দিন ডাক পাঠাইতে দেরি হওয়ায় বাটাজোড়ের অফিস হইতে সেন্সার আসিয়াছে, ওভারসিয়ার আসিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়াছে। এমন করিলে চাকরি থাকিবে না। আর ছাই, চিঠির উপদ্রবই কি কম! যতই দিন যায়, চিঠির ভিড় ততই বাড়িতেছে। একটু ধুম করিয়া পরস্পরের কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান করিলে লোকের যেন চিন্তায় ঘুম হয় না রাত্রে।

কিন্তু সুশীল মাস্টার শোনেন বা না শোনেন, সেদিকে নরেশ করের লক্ষ্য ছিল না। নিজের মনে তিনি বলিয়াই চলিয়াছেন, যেন নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতেই তিনি ভালোবাসেন। হঠাৎ তাঁহার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইয়া আসিল।

ভেরেণ্ডার দাঁতনটাকে সোজা গালের এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া তিনি ছুটিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন।

—আরে আরে, এই নাকি আমাদের নতুন হেডমাস্টার মশাই! নমস্কার, নমস্কার।

প্রফুল্ল চকিত হইয়া চাহিল, কহিল: নমস্কার।

সুশীল মাস্টার নীরব শ্রোতা, কিন্তু সে পুরানো হইয়া গিয়াছে এবং তা ছাড়াও সে এত নীরব যে, সময়ে সময়ে আদৌ শুনিতেছে কিনা সন্দেহ হয়। সম্প্রতি নরেশ কর তাহার উপর হইতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন।

প্রফুল্লকে নতুন দেখিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া পরখ করিবার কৌতূহলটা স্বাভাবিক। এবং ভবিষ্যতে শ্রোতা হিসাবে সে কতটা যে উতরাইয়া যাইবে, সেটাও একবার যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন।

—বাঃ, বেশ বেশ। এই স্টিমারেই বুঝি এলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—পথে কোন কষ্টটষ্ট হয় নি তো? আর যা পথ মশাই, প্রথমটা নদীর মর্জি, তারপর কুয়াশার মর্জি এবং সব্বার ওপরে স্টিমার কোম্পানির মর্জি। তা অনেক দূর থেকে এলেন, সঙ্গে বিছানা-পত্তর কিছু দেখছি না যে?

সুটকেস আর বিছানা দেখাইয়া প্রফুল্ল কহিল: এই যে।

—মোটে এইটুকু! নরেশ করের কণ্ঠে যুগ-যুগান্তের বিস্ময় প্রকাশ পাইল: বলেন কী মশাই, ওর ভেতর আর কী আছে? একটা সতরঞ্চ আর একটা সুজনি—এর বেশি নিশ্চয় নয়! মশারি আনেন নি তো? আরে মশাই, এখানকার যা মশা সে পেল্লায় ব্যাপার। এক-একটা প্রায় ছোটখাটো টুনটুনি পাখি আর কী! রাত্তিরে যখন কন্‌সার্ট শুরু করে দেয়, তখন মনে হয় কী জানেন? কানের কাছে যেন যাত্রার দলের জুড়িরা প্রাণপণে বেহালা বাজাচ্ছে।

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল: খুব মশা বুঝি?

—তবে আর বলছি কী? থাকবেন তো রাসমোহন সেনের বাড়ি? পেছনে একটা ডোবা আছে—হুঁ হুঁ। সন্ধ্যার সময় যখন সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আকাশে উড়তে থাকে, তখন দেখলে বোধ হয় যেন জার্মানিতে একটা কারখানা থেকে হাজার হাজার বোমারু এরোপ্লেন—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা আগাইয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই নরেশ কর হঠাৎ টক করিয়া থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, যে উদ্দেশ্যে তিনি এই সাত-সকালে হন্ত-দন্ত হইয়া ডাকঘরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যটা এখনো পর্যন্ত সফল হয় নাই। সুশীল মাস্টার খটখট করিয়া চিঠিগুলার উপর ছাপ মারিতেছে, এখনই ডাক বন্ধ হইয়া যাইবে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া নরেশ কর কহিলেন: আচ্ছা দেখা হবে আর এক সময়, আসি এখন। বিশেষ কাজ আছে একটু, নমস্কার।

—নমস্কার।

নরেশ কর একরকম ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন। দলটি ততক্ষণে সেক্রেটারির বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

গ্রাম—গ্রামের এইটাই যে সত্যিকারের রূপ শুক্লা সে কথাটা কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই যেন।

কলিকাতা মহানগরী। নিজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সমস্ত দেশের কেন্দ্রশক্তিটাকেই সে টানিয়া আনিয়াছে, কোনখানেই কিছু আর অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই। দিক-দিগন্তে তাহার রাক্ষস-বাহু বাড়াইয়া দিয়া দাবি করিতেছে—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, মস্তিষ্ক। দুর্নিবার তাহার আকর্ষণে দিক-বিদিকের প্রাণশক্তি অন্ধের মতো সেখানে ছুটিয়া গেছে; এখানে রাখিয়া গেছে—ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, কুৎসা এবং কলঙ্ক।

মৃত্যু! দেহের মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু। বর্ষা শেষ হইয়া যায়, ভাদ্রের ভরা জল কার্তিকে পচিয়া পচিয়া অস্বাস্থ্যকর বিষ-বাষ্পে গ্রামের আকাশ-বাতাসকে আবিল করিয়া তোলে।

তারপর কলেরা শুরু হইয়া যায়। বাড়ির পর বাড়ি উজাড় হইয়া চলে, হাতুড়ে ডাক্তারের পশার বাড়িয়া যায়। পোড়াইবার লোক জোটে না, দিনের বেলাতেই দেখা যায়, খালের ধারে ধারে শিয়ালে মড়া টানিতেছে। যাহারা পলাইতে পারে, তাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। তারপর মহামারীর ক্ষুধা ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া আসে—ইন্ধন থাকে না বলিয়া। পরিত্যক্ত ভিটাগুলি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে থাকে, বেড়া ভাঙিয়া পড়ে, খুঁটির গোড়ায় উই ধরে, অবশেষে কোনো এক কালবৈশাখীর আঘাতে টিনের চালাটাও সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়। ধীরে ধীরে সেই নির্জন ভিটাগুলির উপর জঙ্গল গজাইতে থাকে। সে জঙ্গল ঘন হইতে ঘনতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাপের ভয়ে মানুষ আর সেদিকে পা বাড়াইতে পারে না। ভৌতিক অপবাদ বাড়িটাকে অভিশপ্ত করিয়া তোলে; রাত-বিরাতে অনেকে হয়তো দেখিতে পায় —অমানুষিক ছায়ামূর্তি, শুনিতে পায় অস্বাভাবিক হাসির শব্দ; অন্ধকার মধ্যরাত্রে কে যেন নারিকেলগাছের মাথা ধরিয়া ঝাঁকাইতে থাকে, ম্লান জ্যোৎস্নায় ঘোমটা দিয়া পাঁচ বছর আগে মরা ও-বাড়ির বড় বউয়ের মতো কাহার একটা মূর্তি খালের ঘাটে নামিয়া আসে। পিছনের বাঁশবনে কাহারা যেন বাঁশে বাঁশে পিটাইয়া একটা অস্বাভাবিক শব্দ জাগাইয়া তোলে।

আর মন! জীবনে যাহাদের বৈচিত্র্য নাই, নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই যাহাদের পঙ্গু মন ফেনাইতে থাকে, তাদের কাছ হইতে মানুষ কতটুকু কী-ই বা আশা করিতে পারে! নগর-জীবনের এলোমেলো যে এক এক টুকরো আলো এখানে আসিয়া ছিটকিয়া পড়ে, তাহাতে ইহারা চোখে দেখিতে পায় না, ইহাদের চোখে তাহাতে ধাঁধা লাগিয়া যায়। শহরে যে নতুন কাপড় পরিবার ভঙ্গীটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনন্যসাধারণ অনুকরণী প্রতিভার বলে গ্রামের ছেলেরা তিন দিনেই সেটি আয়ত্ত করিয়া বসে, নিউকাট জুতা বা নতুন ছাঁটের জামা আমদানি হইতে মাত্র পনরো দিন সময় লাগে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পত্রিকার বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া ইহারা যৌনবিজ্ঞান কেনে, পলিটিক্সের দু'একটা সস্তা বুলি মুখস্থ করে, অবসর সময়ে নতুন নাটকের রিহার্সাল চালায়। নৈতিক চরিত্রের পবিত্র আদর্শে গ্রাম উজ্জ্বল—দূর হইতে এই যে একটা কথা প্রবাদের মতো হইয়া আছে, তাহা যে কতখানি মিথ্যা, গ্রামে আসিলে সেটা প্রমাণ হইতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। অর্থের অভাবে অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের দল যেখানে ঘরে ঘরে বাড়িতে থাকে এবং শিস দিয়া আড্ডা জমাইয়া বেড়ানো ছেলের দল যেখানে অপর্যাপ্ত, সেখানে নৈতিকতার তথাকথিত মানদণ্ড কোন্ দিকে যে কতখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশি করিয়া বলিতে যাওয়া নিরর্থক।

গ্রামের মধ্যে একান্ত হিতকর এবং প্রয়োজনীয় যে এক-আধটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলিকে লইয়াও ক্ষুদ্রতার অবধি নাই। দরকার হইলে ভদ্রতা সংযমের মুখোশ

এক মুহূর্তে খুলিয়া ফেলিয়া হাতাহাতি করিতেও ইহারা দ্বিধা করে না।

—বল কি হে, রমেশ চৌধুরী হবে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট! ব্রজবিহারী দাদা, তুমি বেঁচে থাকতেই গাঁয়ের মধ্যে এত বড় অঘটনটা ঘটবে? মুখুজ্জেদের সাদা মুখ তিন দিনেই তা হলে কালো হয়ে যাবে যে!

সুতরাং ব্রজবিহারী দাদার ঘুমন্ত পৌরুষ খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো এক মুহূর্তে সজাগ হইয়া ওঠে। সুখটান দিবার জন্য যে হুঁকাটা তিনি হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার প্রলোভনও যেন গৌণ হইয়া আসে। মনের ভুলে সেটাকেও তিনি পাশের লোকটির দিকেই বাড়াইয়া দেন।

—হুঁঃ, তুমিও যেমন! এসব শোনো কার কাছে? বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মরক্ত এখনো ঠাণ্ডা হয় নি হে। মুখুজ্জেদের সমস্ত তালুকদারিই যদি বন্ধক দিতে হয়, তবুও এমনটা হতে দেব না। শুদ্দুরের টাকার জোর হয়েছে! ও অহঙ্কারের পয়সা কদ্দিন থাকবে? আমি পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি—

কী বলিতে পারেন, তাহা নূতন করিয়া বলার দরকার নাই। এ ইতিহাস গতানুগতিক—বার বার করিয়া বলার হয়তো নয়, কিন্তু গ্রামের দিকে একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেই এই পুরাতন, অতি পুরাতন সত্যগুলিও অত্যন্ত নির্মমভাবে দৃষ্টিকে আহত করিতে থাকে। নূতনত্ব হয়তো নাই, হয়তো নূতন করিয়া শোনানোটা ক্লান্তিকর, কিন্তু ক্লান্তিকর হইলেই এ সত্যকে আজ আর কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখা চলিবে! যন্ত্র-চক্র-মুখরিত নাগরিক জীবন, বিদ্যুতের রূপসজ্জা, সিনেমার রূপালি পর্দায় স্বপ্নিল জীবনের বহুবর্ণিল প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেই পর্দার পিছনে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার খাঁ-খাঁ করিতেছে। আশা নাই, আলো নাই, প্রতিকারও হয়তো নাই। সবাই জানে, এত বেশি করিয়াই জানে এবং এত বেশি করিয়াই শুনিতে পায় যে, সেজন্য এতটুকু কিছু করিতে যাওয়াও আজ অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের এই সম্পূর্ণ রূপটাকেই কয়দিনে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিল শুক্লা। বিস্মিত হইল, আঘাত পাইল, সাময়িকভাবে সেণ্টিমেণ্টে খানিকটা আলোড়নও জাগিল হয়তো। কিন্তু অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে আলোড়ন গেল স্তিমিত হইয়া। বেদনাটা হইল কৌতূহল এবং কৌতূহল পার হইয়া খানিকটা কৌতুক জাগিয়া রহিল শুধু।

আর কৌতুক ছাড়া কী-ই বা সে বোধ করিবে। গ্রামে সে কখনো থাকে নাই; জন্মিয়াছে পাটনায় এবং মানুষ হইয়াছে কলিকাতাতে। তাহার বাবা অ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে কি একটা প্রকাণ্ড চাকরি করিতেন। কর্মজীবনটা তাঁহার দেশের বাহিরে বাহিরেই কাটিয়াছে। সুতরাং দেশের সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন একটা ধারণাই শুক্লার মনে থিতাইতে পারে নাই। দেশ সম্পর্কে আবছা-আবছা যতটুকু শুনিয়াছে, তাহাতে শুধু স্বপ্নই

জমিয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের কল্পনা আসে নাই।

আর তা ছাড়া দেশ সম্বন্ধে ভাবিবার কতটুকু অবকাশই বা তাহার ছিল! সংস্কৃতি—শিক্ষা—আলোকপ্রাপ্ত সমাজজীবন। দেশের গ্রামের এতটুকু খবর না রাখিলেই বা তাহার কি ক্ষতি হইতে পারিত! কিন্তু নানা কারণে দেশের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইল। বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জে বাড়ি রাখিয়া বাবা মারা গেলেন, ব্যাঙ্কে যাহা রাখিয়া গেলেন,—এক পুরুষ ধরিয়া অজস্র পরিমাণে অপচয় করিবার পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত। জীবনের সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে চোখ রাখিয়া শুক্লা কলেজের ধাপগুলি ডিঙাইল। তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যখন ঢুকিয়াছে, তখন কী কুক্ষণেই একদিন টালিগঞ্জের মশা তাহাকে কামড়াইল।

সেই যে কামড়াইল, সেই হইতেই জর। ছাড়িল যখন, তখন আর বস্তু রাখিয়া গেল না। পাণ্ডুর চোখ-মুখ, শীর্ণ শরীর—ইনভ্যালিড-চেয়ারে করিয়া শুক্লাকে পুরীতে চালান করা হইল। তারপর গিরিডি, নৈনিতাল, ডেরাডুন এবং কার্শিয়াং ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সে গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে তাহাদের এত বড় যে একটা বাড়ি আছে এবং তাহার কাকার এখানে এমন প্রতিপত্তি, এসব দেখিয়া সে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইল।

ডাক্তারের কড়া নিষেধ: পড়ার বই খুলিবার জো কী! অথচ শরীর সারিয়া উঠিয়াছে, প্রায় নিঃসঙ্গ কর্মহীন দিনগুলি আর কাটিতে চায় না। প্রথম যখন সে গ্রামে আসিয়াছিল, তখন কলিকাতার বাহিরে বাংলার এই রূপটা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তারপরেই সে মোহ কাটিয়া যাইতে দেরি হইল না। আর তা ছাড়া প্রতিদিনের অতি বাস্তবহীনতা, কলিকাতায় যাহার রূপ প্রসাধনের প্রখরতায় চাপা পড়িয়া যায়, তাহা এখানে এমন প্রকট হইয়াই উঠিয়াছে যে, শুক্লা রীতিমত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল।

বিকালের সোনালি রোদ তখন বাগানের নারিকেল-বীথিকে রাঙাইয়া দিয়া তাহার জানালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। শুক্লা আর থাকিতে পারিল না। বাহির তাহাকে সত্যি সত্যিই যেন হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছিল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সে চুলটা একবার ঠিক করিয়া লইল, তারপর পায়ে জুতা আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পল্লীর অভিজ্ঞতায় এটা নূতন। তাদের বিচার-দৃষ্টির কাছে মার্জনীয়ও নয়। কিন্তু বাহির হইতে যারা আসে, এ নিয়ম তাদের পক্ষে খাটে না। আরও বিশেষ করিয়া শুক্লার মতো মেয়ে—নিজের মূল্য সম্পর্কে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সচেতন।

কিন্তু শুক্লার যাহাকে সব চাইতে বিশ্রী লাগে, সে কাকার মেয়ে নীলি; নামটা তাহার নীলিমা নামেরই অপভ্রংশ, কিন্তু অমন চমৎকার নামটার কী অপচয়ই না করা হইয়াছে এই মেয়েটার ঘাড়ে চাপাইয়া! নীলাম্বরী অথবা নীল কাদম্বিনী গোছের নাম হইলেই ইহাকে মানাইত। গ্রামের মেয়ে, বাড়িতে খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু মনের দিক দিয়া যে কে সেই!

প্রথম দিনেই শুক্লা সেটা টের পাইয়াছিল।

বাইরে যাইবার পথে নীলি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : কোথায় যাচ্ছ সেজদি ?

—রাস্তা থেকে ঘুরে আসব একটু। যাবি ? আয় না ?

কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণের কোনো উত্তর না দিয়াই নীলি বলিয়াছিল : তাই বলে ওই জুতোটা পায়ে দিয়ে পথে বেরোবে নাকি ?

সন্দিগ্ধ হইয়া শুক্লা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : কেন, কি হয়েছে জুতোটার ?

নীলি সসঙ্কোচে বলিয়াছিল : না, জুতোটার কিছু হয় নি। তবে ওটা পায়ে দিয়ে রাস্তায়—

—তার মানে ?

শুক্লার মুখের ভাব ক্রমশ কঠোর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নীলি আরো সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল ; সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিল : লোকে যা-তা বলবে।

—ওঃ !

প্রথমটা তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য, তারপর স্নিগ্ধ কৌতুকের দীপ্তিতে শুক্লার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল ; বলিয়াছিল : আচ্ছা, লোকের যা ইচ্ছে বলুক। কিন্তু তুই যাবি সঙ্গে ?

জড়োসড়ো হইয়া নীলি বলিয়াছিল : না, সেজদি। মা এসব বেশি পছন্দ করে না। তা ছাড়া ও বাড়ির জেঠিমা দেখলে—

—তোকে কপ করে খেয়ে ফেলবে, না ? আচ্ছা, থাক তুই, প্যাঁচার মতো মুখ করে তা হলে ঘরেই বসে থাক। থাইসিসে মরবার জন্যেই তোরা জন্মেছিস, বাইরের আলো-বাতাস তোদের পছন্দ হবে কেন ?

চটিয়া হিল-তোলা জুতা ঠকঠক করিয়া শুক্লা বাহির হইয়া গিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল, দোতলার একটা জানালা দিয়া পশুর মতো ভীত অর্থহীন চোখে নীলি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—যেন এমন একটা অসম্ভব অবস্তু সে আর কোন দিন দেখে নাই ! শুক্লার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই সে সজোরে ঠাস করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইঃ, লজ্জার বহরটা দেখ একবার ! যেন মেয়ের শুভদৃষ্টি হইতেছে !

নীলির সম্বন্ধে শুক্লার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিল, চেষ্টা-চরিত্র করিলে সময়মতো মেয়েটাকে হয়তো শুধরাইয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু দিনকয়েক নাড়াচাড়া করিয়াই বুঝিল অসম্ভব। দৈন্য তাহার যে শুধু শিক্ষার তা নয়—তাহার সংস্কারের। এই গ্রাম আর এই রক্ষণশীল পরিবারের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া তাহার প্রতিটি রক্তকণিকায় যে সংক্রামক ব্যাধিটা ছড়াইয়া গিয়াছে, জন্মান্তর না ঘটিলে কোনো-মতে সে রোগ সারিবার নয়।

নমুনার তাহার অভাব নাই।

বলিয়াছিল : দুপুরবেলা কি পড়ে ভোঁসভোঁস করে ঘুমোস ! তার চাইতে আজ এই হাতের লেখাটা লিখে রাখবি, রাত্তিরে দেখে দেব, পারবি ?

—হুঁ, ঘাড়টাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হেলাইয়া নীলি বইটা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উৎসাহের সমাপ্তিও ওইখানেই ঘটিল।

সুতরাং দুপুরে ভোজনপর্ব শেষ করিয়া সে মুঠি ভরিয়া পান মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল, তারপর মেঝেতে মাদুর পাতিয়া এবং ভিজা চুলের গুচ্ছ এলাইয়া দিয়া সটান হইয়া পড়িল। ঘুম যখন তাহার ভাঙিল, বেলা তখন বৈকালের দিকে গড়াইয়া গিয়াছে।

রাত্রে শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল : লিখেছিস ?

অপ্রস্তুতভাবে নীলিমা বলিল : কাল লিখব।

তারপর সেই কাল অনেক কালেই প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। লেখার সময় নীলি এ পর্যন্ত আর পাইয়া উঠিল না। এ সমস্ত বাজে কাজে দুপুরটা নষ্ট না করিয়া ও সময়ে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইলে, আর নয়তো পাড়ার আরো তিন-চারটি মেয়েকে লইয়া বিন্তি খেলিলে যে অনেক উপকার হইবে, এ সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ ছিল না।

শুক্লা তাহাকে শুধরাইবে কী, শেষে এমন দাঁড়াইল যে, তাহাকে দেখিলে নীলি যে কোন্ পথ দিয়া ছুটিয়া পালাইবে, তাহাই ভাবিয়া পায় না। সে যেন তাহার কাছে মূর্তিমতী একটা বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। পড়াশুনা এমনিতে হইবেই না, অনর্থক মেয়েটাকে সদা সন্ত্রস্ত রাখিয়া বেচারার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

সুতরাং শুক্লা হাল ছাড়িয়া দিল। গ্রামের আরো পাঁচটি মেয়ে তাদের জীবনের যে পরিণতিটাকে অনিবার্যভাবে বরণ করিয়া লইয়াছে, নীলির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম যদি না ঘটে, তবে সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করার কারণ নাই। ইহাদের রক্তধারায় যে জন্মার্জিত সংস্কার চিরটা কাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার মতো মনের জোর ইহাদের যদি না থাকে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রেই বা অভিযোগ করিয়া কী হইবে ? সংশোধন করিবার সময় যদি উত্তীর্ণ হইয়াই গিয়াছে, তাহা হইলে রুদ্রের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া সে আর কী করিতে পারে ?

কিন্তু শুধু মেয়েরা কেন, সমস্ত পরিমণ্ডলটাই যে কী অস্বাভাবিক, কী নিশ্বাসরোধী, তাহার পরিচয় পাইতে শুক্লাকে তিনটি দিনও দেরি করিতে হয় নাই ; তথাকথিত শিক্ষার দিক হইতে এ গ্রামটাকে একেবারে পশ্চাৎপদ বলা চলে না, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহাদের একদল কলিকাতার পথেঘাটে এবং দেশ-বিদেশে হা-ঘরের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, একদল ঘরে আসিয়া বসিয়া আছে, কেহ পল্লী-সংস্কারে মন দিয়াছে, কেহ বা থিয়েটার পার্টির অনারারি সেক্রেটারি ; কিন্তু তাই বলিয়া

ইহাদের মনোবৃত্তি যে এই স্তরেই নামিয়া আসিয়াছে, শুক্লা সেটা কল্পনা করিবে কী করিয়া!

পথে তো নামে নাই—যেন সে চিড়িয়াখানার একটা প্রাণী। যে দেখিল, সে-ই চাহিয়া রহিল। আর সে কী দৃষ্টি! ভাষা দিয়া তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

তারপরে গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে ইহাদেরও এবং তাহারও। এখন তাহাকে দেখিলে ইহারা নানা রকম-ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইয়া দেয়। বয়স্কেরা ভ্রূকুটি করেন, ছেলে-ছোকরারা পরস্পরের দিকে চোখ টিপিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে। খাল, পুকুরঘাট বা আনাচ-কানাচ হইতে মেয়েরা যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, সে দৃষ্টিও ঠিক বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

মধ্যে মধ্যে নেপথ্য মন্তব্যও ভাসিয়া আসে।

—নিশি সেনের মেয়ে, না?

—তাই তো দেখছি। কলকাতায় থাকে, তিন-চারটে পাস দিয়েছে।

—বল কী! এত বড় মেয়ে, বিয়ে-থা দেবে না?

—আবার বিয়েও! বড়লোকের মেয়ে, হয় বিলেতে যাবে, নয়তো মাস্টারনী হবে। ওদের আবার বিয়ের ভাবনা!

কিন্তু এগুলি বয়স্কাদের মতামত। এই বাসুদেবপুর গ্রামে বাহিরের রূপ-রস-সমৃদ্ধ জগতের প্রাণ-স্পন্দন একেবারে যে ভাসিয়া না আসে তাও নয়। তরুণী মেয়েরা তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাহার প্রত্যেকটি চালচলনকেই তাহারা মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে।

—দেখেছিস ভাই, কী সুন্দর ওর শাড়িখানা!

—রিগ্যাল শাড়ি, কলকাতায় নতুন উঠেছে! এবার পূজার সময় ওঁকে লিখে দেব—আমার জন্যে কিনে আনবেন একখানা।

তা ছাড়া সবই এখন একটু একটু করিয়া বদলাইতে শুরু করিয়াছে। গত বৎসর এই গ্রাম হইতে দুইটি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছে, বরিশাল কলেজে পড়িতে গিয়াছে তাহারা। গ্রামের যাহারা প্রগতিপন্থী তরুণ, এ ব্যাপার লইয়া তাহারা রীতিমত গর্ব বোধ করে। তবুও এখনও যে ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাব এড়াইতে পারিল না, সেটাই বিসদৃশ লাগে শুক্লার কাছে।

তা যে যাহাই ভাবুক সেজন্য তো আর ঘরে বসিয়া বিকালটাকে মাটি করা চলে না। শুক্লা পথে নামিয়া পড়িল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু রাস্তা, এ অঞ্চলে গোরুর গাড়ি চলে না বলিয়া রাস্তার বুক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায় নাই। দুই পাশে বাঁশ আর সুপারি-নারিকেলের দীর্ঘ ছায়া। শুক্লা মন্থর গতিতে আগাইয়া চলিল।

গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপ, রায়েদের দীঘি, বক্সীদের বাগান—আর কর মজুমদারের মঠগুলি পার হইয়া খালের পাশে পথটি মাহিলাড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়াই শুক্লা চলিতে লাগিল। গ্রামের সীমানা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগান আর বন-জঙ্গল হালকা হইয়া গেল, এইবার দুপাশে অজস্র মাঠ। সবুজ নয়—শস্যহীন শীতের প্রান্তর, একটা রুক্ষশ্রী, চারিদিকে যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে; কোথাও কোথাও সবুজের খানিকটা গাঢ় বিন্যাস, মটর-কড়াইশুঁটি জন্মিয়াছে সেখানে। পথের একেবারে নিচেই খাল, শীতে তাহার দেহ সঙ্কীর্ণ, কোথাও কোথাও কচুরিপানার দুর্ভেদ্য স্তর নৌকার গতি একেবারে রোধ করিয়া আছে—তারপর বামে চাও, দক্ষিণে চাও—মাঠ মাঠ, সীমানাহীন মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। দক্ষিণে অনেক দূরে—প্রায় চক্রবাল-রেখার কাছে এক টুকরা গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ওই গ্রামের নাম পিপলাকাঠি। ওখান দিয়া নদী মস্ত একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। কিন্তু এতদূর হইতে নদীটা দেখা যায় না, শুধু মনে হয় সবুজ মাঠের ভিতর দিয়া গোটাকয়েক ছোট-বড় সাদা পাল বকের মতো ভাসিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু অন্যমনস্কের মতো চলিতে চলিতে শুক্লা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।

নির্জন পৃথিবী, প্রশান্ত পরিমণ্ডল। তাহার মাঝখানে কোথা হইতে স্পষ্ট গানের সুর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। যে গাহিতেছিল সে সুগায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার গানের অর্থ—

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া শুক্লা চাহিল। খানিক-দূর সম্মুখেই খাল হইতে ছোট একটি নালার মতো বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই নালাটির একপাশে কয়েক ঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বসতি। নালার উপরে একটি ছোট কাঠের সাঁকো, তাহারি উপর দাঁড়াইয়া জনতিনেক ছোকরা জটলা করিতেছে। তাহাদেরই একজন আড়চোখে শুক্লার সর্বাঙ্গে নোংরা ক্ষুধিত দৃষ্টি বুলাইতেছে এবং সেই সঙ্গে গান জুড়িয়া দিয়াছে।

বিরক্তিতে, ক্রোধে এবং লজ্জায় শুক্লার মুখ কালো হইয়া উঠিল। মোটা কোলা ব্যাঙের মতো ছোকরার চেহারা, কুতকুতে চোখ দুইটা তাহার লোভে চকচক করিতেছে। আর সে গান! এতটুকু শালীনতাবোধ থাকিলেও এমন অশ্লীল কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। আর এ গানের লক্ষ্যবস্তুও যে কে সেটা অনুমান করিতেও তাহার দেরি হইল না।

রাগে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া পায়ের জুতাজোড়া খুলিয়া গায়ক ছোকরাকে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া দেয়। হতভাগারা তাহাকে কী ঠাওরাইয়াছে! কিন্তু সাহস হইল না। চারিদিকে আর জনমানুষ নাই, গ্রাম হইতে আধ মাইল পথ সে পার হইয়া আসিয়াছে। এখানে ইহারা যদি তাহাকে অপমান করিয়াই বসে, তাহা হইলে একা সে ইহাদের সঙ্গে কী করিতে পারিবে!

শুক্লা কথা কহিল না, সোজা ফিরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। অপমানে তাহার চক্ষু দিয়া জল আসিবার উপক্রম করিতেছে। আচ্ছা, দেখিয়া লইবে। কাকাকে খবরটা একবার দিলেই শায়েস্তা হইয়া যাইবে সব। তাহাকে চেনে নাই এখনও।

কিন্তু শুক্লাও তাহাদের চেনে নাই। তাহারা যথাক্রমে টোনা, রসময় এবং শশিকান্ত।

বড় বড় পা ফেলিয়া শুক্লা চলিয়া গেল। বাঁশবনের আড়ালে আড়ালে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শাড়ির আঁচল দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ ইহারা নির্নিমেষ চোখে চাহিয়াই রহিল।

টোনা বিভোর হইয়া গিয়াছিল। অর্ধ-নিমীলিতভাবে সে ততক্ষণ গাহিয়াই চলিয়াছে—

যৌবনেরি গাঙে আমার ঢেউ লেগেছে সই,
নাগর বিনে প্রাণ বাঁচে না, কেমন করে রই লো!
কেমন করে রই!

রসময় কহিল, থাম থাম। কিন্তু ও মেয়েটা কে বল্ তো রে? আগে তো দেখি নি।

টোনা চোখের একটা ভঙ্গি করিয়া কহিল: কে জানে! কিন্তু খাসা মেয়ে রে!

শশিকান্ত এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, তোরা একেবারে ষাঁড় হয়ে গেছিস। মানুষ তো চিনিস নে, ও কি কাণ্ডটা করলি বল তো—

দুইজনেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। টোনা কহিল: কে ও?

—বড় বাড়ির মেয়ে, বুঝলি! কলকাতায় থাকে, তিনটে পাস দিয়ে চারটে পাসের পড়া করছে।

কলিকাতায় থাকুক বা চারিটা ছাড়াইয়া দশটা পাসের পড়াই পড়ুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সত্যি সত্যিই বড় বাড়ির মেয়ে নাকি? সর্বনাশ! কাজটা তো তাহা হইলে অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রসময় চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল: বলিস কি রে!

টোনা সভয়ে বলিল: পথে বসিয়েছে একেবারে। ওটা যে বড় বাড়ির মেয়ে, একথা আগে বলতে তোর কী হয়েছিল? রঙচঙে কাপড় আর চাল-চলন দেখে ভাবলুম বা উলটো চণ্ডীর মেলায়—

রসময় কহিল: থাক, কী ভেবেছিস তা আর বলে দরকার নেই। শশেই বা তখন চুপ করে রইলি কেন? এখন যদি এ খবর রাসু সেনের কানে যায়, তা হলে—

টোনা শুকনো গলায় বলিল: যা ডাকসাইটে লোক, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে, আর নয়তো চালা কেটে ঘর তুলে দেবে।

না, শশিকান্ত বলে নাই, ইচ্ছা করিয়াই বলে নাই। রাসমোহন সেন কবে যে টোনার

চালা কাটিয়া তুলিয়া দিবে, অথবা মারিয়া হাড় গুঁড়া করিয়া ফেলিবে, সে একান্ত আগ্রহে সেই শুভ দিনটির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছে। আস্পর্ধাখানা দেখ একবার! একেই তো সমস্ত বৈরাগী পাড়াটা চাখিয়া বেড়াইতেছে, ইহার পর আবার ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে নজর! আর সে-ও যে-সে ভদ্রলোক নয়, স্বয়ং রাসু সেন—জোয়ান বয়সে যে লোক লাগাইয়া আড়িয়ল খাঁয় ডাকাতি করাইত। খবরটা একবার তাহার কানে পৌঁছিলে সে কী না করিতে পারে! হয়তো দুনলা বন্দুকটা বাহির করিয়া দুমদুম শব্দে গোটা দুই বুলেট ঝাড়িয়া দিবে। আর ব্যাস্, সেই সঙ্গেই টোনার ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করিয়া চেঁচানো কিংবা লোকের আদাড়ে-পাদাড়ে মেয়ে শিকার করিয়া বেড়ানো চিরদিনের জন্যই বন্ধ হইয়া যাইবে।

ঠাট্টা করিয়া কহিল: আছিস পাঁচী আর ফুটকিকে নিয়ে—তাদের নিয়েই থাক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার শখ কেন বাপু?

এদিকে শুক্লা সেই যে বড় বড় পা ফেলিয়া চলিয়াছিল, পুরা আধ মাইল পথ ডিঙাইয়া তাহার গতি শান্ত হইয়া আসিল। ততক্ষণে অজস্র মাঠের বাতাস এবং পৃথিবীর বুকের উপর তন্দ্রার মতো প্রসারিত স্নিগ্ধ শান্তি তাহার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে; এপাশে সবুজ অবণ্যের মধ্যে পাখি ডাকিতেছে—বাতাসে শিরশির করিয়া পাতা কাঁপিতেছে, আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। শুক্লার মানসিক প্রবণতা অনেকখানি সংযত হইয়া আসিয়াছিল। নাঃ, ছিঃ, এসব কথা কাকার কাছে সে বলিবে কী করিয়া? নিজের সম্মান যদি সে নিজেই না রাখিতে পারে, তবে সেজন্য যাহা কিছু অগৌরব তাহারই। তা ছাড়া কাকিমা যে কী ভাবে সদুপদেশ বর্ষণ করিবেন এবং আড়ালে আড়ালে নীলি যে কী ভাবে মুখ টিপিয়া হাসিবে, সে কথা তো এখনই বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারিতেছে।

যাক, তাহার চাইতে ব্যাপারটা একেবারে চাপিয়া যাওয়াই ভালো। ভবিষ্যতে ওদিকে আর বেড়াইতে না গেলেই চলিবে। আর ওরাও যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিতেছিল, এ কথাই বা সে মনে করে কী করিয়া? এমনও তো হইতে পারে যে, ব্যাপারটা নিছক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু মনের দিক হইতে সান্ত্বনা মিলিতেছে না।

—নমস্কার!

চকিত হইয়া শুক্লা চোখ তুলিয়া চাহিল এবং যাহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল সে তপন। গ্রামে এই একটি মাত্র ব্যক্তি—এতদিনে যাহার সঙ্গে শুক্লার অন্তরঙ্গতা ঘটিতে পারিয়াছিল। তপন তাহাদের প্রতিবেশী, দূর-সম্পর্কের কি রকম জ্ঞাতিও বটে। সেই সূত্রেই বড় বাড়িতে তাহার যাতায়াত ছিল এবং শুক্লার সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হইয়াছিল।

তপন কবি। পরিহাস করিয়া বলা নয়—সত্যি সত্যিই তাহার মধ্যে যে একটা নিজস্ব কবিপ্রাণ আছে, সেটা যখন-তখন প্রকাশিত হইয়া পড়িত। নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন নয়, শিশুর মতো সরল, অসম্ভব খেয়ালী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা শ্রেণী অবধি উঠিয়া তাহার মনে হইল, ইহার চাইতে বেশী একটানা পড়াশুনা করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব পাঠ্য বইগুলি দু হাতে বিতরণ করিয়া দিয়া সে আর্টস্কুলে গিয়া ভর্তি হইল। কিন্তু সেখানে গিয়াও তাহার মনে হইল, প্রতিভা অপেক্ষা অনুকরণের আদর এখানে বেশি। 'দুত্তোর' বলিয়া সে তুলিটাকে রাস্তায় নিক্ষেপ করিল, রঙের বাটিগুলি উবুড় করিয়া ফেলিল, ক্যান্‌ভাস্‌টাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিল এবং ইজেলটাকে আছড়াইয়া শেষ করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া কহিল, অনেক দিন ধরে কুঁদেকুঁদে ছবি আঁকবার চেষ্টা করে সমস্ত শরীরটাই প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছিল। এই ফাঁকে একটু ব্যায়াম করে নেওয়া গেল।

তার পর হইল নিরুদ্দেশ। আত্মীয়-স্বজনেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহার খোঁজ পাইলেন, তখন দেখা গেল বোম্বাইয়ের এক কাপড়ের কলে শ্রমিকের মিটিং জমাইয়া সে তাহাদের ধর্মঘট করিবার উপদেশ দিতেছে। সেখান হইতে তাহাকে বাড়িতে ধরিয়া আনা হইল। দেশোদ্ধারের স্পৃহা তপনের ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছিল, সকলে বলিলেন: দিন কয়েক পড়াশোনা করে 'ল'টা দিয়ে দে।

তপন চোখ পাকাইয়া কহিল: 'ল'। 'ল' পড়ব কি? Every law is unlawful! তা নয়—I must be a builder of the future society. নোয়াখালির একটা ইস্কুলে হেডমাস্টারি পেয়েছি, সেইখানেই চললুম।

সকলে সবিস্ময়ে কহিলেন: হেডমাস্টারি! কেন, তোর কি ঘরে খাওয়ার অভাব আছে যে কোন্ সাতসমুদ্দুর পারে নোয়াখালিতে হেডমাস্টারি করতে যাবি?

—খাওয়ার অভাব! দুত্তোর! তপনের মধ্যে বক্তা জাগিয়া উঠিল। উদ্দীপ্তভাবে বলিল: 'Tis not my profession but a sacred duty. I will make my every student a man with iron muscles and iron nerves, liberated from all conventions—from all social prejudices—

আত্মীয়-স্বজনেরা অত কড়া কড়া ইংরেজী বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন: যা ভালো বোঝ কর বাপু। বয়স তো আর কম হয় নি, এ বয়সেও যদি এরকম ছেলেমানষি কর, তা হলে আমরা আর কী বলব।

তপন কহিল: বটে! বুড়ো হয়ে গেছি? তারপর শান্তিনিকেতনের সুরে গান ধরিল:

"আমাদের পাকবে না চুল গো, মোদের
পাকবে না চুল।

আমাদের ঝরবে না ফুল গো, মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না তো কোন শেষে
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে—"

আত্মীয়-স্বজনেরা চাহিয়াই রহিলেন। তপন টেবিল বাজাইয়া গান শেষ করিল :

"আমাদের ঘুচবে না ভুল গো, মোদের
ঘুচবে না ভুল।"

সুতরাং ইহার পরে আর কথা চলে না। তাঁহারা সংক্ষেপে কহিলেন পাগল এবং তপনের সংশোধনের আশা ছাড়িয়া বিদায় লইলেন।

তপন নোয়াখালি গেল এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াই গেল। কিন্তু ফিরিতে তাহার দশটি দিনের বেশি দেরি হইল না। অঙ্কের ক্লাসে সমস্ত ছাত্রদের একত্র করিয়া যখন সে 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' কোরাসে শিখাইতেছিল, তখন সেক্রেটারি সেখানে আসিয়া জুটিলেন।

সেক্রেটারি লোকটি রায়সাহেব। প্রথম জীবনে মোক্তারি করিয়া বিলক্ষণ পয়সা রোজগার করিতেন, সম্প্রতি কয়েকটা স্বদেশী মামলায় গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিয়া রায়সাহেব উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধিটির মর্যাদা যাহাতে কোনরকমে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁহার কড়া নজর।

আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : ছেলেদের ও কী গান শেখাচ্ছেন মাস্টার মশাই ?

তপন বিশুদ্ধ আভিধানিক ভাষায় জবাব দিল : এটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত।

রায়সাহেব সভয়ে বলিলেন : না মশাই, এখানে ওসব চলবে না। তা ছাড়া অঙ্কের ক্লাসে আপনি গান শেখাচ্ছেন, এই বা কি রকম কথা!

তপন উত্তর দিল : আমার কাজ আমি জানি। সে বিষয়ে আপনি উপদেশ না দিলেই আমি বাধিত হব।

কথায় কথা বাড়িল। মাত্রা যখন একটু বেশি পর্দায় চড়িয়াছে, তখন তপন সেক্রেটারির দাড়ি ধরিয়া তাঁহার দুই গালে বেশ করিয়া চড়াইয়া দিল। ব্যস্, চাকরি তো গেলই, ফেণীর আদালত হইতে ক্রিমিন্যাল অ্যাসল্টের জন্য কুড়ি টাকা ফাইন দিয়া সে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু তপনের চরিত্রের এটা একটা দিক হইলেও এইটাই সব নয়। ইহার মধ্যেই তাহার কবিপ্রাণ নিঃশব্দ ধারায় ফল্গুর মতো বহিয়া যাইত। সে কবিতা লিখিত—কিন্তু সে রচনাকে বাহিরের আলোয় মুক্তি দিবার প্রলোভনে নয়। গ্রামের লোক তাহাকে চিরকাল

খেয়ালী ক্ষ্যাপা বলিয়াই জানিত, বাহিরের জগতে যেমন কেউ কখনো কোনো কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করে নাই, তেমনি সে নিজেও কখনো যাচিয়া দশজনের সঙ্গে মিশিতে যায় নাই। তাহার জগৎকে সে নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করিয়া লইয়াছিল। ভাবপ্রবণ, তীক্ষ্ণ, তীব্র—সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক আত্মবিস্মৃত, কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত আত্ম-সচেতন।

শুক্লা তাহার পরিচয় পাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গেই এই খেয়ালী কবিমানুষটিকে চিনিয়া নিতে তাহার দেরি হয় নাই। এমন হিসাবী এবং বে-হিসাবী, এমন আসক্ত ও অনাসক্ত সে আর জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তাই নিজের অজ্ঞাতেই তাহার তপনকে ভালো লাগিতে শুরু হইয়াছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে তপনকে হঠাৎ নমস্কার করিতে দেখিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। কহিল: ব্যাপার কি, হঠাৎ এমন ঘটা করে নমস্কার করছ যে?

তপন কহিল: এমনি, হঠাৎ অনুপ্রেরণা পেলুম। যে-রকম ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখ করে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছিলে, তাতে নাম ধরে ডাকলে শুনতে পাবে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় ছিল। তাই ভাবলুম, অভিবাদন জানিয়ে দেখা যাক দেবী প্রসন্না হন কিনা।

—বাংলা নাটকের ভাষা হুবহু মুখস্থ করেছ দেখছি!

তপন অট্টহাসি করিয়া উঠিল। বলিল: মুখস্থ না করে কী করি! তোমরা মেয়েরা বাইরে যত বেশি রিয়্যালিস্টই হও না কেন, মনের দিক থেকে সেই নাটকের যুগেই চির-কালটা রয়ে গেলে।

শুক্লা প্রতিবাদ করিয়া বলিল: ইস, কক্ষনো না! ও কথাটা জোর করে তোমরাই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ।

—তোমরা নিজেরাও কোনোদিন এর প্রতিবাদ করতে পারো নি।

—সেও তোমাদের জন্যেই। আমাদের অবস্থা হয়েছে কী জানো? তোমরা আমাদের যে ভাবে ভাবতে শিখিয়েছ, সেই ভাবেই আমরা এতদিন ভেবে আসছি। তোমাদের চিন্তা চুরি করেই আমরা অরিজিন্যাল, কিন্তু সে অরিজিন্যালিটি যে মেয়েদের পক্ষে কত বড় অগৌরব আর কতখানি মিথ্যা তা বোঝবার সময় আমাদের আজো আসে নি। তোমরা টায়র্যাণ্ট, তোমরা অত্যাচারী, ঘরে-বাইরে আমাদের অপমান করে বেড়াও।

শুক্লার চোখে জল ছলছল করিয়া আসিল।

তপন হতবুদ্ধি হইয়া গেল: কী ছেলেমানুষ, এতেই কেঁদে ফেললে নাকি? ব্যাপারটা কী বল তো? আজ তুমি নিশ্চয়ই 'মুডে' নেই।

গানের কথাটা শুক্লার মনের মধ্যে তখন তীক্ষ্ণ হইয়া বাড়িতেছে, আসলে সেই অপমানটাই তখন অন্তরের প্রত্যন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেটা তৎক্ষণাৎ যে মনে পড়িয়াই গেল তাহা নয়,—বাহির হইবার জন্য একেবারে ঠোঁট অবধি আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু সে সামলাইয়া নিল, প্রকাশ করাটা তাহার নিজের কাছেই বিসদৃশ এবং অসম্মানজনক বোধ হইল।

শুক্লা চট করিয়া চোখটা মুছিয়া ফেলিল : না, ও কিছু না। চোখে কী একটা পড়েছিল বোধ হয়।

তপন মাথা নাড়িয়া কহিল : মিথ্যে বললে।

—বললে বললুম। সব কিছুর জন্যেই তুমি কৈফিয়ত দাবি করবে নাকি?

তপন হাসিয়া বলিল : না, অতখানি কর্তৃত্ব ফলাবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু আজ এত সকাল সকালই ফিরে চলেছ যে?

—এমনিই। মাঠের দিকটা ভালো লাগল না। তার চাইতে এসো এখানে—বসে খানিক গল্প করা যাক। চমৎকার কিন্তু এই কাঠের পুলটা, না! দেখেছ, নিচ দিয়ে কী রকম জল বয়ে যাচ্ছে!

দুইজনে পুলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিল। এটা চলাচলের পথ বটে, কিন্তু সাধারণত এ পথে মানুষজনের খুব বেশি আনাগোনা নাই। দুই দিকে বাগান, কাছাকাছি অনেকটার মধ্যে কোনও গৃহস্থের বসতি নাই। পৃথিবীর উপর দিয়া বিকালের ছায়া, সেই ছায়া এখানে বাগানের আড়ালে আড়ালে আরো ঘন হইয়া আসিয়াছে।

নিচে খালের জল একটানা বহিয়া চলিয়াছে—জোয়ার আসিয়াছে এখন। হেমন্তের জোয়ার, তীব্র নয়—কিন্তু তবুও খালের মন্থর নির্জীবতায় খানিকটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে। তরতর করিয়া সাদা ঘোলাটে জল চলিয়াছে। পুলের লোহার খুঁটির গায়ে ঘা লাগিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণি ঘুরিতেছে। স্রোতে কচুরির স্তর ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদের মাথার উপর বেগুনি ফুলের গুচ্ছ বাতাসে তিরতির করিয়া কাঁপিতেছে।

পকেট হইতে একটা সিগারেট কেস বাহির করিয়া তপন বলিল—মে আই! খেতে পারি তো?

অন্যমনস্ক অভ্যাসবশে শুক্লা কহিল : ইয়েস! তাহার দৃষ্টি তখন জলের দিকে নিবদ্ধ। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে দেখিতেছিল, জলে তাহার ছায়া পড়িয়া বিকালের ম্লান রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে কেমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

পা দুইটিকে দোলাইতে দোলাইতে শুক্লা বলিল : আচ্ছা, এখন যদি আমি টপ করে জলের মধ্যে পড়ে যাই, তা হলে কী হয়?

অত্যন্ত অনাসক্তভাবে তপন বলিল : কী আবার হবে!

—সাঁতার জানি নে, ঠিক ডুবে মরব। এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বুদ্বুদের মতো মুছে যাবে আমার চিহ্ন—আমাকে নিয়ে যদি কোনও বিরোধ থাকে, কোনো সমস্যা থাকে—

তপন বাধা দিয়া কহিল,—তাদের কোনোটারই সমাধান হবে না।

শুক্লা ভ্রূ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

—যেহেতু এখান থেকে পড়ে গেলে তোমার চিহ্ন মোটেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে না। ওপর থেকে যা ঠাওরাচ্ছ, ব্যাপার আসলে তা নয়। জল এখানে খুব বেশি তো এক বুক। লাভের মধ্যে খানিকটা নাকানি-চোবানি খাবে, আর এই শীতের সন্ধ্যায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি যাবে। তা ছাড়া আমি আছি, পৌরুষের খাতিরেও টেনেহিঁচড়ে তুলতে হবে।

শুক্লা হাসিয়া উঠিল: ও হরি, তাই নাকি! আমি ভাবছিলুম, না-জানি কত জল! আচ্ছা, জল না হয় বেশি না-ই থাকল, হঠাৎ হার্টফেল করে বসতে পারি তো! তখন তুমি টেনে তুললেও তো কোনো লাভ হবে না।

তপন একটানে সিগারেটটাকে বারো-আনি নিঃশেষ করিয়া কহিল, ও রকম হঠাৎ তা হলে পৃথিবীতে অনেক ঘটতে পারে। এক্ষুনি আকাশে একটা হিঙ্কেল এরোপ্লেন এসে বোমা ফেলে এই সাঁকোটা উড়িয়ে দিতে পারে, বিসুবিয়াসের ইরাপশানে ইতালি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ডিনামাইট বিস্ফোরণে জার্মেনির সব বিমানের কারখানাগুলো নিশ্চিহ্ন হতে পারে; সুতরাং ওসব কল্পনা এখন থাকুক, তার চাইতে তুমি যদি একটা গান গাও—

—গান, এখানে? বরং তুমি একটা আবৃত্তি করো, শোনা যাক।

—কী আবৃত্তি করব?

—যা খুশি। রবীন্দ্রনাথ, শেলী, ব্রাউনিং, ব্রিজেস্, হুইট্‌ম্যান, শিশির ভাদুড়ী, মায় নজরুল—

তপন সিগারেটটা দূরে ফেলিয়া দিল, জলের মধ্যে হিস্‌স্ শব্দ করিয়া সেটা নিবিয়া গেল। কহিল, তুমি তো গড়গড় করে দিশি-বিলিতি একরাশ নাম মুখস্থ বলে গেলে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের কবিতা আবৃত্তি করায় আমার আলাদা মুড আছে, তা জানো? আমি বর্ষার দিনে পড়ি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোৎস্নারাত্তিরে শেলী, ঝড়ের সময় ব্রাউনিং, ঘুমোবার আগে ব্রিজেস, কবিতা লিখবার আগে হুইট্‌ম্যান, আর সাবান মাখতে মাখতে তারস্বরে আবৃত্তি করি শিশির ভাদুড়ী। বাকি রইলেন নজরুল, সভয়ে স্বীকার করি, তাঁর কাব্য পড়বার মতো দম বা গলার জোর আমার নেই। এখানেই তোমার তালিকা শেষ হল—কাজেই এঁদের একজনের কবিতাও আপাতত তোমাকে শোনানো চলে না।

—আচ্ছা, শীতের বিকেলে কী কবিতা পড়ো?

তপন উৎসাহিত হইয়া কহিল, ডি. এইচ. লরেন্স। শুনবে? আবৃত্তি করব 'বিব্‌ল্‌স্' কবিতাটা?

—বিব্‌ল্‌স্! সেই কুকুরের কাহিনী তো? রক্ষা করো, তার চাইতে তোমার নিজের একটা কবিতা—

তপন গম্ভীর হইয়া বলিল, সে আমি আবৃত্তি করি রাত বারোটার পর, প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় সেই জন্যে।

শুক্লা বলিল, তা হোক। এখানে এমন কোনো ভদ্রলোক কাছাকাছি নেই যে, তোমার আবৃত্তিতে শান্তিভঙ্গ হতে পারে। এক আমি আছি, তা ভয় নেই, এজন্যে আমি তোমার নামে পুলিস কেস আনব না।

তপন একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, হ্যাঁ, এখানে লোকজন নেই, বিকল্প সম্ভব। কিন্তু গদ্য-কবিতা বরদাস্ত করতে পারবে তো? ছন্দ-মিলের বালাই আমি ছেড়ে দিয়েছি আজকাল।

শুক্লা খুশী হইয়া বলিল, বেশ, বেশ, এখন থেকে আমিও লেখার চেষ্টা করতে পারব। কলেজ ম্যাগাজিনে বার দুত্তিন দিয়েছিলুম, ছন্দ জুতসই নয় বলে ছাপে নি। আপদ যখন গেছে, তখন এর পর থেকে আবার নতুন উৎসাহে শুরু করা যাবে। জানো, কাব্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দ-বর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' বইতে কী বলেছেন?

তপন হাত জোড় করিয়া বলিল, ক্ষমা করো, তোমার মতো আমি সংস্কৃতে এম. এ. দিতে যাচ্ছি না। আমার ধারণা, যারা বেশি অলঙ্কার বোঝে, তারা এতটুকুও কাব্য বোঝে না।

শুক্লার বুদ্ধি-দীপ্ত চোখ দুইটি মননশীলতায় দীপ্ততর হইয়া উঠিল। খানিকটা আত্মগত ভাবে সে বলিল, তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক। জানো এক জায়গায় 'প্রকাশ'-কার মম্মটভট্ট লিখেছেন—

তপন বলিল, আবার সংস্কৃত! আমাকে তাড়িয়ে ছাড়বে নাকি?

—তা হলে থাক থাক। বরং তোমার কবিতাই আবৃত্তি করো।

—অতি আধুনিক প্যাটার্নের?

—নিশ্চয়। গোটাকয়েক কবিতা আমি নানা কাগজে পড়েছিলুম, কিন্তু মানে বুঝতে পারি নি। দেখা যাক, আবৃত্তি শুনে কোনো অর্থবোধ করা যায় কিনা।

তপন আবৃত্তি শুরু করিল:

মিশরের স্তিমিত অন্ধ-রহস্য পার হয়ে
কথা কও তুমি হে স্ফীংক্স্।
অনেক তামাটে আকাশের গন্ধ-ভরা পিছল রাত্রে
যে কারার্ভা চলে গেল মরু-বালুকা ডিঙিয়ে,—
ডিঙিয়ে কামরান আর কামস্কাট্কা
হনোলুলু আর তিব্বতের গর্ভবতী তুষারপ্রান্তর,

সেই সব ধূসর প্যাচার উষর প্রেম
ঘুমিয়ে রয়েছে লক্ষ বৎসরের 'মমি'র মধ্যে ,
আমাদের মনীষার জ্যোতিঃরেখা
কখনো কি পড়বে সেই সব প্যালিয়োলিথিকদের গায়ে,
কখনো কি জেগে উঠবে সেই সব মৃত অজগর,—
হাজারো, হাজারো শতাব্দী আগে
যারা ঘুমিয়ে রয়েছে সিন্ধু-শকুনের ডিম খেয়ে
আত্মবিস্মৃত নার্শিসাসের মতো ?

—বুঝতে পারলে তো ?

শুক্লা হাসিয়া কহিল, সাধ্য কী ! সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল আর মিথলজি পুরোপুরি জানা দরকার—এত পাণ্ডিত্য কজনের থাকে ! তা ছাড়া অর্থসঙ্গতি—

—দরকার নেই, অবচেতনার ব্যাপার কিনা ; কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল যে ! চলো, ওঠা যাক এবারে।

দুইজনে উঠিয়া পড়িল। গ্রামের পথে পথে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। আজ তৃতীয়া—চাঁদ উঠিবে একটু দেরিতে। তাই গ্রামের উপর দিয়া ছায়ার মতো অন্ধকার বিকার্ণ হইয়া যাইতেছে। গৃহস্থের গোসাঁইঘরে, তুলসীতলায় এখন একটি একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে. শীতের সায়াহ্নে বাঁশবন আর বন-জঙ্গলের মধ্য হইতে অনেকখানি ধোঁয়ার কুয়াশা আকাশে আসিয়া জমিতেছে। ম্লানায়মান দিনের আলোয় কর-মজুমদারের শ্মশানখোলায় চিতার উপর সাজানো পুরানো মঠগুলিকে অস্বাভাবিক বিষণ্ণ ও করুণ দেখাইতেছে। যেন মৃত্যুর নিঃশব্দ গম্ভীর মূর্তি রূপ ধরিয়াছে ওদের মধ্যে। বেশ হিম পড়িতেছে এখনি, ইহারই মধ্যে মাথার চুলগুলি ভিজিয়া আসিবার উপক্রম করিয়াছে শুক্লার।

তপন ধীরে সুস্থে আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

শুক্লা অনুসন্ধিৎসুভাবে তপনের মুখের দিকে চাহিল, বলিল, আচ্ছা, তুমি কী মানুষ তপনদা ! দেশসুদ্ধ লোক যখন সিগারেট ছাড়ছে, তখন তুমি বোধ হয় দৈনিক একটিন করে সিগারেট পোড়াও !

তপন নির্লিপ্তভাবে বলিল, তা পোড়াই।

—কেন পোড়াও ?

—মনের বিলিতীয়ানাটাকে পোড়াতে পারি নি বলে। মনের ভেতরটায় যেখানে আন্তরিকতার জায়গা নেই, সেখানে শুধু দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে বিড়ির ধোঁয়ায় পাইপ্-সিস্ টেনে আনাটাকে আমি ভণ্ডামি বলেই মনে করি।

শুক্লা উত্তেজিত হইয়া কহিল, তুমি বলতে চাও সবাই ভণ্ড ?

তপন মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

শুক্লা কহিল, এটা কিন্তু আমার কথার জবাব হল না।

—আরো জবাব চাও?

—চাই বই কি। তুমি খেয়ালমতো সমস্ত দেশটার সম্বন্ধে যা নয় তাই মন্তব্য করবে, আর সেজন্যে কোন কৈফিয়ত দেবে না? প্রত্যেক কথারই একটা দায়িত্ব আছে জেনো।

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, জানি। কিন্তু তুমি যে সত্যি সত্যি দারুণ সিরিয়াস হয়ে উঠলে।

—উঠব না? দেশ তো শুধু তোমার নয়, সকলেরই।

তপনের মুখে এক ধরনের বিচিত্র বিকৃত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি অন্ধকারে শুক্লা দেখিতে পাইল না, দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইত। কিন্তু তবুও ইহারই মধ্যে সে লক্ষ্য করিল, একটা ইঙ্গিতময় স্তব্ধতা যেন তপনের সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

—কী, কথা কইছ না যে?

তপন কথা কহিল। শুধু যে কথা কহিল তাই নয়—যেন দাঁতের মধ্য হইতে চিবাইয়া সে হিংস্র নিষ্ঠুরভাবে কথাটা শেষ করিল: বলছিলে দেশটা আমার নয়! কিন্তু আমার দুঃখও সেইখানেই। আজ যদি আমি এই দেশের ডিক্টেটার হতুম, তা হলে কী করতুম জানো? এ দেশের সমস্ত শিক্ষা, সংস্কার, আর সভ্যতার বনিয়াদটাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতুম, আগুন লাগিয়ে দিতুম! I would turn a second Nero!

শুক্লা অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল, তপন স্বাভাবিকতা হারাইয়া ফেলিতেছে। অতএব সমস্ত পরিবেষ্টনীটাকেই আবার সহজ করিয়া আনিবার জন্য সে পরিহাস-তরল লঘুস্বরে বলিল: সব পুড়ত, আর তুমি ছাতের উপর বসে বাঁশি বাজাতে, না!

কিন্তু তপন সহজ হইতে পারিল না।

কহিল: না, বাঁশি নয়, ড্রাম বাজাতুম, ব্যাটলড্রাম। তুমি তার বাজনা শোন নি শুক্লা। সে এক অদ্ভুত উন্মাদ বাদ্য, তার তালে তালে মানুষের বুকের রক্ত থই থই করে নাচতে শুরু করে; তার আহ্বানে একজন অসঙ্কোচে আর একজনের হৃৎপিণ্ডে বেয়নেট বিঁধে দেবার জন্য এগিয়ে যায়; তার শব্দে আকাশে এরোপ্লেন ডানা মেলে দেয়, বোমার মুখে ছারখার করে দেয় নগর, গ্রাম; বিষাক্ত গ্যাসে কচি ছেলেকে মায়ের বুকের মধ্যে দম আটকে হত্যা করে, ফসলের ক্ষেত জ্বলে ছাই হয়ে যায়। আর অসহায় মানুষ আর্তচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ভগবানকে অভিশাপ দেয়।

যে লঘু পরিহাস এবং কাব্য আলোচনার মধ্য দিয়া বিকালের সমস্ত পরিমণ্ডলটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন কিসের একটা নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে শতখান হইয়া গিয়াছে। তপন হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল: এই যে এসে পড়েছি।

আশা করি, তোমাকে আর এগিয়ে দিতে হবে না, আচ্ছা চললাম—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে পিছন ফিরিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

শুক্লা দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া পরম বিস্ময়ের সহিত তাহার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটি অবধি কহিতে পারিল না।

অরণ্য

ইস্কুলের সেক্রেটারি রাসমোহন সেন। তাঁহার বাড়িতে আশ্রয় জুটিল প্রফুল্লের। গ্রামের ইস্কুলে সাধারণত এইটাই নিয়ম যে, বিদেশ হইতে যে সমস্ত মাস্টার এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বাড়িতেই থাকিবার জায়গা পান, বেশির ভাগই ছাত্র পড়াইবার বিনিময়ে ; আর যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহাদের অনেক সময় এরকম দাসখত না লিখিয়া দিলেও চলে।

প্রফুল্লও সেই ভাগ্যবানদের দলে পড়িয়াছিল। রাসমোহন সেন গ্রামের নামকরা গৃহস্থ, এরকম বিনিময় প্রথা তাঁর সম্মানের পক্ষে গৌরবের নয়। আর তা ছাড়াও বাড়িতে এমন একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে নাই, যাহার জন্য প্রফুল্লকে আশ্রয় দিবার কোনো অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকিতে পারে। মেয়ের মধ্যে তো ওই এক নীলিমা, কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে মনের দিক হইতে সে কোনদিনই প্রবল একটা অনুরাগ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। যতদিন দায়ে পড়িয়া পড়িতে হইয়াছে ততদিন পড়িয়াছে, লজেন্স মুখে পুরিয়া দুলিতে দুলিতে "গজঃ গজৌ গজাঃ" আর "সোলজার্স ড্রীম" মুখস্থ করিয়াছে ; এবং যেই একটু সুবিধা পাইয়াছে, সরস্বতীকে কুলুঙ্গিতে চাবিবদ্ধ করিয়া পরম আশ্বস্তি সহকারে নিশ্বাস ফেলিয়াছে। রাসমোহন ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলেন নাই। গ্রামের সমাজ—মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর কয়দিন পরেই বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যা যা হইয়াছে, ইহার উপর আর ময়ূরপাখা না চড়াইলেও চলিবে।

সুতরাং প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত আরামে হাত-পা মেলিয়া তাহার বসিবার ঘরটির দিকে চাহিয়া দেখিল। নিচের তলা হইলেও শুকনো খটখটে, কলিকাতার মতো মেজে হইতে ড্যাম্প উঠিবার ভয় নাই। বাহিরে চাহিলেই এখানে ইট-পাথরের দুর্গে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না। সুপারি বন ডিঙাইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া আকাশটাকে দেখিতে পাওয়া যায়—অজস্র, অপর্যাপ্ত, অন্তহীন। ঠিক জানালার পাশেই ঝুমকো জবার বড় একটা ঝাড় উঠিয়াছে, তাহার ডাল জানালা গলাইয়া সোজা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ডালটার মুখেই মস্ত একটা কুঁড়ি, কাল-পরশুর মধ্যেই ফুল ধরিবে সম্ভবত। প্রফুল্ল ডালটাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কতদিন

ধরিয়া এই ঘরটার মধ্যে যে সে এইভাবে নিজের অধিকার বাড়াইয়া দিয়াছে কে বলিবে, এত সহজেই তাহাকে অধিকারচ্যুত করা গেল না। ফুল না ধরা পর্যন্ত জানালাটা বন্ধ করা যাইবে না। দিন তিনেক একটু ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, তা একটা পর্দা টাঙাইয়া লইলেই চলিবে।

রাসমোহন আপ্যায়নের ত্রুটি করিলেন না।

—দেখুন তো, এ ঘরটাতে আপনার অসুবিধে হবে নাকি ? নিচের তলা—

প্রফুল্ল বাধা দিয়া সসঙ্কোচে কহিল : আজ্ঞে নিচের তলা বলে কী হয়েছে, তাতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

—ওপরেই ব্যবস্থা করতে পারতুম। আপনি তো এখন আমার ঘরের ছেলের মতোই। তবু ব্যাপারটা কী জানেন, নানারকম লোকজন আসবে যাবে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা রয়েছে, ঘরেরও অভাব—

প্রফুল্ল আরও অপ্রস্তুত হইয়া বলিল : আজ্ঞে না না, তাতে কিছু হয় নি। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

—যাক, অসুবিধে না হলেই হল। তা এ ঘরটাও বেশ বড়ই আছে, একটু হাত-পা মেলে চলাফেরা করতে পারবেন। দেওয়ালের গায়ে এই যে একটা কাচের আলমারি রয়েছে, দরকার হলে জিনিসপত্তর রাখতে পারবেন এখানে। এই টেবিলটাতেই বেশ কাজ চলে যাবে, কী বলেন ? এ চেয়ারটাতে বসবেন না, একটা পায়া ভাঙা, টক করে পড়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, আমি উপর থেকে আর একটা ভালো চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। চা খান তো ? বেশ বেশ, আমার বাড়িতে আবার ও পাটটা একটু বেশি। আমার এক ভাইঝি আবার বেড়াতে এসেছে কিনা, দিনের মধ্যে পাঁচবার চা না খেলে তার মাথা ঘুরে যায়। সংস্কৃতে এম এ পড়ছে, ওদের ধরনই আলাদা। তা হাতমুখ ধোয়া হয়েছে আপনার ? ওঃ, জল দেয় নি বুঝি এখনো ? আচ্ছা, দেখছি—

রাসু সেন তড়বড় করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রফুল্লের মনে হইল, লোকটি অনাবশ্যক রকমের ব্যস্ত মানুষ ; কথাও বলিতে পারেন কম নয়, একবার আরম্ভ করিলেন তো কোথায় গিয়া যে থামিবেন, তাহা অনুমান করা শক্ত। তবু কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ে দোষে-গুণে লোকটিকে প্রফুল্লের মন্দ লাগিল না।

খানিক পরেই চা আসিল। শুধু চা-ই নয়, আনুষঙ্গিক খাবারের ব্যবস্থাও বিলক্ষণ আছে। বিনয়ের মাত্রাটাকে রাসু সেন কোন্ পর্দায় যে তুলিয়া লইবেন, তাহা যেন ভাবিয়াই পান না।

—দেখুন এমন জায়গা, চা-ও এখানে ভালো পাওয়া যায় না। এটা অবিশ্যি খাঁটি দার্জিলিং টী, শুক্লা নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। তা ছাড়া আমার নিজের গোরুর দুধ,

কণ্ডেন্সড্ মিল্কের চাইতে ভালো হবে নিশ্চয়ই, কী বলেন ?

প্রফুল্ল সবিনয়ে বলিল : আজ্ঞে তা তো বটেই। গোরুর দুধের মতো কি আর জিনিস আছে।

ঠিক এই সময়ে সামনের দরজা ঠেলিয়া এক থালা খাবার লইয়া নীলিমা ঘরে ঢুকিল। পূর্ববঙ্গের মেয়ে, ব্যবহারের মধ্যে তাহার সঙ্কোচ খুব বেশি থাকিবার কথা নয়, তবু প্রফুল্লকে দেখিয়া বেশ খানিকটা দ্বিধাই যেন বোধ করিল সে। জড়িত পায়ে আগাইয়া আসিয়া সামনের টেবিলটার উপরে খাবারের থালাখানা নামাইয়া রাখিল।

প্রফুল্ল বিনয়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া বলিল, আহা-হা, এত সব আবার কেন ?

নীলিমা মৃদুস্বরে বলিল, খুব বেশি নয়। তারপর লজ্জাভীত দ্রুত গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। একেই তো পিতৃ-পিতামহের সংস্কারের ধারাটাকেই উত্তরাধিকারসূত্রে টানিয়া টানিয়া একটা বিশেষ পরিবারের বিশেষ গণ্ডিরেখার মধ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে—সেই জন্য বাহিরের অ-দৃষ্ট জগৎটার সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের আর অবধি নাই ; তাহার উপর নীলিমার চরিত্রের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ-মুক্ততা, হঠাৎ কেমন করিয়া যেন সেটা মস্ত একটা নাড়া খাইয়া বসিল। প্রফুল্লকে দেখিয়া হঠাৎ সে একটা বিজাতীয় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। কেন যে এমন হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না এবং পারিল না বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল না, কবাটের আড়ালে আড়ি পাতিয়া রহিল।

বাসু সেন কহিলেন : আপনি তো একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এখানকার ইস্কুলের ছেলেগুলো যা বাঁদর—সে আর বলবেন না। নিরীহ গো-ব্যাচারা মাস্টার পেলে তার একেবারে হাড়ির হাল করে ছাড়ে।

—তাই নাকি ?

—হাঁ, শুনুন না ব্যাপারটা। আমাদের হেড পণ্ডিত মশায়, বুঝলেন একেবারে মাটির মানুষ। অমন লোক প্রায় দেখা যায় না। তা কখনো-সখনো ক্লাসে মাঝে মাঝে ঝিমোন, বয়স-দোষে অমন এক-আধটু হয়েই থাকে। তাঁর কী করেছে জানেন ? টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে যেই একটু আরাম করতে গেছেন, অমনি পেছন থেকে কাঁচি দিয়ে—ব্যস, কচ !

—মানে টিকি কেটে নিয়েছে ?

—আবার কী !

প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল।

কী চমৎকার হাসিতে পারে সে ! নীলিমা মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রাণের সমস্তটুকু উজাড় করিয়াই সে হাসে, কোনোখানে এতটুকু ঢাকিয়া রাখে না। তা ছাড়া পণ্ডিত মশায়ের

দুর্গতির ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সে-ও খুশী হইয়াছিল। ভদ্রলোক দিনকয়েক বাড়িতে আসিয়া তাহাকে অঙ্ক শিখাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কাঠাকালি বিঘাকালির সে শক্ত শালকাঠ চিবাইতে গিয়া নীলিমার দাঁত নড়িত, চোখ দিয়া জল আসিত। উঃ, সে সব কী দুর্দিনই যে গিয়াছে!

রাসু সেন কহিলেন, হাসির কথাই বটে। আর ছেলেগুলোও এমন জোট পাকিয়েছে বুঝলেন, যে আসামীর খবর কিছুতেই বের করে দিলে না। শেষকালে ক্লাসসুদ্ধ সবগুলোর চার আনা করে ফাইন করলুম। কিন্তু এমন সব নচ্ছার ছেলে, ফাইন দিলে, তবু দোষীকে ধরে দিলে না।

প্রফুল্ল খুশী হইয়া বলিল: এ তো বেশ ভালো কথাই। ছেলেদের মধ্যে চমৎকার একটা একতা দানা বেঁধে উঠেছে। ভবিষ্যতে এদের দিয়ে—

বাধা দিয়ে রাসমোহন কহিলেন, আরে রাখুন মশাই একতা। এসব ছেলে কি সেই জাতের পেয়েছেন! এদের একতা শুধু বাঁদরামির বেলায়। দল বেঁধে কখন পরের বাগান লুঠ করবে, ফুটবল খেলবে, মারামারি করবে, এই হলো এদের একতার উদ্দেশ্য। কই একটা ভালো কাজের কথা বলুন তো, তখন যদি এদের কাছ থেকে এতটুকু উপকার পান, তা হলে আমার নাকটা কেটে নেবেন।

প্রফুল্ল নত মস্তকে চায়ের বাটিটায় চুমুক দিতে লাগিল।

রাসমোহন বলিয়া চলিলেন: তবে আমাকে খুব ভয় করে, বুঝলেন। কোনরকম অসুবিধে ঘটলেই আমাকে খবর দেবেন, আমি সব শায়েস্তা করে আনব।

—আজ্ঞে।

রাসু সেন উঠিলেন, আচ্ছা, তা হলে আমাকে ওদিকপানে যেতে হচ্ছে একবার। কাছারিতে লোকজন এসেছে কিনা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন, কাল থেকে কাজে জয়েন করবেন।

—বিশ্রাম করবার কী আছে? আমি আজ থেকেই জয়েন করতে পারি।

—আরে না না, এসেই অমনি—সে কী হয়? এক দিনে আর কী ক্ষতি হবে? তা ছাড়া আমি সেক্রেটারি, আমি আপনাকে বলছি—আপনি স্বচ্ছন্দে আজকের দিনটা বিশ্রাম করুন। কোনো ব্যাটা একটি কথা বলুক তো! আমি রাসু সেন, নিজে নড়ব, তবু আমার হুকুম নড়বে না।

প্রফুল্ল নিরুত্তরে মাথা নাড়িল।

রাসু সেন আবার বলিলেন: তা হলে আমি উঠি এখন। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি ওদিককার, কষ্ট হবে না। আপনিও একটু জিরিয়ে নিন, রান্না হয়ে এলো বলে।

কিন্তু উঠি বলিলেই ওঠা তাঁহার স্বভাব নয়। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, নীলি, নীলি!

নীলি খুব দূরে ছিল না, ডাকিতেই আসিয়া পড়িল।

—বাড়ির ভেতর গিয়ে ঠাকুরকে তাড়া দে, রান্নাটা যেন চট করে সেরে ফেলে। মাস্টার মশাই কাল রাত্তির থেকে উপোস দিয়ে আছেন, তাঁর কষ্ট হচ্ছে—

প্রফুল্ল প্রতিবাদ করিয়া বলিল : আজ্ঞে না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

রাসু সেন সে কথায় কর্ণপাতই করিলেন না।

—আর মাখন সরকারকে বল, দীঘি থেকে বড় একটা মাছ ধরতে—দেরি হয় না যেন।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

প্রফুল্ল সঙ্কুচিত হইয়া বলিল : কেন আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন! ক্ষিধেও খুব বেশি—

—খুব বেশি না হোক, লেগেছে তো। আরে মশাই, যতক্ষণ পর্যন্ত উপায় আছে, ততক্ষণ যেচে শরীরকে কষ্ট দেন কেন? বলে শরীরমাদ্যং—হুঁ! আর দেখতেই পাচ্ছেন, ইস্কুলের সেক্রেটারি যখন হয়েছি, তখন কত বড় একটা কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে চেপে রয়েছে! কর্তব্যে যাতে এতটুকু ত্রুটি না হয়, সেটাও তো দেখতে হবে।

—তা বই কি।

রাসু সেন খুশী হইয়া কহিলেন : এই এক জ্বালা হয়েছে, বুঝলেন! ধরে-বেঁধে এরা তো সেক্রেটারি করে খাড়া করলে, কিন্তু এখন ঝুঁকি সামলাতে সামলাতে প্রাণ যায়।

বলিলেন বটে প্রাণ যায়, কিন্তু তাঁহার এই পদ-মর্যাদাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার চোখে-মুখে যে গর্বের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল কৌতুক অনুভব করিল। রাসু সেন কোনও মুহূর্তেই নিজে সেকথা ভুলিতে পারেন না এবং পরিচিত কাহাকেও ভুলিতে দেন না। তিনি সেক্রেটারি, সমস্ত ইস্কুলটাই তো তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। সেটা কি সহজ কথা হইল নাকি!

প্রফুল্লের সব রকম আরাম-বিরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মহামান্য সেক্রেটারি বাহির হইয়া গেলেন। কর্তব্যে যাহাতে একটু ত্রুটি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে তো।

তিনি চলিয়া গেলে প্রফুল্ল মৃদু হাসিল এবং তারপর একটা মোটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় গা এলাইয়া দিল। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তাহার ভাঙিয়া আসিতেছে।

হাতে একটা সাবান লইয়া এবং কাঁধে তোয়ালে ফেলিয়া শুক্লা তখন স্নানের জন্য পুকুরঘাটে চলিয়াছে। বিস্মিত হইয়া দেখিল, প্রফুল্লের দরজার ফাঁকে চোখ পাতিয়া চোরের মতো নীলিমা দাঁড়াইয়া আছে।

কী হা-ভাতে মেয়ে, মানুষজন কখনও কিছু দেখে নাই নাকি! যা দেখিবে, তাহারই

দিকে এমন হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবে যে গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়। রূঢ়ভাবে শুক্লা কী একটা বলিতেও গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল নীলিমার। এবং চোখাচোখি হইবামাত্রই আর কথা নাই, নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া নীলিমা অদৃশ্য হইয়া গেল। এত বড় ধিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে মেয়েটা, তবু এ পর্যন্ত ভদ্রভাবে চলিতে অবধি শিখিল না। অস্ফুট একটা বিরক্ত মন্তব্য করিয়া শুক্লা ঘাটের পথে আগাইয়া গেল।

* * *

দুপুরটা কাটিতে না কাটিতে একসঙ্গে অনেকে আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে ভিড় জমাইলেন। আসিল মুকুল, আসিল রবি। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসিলেন নরেশ কর, রাসু সেন স্বয়ং, আর আসিলেন অনাথ কবিরাজ।

আলোচনার ব্যাপারটা কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর হইয়া উঠিল এবং যথানিয়মে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নরেশ করের উদ্দীপ্ত গলা অন্য সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাড়াইয়া গেল।

—দেখুন, ইস্কুলটাকে ন্যাশনাল করে তুলুন, খাঁটি জাতীয় ইস্কুল। পাস করে ইংরেজের চাকরি পাওয়াটাই যে সব ছাত্রের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের দিয়ে দেশের কী হবে, বলুন? জানেন তো কবি লিখেছেন:

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী করে—"

রাসু সেন থামাইয়া দিয়া কহিলেন: আরে রাখো ভায়া, বক্তৃতে আর দিয়ো না। ন্যাশনাল ইস্কুল করতে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেটা একবারও ভেবে দেখেছ? মাসে দুশো টাকা করে এইড পাচ্ছ, অমনি ইন্‌সপেক্টর অফিস থেকে সেটা ঘ্যাচাং করে কেটে দেবে। তার পরেই ব্যাস—তিন মাসের মধ্যেই চোখ উলটে যাবে ইস্কুলের।

অনাথ কবিরাজের দাড়িওয়ালা মাথাটা নড়িতে লাগিল। বুজিয়া-যাওয়া চোখ দুইটা একটু খুলিয়া সে কহিল: ঠিক কথা!

প্রফুল্ল এতক্ষণে ভালো করিয়া অনাথ কবিরাজের দিকে চাহিয়া দেখিল। লোকটির বয়স ষাটের নিচে নয়। মাথায় বড় বড় চুলগুলি বেশির ভাগই সাদা হইয়া গিয়াছে। দাড়ি নামিয়াছে বুক পর্যন্ত। চোখের চামড়া কুঞ্চিত, সমস্ত মুখের উপর বুভুক্ষা-পীড়িত শীর্ণ একটা পাণ্ডুর ছায়া। আর্থিক অবস্থা যে তাঁহার আদৌ ভালো নয়, তাহার দিকে চাহিতেই সেটা বিলক্ষণ বোঝা গেল। গায়ে সাদা জিনের একটা কোট, কাঁধের উপর দিয়া সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, গলার কলার এবং হাতা হইতে সুতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মাঝখানে দুই-তিনটা বোতাম নাই। পরনের কাপড়খানা ময়লা, ছিন্ন তালিমারা কেডস্ জোড়াকে খুলিয়া রাখিয়া তিনি এত সঙ্কুচিত দীনভাবে বিছানার একপাশে ঘেঁষিয়া জড়সড় ভাবে বসিয়া আছেন যে, তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত সহজেই করুণার উদ্রেক হয়।

নরেশ কর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন : কি মশাই, এইড কেটে দেবে ! কেটে দেওয়া চারটিখানি কথা আর কি ! এই যে গবর্নমেণ্ট চুষে নিংড়ে আমাদের কাছ থেকে এতগুলো টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের কি কিছুই দেবে না !

রাসু সেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সে বিচার তুমি তাদের সঙ্গেই কোরো ভায়া। কিন্তু ইস্কুলের সেক্রেটারি হয়ে আমি ওসব ব্যাপারের প্রশ্রয় দিতে পারব না।

তারপরেই তর্ক মাত্রা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। বক্তা দুইজনেই সমান, কেহ কথায় কাহারো কাছে হার মানিবেন, এমন তাঁহাদের স্বভাবই নয়। প্রফুল্ল নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, অনাবশ্যক এবং অহেতুক তর্কে ইঁহারা কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারেন। যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি ইঁহাদের যে পর্যায়েরই হোক, এ সময়ে সে উদ্দাম উত্তেজনা দেখিলে কে বলিবে যে রাজনীতি, ধর্মনীতির ব্যাপারে মাথা গলাইলে ইঁহারা অনায়াসেই প্রচণ্ড এক-একজন নেতা হইয়া উঠিতে পারিতেন না !

রবি বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া ইঁহাদের কথাগুলি গিলিতেছিল, মধ্যে মধ্যে টুকরো টুকরো মন্তব্য পেশ করিতেছিল এখানে ওখানে। কিন্তু মুকুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এ বক্তৃতা না থামাইলে তো চলে না।

কহিল, কাকা, নতুন হেডমাস্টার যে এসেছেন, এ কথা প্রেসিডেণ্টকে জানানো হয়েছে তো ?

রাসু সেন চকিত হইয়া কহিলেন : হাঁ, তাকে তো সকালেই খবর দিয়েছি।

—আপনি নিজে গিয়েছিলেন ?

—না, রাজেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি।

—বলেন কি ! এ তো আপনার নিজের যাওয়া উচিত ছিল। জানেনই তো, এসব সেক্রেটারির কর্তব্য। তা ছাড়া প্রেসিডেণ্ট নিজেই ইস্কুল দেখতে আসবেন, কিংবা হেডমাস্টার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন—

—ঠিক, ঠিক বলেছ তো। রাসু সেনের তর্কস্পৃহা মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া গেল। সেক্রেটারির কর্তব্য কথাটা তাঁহার রক্ত-মাংসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া আছে, সংস্কারের গোড়ায় ঘা লাগিলে বিশ্ব-সংসার মুহূর্তে তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়।

রাসু সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চটি জোড়াকে টানিয়া লইয়া কহিলেন : তাই তো, এখনি একবারটি যেতে হচ্ছে। ভুল হয়ে যায় ভায়া, বয়েস হয়েছে কি না ! তোমাদের মতো যখন ছিলুম, তখন কোনো কাজে একটু কি ত্রুটি হওয়ার জো ছিল ! পানের থেকে চুনটি অবধি খসতে পেত না। আচ্ছা, তোমরা বসে আলাপ-আলোচনা কর, আমি ঘুরে আসি একটু।

আপত্তি করিলেন নরেশ কর।

—যাবেন মানে ? এ কথাটার একটা মীমাংসা না হওয়া ইস্তক তো আপনাকে ছাড়তে পারি না। পলিটিক্সের এত বড একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথাই যদি তুললেন, তা হলে শেষ পর্যন্ত তার একটা রফা হওয়া চাই তো। এসব ব্যাপার সোজা নয় সেন মশাই,—সমস্ত ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম এর উপরেই নির্ভর করছে।

রাসমোহন ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, তুমি বড্ড বাজে বকতে পারো নরেশ। দেখছ ইস্কুলের ব্যাপার, আমি সেক্রেটারি—এখন কাজের সময় ওসব মীমাংসা-টিমাংসা চলবে না। তোমাদের ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাক, আমি—

—ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাক মানে ? গর্জন বলিলে যাহা বুঝায়, নরেশ কর তাহাই করিলেন। প্রফুল্লের দিকে জলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, শুনলেন মশাই, কথাটা একবার শুনলেন ? ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাবে ! এত বড কথাটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অবধি বলতে পারেন না, তা—

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ করিবার আগেই রাসু সেন বাহির হইয়া গেলেন।

নরেশ কর উঠিয়া পডিলেন, বাঃ, সেন মশাই সত্যি-সত্যিই চললেন যে !

বাহির হইতে উত্তর আসিল, সত্যি সত্যিই চললাম।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, কথাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক—নরেশ কর উত্তেজিত হইয়া প্রায় ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল : বাঁচালেন মুকুলবাবু। নইলে এ তর্ক যে আরও কতক্ষণ চলত ঠিক নেই।

মুকুল প্রসন্ন মুখে কহিল : এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বুঝি ! কিন্তু সেক্রেটারির কর্তব্য কথাটা শিখে রাখুন, ওটা ব্রহ্মাস্ত্র। জায়গা-মতো ব্যবহার করতে পারলে ব্যর্থ হবে না, এ আশ্বাস আপনাকে দিলাম।

প্রফুল্ল কহিল : তাই তো দেখছি।

তারপর আলোচনা শুরু হইল। ইস্কুলের উন্নতি ও কল্যাণের গণ্ডিরেখা ছাড়াইয়া সে আলোচনা সমস্ত দেশময় প্রসারিত হইয়া পড়িল। মানুষের বিরাট সভা-প্রাঙ্গণে মানুষের মতো করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার যে কল্পনায় ইহাদের যৌবনোন্মুখ চিত্ত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, তাহারই আলোচনায় ইহারা বিভোর হইয়া গেল।

আর নীলিমা—যেহেতু মুকুলদা, রবিদা এবং আরও অনেকে ঘরের মধ্যে ভিড় জমাইয়া আছে এবং এ সময়ে সঙ্গত-অসঙ্গত কোনো সুযোগ লইয়াই ওখানে যাওয়া চলে না, সুতরাং সে দরজার বাহিরে কান পাতিয়া রহিল। বাড়ির কেউ এভাবে তাহাকে দেখিলে কিছুই মনে করিবে না, কারণ এটা যে তাহার স্বভাবের একটা বিশেষ লক্ষণ, সে কথা সবাই জানে। তা ছাড়া কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, বাবার খোজে আসিয়াছিল।

ভয় তো একমাত্র সেজদিকেই। তা সে এখন চিঠি লিখিতে বসিয়াছে, দু-তিন ঘণ্টার আগে নিচে নামিবার সম্ভাবনা নাই। বাবাঃ, কী অসম্ভব চিঠি লিখিতেই পারে সেজদি! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সে যে এতো কী লেখে, নীলিমা সেটা ভাবিয়াই পায় না। মেয়েমানুষের অতো চিঠি লিখিবার কি-ই বা দরকার! ও রকম করিলে লোকে নিন্দা করে। এক তো স্বামীর কাছে চিঠি লেখার ব্যাপারটাই আসল, তা সেজদির তো বিয়েই হয় নাই। পাতার পর পাতা ভরিয়া এত লম্বা চিঠি তবে সে কার কাছে লেখে! যাই বলো বাপু, কলকাতার মেয়েদের ধরন-ধারণই যেন কেমন কেমন। ওই জন্যই তো শুক্লার সঙ্গে তার বনিতে চায় না।

শুক্লা যাহাই থাক, নীলিমার তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রফুল্ল কথা বলিতেছে, প্রফুল্ল হাসিতেছে। নীলিমার কী অসম্ভব যে ভালো লাগিতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। হাসি অনেকেরই শোনা যায় হয়তো, কিন্তু এমন নিঃসঙ্কোচ উন্মুক্ত হাসি সে আর কখনও শোনে নাই। এ হাসির মধ্য দিয়া সমস্ত অন্তর যেন বিনা দ্বিধায় সকলের চোখের সামনে একখানা পুঁথির মতো খুলিয়া যায়।

কথা বলে আস্তে আস্তে, রবিদার মতো ক্ষেপিয়া ওঠে না। চেঁচানোও তাহার স্বভাব নয়। কিন্তু যেভাবেই বলুক তাহার বলার ভঙ্গিতে এটাই বেশ বোঝা যায় যে সে ইহাদের কাহারও চাইতে ছোট তো নয়ই, বরং অনেক উপরে। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস আছে এবং সে বিশ্বাসের পরিচয় তাহার প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া ওঠে।

—বিচলিত হয়ে লাভ কী? যা করবার তা ধীরে-সুস্থেই করতে হবে। আপনারা তো আছেনই আর রইলাম আমি—দেখি—কতদূর এগোনো যায়!

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। মা'র তো কিছুর একটা ঠিক-ঠিকানা নাই—শেষ পর্যন্ত হয়তো বা গালাগালিই আরম্ভ করিয়া দিবেন। নীলিমা সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল।

ছেলেদের দলটি যখন বিদায় লইল, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়াই নামিয়াছে। এতক্ষণে প্রফুল্ল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সেই তখন হইতেই অনাথ কবিরাজ এখনও এক পাশে ঠায় বসিয়া আছেন। শুধু বসিয়াই থাকা নয়, এমন নীরবে, নিশ্চিন্ত শান্তিতে তিনি বসিয়া আছেন যে, এতক্ষণ তাঁহার অস্তিত্ব তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ডাকিল, কবিরাজমশাই!

কবিরাজমশাই সাড়া দিলেন না।

আর একবার ডাকিতেই কবিরাজ যেন চটকা ভাঙিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন: হাঁ, কী বলছিলে রাসুদা? আর সে তো নিশ্চয়ই, তুমি যা বলবে তার উপর—

প্রফুল্ল হাসিয়া ফেলিল: ও, আপনি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি! কিন্তু রাসুদা দু'ঘণ্টা

আগে উঠে গেছেন, আমি প্রফুল্ল।

অনাথ কবিরাজ চোখ রগড়াইয়া বলিলেন : তাই তো, বটেই তো। তারপর অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কহিলেন : বুড়ো বয়সে একটু আফিং ধরেছি কিনা, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রফুল্ল হাসিল।

—কতটা করে খান আফিং ?

—বেশি আর কী খাব, আগে মুসুরি-পরিমাণ ছিল, এখন মটর-পরিমাণ হয়েছে। তাও খরচ চালাতে পারি না। নেশা পোষা কি আমাদের মতো গরিবের কাজ! বুঝতেই পাবেন, সেই সঙ্গে পরিমাণ-মতো দুধ না হলে—

প্রফুল্ল মাথা নাড়িয়া বলিল, তা তো বটেই।

হঠাৎ অনাথ কবিরাজ প্রফুল্লের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেন। একটু আগেই চাকর ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে। প্রফুল্লের মনে হইল, সে আলোকে অনাথ কবিরাজের মুখখানা অদ্ভুত রকমের বুভুক্ষু দেখাইতেছে। জরা মানুষকে কী অশোভন রকমেই না বিকৃত করিয়া দেয়! সমস্ত মুখের উপর তাঁহার আঁকা-বাঁকা রেখা—যেন জীবনের বিষাক্ত সরীসৃপটার গতি-চিহ্নে তাঁহার পরাভূত মন অঙ্কিত হইয়া আছে। মুখ ভরিয়া তাঁহার বিশৃঙ্খল দাড়ি, বড় বড় পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ময়লা জামা হইতে কদর্য একটা ঘামের গন্ধ। প্রফুল্ল সরিয়া বসিল।

অনাথ কবিরাজ কহিলেন : মকরধ্বজ কিনবেন, মকরধ্বজ ? ষড়্‌গুণবলীজারিত খাঁটি মকরধ্বজ। ইচ্ছে হলেই আমার কাছ থেকে নিতে পারেন, খুব সস্তায় দেব। গাঁয়ে রসিক কবিরাজ আছে, বুঝলেন সে ব্যাটা কিছুই জানে না, তবু সব্বাই তাকে ডাকে, তার কাছ থেকে ওষুধ কেনে। কিন্তু সে যে মকরধ্বজের নাম করে একেবারে আসল রস-সিন্দুর চালিয়ে দিচ্ছে, সে খবর কেউ রাখে? আপনি নতুন লোক, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,—ওর কাছ থেকে ওষুধ কিনবেন না, কখনো না।

প্রফুল্ল হাসি চাপিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

—তা হলে এখন এক তোলা মকরধ্বজ দিই আপনাকে, দেব ? কথার সঙ্গে সঙ্গেই জিনের ছেঁড়া সাদা কোটটার পকেটে হাত দিয়া অনাথ কবিরাজ কাগজের একটা মোড়ক বাহির করিলেন : খেয়ে যদি উপকার না পান তা হলে আমার নামই নেই। আজ চল্লিশ বছর ধরে কবিরাজি করছি, হুঁ, তবু ওই রসিক কবিরাজ বলে যে আমার ওষুধ সব—

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল, আজ্ঞে না, নিশ্চয় খাঁটি। কিন্তু সত্যিই আপনি মকরধ্বজ বের করলেন নাকি ? আমার এখন মকরধ্বজের কোনো দরকার নেই তো!

—দরকার নেই ? অনাথ কবিরাজ ম্লান হইয়া আসিলেন, এখন দরকার না থাকলেই বা কি, যখন-তখন তো দরকার হতে পারে। এই মনে করুন, চট করে এক সময় মাথা ধরে

গেল—

—আমার কখনো মাথা ধরে না, ও রোগ আমার নেই।

অনাথ কবিরাজ বোকার মতো খানিকটা হাসিলেন ঃ হতে কতক্ষণ! রোগের কথা কে অত জোর করে বলতে পারে! নিয়েই রাখুন না, অসময়ে-অবেলায় কাজ দেবে।

—আজ্ঞে না, দরকার হলে আপনার কাছ থেকে অসময়ে-অবেলায় নিতে পারব। এখন নয়।

—আচ্ছা। অনাথ কবিরাজ মোড়কটাকে আবার কোটের পকেটেই গুঁজিয়া রাখিলেন। তাহারই মধ্যে প্রফুল্ল লক্ষ্য করিতে পারিল ঃ নীল-শিরা-বাহির-করা গাঁট-সর্বস্ব আঙুলগুলি তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, তাঁহার মুখ কিসের একটা ছায়ায় অদ্ভুত রকম ম্লান হইয়া গেছে। দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক, এমন বীভৎস করুণ মুখ প্রফুল্ল আর কখনো দেখে নাই; এই কারুণ্যের দিকে চাহিলে মন সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া আসে না, ঘৃণায় যেন শিহরিয়া উঠিতে চায়। রূপহীন শ্রীহীন এই দারিদ্র্য—অতি দরিদ্র এই দারিদ্র্য! মৃত্যুর যেমন বহু বিচিত্র রূপ আছে—মধুর এবং বিস্বাদ, বিশাল এবং সঙ্কীর্ণ, পরিচ্ছন্ন এবং পঙ্কিল,—জীবনের সমস্ত পর্যায়গুলিকেও তেমনি করিয়া একের পর এক ভাগ করিয়া লওয়া চলে। শিল্প যাহাদের মনে, সৌন্দর্য যাহাদের কল্পনায়—এই কুশ্রী কুৎসিত দীনতাকেও তাহারা সুন্দর করিয়া লইতে পারে। এই দারিদ্র্যই বৃহত্তর এবং মহত্তর হইয়া উঠিতে পারে তাহাদের জীবনে।

অনাথ কবিরাজের জরা-চিহ্নিত বুভুক্ষাজীর্ণ বীভৎস মুখের দিকে তাকাইয়া প্রফুল্ল আহত বোধ করিতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল—পশুর মতন মূঢ় ওই চোখের দৃষ্টি তাহাকে যেন পীড়ন করিতেছে, ওই রুক্ষ মুখখানা যেন প্রহার করিতেছে তাহাকে।

অনাথ কবিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থি-প্রকট হাত দুখানি তুলিয়া নমস্কার করিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, তা হলে আমি চললুম আজকে। অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করবেন না।

ঠুকঠুক করিয়া অনাথ কবিরাজ বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, প্রফুল্ল তাঁহাকে ডাকিল।

—শুনুন, শুনুন কবিরাজমশাই, মকরধ্বজটা ভালো হবে তো আপনার?

অনাথ কবিরাজ ফিরিলেন। প্রত্যাশায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—নেবেন নাকি? বেশ বেশ। কত দেব? এক তোলা?

প্রফুল্ল কহিল, তাই দিন।

অনাথ কবিরাজ পকেট হাতড়াইয়া ফের মোড়কটা বাহির করিলেন ঃ মেপে দেব?

—থাক, দরকার নেই। কত দাম?

—সকলের কাছে বারো আনা করেই বেচি। তবে আপনি নতুন লোক, আপনাকে

আট আনা—

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল : না না, নতুন লোক বলে কম নেবেন কেন ? আমি বারো আনাই দিচ্ছি।

একটা টাকা সে বাহির করিয়া দিল।

টাকাটা তুলিয়া দ্বিধাগ্রস্ত মুখে অনাথ কবিরাজ কহিলেন, কিন্তু এর ভাঙানি তো এখন—

—যখন হয় দেবেন। ওজন্যে তাড়া নেই।

—আচ্ছা—অনাথ কবিরাজ হাসিলেন। পরিতৃপ্ত, আনন্দিত হাসি। এক টুকরা হাড় পাইলে রাস্তার কুকুরের মুখে যদি কোনো রকমের হাসি ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে দেখা যাইত এ হাসি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

—কাল সকালেই আপনাকে পয়সা চার গণ্ডা দিয়ে যাব—ঠিক। তা হলে যাই এখন, রাত অনেক হয়েছে, কী বলেন ?

প্রফুল্ল বলিল : আসুন।

বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া অনাথ কবিরাজ হাতের লাঠিটা ঠুকঠুক করিয়া চলিতে লাগিলেন। বুড়ো মানুষ, বয়স অনেক হইয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরা করিতে গিয়া যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রফুল্লের একবার মনে হইল, বাহিরে গিয়া সে লণ্ঠনটা ধরিয়া অনেকখানি পথ আগাইয়া দেয় তাঁহাকে। পরক্ষণেই সে ভাবিল : এই জীবন, এই প্রাত্যহিকের সংঘাতই যাহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, এত সুখ তাহাদের সহিবে না।

কাল সকালেই কি অনাথ কবিরাজ টাকার চেঞ্জ দিতে আসিবেন ? আসিতেও পারেন। প্রফুল্লের কেমন যেন হাসি পাইতেছিল। সত্যি-সত্যিই সে শেষ পর্যন্ত সিনিক হইয়া উঠিল নাকি !

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, গ্রামের উপর মৃত্যু-পাণ্ডুর নীরব নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। শিববাড়িতে কান্ত নাগের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হইয়া গেল, বাজারের পথে শেষ লোকটিও চলাচল শেষ করিল। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে নিশীথের অঞ্চলছায়ায় গ্রামের আর একটা বিচিত্র রূপ, আর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন বিকশিত হইয়া উঠিল। সরকারদের দীঘির পার হইতে চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল, রায়দের বাগান আর গাঙ্গুলিদের ভিটায় খালের ধারে ধারে হোগলাবনের আড়ালে শেয়ালের ডাক শোনা যাইতে লাগিল।

কেন যে আজ ঘুম আসিতে চায় না—শুক্লা উঠিয়া বসিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের রাত্রিটা উঁকি মারিতেছে—যেন অন্ধকারের একটা উচ্ছল তরঙ্গ বাহির হইতে

বন্যার জলের মতো বহিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িল। একটুকরো চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা হইয়া সুপারিবনের প্রান্তরেখায় অস্তে নামিয়া চলিল।

জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল শুক্লা। অন্ধকারের রঙ ঠিক কালো নয়,—কুয়াশার খানিকটা সাদাটে রঙ সেই অন্ধকারের সাথে মিশিয়া সেটাকে অনেকখানি যেন হালকা করিয়া দিয়াছে। যেন খানিকটা ধোঁয়া এই তমসাবৃত পথঘাট, অরণ্যের উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু শুক্লা ভাবিতেছিল তপনের কথা। এই বিচিত্র সৃষ্টি-ছাড়া লোকটিকে তাহার ভালো লাগে। ব্যবহারিক জীবনের কোন প্রয়োজনেই যাহাকে পাশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, মনের জগতে যে নিজের কাছেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে—সেই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আত্ম-অচেতন লোকটি তাহার অন্তরে যে এত বড় একটা সাড়া তুলিয়াছে তাহার স্বরূপ শুক্লা যেন এই মুহূর্তেই অনুভব করিল।

আশ্চর্য, এই মুহূর্তেই সে অনুভব করিল! নাগরিক জীবনে সে অনেক পাইয়াছে, অনেক স্তুতি ও স্তাবক তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের চারিপাশে আসিয়া মৌমাছির মতো ভিড় করিয়াছে। কিন্তু শুক্লার মানসিক আভিজাত্য কোনো দিন তাহাকে তাহাদের দিকে তাকাইতে অবধি দেয় নাই। তাহার মন যে কোথাও কোনো দিন বাঁধা পড়িবে না, একথা সে জানিত, নিশ্চয় করিয়া জানিত; সে কাহারও কাছে আগাইয়া যাইবে না, যাহার আসিবার প্রয়োজন, আপনিই আসিবে—এমনি একটা ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল শুক্লার; কিন্তু তপন তাহাকে জয় করিল। তাহাই নয়—তপনের এই বিচিত্র নিরাসক্ত মনকে জাগাইয়া তুলিবার কাজও আজ হইতে তাহারই—আগাইয়া যাইতে হইবে তাহাকেই, তপনের মনকে অনুপ্রেরিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব তাহারই।

আর তা ছাড়া তপন, যে লোকটির মধ্যে স্তূপীকৃত অসঙ্গতিই এতো দিন তাহার চোখে পড়িয়া আসিয়াছে, সংস্কৃতির সুশৃঙ্খল পারিপাট্যকে যে অস্বীকার করিতেই অভ্যস্ত, তাহার নিজের অতি পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতিলোভী মন সেই অসঙ্গতিগুলিকেই কি না অত্যন্ত সহজ অবলীলায় শুধু গ্রহণ নয়, ভালবাসিয়া ফেলিল। নিজেকে শুক্লা যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারে না।…

শুক্লা সেতারটি নামাইয়া আনিল। মনকে এভাবে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

ওদিকে পাশের ঘরে নীলিমাও ঠিক তাহারই মতো করিয়া আর একজনের কথা ভাবিতেছিল।

প্রফুল্ল—প্রফুল্ল! কী করিতেছে সে এখন? হয়তো বাতি জ্বালাইয়া লেখাপড়া করিতেছে, নতুবা রাত্রি জাগিয়া দেশের কথা, বাড়ির কথা ভাবিতেছে। আচ্ছা প্রফুল্লের কি বিয়ে হইয়াছে? কথাটা ভাবিতে গিয়াও নীলিমার বুকে যেন ধ্বক্ করিয়া একটা ঘা

লাগিল। না, এমনটা হইতে পারে না। আচ্ছা, কালই কৌশল করিয়া কথাটা জিজ্ঞাস-করিতে হইবে বাবাকে।

কিন্তু আজ এ কী হইল নীলিমার! ঋতু-চক্রের আবর্তন-গতি অনুসরণ করিয়া ষোলটি বসন্ত আসিয়াছে পৃথিবীতে, আসিয়াছে অরণ্যে। নদীর নীলাভ নির্মল জলে কাহার চোখের স্বপ্নাঞ্জন ছড়াইয়া গিয়াছে, মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে বাসন্তী বনশ্রী, ভাঁটাফুলের কেশর পল্লীর পথে পথে ঝরিয়া পড়িয়াছে, আমের মুকুল মধু-সৌরভে বাতাসকে মদির করিয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্না-তরঙ্গিত সমস্ত রাত্রি ভরিয়া কোকিল ডাকিয়াছে, ছাদের আলিশায় এক জোড়া কপোত-কপোতী বিহ্বল কূজন করিয়াছে। এই যে ষোলটি বসন্ত আসিয়াছে গিয়াছে, আজ কতদিন পরে নীলিমা অনুভব করিল, আসিয়াই তাহারা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বৃথা যায় নাই। তাহারা তাহাদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে, গন্ধ রাখিয়া গিয়াছে এবং সেই স্মরণের গন্ধে নীলিমার তরুণ বুকের রক্ত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে।

ভয়ে, সন্দেহে, আনন্দে এবং উত্তেজনায় নীলিমার সমগ্র বুকটা দপদপ করিতে লাগিল, কপালের একটা রগ যেন লাফাইতেছে।—প্রফুল্ল, প্রফুল্ল! একটা বিচিত্র মদের নেশা যেন নীলিমাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। প্রেম, ভালোবাসার কথা সে কি শোনে নাই? নিশ্চয় শুনিয়াছে। সে কি তবে প্রফুল্লকে ভালোবাসিল?

নীলিমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—একথা ভাবিতে গেলেও উত্তেজনায় মাথার স্নায়ুগুলি অবধি ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। নীলিমার মনে হইল, তাহার কান্না পাইতেছে। অর্থহীন কারণহীন একটা কান্নার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠের কাছ অবধি আছড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এত রাত্রে কোথা হইতে মিষ্টি বাজনার স্বর আসিতেছে? সেজদি সেতার বাজাইতেছে নিশ্চয়, সত্যি সেজদির যত দোষই থাক, চমৎকার সেতার বাজাইতে পারে সে। শুনিলে ঘুম পায়, যেন চোখ বুজিয়া আসে। কিন্তু আজ নীলিমার কী যে হইল! নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রিতে নির্জন বড় বাড়িটাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া যে প্রশান্তির মায়া তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই অন্তস্তলে ওই সেতারের সুরটি এমন করুণ হইয়াই বাজিতেছে যে, ওই সুরে নীলিমার সমস্ত অন্তরটাই কেমন করিয়া উঠিল। সেতারের প্রতিটি মূর্ছনাই তাহার বুকের মধ্যে একটা পরম স্পর্শাতুর দুর্বল কেন্দ্রকে আঘাত করিতেছে, আর সেই আঘাতে কখন যেন নীলিমার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে।…

প্রফুল্ল ঘুমাইতেছিল। সমস্ত দিন ভালো করিয়া বিশ্রাম নিতে পারে নাই, আগের রাত্রি অসম্ভব পথশ্রমের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে, কী একটা চিঠি লিখিতে লিখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খোলা মশারিটা বাতাসে হু হু করিয়া উড়িতেছে; চিঠির কাগজ কোথায় যে

উড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। লণ্ঠনের আলোটা তাহার ক্লান্ত মুখের উপর প্রতিফলিত হইতেছিল।

আর জাগিতেছিল কবি তপন।

এই নির্জন রাত্রি, বাহিরে নক্ষত্রকিরণে অনুজ্জ্বল গ্রাম-পথ, কুয়াশামিশ্রিত অন্ধকার; সুপারির পাতা হইতে টুপটুপ করিয়া শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, দাড় আর লগির ঘায়ে খালের ঘুমন্ত জলকে জাগাইয়া বুনো ঘাস আর নলখাগড়ার বনে তন্দ্রাতুর গঙ্গাফড়িং আর ছোট ছোট প্রজাপতিগুলিকে সচেতন করিয়া বিদেশী নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, জলের কলরোল ডিঙাইয়া ঝপাং ঝপাং করিয়া একটা শব্দের ঐকতান সঙ্গীতের মতো তপনের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল।

তপন লিখিবে, লিখিবার প্রেরণা পাইতেছে। কী লিখিবে সে জানে না, কোনো নতুন ছন্দও মুক্তি পাইবার প্রলোভনে তাহার মনের মধ্যে গুনগুন করিতেছে না, তবু সে লিখিবে।

কাগজ টানিয়া সে লিখিয়া চলিল।

খসখস করিয়া কলম চলিতেছে, বাতাসে চুল উড়িতেছে তপনের, কিন্তু এতক্ষণ সময় নষ্ট করিয়া সে এ কী লিখিল। তাহার অবচেতন মনে এ কবিতা যে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তপন তাহার কোনও সন্ধানই তো পায় নাই:

হেমন্ত রাতে স্বপ্ন বুলায়ে নামিল তিমির মায়া
আমারো মনের অতল অন্ধকারে,
মৃত স্মরণের সমাধি ফুঁড়িয়া বাহিরিল প্রেতছায়া
কঙ্কাল দল হেসে ওঠে বারে বারে।
সহসা বাজিল মর্মরধ্বনি রিক্ত উদাস বনে
শুক্লা শশীর আভাস লাগিল দিগন্তে সুলগনে,
রজনীগন্ধা কোথায় জাগিল নিভৃত কুঞ্জতলে,
দীপ্ত প্রখর আলোকের তরবারে
আঁধার চিরিয়া হে রূপলক্ষ্মী সমুখে দাঁড়ালে আসি,
ধন্য করিলে প্রেমের কিরণধারে।
শুক্লা, তোমার শুক্ল রূপের স্পর্শ-পুলক লভি'
আমাতে ফুটিল পূর্ণিমা শতদল,
সিন্ধুমথিতা ইন্দিরা সম এলে চিরবল্লভা,
করুণা-কিরণে দুটি আঁখি ছল ছল—

—শুক্লা। বিচিত্র নাম! গানের মতো সুন্দর, ছন্দের মতো লীলায়িত। এই নামটির সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ জড়াইয়া আছে, এই নামটিই যেন মূর্তিমান কবিতা!

অর্ধসমাপ্ত রচনাটির উপর দিয়া সে কেবল এলোমেলোভাবে লিখিয়াই চলিল: শুক্লা, শুক্লা, শুক্লা, শুক্লা!

মুকুল ঘুমায় নাই, এমন অনেক রাত্রি সে ঘুমায় না। রাত জাগিয়া সে বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করে, নিজের মনে মনেই স্বপ্ন দেখে, ভাবিতে ভালোবাসে। সাধারণের সঙ্গে সঙ্গে, সহজ মানুষদের পাশে পাশে পা মিলাইয়া চলিতে চলিতে অসাধারণ কবে তাহাকে ডাক পাঠাইয়াছে। জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত গতিপথে গতানুগতিক একটা চিরন্তন পরিণতির যে স্বপ্ন সে দেখিতেছিল, কেমন করিয়া কিসের আকস্মিক সংঘাতে সে স্বপ্ন, সে কল্পনা তাহার কাচের মতো ঝনঝন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, রক্তে রক্তে আগুন ধরিয়া গেল মুকুলের!

অন্ধকার আর অসীম আকাশ—ইহারই মধ্য দিয়া মুকুলের সমস্ত দৃষ্টি যেন সমস্ত দেশ, মহাদেশ, জাতি, মহাজাতির অন্তরের চিরন্তন সত্যটিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু দারিদ্র্য—শুধু হীনতা, শুধু ক্ষুদ্রতা! তিল তিল করিয়া জীবন ক্ষয় হইতেছে, চলিতে চলিতে প্রতি পায়ে শৃঙ্খল ঠনঠন করিয়া গণদেবতাকে বিদ্রূপ করিতেছে, শাসনের নির্মম, শোষণে বিশ্ব-মানবের রক্ত দিনের পর দিন কণায় কণায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

মানুষ গড়ে, মানুষ রক্ষা করে, প্রতিদিনের যাত্রাপথটিকে নিত্য-নব প্রগতির চক্র-রেখায় চিহ্নিত করিয়া যায়। আবার সেই মানুষ ভাঙিতে চায়, বিপ্লব আনে, স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা এবং বিশ্বগ্রাসী লোভের বর্বর বিকারে মানবতার অগ্রগামিতার পথ শত শতাব্দী ধরিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।

এ অসঙ্গতি কেন থাকিবে, এই অত্যাচারের সিংহাসন যুগ-যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কেন থাকিবে অটুট এবং অনড়? যে মানুষ নিজের মধ্যে সুন্দরের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করিয়াছে, প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে শিল্প-কলা-সৌন্দর্যের পরমতম সার্থক সত্তাকে, সে কেন আবার কুশ্রীতার জয়গান গাহিবে! মুখের উপরে প্রতারণার মুখোশ টানিয়া তাহার নিজের গড়া নীতিকেই কেন ভাঙিয়া-চুরিয়া খানখান করিয়া দিবে?

মানুষ মানুষের অপমান করে, মানুষকে পায়ের নিচে দাবাইয়া রাখে—দেশের সীমা আঁকিয়া, শ্রেণীর ব্যবধান রাখিয়া। কিন্তু এই যে রাশীকৃত কৃত্রিম ব্যবধান সে নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, সে কি নিজেই তাহা অনুভব করে না? এই অপমান কি একখানা কালিমাখা অশুচি হাত ছোঁয়াইয়া তাহাকে অপবিত্র করিয়া দেয় না? স্বহস্তে এই যে পঙ্ক-তিলক ললাটে সে আঁকিয়া লইল, এ অগৌরব আর কতদিন সে বহন করিবে!

—না, বেশিদিন নয়। মুকুল অস্থিরের মতো পায়চারি করিতে লাগিল। এ অসঙ্গতি

থাকিতে পারে না। ইহাকে সে ভাঙিবে, চূর্ণ করিবে, নতুন জগৎ, নতুন পৃথিবীকে জাগাইয়া তুলিবে। মুকুল বিপ্লবের অগ্রদূত, ঘর তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। সে তো সাধারণের মতো আজ আর গড্ডলিকাস্রোতে অনিবার্য ধ্বংসপরিণতির পথে ভাসিয়া যাইবে না, ইহার মধ্যে সে অসাধারণ হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বে, তাহার শক্তিতে এই স্রোতের গতি ফিরাইবে। যাহারা অনিবার্যভাবে মরিতে চলিয়াছে, তাহাদের সে মৃত্যুকে নব-জীবনের সঞ্জীবনী দিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে ; পৃথিবী জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীকে সে নব-যুগের সভাপ্রাঙ্গণে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে। সে কেন পারিবে না ? পৃথিবীর মানচিত্রে এই যে প্রত্যহ নতুন করিয়া রঙ পড়িতেছে, এই যে দিনের পর দিন পৃথিবীর রূপ বিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, এই রূপান্তর আনিতেছে কাহারা ? তাহারা তাহারই মতো, একটুও স্বতন্ত্র, একটুও বিভিন্ন নয়। মুকুল নিজের মনেই আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীকৃত জড়ের জঞ্জাল,
এই মৃত আবর্জনা—"

অনাগত যুগের কল্পনায় মুকুলের স্বপ্নালু নয়ন তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি ব্যক্তি তখন এই নিশীথ রাত্রে একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল।

সে নন্তু। সুরেন মজুমদার কাল তাহাকে শাসাইয়াছেন, সে নাকি তাঁহার খেজুর রস চুরি করিয়াছে। গালাগালি তো করিয়াছেনই, সেই সঙ্গে আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, সে যদি ভবিষ্যতে আর কখনও এমন দুঃসাহস করে, তাহা হইলে তিনি মারিয়া তাহার ঠ্যাং ভাঙিয়া দিবেন। তিনি নাকি এসব বাঁদরকে ভালো করিয়াই শায়েস্তা করিতে জানেন। পঁচিশ বছর ডেপুটিগিরি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কাছে চালাকি চলিবে না—হুঁ হুঁ !

কিন্তু সুরেন মজুমদার তো আর বারো মাস গ্রামে থাকেন না, তাই নন্তুকে চেনেন নাই। তাঁহার জ্ঞানচক্ষুটা একবার ভালো করিয়া ফুটাইয়া দিতে হইবে।

আপাতত সেই সদুদ্দেশ্য লইয়াই নন্তু সদলবলে সুরেন মজুমদারের বাগানে আসিয়া ঢুকিয়াছে। এক হাঁড়ি রসও যদি রাখিয়া যায়, তাহা হইলে কালই সে তাহার নাম বদলাইয়া ফেলিবে। ওঃ, ডেপুটি ! ওরকম অনেক ডেপুটিকে সে মাঠ হইতে ঘাস খাওয়াইয়া আনিতে পারে।...

রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া মুন্সী সাহেব উঠিয়া বসিল।

এই শীতের রাত্রেও তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, বুক ধড়ফড় করিতেছে। কী বিশ্রী স্বপ্ন, অতীতের সেই বিস্মৃত ইতিহাস ! মুন্সী সাহেব কোনদিন কি তাহা ভুলিতে পারিবে না ! তাহার চিন্তার অবচেতনায় সে স্বপ্ন একটা চিরন্তন বেদনা, একটা অসহ্য দুরারোগ্য মর্মপীড়ার মতোই জাগিয়া আছে যে !

দশ বৎসর! কতো দীর্ঘ সময়—কালের পাণ্ডুলিপিতে কত এলোমেলো লেখা! সেই এলোমেলোর ভিড় পার হইয়া এতদিনের জমিয়া থাকা এতো ভালোমন্দ, বাধা-বন্ধের সীমানা অতিক্রম করিয়া মন অতি অনায়াসেই চক্ষের পলকে দশ বৎসর আগে ফিরিয়া যায়। মনে হয়, সে অতীত নয়, সে সুদূর নয়, মাত্র কয়েক দিন—কয়েক দণ্ড—কয়েক মুহূর্ত পূর্বেকার ইতিহাস।

বাহিরে অন্ধকারে আড়িয়ল খাঁ নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে জল আসিয়া কলকল করিয়া বাজিতেছে, নারিকেল গাছগুলি মর্মরিত হইতেছে। জোয়ারে উছলাইয়া-ওঠা জল একেবারে সাহেবপুর হাটের তলা পর্যন্ত আসিয়াছে, বালির চড়াটা ডুবিয়া গিয়াছে।···

···নিশীথ রাত্রি—ডকে কাজ চলিতেছে, এত রাত্রেও কারখানা হইতে লোহার ট্রলি যাতায়াত করিতেছে। হঠাৎ বয়লারে আগুন লাগিল!

লোহার কঠিন কারাগারের মধ্যে যে দৈত্যটা বন্দী হইয়া নিরুদ্ধ আক্রোশ অন্তরে অন্তরে বহন করিয়া মানুষের সেবা করিয়া আসিতেছে, সেই দৈত্যটা কেমন করিয়া যেন হঠাৎ মুক্তি পাইয়া বসিয়াছে। তাহার এতদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রলয়ের মূর্তি ধরিয়া আগুনের লেলিহ জিহ্বায় গর্জিয়া উঠিল। করোগেট টিন শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, লোহার বল্টুগুলি জ্বলন্ত শেলের মতো ছিটকিয়া পড়িতেছে। আগুনের রক্ত-দীপ্তিতে কালো আকাশ ভয়ে শীর্ণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।···

দেখিতে দেখিতে কুলি কোয়ার্টার্সে সে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কলরবে এবং উত্তাপে যখন মুন্সী সাহেব জাগিয়া উঠিল, তখন দরজা-জানালায় হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। পাশের ঘরে আছে স্ত্রী রাহেলা এবং তাহার সদ্যোজাত শিশুসন্তান।

পাশের ঘর বলিতে তখন জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ড। আর তাহারই মধ্য হইতে পোড়া মাংসের তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। মুন্সী সাহেবের সমস্ত চেতনার উপর দিয়া ভূমিকম্প নাচিয়া গেল। পাগলের মতো আগুনের দিকে সে ছুটিয়া গেল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, রাহেলা!

কিন্তু কোথায় রাহেলা? ঝনঝন করিয়া গায়ের উপর একরাশ লোহা-লক্কড় নামিয়া আসিল—চেতনা হইল ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, হাসপাতালে। কারখানা এবং কুলি-কোয়ার্টার্সের আগুন ততক্ষণে হয়তো নিবিয়াছে, কিন্তু মুন্সী সাহেবের অন্তরের আগুন সেই হইতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিয়া চলিয়াছে—মৃত্যু পর্যন্তই তা নিবিবে না।

মুন্সী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিল, রাহেলা! নির্জন আড়িয়ল খাঁর উপর দিয়া সে চীৎকার শূন্য দিগন্তে হা হা করিয়া বহিয়া গেল।···

আর জাগিতেছিল টোনা—আমাদের বৈরাগী পাড়ার শ্রীকৃষ্ণ।

দিনকাল এখন বদলাইয়া গিয়াছে, বাঁশি বাজাইলেই গোপিনীরা আর কুল-শীল-মান ত্যাগ করিয়া কুরঙ্গিণীর মতো বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া আসে না। বরঞ্চ তাহাদের পিতা-পতিরা যে লগুড় লইয়া তাড়াইয়া আসে, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। টোনা অনেকবার মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, দুই-চার ঘা মধ্যে মধ্যে পিঠে না পড়িয়াছে তাও নয়।

তা এসব ব্যাপারে প্রহারের ভয় করিলে চলে না। নিষিদ্ধ প্রেমের মাদকতা যে কী পরিমাণে উগ্র এবং হৃদয়গ্রাহী, বৈষ্ণব মহাজনবৃন্দ রসাইয়া রসাইয়া এবং ইনাইয়া বিনাইয়া সে কথা বহুবার বলিয়া গিয়াছেন। কীর্তনের চর্চা করিবার অবসরেও সে সব বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান অর্জন করিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়াছে।

মধু মণ্ডল কাল জেলায় গিয়াছে, ঘরে তাহার মেয়ে আছে পাঁচী। টোনা আস্তে আস্তে শিকারী বিড়ালের মতো গুঁড়ি মারিয়া ঘরের পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা একটা উঁচু টিপির মতো, চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল থাকিলেও বেশ পরিষ্কার।

টোনা আস্তে একটা শিস দিল। দুইবার—তিনবার। তৃতীয়বার শিসের সঙ্গে সঙ্গেই খুট করিয়া দরজা খুলিয়া গেল ঘরের এবং নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে পনেরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। কালো হইলেও সে সুশ্রী। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, না হইলে দেখা যাইত, নিষেধের ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ, ভীত তাহার চোখের দৃষ্টি। আশঙ্কায় তাহার বুক দুরদুর করিতেছে। মধু মণ্ডল একটিবার টের পাইলে তাহাকে কাটিয়া খালের জলে ভাসাইয়া দিবে। তবে মাকে তাহার ভয় নাই। ও বাড়ির কীর্তিকাকা যে সুবিধা পাইলেই মায়ের কাছে যাতায়াত করে সে কথা সেও বাবাকে বলিয়া দিতে পারে। সেই জন্যই মা টের পাইলেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস পাইবে না।

পাঁচী বাহির হইয়া আসিতেই টোনা তাহাকে খপ করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। কহিল : এসেছিস? আমি ভাবলুম বুঝি ঘুমিয়েই পড়লি।

না, ঘুমাইয়া সে পড়ে নাই। ঘুমাইয়া পড়িবেই বা কী করিয়া! টোনা তাহার রক্তে রক্তে যে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে তাহাতে ঘুমানো কি অতোই সহজ? সে যে কত অধৈর্য হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে-কথা সে ছাড়া আর কে জানে!

তবু পাঁচী মুখ একটু সরাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, তুমি বুঝি আজও মদ খেয়ে এসেছ?

—বেশি নয় অল্প। তুই যদি রাগ করিস, আর খাব না।

ঝোপ-জঙ্গল-ঘেরা নির্জন ভিটা আর অন্ধকার। শুকনো পাতার নিবিড় আস্তরণ পড়িয়া যেন ওদের বাসর রচনা করিয়াছে। কালো আকাশ ঘন হইয়া ওদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে।…

মধু মণ্ডলের বাড়ির উপর দিয়া রাধু চৌকিদার হাঁক পাড়িয়া গেল। পাঁচী আরো নিবিড় করিয়া টোনাকে জড়াইয়া রাখিল, রাধু চৌকিদার টের না পায়।

আকাশে নক্ষত্র-চক্র ঘুরিয়া চলিল।

ইহা একটি দিনের ইতিহাস :

তারপর এই ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়া দিনের পর দিন বহিয়া চলিল। প্রথমে যেগুলি বিচিত্র মনে হইয়াছিল, দৈনন্দিনের চলচ্ছন্দে তাহারা অতি সহজ, অতি সাধারণে রূপান্তরিত হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়ের অঙ্কটা যেই শেষ হইল, তাহার পরেই সেই পরিচিত নাটক। পাত্র-পাত্রীরা সকলেই এক—কোনো বৈচিত্র্য নাই, কোনো বৈলক্ষণ্য নাই। কাল তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল।

কিন্তু কাল তাহার পুনরাবৃত্তি না হয় করুক, এই কালের চাকাটাকেই উলটা-মুখে ঘুরাইয়া দিয়া নতুনত্বের প্লাবন আনিবার কল্পনা যাহারা করে, চিরন্তনকে যাহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যমুখী করিতে চায়, তাহারা এই পুনরাবর্তের দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজী হইল না।

এবং রাজী হইল না বলিয়াই এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোড়ন জাগিল। প্রফুল্ল আসিল বিপ্লবের অগ্রদূত হইয়া ; তাহার পাশে দাঁড়াইল মুকুল, রবি এবং আরো অনেকে। এমন কি তাদের মধ্যে নন্তও।

প্রফুল্ল প্রস্তাব করিল, ইস্কুলের মাথায় একটা জাতীয় পতাকা বসাইয়া দেওয়া হউক।

ইস্কুল কমিটির ঘরোয়া মিটিং। ভিড় খুব বেশি না থাকিলেও সামান্য যে কয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই এমন হল্লা বাধাইয়া বসিলেন যে বলিবার নয়। ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করিয়া এমন একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব যে কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এটা তাঁহাদের কল্পনারই বাহিরে। গবর্নমেণ্টের সাহায্যের উপর যেখানে অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়, সেক্ষেত্রে এসব এলোমেলো আবদার খাটিবে কেন!

সুতরাং প্রথমে দাঁড়াইলেন রামকমল চাটুজ্জে। বহুকাল পুলিসের দারোগাগিরি করিয়া সাধু-অসাধু উপায়ে তিনি বেশ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছেন। সরকারের ডাকসাইটে কর্মচারী হিসাবে যথেষ্ট নাম পাইয়াছেন ; দেশবন্ধুর আমলে স্বদেশী সভায় মারপিট করিয়া শেষ পর্যন্ত মাস কয়েক অস্থায়ীভাবে ইন্স্পেক্টরিও করিয়াছিলেন। সুতরাং আঁতে ঘা পড়িয়াছিল তাঁহারই সব চাইতে বেশি।

টেবিলে কিল মারিয়া তিনি কহিলেন, বন্ধুগণ! এর চাইতে আর কী ভয়ঙ্কর কথা হতে পারে, বলুন? এটা ইস্কুলের ব্যাপার, আর ছাত্রদের অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা। সুতরাং এ সমস্ত সুকুমারমতি বালকদের মনে রাজনীতির দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে দেওয়া কেন! এসব

রাজনীতির ব্যাপার, কংগ্রেসেই ভালো মানায়, ইস্কুলে নয়। আমাদের নতুন হেডমাস্টার মশাই বিজ্ঞ লোক, এই কদিনেই ইস্কুলটার চমৎকার উন্নতি করেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে যে এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বেরোবে, এ আমরা কিছুতেই আশা করি না। কি বল রাসুদা, তুমি তো ইস্কুলের সেক্রেটারি, কথাটা ঠিক নয় ?

রাসু সেন মাথা নাড়িয়া বলিলেন : ঠিকই তো।

অনাথ কবিরাজ এক পাশে ঝিমাইতেছিলেন। তিনি ইস্কুল কমিটির মেম্বার নন, আসিয়াছেন রাসু সেনের সঙ্গে। এরকম তিনি সর্বদাই আসিয়া থাকেন। চোখ বুজিয়া তিনি রাসু সেনের কথায় সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

অতঃপর দাঁড়াইলেন সুরেন মজুমদার। তিনি কহিলেন, দারোগা বাবু এই মুহূর্তে যা বললেন, তা আমি পূর্ণ সমর্থন করি (এখানে রামকমল মুখ বাঁকা করিলেন, তিনি যে দারোগা, একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সুরেন মজুমদার যেন সকলের সম্মুখে নিজের ডেপুটিত্বই জাহির করিতে চান)। তিনি একটা জায়গা সামলে নিয়েছেন, দারোগা, লোয়ার গ্রেডের কর্মচারী (রামকমল দ্বিতীয়বার মুখ বিকৃত করিলেন), তাই স্পষ্ট করে বলতে সাহস পাননি। কিন্তু আমি একটা ফার্স্ট গ্রেড ডেপুটি (রামকমল তৃতীয়বার মুখ-ভঙ্গি করিলেন), আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পাই না। আমি এটা জোর করেই বলতে পারি, ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস একটা গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে, Yes, they are all hooligans (পিছন হইতে রবি বলিল, "শেম-শেম")—কিন্তু "শেম-শেম" আর যাই বলুন, আমার মুখে স্পষ্ট কথা। ভারতের নেতারা ছেলে-ছোকরাদের কী শেখাচ্ছে ? শেখাচ্ছে ইস্কুল বয়কট করা, মাথায় লাঠি ঝেড়ে দেওয়া, আর রাত-বিরেতে প্রতিবেশীর ফল-পাকড় উজাড় করে দেওয়া, খেজুর রসের হাঁড়ি সাবাড় করা। সে আর বলবেন না মশাই, রস খাবি খা, তা নয় হাঁড়ি-কলসি ভেঙে যা-তা কাণ্ড ! ফের যদি আর একদিন আমার রস চুরি যায়, তা হলে আমি নির্ঘাত থানায় ডায়েরি করাব, এ কথা—

সুরেন মজুমদারের মনের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যথার জায়গা ছিল, রাজনীতি এবং ইস্কুল সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি মনের ভুলে সেইখানটাতে হাত দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্ট গনু মিঞা বাধা দিয়া কহিলেন, আউট্ অব্ অর্ডার !

সুরেন মজুমদার উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আউট্ অব্ অর্ডার মানে ? আমার রস চুরি যাবে, আর আপনারা বসে পার্লামেণ্টারি আইন ঝাড়বেন ! ওসব চলবে না মশাই, এর যদি একটা ব্যবস্থা না করেন তো আমি ইস্কুলের নামে ইন্‌সপেক্টর অফিসে রিপোর্ট লিখব। আমিও যা-তা ডেপুটি নই, পঁচিশ বছর সরকারের নুন খেয়েছি—

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই কোথা হইতে এই দিবাদ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড শব্দে শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। অবশ্য সেটা সত্যই শিয়াল নয়। এসব অনুকৃতির ব্যাপারে নস্ত

বিশেষজ্ঞ।

সভায় একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিল। সুরেন মজুমদার ক্ষেপিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা,—তারপর আর দ্বিতীয় কথাটির অবকাশ কাহাকেও না দিয়াই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেলেন তিনি।

গমু মিঞা কহিলেন, আহা-হা-হা, মজুমদার মশাই চলে গেলেন যে!

মজুমদার মশাই ফিরিয়াও চাহিলেন না।

শত্রুপক্ষেরা নীরব রহিল, মিত্রপক্ষ হইতে রামকমল মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, যাক, মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। ডেপুটি-দারোগার তুলনামূলক সমালোচনা তাঁহার মর্মে মর্মে বিদ্ধ হইতেছিল। আর দশ বছর সারভিস করিলে তিনি নিজেই কি একটা ডেপুটি হইয়া যাইতে পারিতেন না।

প্রফুল্ল বিস্মিত মুখে সুরেন মজুমদারের গন্তব্যপথের দিকে চাহিল, মুকুল অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিল এবং রবি এমনভাবেই গলা ছাড়িয়া হাসিতে শুরু করিল যে, আশঙ্কা হইতে লাগিল, কোন সময়ে তাহার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলি একসঙ্গে পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বা!

গমু মিঞা কহিলেন, অর্ডার অর্ডার!

এইবারে উঠিলেন নরেশ কর। স্বদেশী যুগে গলা-ফাটানো বক্তৃতা দিয়া তিনি নাম করিয়াছিলেন, সেই বিরাট প্রতিভা সুযোগের অভাবে এতদিন নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিল। সুশীল মাস্টার কিংবা অন্যান্য যাকে-তাকে ধরিয়া রাজনীতি বোঝানো ব্যাপারটা চলিত বটে, কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার মতোই নরেশ কর তাহাতে সান্ত্বনা পাইতেন না। এইবার ভালো করিয়া তিনি গোঁফজোড়া চুমরাইলেন, চাদরটাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইলেন, তারপর একবার গলাখাঁকারি দিয়া বলিতে শুরু করিলেন। মনশ্চক্ষে তিনি দেখিতেছিলেন, প্রসারিত দেশবন্ধু পার্ক, বিশাল জনতা, সম্মুখে মাইক্রোফোন, এবং তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:

বন্ধুগণ, একটু আগেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (মানে ইস্কুলে) বিরোধিতা করে চাটুজ্জে মশাই আর মজুমদার মশাই যে সমস্ত কথা বলে গেলেন, সে সব যুক্তি যে কত বালকোচিত, তা বোধ হয় বলে না বোঝালেও চলে। সত্যি বলতে কি, তাঁদের দৌর্বল্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আজকালকার দিনে রাজনীতি না হলে কেমন করে চলবে! আপনারা একবার পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন (তিনি এমন করিয়াই দেখাইলেন—যেন তাঁহার ঠিক পাশেই পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলিতেছে), দেশে দেশে যুগে যুগে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কতো পরিবর্তন ঘটে গেল। আয়র্লণ্ড, আমেরিকা, অসভ্য জাপান, স্পেন, রক্তাক্ত রাশিয়া। আর এই সমস্ত বিপ্লবের তরঙ্গ এনেছে কারা? এনেছে তারাই—

যারা ছাত্র, যারা নবযুগের অগ্রদূত—

পিছন হইতে রবি বলিল, হিয়ার, হিয়ার!

উৎসাহিত হইয়া নরেশ কর বলিয়া চলিলেন, হাঁ। তারাই, সেই ছাত্রেরাই চিরকাল এই বিপ্লব এনেছে। তারাই নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে সমস্ত পৃথিবীকে। জানেন তো কবি বলেছেন:

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি!—'

লাইন দুটির প্রতি নরেশ করের পক্ষপাত যে অত্যন্ত প্রবল, একথা যখন-তখন বুঝিতে পারা যায়। নরেশ কর বলিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথ কখনো কবিতা লিখে থাকলে লিখেছেন এই একটি, "পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে"—

তিনি বলিয়াই চলিলেন:

—তারা বাঁদরামো করে বেড়াবে, সেইখানেই তো তাদের প্রাণ। তারা খেজুর রস চুরি করবে, সেইখানেই তাদের বীরত্ব। এমনি করে তারা নেতা হবে, হবে মাইকেল কলিন্স, হবে ডি ভ্যালেরা, হবে ওয়াশিংটন, হবে ম্যাটসিনি, হবে গারিবল্ডি, হবে লেনিন, হবে স্ট্যালিন, হবে ট্রটস্কি, হবে বিবেকানন্দ—উত্তেজনায় নরেশ কর হাঁপাইতে লাগিলেন, হবে রামকৃষ্ণ, হবে ত্রৈলঙ্গ—

পিছন হইতে কে যোগ করিয়া দিল, হবে নরেশ কর, হবে ভুষণ্ডী কাক—

নরেশ কর চোখ পাকাইয়া কহিলেন, কে?

প্রত্যুত্তরে উকুউকু শব্দে খানিকটা উল্লুকের ডাক কানে আসিল।

গমু মিঞা তটস্থ হইয়া কহিলেন, অর্ডার! অর্ডার!

রবি হাঁকিয়া কহিল, এই নন্তু স্টুপিড! কিন্তু কোথায় নন্তু! কাছাকাছি মাইল খানেকের মধ্যে তার আর আভাস নাই। নরেশ বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তারপর হিংস্রভাবে গোঁফজোড়াকে চুমরাইতে লাগিলেন। নাঃ, ছেলেগুলা একেবারে বাঁদর। দুই দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া যে দুইটা ভালো কথা শুনিবে এমন স্বভাবই তাহাদের নয়। এইজন্যেই তো জাতিটার কিছু হইতেছে না।

এতক্ষণে প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। এই প্রহসনের সমাপ্তি করা দরকার। জিজ্ঞাসা করিল, মুকুলবাবু কিছু বলবেন?

মুকুল হাসিয়া বলিল, না। আপনি বললেই আমার বলা হবে।

—রবিবাবু?

রবির মুখ এক ধরনের বিনয়ে বিগলিত হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। বলিবে বই কি, নিশ্চয় বলিবে। কিন্তু চিরন্তন নিয়ম অনুসারে সে বারকয়েক দ্বিধা করিল, আর

একবার সাধিলে তবে সে দাঁড়াইবে, ইহাই প্রথা।

কিন্তু মুকুল গোল বাধাইয়া দিল। রবি দাঁড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে সে কহিল, না, না, রবি আবার কী বলবে, আপনিই বলুন।

রবি স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুকুল যে সত্যসত্যই এত বড় একটা ঘা মারিয়া তাহাকে বসাইয়া দিবে, সেকথা সে যেন এখনো বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

রবি মুকুলের দিকে তাকাইতে গেল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি আসিল প্রতিহত হইয়া। মুকুল তাহার দৃষ্টির প্রতিদান দিল। উগ্রতায় নয়—শান্ত অবজ্ঞায়। তাহার দৃষ্টি পাথরের মতো শীতল, মনটাও বোধ হয় তাহার ওই রকম দৃঢ় নিরুত্তাপ। সেখানে আঘাত করিলে নিজেকেই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

প্রফুল্লও আর দ্বিতীয়বার ফিরিয়া প্রশ্ন করিল না, সে এবার টেবিলটার দিকে আগাইয়া গেল। রবি মাটির দিকে তাকাইয়া নিজের মনেই বিড়বিড় করিয়া কী একটা বলিল, ভালো করিয়া সেটা শুনিতে পাওয়া গেল না।

প্রফুল্ল আস্তে আস্তে বলিয়া চলিল, তাহার কণ্ঠে উত্তেজনা নাই, উত্তাপ নাই। সে কহিল, একটা জাতীয় পতাকার ব্যাপারে রাজনীতির সম্বন্ধে এত কথা কী করে আসে তা বুঝতে পারলাম না। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই এ বিষয়ে আমি আগে থেকেই শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে রাখি। প্রত্যেকেরই জাতিগত একটা বিশেষত্ব আছে, আর সেই বিশেষত্ব তার পতাকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিশেষত্ব মানেই বিদ্রোহ নয়, এ কথা আপনারা কেন ভুলে যাচ্ছেন ?

প্রফুল্ল বলিয়া চলিল, আর এ থেকে আমার এ কথা মনে করতে কষ্ট হয় যে, এজন্য আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অসন্তুষ্ট হবেন। এতখানি অনুদারতা এত বড় বীর জাতির যে থাকতে পারে, কোনও রাজভক্ত প্রজারই এরকম ধারণা রাখা উচিত নয়।

রামকমল তন্ময়ভাবে মাথা নাড়িলেন। মুকুল কৌশলটা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষে একটু হাসিল, আর রবি—কথাটার গতি যে কোনদিকে চলিতেছে, সেটা ভালো করিয়া ধরিতে না পারিয়া বিস্ফারিত চোখে প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল।

প্রফুল্ল কহিল, কোরান শরীফে আছে—

চকিত হইয়া গমু মিঞা চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

—কোরান শরীফে আছে, যে নিজের ধর্ম বা জাতিকে সম্মান দিতে জানে না, সে আল্লার কাছে গুনাহ্‌গার হয়। সুতরাং জাতীয় পতাকার মতো এমন একটা দেশগত ধর্মগত ব্যাপারে আপনারা কেন যে এমন পিছিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না!

গমু মিঞা বলিলেন, ঠিক ঠিক।

—সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে, ইস্কুলে একটা জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলে কারো কোনও আপত্তি থাকবে না—থাকা উচিতও নয়। আর ইস্কুলের সেক্রেটারির এটা অবশ্য কর্তব্য যে—

রাসু সেন উদগ্রীব হইয়া কান খাড়া করিয়া রাখিলেন।

—এটা অবশ্য কর্তব্য যে, অবিলম্বে তিনি একটা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করুন। এ বিষয়ে সেক্রেটারি কী বলেন, আমরা শুনতে চাই।

প্রফুল্ল বসিয়া পড়িল, রাসু সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি কী বলিবেন? সেক্রেটারির কর্তব্য—এই একটি কথাতেই তাঁহার সমস্ত বক্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছিল।

বার কয়েক তো-তো করিয়া রাসু সেন বলিলেন, বিজ্ঞ হেডমাস্টার মশাই যা বললেন তা খুবই ঠিক। আমি এ প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করি। যদি সরকারের কোনও বিরোধিতা না ঘটে আর ইস্কুলের এইডটা কাটা না যায়, তা হলে অনায়াসে কালই একটা জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া চলে। এটা যখন সেক্রেটারির কর্তব্য, তখন এ সম্বন্ধে আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।

অনাথ কবিরাজের নেশা এতক্ষণে গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। জিনের ছেঁড়া কোটটির উপর তাঁহার মাথাটি ঝুঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে, কুঞ্চিত ভাঁজ-করা চামড়া যেন গালের দু পাশ হইতে ঝুলিয়া পড়িতে চায়। চটকা ভাঙিয়া গিয়া তিনি বলিলেন, ঠিক ঠিক।

তারপর অনায়াসেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাবটা পাশ হইয়া গেল।

প্রফুল্ল সকলের দুর্বল জায়গাগুলি ভালো করিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সে ইস্কুলটার সর্বাঙ্গীণ সংস্কার করিবার ব্রত গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে স্কুলে একটা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইল, ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক মনোভাব প্রসারিত হইতে লাগিল এবং আরও অনেক কিছুই ঘটিয়া চলিল, এখানে যাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার অধিকার নাই।

কিন্তু তপন ইহাদের বাহিরে। সে নিজের সীমার মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া আছে। সম্প্রতি সে তাহার মনের এই দিকটাই আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে যে, সে শুক্লার প্রেমে পড়িয়াছে।

প্রথমটা তপন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই মনে হইল, ইহার চাইতে সহজ, ইহার চাইতে স্বাভাবিক পৃথিবীতে আর কী হইতে পারে! একজন মানুষকে কোনো না কোনো সময় ভালো লাগিতে হইবেই—সে ভালো লাগা দেহমাত্রেরই ধর্ম, মনেরও; সুতরাং বিস্ময়টা তাহার স্তিমিত হইয়া আসিতে মাত্র কয়েকটি মিনিট সময় লাগিল।

কিন্তু ইহার কী মূল্য, কী ইহার সার্থকতা! ভালো লাগা কতক্ষণ বা থাকে! একটা দুর্বল মুহূর্তে সাময়িকভাবে মনকে সংক্রামিত করে, কয়েক ছত্র কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। কিছুদিন কল্পনাবিলাসের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যস—ওই পর্যন্তই। তারপর

দৃষ্টির বাহিরে যাইবামাত্র তাহা মিলাইয়া যায়, সে কল্পনার সঙ্গে সাবানের একটা রঙীন ফেন-বুদ্বুদের কোন তফাত নাই। শুক্লার সঙ্গে তাহার পরিচয়ের সুযোগই বা কয় দিনের! এই তো দু-তিন মাসের জন্য সে চেঞ্জে আসিয়াছে, শরীরটা না সারা পর্যন্ত গ্রামে থাকিবে, তারপর যেদিন প্রয়োজন ফুরাইবে, অত্যন্ত অবলীলাক্রমেই চলিয়া যাইবে। পিছন ফিরিয়া তাকাইবে না, একটিবার দ্বিধা করিবে না; কলিকাতার বিদ্যুৎ-উৎসবের উজ্জ্বলতার মধ্যে এ জীবন একটা ছায়া-ছবির মতো দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইবে। পথের প্রীতিকে সে পথের ধূলার মতোই ঝাড়িয়া ফেলিয়া যাইবে, আঘাত শুধু জমা থাকিবে তাহার জন্য।

তবুও কী যে একটা দুর্বলতা আসিতেছে! সব কথা জানিয়া এবং বুঝিয়াও কবি তপন, আত্মসচেতন তপন তাহা মনে রাখিতে পারে না। নিজের কাছেই সে নিজে কতটা বন্দী হইয়া আছে, একথা আগে অনুমান করিতে পারে নাই।

সেইজন্য সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবেই সে বড় বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল এবং তাহার পা দুখানা এতটুকু ইতস্তত না করিয়াই স্বাভাবিক সংস্কারবশে তাহাকে সোজা শুক্লার ঘরের দিকে টানিয়া লইল। এ বাড়ির সঙ্গে আশৈশব তাহার নিকটসম্বন্ধ। এখানে সে ঘরের ছেলের মতো সহজ।

শুক্লা আয়নার সামনে বসিয়া প্রসাধন করিতেছিল, দরজায় ঘা পড়িল টকটক করিয়া। শুক্লা বলিল, কে? এসো।

ঘরে ঢুকিল তপন। আশ্চর্য, একটু আগেই শুক্লাকে লইয়া যত কথা সে ভাবিতেছিল, এবং যে সমস্যাটার সমাধান করিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তরটাই আকুলি-বিকুলি করিতেছিল, এই মুহূর্তে সেই ভাবনা বা সমস্যাটার কোনো অস্তিত্বই সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। মনের এমন একটা সংযত স্তিমিত অবস্থা তাহার আসিয়াছে যে, যে সমস্ত কথা এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে পীড়ন করিতেছিল এবং যেজন্য সে ভাবিতেছিল শুক্লার সম্মুখে সে আজ কিছুতেই সহজ হইতে পারিবে না, তাহার এতটুকুও সে এখন স্মরণ করিতে পারিল না।

ঢুকিয়াই তপন আক্রমণের সুর ধরিল: নারী-প্রগতির এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অবদান।

শুক্লা চকিত হইয়া বলিল, কোন্‌টা?

—এই প্রসাধন ব্যাপারটাই। বাপ রে, কী একখানা টেবিলই সাজিয়েছ! যেন পারফিউমারির দোকান।

—হুঁ, তুমি তো আছই নারী-প্রগতির পেছনে লেগে।

—নারী-প্রগতির পেছনে আমি লাগি নি, আমি লেগেছি সমস্ত পুরুষ জাতের ইন্টারেস্টের পক্ষে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ জাতকে জাত যেখানে কেরানীগিরি করে খায় এবং যাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাসিক আয় গড়পড়তা পনেরো টাকা, সেখানে কেরানী-গিন্নীরা যদি পঁয়তাল্লিশ টাকার রুজ কেনেন, তো স্বামী বেচারাদের দড়ি-কলসির জন্যে কুমোরটুলির দিকে ছুটতে হয়।

শুক্লা চটিয়া গেল, ইঃ, পঁয়তাল্লিশ টাকা! মেয়েদের কাপড়ে তেল-হলুদের দাগ দেখে আর গায়ে ইলিশ মাছের ঝোলের গন্ধ শুঁকে তোমাদের চোখ-নাক কনভেনশন্যাল হয়ে গেছে। এসব ভাল জিনিস তোমাদের সইবে কেন ?

—ভালো জিনিস! রক্ষা কর দেবি—তপন নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত দুখানি জড় করিয়া বলিল, তোমাদের শাড়ির বিলিতি সেণ্টের ঝাঁজে ক্লোরোফর্মের মতো আমার মাথা ঘুরে যায়। তা তোমরা গায়ে এত সব যে চাপাচ্ছ, এতে করে লোকের কেবল মাথাই ঘোরাতে পারলে, জয় করতে পারলে না। আধুনিকতার সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি এইখানেই।

শুক্লা স্প্রে দিয়া খানিকটা সুগন্ধি তপনের নাকের উপর ছড়াইয়া দিল, থামো, বাক্যবীর থামো। এসব চাপানোর ব্যাপার শুধুমাত্র আধুনিকতারই অবদান নাকি! তোমার সংস্কৃত কাব্যের নায়িকারা কী বলেন! তাঁরাও আমাদের থেকে কম যেতেন না। বরং তাঁদের সমারোহ ছিল আমাদের চাইতে অনেক বেশি। সেই যে মেঘদূত থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন না ঃ

"কুরুবকের পরতো চূড়ো
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রইতো হাতে
কি জানি কোন কাজে।
অলক সাজতো কুন্দ ফুলে
শিরীষ পরতো কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিতো
নব নীপের মালা।
ধারা যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিতো কেশে,
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু
মাখতো মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকতো সাজে—"

তপন শিহরিয়া কহিল, সর্বনাশ, জিতেছ তুমি! আমি নিতান্ত দুর্মেধস্—তুমি যে

সংস্কৃতে এম. এ দিতে যাচ্ছ, এ কথাটা কিছুতেই মনে রাখতে পারি না।

শুক্লা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, হার স্বীকার যখন করেছ, তখন প্রসাধন-তত্ত্ব থাক। কিন্তু এমন অসময়ে আবির্ভাবের কারণটা জানতে পারি?

—তা পারো। কারণ কিছু নেই। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলে এলাম—পা দুটো টেনে নিয়ে এলো বলা যায়। আজকাল আমার যেন কী হয়েছে, তোমার সম্বন্ধে নিজেকে সব সময়—

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে একটা প্রবল চমক বোধ করিল। সে কি আত্মপ্রকাশ করিতেছে! মাত্র কিছুক্ষণ আগেই তার পরিস্ফুট নির্মল বুদ্ধির আলোকে যেটাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, অসতর্ক অবস্থায় সেটাই কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়!

তপন থামিয়া গেল।

কিন্তু তাহার মনে যতখানি দোলা লাগিয়াছিল, শুক্লার চিন্তা-চেতনা তাহার চাইতেও বেশি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের মনকে বুঝিতে তাহার দেরি নাই, পুরুষের অপেক্ষা সহজেই মেয়েরা মনের গতি-প্রকৃতিকে অনুধাবন করিতে পারে। তবুও সে-ও এই বলিয়াই নিজেকে প্রবোধ দিয়াছে যে, পথেই যাহার জন্ম এবং আগে পিছনে দুইটি দিন পরে যাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে লইয়া চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিতে পারে না। সর্বোপরি তপন কবি, তাহাকে পূজার নৈবেদ্য ধরিয়া দিলেও সে গ্রহণ করিবে কি না, আগে হইতেই সেকথা অনুমান করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু—

তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল, বুকে স্পন্দন দ্রুততর হইল; হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমাকে কি মনে হয় তোমার? বাঘ-ভালুক বলে ভ্রম হয় নাকি?

তপন নীরস স্বরে বলিল, যদি হয়, তা হলে দোষ কী?

—তা হলে তুমি শঙ্করাচার্যের শিষ্য। সেই যে কী একটা শ্লোক আছে—

—আঃ, আবার সংস্কৃত আরম্ভ করলে! তোমার মনে রাখা উচিত, আমি নাস্তিক, দেবভাষার সঙ্গে প্রীতির বন্ধন আমার নেই।

—তা নয় না থাকল, কিন্তু সত্যিসত্যিই তুমি যে বৈরাগ্যমার্গে এতদূর এগিয়ে গেছ, সে তো আগে জানতে পাই নি।

—ভয় নেই, শঙ্করাচার্যের শিষ্য নই আমি। আমি মেয়েদের মূল্য দিই। যতটা তারা না পেতে পারে, তার চাইতে বেশিই দিই। আর সেই মেয়ে যেখানে খানিকটা অসাধারণ হয়ে ওঠে, সেখানে,—সেখানে—

তপন সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের সাড়া পাইল। এই মুহূর্তে তাহার দেহের উত্তাপ যেন অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়া উঠিতেছে, যেন সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে সম্পূর্ণভাবে। সে অস্বাভাবিক, সে অপ্রকৃতিস্থ।

শুক্লা ভীত মুখে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তপনের অসমাপ্ত কথাটা কী ভাবে যে শেষ হইবে, কে জানে! সে যেন একটা আকস্মিকের, একটা ঝড়ের—এমন কী একটা পরম বিস্ময়ের জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। নির্বাক জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি মেলিয়া সে তপনের দিকে চাহিয়াই রহিল।

বিদ্যুতের মতো তপন খাড়া হইয়া উঠিল। নির্জন দোতলা; বাহিরে ম্রানায়মান শীতের সন্ধ্যা! ঘরের মধ্যে পাণ্ডুর আলোয় তরুণী নারীর শঙ্কাতুর মুখখানা অপরূপ দেখাইতেছে, তাহার তন্বী সুঠাম দেহলতা কী করুণ ভঙ্গিতেই না টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

তপন দুই বাহু বাড়াইয়া দিল—তারপর শুক্লাকে কাছে টানিয়া আনিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত যা দেরি! দেহের ঘন সান্নিধ্যে সে অনুভব করিল, তাহার বক্ষোবন্ধার ভয়ার্ত হৃদ-স্পন্দন তাহার নিজের উত্তেজিত রক্তধারার মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। নির্বাক, ভীত, আশঙ্কা-পাণ্ডুর সেই মুখখানার দিকে চাহিয়া সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। শুক্লার দ্রুত-নিশ্বাস তাহার গালে লাগিতেছে, তাহার দৃঢ় বাহু-বন্ধনে সে শিহরিয়া উঠিতেছে। মুখ নত করিয়া গাঢ় গভীর স্বরে তপন বলিল, সেখানে, সেখানে তাকে পেতে আমার লোভ হয়, তাকে নিষ্পিষ্ট চূর্ণ করে দেবার বাসনা জাগে! কিন্তু এ লোভ আমি জয় করব। অন্তর থেকে যাকে কামনা করি, বাইরের মোহে তাকে কোনোদিন চূর্ণ করতে চাইব না।

শুক্লা কথা বলিবে কী, তাহার যেন তখন একেবারে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

একবার শুক্লার রক্তওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইয়া, পরমুহূর্তেই তাহাকে মুক্তি দিয়া তপন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পলকের মধ্যে সে যেন তাহার অপরাধের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া তাহার পায়ের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিল।...

টেবিলটার গায়ে ভর দিয়া তেমনি পাথরের মূর্তির মতো শুক্লা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নিচের ঘরে তখন আর একটি কাব্য চলিতেছিল।

একটু আগেই বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করিয়া রবি, মুকুল এবং অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গেরা বিদায় লইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল টেবিলের ড্রয়ারটা চাবি দিয়া খুলিয়া ফেলিল, তারপর তাহার মধ্য হইতে অত্যন্ত সযত্নে এক গোছা বই বাহির করিল। এই সমস্ত বই এবং প্রচার-পত্রিকাগুলি এখন কাজে লাগাইতে হইবে। নিঃস্বার্থভাবে বা অর্থের অভাবে সে এখানে মাস্টারি করিতে আসে নাই। ডিস্ট্রিক্ট কমিটি যে কাজের ভার তাহার উপর চাপাইয়া দিয়াছে, ইস্কুলের চাকরিটার সুযোগ লইয়াই সে কাজটা সব চাইতে সহজ হইয়া

উঠিবে। যে ব্রত সে জীবনে একান্ত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উদ্‌যাপনের পথে প্রকাশ্যতার সুযোগ নাই, আলোর অধিকার যদি নাই থাকে, তবে অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া সে আর কী করিতে পারে?

তবে, ইহাই সান্ত্বনা যে, এ কাজে যাহাদের সহায়তা সে পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান রবি এবং মুকুলের উপর সে অনেকখানিই নির্ভর করিতে পারে। আশা হইতেছে, এক মাসের মধ্যেই গ্রামে একটা শক্তিশালী অর্গানাইজেশন গড়িয়া উঠিবে।

প্যাম্ফলেটগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার মনে হইল, দরজার কাছে কে যেন ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া। আবছায়া অন্ধকারে তাহাকে দেখা যায় না, তাহার নিশ্বাস কিন্তু স্পষ্ট শোনা যায়।

সশব্দে ড্রয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া শঙ্কিত সন্দিগ্ধ সুরে প্রফুল্ল বলিল, কে?

নীলিমা আত্মগোপন করিতে পারিল না। সঙ্কোচ-জড়িত পায়ে সে সামনে আগাইয়া আসিল, বলিল, আমি।

—আপনি! প্রফুল্ল হাতের লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিল; তারপর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অন্ধকারে ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

নীলিমা মৃদুস্বরে বলিল, কিছু না। সেজদিকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—সেজদি! আপনার সেজদি তো কোনোদিন এদিকে আসে না।

—না, না, তা নয়। তবে বাড়িতে এখন কেউ নেই কি-না! মা ওপাড়ায় গেছেন, বাবা বাইরে, চাকরগুলোও এদিকে-ওদিকে। তাই ভয় করছিল। তা ঘরটা আপনি এর মধ্যেই বেশ সাজিয়েছেন তো!

নীলিমা জানিত, শুক্লা রোজকার মতো এখন চিঠি লিখিতে বসিয়াছে—সহজে নিচে নামিবে না। সে প্রফুল্লের বিছানাটার একপাশে বসিয়া পড়িল।

—বাঃ, ও জানলাটা ওই রকম খুলেই রাখেন নাকি! ঠাণ্ডা লাগবে যে।

কিন্তু মনের দিক হইতে প্রফুল্ল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। এই একটি মাসের মধ্যেই সে পরিমণ্ডলটা বুঝিয়াছে—বেশ ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। নীলিমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করিবার একটা অসঙ্গত চেষ্টাও যে এর ভিতরেই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, তা নয়। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা যে ক্ষেত্রবিশেষে কতদূর বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে, এখন সে বেশ উপলব্ধি করিল। নির্জন ঘর,—সন্ধ্যার অন্ধকার এবং ঘরে তাহারা দুইজন,—কাহারো চোখে পড়িলে ব্যাখ্যাটা মুখরোচক হইবে না; অন্যের পক্ষে হইতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে নয়।

প্রফুল্ল হাসিবার ভঙ্গিতে সামনের ঝকঝকে দাঁত কয়টা বাহির করিয়া বলিল, না, রাত্তিরে বন্ধ করেই দিই।

—রাত্তিরে আবার কেন, এখুনি দিন না—। ওপাশে যা একটা ডোবা আছে, দারুণ মশা সেখানে। সন্ধ্যে হলেই ভনভন করে ঘরে এসে ঢোকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রফুল্ল এমন বিপন্ন বোধ করিল যে, বলার নয়।

—কিন্তু এখন একটু মাপ করতে হবে যে আমাকে। বিশেষ কাজ রয়েছে খানিকটা, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা তো বলতে পারব না।

—কাজ করুন না আপনি। ওপরে কেউ নেই, ভারি ভয় করছে আমার। আপনার হাতের লেখা খুব সুন্দর কিন্তু। আপনি যখন চুপ করে বসে লেখেন, তখন দেখতে আমার বেশ লাগে।

প্রফুল্লের বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। নীলিমা কী মনে করিয়াছে, কে জানে, হয়তো এ তাহার ছেলেমানুষি খেয়াল। আর ছেলেমানুষ ছাড়া নীলিমাকে প্রফুল্ল কী-ই বা মনে করিতে পারে! কিন্তু এ ছেলেমানুষিকে তো এখন প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। পরের বাড়িতে যেখানে আশ্রয়, সেখানে এসব ব্যাপারে লোকনিন্দাকে ভয় করিতে হয়।

অতএব ভদ্রতা-বোধকে একটু খর্ব করিয়াই সে স্পষ্টভাবে কহিল, কিন্তু এ সময় এখান থেকে আপনার যাওয়াই ভালো। লোকে, মানে ইয়ে, লোকে একটা কিছু মনে করতে পারে তো?

নীলিমার শ্যামল মুখে লজ্জার একটা ছায়া পড়িল, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, বলিল, কেউ এখন আসবে না এদিকে। কিন্তু লোকে কী মনে করতে পারে, বলুন না?

প্রফুল্লের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল। নীলিমা ছেলেমানুষ নয়। তাহার কথার মধ্যে যে অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত আছে, সেটা যেন পরিস্ফুট হইয়া আসিতে লাগিল।

নীলিমা লজ্জা-জড়িত স্বরে বলিল, লোকে যাই-ই মনে করুক আপনাকে আমার ভারি ভালো লাগে, সত্যি বলছি খুব ভালো লাগে!

প্রফুল্লের সর্বাঙ্গ কাঠ হইয়া গেল। এ যে প্রণয়-নিবেদন! নীলিমা ভাষা শেখে নাই; তাই এত সহজে, এমন স্থূলভভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বসিল। কিন্তু এ কি মুশকিল বাধিয়া বসিল আবার! নীলিমার এ প্রেম সে গ্রহণ করিবে কি, এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা শুনিবার আশাই তো সে করে নাই। তা ছাড়া প্রেম করিবে—এমন সুলভ এবং অপর্যাপ্ত সময়ই বা তাহার কোথায়?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রফুল্ল কয়েক পা সরিয়া গেল। কহিল, ছেলেমানুষি করবেন না এখন। আপনি যা বলছেন, তার মানে যে আপনি বোঝেন না, তা নয়! ওসব কথা শোনা আমার যেমন অন্যায়, আপনার পক্ষে বলাও তার চাইতে কম অন্যায় নয়। আর দেখছেন তো হাতে বিস্তর কাজ আমার, এ নিয়ে বিলাসিতা করবার মতো অবকাশ আমার নেই।

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। আজ তাহার মনে এ কি তীব্র মাদকতা আসিয়াছিল—এমন নয়, নিরাবরণভাবে সে নিজেকে প্রফুল্লের কাছে প্রকাশিত করিয়া বসিল! এবং শুধু প্রকাশিতই নয়, সে ইহার বিনিময়ে লাভ করিল আঘাত, লাভ করিল প্রত্যাখ্যান! বয়স তাহার যাই-ই হোক গ্রামের অমার্জিত পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া সে অত্যন্ত অসময়েই এ সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, বয়োধর্ম তো আছেই। তাই প্রফুল্লের কাছ হইতে এই অতি স্পষ্ট আঘাতটা পাইয়া সে কয়েক মুহূর্ত বেদনায় বিমূঢ় হইয়া রহিল।

কিন্তু নীলিমার যে আজ কী হইয়াছে, ইহাতেও সে ফিরিতে পারিল না। তাহার ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়াছিল। বলিল, কী আপনার এত কাজ? সে কাজ কি এতই বেশি যে আপনি দিনরাত তাই নিয়ে থাকবেন? ঐ তো ইস্কুল, ছেলে পড়ানো—

—ভুল করেছেন আপনি। ছেলে পড়ানোটা আমার কাজের উপলক্ষ মাত্র—শেষ লক্ষ্য নয়। যেদিন আমার কাজ শেষ হবে, সেদিনই ঘর-সংসারের যা কিছু স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনকে আমি মেনে নিতে পারব, তার আগে নয়।

—সে কাজ কবে আপনার শেষ হবে?

—কবে? প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না, টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নীলিমার দিকে ফিরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। তারপর উজ্জ্বল চোখ দুইটি নীলিমার আনত ম্লান মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ধরিল। নিরুত্তাপ, প্রশান্ত কণ্ঠ, কিন্তু পাষাণের মতো কঠিন একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা তাহার সে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল।

—যেদিন আমার দেশকে, আমার পৃথিবীকে আমি এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারব, যেদিন যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব। তার আগে পর্যন্ত আমার জন্যে ঘর নেই, বিশ্রাম নেই, প্রেম নেই। অনেক ভুলে আমাদের পৃথিবী ভরে উঠেছে; ভয়ে আর অত্যাচারে, ক্ষুধায় আর অপচয়ে, লোভে আর দুর্ভিক্ষে! এই পৃথিবীটাকে রসাতলে পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামতে পারব না—আমার থামা অসম্ভব। The war is waged and I am a soldier!

শুধু ঘরেই নয়, নীলিমার সারা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়াই প্রফুল্লের কঠোর নিষ্ঠুর কথাগুলি গমগম করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার সমস্ত স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরেই যেন সেগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

নীলিমা আড়ষ্টের মতো শুধু কহিল, আর-এক পৃথিবী!

—হ্যাঁ, আর-এক পৃথিবী! প্রফুল্ল একটানে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্য হইতে কী একখানা বই বাহির করিয়া আনিল। কহিল, বর্তমান পৃথিবীর রূপ কী দাঁড়িয়েছে, নিজের চোখে সব সময় তা হয়তো দেখতে পান না। যদি পেতেন, তা হলে

দেখতেন চারদিকে কী সাংঘাতিক মৃত্যুর ছায়া! সে ছায়া আপনাদের এই গ্রামের উপরেও তিলে তিলে নেমে আসছে, সর্বনাশের বন্যায় বিশ্বসংসার ভেসে যাওয়ার উপক্রম করছে। হাজার হাজার বছরের জমাট অন্ধকার এখানে পাথরের মতো অনড় হয়ে রাজত্ব করছে! আর এই অন্ধকারের মধ্যে বাস করতে করতে আজ আমরা অক্ষম, আজ আমরা অন্ধ। তাই বাইরের আলোক এনে আমাদের দেখতে হবে, কী ভাবে চলেছে আমাদের ওপর দস্যুতা, কোথায় মাটির আড়াল থেকে মৃত্যু-বীজ ফুলে-ফসলে বড় হয়ে উঠেছে!

বইখানা সে নীলিমার দিকে বাড়াইয়া দিল: পড়তে চেষ্টা করুন, সবটা যদি বুঝতে নাও পারেন অনেকটাই পারবেন। এবং তারপরে—

প্রফুল্ল হাসিয়া ফেলিল, তারপরে যদি আমাকে গুণ্ডা বলে মনে না হয় এবং আমি যা করতে যাচ্ছি, তা আগুন নিয়ে খেলা, এ বিশ্বাস আপনার মনে দৃঢ় না হয়, তা হলে আপনি যা দিতে চেয়েছেন, তা আমি প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করব।

নীলিমা হাত পাতিয়া বই লইল বটে, কিন্তু একটা অর্থহীন ভয়ে এবং উত্তেজনায় সমস্ত দেহ তখন তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কথাগুলার সবটা সে বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার মত শিক্ষাও তাহার নাই। তবু কিসের একটা অশুভ অনুমানে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলি যেন আসিতেছে আশঙ্কায় অসাড় হইয়া।

প্রফুল্ল স্মিত মুখেই কহিল, আর এখানে দেরি করছেন কেন? রাত অনেক হয়ে গেল কিন্তু। কেউ এসে পড়তে পারে আবার।

নীলিমা এক রকম অচেতন পা ফেলিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, তারপর বইখানাকে বুকের নিচে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে বিছানার উপরে উবুড় হইয়া পড়িল। চোখ দিয়া অকারণে তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।…জীবন যেন প্রসারিত একটা অন্ধকার রহস্যলোক, পদে পদে তাহার অপরিচিত বিচিত্র বিস্ময়! সেই বিস্ময়ের জগতে নীলিমার এই প্রথম পদার্পণ।…

নিচের ঘরে একখানা জরুরী চিঠি লিখিতে গিয়া সৈনিক প্রফুল্ল অন্যমনস্ক হইয়া গেল, চেয়ার ছাড়িয়া জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সে। অন্ধকারে কোথায় হাসনাহানা ফুটিয়াছে, বাড়ির দোতলাতে কে যেন সেতার বাজাইতেছে, বাহিরের বনকুঞ্জ রাত্রির বাতাসে যেন স্বপ্নমর্মরিত হইতেছে। এই মুহূর্তটি বিচিত্র,—এমন একটি মুহূর্তে জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্যকেও হয়তো ভুলিয়া যাওয়া চলে!

কিন্তু এ শুধু ক্ষণিকের জন্য! কামারের অগ্নি-শিখায় সেখানে আকাশ আজ আলো হইয়া গেল, মৃত্যু-ঈগলের ধাতব পাখায় যেখানে নিখিল কল্যাণের মারণ-মন্ত্র বাজিতেছে, সে রক্ত-পঙ্কিল রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া কে আজ নীড়ের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে?

প্রফুল্লের মনের মধ্যে বার বার ছন্দিত হইতে লাগিল:

"এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি,
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী,
এ যে তোমার তরবারি।"

তিমির-তীর্থ

সাহেবপুর চরে হাট বসিয়াছিল। এ অঞ্চলে একমাত্র নলসিঁড়ি ছাড়া এতো বড় হাট আর নাই বলিলেই চলে। তা নলসিঁড়ির হাট—সেও এখান হইতে পুরাপুরি দুই মাইলের কম হইবে না নিশ্চয়। ইতিমধ্যে আশে-পাশে আরো যে কয়খানা গ্রাম এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়ানো রহিয়াছে, সপ্তাহে একটি দিন—ওই হাটটির অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিলে তাদের চলে না। গ্রামের এই সব সাধারণ অধিবাসীদের হাটই একরকম প্রাণ বলা যায়। ধরো, নদীর বিশাল বিস্তারের মধ্যে দুর্গম চরে যাহারা একটুখানি বসতি গাড়িয়া বসিয়াছে, শিক্ষা-সভ্যতার বাহিরে লাঙল ঠেলিয়া কিংবা বাথানের মহিষ চরাইয়া যাহাদের দিন গুজরান করিতে হয়, সাপ্তাহিক প্রয়োজনের জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে তাহাদের এই-ই একটি মাত্র অবলম্বন!

আর শুধু সাংসারিক দিক হইতেও নয়; মানুষ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক, প্রয়োজনের বাহিরে বিলাসিতা বলিয়া আর একটি যে দুর্মূল্য বস্তু আছে, তাহার প্রতি আকর্ষণ তাদের প্রচুর। মোটর লইয়া বিলাতি দোকানে শৌখিন জিনিসপত্র কেনার মধ্যে যে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা রহিয়াছে, একখানা রঙচঙে তাঁতের কাপড়, দুই ছড়া রঙীন পুঁতির মালা অথবা কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি কেনার মধ্যে তাহার চাইতে কম উৎসাহ-উদ্দীপনা নাই।

সুতরাং জাঁকাইয়া হাট বসিয়াছে। দশ মাইল, বারো মাইল দূরের পথ হইতে মানুষ আসিয়াছে দোকান লইয়া, আসিয়াছে হাট করিতে। ঠিক আড়িয়ল খাঁ হইতে বাহির হইয়া যে কাটা-খালটি সোজা নলসিঁড়ির দিকে বহিয়া গিয়াছে, সে খালটি ডিঙি-নৌকার ভিড়ে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এ সমস্ত নৌকাও আসিয়াছে নানা বিচিত্র জাতের—নানা দিক-দেশ হইতে নানা ধরনের মানুষ লইয়া; তাদের ডিঙি হইতে

আরম্ভ করিয়া গয়নার নৌকা অবধি বাদ নাই। আট-দশখানি বড় বড় নৌকা আসিয়া খালের মুখে নোঙর ফেলিয়াছে, মাঝিরা হিন্দুস্থানী। এই নৌকাতে করিয়াই বরিশালের সুবিখ্যাত বালাম চাউল চালান যায়। আর একরকম লম্বাটে ধরনের বড় বড় নৌকা— ইহারা অন্যান্যগুলি হইতে একটু দূরে স্বতন্ত্র ভাবে যেন নিজেদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া সরিয়া আছে। ইহারা "বেবাজিয়া"দের নৌকা।

"বেবাজিয়া"—অর্থাৎ বেদে সম্প্রদায়, এ অঞ্চলে এই নামেই ইহারা পরিচিত। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ অর্থে যে যৌন-লিপ্সার চরিতার্থতা, তাহারা ইহাদের এই নৌকার সঙ্গেই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। নামত ইহারা মুসলমান, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানে কোনো ধর্মের দাসত্বই স্বীকার করে না। জীবনের প্রথম দিনটি হইতে শেষদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে ভাসিয়া বেড়ায়। নদীতে মাছ ধরে, মদ খায় এবং গৃহস্থপল্লীতে ভানুমতীর খেল্ দেখায় আর টোটকা-টাটকা ওষুধ বিক্রি করিয়া ফেরে। স্ত্রীলোকেরা গলুইয়ে দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো মালকোঁচা আঁটিয়া নৌকা বায়, থেলো হুঁকায় তামাক টানে। একদল বলিষ্ঠ কুকুর সঙ্গে থাকে, ডাঙায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, অবসর সময় গলুইয়ে বসিয়া জল দেখিতে দেখিতে ঝিমাইতে থাকে।

হাটের ধারেই কালীপদ পোদ্দারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। কয়েক বছর আগেও এই দোকানের মুনাফা হইতে কালীপদ লাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই যে কুক্ষণে স্বদেশীর হুজুগ শুরু হইল, শনির দশা ধরিল কালীপদর। যেখানে মাসে দুশো গ্যালন মদ কাটিত, সেখানে কাটিতে লাগিল পনেরো-কুড়ি গ্যালন। সে হুজুগ মিটিল তো শুরু হইল মানুষের অকাল। ধবক্ করিয়া পাটের বাজারটা নামিয়া গেল। রাতারাতি পয়সাকড়িগুলা কোথায় গিয়া যে হাত-পা গুটাইয়া গ্যাঁট হইয়া বসিল, তা একমাত্র বিধাতাই বলিতে পারেন।

তা যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদে দিনকালের আবহাওয়া এক-একটু করিয়া বদলাইতে শুরু করিয়াছে যেন। মদ আজকাল কিছু বেশিই বিক্রি হইতেছে। এই 'বেবাজিয়ারা'ই কালীপদর বড বড় মূল্যবান খরিদ্দার। ইচ্ছা করিলে চাই কি এক-একজনেই একসঙ্গে বসিয়া সাত-আটটি পঁচাত্তরের বোতল তলানিসুদ্ধ নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে।

হাটবারই লক্ষ্মীবার—কালীপদর দোকানের সামনে একটা ছোটখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছে। কাঠের কাউন্টারের সামনে দাঁড়াইয়া বোতল সরবরাহ করিতেছে কালীপদ। একপাশে মাটির প্রদীপের আকারে কতগুলি ছোট ছোট পান-পাত্র—বোতলের সঙ্গে এগুলি বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

সম্প্রতি দোকানের সামনে নমঃশূদ্র শ্রেণীর একদল লোক জাঁকাইয়া বসিয়া ছিল।

আশে-পাশে তাহাদের পাঁচ-সাতটা পঁচাত্তর ও বাটের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। একরাশ মাটির পাত্র এদিক-ওদিক ছড়াইয়া, একটা বড় শালপাতার ঠোঙায় প্রচুর ছোলা আর কাবলি মটরভাজা, কয়েকটা প্যাজ-ফুলুরি এবং বেগুনি। এগুলি মদের চাট হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল।

ইহাদের দলপতি মানিক ভুঁইমালী—কাপ্তেনও বলা চলে। অবস্থা তাহার শীতের সময়ে সকলের চাইতে সচ্ছল থাকে। খেজুরগাছ চাঁছিতে তাহার কৃতিত্ব এ অঞ্চলে স্বীকৃত; দৈনিক প্রায় দেড়শো গাছ হইতে সে হাঁড়ি নামায় এবং আধি বখরার দরুন যথেষ্ট পরিমাণে রসও পাইয়া থাকে। এই হেতু শীতের মরশুম ভরিয়া তাহার চতুর্দিকে প্রসাদার্থীদের চমৎকার একটা ভিড় থাকিয়া যায়।

পূর্ণ পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া মানিক একটা আস্ত বেগুনি মুখে পুরিয়া দিল। আকণ্ঠ মদ উদরস্থ করিযাও তাহাব নেশা জমে নাই। দুই-তিনটা বোতল নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, ফুরিয়েছে?

একজন বলিল, ফুরোবে না? যে টান ধরেছে তাতে মদ তো মদ, চোঁ চোঁ শব্দে স্বয়ং ভাগীরথী অবধি শুকনো মেরে যেতেন বাবা।

একথাবা কাবলি মটর চিবাইতে চিবাইতে আব একজন প্রশ্ন করিল, ভাগীরথী! সে আবার কি হে পণ্ডিত?

বোঝা গেল, আগেব লোকটির নাম পণ্ডিত। এটা তাহার আসল নাম নয়, সম্ভবত তাহার বিশ্রুত পাণ্ডিত্য অথবা পাঠশালার পণ্ডিতগিরি হইতে সে এই সম্মানজনক উপাধিটি পাইয়াছে। পণ্ডিত পণ্ডিতের মতোই হাসিয়া কহিল, ভাগীরথী জানো না তো জানো কচুপোড়া? ভাগীরথী হলেন গিয়ে স্বয়ং মা গঙ্গে; সেই 'গঙ্গে চ যমুনে চ' আর কি। মায়ের সহস্র নাম, গঙ্গা-যমুনা-গোদাববী মায় আমাদের আড়িয়ল খাঁ পর্যন্ত।

—বল কি! কাবলিমটর-চর্বণকারী লোকটি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল: মা গঙ্গে, সামনে মা গঙ্গে! এই ভরসন্ধ্যেবেলা—জয় মা—

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে স্খলিত পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবটা যেন গঙ্গায় সে ঝাঁপ মারিবে, কিন্তু ঝাঁপ সে মারিল না। হাত দুখানা বাড়াইয়া পিঠ বাঁকাইয়া বার কয়েক সে সামনের দিকে দোল খাইল, তারপর কথা নাই, বার্তা নাই, মুখ থুবড়িয়া সোজা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল।

পড়িল একেবারে মোক্ষম পড়া। অন্য সময় হইলে নাকমুখ থেঁতলাইয়া যাইত নিশ্চয়; কিন্তু নেশা-প্রসাদাৎ আপাতত সে কোনো রকম বেদনা বোধ করিল বলিয়া মনে হইল না। বরং পরম নিশ্চিন্তে তাহার নাক হইতে এক রকম শব্দ বাহির হইতে লাগিল, যেটাকে অনায়াসে নাসা-গর্জন বলিয়া ভ্রম করা চলে।

পণ্ডিত কাঁদিয়া ফেলিল, সহসা কিসের একটা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় তাহার সমস্ত অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। গদগদ কণ্ঠে কহিল, আহা হা, ভর হয়েছে রে, মায়ের ভর! ক্যাবলাটা ভাগ্যবান পুরুষ, বাপের পুণ্যে আর কিছুদিন বাঁচলে হয়!

—পাঁড় মাতাল হয়ে উঠেছে এগুলো—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া মানিক নিঃশেষিত বোতল কয়টি তুলিয়া লইয়া কাউণ্টারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পা এখনো টলে নাই। আরেকটা তিরিশের বোতল টানিতে পারিলে তবে তাহার নেশাটা জমিবে।

কাউণ্টারের সামনে বোতলগুলি জমা দিয়া সে প্রশ্ন করিল, আর আমার কত পাওনা রইল বাবু? মদ খাইবার আগেই দশ টাকার একখানা নোট সে জমা রাখিয়াছে, নেশার ঝোঁকে পাছে খেয়াল না থাকে, ট্যাকের অতিরিক্ত খরচ করিয়া বসে সেইজন্য। কালীপদ নিকেলের চশমার ভিতর হইতে প্যাঁচার মতো তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখ মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। খালি গা, মসীকৃষ্ণ ভুঁড়িটি প্রধান লক্ষণীয়। মনে মনে কী একটা হিসাব করিয়া কহিল, এক টাকা সাত আনা।

বিস্মিত স্বরে মানিক বলিল, মোটে? এখনো তো নেশাটা ভালো ধরলো না পোদ্দার মশাই, এর মধ্যেই—

সোজা ঝাঁকিয়া উঠিয়া কালীপদ কহিল, তবে আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি? আমি চোর? ব্যাটা মাতাল, মদ টানতে পারবি আর হিসেব রাখতে পারবিনে?

অতবড় ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা! ধমক খাইয়া একেবারে কেঁচোটি হইয়া গেল।

—না, না, তা কি আর বলছিলাম কর্তা। আপনাকে চোর বলতে এতখানি বুকের পাটা আছে আমাদের? তবে এখনো 'ঝুম' লাগল না কি না, তাই—

—ঝুম লাগল না তো আর-একটা তিরিশের বোতল নিয়ে যা। আসচে হাটে এক আনা পয়সা দিয়ে যাস।

—তাই আজ্ঞে,—মাথা নিচু করিয়া আর-একটা বোতল নিয়া মানিক সরিয়া পড়িল। কয়েক পা আগাইয়াই অস্ফুট স্বরে শপথ করিয়া বলিল, না ছেড়েই দেব শালার পাজী নেশা। ঘরের টাকাগুলো হারামজাদা পোদ্দারকে খাইয়ে—

কিন্তু প্রত্যেক হাটবারেই শূন্য-ট্যাক হইয়া এই প্রতিজ্ঞাটা সে করিয়া থাকে এবং পরের হাটেই প্রতিজ্ঞা তাহার ভুল হইয়া যায়। মদের দোকানটা চোখে পড়িবামাত্র একটা অসহ্য তীক্ষ্ণ তৃষ্ণায় তাহার গলার শিরা-নালীগুলি মরুভূমির মতো জ্বলিতে থাকে, দেশী মদের মহুয়া-পচা মাতাল-করা গন্ধে এবং অ্যাল্‌কহলের তীব্র আস্বাদ-স্মৃতিতে অন্তর উদ্বেল হইয়া ওঠে; এবং পরক্ষণেই—

কালীপদ সাপের মতো দুইটি ছোট ছোট নিষ্পলক চোখে মানিকের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল। বিক্রির মুনাফা ছাড়িয়াও মত্ততার সুযোগ লইয়া নগদ আড়াই

টাকা লাভ। বিবেক মধ্যে মধ্যে তাড়া দেয় বটে, কিন্তু মাতালের ধন তো বারো ভূতেই লুটিয়া খাইবে। সে-ও না হয় সে রাশীকৃত অপব্যয়ের মধ্য হইতে কিছু ভাগ বসাইয়া লইল। ছা-পোষা মানুষ, পাপ অর্শিবে না নিশ্চয়ই।

হৈ-হৈ করিতে করিতে 'বেবাজিয়া'র দল আসিয়া পড়িল। হ্যাঁ,—খদ্দের বলিতে হয় তো ইহাদের, মানিকের মতো কাপ্তেন ছোট জাতের মধ্যে দু-চারজন মাত্র আছে, কিন্তু 'বেবাজিয়া'রা প্রত্যেকেই এক-একজন কাপ্তেন ; একনাগাড়ে সাত-আট বোতল মদ চোখ বুজিয়া হজম করিতে পারে। তবে দুঃখ এই যে, ইহারা কোথাও বেশিদিন ডেরা বাঁধিয়া থাকিতে পারে না, জীবনের ঘাটে ঘাটে এলোমেলো ভাবে ভাসিয়া বেড়ানোকেই ইহারা সত্য বলিয়া জানিয়াছে।

যে দলটি আসিল, স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া সংখ্যায় তাহারা প্রায় পনেরজন হইবে। বেশ-বাস এবং চাল-চলনে তাহারা যে অন্যান্যদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এক্ষেত্রে তাহার পরিচয় মিলিল। দোকানের ভিড় এবং হাটের জনতার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইল না তাহারা। একগাদা বোতল লইয়া একপাশে চক্র করিয়া বসিল এবং বলিষ্ঠ-দেহা দীর্ঘাকৃতি একটি মেয়ে সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। এসব ব্যাপারে মেয়েদের এক-চেটিয়া অধিকারকে এক্ষেত্রে সে ক্ষুণ্ন করিতে রাজী নয়।

সঙ্গে আবার তাহাদের মোটা মোটা গোটাকতক কুকুরও আসিয়াছে, এগুলি তাহাদের নিত্য সহচর। চর্বিযুক্ত তৈলাক্ত দেহ, গায়ের লোমগুলি যেন চকচক করিয়া জ্বলে। পায়ের পেশীগুলি পরিপুষ্ট, ঝাঁকড়া চুলের আড়াল হইতে তাহাদের বন্য চোখগুলি দীপ্তি পায়। বেদেনী মেয়েটি মাটির পাত্রে খানিকটা করিয়া ইহাদের ঢালিয়া দিল। জীবনের ছোট বড় নানা সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের সঙ্গে নেশারও অংশীদার ইহারা।

নেশা জমিতে লাগিল এবং হল্লাও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। মানবতার শ্রীক্ষেত্র বলিতে হয় তো ইহাকেই। অনভ্যস্ত চোখে জিনিসটাকে যতো অপ্রীতিকরই মনে হোক, ইহাদের জীবনের আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হইতে এটাকে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া চলে না। বহুদূরের শিক্ষা-সভ্যতা-বিবর্জিত গ্রামে নোনা জলের নিভৃত আশ্রয়ে চরের মধ্যে যাহারা বাস করে, সপ্তাহের মধ্যে এই একটি দিনবিশেষের জন্য তাহারা যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া থাকে, এবং সে বিকৃত আনন্দ-তৃষ্ণা এই মদের দোকানের সামনে আসিয়াই উদ্দাম হইয়া ওঠে।

তবে এইটুকু নিষ্কৃতি যে, এখানে রূপোপজীবিনীদের ভিড় নাই। থাকিলে অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হইত—অন্তত কালীপদ সেকথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মদ অন্তত কোন্ না আরো দু-চার গ্যালন বেশি বিক্রি হইত। তা ইহাদের অনেকের মধ্যে বিবাহ-বন্ধনটাই যখন সত্য নয় এবং পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডিটাকেও যখন সকলে মানিয়া চলে না তখন

এখানে দেহ-বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়াও খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

তিন-চারজন লোক লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, 'বেবাজিয়া'দের একটা কুকুর তাহাদের মুখ চাটিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু কুকুরটাকে তাড়াইবার চেষ্টা কেউ করিতেছে না। মত্ততার আদিমতম পর্যায়ে আসিয়া কুকুর ও মানুষ নিঃসংশয়ে এক হইয়া গিয়াছে। একজন অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া অশ্লীলতর একটা গান জুড়িয়াছে এবং আর-একজন অশ্লীলতম ভঙ্গিতে খেমটা জাতীয় একটা নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে।

চাদরে ঢাকিয়া তিনটা ষাটের বোতল লইয়া রসময় চলিয়া গেল। সম্প্রতি কাঁচি হইতে সে প্রোমোশন পাইয়াছে। মুকুন্দ আসিয়া এক সিকি গাঁজা কিনিল। প্রতি হাটবার সন্ধ্যায় সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া সে জন-কতক বন্ধু-বান্ধব লইয়া সিদ্ধি এবং গাঁজার সেবা করিয়া থাকে। গত বৎসর এক মন্ত্রসিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সে এই নতুন অভ্যাসটি গড়িয়া তুলিয়াছে। গাঁজায় একটা ব্রহ্মদম লাগাইয়া যদি পাঁচটি মিনিট ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সুষুম্না নাড়ীতে সুড়সুড়ি লাগিয়া কুল-কুণ্ডলিনী লাফাইয়া উঠিবেন এবং মূলাধার-চক্রে সাক্ষাৎ দেবী ধূমাবতীর আবির্ভাব ঘটিবে, ইহা সাধকদের পরীক্ষিত সত্য।

কাউণ্টারের উপর কতকগুলি নতুন বোতল সাজাইতে সাজাইতে কালীপদ শুনিল, পিছনের দরজায় অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে টকটক করিয়া টোকা পড়িতেছে।

এখানে কাউণ্টারটির একটু বর্ণনা প্রয়োজন। কালীপদ মদ এবং গাঁজার জয়েন্ট লাইসেন্সি, পাশাপাশি দুইটি জানালা হইতে মদ ও গাঁজা সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ঘরের মধ্যে দুইটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কেরোসিন কাঠের বাক্স আলমারির মতো করিয়া রাখা, তাহার একটা দিক কাটা, মাঝখানে দুই-তিনটা তাক করা। এই তাকগুলিতে মদের বোতল, গাঁজার মোড়ক এবং মাপিবার পিতলের নিক্তি প্রভৃতি সাজানো। আসলে জানালার পিছনে এই বাক্স দুইটিই কাউণ্টারের কাজ করিতেছে।

দোকানে বাজে লোক ঢুকিবার নিয়ম নাই বলিয়া কাউণ্টারের সামনের দিকে কোনো দরজার ব্যবস্থা নাই, কিন্তু বাজে লোক ঢুকিবার নিয়ম থাক বা না থাক, ঘরের মধ্যে সযত্নে একখানা বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে। প্রকাশ্য না হোক, এটির অপ্রকাশ্য একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। বাড়িতে বোতল বহিয়া লইয়া যাওয়া যাদের সম্ভব নয়, ডুবিয়া-জল-খাওয়া সেই জাতীয় ভদ্রলোকদের এবং হাটে তদারক বা তদন্ত করিবার জন্য যে সমস্ত পুলিস ও জমিদার-কর্মচারীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, এটা তাঁহাদেরই কাহারও কাহারও গলা ভিজাইবার নিভৃত স্থান। পিছনের দরজায় টোকা পড়িবারও বিশেষ একটা অর্থ আছে।

গাঁজার বাক্স সামনে লইয়া যে ছোকরা ভেণ্ডারটি খদ্দেরদের পুরিয়া সরবরাহ করিতেছিল, শশব্যস্তে উঠিয়া দরজাটা সে-ই খুলিয়া দিল।

ঘরে ঢুকিলেন অবসরপ্রাপ্ত দারোগা রামকমল চাটুজ্জে এবং বার্ষিক দু হাজার টাকা মুনাফার জমিদার গন্নু মিঞা স্বয়ং। বাহিরের পরিবেশের মধ্যে দেখিলে বোঝা যায় না,— সাধারণ আর দশজনের সঙ্গে মিশিয়া রামকমল এক হইয়া যান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ঝুলিয়া ইঁদুরের মতো মুখ এবং একটা চোখের ঈষৎ ট্যারা দৃষ্টি তাঁহার চরিত্রের একটা অপ্রীতিকর বিশেষত্বের প্রতি নির্দেশ করে শুধু; কিন্তু এই মদের দোকানে এক গ্লাস ত্রিশ হাতে লইয়া না বসিলে তাঁহাকে যেন সম্পূর্ণ চেনা যায় না। বিনা পয়সার মদ ব্রাহ্মণেও খাইয়া থাকে, দারোগাজীবনে এই আর্ষবাক্যটি প্রমাণ করিবার সুযোগ রামকমলের ঘটিয়াছিল; কিন্তু ওই বস্তুটার বিশেষত্বই এই যে, দেখিতে দেখিতে সুযোগটি নেশায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। দীক্ষাদাতারা তো গাছে তুলিয়া দিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িলেন, এদিকে গাঁটের কড়ি বাহির করিয়া নেশার সেবা কবিতে রামকমলের প্রাণান্ত।

প্রেসিডেন্ট গন্নু মিঞার চেহারায় এক ধরনের আভিজাত্য আছে। শরীরে মেদ-বাহুল্য, গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, বুদ্ধিহীন চোখ দুইটা অশোভন রকমে নির্বাপিত, নাকের উপর গোটা তিনেক রক্তাক্ত শিরা নজরে পড়ে, মদ্য-মাংসের অকুণ্ঠ চর্চায় লোকটির ব্লাড্-প্রেশার বাড়িয়াছে। নেশার ব্যাপারে ইহারা দুইজনে মানিকজোড়।

ছোকরা ভেণ্ডারটি অতি সাবধানে আবার পিছনের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। কর্কস্ক্রু দিয়া খুলিয়া এক বোতল খাঁটি এবং দুইটা কাঁচের গ্লাস আগাইয়া দিল কালীপদ। গ্লাস দুটিও ইহাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য রিজার্ভ থাকে।

পান চলিতে লাগিল এবং দুই গ্লাসের পর তিন গ্লাস নামিতেই রামকমলের বয়ঃশুষ্ক দেহ যেন আনন্দে উদ্দীপনায় সতেজ হইয়া উঠিল।

গন্নু মিঞা বলিতেছিলেন, মেলাটা জমছে না, এবার যাত্রাগানের বন্দোবস্ত করব নাকি এক পালা?

রামকমল মুখে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া কহিলেন: যাত্রা—দুয়ো! তার চাইতে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করলেই তো হয়। ওসব নিরিমিষে এবার চলবে না বাবা, খ্যামটা কিংবা ঢপ-কেত্তনের ব্যবস্থা করো। মাইরি, দারোগা থাকতে জগদ্দলের বাবুদের ওখানে যা একখানা ঢপ-কেত্তন শুনেছিলুম! গৌরাঙ্গিনী খ্যাম্‌টাওয়ালীর সে গান যেন এখনো আমার কানে লেগে রয়েছে—

বলিয়া তিনি গুনগুন করিয়া শুরু করিলেন:

"আসিয়া নাগর সম্মুখে দাঁড়াল
গলে পীত বাস লইয়া—
তবু না ক্ষণেকে দেখিলি চাহিয়া
তু বড় কঠিন মাইয়া—"

গমু মিঞা ঠুনঠুন করিয়া কাঁচের গ্লাসের গায়ে হাতের আংটিটা দিয়া তাল বাজাইতে লাগিলেন।

ভালো করিয়া আর একবার গলা ভিজাইয়া রামকমল কহিলেন, বাস্তবিক, সরকারী চাকরি যখন করতুম, তখন একচোট ফুর্তি করে নিয়েছি যা হোক। একরকম রাজার হালেই কাটিয়েছি বলা চলে; সে সব দিন আর ফিরে আসবে না।

গমু মিঞা মদে-রাঙা নির্বোধ চোখ দুইটা বার কয়েক পিটপিট করিয়া কহিলেন, খুব সুবিধে ছিল বুঝি?

—ছিল না আবার? একদিনের গল্প বলি শোনো: আমি তখন বালুরঘাট মহকুমার এক থানার ইনচার্জ। দুর্গম দেশ, আশেপাশে কেবল ওঁরাও, সাঁওতাল আর ধাওয়া নামে এক সম্প্রদায়ের হরিজন মুসলমানের বসতি। সেদিন খুব বাদলা, সকাল থেকেই অঝোরে বিষ্টি পড়ছিল। থানায় চুপচাপ বসে ডাইরি লিখছি, এমন সময় একদল সাঁওতাল পুরুষ আর একটা জোয়ান মেয়ে এসে হাজির। মেয়েটা কাঁদছে, পুরুষগুলো আস্ফালন করছে—'কেসটা', বুঝতেই তো পারছ কিসের কেস। ওসব অঞ্চলে এসব হামেশাই চলচে—এক-রকম অরাজক মুল্লুক বললেই চলে। কিন্তু আমার সুবিধেই হয়ে গেল। বুঝলুম, ভগবান পাইয়ে দিলেন, বাদলার সন্ধ্যেটি বৃথা যাবে না। বললুম, মেয়েটা আজ থানায় থাকবে, জেরা-টেরা করে ব্যাপারটা ঠিক-ঠাক জেনে নিয়ে রিপোর্ট করব। বোকা সাঁওতালের দল তো, মেয়েটাকে রেখে তখনি সুড়সুড় করে সরে পড়ল। জমাদারকে দিয়ে হাঁড়ি তিনেক তাড়ি আনালুম, কাছাকাছি আবার মদের দোকান নেই। কপালগুণে এক ইন্‌স্‌পেক্টার সেদিন এসে পড়েছিলেন, সাক্ষাৎ ঘুঘু লোকটি। ভালো করেই অতিথি-সৎকার করা গেল, আমিও প্রসাদ পেলুম। যাওয়ার আগে ইন্সপেক্‌শন বইতে লিখে গেলেন, এমন যোগ্য সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার এ জেলায় একটিও নেই।

—আর মেয়েটা? পরের দিন কিছু বললে না?

—নাঃ, স্রেফ চেপে গেল। পুলিস নয় তো স্বয়ং ভগবান। তার বিপক্ষে কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজেরই মরণ ডেকে আনা কি না!

গমু মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, চমৎকার দেশ! ওসব দেশে থেকেই না আরাম! আর আমাদের এ দেশে লোকগুলো সব পেল্লায় চালাক হয়ে আছে, ধড়িবাজের একশেষ। হারান শীলের মেয়েটার দৌলতে সেবার আমার জেলে যাবার যোগাড় হয়েছিল জানো তো?

কিন্তু প্রসঙ্গটা আপাতত এই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই বাহিরে কিসের একটা গোলযোগ চলিতেছিল, সে কলরবটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মদের দোকানে এরকম চীৎকার বিশেষত হাটের দিনে—কিছু পরিমাণে হইয়া থাকেই কিন্তু

যেন তাহারও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। মারামারির উপক্রম একেবারে।

ব্যাপারটা কম হইয়াও কম নয়।

ওদিকে মানিক ভুঁইমালীর দল, এদিকে বেদে-সম্প্রদায়। মদের ঝোঁকে বেসামাল হইয়া মানিক একটি বেদেনী মেয়ের কাপড় ধরিয়া টানিয়াছিল, কী একটু ইঙ্গিতও করিয়াছিল হয়তো। কিন্তু বেদেরাও সেই জাতের—জীবনকে যাহারা একটা রঙীন বুদ্বুদের চাইতে বড় বলিয়া মনে করে না। মুহূর্তে 'বেবাজিয়া'র দল গর্জিয়া উঠিল, সেই মেয়েটা কাপড়ের মধ্যে হাত পুরিয়া ঝাঁ করিয়া একটানে ষোল ইঞ্চি ফলার একখানা ঝকঝকে ছোরা বাহির করিয়া বসিল! মানিক ভুঁইমালীর উদ্যত রসিকতা ছোরা দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু ভুঁইমালী সম্প্রদায়ের রক্তেও ততক্ষণে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত নামধেয় ব্যক্তিটি মাটিতে একটা লম্বা গড়ান দিয়া "জয় কালী" বলিয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল এবং তাহার পরেই বিচিত্র ভঙ্গিতে দুই হাঁটুতে তাল ঠুকিয়া বলিল, চলে আয়, চলে আয় ব্যাটারা। এক একটা মুষ্কি কষিয়ে মুখগুলো চ্যাপ্টা বানিয়ে দিই তোদের।

ক্যাব্‌লা—সেই একটু আগেই যাহার স্কন্ধে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'র ভর হইয়াছিল, অকস্মাৎ গঙ্গার পরিবর্তে সাক্ষাৎ মহিষ-মর্দিনী তাহার কাঁধে চাপিয়া বসিলেন।

—কে রে ব্যাটা মহিষাসুর। দেখছিস্ না অসুর নিপাত করতে স্বয়ং মা দুগ্‌গো পৃথিবীতে অবতীর্ন হয়েছি! এক-একটাকে ধরবো আর কচকচ করে গলা কাটবো।

বেদেরা কিন্তু নেশায় চুরচুরে হইয়া ওঠে নাই, তাহারা লুঙ্গি মালকোঁচা করিয়া আঁটিতে লাগিল। একজন সামনের লোকটির হাতে পাকা একখানা বাঁশের লাঠি আগাইয়া দিল এবং দুই তরফ হইতেই অশ্লীল গালাগালি পর্দায় পর্দায় চড়িতে লাগিল।

জানালা হইতে এইবার গনু মিঞা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

—এই হতভাগা মানকে, কী শুরু করলি ওখানে?

মানিক থমকিয়া দাঁড়াইল, গনু মিঞার সে প্রজা। 'দয়া হল না মা কালী' বলিয়া পণ্ডিত ধুলার উপরে আবার একটা গড়ান দিল এবং ক্যাবলা 'বম্' বলিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

হাতে একখানা ছোট বেত সর্বদাই থাকে, সেইটা লইয়া টলিতে টলিতে গনু মিঞা বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার জমিদারী মেজাজ খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। এই হাটে তাঁহার তিন-আনী অংশ আছে, সেদিক দিয়া তিনি হাটের একজন মালিক বটেন।

গনু মিঞা বেতখানা হাতে লইয়া একেবারে ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামকমল অগ্রসর হইলেন না, এসব ব্যাপারে খামোকা মাথা গলাইতে নাই। কে জানে কোন্ ব্যাটা হয়তো বা হুট করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের গায়ে হাতই বা তুলিয়া বসিল! তা

ছাড়া ভূতপূর্ব দারোগা, এককালে জাতি-সাপ থাকিলেও বর্তমানে ঢোঁড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কিল খাইলে বর্তমানে মুখটি চুন করিয়া সেটি চুরি করিয়া যাইতে হয়, টু শব্দটি করিবার যদি জো থাকে!

কিন্তু নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রক্ত যতই গরম হোক, জমিদারের পরাক্রম তাহারা জানে। একটু মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেই বিঘা-প্রমাণ ধানের জমি এবং মাথা গুঁজিবার হোগলার চালাটুকু বাকি খাজনার দায়ে সাত দিনের মধ্যেই 'সরকারে' খাস হইয়া যাইবে। সুতরাং—

নমঃশূদ্রের দল শশব্যস্ত হইয়া সেলাম করিল, মানিক হাত কচলাইয়া বলিল, আজ্ঞে না হুজুর, এই বিশেষ কিছু নয়, সামান্য—

গন্নু মিঞা মাটিতে লাঠি ঠুকিয়া কহিলেন, না, কোন গোলমাল নয় এখানে। দু ঘণ্টা ধবে তো সব এখানে বসে মদ টানছ, সরে পড়ো এবার, যা—ও—।

মাতাল বা যাই হোক, জমিদার তো বটে। নমঃশূদ্রেরা উঠিয়া পড়িল, আর কোথাও গিয়া বসিবে। দুই-তিনটা বোতল লইয়া গেল তাহারা। কেবল পণ্ডিত সটান হইয়া পড়িয়া রহিল, টানাটানি করিয়া তাহাকে নাড়ানো গেল না। সে শুধু সংক্ষেপে মন্তব্য করিল, আমি পাখি নই ব্যাটা, স্বয়ং হিমালয়। আমাকে ঘাঁটিসনি, নাড়তে পারবিনে।

বেবাজিয়ারা পরম অবজ্ঞায় হাসিল এবং যেন কিছু হয় নাই, এইভাবে অতি সহজেই প্রশান্ত হইয়া আসিল। যে লাঠি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, সে লাঠি ফেলিয়া একটা নতুন বোতল লইয়া বসিল এবং মেয়েটিও যথানিয়মে দলের সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল।

শান্তিস্থাপন করিয়া মত্ত মাতঙ্গের মতো হেলিয়া দুলিয়া গন্নু মিঞা আবার দোকানে আসিয়া ঢুকিলেন।

…ইহাও সমাজ এবং সমাজের একটা দিক! মূল্য যে ইহার কম, সে কথা কিছুতেই জোর করিয়া বলা চলে না। জীবনে বৃহত্তর আনন্দ-আস্বাদনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত, নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্য হইতে অনাবশ্যক, অথচ উন্মাদনার রস তাহাদের নিংড়াইয়া লইতে হয়। জীবন তাহাদের বিস্বাদ, জীবন-নিংড়ানো এ রসটাও তাই সুস্বাদু নয়। অথচ, এ ছাড়া তাহারা বাঁচিবেই বা কী করিয়া? নেশা না হইলে মানুষ তো বাঁচিতে পারে না, তাই নানা দিক হইতে এই অপরিহার্য বস্তুটি তাহাকে সঞ্চয় করিতে হয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, রেস এবং হুইস্কি, সাহিত্য এবং শিল্প সব কিছুর মধ্য হইতেই সেই মাদক রসটি ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার বর্ণে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গন্ধে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে নিখিল মানবের মন।

এই নিখিল মানবসমষ্টির তাহারাও এক-একটি অংশ, এই আনন্দের রঙে তাহারাও

রাঙিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু সুযোগ অল্প, পরিসর আরও অল্প। নিজেদের বুকের রক্তে পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহারা পান করে, অথচ পূর্ণপাত্র ওষ্ঠাগ্রে ধরিয়া মদের পরিবর্তে তাহারা নিজেদের আয়ুই যে নিঃশেষ করিয়া চলিয়াছে, এ কথা অহাদের কে বুঝাইবে?

জীবন বলিতে তাহারা কী বোঝে, বাঁচিবার অর্থই বা তাহাদের কাছে কতটুকু? স্বর্ণপ্রসূ বসুন্ধরা মাটির ভাণ্ডারে তাহাদের জন্য সঞ্চয় রাখিয়া দিয়াছেন, কাদা মাখিয়া বুকের রক্ত জল করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই নিভৃত ভূমি-ভাণ্ডারটি হইতে তাহারা রত্ন খুঁড়িয়া তোলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিনের শেষে যখন জীর্ণ ক্লান্ত দেহে তাহারা দীর্ণ-কুটিরে ফিরিয়া আসে, তখন তাহাদের রিক্ত পর্ণপুটে ভরিয়া আনে দারিদ্র্য, ভরিয়া আনে বুভুক্ষা, ভরিয়া আনে রাশীকৃত বঞ্চনা। তারপর সেই বঞ্চনার আঘাতটাকে ভুলিবার জন্য তাহারা তাহাদের সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফেরে তাড়ির দোকানে, কণ্ঠ-প্রদাহী বিষাক্ত তীব্রতায়। এতবড় বিয়োগান্তও তাহাদের জীবনে কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ হাটের মধ্যে কিসের একটা গোলযোগ শোনা গেল। মনে হইল, হঠাৎ যেন সমস্ত মানুষগুলিই একসঙ্গে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; যেন ঝড়ের ঝাপটা লাগিয়া বিশাল অরণ্য মর্মরিত হইয়া উঠিল, যেন ডালে পাতায় প্রমত্ত আঘাত বাজাইয়া শোঁ শোঁ করিয়া বৈশাখী ঝড় ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঝড়ের সংঘাতে প্রকৃতির রাজ্যে যত হাহাকারই জাগুক না কেন, সচেতন মানুষের অসহায় মূঢ় কলরবের তুলনা কোথায় মিলিবে?

কালীপদ নিশাচরের মতো দুইটি তীক্ষ্ণ চোখ একবার বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল, তাহার গালে কপালে গোটা কয়েক সন্দিগ্ধ এবং আঁকাবাঁকা কুটিল রেখা পড়িয়াছে। তারপর গমু মিঞার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, দেখেছেন ব্যাপারটা? আবার আজও এসেছে।

গমু মিঞার নেশাটা তখন আরো গাঢ় হইয়া আসিতেছে। জড়াইয়া জড়াইয়া তিনি কহিলেন, কী ব্যাপার? কে এসেছে?

—আসবে আবার কে? আপনার ইস্কুলের ওই প্রফুল্ল মাস্টার আর তার দলবল আর কি।

রামকমল চমকিয়া উঠিল: প্রফুল্ল মাস্টার এসেছে—আবার দলবল নিয়ে! কেন, ফিষ্টি করবে নাকি? পাঁঠা কিনতে এসেছে?

—হাঃ, পাঁঠা কিনতে না হাতি! কালীপদর কণ্ঠস্বরে রাজ্যের বিরক্তি এবং বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল: এসেছে তো আপনাদের আর আমার সর্বনাশ করতে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কী বলছে শুনছেন না? মদ খেয়ো না, জমিদার তালুকদারকে খাজনা দিয়ো না, আরো কী সব, যান না—দু পা গেলেই তো শুনতে পাবেন।

—মানে-মানে? জমিদারকে খাজনা দিতে নিষেধ করছে প্রফুল্ল মাস্টার? আমার

ইস্কুলে মাস্টারি করে এতখানিই বাড় বেড়েছে তার ?

গন্থু মিঞা কথাটাকে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না।

—শুনতে চান তো নিজেই যান না। আবার সেই স্বদেশীর ব্যাপার শুরু করেছে আর কি। দুদিন বাদে যদি ফের মদের দোকানে এসে পিকেটিং শুরু করে, তা হলে আমরা দাঁড়াব কোথায় বলুন ? আপনাদের আশ্রয়ে আছি বলে না খেয়ে মরব নাকি ?

—বটে !

ছড়িখানা লইয়া গন্থু মিঞা আর একবার বাহির হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, আসুন তো চাটুজ্জে মশাই, ঘটনাটা একবার দেখা যাক।

রামকমল সাহস পাইলেন। এবার আর নমঃশূদ্র কিংবা 'বেবাজিয়া' নয়, ইহারা স্বদেশী এবং ভদ্রলোক। ইহাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, চিরকাল ইহারা মারই খাইয়া থাকে, ফিরিয়া মারিতে জানে না অথবা চায় না। অহিংস বলিয়াই ইহাদের উপরে সহিংস হইয়া ওঠা সব চাইতে সহজ; নিজের সুদীর্ঘ পুলিস-জীবনে এ অভিজ্ঞতা রামকমলের বার বার ঘটিয়াছে।

বাহির হইয়া গন্থু মিঞা হাঁক পাড়িলেন, মানকে, ওরে মানকে !

মানিক কাছাকাছি কোথায় ছিল, হাঁক শুনিতেই আসিয়া পড়িল।

—নেশায় তো পা টলছে দেখছি। লাঠি ধরতে পারবি ?

মানিক ভুঁইমালী হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে কালো মুখের মধ্য হইতে দুই সারি ঝকঝকে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল—কুকুরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণাগ্র ! পানের রঙে পুরু দুইটি ঠোঁটের এবং দীর্ঘ দাঁতগুলির গোড়ায় গোড়ায় ময়লা একটা আস্তরণের মতো জমিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে যেন এইমাত্র সে জ্যান্ত মানুষ সাবাড় করিয়া আসিল।

হাসিটাও নিঃশব্দ নয়। নিঃশব্দে হাসিতে সে শেখে নাই, কাতলা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখ এবং পাকা বটফলের মতো রক্তাক্ত চোখ দুইটার থেকে প্রশান্ত একটা মৃদু হাসির কল্পনা করাও যেন অসম্ভব। হাসিল না তো, যেন শুকনো ঝামা দিয়া কে একটা কালিমাখা খসখসে কড়াইয়ের পিঠ বার কয়েক ঘসঘস করিয়া প্রচণ্ড শব্দে ঘষিয়া দিল।

হাসিয়া মানিক কহিল, এতো সহজেই আমাদের পা টলে না হুজুর, বরং দু-এক পাত্তর পেটে পড়লেই আমাদের হাতে লাঠি নেচে ওঠে। মাথায় খুন না চাপলে মানুষ মারব কী করে ? কিন্তু এখন লাঠি ধরে কী করতে হবে ?

—ওই একদল স্বদেশী বাবু হাটে এসেছে না। ওদের দু-চার ঘা বসিয়ে দিবি আর কি।

—স্বদেশী বাবু ? সঙ্গে সঙ্গেই মানিক ভুঁইমালী একেবারে নিবিয়া গেল। সমুদ্র জুড়িয়া যখন ঝড় উঠিয়াছে, উত্তাল তরঙ্গবিক্ষেপে দিক্‌দিগন্ত আলোড়িত, তখন সে ঢেউয়ের

আঘাত এই নির্জন প্রবালদ্বীপেও আসিয়া বাজিয়াছে বই কি।

মানিক সসঙ্কোচে কহিল, তা স্বদেশী বাবুরা তো কোনো খারাপ কথা বলছে না হুজুর। কারো অনিষ্ট করছে না বরং—

—না—খারাপ কথা বলছে না, সত্যপীরের পাঁচালি শোনাচ্ছে সবাইকে! ঐ সব বক্তৃতে শুনে ভাবছিস বুঝি, জমিদারকে ফাঁকি দিবি! কিন্তু সে গুড়ে বালি, বুঝলি সে গুড়ে বালি। ইংরেজ রাজ্যি এখনো রয়েছে, এখনো আইন আছে, আদালত আছে। এক-একটা করে নালিশ ঠুকবো, তিন দিন বাদেই দেখবি দলে দলে ঘুঘু ভিটেয় চরে বেড়াচ্ছে তোদের।

মানিক চুপ করিয়া রহিল।

—ধর লাঠি, মারধোর না করিস, তাড়িয়ে দিবি। বলবি, বাবু, তোমাদের ওসব ধাপ্পাবাজিতে আমরা আর ভুলব না, ভালো চাও তো মানে মানে সরে পড়ো।

মানিক দ্বিধা করিয়া বলিল, আপনি একবারটি আসবেন না হুজুর?

—না, আমি এই রইলুম দাঁড়িয়ে। আমার ইস্কুলের মাস্টার কি না, দেখলে কিছু একটা ভেবে বসবে আবার। যা, এগো তুই। তিন বোতল মদের পয়সা দেব,—যা—

যেটুকু দ্বিধা আসিয়াছিল, 'তিন বোতল' কথাটা কানে ঢুকিতেই সেটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল।

—রঘুয়া রে, বলিয়া মানিক একটা হাঁক ছাড়িল, তারপর একগাছা লাঠি কুড়াইয়া লইয়া হাটের মধ্যে নামিয়া গেল।

বক্তৃতা বটে, কিন্তু সভা জাঁকাইয়া নয়, আগে হইতে ঢাকঢোল পিটাইয়াও নয়। হাটের মধ্যে অত্যন্ত সহজেই একসঙ্গে অনেকগুলি মানুষকে সম্মিলিত আকারে পাওয়া যায়, তাই সভা জমাইবার জন্য বিশেষ কোনোরকমে চেষ্টা-চরিত্র করা হয় নাই। এত দূর-দূর হইতে এতগুলি মানুষকে একত্র করা সম্ভব নয়, অসুবিধাও অনেক; খুব বেশি না হোক, খানিকটা কাজও তো অন্তত ইহাতে হয়।

কিন্তু আজ প্রফুল্ল নিজে আসে নাই, মুকুল আসিয়াছিল তাহার প্রতিনিধি হইয়া। সঙ্গে আরো তিন-চারটি ছেলে, হাটের এলোমেলো জনতাকে তাহারাই বড় বটগাছটার তলায় ভিড়াইয়া আনিয়াছিল। এই বটগাছ বস্তুটি প্রত্যেক হাটেরই বিশেষত্ব; ঝুরিনামানো সুপ্রাচীন একটি গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় একটি কালীর থান অথবা পীরের দরগা, ইহাই হাটের বারোয়ারিতলা বা কেন্দ্রস্থল।

চাষী-মজুরের মোটামুটি একটা ভিড় জমিয়াছিল ভালোই। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহাদের দুয়ারে আরো দু-একবার না আসিয়াছিল তা নয়, এবং সে তরঙ্গও তাহাদের জীবনকে কম আলোড়িত করে নাই; তাহারা সাড়া দিয়াছিল, তাহাদের সাধ্যমতোই

ঝাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ হয় নাই। অভাব-অভিযোগের শূন্য পাত্রটি হাতে লইয়া ব্যর্থ বেদনায় তাহারা ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতে সমাজের অগ্রগামী দল, এই চিরন্তন ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে, ইহাদের প্রতিটি কল্যাণ চেষ্টাকেই তীক্ষ্ণ সন্দেহে বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া কাজের কথা তো কেউ তাহাদের বলিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের অতি-বাস্তব দুঃখ-বেদনার কাহিনী তো কেউ এমন করিয়া তাহাদের কোনো দিন শুনাইতে আসে নাই। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সহসা একটা অতি রূঢ় চিৎকারে সমস্ত ব্যাপারটারই যেন সুর কাটিয়া গেল।

মানিক ভুঁইমালীর দল হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল সভার মধ্যে—সভা ভাঙিয়া দিবে তাহারা। একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা কোথা হইতে বন্যার মতো আসিয়া সবকিছু ভাসাইয়া লইয়া গেল। অবাক বিস্ময়ে মুকুল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সঙ্গী যে দুই-চারিটি ছেলে অগ্রসর হইয়া গোলমাল থামাইবার চেষ্টা করিল, তাহাদের ঘাড়েও দু-চার ঘা লাঠি না পড়িল, তা নয়।

মুকুল বিব্রত হইয়া বলিল, আহা-হা, তোমরা গোলমাল করছ কেন? মারামারির কী হয়েছে?

জনতা গর্জন করিয়া উঠিল। তিমির-তীর্থের নিবিড় অন্ধকারে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মৃত্যুর জারকরসে যাহারা জীর্ণ হইয়াছে, এই মুহূর্তে কি উদয়-দিগন্তে তাহারা নতুন উষার স্বর্ণদ্বারের উন্মোচনী দেখিতে পাইল? নবজীবনের আনন্দ-স্পন্দনে তাহাদের বেদনাহত মৃত্যুকল্প প্রহরগুলি কি মর্মরিত হইয়া উঠিল?

কে একজন চাৎকার করিয়া উঠিল, ব্যাটারা মদ খেয়ে মাতলামো করতে এসেছে এখানে! ঘাড় ধরে বের করে দাও হতভাগা বদমায়েশদের।

ভিড়ের মধ্যে মানিক ভুঁইমালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার ছয় হাত লম্বা একখানা লাঠি—সেখানা সে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল, ঘাড় ধরে বের করে দেবে! কার বুকের পাটা আছে, এগিয়ে এসো।'

জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। মানিক ভুঁইমালীকে তাহারা চেনে। মদে এবং গুণ্ডামিতে সে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সুযোগ পাইলে ডাকাতি করিয়া থাকে—এমনও জনশ্রুতি আছে। তাই দূর হইতে সরিয়া তাহারা যথেচ্ছ গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, আগাইয়া আসিল না।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই—

কোথা হইতে "বেবাজিয়া"র দল আসিয়া মাথা গলাইল। মারামারির ব্যাপার দেখিলে রক্ত তাহাদের মাতাল হইয়া ওঠে, বৈচিত্র্যহীন জীবনটাকে তাহারা রক্তারক্তির আস্বাদ

দিয়া সুস্বাদু করিয়া লইতে চায়। আশ্রয়হীন মানুষের দল, স্রোতের শ্যাওলার মতো পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে ভাসিয়া চলে তাহাদের যাযাবর প্রাণ-যাত্রা, তাই এই চলচ্ছন্দে যেখানে যে ঘূর্ণিটি আসে, সেখানেই একটি পাক না ঘুরিয়া তাহারা আগাইতে পারে না। তা ছাড়া একটু আগেই এই নমঃশূদ্রদের সঙ্গে যে সংঘাতটি তাহাদের বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, সে কথাও এর মধ্যেই তাহারা ভুলিয়া যায় নাই।

"বেবাজিয়া"রা আসিয়া পড়িয়াছে। মারিতে এবং মরিতে তাহারা ভয় পায় না, ষোড়শী বেদেনী মেয়ে কালো চোখে বাঁকা বিদ্যুৎ হানিতে হানিতে যে কোনো মুহূর্তেই ষোলো ইঞ্চি লম্বা একখানা ছোরা বাহির করিয়া বসিতে পারে।

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে মানিক ভুঁইমালীর দল অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনটা তিরিশের বোতলের জন্য জীবনের মায়া তাহারা ছাড়িতে পারে না।·

···আবার বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

* * *

তারপরে ঝড় উঠিল।

শীত শেষ হইয়া আসিতেছে—পৃথিবী জুড়িয়া বসন্তের আভাস লাগিল। কাছারি-ঘরের সামনে অশ্বত্থ গাছটার ঝরিয়া-যাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল শ্যামলতা নতুন পৃথিবীর আলো মাখিয়া ঝকঝক করিতেছে, সামনে মেটে পথটা হইতে একটু একটু ধুলা উড়িতেছে আজকাল। একটু দূরেই খালের ধারে তিন-চারটি পত্রহীন শিমূলের গাছে যেন রক্তের ছোপ ধরিয়াছে।

রাসু সেন ফরাসে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও কেমন একটা বিবর্তন আসে সম্ভবত। দলিলপত্র এবং সেক্রেটারির কর্তব্য,—ইত্যাদি সব কিছুকে ডিঙাইয়া তাঁহার মন একটা অকারণ খুশীতে ভরিয়া উঠিতেছিল। তা, ইস্কুলটার ইহারই মধ্যে বেশ উন্নতি হইয়াছে কিন্তু। ছেলেগুলার দুরন্তপনা কমিয়া গিয়াছে, কোমর বাঁধিয়া পল্লী সংস্কারে লাগিয়াছে তাহারা। কলাবাড়িয়া হইতে আসিবার পথটা এক জায়গায় অনেকখানি ভাঙিয়া নামিয়াছে, বর্ষার সময় সেখান দিয়া আড়িয়ল খাঁর জল কলকল করিয়া ছুটিয়া যায়, পারাপারটা রীতিমতো বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা কোদাল লইয়া ছুটির দিনে সেখানে বাঁধ বাঁধিতে গিয়াছে। ফুটবল টিমটা ভালো হইয়া উঠিতেছে, উজিরপুর হইতে এবার কাপ জিতিয়া আনিতে পারিবে আশা হয়। মাহিলাড়ার খালে কী অসম্ভব কচুরিপানাই জমিয়াছিল, প্রাণপণে তিনখানা লগি ঠেলিয়াও এক-মাল্লাই নৌকা তিন হাতের বেশি আগাইতে পারিত না। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের কাছে বিস্তর লেখালেখি করিয়াও কোনো ফল হয় নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কী ব্যাপারটাই না প্রফুল্ল করিয়া ফেলিল। দু মাইল আন্দাজ কচুরিবন প্রায় পরিষ্কার, উঁচু

রাস্তার পাশে পাশে স্তূপাকারে তাহারা জমিয়া আছে।

রাসু সেন গড়গড়া টানিতে টানিতে ভাবিতেছিলেন, আগামী মিটিঙে প্রফুল্লের বেতন কিছু বাড়াইয়া দেওয়া চলে কি না! পঁয়তাল্লিশ টাকায় কোনো ভদ্রসন্তানের ভদ্রভাবে চলা অসম্ভব। প্রেসিডেন্টকে একটু অনুরোধ করিতে হইবে। আর তিনি তো নিজেই ইস্কুলের সেক্রেটারি, যা করিবেন তাহার উপর কথা কহিবে, এমন দুঃসাহস এই বাসুদেবপুর নলসিঁড়ি বা চণ্ডপাশা গ্রামে কাহার আছে?

কিন্তু এমন হিতচিন্তায় সহসা বাধা পড়িয়া গেল।

ভূতপূর্ব দারোগা রামকমল চাটুজ্জে এবং পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি স্থরেন মজুমদার কোথা হইতে উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া হাজির। রামকমলের ইঁদুরের মতো শুকনো ছোট মুখখানি এক ধরনের ভয়ে আর উদ্বেগে ছুঁচোর মতো লম্বা হইয়া গিয়াছে, সুরেন মজুমদারের লাল টুকটুকে ফুলো গাল দুটি আরো ফুলিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন দুই গালে তিনি দুইটি কয়েতবেল পুরিয়া আসিয়াছেন।

রাসমোহন আপ্যায়ন করিয়া কহিলেন: আসুন, আসুন। তারপর, এই সকালেই কী মনে করে? ওরে কানাই, আর দু পেয়ালা চা—

কিন্তু অভ্যর্থনা করিবার দরকার ছিল না। তাঁহারা নিজেরাই আসিয়া জাঁকাইয়া বসিলেন এবং এই সুমধুর আতিথ্যের বিনিময়ে যে কয়টি কথামৃত তাঁহারা বর্ষণ করিলেন, তাহাতে রাসু সেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। যেন চড চড় করিয়া একরাশ ইট-পাটকেল সম্পূর্ণ বিনা নোটিশেই তাঁহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

কথা কহিলেন সুরেন মজুমদার। অবশ্য বলিবার জন্য রামকমলই বেশি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু ডেপুটির সামনে দারোগা এতখানি ধৃষ্টতা করিবেন তাহার জো কি!

—বসব তো মশাই, কিন্তু তার আগে যে গোষ্ঠীসুদ্ধ জেলে যেতে হচ্ছে, বলি সে খবরটা রাখেন? হাতকড়া, হুঁ হুঁ—হাতকড়া চেনেন?

রাসু সেন চমকিয়া বলিলেন, তার মানে?

—মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। খেজুর রস চুরি করবে, গুণ্ডামি করবে, ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে শেয়াল ডাকবে, তখন তো ভারি প্রশ্রয় দিলেন এ-সবের। এখন বুঝুন ঠেলা! হেড মাস্টার, সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, কমিটি—মায় ইস্কুলকে ইস্কুল এবার শ্রীঘর ঘুরে আসুন।

সেক্রেটারি বিবর্ণ হইয়া কহিলেন, এসব আপনি কী বলছেন?

—যা বলছি তা ভয়ানক কথা। আপনার হেড মাস্টারটি তো আর সোজা নয়—এক নম্বর পলিটিক্যাল গুণ্ডা। দেখছেন?

সুরেন মজুমদার পকেট হইতে খরখর করিয়া একখানা হলদে কাগজ বাহির করিয়া রাসু সেনের নাকের সামনে মেলিয়া ধরিলেন: পড়ুন পড়ুন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ার্নিং। লিখেছেন, মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে যে বাসুদেবপুর ইস্কুলে সম্প্রতি লেখাপড়ার চাইতে রাজনীতির চর্চাই পুরোদমে চলছে। বলা বাহুল্য, জিনিসটা নির্দোষ নয়। সুতরাং অবিলম্বে যদি এ সব বন্ধ না হয়, তা হলে সরকার বাহাদুর এজন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আর সেই সঙ্গে এই মর্মে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপরও কোনো রকম সভা-সমিতি নিষেধ করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হল:

ইহার নিচেই একসারি নাম। রাসমোহন দেখিলেন তিনি নিজেও সে তালিকার বাহিরে পড়েন নাই।

রাসু সেন সভয়ে বলিলেন, এ তো সর্বনেশে ব্যাপার মশাই! গ্রামের উন্নতির জন্য কতগুলো ভাল কাজ হচ্ছে, ছেলেরা খাটছে আপ্রাণ, এমন একটা পাবলিক ওয়েলফেয়ার কি-না অপরাধ হয়ে গেল!

সুরেন মজুমদার কিছু বলিবার আগেই রামকমল ফস করিয়া কথাটা তুলিয়া লইলেন, রাখুন আপনার পাবলিক ওয়েলফেয়ার! ওসব পাবলিক ওয়েলফেয়ার আসলে যে কি, গবর্ণমেণ্ট সেটা বেশ বোঝে। এ আর কিছু নয় মশাই, সেরেফ বোমা-পিস্তলের কারবার, নইলে—

—বোমা-পিস্তলের ব্যাপার! হতেই পারে না।

সুরেন মজুমদার ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, তা আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখন পনেরো দিনের নোটিশে হেড মাস্টার তাড়াবেন কি না, জানতে চাই। যদি না তাড়ান, তা হলে শ্রীঘরের জন্যে তৈরি থাকুন।

রাসু সেন জড়াইয়া জড়াইয়া কহিলেন, তা হলে প্রেসিডেণ্টকে একটা খবর—

রামকমল সাগ্রহে বলিলেন, গমু মিঞাকে? তাঁকে আর খবর দিতে হবে না, তিনিই আমাদের খবর পাঠিয়েছেন। আপনি বরং এখুনি হেড মাস্টারকে ডেকে—

রাসু সেন বিপন্ন মুখে বলিলেন, কোথায় হেড মাস্টার? তিনি তো মাহিলাড়ার খালে কচুরিপানা সাফ করতে গেলেন সকালবেলা—

—আর কচুরিপানা সাফ করতে গিয়ে সকলের পরকালও সাফ করে ফেললেন। এখনি তাঁকে ডাকতে লোক পাঠান, তারপর এক মাসের মাইনে দিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করুন। আমরা ছুটলুম অন্যান্য মেম্বারদের কাছে, দেখি তাঁরা কী বলেন!

দারোগা এবং ডেপুটি যেমন ঝড়ের মতো আসিয়াছিলেন, অদৃশ্য হইলেনও তেমনি ঝড়ের মতোই; কিন্তু সেক্রেটারিকে তাঁহারা রাখিয়া গেলেন দারুভূতমুরারি করিয়া। না

পারিলেন তিনি নড়িতে, না পারিলেন চড়িতে। গড়গড়ার দামী বিষ্ণুপুরী তামাকটা অনাদরেই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

যথাসময়ে খবরটা পাইল সকলেই।

মুকুল আসিল, নন্তু আসিল, পাড়ার আরো পাঁচ-সাতটি ছেলে আসিয়া জুটিল। রবি আসিতে পারে নাই, সে নাকি পেটের অসুখে শয্যাগত হইয়া আছে। এতদিন ধরিয়া যে প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাকে পণ-বদ্ধ করিয়া লইয়াছিল, সেই সংগঠনার অর্ধেকটাও অগ্রসর হইতে-না-হইতেই তাহাদের উপর দারুণ দুর্দিন নামিয়া আসিল। একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষার সামনে দাঁড়াইয়া আজ তাহাদের ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করিয়া লইতে হইবে। সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহার পরিণতি যে কী দাঁড়াইবে, সেটা অনুমান করাও খুব বেশি অসম্ভব নয়। তবু পিছাইলে তো চলে না, যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে, তখন মৃত্যু পর্যন্ত কামানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলাই সৈনিকের ধর্ম।

প্রফুল্ল বলিল, ইস্কুল কমিটি আমাকে পনের দিনের নোটিশ দিয়েছেন। যেদিক থেকেই হোক, চলে আমাকে যেতে হবেই এবং তার জন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত।

মুকুল চিন্তিত হইয়া কহিল, তা হলে কয়েকদিনের মধ্যেই বড় মিটিংটার বন্দোবস্ত করতে হয়।

প্রফুল্ল বলিল, তা বই কি। কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ আছে, এর ফলে অনেককেই সরকারের অতিথি হতে হবে। সেই জন্যেই আপাতত আপনাকে এই ব্যাপারের বাইরে থাকতে হবে মুকুলবাবু। এর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কাজের প্রোগ্রাম যাতে নষ্ট না হয় সে দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

নন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল। চিরদিন ধরিয়া তাহাকে সকলে অপব্যয়ের খরচেই হিসাব করিয়া আসিয়াছে, তাই এই মুহূর্তের বিচারহীন ভাবচঞ্চল আত্ম-অপচয়ে সে অনায়াসে অগ্রণী হইতে পারিয়াছে। শিক্ষা তাহার প্রচুর নয়, তাই সে রবির মতো তর্ক করিতে পারে নাই, বুদ্ধির পরিমিতি তাহার সঙ্কীর্ণ, তাই বিচারের কুয়াশায় নিজের দৃষ্টিকে সে সমাচ্ছন্ন বোধ করে নাই।

নন্তু কহিল, আমি চললুম। নমঃশূদ্র আর বৈরাগীদের খবরটা দিচ্ছি, ওখান থেকে একবার মুসলমান-পাড়ার দিকেও যেতে হবে। গমু মিঞা নাকি গবর্ণমেণ্টের নাম করে আমাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কাজেই আজ থেকে ওদের একবারটি নাড়াচাড়া দিয়ে আসা দরকার।

নন্তু দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু নীলিমার কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হইল। স্পষ্ট করিয়া বিশেষ কিছু সে যে বুঝিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আকাশ-বাতাসে যে ঝড় মেঘে মেঘে কালো হইয়া আসিয়া নামিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, নিতান্ত অনায়াসেই সে তাহা টের পাইয়া গিয়াছে।

আর তাহারই বিদ্যুৎ-চমক রাসু সেনের মুখে।

যৌবনে তিনি নাকি এ অঞ্চলের ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন, তাঁহার বারোখানা ছিপ রাত্রির ঘন অন্ধকারে আড়িয়ল খাঁয় ডাকাতি করিয়া বেড়াইত; কিন্তু এ বয়সে তাঁহাকে দেখিয়া সে কথা কল্পনাও করা চলে না। সরল, পরোপকারী, ইস্কুলের সেক্রেটারিত্ব লাভ করিয়া এমন স্বসম্পূর্ণ হইয়াই আছেন যে কাহারো বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ অবধি তাঁহার নাই। কিন্তু আজ তাঁহার এ কি ভাবান্তর ঘটিল! নীলিমা আন্তরিক বিস্মিত হইয়া গেল।

প্রফুল্ল তাহাকে যে বইখানা দিয়াছিল, সে বইখানা সে আগাগোড়া পড়িয়াছে। নিজের সমস্ত বুদ্ধি, এতদিনের অনাদৃত সমস্ত শক্তিকেই সংহত করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। কতটুকু বুঝিয়াছে, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টাতে ত্রুটি করে নাই এবং প্রফুল্লের সম্বন্ধে তাহার যে মনোভাব, এ উপলক্ষে সে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন তাহার ঘটে নাই; শুধু এইটুকু সে বুঝিয়াছে—প্রফুল্লকে সে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, প্রফুল্ল সেভাবে তাহাকে দেখিতে চায় না।

ভাবিল: একটিবার সে প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা করিয়া আসে, কিন্তু সুযোগও পাইল না, অবসরও মিলিল না। তারপর এক সময় সুযোগ সে নিজেই করিয়া লইল। কাজটা দুঃসাহসিক কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

রাত্রি গভীর—বড় বাড়ির উপর দিয়া প্রসুপ্তির নিশ্চিন্ত প্রশান্তি! নীলিমা বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া হাতড়িয়া হাতড়িয়া সে নিচে নামিয়া আসিল। প্রফুল্ল এখনও ঘুমায় নাই। তাহার টেবিলে বাতি জ্বলিতেছে, কি লিখিতেছে সে। নীলিমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সোজা তাহার জানালাটার সামনে দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল চমকিয়া উঠিল। মানুষের সাড়া পাইবামাত্র তাহার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে?

নীলিমা সভয়ে ফিসফিস করিয়া কহিল, চেঁচাবেন না, আমি।

—আপনি! প্রফুল্ল চোখ মুখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলেন?

সে কথার জবাব না দিয়াই নীলিমা বলিল, আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন?

এই মুহূর্তে নীলিমাকে এমন অপরূপ এমন অপূর্ব সুন্দরীই মনে হইতেছে! জানালায়

গরাদ ধরিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, বাহিরে অন্ধকারের পটভূমিকা, ঘরের আলো হইতে খানিকটা দীপ্তি তাহার মুখে পড়িয়া সেই মুখখানাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ভীত উদ্বিগ্ন আর্ত তাহার দৃষ্টি।

—হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সে তো আপনি জানেনই। তা জানবার জন্যই এত রাত্রে এসেছেন নাকি?

—আবার কবে আসবেন? আবেগে নীলিমার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

—জানিনে। খুব সম্ভব আর কোনোদিনই আসবো না।

—মানে?

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, কারণ প্রথমত কিছুদিনের জন্যে যেতে হবে সরকারের অতিথি-শালায়। সেখান থেকে যদি নিরাপদে বেরোতে পারি, তা হলেও শেষ পর্যন্ত টানে টানে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছব তা আগে থেকেই কী বলতে পারি, বলুন?

নীলিমা হঠাৎ গরাদের উপর আরো বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। গরাদে না থাকিলে হয়তো আরো অনেকখানিই সে করিয়া ফেলিতে পারিত। প্রফুল্লের সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু হাতখানা সে ছাড়াইয়া নিতে পারিল না।

—আপনি যেতে পারবেন না, কিছুতেই না। আমি যেতে দেব না আপনাকে।

বিপন্ন হইয়া প্রফুল্ল বলিল, এ কি ছেলেমানুষি আরম্ভ করলেন আপনি! না গেলে চলে! পনেরো দিনের নোটিশ পেয়েছি, চাকরি শেষ হয়ে গেছে—

—ওসব আমি কিছু বুঝিনে—নীলিমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল: আপনি যাবেন না, তা হলে আমি কিছুতেই বাঁচব না।

—আপনি কাঁদছেন নাকি! এমন পাগল তো দেখিনি!

নীলিমা জবাব দিল না, কাঁদিতেই লাগিল। তাহার শ্যামল মুখখানি বাহিয়া চোখের জল পড়িতেছে, কান্নার বেগে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিতেছে, মুখের উপর দুখানি হাত চাপিয়া সে কান্নার আবেগ রোধ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

প্রফুল্ল যে কী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, ভাবিয়া পাইল না। ধীরে ধীরে সে জানালার কাছে সরিয়া আসিল, নীলিমার মাথার উপর হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, শান্ত হোন, যা ঘটবেই তার জন্যে বিচলিত হয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে।

জলভরা চোখ তুলিয়া নীলিমা তাহার দিকে তাকাইল।…

শুক্লা ওদিকে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তপনদা তাহার কাছে ধরা দিল বটে,

কিন্তু সেজন্য নিজেকে সে এতটা অপরাধী মনে করিল কেন? সেই হইতে সে অদৃশ্য হইয়াছে, আর এদিকে পা বাড়ায় না। কিন্তু এ ধারণা তাহার কেমন করিয়া জন্মিল যে শুক্লাকে সে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে? তাহাকে ভাঙিতে পারা-না-পারা অনেকটা তাহার নিজের দৃঢ়তার উপরেই নির্ভর করে না? আর ধ্বংসের অর্থ যে সকলের কাছে এক হইবে, তাহারই বা কি মানে আছে?

কিন্তু তপনদা কবি, তপনদা আইডিয়ালিস্ট। ভাবের প্রেরণায় মন যাহাদের চলে, জীবনকে ব্যাখ্যা করে তাহারা কল্পনার অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়া; অল্পে আহত হয়, অল্পে খুশি হইয়া উঠে। কিন্তু এমন স্পর্শকাতর মন লইয়া তো বস্তু-পৃথিবীতে চলে না। তপনদাকে সে কি এই মাটির পৃথিবীর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না, নিজের শক্তির উপর এতটুকু বিশ্বাস তাহার নাই?

শুক্লা বড় আয়নাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যিই সে রূপবতী,—একথা বিনয় করিয়াও অস্বীকার করা যায় না। কিছুদিন আগেই অসুখ হইতে উঠিয়াছে। শরীর সবটা না সারিলেও যেটুকু পাণ্ডুরতা আছে, তাহাতে সৌন্দর্য যেন বাড়িয়াই গিয়াছে। যৌবন যাহাকে বলা যায়, সে বস্তু তাহার পূর্ণাঙ্গ শরীরের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, উপচাইয়া পড়িবার অপেক্ষা মাত্র। শুক্লার হঠাৎ মনে হইল, রূপ তাহার তীব্র, আগুনের মতো উজ্জ্বল। তপনদার ভয় পাওয়া হয়তো আশ্চর্য নয়। শুক্লাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজেকেই সে রক্ষা করিল নাকি?

এদিকে মিটিংয়ের কথাটা দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাইতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিল। জাতির বর্তমান অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতা করিবে প্রফুল্ল। দেশকে যাহারা ভালবাসে, মানুষের মতো করিয়া যাহারা বাঁচিতে চায়, অন্নবস্ত্রের সমস্যায় যাহারা কাতর, তাহাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়: জীর্ণ কুটিরের মধ্যে যাহাদের নিষেধ-ভাঙা বৃষ্টির জল ঝরঝর করিয়া পড়ে, পৃথিবীর রাশি রাশি প্রাচুর্যের মধ্যে উপবাস যাহাদের দৈনন্দিন; যাহারা নিজেদের রক্ত ঢালিয়া পরের জন্য ক্ষেত্র ভরিয়া সোনার ফসল উৎপাদন করে, যাহাদের হাড়ের পাহাড় স্তূপাকার হইয়া এই আলো-উৎসব মুখরিত বিংশ শতাব্দীকে গড়িয়া তুলিল, আজ তাদের সংঘবদ্ধ হইবার, একত্র হইবার পরমতম প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের মুখে সাড়া দিবে না এমন কে আছে।

গ্রামের বিভিন্ন স্নায়ু-কেন্দ্রে এই কথাগুলি বিভিন্ন রকমের স্পন্দন জাগাইল।

রসময় কহিল, গ্রামে কিসের একটা মিটিং হবে শুনেছিস রে?

শশিকান্ত পান চিবাইতেছিল, ফিক করিয়া খানিকটা পিক ফেলিয়া বলিল, অমন কত মিটিং শহরে হামেশাই হচ্ছে। আমি যখন বরিশালে দরজির দোকানে কাজ করতুম, তখন

কতবার ভলান্টেরি করেছি। তোদের কাছে এসব নতুন লাগবে বটে, কিন্তু এ শর্মা ওসব বিস্তর চেটে এসেছেন, জানলি ?

টোনা হুঁ হুঁ করিয়া একটা সুর ভাঁজিতেছিল, এতক্ষণে এদিকে দৃষ্টি পড়িল তার।

—আরে কী রকমের মিটিংটা হবে বল দিকি ? মেয়েমানুষ বক্তা আসবে ? খ্যামটা কিংবা ঢপ্‌, কেত্তন হবে নাকি দু-এক পালা ?

শশিকান্ত কহিল, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করেই তুই গেলি। স্বদেশীর ব্যাপার বাবা এসব, খ্যামটা যা চলবে তা পুলিসের লাঠি। ইচ্ছে থাকলে নাম লেখা গিয়ে, দিন কয়েক সদরের জেলখানা থেকে দিব্যি ঘানি ঘুরিয়ে আসবি।

টোনা অবজ্ঞাভরে বলিল, শুঃ, আবার সেই স্বদেশীর ব্যাপার ? মেয়েমানুষ নেই, রস-কষের কারবার নেই, ওর মধ্যে কে মরতে যাচ্ছে ? আমি এখন খাসা আছি, বুঝলি ! পাঁচিকে বাগিয়েছি।

রসময় ও শশিকান্ত সমস্বরে কহিল, বটে ?

—তা না তো কি। মধু মণ্ডল বাড়িতে নেই কিনা আজকাল। কিন্তু খবরদার, কাউকে বলিসনি। মণ্ডল ব্যাটা আবার ভারি একরোখা, একবার টেরটি পেলে আর রক্ষে রাখবে না।

রসময় কহিল, পাগল, একথা বলি কাউকে ?

শশিকান্ত কিন্তু কোনো জবাব দিল না। তাহার দীপ্তিহীন চোখ দুইটা লোভে আর হিংসায় যেন জ্বলিতেছে। আচ্ছা, তোমার সময় তাহা হইলে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দুইটা দিন অপেক্ষা করো শুধু। পানে রাঙা বড় বড় দুইটা দাঁত দিয়া শশিকান্ত সামনের ঠোঁটটা কামড়াইতে লাগিল।

ওদিকে নলসিঁড়ি বাজারে খবরটা পাইয়া সনাতন ভীত হইয়া উঠিল।

কহিল, ওহে মুকুন্দ, বলে কি হে এরা ? আবার নাকি স্বদেশী কারবার শুরু হয়ে গেল গ্রামে ?

মুকুন্দ সবে তাহার মুদিখানার ঝাঁপ খুলিয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতেছিল। সনাতনের প্রশ্নে সে মন্ত্র তাঁহার ভুল হইয়া গেল। কহিল, তাই তো শুনছি।

সন্ত্রস্ত হইয়া সনাতন কহিল, তবে তো ভয়ানক কথা হল। আবার কি বিলিতী বয়কট আর দোকানে দোকানে পিকেটিং করে বেড়াবে নাকি ?

মুকুন্দ আশ্বাস দিয়া কহিল, কিন্তু তোমার ভয় কী তাতে ? নাকের সামনে তো স্বদেশী বস্ত্রালয় নাম দিয়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়েই রেখেছ।

—গোল্লায় যাক তোমার সাইনবোর্ড। ওটা সামনে ঝুলিয়েছি বলেই সব স্বদেশী মাল

ঘরে এনে মজুত করেছি, না? বলে, স্বদেশী আর স্বদেশী। স্বদেশীতে যেখানে মুনাফা হয় এক আনা, বিলিতীতে সেখানে হয় দু আনা। ম্যাঞ্চেস্টারী কাপড়ে গুদাম আমি বোঝাই করে রেখেছি, ঘরের পয়সা জলে দিয়ে অমন স্বদেশী আমার পোষায় না।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল, দেখো, এবার এসে আগুন লাগিয়ে দেবে সব।

—এঃ, আগুন লাগিয়ে দেবে? সাতশো টাকার কাপড় মজুদ আমার ঘরে, আগুন লাগানো একটা ইয়ার্কি হল আর কি? লাঠি নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকব না? যিনি এগিয়ে আসবেন, আগে তাঁকে দু-চার ঘা ঝেড়ে পরে অন্য কথা।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল, ভয় নেই ভয় নেই। এ সব আদপেই সে ব্যাপার নয়। এ চাষাভুষোদের নিয়ে কারবার, গান্ধী মহারাজ এখানে বাতিল।

—গান্ধী মহারাজ এখানে বাতিল! বলিস কি রে? সনাতন অসীম বিস্ময়ে চোখের তারা বড় বড় গোঁড়ালেবুর মতো করিয়া কহিল, গান্ধী মহারাজ নেই তো এ কেমনধারা স্বদেশী!

মুকুন্দ বিজ্ঞের মতো চোখ টিপিয়া বলিল, হালের স্বদেশীই এই রকম। তোমরা সেকেলে মানুষ, এসব বুঝবে না। গান্ধী মহারাজ ওল্‌ড-ফুল হয়ে উঠেছে আজকাল।

—ওল্‌ড-ফুল হয়েছে গান্ধী মহারাজ! সনাতন ভয়ঙ্কর রকমের একটা বীররসাত্মক ভঙ্গি করিল, তবে তো এরা কচু স্বদেশী করছে! ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই, পায়ে ধরে সাধলেও আমি নেই।

দেখিয়া মনে হইল, ওসব ব্যাপারের মধ্যে যাইবার জন্য সত্যি সত্যিই কেউ তার পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতেছে। টানিয়া টানিয়া বলিয়া চলিল, গান্ধী মহারাজ, ওরে বাবা! তিনি কি সোজা লোক নাকি! সাক্ষাৎ কলিযুগে নারদ-অবতার, ভক্তিমার্গের গুরু।

দিনকতক আগেই বাজারে লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুরের কথকতা হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এ সময় তাহার সে ভাব দেখিলে কে বলিবে, মাত্র কয়েক মিনিট আগেই স্বদেশী-ওয়ালাদের নামে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল!

আর চকিত হইয়া উঠিলেন অনাথ কবিরাজ।

বয়স তাঁহার ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জীবনটা কী ভাবেই যে কাটিতেছে। স্ত্রী মরিলেন, বিধবা মেয়েটা গর্ভবতী হইয়া আত্মহত্যা করিল, ছেলেটা কোথায় যে দেশত্যাগী হইয়া গেল, আজ পনেরো বৎসরের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলে নাই। সংসারে তিনি একা। বৈদ্যের ছেলে মূর্খ হইলে কবিরাজি করে, কিন্তু কবিরাজ-প্রধান বরিশালের গ্রামে তাহাতে করিয়া খাওয়া অসম্ভব। অনেকবার ভাবিয়াছেন, গ্রাম ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইবেন, নূতন জায়গায় নূতন পরিবেশের মধ্যে গিয়া পড়িতে পারিলে

কিছু-না-কিছু হইবেই : অন্তত এ রকম কঠোর উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়া যে দিন কাটাইতে হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কিন্তু তবু তিনি গ্রাম ছাড়িয়া নড়িতে পারেন নাই। আজ তাঁহাকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস হয় না; কিন্তু একদিন তো যৌবন তাঁহারও ছিল। তিরিশ বৎসর আগে অনাথ কবিরাজ স্ত্রীকে হারাইয়াছেন। হারাইয়া সে কি সত্যিই গিয়াছে! ওই যে খালের ধারে ধারে বাঁশের বন ঘন হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া হলদে জলে কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে; স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায় আর বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝরিয়া সেখানে ছোট একটা মাটির বেদী প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; বৃষ্টির জলে বেদীটি ধুইয়া যায়, মৃত-জ্যোৎস্নায় বাঁশের পাতা আলো-আঁধারের মায়াজাল বিছাইয়া দেয়। এটি তাঁহার স্ত্রীর চিতা। উহারই পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পড়িয়া আছে, খানিকটা জুড়িয়া নলখাগড়ার বন, বৈঁচি-কাঁটায় বাকি জায়গাটা আকীর্ণ। মরিলে তাঁহাকে যেন ওই চিতার পাশেই দাহ করা হয়, এমনি একটা বাসনা তিনি আগে হইতেই জানাইয়া রাখিয়াছেন।

এপাশে একটা বড় পুকুর প্রায় মজিয়া আসিয়াছে। কর্দমাক্ত জলের উপর ঘন জমাট শ্যাওলা ভাসিয়া বেড়ায়, নীল ফেনা হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া আসে, মশা-গুঞ্জিত পচা পাঁকের উপর যেন তেলের মতো কী একটা তরল জিনিস লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ওইখানে, উঁচু পাড়ের উপর, ওই যে কাঁটাওয়ালা শাদা রঙের একটা বেঁড়ে মাদার-গাছ বাঁকা হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওই গাছটার ডালে গলায় দড়ি দিয়া তাঁহার মেয়ে আত্মহত্যা করিয়াছিল। আফিমের নেশা যেদিন গাঢ় হইয়া আসে, নির্জন ভাঙা বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে অনাথ কবিরাজ দেখিতে পান, ওই ভাঙা চিতাটার পাশে, বাঁশবনের আড়াল হইতে কে যেন উঠিয়া আসিল : ম্লান সন্ধ্যায় তাহাকে চিনিতে পারা গেল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া। তারপর পুকুরের উঁচু পাড় ধরিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া আবার কে এদিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, প্রদীপের আলোটা গিয়া তাহার মুখে পড়িল : সে সুরো, হ্যাঁ সুরোই তো! মরিয়া তাহার মুখ যে ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যাসন্ন মাতৃত্বের ভারগ্রস্ত দেহ যে ভাবে মাদারের ডালটাকে অনেকখানি বাঁকাইয়া নিয়া পুকুরের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, সে কুশ্রী বীভৎসতা এখন তাহার কোথায়! সেই আঠারো বৎসরের যুবতী সুশ্রী মেয়েটি শাদা একখানি থানকাপড় পরিয়া, রুক্ষ চুল এলাইয়া ঠিক তেমনি ভাবেই আসিতেছে—দশ বছর আগে যেমন করিয়া সে আসিত।

অনাথ কবিরাজ ইহাদের দেখিতে পান—সন্ধ্যার অন্ধকারে ইহারা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কী যে বলে, নেশা কাটিলে সে কথা তাঁহার আর মনে থাকে না। এই দেখার প্রলোভনেই অনাথ কবিরাজ এ বাড়িটা এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, লোকের দুয়ারে কাঙালপনা করিয়া তিনি ঔষধ বিক্রি করিবার প্রয়াস

পান। স্নেহ নাই, সহানুভূতি নাই, শুধু ধূসর সন্ধ্যায় তাঁহার ম্লান অবকাশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া প্রেতমূর্তিরা নামিয়া আসে, এই মৃতের জগতের বাহিরে তিনি যাহাদের স্নেহ পাইয়াছিলেন, প্রফুল্ল তাহাদেরই একজন। বিনা প্রয়োজনেই সে তাঁহার কাছ হইতে কতবার ঔষধ কিনিয়াছে, আট আনার জিনিস কিনিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছে, দয়া করিয়াছে, দান করিয়াছে। মরা-মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে যাহার আর কেহই নাই বলিলেই হয়, নিজের এই শেষ আশ্রয়টিকেও সে হারাইবে কেমন করিয়া?

সুতরাং তিনি একরকম ব্যস্তসমস্ত হইয়াই ছুটিয়া আসিলেন: ব্যাপারটা কী বলুন তো?

প্রফুল্ল বলিল, সবই জানতে পাবেন। একটা মিটিং করব আমরা, তা গবর্নমেণ্ট আগে থেকেই আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন।

—তা হলে তো মিটিং হতে পারে না।

—সেই জন্যেই আরো মিটিং হবে। দু-চারজনকে জেলে যেতে হবে, মার খেতে হবে, তার জন্যে আমরা তৈরিই আছি।

—বলেন কী? বিবর্ণ মুখে অনাথ কবিরাজ কহিলেন, না না, ও সব হতে পারে না। আপনি ও সমস্ত করতে পারবেন না, আপনাকে ছাড়তে পারি না আমরা।

এত প্রীতি, এত বন্ধন! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু ছাড়তেই হবে যে কবিরাজ মশাই।

অনাথ কবিরাজ ম্লান হইয়া বলিলেন, কেন?

সাহেবপুরের মুসলমান সমাজ কিন্তু ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। লাঠি-সোঁটা লইয়া তাহারা জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল, মিটিং ভাঙিয়া দিবে। হিন্দুরা কিসের জন্য যে এসব আন্দোলন করিতেছে তা কি তাহারা জানে না? কুমিল্লা হইতে সেদিন যে মৌলবী সাহেব আসিয়াছিলেন তিনি কোরানের বয়েত আওড়াইয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে এ সমস্ত কেবল কাফের-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মতলব। তাহা হইলে গো-কোরবানি বন্ধ হইয়া যাইবে, মুসলমানদের ধর্ম থাকিবে না, মসজিদগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া হিন্দুরা সেখানে জিভ-বাহির-করা ভূতুড়ে কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। যদি সাহেবপুরের মুসলমানদের দেহে একবিন্দুও ইসলামিক রক্ত থাকে, এবং যদি তাহারা ইরান-তুরানের খাঁটি বংশধর হয়, তাহা হইলে এ হেন অনাচার তাহারা কখনোই ঘটিতে দিবে না।

জনতা চিৎকার করিয়া বলিল, কিছুতেই না।

সর্দার ইদ্রিস অগ্রসর হইয়া কহিল, লাঠির ঘায়ে আমরা সভা ভেঙে দেব। মৌলবী সাহেব বলে গেছেন, সরকার আমাদের পক্ষে। আর আমাদের কিসের ভয়?

সেই বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে মুন্সী সাহেব আসিয়া দাঁড়াইল। যাচিয়া সে কোনদিন

আসে না; গ্রামের বা সাধারণের ভালো-মন্দের ব্যাপারে কেহ কখনও তাহাকে এতটুকু অংশ লইতে দেখে নাই। সে ইহাদের বাহিরে নিজের চারিদিকে এমন একটা আভিজাত্যের সীমারেখা টানিয়া রাখিয়াছিল যে মুসলমান সমাজ তাহাকে শুধু সম্মান করিত না, শ্রদ্ধাও করিত, সর্বোপরি কোরানে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য বিশ্রুত ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

মুন্সী সাহেব দাঁড়াইল, কিছু বলিবার জন্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসে তাহার চুলগুলি উড়িতেছে, শান্ত কঠিন স্বরে সে প্রশ্ন করিল, হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ করলেই ইসলাম নিরাপদ হবে, এ কথা কোথায় আছে?

ইদ্‌রিস বলিল, কোরানে।

মুন্সী সাহেব কহিল, কোর্-আন্-শরিফ্ আম্‌পারা শরীয়ত আমার কণ্ঠস্থ। কোথায় আছে আমি সেটাই জানতে চাই।

উত্তর আসিল না।

মুন্সী সাহেবের উদাত্ত কণ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মানুষকে যারা মানুষের বিরুদ্ধে ভুল বোঝায়, অন্যের পরামর্শে যারা নিজেদের বুকে ছুরি মারতে চায়, আল্লা তাদের কোনোদিন দয়া করেন না। আমার এই কাটা হাতখানা তোমরা দেখেছ? যে শয়তানের বিষ-নিশ্বাসে এ হাত আমার পুড়ে গিয়েছে, আমাদের রক্ত-মাংসেই সে তার ক্ষিদে মেটায়। তার সাপ-খেলার বাঁশির সুরেই আমাদের মনের যত হিংসা আজ অন্যকে ছোবল মারবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রেখো, শয়তান শুধু আমাদেরই মাংস খায় না, আমাদের আত্মাকে খাবার জন্যেও সে জিভ মেলে বসে আছে।

ইদ্রিসের মাথা নত হইয়া আসিল।

রাসমোহন শেষবারের জন্য প্রফুল্লকে ডাকিলেন।

—কী অর্ডার এসেছে, শুনেছেন তো?

—শুনেছি।

—এর পরেও কি এ বিষয়ে আর বেশি এগিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করেন?

প্রফুল্ল নিরুত্তরে শুধু হাসিল।

রাসু সেন কহিলেন, এর ফলে কী হবে তা বুঝতে পারছেন?

প্রফুল্ল মাথা নাড়িয়া বলিল, নিশ্চয়।

—তা হলে শেষবারের মতো এখনো ভেবে দেখুন। নিজেকে এভাবে কেন নষ্ট করে ফেলছেন? আপনি কত কাজ করতে পারেন, আপনাদের মতো ছেলে দেশের গৌরব। আর কেউ না জানলেও আমি সেক্রেটারি, আমি তো জানি এই সামান্য তিন মাসের মধ্যেই আপনি কী অসম্ভব উন্নতি করেছেন ইস্কুলটার—

রাম্ন সেনের গলা কাঁপিতে লাগিল, তিনি সত্যি সত্যিই প্রফুল্লকে কি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন নাকি? কিন্তু প্রফুল্ল নির্বিকার।

শুধু কহিল, আমি চলে গেলেও সে উন্নতি আর থেমে দাঁড়াবে না, সে আশ্বাস আপনাকে দিয়ে গেলুম।

ওদিকে কিন্তু বিশ্রাম নাই নন্তুর।

গ্রামের পর গ্রাম সে চষিয়া ফেলিতে লাগিল; মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া, খাল বিল নদী নালা ডিঙাইয়া রৌদ্র-বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে মিটিংয়ের বন্দোবস্ত করিতে ছুটিল। বেশির ভাগই আসিতে রাজী হইল না, সরকারী নিষেধ তখন তাহাদের সমস্ত উত্তেজনা-উদ্দীপনাকেই প্রশান্ত করিয়া দিয়াছে।

কেহ বলিল, দাদাঠাকুর, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমরা। ওসব কি আর আমাদের পোষায়?

নাস্তা চিবাইতে চিবাইতে আর-একজন কহিল, স্বদেশী-টদেশী করা বড়লোকের কারবার, আমাদের নয়।

টোকা পরিয়া যে লোকটি ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়াইয়া হুঁকা টানিতেছে সে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করিল, তোমরা ঘরে বসে খাবেদাবে, দু দিন শখ করে জেল থেকে ঘুরে আসবে। আমরা গেলুম তো গুষ্টিসুদ্ধই গেল।

মানিক ভুঁইমালীর দল খেজুর-গাছ-চাঁছা হাসুয়া শাসাইয়া কহিল, ও সমস্ত মতলব আমাদের দিতে এসো না বাবুরা। জমিদারের রাজত্বে আমরা বাস করি, ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে দিলে তোমরা তখন দেখতে আসবে?

কেরায়া নৌকার মাঝিরা তো লগি তুলিয়া মারিতেই আসিল।

—যাও যাও বাবু সরে পড়ো। তোমাদের আর কি, শেষকালে মরতে মরি আমরাই। ভদ্রলোকদের কি বিশ্বাস করতে আছে?

অবশেষে ইস্কুলের মাঠেই সভার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

সভাপতি হইলেন নরেশ কর। এতদিন ধরিয়া আয়োজন বৃথা হয় নাই, এক দুই করিয়া ক্রমে ক্রমে লোক জমিতে লাগিল। শেষে সত্যি সত্যিই ভিড় জমিল। অন্তরের প্রেরণায় কয়জন আসিয়াছিল কে জানে, কিন্তু কৌতূহল কাহারোই কম ছিল না। উঁকি মারিতে আসিয়া শেষ পর্যন্ত দর্শকই দাঁড়াইয়া গেল অনেকে।

সুরেন মজুমদার আসিলেন না, রাম্ন সেন আসিলেন না, রামকমল আসিলেন না, ইস্কুল কমিটির সদস্যেরা কেউই আসিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু অনাথ কবিরাজ আসিলেন।

এ সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো পরিস্ফুট ধারণাই তাঁহার নাই, তবু তিনি কেন যে কিসের টানে আসিলেন, সে কথা শুধু তিনি নিজেই বলিতে পারিতেন।

নরেশ কর বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। একবার গোঁফজোড়া চুমরাইলেন, কাঁধের চাদরটা ঠিক করিয়া লইলেন, কল্পনা করিলেন তাঁহার সামনে মাইক্রোফোন এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিপুল জনতা।

গলা খাঁকারি দিয়া নরেশ কর আরম্ভ করিলেন:

কবি বলেছেন—সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে—

কিন্তু অর্ধপথেই বক্তৃতা তাঁহার থামিয়া গেল।

শিববাড়ির নিচে ছুখানা বড় নৌকা আসিয়া ভিড়িয়াছে,—আট-দশ মাইল দূরের থানা হইতে আসিয়াছে পুলিসের নৌকা। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। খবর পাইয়া স্থরেন মজুমদার এবং রামকমল কোথা হইতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন।

—হেঁ-হেঁ—একটু চা?—স্থরেন মজুমদার জানিতে চাহিলেন। ইন্‌সপেক্টর পকেট হইতে গোল্ডফ্লেক্ সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন, কহিলেন, চা পরে হবে, আগে অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট সেরে শেষে অন্য কথা। মিটিং কোথায় হচ্ছে?

—মিটিং হচ্ছে ইস্কুলের মাঠে, চলুন—রামকমল পুলিসবাহিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি আসিয়াছেন অভ্যর্থনা করিতে, ইন্‌সপেক্টর তাঁহাকে একটা সিগারেট না দিয়া পারিলেন না। স্থরেন মজুমদার সিগারেট হাতে লইয়া একবার গর্বিত-ভাবে চারিদিকে তাকাইলেন শুধু। তাঁহার মূল্য ইহারা বুঝুক। হাতি মরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লাখ টাকা।

নরেশ কর খবরটা পাইয়াছিলেন। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার বেগটা হঠাৎ সংযত করিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, বন্ধুগণ, আমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ বোধ করছি, আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিতে হল, কিছু মনে করবেন না।

নরেশ কর নামিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল 'ডায়াসে' আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় তাহার খদ্দরের টুপি, তাহার দীর্ঘদেহ স্থির-সংকল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখের সেই দীপ্তি আরো তীব্র, আরো উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল। নন্তু কী একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, বজ্র-কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি গগন-পবনময় ছড়াইয়া গেল।

ঠিক এমনি সময়েই ইন্‌সপেক্টর তাঁহার পুলিস বাহিনী লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মুহূর্তে যেন জাদুমন্ত্রের স্পর্শে ভিড় ভাঙিয়া পড়িল, তারপর একটা দমকা বাতাসের অপেক্ষা মাত্র।

ঝড় আসিল।

ঝড আসিল এবং বহিয়া গেল। ভাঙিয়া চুরিয়া যাওয়াটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যে অনিবার্য পরিণতির জন্য ইহারা অপেক্ষা করিতেছিল, সেই পরিণতির আবির্ভাবে কেহ দুঃখিত হইল কি-না কে জানে, কিন্তু বিস্মিত হইল না। যাহারা আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল, জীবনের সূর্যোদয় সম্ভাবনায় যাহারা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারা তিরোহিত হইল অন্ধকারের পটভূমিকায়। তাহাদের কণ্ঠ কতদিনের জন্য, অথবা চিরদিনের জন্যই অবরুদ্ধ হইয়া গেল কি-না কে বলিবে ?

তপন দাতে দাঁত চাপিয়া বলিল, Fools, they are all fools !

একটু আগেই তপনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, মনের দিক হইতে শুক্লা একটা প্রশান্তি বোধ করিতেছিল। বাহিরের এই ঝড়ে সে বিশেষ বিচলিত হয় নাই, কলিকাতার পথেঘাটে এ দৃশ্য দেখা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নিজের চোখের সামনেই লাঠির আঘাতে এমন বহু ছেলেকে সে রক্ত দিতে দেখিয়াছে। কিন্তু শুক্লা নাগরিক —সে ভাবপ্রবণ নয়, বুদ্ধিবাদের আশ্রয়ে সে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সে কতখানি মূল্য দেয় কে জানে, কিন্তু বিচলিত হয় না।

জিজ্ঞাসা করিল, কেন, ওরা fool হতে গেল কিসের জন্যে ?

—কারণ ওরা যা করল তার মূল্য কে বুঝবে ? এরা অন্ধকারের জীব, এরা যক্ষ্মারোগী। এদের বাঁচিয়ে কী হবে—মরুক ; মরুক—সব মরে শেষ হয়ে যাক। অনেক ভেবে এইটেই আমি বুঝেছি যে পৃথিবাতে Neroরই জয়জয়কার। If I could turn a second Nero !

নাঃ, আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তপন। অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ যা-হোক। কিসে যে ক্ষেপিয়া উঠিবে অনুমান করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বাইরের এই সামান্য ব্যাপারটা লইয়া এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইতেছে না শুক্লার।

সুন্দর সন্ধ্যাটা কেনই বা নষ্ট হইবে ! তপন কবি, তপন ভাবপ্রবণ। একথা তাহার বেশিক্ষণ মনে থাকিবে না। শুক্লার রূপ আছে, তপনের দেহেমনে রূপতৃষ্ণা কাঁদিয়া মরিতেছে। এইটাই তো আর তপনের একমাত্র পরিচয় নয় ! একটু পরেই হয়তো সে প্যালিয়োলিথিক ম্যান লইয়া কবিতা লিখিতে শুরু করিবে, নয়তো ব্রাউনিং খুলিয়া বিদ্রোহী প্রেমের কবিতা পড়িতে বসিবে।

তপন কবি—তপন খেয়ালী।

গ্রামের উপর ধূসর সন্ধ্যা নামিয়াছে। চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়। মুকুল পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে, চুলগুলির মধ্যে তাহার আঙুল চলিতেছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে। কন্ঠ

কাজ—কত বড় কর্তব্য। সমস্ত জীবন দিয়াই এ ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হইবে, কোন সংশয়-সঙ্কটেই থামিলে চলিবে না। নীলিমার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে না, ঘরে খিল দিয়া সে যে কী করিতেছে কে জানে। মধু মণ্ডলের বাড়ির আনাচ-কানাচে টোনা শিস দিয়া ফিরিতেছে, শশিকান্ত ভাবিতেছে, মধু মণ্ডল একবার সদর হইতে আসিলেই হয়। রাম্ব সেনের সামনে গড়গড়াটা পুড়িয়া চলিয়াছে, শূন্য দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে প্রসারিত করিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন। দাওয়ায় বসিয়া অনাথ কবিরাজ ঝিমাইতেছেন, সময় হইয়া আসিল, সময় হইয়া আসিল: মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখন চারিদিকের প্রেতাত্মারা সারাদিনের প্রগাঢ় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবে, তাহাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে নল-বনের মধ্যে দপ করিয়া একটা আলো জ্বলিতে থাকিবে বুঝি।

ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আড়িয়ল খাঁর জলে দাঁড় টানিয়া বেবাজিয়াদের নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে নিরুদ্দেশের পথে। চিরন্তন যাযাবর ইহারা, কোথাও দাঁড়াইবার সময় ইহাদের নাই। কালীপদর দেশী মদের দোকানের সামনে নেশায় চুরচুরে হইয়া মানিক ভুঁইমালীর দল গড়াগড়ি দিতেছে, কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া মুখ চাটিতেছে তাহাদের। মত্ততার একটা চরম পর্যায়ে আসিয়া মানুষ ও পশুর মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যবধানই নিঃশেষে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কাউণ্টারের সামনে কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া কালীপদ হিসাব দেখিতেছে, তিন গ্যালন মদ বেশি বিক্রি হইয়াছে এ হাটে। এমন করিয়া বিক্রি বাড়িতে থাকিলে এ বৎসর পূজার সময়েই ঘরের ভিটেটা পাকা করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। গমু মিঞার বৈঠকখানায় মদ ও মাংসের আসর বসিয়াছে, দুই-এক পাত্র পেটে পড়িতে না পড়িতেই রামকমলের মুখ খুলিয়া গিয়াছে। ইনাইয়া বিনাইয়া রসাইয়া রসাইয়া তিনি দারোগা জীবনের কোনো এক অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন হয়তো। মশার গুঞ্জনে এবং পচা পাটের দুর্গন্ধে পল্লীর বায়ুস্তর ভীত—বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে; খালে বিলে কচুরির গভীর আবরণ যেন অজস্র মুখ মেলিয়া পৃথিবীর প্রাণরস শুষিয়া লইতেছে; দরিদ্র কুটিরের ভাঙা বেড়ার আড়ালে সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের বুক হইতে চুরি করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিয়া শেয়ালের দল আনাগোনা করিতেছে। পাট ক্ষেতের নিবিড় দুর্ভেদ্যতা হইতে নর-পশু-কবলিত মাতৃজাতির চাপা আর্তনাদ সকরুণ ব্যর্থতায় অভিশাপের মতো আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে।…

ধারা কি এমনিই চলিবে,—অনন্তকাল ধরিয়া, যুগ-যুগ, কাল-মহাকাল ধরিয়া? ঝড়ের যে ডঙ্কা বাজিল, তাহার আহ্বানে কোথাও কি সাড়া জাগিল না? মানুষ এতকাল ধরিয়া সুন্দরের যে তপস্যা করিয়াছে, এমনি করিয়াই কি তাহা চিরন্তনের চক্রাবর্তে বিলীন হইয়া যাইবে?

সাহেবপুর ঘাট হইতে স্টীমার ছাড়িল। একদা প্রভাতে প্রফুল্ল এখানে আসিয়া নামিয়া-

ছিল, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে এখান হইতে বিদায় লইল। তবে এবারে সে আর শুধু একা নয়, সঙ্গী অনেকেই। নন্তু, পাড়ার কয়েকটি ছেলে এবং পুলিসের সতর্ক প্রহরা। তাহাদের সদরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখানকার থানায় একসঙ্গে এতগুলি মানুষকে আটকাইয়া রাখিবার জায়গা নাই।

ইন্‌সপেক্টরটি সত্যিই ভালো লোক। সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চায়ের ব্যবস্থা করব আপনাদের?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, ধন্যবাদ। পেলে তো ভালোই হয়।

একজন কনেস্টবলকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া ইন্‌সপেক্টর সেকেণ্ড ক্লাসের ডেকে চলিয়া আসিলেন। তারপর একখানা ডেক্ চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া পকেট হইতে একখণ্ড সচিত্র 'নাইট ইন্ প্যারিস্' পত্রিকা বাহির করিলেন। ছবিগুলি যেমন সরেস, গল্পগুলিও। হাতে সিগারেট পুড়িতে লাগিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্‌সপেক্টর নগ্ন চিত্র এবং নগ্নতর গল্পগুলির মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

...আড়িয়ল খাঁর কালো জল কলকল করিয়া বাজিতেছে, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় ফেনায়িত তরলতা গজরাইয়া উঠিতেছে, তীর ক্রমশ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের ম্লান অন্ধকার। সাহেবপুর হাটের এলোমেলো সুপারিবন বাতাসে দুলিতেছে, মনে হইতেছে হাত বাড়াইয়া রক্তবিন্দুর মতো অসংখ্য তারা—ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে তাহারা ভাঙিয়া পড়িতেছে।

নন্তু প্রফুল্লর পাশেই বসিয়াছিল। মাথায় তাহার রক্তে ছোপানো একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্‌সপেক্টর চলিয়া যাইতেই অগ্নিগর্ভ স্বরে কহিল, এখন সব বুঝলেন তো? রবিদা শ্শাই, ওই ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলেছে। কী ভয়ানক লোক! একবার যদি ছাড়া পাই—

নিজের মনেই নন্তু শৃঙ্খলিত হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল তাহার কথার উত্তর দিল না। কাহারো উপর রাগ নাই, অভিমান নাই, অভিযোগ নাই একবিন্দু। ক্লান্ত প্রশান্তি সমস্ত মনটাকে অলস করিয়া দিয়াছে। অনেক দূরে—যেখানে অন্ধকারের মধ্যে প্রায় মিলাইয়া আসা তীর-তটের গায়ে আড়িয়ল খাঁর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, সুপারি-নারিকেলের বীথিতে বাতাসের মর্মর বাজিতেছে এবং নির্জন চড়ার গায়ে একলা দাঁড়াইয়া থাকা মুন্সী সাহেবের শাদা জামাটা বাতাসে উড়িতেছে, সেদিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলিয়া সে আর এক পৃথিবীর স্বপ্নই দেখিতেছিল হয়তো।

স্বর্ণ-সীতা

উৎসর্গ

অন্নুকে

ভূমিকা

সম্প্রতি বইটি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সে কারণে দ্বিতীয় সংস্করণে এর কিছু কিছু নতুনত্ব চোখে পড়বে। ছায়াচিত্র ও উপন্যাসের প্রয়োজন এক নয়, সেই জন্যে উপন্যাসকে ব্যাহত না করে ছায়াকাহিনীর সঙ্গে এর সংযোগ রাখতে চেষ্টা করলাম। যেটুকু পার্থক্য রইল তা আপাত—'স্বর্ণ-সীতা'র মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে চিত্র ও উপন্যাসের ক্ষেত্রগত পার্থক্য মাত্র।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

স্কুলের ছুটির পরে কেন কে জানে, এই পথটা দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগে অনুপমার। পথটার সারা গায়ে কুমীরের পিঠের মতো রাশি রাশি খোয়া আর নুড়ি উঠেছে; একটা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি কিংবা হেনরি ফোর্ডের ফার্স্ট মডেলের মতো ঝরঝড় ট্যাক্সি সেই পথ বেয়ে যখন চলে যায় তখন মনে হয় চারপাশে চারটে অয়েল ইঞ্জিন যেন একসঙ্গে চলতে শুরু করেছে। ইট-বের-করা পুরনো বাড়িগুলো থেকে তার শব্দে ঝুপঝাপ করে চুন সুরকি খসে পড়তে থাকে। মরচে-ধরা করোগেটেড টিনের চালা থেকে কা কা করে কাক উড়ে যায়, হঠাৎ চমকে উঠে পাড়ার নেড়ী কুকুরগুলো চিৎকার জুড়ে দেয় আর্তস্বরে। ধুলোর কুয়াশায় পথঘাট একেবারে অন্ধকার।

এটা শহরের পুরনো অঞ্চল। এককালে ছিল বনিয়াদী, এখন দরিদ্রতম। ভাঙা সিঁড়ি-নামা আধবোজা পুকুরের নীল জল গুঁড়ি পানা আর ক্ষুদে কচুরিতে ঢাকা। শোল আর চ্যাং মাছ ধরবার জন্যে এখানে ওখানে বাঁকারির বঁড়শি পোঁতা। ঘাটে স্তূপাকার বাসন আর কাংস্যকণ্ঠি কালো কালো ঝিয়ের ঐকতান।

এখানকার মানুষগুলো কাঁধ-ছেঁড়া মোটা লংক্লথের পাঞ্জাবি পরে—পায়ে দেয় শক্ত ক্রোমের জুতো—অন্তত ছ-বার হাফসোল-মারা চটি। এখানকার উকিলদের কালো গাউনে ছাই রঙের তালি। পুরনো হার্কিউলিস্ সাইকেলের পেছনে ইলিশ মাছ বেঁধে এরা বাজার করে আনে। স্কুলের বা কলেজের বিশেষ বাস যখন এই সনাতনী রক্ষণশীল অঞ্চলের মুখের ওপরে ধুলো ছড়িয়ে যায়, তখন আনাচ-কানাচ থেকে সিনেমার গানের কলিও ভেসে আসে।

এই রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকের ছোট গলিতে বাঁক নাও। পেরিয়ে এসো দরিদ্র মুসলমানদের একটা বস্তি। তারপরেই দেখবে ইস্ট-এণ্ড থেকে ওয়েস্ট-এণ্ড-এ এসে পড়েছো। ঝক্‌ঝকে কংক্রীটের মসৃণ রাস্তা দিয়ে চকচকে মোটরগুলো যেন পাখীর মতো উড়ে চলেছে। সিনেমা হাউসে রঙীন পোস্টার। চৌরঙ্গীর অনুকরণে নতুন বাড়ি—কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট—হেয়ার কাটিং সেলুন—শৌখীন দোকান—কাচের গায়ে সোনালী জলে ভীমটোর ছবি আঁকা রেস্তোরাঁ। মফস্বল শহরের ব্রডওয়ে।

নতুন শহরের রূপ দেখতে হলে আরো কয়েক পা এগোতে হবে তোমাকে। বড় দীঘিটা পাশে রেখে আরো খানিকটা বাঁ দিকে—তারপর কালেক্টরি, ট্রেজারি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড—আর-এম-এস, স্টীমার ঘাট। এইবারে চোখ তুলে তাকাও—যেন জুড়িয়ে যাবে দৃষ্টি। টানা পরিচ্ছন্ন রাঙা কাঁকরের পথটার পাশে নদীর জল চলে এসেছে জোয়ারের আবেগে। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো জেগে আছে সবুজ তৃণভূমি। বিচ্ছিন্ন ভাবে ছোট

বড় স্টীমার আর মোটরলঞ্চে নদীর আধাআধি জুড়ে রয়েছে—গম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে কখনো আসছে ডেস্‌প্যাচ, কখনো যাত্রীবাহী। বড় বড় বয়া দুলছে ঢেউয়ের আঘাতে। ওপারে লাল ইটের একটা টিন্‌শেডের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কতগুলো অক্ষর এখান থেকেও পড়া যাচ্ছে : বরফ কল। তার পাশে ছোট গঞ্জ, খেয়াঘাট, খালের ওপর কাঠের সাঁকো, আকাশে উড়ন্ত কাকের ঝাঁক। আর এপারে রাঙা কাঁকরের পথটা এগিয়ে গেছে, যেন যাত্রা শেষ করেছে দূরের কোন একটা স্বপ্ন-তোরণে। দীর্ঘ ঝাউয়ের সারি নদীর বাতাসে সারাক্ষণ সাঁই-সাঁই করে শব্দ করছে। ছোট বড় লনের মাঝখানে বাংলো ধরনের মনোরম বাড়িগুলো —পরস্পরের সঙ্গে অভিজাত-সুলভ দূরত্ব বজায় রেখে মহিমান্বিত হয়ে আছে। সীজন-ফ্লাওয়ারে বসেছে রঙের মেলা—যেন আকাশের ইন্দ্রধনু ফুল হয়ে ফুটেছে মাটিতে। তার এখানে-ওখানে টেনিস গ্রাউণ্ড—জালের বেড়া ঘিরে উঠেছে আইভিলতা। রাস্তার ওপরে এখানে মাস্টিফ্‌ কুকুর আর ল্যাপ্‌-ডগ্‌ বিকালের নীলাভ শান্ত আলোয় খেলা করে বেড়ায়, কোঁকড়াচুল ফুলের মতো শিশুদের পেরাম্বুলেটারে ঠেলে নিয়ে যায় লাল শাড়ি-পরা আয়ার দল।

এখানে গ্লেজ-কিড জুতো—গরদ আর সিল্কের পাঞ্জাবি, হেক্সাগন ফ্রেমের সোনার চশমার ঝলক। মোটরে চড়ে যারা অফিসে যাতায়াত করে, তাদের দামী স্যুটের ক্রীজ নির্ভুল এবং উদ্ধত। পেছনে পেছনে অফিসের বাক্স বয়ে নিয়ে যায় তকমা-পরা আর্দালিরা। সাইকেলে যারা চলে, তারা গোল্ডেন সানবীম থেকে বি-এস-এ-র নিচে নামে না। কখনো কখনো এক একটা জে-এল-ও, স্টীমলঞ্চের কট-কট শব্দের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

এই রাস্তার ওপরেই থাকেন অনুপমার বাবা প্রসন্ন সরকার এবং থাকেন অনুপমার মা শিবানী সরকার, ছোট বড় মিসি বাবা, খোকা বাবা। আর থাকে সোফার, দারোয়ান, আয়া, আর্দালি এবং কুকুর।

দামী অফিসার, অতএব অভিজাত। কোর্টে যাওয়ার সময় প্রসন্নবাবু মোটরে করে অনুপমাকে ইস্কুলে পৌঁছে দেন। ফেরার পথে হেঁটেই আসে অনুপমা—স্নিগ্ধ বিকালে মর্মরিত ঝাউবীথির তলা দিয়ে হেঁটে আসতে তার ভালো লাগে। নদীর বাতাসে আসে ভিজে নোনামাটির সুগন্ধ। সুগঠিত ঋজুদেহ থেকে সিল্কের শাড়িটা উড়ে যেতে চায়, স্পোর্টস্‌ম্যান্ অনুপমার ছন্দিত পদক্ষেপে রাঙা কাঁকরগুলো যেন আনন্দে গান গেয়ে ওঠে।

এই পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তারা ব্যর্থ এবং লুব্ধ কামনায় দূর থেকে সিনেমার সুর ছুঁড়ে মারে না। সহজভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, পাঁচটা আংটি-পরা গোল্ডফ্লেকের রঙে রাঙানো আঙুলগুলো জড়ো করে নমস্কার জানায়। হাসে পরিমিত এবং পরিচ্ছন্ন হাসি।

হাতের বইগুলো বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে অনুপমা বলে, আজ সন্ধ্যায় আসছেন তো? শঙ্করদার গান হবে।

হেক্সাগন সোনার ফ্রেমের ভেতরে চোখ জ্বলে ওঠে।

—আপনিও বঞ্চিত করবেন না নিশ্চয়।

—বলেন কি, শঙ্করদার সামনে আমার গান ?

—আপনি নিজেকে চেনেন না মিস্ সরকার। ফুল কি বুঝতে পারে নিজের রূপ আর গন্ধকে ? সেটা বিচার করে রসিকজন।

অনুপমা হাসে। ছোট একটি টোল আবর্তিত হয়ে ওঠে গালের একপাশে। কর্ণাভরণে বিকালের আলো ঝিকিয়ে ওঠে।

—তা হলে নিজেকে রসিক বলে মনে করেন আপনি ?

—নিশ্চয় ! হেক্সাগন চশমার আড়ালে তেমনি জ্বলতে থাকে চোখ, গরদের পাঞ্জাবি থেকে একটা ঝাঁঝালো সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে : ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমার নেই। অন্যকে প্রাপ্য মূল্য যদি দিতে পারি, তাহলে নিজের বেলায় অতি বিনয়ের কার্পণ্য করব কেন ?

অনুপমা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে। জোয়ারের জলে জেগেছে কল-তরঙ্গ—উঁচু রাস্তার পাশে পাশে কৌতুকভরে আনন্দিত আঘাত দিয়ে যাচ্ছে। ঝাউবনের শনশনানির বিরাম নেই। অনুপমার হাসি যেন সেই জল আর বাতাসের সঙ্গে জলতরঙ্গের সুর মিলিয়ে দেয়।

—চমৎকার আত্মপ্রত্যয় আপনার। তা হলে আসছেন তো ? মাইণ্ড ইট্, ঠিক সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা—কাঁটায় কাঁটায়।

—আমি এদিক থেকে পাংচুয়াল—বাঙালি টাইমিং নিয়ে আমি চলি না। গরদের পাঞ্জাবির নিচে সোনার দামী হাতঘড়ি আত্মপ্রকাশ করে।

—আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার।

গ্রেজ-কিড জুতোর শব্দ আর গোল্ডফ্লেকের ধোঁয়া এগিয়ে যায় সামনে। আর ছন্দোবদ্ধ ললিত পায়ে নির্জন ঝাউবীথি দিয়ে এগিয়ে চলে অনুপমা—সিল্কের শাড়িটা তনুদেহ ছাড়িয়ে যেন বাতাসে উড়ে যেতে চায়।

* * * *

এ-পাড়া আর ও-পাড়া। এখানে পুরনো শহর—চিন্তায়, কল্পনায়, প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছতায় পাঁচশো বছর—হয়তো তারও পেছনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে আছে। উনবিংশ শতকের যে রাষ্ট্রনেতার কর্মপ্রেরণায় এই জেলা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র এবং এই শহর পূর্ব বাংলার অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ছিল—পুরনো শহরের তিনিই আধুনিকতম ব্যক্তি। চিরকুমার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি, নিজে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং দেশবরেণ্য নেতা হয়েও খালি পায়ে পথ চলতে দ্বিধাবোধ করতেন না। পাশ্চাত্ত্য

শিক্ষায় চূড়ান্ত শিক্ষিত হয়েও ভারতীয় ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগে ছিল তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। তাই এ-পাড়ার অধিকাংশ প্রবীণেরা চা-কে আজো কুলির রক্ত মনে করেন, সিল্কের জামা অস্পৃশ্য বোধ করেন, জীবনে কখনো তাঁরা সিনেমা দেখেন না। ধর্মরক্ষণ-সংঘের গীতা ব্যাখ্যার বৈঠকেও তাঁরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

ও-পাড়ার নতুন জীবন—অফিসার এবং অভিজাততন্ত্র জেলার বড় সাহেবদের 'ম্যানারিজম'গুলোকে আয়ত্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টায় বিব্রত। ক্লার্ক গেবল, গ্যারী কুপার, ফ্রেড য়্যাস্‌টেয়ারকে এরা স্বপ্নে দেখে, মার্লিন ডিট্রিক, নর্মা শিয়ারার, গ্রেটা এদের দৈনন্দিন জীবনে ছায়া ফেলে। কেউ জর্জ র‍্যাফ্‌ট হতে চায়—কেউ বা জীন হার্লো। পলিটিক্স এরা ভাবে না—কলকাতার অনুকরণে এদের জীবন একাধারে কস্‌মোপলিটান এবং বোহেমিয়ান। স্বল্পবিস্তৃত গণ্ডিতে বলেই কখনো কখনো তা অত্যুগ্র।

ইস্ট-এণ্ড আর ওয়েস্ট-এণ্ড। এ ওর মুখাপেক্ষী। এ-পাড়ার উকিল ও-পাড়ার হাকিমের সামনে 'ইয়োর অনার' বলে সওয়াল শুরু করে; এ-পাড়ার কেরানীরা না এলে ও-পাড়ার সাহেবের সেরেস্তা অচল। এ-পাড়ার ধর্মসভায় কিংবা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাসবে ও-পাড়ার নাস্তিক এবং সাহিত্যবুদ্ধিহীন ব্যক্তিরাই সভাপতি। মিউচুয়্যাল কো-অপারেশন।

কিন্তু দু-পাড়ার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এক দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা শহরের মধ্য-বিত্তদের সন্তান। চিরকুমার নেতার অগ্নিগর্ভ উপদেশের আওতায় তারা বেড়ে উঠেছে, শনি-সত্যনারায়ণের প্রসাদ পেয়েছে—বারোয়ারী দুর্গাপূজায় আরতির নাচ নেচেছে—তরুণ ব্যায়াম সমিতি গড়ে শরীরে এবং মনে বিবেকানন্দের আদর্শকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছে। পুরনো শহরের নিষ্ঠা এবং গভীর দেশাত্মবোধকে রক্তের কণায় বহন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনে। কলেজে ভর্তি হয়ে পড়েছে বার্নার্ড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হাক্সলি, এলিয়ট, কার্ল মার্কস্ আর ফ্রিডরিশ এঙ্গেল্‌স। এরা হচ্ছে এই দু-পাড়ার মধ্যবর্তী সংযোজক—ইস্ট-এণ্ড আর ওয়েস্ট-এণ্ডের সেতু।

এদেরই একজন অরুণ মজুমদার সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাউবীথির তলা দিয়ে হেঁটে আসছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার—কিন্তু অন্ধকার নেই। এখন সমস্ত পথটা গলায় বিদ্যুৎ-প্রদীপের মালা দুলিয়েছে। জোয়ারে উচ্ছ্বসিত নদীর জলে সে আলোর ছায়া পড়েছে; দূরে দূরে নোঙর করা ছোট বড় স্টীমারগুলোয় নানা রঙের আলোতে যেন দীপালির উৎসব। তেমনি শন্‌শন্ করে ঝাউয়ের অশ্রান্ত কান্না আর পথের পাশের লনগুলো থেকে হাস্নুহানা আর রজনীগন্ধার সুরভি।

বিকালের নির্জনতা এখন আর নেই। সন্ধ্যার পরে অন্তত দুটি ঘণ্টা সময় অভিজাত রাস্তাটার আভিজাত্যটুকু ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। শহরের লোক দিনান্তে এখানকার খোলা বাতাস

আর উন্মুক্ত দিগন্তে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। অভিজাতেরা যখন ঘরে রেডিয়ো খুলে দিয়ে বি-বি-সি ধরবার চেষ্টা করে কিংবা পিং-পং খেলে তখন এই পথ দিয়ে চলা-চলতি করে সমষ্টি জীবনের সর্বময়তা। নদীর ধারে পা ছড়িয়ে দিয়ে বিড়ি টানে, গান গায়, কড়মড় করে চিবোয় চীনেবাদাম। কলেজের ছাত্রেরা পলিটিক্স এবং ছাত্রীতত্ত্ব আলোচনা করে। আধুনিকা হওয়ার করুণ চেষ্টায় গৃহস্থ বউ-মেয়েরা ফোস্কা-পড়া পায়ে এবং বিকৃত মুখে নতুন জুতোজোড়া পায়ে টেনে টেনে পথ চলে। রাত একটু বেড়ে উঠলে ঝাউগাছের নিরিবিলি ছায়াতে এক-আধটু প্রণয়-কাব্য যে চোখে পড়ে না, এমনও নয়। আর সকলের মাঝখানে ঘুরে বেড়ায় পকেটমার—ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে গণিকা। পাড়ার যারা বনিয়াদী, এ সময়ে এ পথটাকে তারা পরিহার করেই চলে সাধারণত।

নানা স্তরের লোকের ভিড় ঠেলে অরুণ মজুমদার হেঁটে আসছিল। একটা ল্যাম্প-পোস্টের কাছাকাছি আসতে বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট করে চেনা গেল তাকে। বছর কুড়িক বয়স হবে—কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। মাথার কড়া কড়া চুলগুলো উদ্ধত ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে আছে। এক্সারসাইজ-করা কঠিন শরীর—শ্যামবর্ণ মুখের ওপর সংক্ষিপ্ত গোঁফের আভাস। গালের একপাশে একটা দাগ—রিং করতে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল এক টুকরো ইটের উপরে। কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, পড়ে রাজনীতির বই—পড়ে ইকনমিক্সে অনার্স। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির কন্‌ভেনার এবং মফঃস্বল শহরের জাগ্রৎ তারুণ্য।

একটা সাইকেলে করে উলটো দিক থেকে আসছিল প্রিয়তোষ। মুখে বিড়ি। অরুণকে দেখে ব্রেক কষে নেমে পড়ল।

—তারপর, বড়লোকের বাড়িতে যাচ্ছ নাকি?

—হুঁ।

পাশ দিয়ে একজন অধ্যাপক চলে যাচ্ছেন—প্রিয়তোষ বিড়িটা হাতের তেলোয় লুকিয়ে ফেলল। বললে, জে. সি. পি. যাচ্ছে। ব্যাটা স্কাউণ্ড্রেল।

অরুণ হাসল।

—খালি খালি গাল দিচ্ছিস যে ভদ্রলোককে?

—জানিস না, ব্যাটার চোখ চরকির মতো ঘোরে। হিস্ট্রির ক্লাসে প্রক্সি একদম বন্ধ—প্রিয়তোষ বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলে।

—কিন্তু পড়ায় ভালো।

—কচু পড়ায়। গড়গড় করে কেটেল্‌বী মুখস্থ বলে যায় খালি।

—তাই নাকি? অরুণ আবার হাসল: কী করে জানলি? কেটেল্‌বীর পাতা কোন দিন উলটে তো দেখিসনি।

—থাক থাক, যেতে দে।—প্রিয়তোষ বিড়িটাকে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে : ওসব এখন ভালো লাগে না। তোর খবর বল্।

—আমার আবার কী খবর?

—মাইরি আর কি।—প্রিয়তোষ একটা অশ্লীল ভঙ্গি করলে মুখের : খবর তো তোমারই চাঁদ। কদ্দূরে এগোলে? কী বলে মিস্ সরকার?

—কিছুই বলে না।

—কিছুই না? একেবারে কিছুই না? নিতান্তই শুষ্কং কাষ্ঠং?

—রস নির্ঝরিত হওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না। পয়সা নিয়ে পড়াই—টিউশনি করি, রসস্থ হতে গেলে অর্ধচন্দ্র মিলবে।

—তুই একটা মরাল কাওয়ার্ড। এমন শাঁসালো বড়লোকের মেয়ে, জোটাতে পারলে বিলেত যেতে পারতিস। আমি যদি হতাম, তা হলে অ্যাদ্দিন—হুঁঃ!

একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে প্রিয়তোষ। পকেট হাতড়ে বিড়ি বার করলে একটা। অন্তর্নিহিত তেজস্বিতার প্রেরণায় এত জোরে দেশলাই ঠুকলে যে হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল জ্বলন্ত কাঠিটা।

—শা-লা!—আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে প্রিয়তোষ বিড়িতে মুখাগ্নি করলে, খানিকটা ধোঁয়া ছড়ালো রণক্ষেত্রের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের মতো। চোয়াল-ভাঙা গাল আর আদ্দির পাঞ্জাবির নিচে তিরিশ ইঞ্চি বুকের আভাসটা এত স্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলে মনে করা যেত যে প্রিয়তোষ কোনো একটা অসাধ্য-সাধন করে ফেলতে পারে।

—নো রিস্ক নো গেইন। যা থাকে কপালে, একটা প্রোপোজ করে ফেল্। Cheer up lucky dog—

প্রিয়তোষ সাইকেলে উঠে পড়ল—প্যাডলটাকে একবার উলটো ঘুরিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। যেন বিরাট কোনো একটা রিস্ক নিতে ছুটল।

অরুণ অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য করতে লাগল প্রিয়তোষকে। এর চাইতে কোনো পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না—অধিকাংশ ছেলের কাছ থেকেই নয়। অক্ষম লোভ ওদের আত্মপ্রকাশ করে অবিমিশ্র ইতরতার মধ্যে; কলেজের দেওয়ালে কদর্য প্রেম নিবেদনে। মেয়েদের গাড়ির পেছনে পেছনে নিষ্ঠাভরে সাইকেল চালিয়ে দু-বেলা কলেজ এবং কলেজ ফেরত যাতায়াত করে। কী সার্থকতা অর্জন যে করে ভগবানই বলতে পারেন, কিন্তু একনিষ্ঠ সাধনায় বিরাম ঘটতে দেখা যায় না কখনো।

বেশ তো, প্রেমেই যদি পড়ে থাকে তা হলে সামনে দাঁড়িয়ে কেন সেটাকে বীরের মতো বলতে পারে না? কিন্তু সেটা তো দূরের কথা, আড়ালে থেকে যে মেয়ের সম্বন্ধে উৎসাহিত মন্তব্য করে, সেই বিশেষ মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়ালেই যেন নার্ভাস্ ব্রেকডাউন

ঘটে যায় ছেলেদের। একবার নয়, বার বার সেটা লক্ষ্য করেছে অরুণ। অতিশয় স্মার্ট বন্ধুদের পরিচিত মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গিয়েই তার প্রমাণ পেয়েছে সে। বারকয়েক তো-তো করেছে, মুখে কপালে ঘাম জমে উঠেছে, এলোমেলো ভাবে কতকগুলো কথা বলে যেন পালিয়ে বেঁচেছে সামনে থেকে।

কেন এমন হয়? 'ফেমাস' যদি না হয় তো 'নোটোরিয়াস' কেন হতে পারে না? সব দিক থেকে যেন দেউলে হয়ে গেছে ছেলেরা। না শরীরে, না মনে। আগে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা মারামারি করত, কিন্তু এখন ভব্য হয়ে গেছে, ভদ্র হয়ে গেছে অতি-মাত্রায়। জামার আস্তিন গুটোতে ভয় পায়—পাছে ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে।

পাশ দিয়ে কলরব করতে করতে গেল আর এক দল। বেশ সোল্লাস কলরব। ইস্ট-বেঙ্গল কী একটা খেলায় জিতেছে—এইমাত্র খবর এলো রেডিয়োতে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাবুদ্ধির আর একটা রূপ। যেমন কুশ্রী তেমনি অর্থহীন মনে হয়।

ঝাউয়ের বনে বাজছে অশ্রান্ত শন্‌শনানি। জোয়ারের জলে তেমনি আনন্দিত কলোচ্ছ্বাস। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে।

ভোঁ করে একটা গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি দিগন্তে প্রসারিত হয়ে গেল। একটা আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে—সন্ধ্যার এক্সপ্রেস স্টীমার। সকালে কলকাতার ট্রেন ধরিয়ে দেবে। সার্চলাইটের এক ঝলক আলো মর্মরিত ঝাউবনের ওপর বিদ্যুতের মতো চমকে গেল।

বাতাসে হাস্নুহানার গন্ধ। লোহার ফটকের দুপাশে উঠেছে আইভিলতার ঝাড়। উজ্জ্বল আলোয় লনের সীজন ফ্লাওয়ারগুলো নানা রঙের মণিখণ্ডের মতো জ্বলছে। সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে রাঙা কাঁকরের পথ—ভাগ্যবতী কোনো সীমন্তিনীর সীমন্ত-রেখার মতো।

সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চলল অরুণ। বারান্দায় লোহার চেনে-বাঁধা মাস্টিফ্ কুকুর দুটো তারস্বরে চিৎকার করে উঠল বারকয়েক। তারপর চেনা মানুষের ছায়া দেখেই চুপ করে গেল।

বাইরে ড্রয়িংরুমে মুখর হয়ে উঠেছে রেডিয়ো, আর তার সঙ্গে উচ্ছলিত হাসি আর কলগুঞ্জন। আর অনুপমার পড়ার ঘরে আলো জ্বলছে। অরুণ মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে ভাব-বার চেষ্টা করে কতখানি মানসিক আত্মস্থতা থাকলে এই কলরব-কোলাহলের মাঝখানেও পড়ার বইতে মন বসাতে পারে অনুপমা।

দুই

দেওয়ালে নকল ম্যাডোনার মাথার চারদিকে জ্যোতির্মণ্ডল বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর একদিকে রয়েছে একখানা বড় ল্যাণ্ডস্কেপ—তুহিনধবল গিরিশৃঙ্গের নিচে মাথা তুলেছে পাইনের সারি। কিন্তু ম্যাডোনা এখানে যেমন বেমানান, আল্‌পসের উপত্যকায় পাইনের সমারোহও সেখানে তেমনি একটা পরিহাসের মতো অশোভন।

নিচে অনুপমার পড়বার টেবিল। স্বস্তিকের ভঙ্গিতে মানুষের হাতের মতো একটা ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড টেবিলটাকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট একটা শ্বেত-পাথরের মূর্তি টেবিলের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে—বিদ্যার তীর্থে প্রতিহারী আছেন বাণীর বরপুত্র।

অনুপমা লিখছিল। অরুণের অভ্যস্ত পায়ের শব্দে মাথা না তুলেই বললে, আসুন।

উল্টোদিকের চেয়ারে ঠিক মুখোমুখি বসল অরুণ। অনুপমা মাথা তুলল না, তেমনি লিখেই যেতে লাগল।

—কী লিখছ?

—বলছি মাস্টারমশাই, এই এক মিনিট।

অরুণ বসে রইল চুপ করে। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে—ল্যাণ্ডস্কেপের ছবিটার ওপর দিয়ে দ্রুত গতিশীল ছায়া আবর্তিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। আল্‌পসের পাহাড়ে পাইন বন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ম্যাডোনার কোলে তরুণ যীশুখ্রীষ্ট, পীড়িত আর্ত মানুষের প্রতিরূপ—অপমানিতের মুক্তি-দেবতা।

কিন্তু ম্যাডোনার রুপোর ফ্রেমটা আলোয় চিকচিক করছে—চোখে ধাঁধা লাগে। দরিদ্রের দেবতা বাঁধা পড়েছেন ঐশ্বর্যের আবেষ্টনীর মধ্যে। ধনীদের সম্বন্ধে কী বলেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট? অন্যমনস্ক অরুণ অকারণেই কথাটা মনের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে লাগল: ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু—

চমক ভেঙে গেল।

—মাস্টারমশাই!

—কী বলছিলে?

একটু অপ্রতিভের মতো তাকাল অনুপমা। আয়ত চোখের কোণে কোণে লজ্জার জড়তা দেখা দিয়েছে। কলমের ক্যাপটা খুঁটতে খুঁটতে বললে, এই লেখাটা একটু দেখে দিন না।

—কবিতা লিখেছ? অরুণ মৃদু হাসল: জানো তো পোয়েটিক সেন্স আমার নেই।

—না, না, কবিতা নয়। মানপত্র।

—মানপত্র? কী উদ্দেশ্যে?

অনুপমার দৃষ্টি সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। মাস্টারমশাইয়ের চিন্তাধারার যতটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে—। কিন্তু এখন পিছিয়ে গেলে চলবে না, কালকে সভাতে এই মানপত্র ওকেই পড়তে হবে। হেড মিস্ট্রেসের এই নির্দেশ।

—ডিভিশনাল কমিশনার কাল ইস্কুল দেখতে আসবেন, তাই—

—ওঃ।

নিরুৎসাহ গলায় জবাব দিলে অরুণ, কাগজটা কাছে টেনে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে পড়তে লাগল। সংক্ষেপে বললে, বেশ হয়েছে।

হঠাৎ একটা বিদ্রোহে ভরে গেল অনুপমার মন। অরুণ প্রাইভেট টিউটার, অর্থের বিনিময়ে পড়াতে আসে তাকে। বেশি কথা বলে না, নীরবে কাজ করে যায়। তবুও মাঝে মাঝে অনুপমা ভাবে তার সম্বন্ধে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অনুকম্পা পোষণ করে অরুণ।

সে অনুকম্পা, তাদের প্রাচুর্যের প্রতি, ঐশ্বর্যের প্রতি। দারিদ্র্যের একটা আভিজাত্যে যেন আত্মসম্পূর্ণ হয়ে আছে অরুণ—সে সৌভাগ্যে যারা বঞ্চিত তাদের প্রতি তার সহানুভূতির সীমা নেই।

হিংস্র ভাবে একবার ঠোঁট কামড়াল অনুপমা।

—আজকে আর পড়ব না মাস্টারমশাই। তা ছাড়া কালও আপনি আসবেন না—আমাদের একটা টী-পার্টি আছে মিস্টার সেনের ওখানে।

—বেশ তো। অরুণ মৃদু রেখায় হাসল: আমিও তোমার কাছে ছুটি চাচ্ছিলাম। কালকে জালিয়ানওয়ালা ডে—এই দুটো দিন আমাকেও একটু ব্যস্ত থাকতে হবে।

মুহূর্তে একটা ইঙ্গিতময় নীরবতায় সমস্ত ঘরটা গেল আচ্ছন্ন হয়ে।

অরুণের কথাটা একটা নিষ্ঠুর আঘাতের মতো এসে পড়ল অনুপমার মুখের ওপরে। ইচ্ছে করেই কি এই আঘাতটা করেছে অরুণ, অত স্পষ্ট করে টেনে টেনে উচ্চারণ করছে জালি-য়ান-ওয়ালা ডে! মিস্টার সেনের টী-পার্টি, রেডিয়ো-আর্টিস্ট শঙ্করদার গান, রুপোর ট্রেতে সোনালী চা—পেস্ট্রি, প্যাটি, পাম্ কেক। আর জালিয়ানওয়ালা। স্বাধীনতার অগ্নি-যজ্ঞে নিরপরাধ প্রাণের আহুতি। পঞ্চনদী-বিধৌত জনপদে সিন্ধু-শতদ্রু-বিপাশার জল-কল্লোলকে ডুবিয়ে দিয়ে ওডায়ারের মেশিনগান গর্জে উঠেছে। শৃঙ্খলিত ক্রন্দনকে পরিহাস করছে সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রের অট্টহাসি।

বাইরে বিস্তীর্ণ বীথিপথ থেকে মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। বাঁশির স্বর ভেসে আসছে তেমনি ভাবেই, দূরযাত্রী স্টীমারের গম্ভীর আহ্বান! সে আহ্বান শুধু এখান থেকে নয়—আরো দূর থেকে, পাঞ্জাবের অনুর্বর মরুসদৃশ ভূমিখণ্ড থেকে। সেখানে গুলি খেয়ে

রক্তাক্ত মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বিচ্ছিন্ন রক্তপদ্মের মতো—সেখানে যূপবদ্ধ পশুর মতো নগ্ন নারীদেহের ওপরে একটার পরে একটা চাবুকের আঘাত এসে পড়ছে।

অনুপমার মনের ভেতরটা যেন জ্বলে যেতে লাগল। কী প্রয়োজন ছিল এমন ভাবে এই শান্ত সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দেবার, কী অধিকার ছিল অরুণের? শঙ্করদার গানের যে স্বপ্ন মনটাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল—একটা নিষ্ঠুর আর অশুভ আঘাত দিয়ে অরুণ তাকে তিক্ত আর বিষদগ্ধ করে দিয়েছে।

—কিছু যদি মনে না কর—ঘরের স্তব্ধতাটাকে অরুণ হঠাৎ টুকরো টুকরো করে দিলে: একটা কথা বলতে চাই।

—বলুন।

—জালিয়ানওয়ালা ডে নিশ্চয় জান।

বিদ্রোহে অনুপমার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। নিবিষ্ট চিত্তে একটা কাচের পেপার-ওয়েটকে পরীক্ষা করতে করতে মৃদু গলায় জবাব দিলে, জানি।

—আমরা কত অসহায়, কশাইখানার পশুর মতো কেমন করে নির্বিবাদে শানানো ছুরির নিচে প্রাণ দিতে পারি, সেদিন তার প্রমাণ দিয়েছি। তার ধারা আজো শেষ হয়নি—আজো আমরা তার জের টেনে চলেছি।

অরুণ যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। কথাগুলো আঘাত করতে লাগল অনুপমার কানে। এর প্রতিবাদ করা উচিত, স্পষ্টাক্ষরে, তীব্র ভাষায় বলে দেওয়া উচিত, এজন্য অরুণকে এখানে ডেকে আনা হয়নি। কিন্তু অনুপমা বলল না, নীরবে ইন্দ্রধনু-রঙা পেপার-ওয়েটটার দিকে চোখ রেখে তেমনি কথা শুনে যেতে লাগল।

ড্রইংরুমে রেডিয়োতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেজে উঠল: 'ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর'। রবীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তির ওপরে যেন জীবনের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আলো কিসের? তাঁর গানের এই অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিতরঙ্গে, না জালিয়ানওয়ালা স্মরণ করে? সেই যেদিন সমস্ত দেশের বাণীমূর্তি হয়ে—বেদনার প্রতীক হয়ে অপমানিত সম্মানের ময়ূরপুচ্ছ তিনি ধুলোতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন?

অরুণ হঠাৎ সহজ এবং অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে অনুপমার মুখের দিকে তাকাল। বললে, সত্যি কথা, আজকে ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর। টী-পার্টি না থাকলে কালকে তোমাকে মিটিঙে যেতে বলতাম।

এতক্ষণে কথা কইল অনুপমা।

—কিন্তু বাবা শুনলে কী বলবেন জানেন তো?

অরুণ প্রশান্তভাবে হাসল: জানি। আমার টিউশনিটা যাবে। কিন্তু সেটাই বড় ক্ষতি নয়। তার চাইতেও বড় ক্ষতি হবে—যদি তোমরা আজো নেমে না আস! আজ তোমরা

যেখানে আছ আঘাতটা হয়তো সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। কিন্তু সকলেরই দিন একদিন আসবে, বলির খড়্গ সেদিন কাউকে বাদ দেবে না অনুপমা।

মনের মধ্যে যে বিদ্রোহের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল সেটা সরে গিয়ে সঞ্চারিত হতে লাগল একটা অপরিসীম বিস্ময়। কী ভেবেছে অরুণ, কিসের জোরে এতখানি সাহস সঞ্চয় করেছে সে? এ বাড়ির আবহাওয়ায় এই কটি কথার অপরাধেই চরম দণ্ডের বিধান—প্রসন্নবাবুর কানে একবার গেলে কালই অরুণের মুখের সামনে লোহার ফটকটা বন্ধ হয়ে যাবে। রাগ ভুলে গিয়ে অনুপমা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

অরুণ বললে, কিন্তু সে যাক। তুমি তো বড়লোক। কিছু চাঁদা দাও না আমাদের।

অনুপমা তেমনি বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে রইল। আজকে আশ্চর্য লাগছে অরুণকে—মনে হচ্ছে অন্য কেউ, মনে হচ্ছে কোনো নতুন লোক। শুধু গ্রামার নয়, শুধু পড়ার বই নয়, প্রতিদিনের রুটিনে-বাঁধা প্রাইভেট টিউটারের কর্তব্য পালনই নয়। অরুণ আজকে এগিয়ে এসেছে অসঙ্গত ভাবে, একটা অবাঞ্ছিত অন্তরঙ্গতা করছে, করছে অনধিকারচর্চা। কিন্তু তবু অনুপমার খারাপ লাগল না।

—সত্যি, কিছু চাঁদা দিলে উপকার হয়। পার্টির অবস্থা খারাপ, তোমরা বড়লোকেরা কৃপা না করলে কার মুখের দিকে তাকাই বলো?

চিরদিনের নীরব মানুষটা অপ্রত্যাশিতভাবে মুখর হয়ে উঠেছে আজকে। রেডিয়োতে তেমনি বেজে চলেছে: "মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ, নব-অঙ্কুর জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ।" হাস্নুহানার গন্ধের মদিরতা—ঝাউবনের মর্মর। কালকে জালিয়ানওয়ালা দিবস—পরাধীন জাতির রক্তযজ্ঞের স্মরণ-তিথি।

—সত্যি চাচ্ছেন চাঁদা?

অরুণ হঠাৎ হেসে উঠল প্রবল ভাবে। চমকে গেল অনুপমা, পেপারওয়েটটা হাত থেকে আছড়ে পড়ল নিচের কার্পেটটার ওপর। রেডিয়োর গানটা অবধি যেন থমকে বন্ধ হয়ে গেল।

—বাঃ, চাঁদা কেউ মিথ্যে করে চায় নাকি?

—আচ্ছা বসুন একটু।

ঘরের মধ্যে উঠে গেল অনুপমা, বেরিয়ে এল একটা দশ টাকার নোট নিয়ে। বললে, নিন।

অরুণ বললে, সবটাই চাঁদা দিচ্ছ নাকি?

—কেন, আপত্তি কেন?

—বলো কী, আপত্তি! কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আশীর্বাদ করছি পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাও এবারে—অরুণ উঠে দাঁড়াল: তা হলে চললাম আজকে। কাল তুমি ছুটি নিচ্ছ তো?

অনুপমা উঠে দাঁড়াল : আমি ছুটি না নিলেও আপনি ছুটি নিতেনই মনে হচ্ছে।

—তা বটে—অরুণ প্রসন্নমুখে হাসল ; কয়েক পা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তারপর কী ভেবে পেছন ফিরে বললে, কিন্তু কাল তুমি মিটিংএ গেলে সত্যি খুশি হতাম।

—বাবাকে খুশি করা আগে দরকার—সেটা ভুলবেন না।

হঠাৎ যেন মোহ ভেঙে গেল অরুণের। মনে পড়ে গেল অনেকখানি বেশি এগিয়ে পড়ছে সে, এতটা করবার তার অধিকার ছিল না। অরুণ থেমে দাঁড়ালো—দশ টাকার নোটটা যেন হাতের ভিতর জ্বালা করে উঠল। শেষ কথায় অনুপমা মৃদু একটা আঘাত দিয়েছে তাকে, আঘাত দিয়েছে অভিজাতসুলভ স্বাভাবিক অবজ্ঞার। এসব কথা বলবার কী প্রয়োজন ছিল অনুপমাকে? এর মূলে কি প্রিয়তোষের অনুপ্রেরণা আছে, একটা শিভাল্‌রি করবার—এক ধরনের প্রোপোজ করবার?

অনুপমা ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে—বারান্দার তরল অন্ধকারে অরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। চেনে বাঁধা মাস্টিফ্‌ কুকুর দুটো সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ্য করছে তাকে—অনুপমার আদরের কুকুর। নোটটাকে পকেটে পুরে অরুণ দ্রুতপদে হাঁটতে শুরু করে দিল—আইভিলতায় ঘেরা লোহার গেটটা পার হয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

ড্রইংরুমে রেডিয়োর কাকলি থেমে গেছে, কী একটা উদ্দাম আলোচনায় যেন ঝড় বইতে শুরু করেছে ওখানে। শিবানী দেবী হেসে উঠলেন, তার নিচে চাপা পড়ে গেল নির্মলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কিন্তু নির্মলের উত্তেজনায় ভাঁটা পড়েনি—তেমনি টেবিল চাপড়ে সে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। সব কিছু সম্বন্ধে শেষ কথা বলবার দায়িত্ব এবং অধিকার নিয়েই যেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে সে।

কিন্তু অনুপমা ঘরে ঢুকতেই আলোচনায় ছেদ পড়ে গেল। নির্মল বললে, আসুন। হেক্সাগন সোনার ফ্রেমের অন্তরালে চোখ দুটো কথা কয়ে উঠেছে তার।

একটা সেটির ওপরে ক্লান্ত ভাবে নিজেকে এলিয়ে দিলে অনুপমা।

বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন প্রসন্নবাবু। ডান পায়ের হাঁটুটার ওপরে একটা মাফলার জড়ানো। বিকৃত মুখে বললেন, অরুণ চলে গেল নাকি? আটটা তো বাজেনি এখনো!

—আমিই বিদায় করে দিলাম। ভালো লাগছে না পড়তে।

নির্মল গুজন-করা হাসি হাসল। বললে, বেশি পড়া ভালো নয় মিস্‌ সরকার, ওরিজিন্যালিটি নষ্ট হয়।

—ধন্যবাদ।

শিবানীর মেদবহুল পরিস্ফীত গাল দুটো চরিতার্থ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল : অনু আজকাল বেশ কবিতা লিখছে নির্মল। সেদিন বিশ্ববন্ধুতে ওর 'শ্রাবণসন্ধ্যা' বলে যে কবিতাটা ছাপা হয়েছে দেখনি তুমি?

—কই, না তো ?—বিস্মিত অভিমানে নির্মল বললে, এ আপনার অত্যন্ত অন্যায় মিস্ সরকার। স্রষ্টার কাজ শুধু সৃষ্টি করাই নয়—অন্যকেও সে আনন্দের অংশ দেওয়া, এ কি আপনি জানেন না ?

অনুপমার ক্লান্তি লাগছিল। নির্মল বড় বেশি সাজিয়ে কথা বলে, বড় বেশি পরিমাণে ভালো কথা গুছিয়ে রাখে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োগ করবার জন্যে। কেন আর একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না সে ? হঠাৎ মনে হল: বাইরে নদীর ধারে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ কলরব করছে, চিৎকার করে যা খুশি গান গাইছে, তাদের মতো করে নির্মল যা হোক একটা অশোভন কিছু চেঁচিয়ে উঠলেই যেন তার চেতনার ওপর থেকে ভার নেমে যেত।

—কী করতে বলেন ?

—বলি কবিতাটি পড়ে শোনাতে। কেমন সুন্দর সন্ধ্যাটি, কাব্যচর্চার এর চাইতে ভালো অবকাশ আর কী আছে বলুন ?

—কাব্যচর্চা ?—অনুপমা তীক্ষ্ণভাবে হাসল: কিন্তু এতক্ষণ যা চর্চা করছিলেন সে অফিস-কাব্যের সঙ্গে এর সুর নিশ্চয় মিলবে না। ডার্ক-ডেভিল্ আর স্যাটান সাহেবের নাম এ কবিতায় খুঁজে পাবেন না কোথাও।

আক্রমণটা যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। আহত নির্মল কিছুক্ষণ নিজের কানকে যেন বিশ্বাসই করতে পারলে না। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে অনুপমা, কিন্তু এর মধ্যেই রসনা এমন খরধার হয়ে উঠেছে কী করে এবং এই আক্রমণের হেতুই বা কী ? এতদিন নির্মল ছেলেমানুষ মনে করত অনুপমাকে—কথা বলত খানিকটা কৌতুক আর খানিকটা বাৎসল্য বহন করে। একটা চমক খেয়ে মনে হল অনুপমা আজকে বড় হয়ে উঠেছে—এই মুহূর্তে একটা স্বতন্ত্র সত্তা জেগে উঠেছে তার। বালিকা থেকে তরুণী। তীক্ষ্ণ-ভাষিণী এবং তীব্রহাসিনী আধুনিকা।

নির্মল বোকার মতো হেসে উঠল: আপনার সেন্স অফ হিউমার কিন্তু চমৎকার। ডার্ক-ডেভিল্ আর স্যাটান! অপূর্ব কয়েন্ করেছেন নাম দুটো।

প্রসন্নবাবু বাতগ্রস্ত পা দুটোর পরিচর্যা করছিলেন এবং হাঁটুটা টিপে টিপে পরীক্ষা করছিলেন বাতটা কতখানি ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে। নির্মলের কথায় যেন ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর। খানিকটা নির্বোধ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি: ডার্ক-ডেভিল্ আর স্যাটান! ইউনিক—ইউনিক।

অসীম বিরক্তিতে চুপ করে রইল অনুপমা। আর বিরক্তির পাত্রটাকে পূর্ণ করে দিয়ে কোথা থেকে শিবানী একটা মাসিকপত্র সংগ্রহ করে আনলেন, ধপাস করে নির্মলের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, পড়ো।

বাতের ব্যথা ভুলে গেলেন প্রসন্নবাবু। উৎসাহিত গলায় বললেন, পড়ো, পড়ো। বেড়ে হয়েছে কবিতাটা। আমি তো ওসব বিশেষ কিছু বুঝি-টুঝি না, কিন্তু সত্যি বলতে কি, অদ্ভুত কবিতা পড়ে আমারই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

—তাই নাকি? নির্মল অনুপ্রাণিত হওয়ার দারুণ চেষ্টা করলে একটা নিজের অপ্রতিভ অস্বস্তিটাকে চাপা দেওয়ার জন্যেই। একসঙ্গে খসখস করে অনেকগুলো পাতা উলটে গেল সে। তারপর আর্কিমিডিস যেমন ভাবে ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি গলায় বললে, এই যে—পেয়েছি!

চূড়ান্ত অস্বস্তিতে অনুপমার মনটা ভরে উঠেছে। কালকে জালিয়ানওয়ালা ডে—অরুণের এই একটা কথাতেই এতদিনের সমস্ত সংস্কার আর চিন্তাধারায় যেন দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। প্রতিদিন যাকে মনে হত স্বাভাবিক—মনে হত এ ওর জীবনে অবশ্যম্ভাবী, একটা কুৎসিত ন্যাকামির মতো অনুপমাকে তা পীড়িত করে তুলতে লাগল।

উঠে যাওয়ার প্রেরণা বোধ করেও অনুপমা উঠতে পারল না। দেখাই যাক, নির্মল কী বলে তার কবিতা সম্বন্ধে। নির্মলের যত দোষই থাক, কবিতা সম্বন্ধে তার একটা রস-গ্রাহী মন আছে একথা মানতেই হবে। অরুণের মতো এদিক থেকে সে শুধু নীরস নেস্‌ফিল্ডই নয়। নতুন সাহিত্যিকের স্বাভাবিক দুর্বলতা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল অনুপমা।

কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে নির্মল বললে, পড়বেন আপনি?

—আপনিই পড়ুন।

ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে নির্মল। কবিতার প্রতি মৌখিক যত উৎসাহই থাক, আপাতত প্রসন্নবাবুর বাতের ব্যথাটার দিকেই মনোযোগ বেশি, বিকৃত মুখে প্রাণ-পণে হাঁটুটাকে টিপে চলেছেন তিনি। শিবানী অস্বাভাবিক ভাবে হাঁ করে আছেন—মেদ-গ্রস্ত চোখ দুটো আত্মপ্রসাদে মিটমিট করছে। কাতলা মাছ যখন টোপ গেলে তখন তার মুখ-চোখের ভঙ্গিটা কি শিবানীর মতোই হয় নাকি? যেন কবিতাসুদ্ধ নির্মলকেই তিনি সাগ্রহে টপ করে গিলে ফেলবেন। আর অনুপমা কার্পেটের দিকে তাকিয়ে আছে, বড় গোলাপ ফুলটাকে লক্ষ্য করছে, না নিজের পায়ের জুতোটাকেই, ঠিক বোঝা গেল না।

নির্মল বললে, তাহলে পড়া যাক।

সকলের হয়ে শিবানী একসঙ্গেই তিনটে গলায় যেন সাড়া দিলেন: পড়ো। চোখের দৃষ্টিটা আরো উৎফুল্ল, মুখটা আরো খানিক বিস্ফারিত। প্রকাণ্ড কাতলা মাছটা টোপ গিলল বলে।

যেমন করে শুদ্ধ এবং শান্ত চিত্তে লোকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, তেমনি একটা উদাত্ত ভঙ্গিতে কবিতাটা পড়তে শুরু করলে নির্মল। তার গলা সুরেলা, আবৃত্তিও চমৎকার করতে

পারে, এ কথাটা অনুপমাকে মানতে হল।

নির্মল পড়তে লাগল :

কাজলী নদীর তীরে তীরে দোলে সিক্ত বেতসবন
ভরা-ভাদরে বয়ে যায় নদীজল,
এপার-ওপার বন্দী হয়েছে ধূমল মলিন ছায়ে
জল-তরঙ্গ বেজে ওঠে ছলোছল।
সুদূর বলাকা মেদুর শূন্যে মেলেছে ধবল পাখা
বিরহী কবির মন্দাক্রান্তা স্বপন-ছন্দ মাখা ;
প্রাচীমূলে যেথা শেষকলাশশী কাঁদিছে যক্ষপ্রিয়া
সন্দেশবাহী চলিয়াছে মেঘদল—

বাঃ, চমৎকার অ্যাটমোস্ফিয়ার ফুটিয়েছেন তো! মেঘদূতের জগৎটা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আব কী অপূর্ব শব্দ আর ছন্দোজ্ঞান আপনার—ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে যে স্থায়ী আসন পাবেন আপনি!

সলজ্জ দীনতায় মাথা নীচু করে রইল অনুপমা। আর শিবানীর মুখভঙ্গিটা ক্রমশ অবর্ণনীয় হয়ে উঠতে লাগল—এমন কি বাতের ব্যথাটা অবধি ভুলে গেলেন প্রসন্নবাবু।

নির্মল পড়ে চলল :

দূর-দিগন্তে হারায়েছে আজ বঙ্কিম পথখানি
যাত্রা-পথিক চলেছে সঙ্গিহীন,
হেথায় কাটিছে পথিক-বধূর বিবশ প্রহরগুলি
নিবালোক ঘন ব্যথিত দীর্ঘ-দিন ;
উৎসবহারা সন্ধ্যা ঘনায় প্রান্তর-সীমাপারে
কাজলী নদীর কল্লোল-গীতি বাজিতেছে বারে বারে
স্বপ্ন নেমেছে বেণু-কদম্ব-কেতকীর বনে বনে
বেতস-কুঞ্জ আঁধারে হয়েছে লীন।

কবিতাটা চমৎকার পড়ছে নির্মল। সমস্ত ঘরটা যেন বিহ্বল আর মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, এমন কি শিবানীর মুখ-বিকৃতিটাও আর অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। নিজের কবিতাটা যে এত সুন্দর, তার সুর যে এমন করে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারে, এ কথা অনুপমাও কোনদিন কল্পনা করেনি।

মনের ওপর থেকে জালিয়ানওয়ালার মেঘ কেটে গেছে,—সরে গেছে একটা দুঃস্বপ্নের কুজ্ঝটিকা। পাঞ্জাবের মাটিতে যদি অনেক মানুষের রক্ত ঝরে গিয়েই থাকে, তাতে ক্ষতি কী অনুপমার! পৃথিবীতে অনেক কিছুই ঘটে চলেছে, অনেক অবিচার, অনেক অন্যায়। কী

প্রতিকারের ক্ষমতা আছে তার? এই মুহূর্ত সত্য—বাইরের ঝাউবীথির সঙ্গীত সত্য—এই ছোট কাব্যচর্চার আসরটিও সত্য। এই ভালো—ভুলে যাও পৃথিবীর কোলাহলকে, কলরবকে, ছোট বড় সংঘাতকে।

নির্মলের মুখের দিকে প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাল অনুপমা। আর রাগ হচ্ছে না—অসহ্য একটা ন্যাকামির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। হেক্সাগন ফ্রেমের আড়ালে একটা বিচিত্র ইঙ্গিত—আনন্দিত রোমাঞ্চে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল অনুপমার।

তিন

এদিকে ইস্ট-এণ্ড।

ইলেকট্রিকের আলোগুলো এখানে দূরে দূরে—বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়ানো। শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকারের মাঝে মাঝে যেন ছেদ ফেলেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি পানা আর কচুরির গন্ধ ভেসে বেড়ায়—মানুষের ছায়া দেখে চিৎকার করে নেড়ী কুকুর। খোয়া-ওঠা পথে পায়ে হোঁচট লাগে। কাঠ-বিড়ালে খাওয়া একটা নারকেল ঝুপ করে খসে পড়ে টেলিগ্রাফের তারের ওপর—ছন্দোহীন শ্রীহীন প্রায়-নিঃশব্দ রাস্তার ওপর দিয়ে যেন ছড়িয়ে যায় একটা বিরাট তার-যন্ত্রে আকস্মিক মীড়ের ঝঙ্কার।

টিনের চালা আর কাঠের বেড়া দেওয়া একটা পুরনো বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল অরুণ। বাঁ দিকের ঘরের দরজায় মৃদু একটা আঘাত দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

পুরনো টেবিল আর আধভাঙা শেল্‌ফে রাশি রাশি বই। অনুপমার বইগুলোর মতো নতুন নয়, ঝক্‌ঝকেও নয়। বহু ব্যবহারের চিহ্ন তাদের সর্বাঙ্গে—কোনো কোনোটায় ময়লা খবরের কাগজের মলাট পরানো। একটা টেবিল ল্যাম্প মৃদু আলো বিকীর্ণ করছে তার মাঝখানে। আর ঠিক সামনেই আত্মত্যাগী বীর যতীন দাসের বড় একখানা ছবি—বাংলার ম্যাকস্থইনি।

ঘরের মাঝখানে একখানা ছোট খাট—ময়লা সতরঞ্চি পাতা। ঘরের মালিক বেলা ছোটখাটো মানুষ—এর চাইতে বড় খাট তার দরকার হয় না। তা ছাড়া মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা বোধও বেলার কম। একরকম করে দিন কাটিয়ে গেলেই যেন তার চলে।

খাটের ওপরে বেলা আর প্রমীলা—একরাশ পোস্টার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। লাল নীল কালিতে তুলি ডুবিয়ে তারা লিখে যাচ্ছে: পাঞ্জাবের রক্তযজ্ঞে আত্মত্যাগী শহীদদের স্মরণ করুন।

অরুণের পায়ের শব্দে দুজনেই মুখ তুলে তাকাল। গায়ের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে বেলা

উঠে বসল, হাই তুলল।

অরুণ বললে, কতদূর হল ?

লাল কালি দিয়ে রক্তযজ্ঞ কথাটার ওপর তুলি বুলোতে বুলোতে প্রমীলা বললে, প্রায় শেষ।

—প্রায় শেষ ?—বেলা ভ্রূভঙ্গি করলে : শেষ মানে ? এখনো স্তূপাকারে যা পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ ?

—ও হয়ে যাবে।

—হুঁ, সারারাত বসে বসে লিখলে নিশ্চয় হয়ে যাবে। তা হলে তুমিই লেখো, আমি আর পারব না। আঙুলগুলো টনটন করছে আমার।

অরুণ হাসল : গৃহবিবাদ হচ্ছে সর্বনাশের মূল। সারারাত বসে বসে এভাবে যদি ঝগড়া করতে পারো তা হলে বছর পাঁচেকের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবে ভরসা হচ্ছে।

বেলা বললে, অরুণদা, গালাগালিটা নিশ্চয় আমাকেই দিলে ?

—না, দুজনকেই।

—উহুঁ, ওটা গৌরবে বহুবচন।

—ভাষাতত্ত্ব থাক। কাজটা শেষ করে ফেল তো লক্ষ্মীটি।

প্রমীলা বললে, বেলা কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে অরুণদা। ষোলখানার ভেতরে মোট পাঁচখানা লিখেছে আর সেই থেকে হাই তুলছে।

—এই প্রমীলাদি, মিথ্যা কথা বোলো না। পাঁচখানা নয়, সাড়ে চারখানা। বাকী অর্ধেকটা তুমি লিখেছিলে।

—দেখছ প্রমীলা, বেলা তোমাকে কি রকম ভালোবাসে। আধখানা পোস্টারের জন্যে প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকেও তোমাকে বঞ্চিত করতে রাজী নয়।

প্রমীলা হাসল : হুঁ, ভালো কথা ও খুব বলতে পারে। কিন্তু ভালো করে একটু লিখে দিলে কাজ হত ঢের বেশি।

অরুণ বললে, আমি তা হলে উঠে পড়ি। বসে থাকলে তো তোমাদের ঝগড়াই চলতে থাকবে। কাল সকাল সাতটার মধ্যে পোস্টারগুলো শেষ করা চাই—সুজিত এসে নিয়ে যাবে।

বেলা লিখতে লিখতে হঠাৎ মুখ তুলল। মৃদু কৌতুকের হাসি ঝিকিয়ে উঠল চোখের কোনায় : বাঃ, যাবে মানে ? রাত নটা বাজে, খেয়াল আছে ? প্রমীলাদিকে আধ মাইল রাস্তা এগিয়ে দেবে কে শুনি ?

—আমি না এলে কে এগিয়ে দিত ?

—তুমি যে আসবেই প্রমীলাদির ইনটুইশন সেটা বলে দিয়েছিল। নইলে এত রাত পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতে পারতাম নাকি ?

প্রমীলার মুখের ওপরে রক্তোচ্ছ্বাস বয়ে গেল, কালো মেয়েটির কালো চোখের দৃষ্টিটা স্নিগ্ধ আর মধুর হয়ে উঠল মুহূর্তে : এই থাম্, তোকে আর ইয়ার্কি দিতে হবে না।

প্রমীলা আবার চোখ নামিয়ে নিল পোস্টারের ওপরে ; তুলির মাথাটা মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল। বুকের মধ্যে দুলছে রক্তের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস। অকারণে সমস্ত শরীরটা ঝিম-ঝিম করছে। নিজের দুর্বলতাটা নিজের কাছে আর গোপন নেই—বেলাও সেটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু কী লাভ এতে ? যা কখনো জীবনে রূপ পাবে না, যা কখনো সত্য হয়ে উঠবে না—কি সান্ত্বনা তার ব্যর্থ তপস্যা করে ? রুদ্রসন্ন্যাসীর তপোভঙ্গ হবে না কখনো—তার দরজা থেকে ব্যর্থ আর অপমানিত বসন্ত বারে বারেই ম্লান মুখে ফিরে যাবে।

কিন্তু অরুণ কিছু লক্ষ্য করলে না। সংক্ষেপে বললে, থাক, আমি বসছি।

শেল্‌ফ থেকে একখানা মোটা রাজনীতির বই টেনে নিলে অরুণ। কিন্তু কয়েকটা পাতা উলটে যাওয়ার পরেই সমস্ত চেতনাটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। দৃষ্টির সামনে অকারণেই ভেসে উঠেছে অনুপমার মুখখানা। নিখুঁত সুন্দরী—স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। মার্জিত, পরিচ্ছন্ন, বুদ্ধিতে বিমণ্ডিত। ঐশ্বর্য আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকলে অনুপমাকে মন্দ লাগে না, ওর কাছে থাকার মুহূর্তগুলো মনকে যেন মধুস্বাদে ভরে রাখে।

বহুদিন রাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জানালার পারে নারকেল-বীথির কালো পটভূমির ওপরে সীমাহীন আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল মণিমালার মতো জ্বলে, তখন মনে পড়ে অনুপমাকে। একটা নিবিড় সহানুভূতি—একটা বেদনার সূক্ষ্ম সূচীমুখ বুকের মধ্যে বিঁধতে থাকে খচখচ করে। খানিকটা আগুনের মতো অনুপমা—খানিকটা বন্দী বিদ্যুৎশিখার মতো। অরুণ ভাবে : কেন ও নিজেকে চিনতে পারে না, কেন বিকীর্ণ করে দিতে পারে না বহুর মধ্যে, তরঙ্গিত জীবনধারার বিচিত্র বিকাশের ভেতরে ?

কখনো কখনো পড়াতে পড়াতে বাইরে হয়তো নেমেছে বর্ষা-সন্ধ্যার ঘন বর্ষণ। মর্মরিত ঝাউবীথি হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে—হয়তো তাদের চেতনায় চেতনায় সাড়া দিয়েছে আদিম অরণ্যের আহ্বান। নির্জীব শাখাপ্রশাখায় হয়তো প্রসারিত হয়ে গেছে সেই সমস্ত বহু-বিস্মৃত দিনের স্মৃতি, যেদিন দিক-দিগন্তে শুধু ছিল উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর আর টেরাইয়ের বিস্তৃত বনভূমি। পাথরকাটা ঝোরার জলে হঠাৎ বান নেমেছে, অট্টহাসির মতো আছড়ে পড়ছে রাশি রাশি জল—পাথরের চাঙাড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার আঘাতে আঘাতে। আর ওপরে নিচে সম্মুখে পেছনে—সারি সারি—ছেদহীন শ্রেণীতে ঝাউয়ের বন উপভোগ করছে, অনুভব করছে, সহস্র বাহু দিয়ে আহরণ করে নিচ্ছে উন্মুক্ত উন্মত্ত জীবনের অকৃপণ আনন্দ।

বাইরে ঝাউবনের সেই গান—নদীর জলে কলোচ্ছ্বাস, বসবার ঘরে রেডিয়োতে গান বাজছে "মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগ্‌ দিগ্‌ অন্তের পারে"। তার সুরটা মিশে গিয়েছে বর্ষার জলতরঙ্গের সঙ্গে। আর অন্য-মনে মুখ তুলে জানলার বাইরে তাকিয়েছে অনুপমা। বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্তি তার মুখখানার ওপরে ক্ষণিকের ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছে। পড়ার বই ভুলে অরুণের মনে হয়েছে কী একটা বেদনায় যেন অনুপমা আত্মবিস্মৃত; তারও মন কি আজ মেঘের সঙ্গী হয়ে উড়ে যাচ্ছে কোনো নিঃসীম শূন্যতায় কোনো শ্রাবণ-বর্ষণ সঙ্গীতে? হংসবলাকার পাখায়-পাখায় সেও কি আজ দেখেছে কোনো মেঘনীল উন্মুক্ত গিরিশৃঙ্গের স্বপ্ন? যেন ওই ঝাউবনের মতো নিজের জীবনেও সে বহু মানুষের সত্তাকে অনুভব করছে; যেন এখানে সে বন্দিনী ইলেকট্রিকের তারে বাঁধা ওই সাজানো ঝাউগাছগুলোর মতো একটা কৃত্রিম পরিবেশে শৃঙ্খলিত। এই বর্ষার সন্ধ্যায় ওই ঝাউবনের মতো তার মুক্তির কামনা যদি সার্থক হয় তা হলে সে নেমে আসবে সকলের মাঝখানে—সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলবে: আমি তোমাদেরই; বহুদিনের বহু পাপ আর ভুলে দূরে সরে ছিলাম, আজ সে রাহুর গ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছি—আজ তোমাদের সঙ্গে আমার প্রাণ মিলিয়েছি।

কিন্তু হঠাৎ অরুণ সজাগ হয়ে উঠল: এর কতটুকু সত্য? তার নিজের মনের এই কাব্য—বর্ষার সেই বিশেষ বর্ণবিন্যাসের মধ্যে নিজের স্বপ্নাতুরতা—তার থেকেই কি এর সৃষ্টি হয়নি? অনুপমাকে যেমন করে সে ভাবতে চায়, অনুপমা নিজেকে কি তেমনি করেই ভাবে? এর অনেকটা—হয়তো সবটাই কি 'উইশফুল থিঙ্কিং' নয়? হয়তো সেই মুহূর্তে অনুপমা ভাবছে আসন্ন টী-পার্টির কথা, হয়তো বা কোনো নতুন বন্ধুর কথা, আর হয়তো বা কোনো নতুন শাড়ির কথা—বিশেষ একটা গয়নার কথা। কে জানে, মেয়েদের মনের কথা অরুণ ঠিক বুঝতে পারে না।

বেলার ঘড়িতে টং করে একটা শব্দ হল। সাড়ে ন-টা। অরুণের হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গেল। প্রমীলা আর বেলা তেমনি নতমুখে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পোস্টারের ওপরে তুলি বুলিয়ে চলেছে।

—হল, প্রমীলা?

—আর পাঁচ মিনিট অরুণদা, আর একটু বসুন।

পোস্টারের ওপরে লাল অক্ষরে লেখা ফুটছে: পাঞ্জাবের রক্তযজ্ঞে আত্মত্যাগী শহীদদের স্মরণ করুন—জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন করুন—

আবার অনুপমার দিকে ফিরে গেল অরুণের মন। কিন্তু সত্যিই কি সবটা 'উইশফুল থিঙ্কিং'য়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যাবে? যদি অনুপমা আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকে—কেন সে জেগে উঠবে না সেই বিস্মরণের অবলুপ্তি থেকে। কেন সে স্মরণ করবে না ভারতবর্ষের

আত্মত্যাগী বীরদের—কোটি কোটি লাঞ্ছিত মানুষকে ?

অনুপমার কথাটা মনে পড়ে গেল : বাবাকে আগে খুশি করা দরকার সেটা ভুলবেন না। তখন খোঁচা লেগেছিল, অনুতাপ বোধ করেছিল একটু বেশি মাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে, চাঁদা চাইবার জন্যে। পকেটে হাত দিয়ে অরুণ দেখল দশ টাকার নোটটা ঠিক আছে সেখানে। এ ঘনিষ্ঠতা করবার প্রয়োজন আছে, আঘাত খেলেও এগিয়ে যাওয়ার দরকার আছে। অনুপমা যদি নিজে না জাগে, জাগাতে হবে তাকে ; যদি নিজের শিকল সে ছিঁড়ে ফেলতে না পারে, সেই শিকল ছেঁড়বার সাহস আর শক্তি দিতে হবে। আগুনের মতো অনুপমা—বন্দিনী খানিকটা বিদ্যুৎশিখার মতো অনুপমা। সেই আগুন আর সেই বিদ্যুৎ কেন গণ্ডির মধ্যে বাঁধা হয়ে থাকবে—দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়বে না ?

প্রিয়তোষকে ধন্যবাদ। যদিও 'ভালগার'—যদিও মেয়েদের সম্বন্ধে ওজন বুঝে কথা বলতে পারে না, তবু ওর কথার মধ্যে সত্যি আছে। খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে—খানিকটা শিভাল্‌রাস্‌ হয়ে উঠতে হবে। দেশ অরুণের একার নয়, বেলার নয়, প্রমীলারও নয়। বলির খড়্গ কাউকে বাদ দেবে না। অনুপমাই বা আভিজাত্যের সংকীর্ণ উচ্চাসনে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে কেন এবং কী অধিকারে ?

—অরুণদা, চলুন।

—হয়েছে ?—আচ্ছন্ন চোখ মেলে অরুণ উঠে দাঁড়াল।

—আর খান পাঁচেক বাকি আছে, বেলা শেষ করে ফেলবে। অনেক ফাঁকি দিয়েছে ; এবার এতটুকু অন্তত করুক।

বেলা বিরস মুখে বললে, তোমাকে বললাম থেকে যেতে, তুমি কিছুতেই থাকবে না। এই রাত্রিতে মেসে না ফিরলে কী ক্ষতি হত তোমার ?

—না, না, কালকে লাস্ট ডে—মার্ক সাবমিট করতেই হবে। অনেকগুলো খাতা বাকি আছে ভাই, সকালে কিছুতেই শেষ করতে পারব না।

বেলা রাগ করে বললে, তা হলে মরোগে, যাও।

—মরলে তো তোর আর অরুণদার পোস্টারের হাত থেকে বেঁচেই যেতাম। সেটা ভালোই হত।

—কিন্তু মরতে দিচ্ছে কে তোমাকে ? এমন পোস্টার-লিখিয়ে তা হলে আর পাওয়া যাবে কোথায় ?—অরুণ হাসল : কিন্তু যাবে তো আর রাত কোরো না। আমার ঢের কাজ বাকি, এখানে বসে থাকলে চলবে না।

—চলুন।—কাঁধের ওপর ব্রোচটা ভালো করে এঁটে দিয়ে পায়ে চটিটা টেনে নিলে প্রমীলা। ক্ষীণ দুর্বল শরীরে ময়লা খদ্দরের শাড়িটাকে কেন যেন বেমানান মনে হয় —মনে হয় যেন ওটার ভার প্রমীলা আর বইতে পারছে না। বললে, আসি বেলা।

বেলা চোখের কোনায় কৌতুকের ঝলক দিয়ে তেমনি মৃদু হাসল। বললে, এসো।

লক্ষ্য করেও সেটা লক্ষ্য করল না প্রমীলা। অরুণ তখন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বারান্দাতে। প্রমীলা আসতেই দুজনে পথে নেমে পড়ল।

ইস্ট-এণ্ডের অন্ধকার পথ। এখানে ওখানে কুকুরের সতর্ক চিৎকার—এত বেশি সতর্ক আর সন্দিগ্ধ বলেই চোর ধরতে পারে না, ওদের চোখের সামনে দিয়েই শেয়ালে গৃহস্থ-বাড়ির হাঁস চুরি করে সরে পড়ে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীকে বাঁধবার কামনায় তরুণ মানবদের আকুল সারস্বত সাধনা—লেট এ বি সি বী এ ট্রাংগল—

দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগল। পানা-পুকুরের পাশের ঝোপে ডাহুক ডাকছে। প্রমীলার স্যাণ্ডালের শব্দ বাজছে খোয়া-ওঠা পথের নুড়িতে। ঝপাস ঝপাস করে এ-গাছে ও-গাছে উড়ে পড়ছে বাদুড়।

অরুণ সংক্ষেপে বললে, অনেক রাত হয়ে গেল তোমার।

আরো সংক্ষেপে প্রমীলা জবাব দিলে, হুঁ।

কিন্তু বেলার হাসিটা প্রমীলার মনের মধ্যে জ্বালা করছে ক্রমাগত। সব জেনেশুনেও কেন এমন করে ঘা দেয় বেলা? নিভৃত ব্যথার মতো বুকের মধ্যে যেটাকে সে প্রতিক্ষণ বহন করে চলেছে, সেটাকে কেন এমনভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়? অরুণের যে চলার পথ, সে পথ কাঁটায় আকীর্ণ, সংকটে বন্ধুর। সেখানে তার দৃষ্টির সামনে একটি মাত্র আলো জ্বলছে, সে আলো স্বাধীনতার, সে আলো মুক্তির। অপমানিত মানুষের লাঞ্ছনার আগুনে নিজের পাঁজরাকে জ্বালিয়ে নিয়েছে মশালের মতো—ভারতবর্ষের মহাশ্মশানে শবাসীন কাপালিক।

সেখানে কোথায় প্রমীলা? কতক্ষণ প্রমীলা তার পথের সঙ্গী? দুর্বল মন। একদিন নিঃশব্দে ঝরে যাবে, পিছিয়ে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাবার ক্ষমতা যে তার নেই, সে কথা প্রমীলা নিজেও জানে। তবু এই মোহ—এই আত্মবিস্মৃতি। নিজেকে বার বার জয় করতে চায়, ভুলে যেতে চায়। সব জানে, সব বোঝে বেলা। তবু নিষ্ঠুরের মতো আঘাত করে, ইঙ্গিত করে।

অন্ধকার পথ দিয়ে দুজনে চলেছে। এই পথটা যদি কোনোদিন শেষ না হয়, যদি প্রসারিত হয়ে যায় সীমাহীন, লক্ষ্যহীন অনন্ত পর্যন্ত? এমনি নিঃশব্দে হেঁটে যাবে প্রমীলা, অরুণের পেছনে পেছনে চলবে নির্বাক ছায়ামূর্তির মতো। কোনো দাবি করবে না। অরুণ যদি কখনো পেছনে ফিরে নাও চায়, তবু সে সঙ্গে চলতে থাকবে, চলতেই থাকবে।

অরুণ হঠাৎ মুখ ফেরাল।

—তোমার কাজ কেমন চলছে?

—ভালো নয়।

—কেন ?

—ইস্কুল মিস্‌ট্রেসদের আপনি চেনেন না অরুণদা। উৎসাহ নেই কিছুতে, আগ্রহ নেই। কোনোমতে দিনের বোঝাটা টেনে চলতে পারলেই খুশি হয়।

—কেন ?—অরুণের গলায় বিস্ময়ের স্বর ফুটল : ওরা তো স্বাধীন—ওদের তো কারো কাছে কৈফিয়তের দায় নেই। সব চেয়ে বেশি কাজ তো ওদেরই করা উচিত।

—তাই কি ? প্রমীলা চিন্তিত হয়ে উঠল : আমার কিন্তু তা মনে হয় না। বেশি স্বাধীনতাই বোধ হয় কাল হয়েছে। স্বাধীনতার ভারও যেন আজ অনেকের অসহ্য।

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঠিক বুঝতে আপনি পারবেন না অরুণদা। মেয়েদের মন একটা সীমার বাইরে বোধ হয় আর এগোতে পারে না। খানিক পরেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তখন আশ্রয় চায় ; হয়তো তখন ভাবে, এই অবাধ স্বাধীনতার চাইতে কারো কাছে আত্মসমর্পণ করে দিলেই সুখী আর নিশ্চিন্ত হতে পারত।

কিন্তু এ পর্যন্ত বলেই চমকে থেমে গেল প্রমীলা। এমন নির্বিচার সিদ্ধান্ত কি সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য ? এ কার কথা বলছে ও ? এ কার মন ? আজ ওর কী হয়েছে যে নিজেকে এমন দীন ভাবে মেলে ধরেছে অরুণের অনুকম্পার সামনে ! নিজের ভেতরে কেমন একটা গ্লানি এসে প্রমীলার সমস্ত আবেগকে চকিতে স্তব্ধ করে দিলে।

আর ঠিক অন্য ভাবেই প্রমীলার কথাটা অরুণ চিন্তা করতে লাগল। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, ইউনিভার্সিটিতে ওর বড়দির সঙ্গে পড়ত। মেয়েটির রূপ ছিল, অর্থ ছিল, বুদ্ধি ছিল। একদিন নাকি দুঃখ করে বলেছিল, ভাই, এমন বিপদেই পড়ে গেছি ! এম.এ. পড়া মেয়েদের জন্যে বাবা-মা পাত্র খুঁজতে ভরসা পান না ; নিজেও কাউকে খুঁজে নেব, তাতেও আত্মসম্মানে বাধে। তা ছাড়া চোখের সামনে এমন কাউকে দেখতে পাই না যার কাছে নিজের সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সটা বিসর্জন দিয়ে মাথা নোয়াতে পারি। তাতেও রাজী আছি—কিন্তু তারাও তো কাছে ভিড়তে ভয় পায়। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে—বিয়ের বাজারে দিনের পর দিন দেউলে হতে চলেছি। কী করা যায় বল দেখি ?

মেয়েটি শেষ পর্যন্ত কী যে করেছিল সে ইতিহাস অরুণ জানে না। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে বাঁধা পড়াই মেয়েদের ধর্ম ? নতুন যুগের ঝড়ে যারা পাখা মেলে বেরিয়ে পড়েছে, আজ কি ঝড়ের ঝাপটা তারা সইতে পারছে না ? ভীরু গৃহকপোতীর মতো তারা নীড়ে ফিরতে চায় ? এই প্রতিক্রিয়া কি নিতান্তই অপরিহার্য সত্য হয়ে উঠেছে আজ ?

কিন্তু এর উলটোটাও কি সমান সত্য নয় ? অনুপমা ? অনুপমাকে দেখলে মনে হয় না কি, তার একটা বিরাট শক্তি পাথরের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে ? সেখান থেকে

মুক্তি দিলে বাংলা দেশে কি খুঁজে পাওয়া যায় না ক্রুপসকায়াকে, ভেরা ফিগনারকে, রোজা লুক্সেমবার্গকে ?

দশ টাকার নোটটা পকেটের মধ্যে খচখচ করছে। একটা কথা মনে পড়ে গেল অরুণের। বললে, এই নোটটা রাখো প্রমীলা।

—কিসের নোট ?

—চাঁদা।

—কে দিল চাঁদা ?

—বড়লোকের মেয়ের কাছ থেকে আদায় করলাম। অনুপমা দিয়েছে। তুমি তো ক্যাশিয়ার, জমা করে নিয়ো।

—আচ্ছা।—নোট নিয়ে প্রমীলা ভাঁজ করে রাখল নিজের ব্যাগটার ভেতর।

অরুণের গলায় উত্তেজিত আনন্দের সুর পাওয়া গেল : বেশ মেয়ে অনুপমা। এখনো নিজেকে চেনেনি বটে, কিন্তু বেশ আশা আছে ওকে দিয়ে। কয়েক দিন চেষ্টা করলে হয়তো টানা চলে। দেখব নাকি ?

—ক্ষতি কী।—তেমনি নিরুৎসুক ভাবে জবাব দিলে প্রমীলা। কিন্তু অরুণের গলায় স্বরটা কেমন অপরিচিত ঠেকছে। মেয়েদের সম্বন্ধে নির্বিকার অনাসক্তিই ছিল এতদিন ওর বৈশিষ্ট্য—যেন তার ব্যতিক্রম ঘটেছে আজ।

অরুণ বলে চলল, সত্যিই ভালো মেয়েটি। তা ছাড়া গ্র্যাণ্ড বাংলা লিখতে পারে—সেদিক দিয়েও কিছু কাজ হতে পারে বোধ হয়।

—খুব সম্ভব।

প্রমীলার বিতৃষ্ণ মনটা আরো বিস্বাদ হয়ে গেছে। মেয়েদের স্বাভাবিক সংস্কার ওর মনে একটা নতুন সম্ভাবনার ছায়া ফেলেছে এসে। সত্যিই কি এতই ভালো অনুপমা ? অথবা একটা বিশেষ ভালোর চোখ দিয়ে অরুণ দেখতে শিখছে তাকে ? আর সেই চোখের জন্যেই কি প্রমীলা চিরকাল তার পাশে পাশে হেঁটে চললেও অরুণ কোনোদিন তাকে দেখতে পাবে না ?

রাত ঝিমঝিম করছে, প্রমীলার মাথার মধ্যেও ঝিমঝিম করছে। এত ক্লান্ত লাগছে আজকে। নিজেকে এমনভাবে অসহায় বোধ হচ্ছে ! অনেকক্ষণ ধরে লিখে লিখে আঙুলগুলোও যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে তার। পা দুটো টেনে টেনে চলাও মনে হচ্ছে কঠিন পরিশ্রমের মতো।

পথ শেষ হয়ে গেল। একটা বিরাট অস্বস্তির ভার যেন নেমে গেল বুকের ওপর থেকে। একটু আগেই যে পথটা অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে প্রমীলা খুশি হত—সে পথের এতটুকু অংশ পাড়ি দিতেও এমন অসহ্য শ্রান্তি এসে দেখা দেয়—এটা কি ও আগে

বুঝতে পেরেছিল!

অরুণ বললে, তোমার মেস। এবারে আমি চললাম। সম্ভব হয়তো বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটু চেষ্টা করে দেখো।

—দেখব।

অরুণ আর দাঁড়াল না। অন্ধকার পথ বেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল, তার অনেক কাজ। মেসের দরজার পাশে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রমীলা।

বার কয়েক কড়া নাড়তে কৃষ্ণা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠে এসে দরজা খুলে দিলে। বিরক্ত গলায় বললে, এত রাত অবধি কোথায় থাক? একটা বিশ্রী কাণ্ড শেষ পর্যন্ত ঘটবে তোমার জন্য। হেড মিস্‌ট্রেস শুনলে কী বলবেন জান?

—সে ভাবনা তুমি নাই ভাবলে।—প্রমীলা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

—কিন্তু এত রাত পর্যন্ত তোমার জন্য জেগে থাকবে কে? একটা ঝি রেখে দিয়ো দয়া করে, আমি পারব না।—বিড়বিড় করে বকতে বকতে চলে গেল কৃষ্ণা।

প্রমীলা কৃষ্ণার কথার জবাব দিল না। জবাব দেবার কিছু নেই—এ প্রায় প্রতিদিনের ইতিহাস। কৃষ্ণা মানুষ খারাপ নয়—ওকে ভালোই বাসে। কিন্তু কাঁচা ঘুম ভাঙালে ভয়ঙ্কর চটে মেয়েটা।

ঘরে ঢুকে সুইচটা টেনে দিতেই প্রথমে চোখে পড়ল অগোছালো বিছানার ওপর—বিভীষিকার মতো পরীক্ষার খাতাগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। এত সম্ভব-অসম্ভব ভুল ইংরেজি লিখতে পারে মেয়েরা। এক ঘণ্টা খাতা দেখলে নিজের ইংরেজি জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। বানান ব্যাকরণ—ইডিয়াম—ফ্রেজ এবং সর্বোপরি বিচিত্র হাতের লেখার একটা মিউজিয়াম যেন।

টেবিলের ওপরে ঠাকুর ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু যেমন অসহ্য মনে হল পরীক্ষার খাতাগুলো, তেমনি খাওয়ার জন্যেও কোনো প্রেরণা বোধ করলে না প্রমীলা। হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আলোটা অফ্‌ করে দিলে, তারপর এসে দাঁড়াল জানালার সামনে।

গরিবের মেয়ে। আই.এ. পাস করবার পরে আর পড়তে পারেনি পয়সার অভাবে। সংসারের মুখ চেয়ে নিয়েছে এই ইস্কুল-মাস্টারি। কিন্তু এত দিন পরে নিজেকে কেন যে এমন ব্যর্থ আর বঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে প্রমীলা তা বুঝতে পারল না।

জানালার গরাদের ওপর মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। বাইরে কালো রাত্রি তন্দ্রামন্থর। কাল জালিয়ানওয়ালা ডে, রুদ্রযজ্ঞের আহুতি দিবস। কিন্তু প্রমীলা ভীরু, প্রমীলা দুর্বল। এই দুরূহ ব্রতের যোগ্য নয়। তা হলে কোথায় তার আশ্রয়, কিসে তার সান্ত্বনা? হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বহুদিন পরে বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা আবার

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুহাতে বুক চেপে ধরে মাতালের মতো বিছানাটার দিকে এগিয়ে এল, তারপর উবুড় হয়ে পড়ল স্তূপাকার পরীক্ষার খাতাগুলোর ওপরেই।

চার

পাশের ঘরে নির্মল ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছে। বসে বসে চেইনের মতো প্রায় আধ টিন সিগারেট শেষ করে ফেলল। ইংরেজী মাসিকপত্রগুলো আগা থেকে গোড়া অবধি পড়ে ফেলেছে—পেল্‌ম্যানিজম্-এর বিজ্ঞাপনটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু কা কস্য! অনুপমা পড়ছে তো পড়ছেই। সোনার হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত পৌনে নয়টা বাজবার উপক্রম করছে।

এতক্ষণ ধরে কী পড়ছে অনুপমা? দুজনে মিলে এমন চাপা গলায় কী পড়া সম্ভব? খানিকটা কালো আর কুটিল সন্দেহে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। নাঃ, অসহ্য করে তুলল।

একা একা কতক্ষণ থাকা যায় এভাবে? অথচ এই একা থাকবার কী চমৎকার সুযোগ নেওয়া যেত আজ। ছেলেপুলেদের নিয়ে প্রসন্নবাবু আর শিবানী কোথায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছেন, অনুপমা একাই ছিল। 'এমন দিনে তারে বলা যায়'—নির্মল ভেবেছিল আজকেই মনোভাবটা প্রকাশ করে ফেলবে অনুপমার কাছে—একটা চান্স নেবে। নিরালা নির্জন বাড়ি—আবেগ-বিহ্বল গলায় মর্মবেদনা প্রকাশ করবার এমন অপূর্ব অবকাশ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

কিন্তু এই প্রাইভেট টিউটারটাই বাগড়া দিয়েছে। রাত আটটা পর্যন্ত ওর মেয়াদ, অথচ প্রায় নটা বেজে গেল, কী পড়াচ্ছে এখনও? একটা ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়েকে এত পড়াবার কীই বা আছে?

এতদিন এই ছোকরাটাকে অনুকম্পার চোখেই দেখেছে নির্মল। গরিবের ছেলে টিউশনি করে এ বাড়িতে, অতএব নিরীহ জীব। কিন্তু এই নিরীহ মানুষটির মধ্যেই ছদ্মবেশী বৃহন্নলা লুকিয়ে নেই তো? কেমন সন্দেহ হতে লাগল।

রেডিয়োটা খুলে দিতেই পুরুষ কণ্ঠে বেজে উঠল: "অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো। খবর বলছি। আজ সন্ধ্যেবেলার মোটামুটি খবর হল মহামান্য বড়লাট গো-জাতির উন্নতির জন্যে যে সমস্ত ষাঁড় আমদানি করেছেন, ইতিমধ্যেই তা থেকে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। শোনা গেল আরো দশটি ষাঁড় সম্প্রতি নয়াদিল্লী থেকে বাংলা দেশে—"

ঘটাং। নির্মল রেডিয়ো বন্ধ করে দিলে। শুধু মহামান্য বড়লাটের বাছাই-করা ষাঁড় কেন, দিনের পর দিন নয়াদিল্লী থেকে আরো নানা রকম ষাঁড় যে আমদানি হচ্ছে তাতে আর সন্দেহ কী। অন্তত ওপরওয়ালাদের ধরন-ধারন থেকে তার প্রমাণ যেন পাওয়া যায়।

নিজেও তো অফিসার মানুষ, সুতরাং কার হাঁড়িতে কত চাল—সেটা বুঝতে ওর বড় বাকি নেই।

কিন্তু অনুপমার ব্যাপার কী! মাস্টারটা কি আজ আর উঠবে না! আর চাপা গলার ওই আলোচনা কানের মধ্যে বিষের মতো বিঁধছে। অধৈর্য ভাবে নির্মল কার্পেটের ওপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। সময় চলে যাচ্ছে—দামী, দুর্মূল্য, দুর্লভ সময়। একটু পরেই বাতের ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে আসবেন প্রসন্নবাবু, কাতলা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখ নিয়ে দেখা দেবেন শিবানী, চিৎকার করতে করতে দেখা দেবে ছোট ছোট মিসিবাবা আর মাস্টার বাবারা—বিড়ম্বনা বিশেষ। আর শিবানী! শিবানীর কথা মনে পড়তেই সমস্ত শরীর একবার ঝেঁকে উঠল নির্মলের। সত্যি বলতে কি, আজকাল সে ভয় করতে আরম্ভ করেছে শিবানীকে। প্রেমের পথ যে শুধু কণ্টকাকীর্ণ নয় এটা জানা আছে বটে, কিন্তু সম্প্রতি নির্মল যে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সাক্ষাৎ কন্দর্পও সে পরীক্ষায় পাস করতে পারেন কিনা বলা শক্ত।

নির্মলের প্রতি শিবানীর যে বিরাগ আছে তা নয়; বরং অনুরাগের মাত্রাধিক্যটা সম্প্রতি এমন পরিমাণে ঘটছে যে ক্রমে দুঃসহ হয়ে উঠেছে সেটা। আসলে শিবানীর দুর্দান্ত রান্নার শখ জেগেছে আজকাল। জীবনে কখনো তিনি ভাতের হাঁড়িতে হাতা ডুবিয়েছেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু হঠাৎ এই বয়সে তিনি মানুষের পাকস্থলীর ওপর দিয়ে যা গবেষণা শুরু করেছেন তাতে তাঁকে কাল্‌পেবল্ হোমিসাইডের ধারায় ফেলা চলে কিনা তরুণ মুন্‌সেফ নির্মল তাই নিয়ে চিন্তা করতে চেষ্টা করে।

বাংলা পত্রিকাগুলোতে সম্প্রতি 'মহিলা বিভাগ' নামে একটা ভয়ঙ্কর বস্তু আমদানি হয়েছে। তাতে নারীবিদ্রোহ থেকে শুরু করে 'শেষ রাত্রে খোকা কাঁদিলে কী করিবেন' ইত্যাদি নানা জিনিসের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থাকে; কিন্তু সব চাইতে যেটা মারাত্মক সেটা এঁদের 'রন্ধনশালা'—পুরুষকে ক্রন্দন করাতে কোনো নারীবিপ্লব এর কাছাকাছিও যেতে পারে না। এই কাগজগুলো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতি শিবানী তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেছেন। ঘি, দুধ, চিনি, কিসমিস, পেঁয়াজ আর মশলার শ্রাদ্ধ করে পৃথিবীর অখাদ্যতম খাদ্য তৈরি করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। অনুপমার কাছে তিনি আমল পান না; প্রসন্নবাবু ডিস্‌পেপটিক মানুষ, অতএব তাঁর একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষার বর্ম আছে, কিন্তু ধরা পড়েছে নির্মল। প্রেমের বন্ধন তো আছেই, তা ছাড়া ওপরওলার স্ত্রীকে চটানোও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সুতরাং—

সুতরাং যা হচ্ছে তা অবর্ণনীয়।

এই তো দিন তিনেক আগেকার কথা। একটা দুর্বল মুহূর্তে শিবানী নির্মলকে পাকড়াও

করে ফেললেন। পেঁয়াজের পায়েস তৈরি করেছেন তিনি, নির্মলকে খেয়ে দেখতে হবে।

সে পায়েস মুখে দিয়েই নির্মলের হয়ে এল। যেমন তার স্বাদ, তেমনি গন্ধ—মনে হল প্লেটের ওপরেই সে বমি করে দেবে।

কিন্তু শিবানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। আত্মপ্রসাদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কী নির্মল, ভালো লাগছে না?

বিকৃত মুখে নির্মল বললে, আজ্ঞে, আমি ঠিক—

—বলো কী, তোমার ভালো লাগছে না! এমন ভঙ্গিতে কথা বললেন শিবানী, যে লজ্জায় নির্মল এতটুকু হয়ে গেল: ভালো লাগছে না! এ-যে খেতে অতি সুস্বাদু হয়ে থাকে! এই দেখো না—'দীপিকা' পত্রিকা লিখছে—শিবানী সঙ্গে সঙ্গেই তার নথিপত্র পেশ করলেন: "তিন সের দুধ এবং এক পোয়া পেঁয়াজ লইবে। দুধটি যখন ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিবে—" ও কি, ও কি উঠছ যে! সবই তো পড়ে রইল!

—আজ্ঞে আর পারছি না।—অতিকষ্টে উদ্গত বমির আবেগটা রোধ করলে নির্মল।

—না, না, ওটুকু খেয়ে ফেলো—নষ্ট হবে নাকি! সারা দুপুর বসে বসে করেছি—

কান্না চেপে আর এক চামচে মুখে পুরল নির্মল। একটু দূরেই অনুপমার পোষা কুকুরটা বসে বসে লেজ নাড়ছিল, নির্মল আশান্বিত হয়ে ডাকল: আয় আয় ববি, চুক্ চুক্—

শিবানী সন্ত্রস্তস্বরে বললেন, না না, ওকে ডেকো না। ওর পেটে এসব সহ্য হয় না।

নির্মল প্রায় বলে ফেলছিল, কুকুরের সর্বংসহ পেটেও যা সয় না, তাই আমাকে গিলতে হবে? আমি কি ববির চেয়েও নীচু পর্যায়ের জীব!—কিন্তু ওপরওলার স্ত্রীকে ওকথা কোনোমতেই বলা চলে না। অতএব মরীয়া হয়ে সে তড়াক করে উঠে পড়ল, তারপর "অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে" বলে ছুটে সোজা বেরিয়ে গেল রাস্তায়। সেই থেকে শিবানী সম্পর্কে একটা পৈশাচিক আতঙ্ক জেগেছে তার। পারতপক্ষে তাঁর ছায়াও সে আর মাড়াতে চায় না। বিশেষ করে যখন কাল আবার শুনেছে যে শিবানী লেটুস্ আর গাজর দিয়ে একটা জাপানী সুপ তৈরি করবার মতলবে আছেন, সেই থেকেই সে দস্তুরমতো দুঃস্বপ্ন দেখছে।

অতএব অনুপমাকেই তার পাওয়া দরকার এবং সেই সঙ্গে দরকার শিবানীর কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা। কিন্তু এ কি হচ্ছে! এমন করে কেন সে সময়টা নষ্ট করছে অনুপমা, নষ্ট করছে বহু প্রতীক্ষার পরে পাওয়া দামী, দুর্লভ, দুর্মূল্য সময়?

—ঝগড়ু সিং!

বেশ চিৎকার করে ডাকল। ঝগড়ু সিংকে ডাকাটাই শুধু লক্ষ্য নয়—বরং উপলক্ষ, এই সুযোগে অনুপমাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে নির্মল এসেছে এবং অনেকক্ষণ ধরে ওর জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

বেয়ারা ঝগড়ু সিং এসে দাঁড়াল।

—সাহেব কখন আসবে?

—কিছু তো ঠিক নেই হুজুর। এগারো বাজতে পারে, বারোভি বাজতে পারে। আপনি আর কতক্ষণ বসে থাকবেন?

নির্মলের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল ঝগড়ু সিংয়ের ওপরেই। ওর কণ্ঠস্বরে আগ্নেয়গিরির আভাস পাওয়া গেল: যতক্ষণ আমার মর্জি।

—জী, সে তো বটেই।—ঝগড়ু সিং সভয়ে বললে: একা একা বসে থাকবেন হুজুর? চা-পানি এনে দেব? কোকো?

বীভৎস গলায় নির্মল বললে, না।

—কী করব তবে?

—কিছুই করতে হবে না।

—সেলাম।

—যাও।

নির্মল আবার বিলিতী পত্রিকাটা খুলল। প্রাণপণে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে একটা সচিত্র প্রবন্ধ। কিসে মেয়েদের বেশি স্মার্ট আর ফ্যাশনেব্‌ল দেখাবে, এবং বক্ষোশ্রী একটা পরিপূর্ণ ইঙ্গিতময় আবেদন দিয়ে রোমাঞ্চিত করে তুলবে সে সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সুচিন্তিত গবেষণা। বেয়ারাটাকে একটা কাজ সে করতে বলতে পারত। সে-কাজ—ওই মাস্টারকে সোজা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া। কিন্তু সেটা নানা কারণে কোনোমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং অসহায় ক্রোধে সে বিলিতী পত্রিকার মলাটের ওপরে একটা ড্রাগন আঁকবার চেষ্টা করতে লাগল পেন্সিল দিয়ে। তার মনোভাবটা এখন প্রায় ড্রাগনের মতোই।

ও ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বারান্দা দিয়ে জুতোর শব্দটা নেমে গেল নিচে। মাস্টারটা তাহলে এতক্ষণে বিদায় নিয়ে গেছে। উঃ, কী অসাধারণ 'বোর' লোকটা। নাকি চান্স নিচ্ছে? বাড়িতে কেউ নেই বলেই—

অনুপমার কোমল গলা শোনা গেল: কাল নিশ্চয়ই আসছেন?

দূর থেকে সাড়া এল: নিশ্চয়।

রাগে নির্মলের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। আর যাই হোক, প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে কথা বলার সুর এ নিশ্চয়ই নয়। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে কেমন একটা পরিবর্তন চোখে পড়ছে অনুপমার! স্বল্পভাষিণী হয়ে গেছে, স্বল্পহাসিনীও। কিসের লক্ষণ এসব?

শিথিল মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকে চমকে গেল অনুপমা। বললে, এখনো আপনি বসে আছেন নাকি?

হেল্‌গাগন ফ্রেমের আড়ালে আগুন জলছে। কিন্তু আত্মসংবরণ করলে নির্মল।—হাঁা, আপনার অপেক্ষাতে।

—সত্যি, ভারী দুঃখিত। পড়ছিলাম।

—মাস্টার খুব মন দিয়ে পড়ায় দেখা যাচ্ছে। যা দরকার তার চেয়েও বেশি।

খোঁচাটা অনুপমা বুঝতে পারল এবং অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকল কানে। টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে, তাঁর দরকারটা তিনি নিজেই ভালো বোঝেন বোধ হয়।

—বোধ হয়! নির্মল বিনীত হাসি হাসল। কিন্তু হাসির ভেতর থেকে যা ঠিকরে পড়ল তা বিনয় নয়। সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবি, গোল্ডফ্লেকের রঙে রাঙানো পাঁচটা আঙুল আর নিখুঁত আভিজাত্যের অন্তরাল থেকে মানুষের আদি-প্রবৃত্তিটা আত্মপ্রকাশ করেছে।

—আপনাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম।

—কাল বললে হয় না?—অনুপমা মধুর ভাবে হাসল: আজ সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

—আমি এতক্ষণ বসে আছি—

—তা হলে আর একটু বসতে পারেন। বাবা মা—এক্ষুণি আসবেন।

নির্মলের রক্ত আগুন হয়ে উঠল। ইচ্ছে করল সশব্দে একটা প্রকাণ্ড চড় বসিয়ে দেয় এই অকালপক্ব মেয়েটার গালে। কিন্তু আজ যা করতে এসেছিল তার সঙ্গে এই হিংস্র একটা প্রচণ্ড চড়ের সামান্যতম কল্পনাও ছিল না কোনোখানে। বাড়িটা নির্জন ছিল, বাইরে ঝাউবনের গান ছিল, নদীর জলে জোয়ারের উচ্ছ্বাস ছিল। আকাশের কোণায় কোণায় খুঁজলে একফালি চাঁদের দেখা পাওয়াও হয়তো অসম্ভব হত না। কিন্তু সমস্ত বৃথা হয়ে গেছে—সব মিথ্যে হয়ে গেছে। আর সেই অপমানিত ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে কাটা ঘায়ে যেন লবণ ছিটোচ্ছে অনুপমা।

—কথাটা মিস্টার বা মিসেস্ সরকারের সঙ্গে নয়, আপনার সঙ্গে!

—সত্যি লজ্জিত। আচ্ছা কাল শুনব—এখন ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে আমার—অনুপমা হাই তুলল একটা।

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এর পরে আর কোনোমতেই বসা চলে না। সমস্ত চেতনার মধ্যে হিংস্র একটা বন্য জন্তুর আক্রোশ নিয়ে উঠে দাঁড়াল নির্মল। নতুন যে সিগারেটটা ধরিয়েছিল, সেটাকে ছুঁড়ে মারল অ্যাশট্রের দিকে।

—আচ্ছা আসি আজ।

অনুপমা স্বচ্ছন্দ ভাবে বললে, আসুন, নমস্কার। বড় কষ্ট হল।

অভ্যাসবশে মুখে আসছিল, না, এমন আর কি—কিন্তু মনের জ্বালায় স্বাভাবিক এই

বিনয়টুকু করবার আগ্রহ আজ বোধ করলে না নির্মল। বড় বড় পায়ে গেটটা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল সে। ঝাউবন আর নদীর ঠাণ্ডা হাওয়াতে উত্তেজনাটা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। ঝাউবীথির অন্ধকারেও লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হল এর ভেতরে নিশ্চয় কোনো একটা ব্যাপার আছে—যা সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। সেটা কী ব্যাপার? অনুপমা ওই ভ্যাগাবণ্ডটার প্রেমে পড়েছে এমন কথা নির্মল কখনো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তা হলে ?—

হঠাৎ মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো একটা জিনিস চমকে গেল। অনুপমা যখন ঘরে ঢুকেছিল, তার হাতে ছিল লাল মলাটের একটা বই, অপ্রতিভ হয়ে সেটাকে লুকোবার চেষ্টা করেছিল শাড়ির আঁচলে। কিন্তু অন্যমনস্ক উত্তেজনায় নির্মল সেটাকে ভালো করে লক্ষ্য করেনি তখন। এখন নামটা মনের সামনে রক্তের অক্ষরে জ্বলে উঠল : মুক্তিশঙ্খ।

'মুক্তিশঙ্খ' ? নির্মল থেমে দাঁড়াল, ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল। নামটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে। এই রকম একখানা বই সম্বন্ধে কী একটা সরকারী নির্দেশ খবরের কাগজে দেখেছিল না কি ? যতদূর মনে পড়ছে—

নির্মল আর একটা সিগারেট ধরাল। সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ থাকলে কী করত কে জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সমস্ত চেতনা যেন মশালের মতো শিখায়িত হয়ে উঠেছিল। অরুণ মাস্টারকে বোধ হয় চেনা যাচ্ছে এতদিনে! খাড়া খাড়া চুল, ময়লা জামা, গালের পাশে কাটা দাগ এবং একান্ত স্বল্পভাষী। সবগুলো মিশিয়ে একটা একান্ত অশুভ সূচনা মনের মধ্যে সাড়া দিতে লাগল।

এ ছাড়া দুদিন আগে পার্টিতে অনুপমা যে কাণ্ডটা করেছে তাও উল্লেখযোগ্য। কী তার সেদিন যে হয়েছিল কে জানে! চায়ের আসরটা যখন ভালো করে জমে উঠেছে তখন পথ দিয়ে শোভাযাত্রা যাচ্ছিল একটা। চিৎকার উঠছিল : জালিয়ানওয়ালা স্মরণ করুন—

পার্টিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, অস্বস্তি বোধ করেছিলেন তাঁরা, ভ্রূকুঞ্চিতও করেছিলেন কেউ কেউ। নির্মল বিরক্তিভরে মন্তব্য করেছিল, যত সব ভ্যাগাবণ্ডের কারবার।

অনুপমা চুপ করে বসেছিল, কোনো কথা বলেনি। কিন্তু তারপর যখন তার গানের পালা এল তখন একটা অপ্রত্যাশিত আর অবাঞ্ছিত ব্যাপার করে বসল সে। অর্গ্যানের দিকে যখন সে অগ্রসর হল তখন সাগ্রহে করতালি পড়েছিল চারদিকে, চাঁদ এবং রজনী-গন্ধার একটা আসন্ন মোহময় পরিবেশ কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সবাই।

কিন্তু অনুপমা যখন গান ধরল তখন এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল আসর। পার্টিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যেন পাথর হয়ে গেলেন, নির্মলের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট খসে পড়ল মাটিতে।

অর্গ্যানে ঝঙ্কার দিল অনুপমা। তাকাল অদ্ভুত একটা অগ্নিময় দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি নির্মল

কখনো দেখেনি—সে অনুপমাকে একেবারেই আলাদা আর একান্ত বলে মনে হয়েছিল

তীব্রভাবে ঝড়ের গতিতে গান ধরলে অনুপমা :

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার—"

এ কী গান! স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়। আর এ গান শোনা যে ওদের পক্ষে অপরাধ—এ যে রাষ্ট্রবিদ্রোহ! কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি, শুধু স্তব্ধ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অনুপমার মুখের দিকে। প্রসন্ন সরকারের মেয়ে এই গান গাইছে পার্টিতে!

বাড়িতে ফিরে নাকি শিবানী গালাগালি করেছিলেন অনুপমাকে ; তার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে নির্মল জানে না। কিন্তু আজ এখানে এই দুঃসহ ব্যর্থতার পর একটা হঠাৎ নতুন সত্য যেন আবিষ্কৃত হল তার মনের কাছে, গ্রন্থিমোচন হল কতগুলো দুর্বোধ্যতার। এর সঙ্গে কোনো যোগ নেই তো অরুণ মাস্টারের? কোন সম্পর্ক নেই তো তার প্রতি অনুপমার এই উপেক্ষার সঙ্গে, পার্টির চায়ের পেয়ালায় ওই রকম একটা অশোভন গান গেয়ে তুফান তোলবার-ব্যাপারে?

নিশ্চয় তাই!

তা হলে মতলব কী অরুণের? অনুপমাকে 'মুক্তিশঙ্খ' পড়তে দেবারই বা অর্থ কী? প্রসন্নবাবুর মতো লয়্যাল অফিসারের ঘরে রাজনীতি? বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা?

নির্মল একটু হাসল। একটা ঝকঝকে মতলব খেলেছে মাথার মধ্যে। তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিল ফিরে চলল তার উলটো দিকে। স্টীমারঘাটের কাছাকাছি আই. বি. ইনস্পেক্টারের বাসা। তাঁর ওখানে গিয়ে একবার পুরনো পুলিস গেজেটটা দেখে আসা দরকার।

* * * *

যথানিয়মে আজও রাত বেশি হয়ে গেল।

সঙ্গে আজ আর অরুণ আসেনি—সুজিতই এগিয়ে দিল মেস পর্যন্ত।

ইস্কুলের ছেলে, বেশ উৎসাহী, রক্তও একটুকু বেশিমাত্রায় গরম। তাই মেয়েদের সম্পর্কে এক ধরনের পৌরুষ বোধ করে সব সময়ে। পথ চলতে চলতে দু-তিনটে কুকুরকে তাড়া দিলে, ঢিল ছুঁড়ল একটা বাদুড়কে।

—প্রমীলাদি, ভয় করছে না তো?

—না।

—বড্ড অন্ধকার রাস্তা! আপনার অসুবিধে হচ্ছে না?

প্রমীলা মৃদু সস্নেহ হাসি হাসল : এ পথে আমি তো রোজই চলি ভাই। তোমার ভয় করে না তো?

—আমার ভয়! ইস্! জানেন প্রমীলাদি, একা একা শ্মশানে গেছি কবার, গোরস্থান থেকে মড়ার খুলি নিয়ে এসেছি।

—মড়ার খুলি!—প্রমীলা বিস্মিত হয়ে বললে, মড়ার খুলি কী জন্যে? তান্ত্রিক সাধনা শুরু করেছিলে নাকি?

—না, না!—মেয়েদের মতো সলজ্জ গলায় সুজিত বললে, ওসব না। সাহস হওয়া চাই তো। মনে জোর না পেলে কাজ করব কী করে বলুন।

—তা তো বটেই। কিন্তু একা একা যে শ্মশানে যেতে, কবরখানায় যেতে, ভয় পাওনি কখনো? ভূত?

—ভূত!—সুজিত অবজ্ঞার হাসি হাসল : ওসব বাজে কথা। কত মিথ্যে জিনিসে মানুষ যে ভয় পায়। আমার একবার ভারী মজা হয়েছিল, জানেন?

—বলো শুনি।

—অমাবস্যার রাত্তিরে বাজি রেখে রাজসাহীর এক শ্মশানে গিয়েছি। কী অন্ধকার—সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কথা ছিল শ্মশানের ঠিক মাঝখানে একটা নিশান পুঁতে আসব। মরা নদী—ওপারে ঘন জঙ্গল, তিন মাইলের মধ্যে লোক নেই। পায়ে মড়ার হাড় লাগছে, পোড়া কাঠ ঠেকছে—ছায়ার মতো শেয়াল সরে যাচ্ছে, অন্ধকারে জ্বলছে তাদের চোখগুলো। ভয় করছিল, তবু বুক ঠুকে শ্মশানের ঠিক মাঝখানে নিশান পুঁতে ফেললাম।

পিছন ফিরতেই মনে হল কে যেন প্রাণপণ জোরে আমার কাপড় টেনে ধরছে। যত ছাড়াতে যাই, ছাড়াতে পারি না। কাপড় ধরে তেমনি টানছে তো টানছেই। তারপর বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা। ভয়ে মাথার মধ্যে রক্ত চড়ে গেল—ফিট হয়ে যাই আর কি!

প্রমীলা বললে, সর্বনাশ!

—শুনুন না মজার কথা। যা থাকে কপালে বলে ফিরে দেখতেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। নিশানের সঙ্গে কোঁচার খানিকটাও মাটিতে পুঁতে ফেলেছি, তাইতেই—ওই কাণ্ড। জানেন প্রমীলাদি, এমনি করেই লোকে খালি খালি ভয় পায়। কক্ষনো ভূতে বিশ্বাস করবেন না প্রমীলাদি।

—না। তোমার কথা শুনে ভরসা পেয়ে গেলাম।—প্রমীলা হাসল।

মেসের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সুজিত বললে, আমি যাই তাহলে।

—এসো। কিন্তু দেখো, সত্যি সত্যিই কেউ পেছন থেকে কোঁচা টেনে না ধরে।

—ইস্,—আমার ?

বীরের মতো পা ফেলে ফেলে সুজিত চলে গেল। চমৎকার ছেলেটা—নিজের ছোট ভাই বলে ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু এই বয়সেই যে-পথে নেমে এসেছে, তাতে একদিন হয়তো দমকা হাওয়া এসে অকালেই ঝরিয়ে দেবে ওকে। প্রমীলার মাঝে মাঝে মনে হয়: বড় নিষ্ঠুর এই পথ—বড় বেশি নির্মম। ক্ষমা নেই, করুণা নেই। কারো মুখের দিকে সে তাকাবে না—যা তার প্রয়োজন দু হাতেই ছিনিয়ে নেবে তাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা কড়া নাড়ল। আবার সেই পুরনোর পুনরাবৃত্তি। আধ ঘণ্টার ধাক্কাধাক্কির পর মেঘের মতো মুখ করে আসবে কৃষ্ণা—কতগুলো অপ্রিয় মন্তব্য করবে, তারপর টলতে টলতে গিয়ে পড়বে বিছানায়। আর একদিকে নির্জন নিরানন্দ ঘর প্রমীলার, অগোছালো বিছানা, অগোছালো বইপত্তর, টেবিলের ওপরে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত।

কিন্তু আশ্চর্য, কড়া নাড়তেই সাড়া এলো, দাঁড়াও।

কৃষ্ণা জেগে আছে এখনো? ন-টা বাজতেই তো ঘুমে ঢুলে পড়ে, অসম্ভব ঘুমকাতুরে মানুষ। আর এখন সাড়ে দশটার সময়েও সজাগ গলায় সাড়া দিচ্ছে। ব্যাপার কী ?

খিল খুলে গেল, দেখা গেল কৃষ্ণার মূর্তি। নিদ্রোত্থিতা নয়, বেশে বাসে কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। যেন তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছে।

—ব্যাপার কী, এখনো জেগে আছ তুমি ?

—হুঁ।—আষাঢ়ের জমাট মেঘের মতো কৃষ্ণার মুখ।

—কী হয়েছে তোমার ? কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি ?

—ভেতরে চলো!—গভীর ব্যঞ্জনাময় কণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বড়দি এতক্ষণ বসে এই মাত্র চলে গেলেন।

—বড়দি ? হেড্ মিস্ট্রেস ?—নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে প্রমীলা থেমে দাঁড়াল: পরিস্থিতি তাহলে তো বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে!

—নিজেই যদি জটিল করে তোল, তা হলে কার কী বলবার আছে!

—তাই নাকি ?—প্রমীলা ভ্রূ দুটো বিস্তীর্ণ করে তাকাল কৃষ্ণার মুখের দিকে। বারান্দায় আলোটার জোর কম, কৃষ্ণার মুখের এ পাশটাতে খানিকটা ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণাকে দেখে মনে হল যেন ও ফাঁসির আসামীর রায় দিতে যাচ্ছে: He will be hanged by the neck till death—

প্রমীলা আঁচ করে নিলে ব্যাপারটা। এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়—এই জাতীয় একটা কিছু ঘটবে বহুদিন আগেই সেটা টের পেয়েছে সে। ঘর খুলে আলো জ্বাললে, বললে, বোসো।

বিছানার এক পাশে বসে কৃষ্ণা বললে, তুমি খেয়ে নাও আগে।

—পরে খাবো। আগে তোমার কথাটা শুনি।

জানালা দিয়ে খানিকক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণা। একটা কাঁচা ড্রেনের দু পাশে ঘন জঙ্গল, তার ভেতরে ডাহুক ডাকছে। খোয়া-ওঠা রাস্তা দিয়ে কে'হেঁটে যাচ্ছে—নির্জন অন্ধকারে তার জুতোর শব্দটা ছড়িয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক ভাবে। শুধু অস্বাভাবিক নয়, অস্বস্তিকরও।

শাড়িটা বদলে নিয়ে প্রমীলা কৃষ্ণার পাশে এসে বসল: কী বলছিলে বলো।

—আজ বিকেলে পুলিস এসেছিল।

—বেশ, ভালো কথা।

—কেন এসেছিল, জান?

—তুমিই বল।

—তোমার খোঁজ নিতে।

প্রমীলা বিষণ্ন ভাবে হাসল: যাক, আমার কিছুটা দাম বেড়েছে তা হলে। পুলিসও খবর নিচ্ছে আজকাল। খুশি হওয়া উচিত, কী বল?

কৃষ্ণার সমস্ত মুখটা ভয়ে ম্লান হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ নির্বাক নিষ্পলক চোখে প্রমীলার মুখের দিকে তাকাল: ইয়ার্কি কোরো না। এ সব পথ ছেড়ে দাও প্রমীলা। আগুন নিয়ে খেলা করতে যেও না।

বিষণ্ন কৌতুকের হাসি প্রমীলার মুখের ওপর তেমনি ভাসতে লাগল: কোন্ পথ ধরেছি যে ছাড়ব।

—সে তুমি নিজেই জানো। গরিবের মেয়ে, চাকরি করতে এসেছ। দেশ স্বাধীন করা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা কেন এত?

—তা হলে কথাটা এই যে গরিবের স্বাধীনতা দিয়ে কোনো দরকার নেই?

—তোমার সঙ্গে আমি লজিকের তর্ক করতে চাই না—কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে বললে, হেড্‌মিস্ট্রেস তোমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন বলেই এতদিন কিছু বলেননি। কিন্তু যা তুমি করে তুলেছ, এর পরে তোমাকে ইস্কুলে রাখাই শক্ত হবে।

—রাখার দরকার কী?

কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল: ওভাবে যদি জবাব দাও তাহলে তোমার সঙ্গে কথাই বলা চলে না। কিন্তু নিজের ভালো নিজে ভেবে দেখো। তা ছাড়া কাল বড়দি যা বলবার তা নিজেই বলবেন তোমাকে।

—তাই শুনব।

—হুঁ—দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল কৃষ্ণা। বললে, কিছু

মনে কোরো না ভাই। তুমি ভাবছ হয়তো খানিকটা অনধিকার চর্চা করলাম। কী রাজনীতি তুমি করছ জানি না, আমার কিন্তু মনে হয় কারো প্রেমে পড়ে গেছ।

ধক করে বুকের মধ্যে ঘা লাগল। মনের কথাটা কি সত্যি সত্যি ধরে ফেলেছে কৃষ্ণা? দুর্বল দেহ, দুর্বল মন—একান্ত অসহায় বলেই বোধ হয় নিজেকে। গৃহকপোতীর মতো ভীরু আর নীড়সন্ধানী। তবু এই দুর্যোগের মধ্যে সে যে পথে নেমে পড়েছে, সে কি শুধু শৃঙ্খলিত দেশমাতার কান্না শুনেই? নাকি আর কোনো মোহ আছে—মদের মতো তীব্র আর কোনো নেশার আকর্ষণ আছে, যাব জন্যে একটা বিশেষ রাজনীতির মতবাদকে উপলক্ষ্য মাত্র ধবে নিয়ে যেন স্বপ্নের মধ্যে পথ হেঁটে চলেছে সে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। পাণ্ডুর মুখের ওপর রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিচিত্র দ্রুত স্পন্দন—যেন ছোট পা ফেলে সেখান দিয়ে চলে বেড়াচ্ছে কেউ।

কৃষ্ণা বললে, তাই যদি, তাহলে এসব না করে বিয়ে করে ফেলো।

—কী করব?

—বিয়ে।

—কাকে?

প্রমীলার স্বপ্নাতুর আত্মমগ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার আশ্চর্য লাগতে লাগল: কেন, যার প্রেমের জন্য ঘর ছেড়েছ, তাকে?

—তাকেই?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। বাইরে নারকেল গাছের পাতায় বাতাস বাজছে। অন্ধকার আকাশে বসেছে নক্ষত্রেব সভা। স্টীমারঘাট থেকে গম্ভীর বাঁশির সুর—যেন কোন্ সুদূর দিগন্তেব আহ্বান। এখানে নয়, এখানে নয়। এই সীমা ছাড়িয়ে চলে এসো, ভেঙে এসো এই ঘর, এই দুর্বল মোহ। ডাক আসছে পাঞ্জাব থেকে, সিন্ধু থেকে, গুজরাট থেকে, মহারাষ্ট্র থেকে, অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ-প্রাগ্‌জ্যোতিষ থেকে। ডাক পাঠিয়েছে বালেশ্বরের অরণ্য, চট্টগ্রামের পাহাড়, সবরমতীর নীল জল, আন্দামানের শিলাতটে প্রতিহত বঙ্গোপসাগরের অশ্রু-তরঙ্গ। কোথায় অরুণ, কোথায় কে। নিরুদ্দেশ যাত্রার যারা পথের সঙ্গী, সঙ্কট-পঙ্কিল তিমিররাত্রে আলোকের তীর্থযাত্রায় তারা কে কোথায় ঝরে পড়বে কে জানে। আর বহু প্রাণের রক্তজবার অর্ঘ্যের সঙ্গে প্রমীলার হৃৎপিণ্ডও একদিন ডালি সাজাবে—সেদিন সামগ্রিক আহুতির মধ্যে নিজের জন্য কোনো কিছুই তো অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রমীলা হেসে বললে,

যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন

সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কৃষ্ণার। বললে, না, সে লগ্নের আর দেরি নেই। বীরহস্তে বরমাল্য তোমার আসছে হাতকড়ির রূপ নিয়ে। এবার লোহার বাসর জাগবার পালা।

—ভালোই তো, মরা লখীন্দরকে জীইয়ে তুলব।

কৃষ্ণা আর দাঁড়াল না। দরজাটা ধড়াস করে আছড়ে ফেলে চলে গেল।

আরো দিন কয়েক পরে ভোররাত্রে ঘুম ভেঙে গেল প্রমীলার। বাইরে বুটের শব্দ—মেসের চারদিকে শুকনো পাতার ওপর ত্রস্ত পদসঞ্চারণ।

দরজায় পুরুষ গলায় সাড়া: কৃষ্ণা চৌধুরী আছেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট?

কাঁপতে কাঁপতে বেরুল কৃষ্ণা। পুলিস।—কী চান?

—মেস সার্চ করব। আপনারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে পাশের বাড়িতে চলে যান। দয়া করে সঙ্গে কিছু নেবেন না।

ভয়ে কৃষ্ণার দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করে বাজতে লাগল। দু-তিনটি মেয়ে কেঁদেই ফেললে একেবারে। পুলিস মেস সার্চ করলে, সব চাইতে তছনছ করে খুঁজলে প্রমীলার ঘর। দু ঘণ্টা তন্নতন্ন অনুসন্ধানের পরেও বোমা-পিস্তল যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন প্রমীলাকে বললে, আপনাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে অ্যারেস্ট করবার অর্ডার আছে। এই ওয়ারেণ্ট।

প্রমীলা বললে, চলুন।

দরজার গোড়ায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণা। সাদা কাগজের মতো রক্তহীন বিবর্ণ মুখের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

ভেতরে উঠতে উঠতে প্রমীলা কৃষ্ণার দিকে তাকালো। মৃদু হেসে বললে, কাঁদিস নে ভাই, লোহার বাসর জাগতে চললাম। তোর কথাই সত্যি হল। মরা লখীন্দর বাঁচবে কিনা, এখনো জানি না অবশ্য।

কৃষ্ণা জবাব দিলে না। সকালের আলোয় যেন গভীর একটা মৃত্যুশোক বহন করে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল প্রমীলার বিশৃঙ্খল ঘরটা। টেবিলের ওপরে রাত্রির ভাতটা তখনো ঢাকা দেওয়া—বুকে ব্যথা ওঠাতে প্রমীলার আর খাওয়া হয়নি।

পাঁচ

রবিবারের ছুটি। ঈশ্বরের বিশ্রাম-দিবস। মানবপুত্রের মুখে সে বাণী ঘোষিত হয়েছে ইয়োরোপ এবং ইয়োরোপীয় তলোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে। গীর্জায় যাওয়া

হয় না বটে কিন্তু সারা দুপুর তাস খেলা চলে। বাজার থেকে মাংস আসে, কেরানীর বাড়িতে রান্না হয় মাছের কালিয়া। অল-ডে টিকিটে অবাধ বিচরণ এবং আত্মীয়স্বজনের কুশল বিনিময়। সিনেমায় হাউস ফুল যায়, সন্ধ্যার আগেই কেরানী বউদের রান্না শেষ। আর পল্লীবিশেষের ভিড়টা একটু বেশি মাত্রাতেই বেড়ে ওঠে।

ওয়েস্ট-এণ্ড-এর ইতিহাসও মোটামুটি এই রকম। চায়ের টেবিলে আড্ডাটা অনেকক্ষণ ধরে জমাট হয়ে থাকে। তর্কের ঝড় ওঠে। দৈনিক কাগজের বিশেষ পাতাগুলো চিন্তার খোরাক জাগায়। মাছের কালিয়া একধাপ এগিয়ে রূপায়িত হয় 'মুর্গ মুসল্লম' আর 'বিরিয়ানী পোলাও'তে, অকালের ল্যাংড়া আম রসনায় রস সঞ্চার করে।

চায়ের টেবিল থেকে উঠে এল অনুপমা। এলো বাইরের ঘরে। আজ আর পড়তে ভালো লাগছে না। বাইরের টেবিলে পড়ে আছে আখোলা স্টেটস্‌ম্যান, দু-তিনখানা রঙিন সাপ্তাহিক। রাতের পরিচর্যা শেষ করে প্রসন্নবাবু এখনো বাইরে আসেননি। ভাই-বোনেরা একটা নতুন ট্রাইসাইকেল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। গলদা-চিংড়ীর কী একটা বিশেষ ডিশ রান্নার পদ্ধতি সম্প্রতি আয়ত্ত করেছেন শিবানী—বেয়ারাকে বাজারে পাঠাবার আগে সেই উপলক্ষে তিনি একটা ফর্দ তৈরি করছেন।

খবরের কাগজের কয়েকটা পাতা উলটে অনুপমা সেটাকে সরিয়ে রাখল। বাইরের পৃথিবীতে শরতের রোদ আনন্দিত উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়েছে। নদীর জল জোয়ারে যেখানে এসে খেলা করে যায়, সেখানে আধোজাগ্রৎ তৃণভূমির ওপর কাশফুল ফুটেছে। সকালের শিশিরে রাঙা কাঁকরের রাস্তাটা যেন আরো রাঙা হয়ে উঠেছে।

নিজের কথা ভাবছিল অনুপমা। এক মাস আগেও ভাবতে পারত না যে, জীবনের গতি কোনোদিন ঘুরে যাবে এই বিচিত্র বিপর্যয়ের মধ্যে। অরুণ ওর মনের একটা নতুন চোখ খুলে দিয়েছে। তাকাও—তাকাও—একবার চোখ মেলে তাকাও। চারদিকে যখন আগুন জ্বলছে—তখন আর মাঝখানে বসে কোন্ বসন্তের স্বপ্ন দেখছ তুমি? যখন দাবানল জ্বলছে অরণ্যে—তখন বনগোলাপের কোন্ নিভৃত নিকুঞ্জছায়ায় হরিণী আত্মবিস্মৃত হয়ে আছে?

আজ যারা বুকের রক্ত ঝরিয়ে দিল—তারা কারা? দুঃখের রাত্রে ফেন-সমুদ্রে যারা নৌকো ভাসাল, কোন্ তীর্থে গিয়ে তারা পৌঁছবে? দ্বীপান্তরের পার থেকে যার কান্না ভেসে আসছে, সে কে? আত্মতৃপ্তির স্বর্ণসৌধে যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, মাটির তলায় যখন বাসুকির ফণা টলে উঠল, এখনো কি তারা জাগবে না?

পুরনো শহরের পথঘাট আর খারাপ লাগে না। ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে দুদিন সে বেলাদির বাড়ি হয়ে এসেছে। নানা ধরনের মেয়ে আসে ওখানে, নানা রকমের আলোচনা করে তারা। তাদের চোখ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ বিশ্বাসী তাদের মন, সাজিয়ে

কথা বলতে পারে না, মাত্রা ছাড়িয়ে তারা হাসে। আর এত সহজ ভাবে আলাপ জমিয়ে নিতে পারে যে, প্রথমটা আশ্চর্য লাগলেও কেমন একটা আত্মীয়তা অনুভব করা যায়।

পৃথিবীর নানা জায়গার খবর রাখে তারা। চীনের ডাক্তার সান-ইয়াৎ সেন—মহা-চীনের নবজীবনের জন্মদাতা—কুয়োমিনটাং: আয়ার্ল্যাণ্ডের 'সিন্‌ফিন্' আন্দোলন—মিচেল কলিন্স, ডি. ভ্যালেরা—ইংরেজী শাসনের বাহুপাশ থেকে মুক্তি। আমেরিকার ওয়াশিংটন—মনরো ডকট্রিন। স্পেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, আল্‌ফান্সোর পদচ্যুতি। মিশরের বীর জগলুল, নতুন তুর্কীর মুস্তফা কামাল, মাদাম হালিদা এদিব। মুরনেতা আবদার রহিম, অশিক্ষিত পর্বতাচারী সেনাদলের অপরিসীম আর লোকোত্তর বীরত্বের ইতিহাস, সর্বোপরি রাশিয়া। লেনিন-স্টালিন-ট্রটস্কি। নিহিলিস্ট আন্দোলন—নার্দিস্ট সন্ত্রাসবাদ, ১৯০৫ সালের জাগরণ, অক্টোবর বিপ্লব। দিকে দিকে মানবমুক্তির বেদমন্ত্র।

কোন জগৎ থেকে কোথায়! এই লাল কাঁকরের পথ, ওই ঝাউবন, ওই নদী, আইভিলতার বেড়া দেওয়া সীজন ফ্লাওয়ারে মণ্ডিত আর হেনার গন্ধভরা ডাক-বাংলো। শঙ্করদার গান, নির্মলের সাজানো কথা, প্রসন্নবাবুর অফিসতত্ত্ব। মুহূর্তে ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়। আসমুদ্রহিমাচল মন্দ্রিত করে প্রতিধ্বনি তোলে বিশ্বমানবের কলকল্লোল।

এ কি ভালো? ভালো এই ঝাঁপিয়ে পড়া? সত্যিই কি এর প্রয়োজন ছিল? কিন্তু এত কথা বুঝতে পারে না অনুপমা, বিচার করতে পারে না। নেশা ধরেছে মনে। গতানুগতিক আর নিত্য-নিয়ন্ত্রিত জীবনের গতি ছাড়িয়ে একটা নতুন জগতে প্রবেশ। সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে অসাধারণে।

আর অরুণ। কী আশ্চর্য মানুষ। কত জানে, কত ভাবতে পারে। কত কঠিন জিনিস মুহূর্তে সূর্যের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়—অবারিত রৌদ্রে প্রসারিত ওই বীথিপথটার মতো সহজ আর সংশয়হীন হয়ে ওঠে। এত ভালো ছেলে সুজিত, এমন মিষ্টি মেয়ে বেলাদি!

নির্মল এসে ঢুকল।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

অনুপমার মনটা মুহূর্তে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। কদিন থেকেই যেন কেমন করে তাকায় নির্মল, দৃষ্টিটা ভালো লাগে না। চোখের চকিত কটাক্ষগুলো যেন হিংসায় আর লোভে মুখর। ওঠবার ইচ্ছা সত্ত্বেও অনুপমা উঠে যেতে পারল না। বললে, বসুন।

নির্মল বসল এবং ভালো করেই জাঁকিয়ে বসল। পকেট থেকে বার করলে একটা ছোট

কাগজ—'জয়যাত্রা'। ওপরে অগ্নি-নয়না রক্ত-বসনা এক নারীর মূর্তি—দু হাতে তার শৃঙ্খল, আর পেছনের পটভূমিতে চলেছে একটা শোভাযাত্রা—দিগন্তে ঝকে উঠেছে শত শত রক্তাক্ত তলোয়ার।

বিনা ভূমিকায় নির্মল কাগজটার পাতা উলটে গেল। বললে, এই কাগজে একটা কবিতা দেখছি। লেখিকা কুমারী অনুপমা সরকার। আপনি লিখেছেন?

—আপনার কী মনে হয়?—অনুপমার শুকনো গলাটা আরো শুকনো হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে উঠল সংশয় ও সন্দেহ।

—আমার মনে হয়,—জোর দিয়ে নির্মল বললে, এ আর কেউ। এমন কবিতা আপনি কখনো লিখতে পারেন না।

—কেন, কবিতার অপরাধ?

—অপরাধ এই যে, মানুষের রক্ত গরম করে তোলা ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। শুনুন, আমি পড়ছি। কবিতার নাম : শহীদ।

নির্মল পড়ে চলল :

ললাটে পরিষা যুগের যজ্ঞে
রক্ত বিভূতিটীকা,
ফাঁসির মঞ্চে যাহারা জ্বালাল
জীবনের দীপশিখা—
মিথ্যাচারের বন্ধন-ডোর
দুঃখরাতের তমিস্রা-ঘোর
করিয়া ছিন্ন করিয়া দীর্ণ
যাহারা আসিল দ্বারে
আজি কি তাদের ফিরাইয়া দিবে
বিফল অহঙ্কারে।

নির্মল বললে, এ শুধু সিডিশন। এর মধ্যে আর্ট নেই।

অনুপমা হাসল, জবাব দিল না।

ঈশান গগনে জাগে ধূর্জটি
প্রলয়-পিনাক-পাণি,
ভীরুতার বাঁধ ভেঙে দেবে সব
রুদ্র-আঘাত হানি।
ভারত-শ্মশানে মহা কাপালিক,
উচ্চারে তারি আবাহন-ঋক্,

প্রাণের সন্নিধে শোণিতের হবি
আজিকে ঢালিল যারা,
পরশে তাদের হল কৃতার্থ
মৃত্যু-পাষাণ-কারা।

—নাঃ, এ কবিতাই নয়।—নির্মল হতাশ ভাবে পত্রিকাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল।

—কেন, কবিতাটার অপরাধ ?

—বলেছি তো আর্ট নেই।

—আর্ট বলতে কী বোঝেন আপনি ? জীবনের যা সত্যিকারের দাবি সেটাকে এড়িয়ে চলাই কি আর্ট ? তা হলে সে-আর্টকেও এড়িয়ে চলাই ভালো।

—তাই নাকি !—বিস্ফারিত চোখে নির্মল অনুপমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তর্ক করতে পারত, অনেক ভালো ভালো কথা বলতে পারত আর্ট সম্বন্ধে, কিন্তু ম্যাট্রিক-পড়া একটা মেয়ের কাছে সে কথাগুলোর অপব্যয় করে লাভ নেই। শুধু অনুপমার স্পর্ধা দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

অনুপমা বললে, হ্যাঁ। তা ছাড়া স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে ও কবিতাটা আমিই লিখেছি।

নির্মল সোজা হয়ে বসল : আপনি !

—নিশ্চয়।

—কেন লিখলেন ?

—লিখতে ভালো লাগল বলে।

—কিন্তু এসব জিনিস লেখবার দায় জানেন ? জানেন, এর জন্য মিস্টার সরকারকে সুদ্ধ বিপদে ফেলতে পারেন ?

এক মুহূর্তে অনুপমার মুখখানা পাংশু হয়ে গেল, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলে পলকের মধ্যেই। শান্ত গলায় বললে, সে ভাবনা আপনি নাই ভাবলেন।

—ওঃ !—নির্মলের চোখ ধ্বকধ্বক করতে লাগল : যাক, অরুণবাবু তা হলে ভালোই পড়াচ্ছেন আজকাল। দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষছেন মিস্টার সরকার।

অনুপমা কঠিন ভাবে বললে, অন্য একজন ভদ্রলোকের অসাক্ষাতে এই ভাবে তাঁর সমালোচনা করাটা ভদ্রতার কোন্ পর্যায়ে পড়ে বলতে পারেন ?

—ভদ্রতা !—হেক্সাগন ফ্রেমের সোনার চশমা আর গরদের পাঞ্জাবি সত্ত্বেও নির্মল যে মুখভঙ্গি করলে, তার মধ্যেও কোনো আর্ট নেই : কার সঙ্গে ভদ্রতা করব ? একটা অ্যানার্কিস্ট একটা টেরোরিস্টের সঙ্গে ?

—আপনি কী করে জানলেন, তিনি অ্যানার্কিস্ট কি, কী ?

—আমার জানবার কোনো দরকার নেই।—মিষ্টি করে হাসতে গিয়েও নির্মল অত্যন্ত কুশ্রী ভাবে হাসল : যাদের জানবার দরকার তারা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে এবং সকলকে জানিয়েছেও। এখন আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আজ সকালেই অরুণ মজুমদার অ্যাণ্ড কোং অ্যারেস্টেড হয়েছে।

—কী বললেন ?—অনুপমা প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—হ্যাঁ, পাকা খবর। স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করতে পারেন। আজ শেষ রাত্রে সমস্ত শহর র‍্যানস্যাক করা হয়েছে, ধরা পড়েছে হোল গ্যাং। আর একটু এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ পেলে আপনিও বাদ যেতেন না মনে হচ্ছে।

—ধন্যবাদ।

অনুপমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, তারপর দ্রুতবেগে চলে গেল পাশের ঘরে।

নির্মল বোকার মতো বসে রইল। এতক্ষণে যেন চমক ভেঙেছে তার। এ কী করল সে ! এই কি অনুপমাকে পাবার পথ ! রাগে হিংসায় আর অন্ধ বিদ্বেষে আঘাত করতে গিয়ে ঠিক এর উলটো ফলটাই কি ফলল না ? সমস্ত ব্যাপারটার ভেতরের খবর জানতে পারলে অনুপমা কি তাকে কখনো এক বিন্দু শ্রদ্ধা করতে পারবে ?

শিবানীর উচ্চকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বাইরের ঘরের দিকেই আসছেন তিনি। সিগারেটের টিনটা নিঃশব্দে পকেটে পুরে নির্মল বারান্দায় চলে এল, নেমে এল পথের ওপর। আর বসবার ঘরের মেঝেতে পড়ে রইল 'জয়যাত্রা' পত্রিকাটা—হাওয়ায় তার পাতাগুলো উড়তে লাগল।

* * * *

কিন্তু অনুপমাকে শেষ পর্যন্ত যে জয় করল সে অরুণ মজুমদার নয়, নির্মল মল্লিকও নয়। তার নাম সোমনাথ দত্ত।

নিজের ঘরটির মধ্যে একান্ত ভাবে নিজেকে সংকুচিত করে নিয়েছে অনুপমা। পড়ায় মন নেই, লিখতে ভালো লাগে না। মিশতে ইচ্ছে করে না কারো সঙ্গে। প্রতিদিন জগৎটা বিস্বাদ হয়ে গেছে, নতুন জগৎটা ধরা দিয়েই সরে গেল দূরে। একটা নিরুৎসাহ অনাসক্তির জাল দিয়ে দিনগুলিকে ঘিরে দিয়েছে কেউ।

কোথায় গেল অরুণ—কোথায় গেল বৃহত্তর মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন ! লেনিন—স্ট্যালিন—মুস্তফা কামাল—ডি. ভ্যালেরা, নবজাগ্রত চীন—প্রাণস্পন্দিত ভারতবর্ষ। ঝাউবনের মর্মর যেন কান্নার সুর হয়ে বাজে ; নদীর জলোচ্ছ্বাস দ্বীপান্তরের পার থেকে বন্দিনীর আর্তনাদ বয়ে আনে। রেডিয়োর গান যেন নির্লজ্জ পরাধীনতাকে বিকৃত মুখে উপহাস করে যায়।

ভালো লাগে না অনুপমার—উৎসাহ আসে না। নির্মলও যেন কেমন হয়ে গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে তার। আজকাল আর তেমন আসা-যাওয়া করে না। যখন আসে প্রসন্নবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, শিবানীর সঙ্গে বাঁধা-ভদ্রতা বিনিময় করে। এমন কি নির্বিকার মুখে তাঁর নতুন ফিশফ্রাই আর ইটালীয়ান পোচ গিলে যায়, কোনো প্রতিবাদ করে না। শোনা যায় এখান থেকে ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা করছে সে। অনুপমার সঙ্গে দেখা হলে যেমন বিব্রত, তেমনি বিপন্ন বোধ করে।

—নমস্কার।

—হ্যাঁ, এই যে, নমস্কার।—নির্মল যেন চমকে যায়। সন্ত্রস্তভাবে তাকিয়ে দেখে অনুপমার দিকে। ব্যাপারটা কিছু টের পেয়েছে নাকি অনুপমা!

অনুপমা বলে, আজকাল তো আর বিশেষ আসেন-টাসেন না।

—না, ইয়ে, তেমন সময় পাই না।

—ওঃ!

তারপর দুজনেই চুপ করে থাকে। অর্থহীন অস্বস্তির একটা বোঝা চেপে থাকে সমস্ত ঘরটায়, চেপে থাকে দুজনের মনের ওপরে। সাপ্তাহিক পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে অখণ্ড মনোযোগে নির্মল হোয়াইটওয়ে-লেড্‌লর ক্রিস্‌মাস সেলের বিজ্ঞাপনটা মুখস্থ করবার চেষ্টা করে।

—শুনলাম ট্রান্সফার নিচ্ছেন আপনি।

—চেষ্টা করছি তো। এখানে আর ভালো লাগে না।

—ওঃ।

আবার স্তব্ধতা। কাগজটা থেকে মুখ তুলে নির্মল জিজ্ঞেস করে, আপনার পড়াশুনো কেমন চলছে?

—ভালোই।

—বেশ।

নির্মল উঠে দাঁড়ায়। গরদের পাঞ্জাবির নিচে সোনার হাতঘড়িটার দিকে তাকায়। বলে, আচ্ছা তা হলে আজ আমি আসি। নমস্কার।

—নমস্কার।

এ আর সহ্য হয় না অনুপমার। মনের সুর কেটে গেছে, ছন্দপতন হয়ে গেছে। মুহূর্তগুলো যেমন দুর্বহ, তেমন ক্লান্তিকর। একটা নতুন কিছু চাই—নতুন একটা তরঙ্গ। যা অনুপমাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এই অর্থহীন আচ্ছন্নতার নাগপাশ থেকে, এই পুঞ্জীভূত অবসাদ থেকে।

কিন্তু নতুন তরঙ্গ এসেছিল তো। সন্ধ্যায় পড়ার বই নিয়ে বসলেই মনে পড়ে মাস্টার মশাইকে। মাথায় খাড়া চুল, ময়লা জামা, গালের ওপরে কাটা দাগ। সমস্ত পৃথিবী প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে তার তীক্ষ্ণ দুটি চোখের শাণিত দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। বলে, এখনো সময় আছে। এখনো নেমে এসো, যারা প্রাণ দিতে চলেছে, দাঁড়াও তাদের পাশে। তোমরা ছাড়া কে তাদের শক্তি দেবে, কে দেবে তাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা? 'কোনোকালে একা হয় নাই জয়ী পুরুষের তরবারি'—

কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে অরুণের ওপর একটা অভিমান বুকের মধ্যে ঘা দিতে থাকে। মনে হয়, ওকে ঠকিয়েছে অরুণ, একান্ত একটা মিথ্যাচার করেছে ওর সঙ্গে। যদি জাগিয়ে দিয়ে গেল, পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল না কেন? এপার যদি মিথ্যে হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ওপারে যাওয়ার উপায় কোথায়?

ঠিক এমনি সময়ে এল উপায়। ম্যাট্রিক ডিঙিয়ে কলেজে ভর্তি হবার পর অনুপমার শীর্ণ-সংকুচিত মনের দুয়ারে এল জোয়ারের কল-কল্লোল। দেহে-মনে সম্পূর্ণ একটি মানুষ।

এল যেদিন, সঙ্গে দুটো রাইফেল। একরাশ বাঘ আর হরিণের ছাল, কুমীরের দাঁত। পায়ের জুতোটা পাইথনের চামড়ায় তৈরি, ডুয়ার্সের জঙ্গলে নিজের হাতেই সে শিকার করেছিল বিরাট অজগরটাকে।

প্রসন্নবাবুর বন্ধু-পুত্র। শিকার করে এল সুন্দরবন থেকে।

ব্রীচেসের ওপর টপ-বুট। চকচকে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—মাথার চুল পর্যন্ত লাল। কবজি দু হাতে মুঠো করে ধরতে হয়।

ভারী ভারী সুটকেস দুটো নিজের হাতে করেই নিয়ে এল। একমুখ হেসে বললে, কাকাবাবু, আমাকে চিনতে পারলেন?

বাতের ব্যথা ভুলে প্রসন্নবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

—আরে সোমনাথ যে! কোত্থেকে এলে?

—সুন্দরবন থেকে। শিকারে বেরিয়েছিলাম। ফেরবার পথে ভাবলাম আপনারা তো এইখানেই আছেন, তাই এই ফাঁকে দেখা করে যাই।

—এসো এসো, বোসো—কী ভাষায় যে অভ্যর্থনা করবেন ভেবে পেলেন না প্রসন্নবাবু; একেবারে এমন বীর বেশে এসে হাজির হয়েছে যে—

শক্তিমান শরীরের চাপে একটা চেয়ারের সর্বাঙ্গে সশব্দ আলোড়ন তুলে সোমনাথ বসে পড়ল। উচ্চ হাসি হেসে বললে, বনেজঙ্গলে ঘুরতে হলে আদ্দির পাঞ্জাবি আর আট-চল্লিশ ইঞ্চি কোঁচায় চলে না কাকাবাবু। জোঁক আছে, কাঁটাবন আছে, বেতের ঝোপ আছে, খানা-খন্দ আছে। বাবু সেজে বনে যাওয়া যায় না। ওখানকার যারা বাসিন্দা, তারা ভদ্রতার ধার ধারে না, কাজেই ওদের কাছে ওদের মতো করেই সেজেগুজে যেতে হয়।

—বেশ, বেশ।—বোকার মতো অট্টহাসি করে উঠলেন প্রসন্নবাবু: বড় ভালো কথা বলেছ। তা কী শিকার করলে?

—একটা ডোরাদার পেয়েছিলাম, আর দুটো হরিণ। কুমীরও একটা মেরেছি, তা ওর চামড়াটা আর আনলাম না, প্রেজেন্ট করে এসেছি ওখানকার ফরেস্ট অফিসারকে।

—ডোরাদার কী জানোয়ার? জেব্রা?

—নাঃ।—সোমনাথ হাসল: ওটা টেকনিকাল টার্ম। ওর মানে হচ্ছে সুন্দরবনের রাজা হিজ হাইনেস্ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বেশ বড় জানোয়ার—লেজসুদ্ধ প্রায় ষোলো ফুট। যা লাফ মেরেছিল—আর একটু হলেই মাচাং ধরে ফেলত। তাক বুঝে ঠিক সেই সময় কপালে মেরে দিলাম—ব্যস, একটা শেলেই ঠাণ্ডা।

প্রসন্নবাবু তেমনি তাকিয়ে রইলেন।

—সে যাক, সে গল্প পরে হবে। আপাতত এই ধরাচুড়োগুলো ছেড়ে ফেলা দরকার। ভদ্রসমাজে যখন এসেই পড়েছি, তখন একটু ভদ্রলোক হওয়া দরকার তো।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। প্রসন্নবাবু অবহিত হয়ে উঠলেন: ওরে ঝগড়ু, এই রহমৎ! ওগো শুনছ—ওরে অনু—

সমস্ত বাড়িটায় বিরাট বিপ্লবের মতো এসে দেখা দিলে সোমনাথ। ওজন-করা পরিমিত হাসির ধার ধারে না, অট্টহাসিতে সব মুখরিত করে তোলে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্যাণ্টা ক্লজ আর আঙ্কল্ ক্রিস্‌মাস নিয়ে গল্প জমায় না, তাদের ধরে নাড়াচাড়া করে, ক্রিকেট বলের মতো লোফালুফি করে। বলে, হাড় শক্ত হয়েছে তো? মাস্‌ল্? স্পোর্টসম্যান হওয়া চাই, হেল্‌দি হওয়া চাই, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

শিবানী সগর্বে অনুপমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—এই আমার মেয়ে। অনু। ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে পড়ছে।

সোমনাথ বললে, বেশ।

—আর চমৎকার কবিতা লিখতে পারে। নানা কাগজে লেখে। 'বিশ্ববন্ধু'তে, 'কল্লোলিনী'তে। ওর কবিতা তুমি পড়োনি?

—নাঃ।—সোমনাথ অসংকোচে বললে, কবিতা আমি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো পড়ি না। দেহে মনে ওই একটি শক্তিমান পুরুষ যিনি বাইরের জগতের সঙ্গে মনো-জগতের মিল ঘটিয়েছেন। আর রবার্ট ব্রাউনিং—যিনি সাইবেরিয়ার মরু-প্রান্তরে দু হাজার মাইল ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছেন, কবিতা লিখেছেন; লাস্ট্ রাইড্ টুগেদার।

শিবানী কিছু বুঝলেন না, অতএব হাসলেন। তাঁর মনে হল ছেলেটি বড় গোঁয়ার, কথাবার্তা বড় বেশি কাঠখোট্টা। এর সঙ্গে বসে সময় নষ্ট না করে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ানোই ভালো, বাবুর্চি হয়তো গলদাচিংড়ির নতুন প্রিপারেশনটাই মাটি করে দেবে।

সোমনাথ অনুপমার দিকে অসংকোচে তাকালো। বললে, দেখুন, অপরাধ নেবেন না। আপনার কবিতা সম্বন্ধে কোনো রায় দিতে পারলাম না। কিন্তু একটা জিনিস সম্পর্কে আপনাকে কম্প্লিমেণ্ট না দিলে অপরাধ হবে। সে আপনার ফিগার। যেমন নীট, তেমনি স্পোর্টস্‌ম্যানলি।

অনুপমা আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনো মেয়ের সামনে তার ফিগার নিয়ে আলোচনা করা, অন্তত প্রথম পরিচয়ের পরেই, রীতিমতো বিস্ময়কর। যথেষ্ট মনের শক্তি আর শুচিতা না থাকলে এ অসম্ভব।

লজ্জারুণ মুখে অনুপমা মাটির দিকে তাকাল।

—না, না, বিব্রত হবেন না। স্বাস্থ্য আমার ভালো লাগে। আজকালকার মেয়েরা রিকেট হতে ভালোবাসে। কিন্তু ওই 'সঞ্চারিণী পল্লবিনীলতেব' আমার কেমন বরদাস্ত হয় না। অলডাস্ হাক্সলি এক জায়গায় বলছেন, আধুনিক মেয়েরা স্বাস্থ্যটাকে একটা ইন্-আর্টিস্টিক ব্যাপার বলে মনে করে : They like to be drain-pipes! আপনি যে তার ব্যতিক্রম এটা দেখে আমার মনটা খুশী হয়ে উঠল।

সোমনাথের কথাবার্তার ধরনটা একটু অমার্জিত। কিন্তু ওই রকম একটা শক্তিমান শরীরের ভেতরে নির্মলের মতো কথাবার্তাই যেন অশোভন লাগত। অনুপমা আরক্ত মুখে তেমনি তাকিয়ে রইল, জবাব দিল না।

—টেনিস খেলতে পারেন?

অনুপমা এবার মুখ তুলল : পারি সামান্য সামান্য।

—গুড। আজ বিকেলে খেলব আপনার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে আমি পারব?

—পারবেন! পারবেন কে বলেছে! শিভালরি করেও আপনাকে জিতিয়ে দেব না। Sport is sport after all!

সোমনাথ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল, সে হাসিতে যোগ দিলে অনুপমা।

বাইরে প্রসন্নবাবুর দামী মোটরটা। সোফার ঘষে মেজে গাড়িটাকে ঝকমকে করে তুলছিল। সোমনাথ বললে, কি গাড়ি ওটা?

প্রসন্ন কৃতার্থভাবে বললেন : ক্রাইসলার।

—নট ব্যাড; দৌড়োয় কেমন?

—তা ভালোই। বেশ দাম নিয়েছিল।

—আই সি। সোমনাথ উঠে দাঁড়াল : ভালো গাড়ি আর ভালো ঘোড়া দেখলে আমি আর থাকতে পারি না। চালিয়ে দেখব?

প্রসন্নবাবু হাসলেন, তা বেশ তো। সোফার!

—না, না, সোফার দরকার নেই। নিজেই পারব আমি। আমার রেসিং কার-আছে।—তীব্র দৃষ্টিতে সোমনাথ হঠাৎ অনুপমার মুখের দিকে তাকাল : আসুন না, একটা রাইড দিই আপনাকে।

—আমাকে ?—অনুপমা দ্বিধাবোধ করতে লাগল।

—আসুন, আসুন।—সোমনাথ উজ্জ্বল ভাবে হাসল। ওর গলায় একটা প্রচ্ছন্ন আবেগের সুর , একটা বিবাট ব্যক্তিত্বের আভাস। অনুপমার মনে হল সোমনাথ ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে—বন্দী করে ফেলেছে শক্তিমান প্রচণ্ড একটা ইচ্ছার জালে।

প্রসন্নবাবু বললেন, যাও না অনু, বেড়িয়ে এসো।

অনুপমা এড়াতে পারল না। মন্দ লাগছে না। একটা বহুপ্রত্যাশিত নতুনত্বের—বহুকাম্য একটা দুর্বার আবেগের তরঙ্গ নিয়ে এসে সোমনাথ ঘা দিয়েছে দ্বারে। অরুণ আর নির্মলের দুঃস্বপ্ন থেকে অনুপমা যেন মুক্তি পেয়েছে। সোমনাথ অমার্জিত—সোমনাথ স্থূল। কিন্তু অরুণের দূর-বিস্তৃত জগৎ যেমন বন্ধুর আর সংশয়গ্রস্ত, নির্মলের লোভ আর সৌজন্য তেমনি দুর্বহ। হঠাৎ অনুপমার মনে হল, এদের দুজনের চাইতে সোমনাথ অনেক ভালো, অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।

মোটর বেরিয়ে পড়ল।

সোমনাথ বললে, স্পীড ভালোবাসেন আপনি ?

—মন্দ কি !

—গুড, গুড। আপনার সঙ্গে আমার টেম্পারামেণ্ট মেলে—খোলা লাল কাঁকরের ওপরে সোমনাথ মোটরটাকে যেন উড়িয়ে দিলে।

—করছেন কি ! অ্যাক্‌সিডেণ্ট ঘটাবেন নাকি !

—ভয় নেই।—সোমনাথ শান্ত হাসিতে অনুপমার মুখের দিকে তাকাল। লাল চুলগুলো উড়ছে, পাঞ্জাবির নিচে ফুলে উঠেছে কঠিন পেশী—সমস্ত শরীরে আত্মপ্রতিষ্ঠ দৃঢ়তা যেন রূপায়িত।

এবার অনুপমাও হাসল : আপনাকে বিশ্বাস করলাম।

—ধন্যবাদ।

তখন আকাশের কোণায় এক ফালি ঝড়ের কালো মেঘ উঠেছে। দিগন্তে এক ঝাঁক বুনোহাঁসের শাদা পাখায় ত্রস্ত পলায়নী সংকেত। শাঁ শাঁ করে দমকা এল একটা, পথের এক পাশ থেকে একটা ঝাউগাছ যেন ধনুকের মতো হয়ে পড়ল সম্মুখের দিকে।

অনুপমা বললে, ঝড় আসছে।

সোমনাথ তেমনি শান্ত হাসিতে বললে, আসতে দিন।

—তাহলে এখন তো ফেরা উচিত।

অনুপমার মুখের ওপর একটা দ্রুত আর দীপ্তিময় দৃষ্টি ফেলল সোমনাথ : কেন, ঝড়ের ভেতর গাড়ি ছোটানোতেই তো আনন্দ। মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত বাধাকে অস্বীকার করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আর সেইটেই তো সত্যিকারের জীবন।

—কিন্তু—

অনুপমার কথাটাকে তলিয়ে দিয়ে আবার শোঁ শোঁ করে উঠল ঝাউবন, মোটরের গায়ে ঝাপটা মারলে একটা ধুলোর ঘূর্ণি।

—ভয় পাচ্ছেন ?—সকৌতুকে প্রশ্ন করলে সোমনাথ।

—না।—শুকনো ভাবে জবাব দিলে অনুপমা।

—আমাকে বিশ্বাস করেন তো ?

—করি।

—তবে চলুন। বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখব।

সোমনাথের মোটর ছুটতে লাগল। ছিটকে পড়তে লাগল ঝাউবীথি, ছিটকে সরে যেতে লাগল পৃথিবী। গতির সেই বিরাট ছন্দের মধ্য দিয়েই সোমনাথ জয় করলে অনুপমাকে, জয় করলে তার সংগ্রামী পৌরুষের শক্তিতে। আর সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-তরঙ্গ জাগিয়ে বজ্র গর্জন করল, ভেঙে পড়ল ঝড়ের ঝাপটা, ধুলোর কুয়াশায় মোটরটা হারিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

ছয়

তারপর সাতটা বছর যেন উড়ে গেল গতিশীল মোটরের সঙ্গে সঙ্গেই।

কাহিনীর ওপর দিয়ে যবনিকা উঠল একটা অপরিচিত পটভূমিতে। ইস্ট-এণ্ড নয়, ওয়েস্ট-এণ্ডও নয়। শবরপল্লী। যারা ব্রাত্য, যারা মন্ত্রহীন, তাদের দেশে। এখান থেকে রেল-স্টেশন ষোল মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তায় বর্ষাকালে কোথাও কোথাও হাঁটু-সমান কাদা আর গলা-সমান জল জমে ওঠে—এক ঈশ্বরেরই মতো সর্বগামী গোরুর গাড়িই সে-পথ দিয়ে চলতে পারে তখন। গরমের দিনে ধুলোর ঝড় ওঠে, বাতাসে যেন 'লু'য়ের ঝাপটা বয়ে যায়, এক-আধটা ছোটখাটো আঁধি পর্যন্ত কুণ্ডলিত হয়ে ওঠে।

সামনে তাকাও, পেছনে তাকাও, মাঠ, মাঠ আর মাঠ। শস্যশ্যামল নয়। লাল, কঠিন মাটি। হাতে করে তুলে নাও, ধরিত্রীর কোমল স্পর্শে চরিতার্থ বোধ করবে না, কঠিন কাঁকরে হাত কেটে রক্ত পড়বে। মাঝে মাঝে ঘাস উঠেছে, কিন্তু সে ঘাস কুশ—তলোয়ারের ফলার মতো ধারাল। কোথাও বিন্না, কোথাও শন। বরেন্দ্রভূমির পুরনো মাটি! রাঢ় আর বঙ্গ যখন সমুদ্রের তলায়, সেই যুগে গৌড়ীয় সভ্যতার আদিকেন্দ্র।

পুরনো পৃথিবী বয়সের জীর্ণতায় আজ রসহীন, প্রাণহীন, শুধু বিন্না আর শন ঘাস বুড়ীর বিশৃঙ্খল চুলের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেয়ে যাচ্ছে।

পুরনো পৃথিবী। গৌড়ের হিন্দু যুগ। সিংহাসনে পঞ্চ-গৌড়াধীশ-রাজন্যকুল-মুকুটমণি-পরমভট্টারক-সেন-শীল-কমল-বিলাস নৃপতিবৃন্দ। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ছত্রধারণ করে, পদ-বন্দনা করে গুর্জর-দ্বারাবতী, দ্বারে রাষ্ট্রকূট দৌবারিক, চোল-বংশজ সেনাপতি।

সে যুগের রাজারা ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন, সাধ্যায়শীল বেদজ্ঞকে উপচারে-উপহারে কৃতার্থ করেন এবং কৃতার্থ হন। তাম্রপট্টে, স্বর্ণপট্টে তাঁদের দানশীলতার খ্যাতি অক্ষয় হয়ে থাকে। পৌণ্ড্রবর্ধনের, তথা উত্তর বাংলার অনুর্বর ভূমিখণ্ডকে শস্যশ্রীতে মণ্ডিত করবার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন জলাশয়—ধূ-ধূ প্রান্তরের বুকে রোপণ করেন বটবৃক্ষ। এখানে ওখানে ছোট গ্রাম, বড় বড় দীঘি, পাথর-বাঁধানো সোপানশ্রেণী। ছোট-বড় সংখ্যাতীত দেবালয়ে সমস্ত বরেন্দ্রভূমি আকীর্ণ। কোথাও মহালক্ষ্মী, কোথাও বাসুদেব, কোথাও মহিষমর্দিনী, কোথাও পুরন্দর, কোথাও বা পদ্মযোনি ব্রহ্মা। চতুর্ভুজ শিব, অষ্টভুজা কালিকা।

সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, ধূপধুনার গন্ধে আকাশ আকুল হয়ে ওঠে। অশ্বারোহী সৈন্য ভেরীনিনাদে জানিয়ে যায় মহারাজচক্রবর্তীর আদেশ। তখন মেয়েদের কারো নাম চারুনেত্রা, কারো নাম মদালসা, কারো নাম মুকুলিকা। যারা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তাদের নাম পাঁচু নয়, হাঁদু নয়—কেনারাম নয়। তারা কেউ বসুভূতি, কেউ ইন্দ্রপাল, কেউ বা সোমসেন।

হিন্দুযুগ, বৌদ্ধযুগ, আবার হিন্দুযুগ। তারপরে বিপ্লব। বৌদ্ধ-হিন্দু একই আগুনে আহুতি হয়ে গেল। উত্তরবঙ্গ হল শ্মশান। বর্ণহিন্দুরা পালিয়ে বাঁচলেন কিরাতদের দেশ রাঢ়ে, হিংস্র জন্তু আর বাদাবনের দেশ পদ্মা-পরপারের বঙ্গে। যাঁরা রইলেন কেউ কেউ অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করলেন, নিম্নবর্ণের কতক প্রাণ দিলে, কতক ধর্মান্তর গ্রহণ করল।

কোথায় রইল মহাকাল আর পুরন্দর, অবলোকিতেশ্বর আর বজ্রাসন সিদ্ধার্থ। মন্দির ভেঙে গেল, বিচূর্ণ দেবতারা লুকলেন মাটির তলায়, দীঘির কর্দম শয়নে। বড় বড় দীঘির চারপাড় ঘিরে ঘন জঙ্গল মাথা তুলল—রাজত্ব করতে লাগল শঙ্খিনী এবং আলাদ-গোক্ষুর। অষ্টভুজা কালিকা ভাঙা থানে অধিষ্ঠিতা হয়ে ডাকাতে-কালীতে রূপান্তরিতা হলেন।

উত্তর বঙ্গে জন-বসতি ক্ষীণ হয়ে এল—ধূ-ধূ করতে লাগল মরা মাটি। আর একটা বিরাট অঞ্চল ব্যেপে মাথা তুলল দুর্ভেদ দুর্গম জঙ্গল—চোর-ডাকাতের আস্তানা। আত্রাই, পুনর্ভবা, মহানন্দা আর করতোয়ার জলে ডাকাতে নৌকো হানা দিয়ে ফিরতে লাগল।

মুসলমান যুগ। গৌড় থেকে পাণ্ডুয়া। স্বনামধন্য সুলতান হোসেন শাহ, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। আবার গৌড়! তারপর মহামারী—গৌড়-পাণ্ডুয়া জনহীন ধ্বংসস্তূপ

আর অরণ্যে পর্যবসিত হল। বাংলার রাজধানী চলে গেল মুর্শিদাবাদে—বরেন্দ্রভূমির শেষ শিখা নিবে গেল। সেই বরেন্দ্রভূমি। ধূ-ধূ মাঠের এখানে ওখানে লাল মাটির টিলা, মজা-দীঘি, মাটিতে পাথর আর গেরিমাটির রাঙা বিবর্ণ ইটের গুঁড়ো।

সময় পেয়ে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয় আজকাল। খরবাহিনী গভীর নদীগুলোর গর্ভে জমেছে বালির পাহাড়—অদূরে হিমালয়ের ঢল-নামা বান সে বিশাল জলরাশিকে আর বইতে পারে না। দু'পাশের ঢালু মাঠ বা 'টাল' ডুবিয়ে দিয়ে সে জল সমুদ্রের আকার ধরে।

উত্তর-বাংলার এই সব অঞ্চলে ভরা-বর্ষার সে রূপের তুলনা নেই। মাইলের পর মাইল জুড়ে জল থই-থই করছে। বিন্না আর দামঘাস মাথা তুলে আছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একহাঁটুর বেশি জল হবে না। কিন্তু নৌকো বাঁধতে চাও—বারো হাত লগি তলিয়ে যাবে। এখানে ওখানে জেগে থাকা হিজলবনের মাথা, কাছে গিয়ে দেখবে গাছে পাতা নেই, সব সাপ। বিশ হাত জলের নিচে গোরুর গাড়ির পথ—তার ওপর দিয়ে এখন চলে নৌকো। উঁচু টিলার ওপরে কচ্ছপে ডিম পাড়ে, কখনো দু-একটা কুমীরের ডিমও দুর্লভ নয়।

এই বিলে যদি ঝড়ে পড়ো, তা হলে আর আশা নেই। নৌকো ডুবলে সাঁতরাতে পারবে না, দামঘাস তোমার পা জড়িয়ে নিচে টেনে নেবে। একশো হাত দূরে পাড়ে যদি লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তবু তার সাধ্য নেই তোমাকে টেনে তোলে। সাঁতরাতে নামার অর্থই নিজে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। অতএব—

এর একটা উলটো দিকও আছে। সেটা বর্ষার নয়—বর্ষার অব্যবহিত পরের আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন বিলের বা টালের জলে টান ধরে, তখন। এত বড় সমুদ্র তখন ছোট হয়ে গিয়ে খণ্ড জলাধারের রূপ নেয়। আর তাদের মধ্যে যোগ-সাধন করে ছোট ছোট অসংখ্য খরস্রোতা নালা—সেই নালাগুলোর ভেতর দিয়ে তীব্রবেগে জল নামে। জলের স্রোত না মাছের স্রোত। এদেশী লোকে বলে "জোভা" লাগল।

তোমরা শহরের মানুষ। কলকাতার বাজারে চালানী মাছ কেনো—বরফ-দেওয়া মাছের টুকরো খুশি হয়ে বাড়িতে নিয়ে যাও। যুদ্ধের বাজারে বারো আনা দিয়ে এক পোয়া মাছ কিনে আনো। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের নিয়ে গিয়ে একবার এই সময়ে সেই সব নালা বা 'ভাঁড়া'র পাশে দাঁড় করিয়ে দিই।

অন্তহীন আকাশ—অনন্তবিচ্ছিন্ন জল-বিস্তার। রাশি রাশি শঙ্খচিল, কানি বক, বড় বক, শামকল, স্নাইপ। সারি দিয়ে সব দাঁড়িয়েছে 'ভাঁড়া'র পাশে। চারদিক থেকে উঠছে কাদার গন্ধ—পচা ঘাসের গন্ধ—আর মাছের আঁশটে গন্ধ।

খরস্রোতা জলে হাত ডুবিয়ে দাও একবার। মুঠি ভরে তোলো—আর কিছু নয়,

মাছ। চাঁদা, খলসে, চাপলি, পুঁটি, চ্যালা, বান, কালবোসের ছানা। মাছ, মাছ, মাছ। একটা খেপলা জাল ফেললে আর টেনে তুলতে পারবে না, মাছের ভারে তোমার জাল ছিঁড়ে যাবে। নৌকো করে যাও—দু'পাশ থেকে মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে তোমার নৌকো ভরিয়ে দেবে।

এত মাছ—অথচ বে-ওয়ারিশ বললেই হয়। যাদের জমিদারি, শুকনোর সময় তারা ছোট ছোট বিলে জলকর বসায়। পশ্চিম থেকে আমদানী 'বিন' আর 'মালা' সম্প্রদায়, ভেসাল ফেলে মাছ ধরে। কিন্তু এই সময়টা সদাব্রত। "জোভা"র মাছের ওপর জমিদার লোভ করে না। তার অনেক আছে। চেক আছে, দাখিলা আছে, দোর্দণ্ড-প্রতাপ নায়েব গোমস্তা আছে, সার্টিফিকেট আছে, কারো কারো লাঠিয়ালও আছে। সব দিক থেকে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবার ব্যাপারে তার ত্রুটি নেই। কিন্তু এই বিশেষ সময়টা সে প্রসন্ন উদারতায় 'ডাঁড়া'র ধারে আর লাঠিয়াল বসায় না। সম্বৎসরে যাদের পেটের ভাত জোটে না, এই সময় মাছ খেয়ে তারা পেট ভরায়।

কিন্তু দিন বদলে গেছে। যারা সাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্র দিত, স্বর্ণপট্টে ভূমিদান করত, তাদের বংশধরেরা আজ ভুলতে বসেছে সামন্ত-তন্ত্রের বিরাট আভিজাত্যকে। ধনতন্ত্রের সংঘাতে দিনের পর দিন তারা ক্ষীণপ্রাণ হয়ে আসছে আর সেই জন্যে আত্মরক্ষার অন্তিম চেষ্টায় আঁকড়ে ধরেছে ধনতন্ত্রের বিকৃত লোলুপতাগুলো। অবসিত জমিদারি যেটুকু আছে তার ভেতর থেকেই যতখানি পারে চুষে নিংড়ে নিংড়ে নিতে চায় তারা। ফলে এখন এই 'ডাঁড়া'র মাছগুলোর ওপরেও নজর পড়েছে তাদের। কেন এত মাছ বারো ভূতে লুটে খাবে, কেন যাবে অভুক্ত প্রজাদের পেটে ? অথচ ওই মাছ যদি বিক্রি করা যায়, তাহলে অন্তত পাঁচশো টাকা ঘরে আসতে পারে।

সুযোগসন্ধানী লোকেরও অভাব নেই। পশ্চিমের আমদানী 'মহলদারেরা' সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নামকরা মাছ-ব্যবসায়ী সিপাই মহলদার কালীর 'ডাঁড়া'র জমিদারকে জানিয়েছে যে এবার "জোভা"র সময় ওই ডাঁড়া সে ইজারা নেবে—পাঁচশো টাকা নজরানা দেবে জমিদারকে।

আর সেই জমিদার সোমনাথ দত্ত।

…নিচে ঢালু জমি বা টাল যেখানে আরম্ভ হয়েছে, তার থেকে মাইলখানেক সরে এলে একখানা গ্রাম পাওয়া যাবে। গ্রাম বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের বসতি নেই। দু-চার ঘর ওঁরাও, তুরী আর মুণ্ডা। আর আশেপাশে যেসব তালবনে ঘেরা রাঙা মাটির টিলা সেগুলো সাঁওতালদের আস্তানা।

মহা-পৃথিবী বিশাল পৃথিবীর একটা খণ্ডরূপ। এখানকার যারা মানুষ, তারা মানুষ

নয়, মানুষের ভগ্নাংশ , অথবা মানুষের অপূর্ণতা। তারা মাদল বাজায়, মহুয়া আর ধান পচিয়ে মদ তৈরি করে। যোগঅঙ্ক এখনো তারা ঠিক দিতে শেখেনি, কাজেই জমিদারের আমলারা তাদের ঠকায়, ঠকায় মহাজনেরা। মাটির বেশি কাছাকাছি বলেই মাটিকে ভোলেনি, নাচবার সময় তাদের খোঁপাতে জড়িয়ে নেয় কচি কিশলয়ের মঞ্জরী। হরি-সংকীর্তনে যোগ দেয়, মুর্গি বলি দেয় 'বোঙা'র পুজোতে।

যেদিন পরিত্যক্ত বরেন্দ্রভূমি মৃত-অতীতের কঙ্কাল বুকে করে পড়ে ছিল মজা দীঘিতে, বিশৃঙ্খল অরণ্যে আর ঊষর মৃত্তিকায় সেদিন ওরাই এসে এখানে আস্তানা বেঁধেছিল ঘরছাড়া যাযাবরের দল। সেদিন কোনো জমিদার ওদের কাছে খাজনা চায়নি, পত্তনির জন্যে নজরানা দাবি করেনি কেউ। কিন্তু মরামাটি যখন ওদের লাঙলের ফলায় প্রাণ পেল, যখন অনাবাদী জমিতে ফলতে লাগল আশু-আমন-বোরো, তখন তাব সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লোভও এল এগিয়ে।

তাই ওদের গ্রামের মাঝখানে আজ জমিদারবাড়ি আকাশে স্পর্ধিত মাথা তুলেছে। অবশ্য ঠিক আজই নয়। এই বাড়ি করেছিলেন সোমনাথেব বাবা গিরিশনাথ। শহরের কোলাহলেব বাইবে মাঝে মাঝে এখানে এসে তিনি থাকতে ভালোবাসতেন। তাঁর ভালো লাগত এখানকার দিক্-চিহ্নহীন প্রান্তর—ভালো লাগত বর্ষার ভরা টানে সমুদ্রের মতো রাশি রাশি জলের উদ্দাম-নৃত্য। খুব সম্ভব খানিকটা কাব্যধর্মী ছিল গিরিশনাথের মন।

কিন্তু তার চাইতেও যেটা বড় কথা ছিল—এই সাঁওতালদের অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন গিরিশনাথ। জমিদারের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে খাজনা তিনি নিতেন, কিন্তু সেজন্যে কড়াকড়ি তাঁর ছিল না। কলা, মুলো, আধসের তামাক কিংবা দুটো বুনো শূয়োরের দাঁত পেলেও খুশি হয়ে যেতেন তিনি। সাঁওতালদের সঙ্গে করে তিনি কুমীর মারতে বেরুতেন, বেরুতেন বাঘের সন্ধানে। শোনা যায়, তাদের দলে একসঙ্গে বসে পচাই খেতেন, সাঁওতালি নাচও উপভোগ করতেন। এই নির্বোধ অথচ সদানন্দ সরল প্রজাদের উপর অকৃত্রিম একটা অপত্য-স্নেহই তাঁর ছিল।

তাই এখানে বাড়ি করেছিলেন গিরিশনাথ। বাড়িটা অবশ্য জমিদারের নাম রাখবারই মতো। পাঁচিলে ঘেরা মস্ত তিন-মহলা বাড়ি। সামনে সিংহ-দরজা। আশেপাশে অন্তহীন মাঠ—আর অনেক দূরে চিকচিক করছে নদীর একটা রুপোলি রেখা। নদীর নাম মহানন্দা। নদীটা অবশ্য আগে অনেক কাছেই ছিল কিন্তু বছর দশেক আগে থেকেই দূরে সরতে শুরু করেছে। পাহাড়ী নদীর যা স্বাভাবিক নিয়ম—মাটি-মেশানো বালির রিক্ত শয্যা বিকীর্ণ হয়ে আছে, তার ওপর গজিয়েছে এলোমেলো আকন্দ আর বন-তুলসীর ঝাড়।

এখানে সোমনাথ কখনো সচরাচর আসে না। ছেলেবেলায় দু-একবার এসেছিল, নদীতে নৌকো ভাসিয়েছিল আর এয়ারগান্ দিয়ে শঙ্খচিল শিকার করবার চেষ্টা করেছিল, এই পর্যন্তই মনে আছে; কিন্তু তারপর এখানে আসবার আর কোনো প্রয়োজন বা প্রেরণা বোধ করেনি। শিকারে তার ঝোঁক আছে, কিন্তু অরণ্যের সে রোমান্স বা অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য জাতের জিনিস। শহরের জীবন সে ভালোবাসে, ভালোবাসে সেখানকার মুখর জন-যাত্রা, জনাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে বীথি-পথ দিয়ে ঝড়ের গতিতে রেসিং-কার চালিয়ে যাওয়া, রেসের ঘোড়ার বাজি ধরা।

সে নাগরিক নেশা—সে নেশা সভ্যতার।

তবু কেন আসতে হল এখানে?

বলা বাহুল্য, একেবারেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নয়। প্রয়োজন। বাস্তব এবং বিরক্তি-কর প্রয়োজন। রেসিং-কার আর রেসের খরচ, নতুন রাইফেলের খরচ, এগুলো শহরের পথঘাট থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। নাগরিক জীবন-যাপনের ইন্ধন এই সমস্ত পল্লী এবং অনাদৃত জায়গাগুলো থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। যেখানে কোমল, অনাবরণ আর স্নেহস্নিগ্ধ পৃথিবী—যেখানকার মানুষ ধুলো-কাদার মধ্য থেকে সোনা কুড়িয়ে তোলে শহরের পাথর-বাঁধানো কঠিন পথে ছড়িয়ে দেবার জন্যে এবং নিজেদের জন্যে রিক্ততার করপুট ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে না—বাধ্য হয়েই সোমনাথকে সেখানে এসে উপস্থিত হতে হয়েছে।

আর সঙ্গে এসেছে অনুপমা। কিন্তু তার কথা পরে।

নিচের তলায় বসবার ঘরে কথা বলছিল সোমনাথ আর সিপাই মহলদার। বাইরে ঘনিয়ে আসছে বিকেলের ছায়া। দূরে তালবনের পটভূমিতে সূর্য রক্ত ছড়িয়েছে—বিলের জল রাঙা হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বুনো হাঁস।

মহলদার লম্বা চেহারার লোক। মুখে বসন্তের দাগ। বাসন্তী রঙের ধুতির ওপরে ময়লা কুর্তি পরা—দু হাতে প্রাণপণে খৈনি ডলছিল সে।

মহলদার বললে, এ তো ঠিক কথাই বাবু। এত টাকার জিনিস আপনার—কেন এভাবে বরবাদ হয়ে যাবে? যদি ভরসা দেন তো কাল থেকেই বাঁধ দিয়ে ফেলি।

সোমনাথ একটা চুরুট ধরিয়ে চিন্তা করতে লাগল, জবাব দিলে না।

—টাকার জন্যে ভাববেন না আপনি। পাঁচশো না হয় সাতশো নিন। মোট কথা ওই বিল আর ভাঁড়া ছেড়ে দিন আমাকে—তারপর যা হয় তা হবে।

সোমনাথ চিন্তিত মুখে বাইরের দিকে তাকালো। আধা অন্ধকারে সাঁওতাল পাড়াটা দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে আসছে—শুধু দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাদলের শব্দ। সোমনাথ বললে,

যা হয় তা হবে নয়। সাঁওতালদের তুমি চেনো না মহলদার। একবার ক্ষেপে গেলে ওদের সামলানো মুশকিল।

—খেপবে? কেন খেপবে?—মুঠিভরা খৈনি পুরে দিয়ে মহলদার উৎসাহিত হয়ে উঠলো: ওদের খেপবার কী আছে হুজুর? আপনার জমি, আপনার জল—আপনি যা খুশি তাই করবেন। এতে কার কী বলবার আছে?

—তুমি বুঝছ না মহলদার। চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে সোমনাথ বললে, এতদিন ধরে ওরা ডাঁড়ার মাছ ধরে খাচ্ছে, কোনোদিন কেউ বাধা দেয়নি। সেই থেকে ওদের একটা দাবি দাঁড়িয়ে গেছে। সে দাবি সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে কর নাকি?

—বেশ তো, জোর করুন না হুজুর।

—সেটা কি বিশ্রী হয়ে উঠবে না?

মহলদার অনুকম্পার হাসি হাসল।

—কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি হুজুব।

—উ?

—বাঙালি জমিদার বড ভরপোক। খালি দুধ-ঘিউযের শ্রাদ্ধ করতে পারে, আব কিছু পারে না।

সোমনাথের চোখে ধ্বক করে আগুন জ্বলে গেল। অপরিসীম স্পর্ধা লোকটার। এক চড়েই মহলদারের মাথার খুলিটা দশ হাত দূরে উড়িয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু সোমনাথ কিছু বললে না, শুধু নীরবে চুরুট টেনে চলল।

মহলদাব অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পর আস্তে আস্তে বললে, হুজুর তা হলে—?

—তুমি যাও, আমি ভেবে দেখব। কাল খবর নিয়ো।

—হুজুর।

সেলাম করে বেরিয়ে গেল মহলদার।

টেবিলটার ওপরে পা তুলে দিয়ে সোমনাথ অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। ব্যাপারটা নিজের কাছেও খুব বেশি ভালো লাগছে না। হাঙ্গামা বা মাবামারিটাকে সোমনাথ খুব বেশি ভয় করে না, নতুন রাইফেলটা যতক্ষণ হাতে আছে, তখন পাঁচশো হোক বা পাঁচ হাজার লোকই হোক, সেজন্যে কিছু দুশ্চিন্তা নেই সোমনাথের। আসলে যেটা বাধছে সেটা নিজের মনের ভেতর। গিরিশনাথ তাঁর সাঁওতাল-প্রজাদের বড বেশি ভালোবাসতেন, সন্তান বলে মনে করতেন। আজকের এই অপ্রীতির সঞ্চারটা যেন কেমন—

অথচ উপায় নেই। চারদিকে দেনা। সোমনাথ যখন রেসিং-কার কিনেছে কিংবা ব্যাক করেছে রেসের ঘোড়াকে, তখন দিনের পর দিন জমিদারিও রেস দিয়েছে সর্বনাশের

অভিমুখে। এখন টাকা চাই, প্রচুর টাকা, রাশি রাশি টাকা। পাঁচ-সাতশো টাকায় বিশ্বগ্রাসী প্রয়োজনের খাঁকতি যে খুব বেশি মিটবে তা নয়—তবু যতখানি হয়।

ঘরে অন্ধকার ঘনাল। ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে বাইরে; ডাকছে ব্যাং, ডাকছে নানা জাতের পতঙ্গ। দিনের আলোয় যাদের চোখে দেখা যায় না, লুকিয়ে থাকে ভয়ে এবং সংকোচে, সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা নিজেদের আনন্দিত কলরব দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরটা আলো দিয়ে গেল, দিয়ে গেল এক কাপ চা। অন্যমনস্ক ভাবে সে চায়ে চুমুক দিয়ে চলল।

—প্রাতঃপেন্নাম।

সোমনাথের চমক ভাঙল।—কে, হরেন? এসো। কিন্তু এই ভরসন্ধ্যেবেলাতে প্রাতঃপেন্নাম কিসের হে?

হরেন অপ্রতিভ হয়ে বোকার মতো দাঁত বের করে হাসল।

—আজ্ঞে, বুঝলেন না, ওটা মুখের 'লবজো' হয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলতে গেলেই ফস করে প্রাতঃপেন্নাম বেরিয়ে যায়—সামলাতে পারি না। অভ্যেস।

—বদ অভ্যেস।

হরেন তেমনি দাঁত বের করে হাসল।

—তারপর, খবর সব বলো দেখি। বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—আজ্ঞে এই বসছি।—একপাশে ছোট বেঞ্চটার ওপরে আসন নিলে হরেন। প্রথম দৃষ্টিতেই যেটা মনে হয় সোমনাথের, ঠিক একটা বিপরীত রূপ লোকটার। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু অতিরিক্ত রোগা বলেই ঠিক বোঝা যায় না। কানের পাশে চুলগুলো শাদাও নয়, কালোও নয়, সোমনাথের মতো লালচেও নয়—তামাকের রঙের মতো পাটকিলে, অর্থাৎ কলপ ব্যবহারের নিদর্শন। ছোট ছোট চোখ দুটো ধূর্ততায় উজ্জ্বল—শুকনো মুখ আর চিমসে চামড়ার আড়াল থেকে সে চোখ যেন আত্মপ্রকাশ করেনি, উঁকি দিচ্ছে। এ সেই লোক, যে শুভঙ্করের নামতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারে, কড়া—ক্রান্তি—কাগ—তিলের যোগ চক্ষের নিমেষে করে ফেলতে পারে এবং জমিদারির পক্ষে অপরিহার্য ফৌজদারী আর দেওয়ানী কার্যবিধির মূল্যবান অংশগুলো যার ঠোঁটাগ্রে; নেকড়ের মতো সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে সে চলা-ফেরা করে এবং ছুটতে পারে খরগোসের মতো দ্রুত গতিতে।

একটা ছোট ডিবে থেকে এক টিপ নস্যি নিলে হরেন। বললে, আর সব ঠিক আছে কর্তা। সাঁওতালদের একটা মস্ত গুণ ওদের জমিদারে অচলা-ভক্তি। জমিদার যা বলবে হাজার অসুবিধে হলেও তা মাথা পেতে নেবে। এক মেয়েদের গায়ে হাত না পড়লে ওদের

রক্তে সহজে আগুন জলে না।

—সে তো বেশ কথা।

—বেশ কথাই তো ছিল এতদিন। কিন্তু হালে এক গণ্ডগোল বেধেছে হুজুর।

—গণ্ডগোল? কী গণ্ডগোল?—সোমনাথ ভ্রুকুঞ্চিত করলে।

—আজকাল যে ওরা অন্ধকার থেকে আলোকে আসছে হুজুর।—হরেন কোঁচার খুঁটেই নস্ত-সিক্ত নাকের লালা-নিঃস্রাবটা মুছে ফেললে।

—কেন, পাদ্রীরা এসেছে নাকি এখানে?

—না, পাদ্রী নয়। একজন লেখাপড়া-জানা বাঙালিবাবু, বছর পাঁচেক জেল-খাটা স্বদেশী মানুষ। সঙ্গে একটা অন্ধ বউ। এখানে বসে আশ্রম করেছে, লেখাপড়া শেখাচ্ছে সাঁওতালদের। তাঁত বসিয়েছে পাঁচ-সাতখানা।

অকৃত্রিম বিস্ময়ে সোমনাথ চোখ বিস্ফারিত করলে।

—বাঙালিবাবু? সঙ্গে অন্ধ বউ?

—আজ্ঞে সাঁওতালেরা গুরু বলে তাকে। শুনেছি সে-ই ওদের উপদেশ দিয়েছে ডাঁড়ায় বাঁধ দিতে দিয়ো না, নিজেদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিয়ো না। তোমাদের মাছ তোমরা খাবে তাতে কার কী বলবার আছে।

—বটে! বটে! There are more things in heaven and earth—

—আজ্ঞে, সেই যত গণ্ডগোলের গোড়া। সাঁওতালেরা আজকাল কী বলা শুরু করেছে জানেন? জমি যারা চাষ করে, তারাই জমির মালিক। মাটিতে যে কখনো পা দেয়নি, এক কাঠা জমিতে যে কখনো লাঙল ঠেলল না, সে কিসের জমিদার? তাকে খাজনা দিই তো দয়া করে।

—এত দূর?—সোমনাথের চোখে আগুন জলে উঠল: আমার জমিদারিতে বসে—?

—আজ্ঞে। হরেন আর এক টিপ নস্যি নিল: এভাবে চললে আর বেশি দিন জমিদারি করতে হবে না—মানে মানে তলপি-তলপা গুটোতে হবে।

—তাই দেখছি।

রাগে সোমনাথের সমস্ত মনটা জলতে লাগল। এইসব স্বদেশী করার দল, দেশটাকে রাতারাতি রাশিয়া বানাবার দল। শহরে এরা যা খুশি চিৎকার করুক, কাগজের পাতায় যত খুশি লিখে যাক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখানে এসব কী? এতখানি বরদাস্ত হবে না—যেমন করে হোক এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

—ওই সাঁওতালগুরুকে কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলতে পারো? আসবে?

—আজ্ঞে তা আসবে। মুখ মিষ্টি, বিনয়ে গলেই থাকে সব সময়ে। কিন্তু আসলে ঠিক

আছে। নোয়াতে পারবেন বলে মনে হয় না।

—সে আমি বুঝব। নিজে থেকে না হুইলে নোয়াতে আমি জানি।—সোমনাথ হঠাৎ অধৈর্যের মতো উঠে দাঁড়াল—বারকয়েক অস্থির ভাবে পায়চারি করলে ঘরের ভেতর। চুরুটের রাশি রাশি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঘরটা।

রক্তের মধ্যে যেন শিকারের ডাক শোনা যাচ্ছে—হৃৎপিণ্ডে চকিতে দোলা লেগেছে সোমনাথের। কিন্তু এবার আর সুন্দরবনের বাঘ নয়, ডুয়ার্সের গণ্ডারও নয়। মানুষ মানুষের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এই স্বদেশী বাবুদের সোমনাথ জানে, ব্যাপারটা সহজ হবে না।

সোমনাথ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো : আচ্ছা তুমি যাও। সাঁওতালগুরুকে খবর দিয়ো।

—আজ্ঞে।—নেকড়ের মতো সতর্ক নিঃশব্দ পায়ে এবং খরগোসের মতো দ্রুতগতিতে হরেন বাইরের অন্ধকারে নেমে গেল।

সাত

ওপরের ঘরে অনুপমা চুপ করে বসে ছিল।

এতবড় বিরাট বাড়ি—আকাশছোঁয়া এই মাঠ। বিরল-বসতি রিক্ততা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। জানালার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই অনুপমার।

আজ ছয় বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অনুপমা নিঃসন্তানা। মনটা কেমন উদাস আর নিরাসক্ত হয়ে গেছে। কলকাতার জীবন দুর্বহ—তাই অনেকটা জোর করেই সোমনাথের সঙ্গে চলে এসেছে এখানে—মাস তিনেক হাওয়া বদলে যাবে। কিন্তু কলকাতার কোলাহল যেমন খারাপ লাগছিল, এখানকার অতিরিক্ত স্তব্ধতা তার চাইতেও বেশি খারাপ লাগছে।

অবশ্য সোমনাথের চেষ্টার ত্রুটি নেই। রাশি রাশি বই আনিয়ে দিয়েছে, এনে দিয়েছে গ্রামোফোন, স্তূপাকারে রেকর্ড। এমন কি ড্রাই-ব্যাটারি দিয়ে একটা রেডিয়ো পর্যন্ত।

তবু সময় কাটে না। তবু মন ভরে না। আসল কথা—সোমনাথের জীবনের সঙ্গে ছন্দ মেলেনি অনুপমার। প্রথম পরিচয়ে সোমনাথের যে ব্যক্তিত্ব আর পৌরুষকে সে শ্রদ্ধা করেছিল, যা তাকে আকর্ষণ করেছিল অগ্নিলুব্ধ পতঙ্গের মতো—তাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমনাথের এত শক্তি যে অনুপমা সেখানে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না; প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন না দিয়ে স্বামীর কাছে এগোবার উপায় নেই।

সাত বছর আগেকার কথা ছায়ার মতো অস্পষ্টতায় ভরা। অনেক বিস্মৃতি তার ওপরে কুজ্ঝটিকার জাল রচনা করেছে, অনেক ধুলো ছড়িয়েছে সেদিনের চিত্রপটের ওপরে। তবু একজনের কথা মনে পড়ে। সে মাস্টার মশাই।

মাস্টার মশাই কলেজের ছাত্র—বয়স অল্প। সাহস, শক্তি, অর্থ, রূপ—এমন কি বিদ্যার দিক থেকে বিচার করলেও সে সোমনাথের সামনে দাঁড়াতে পারে না। তবু সোমনাথের চাইতে সহস্রগুণে সম্পূর্ণ। একটা নতুন জগৎ—নতুন পৃথিবীর বাণী নিয়ে এসেছিল। অপমানিত লাঞ্ছিত ভারতবর্ষ। কাঁটামারা বুটের তলায় দেশের হৃৎপিণ্ড কাদার তালের মতো দলে যাচ্ছে—পিষে যাচ্ছে। আর পদদলিত মানুষের মুক্তির বাণী আসছে চীন থেকে, রাশিয়া থেকে, নবজাগ্রত তুরস্কের প্রাণ থেকে।

কী জীবন হতে পারত—অথচ কী হয়ে গেল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হয় অরুণকে—সে কি ভালোবেসেছিল তাকে ? কিন্তু ভাবনাটাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নেই। তার চাইতে যা ঘটেছে তাই ভালো। তাকে মেনে নাও—ক্ষোভ কোরো না, অভিযোগ কোরো না।

কিন্তু তাই কি ?

জানালা দিয়ে অনুপমা তাকিয়ে রইল।

ভরা বিলে টান ধরেছে। আকাশ ভরে নানা জাতের পাখি। এদিকে সোনার রঙ ধরা ধানের জমির এখানে ওখানে কলা আর তালবনে ঢাকা সাঁওতালপাড়া। দূরের নদীটার জলরেখাটা বেশ পুষ্ট আর পরিস্ফুট।

মনে পড়ল এককালে কবিতা লিখত সে। বিয়ের পরও বছর দুই লিখেছিল, অল্প-স্বল্প নামও হয়েছিল বাজারে। কিন্তু একদিন সোমনাথের একটা প্রচণ্ড অট্টহাসিতে সে কবিতা হাওয়ায় উড়ে গেল।

—কী লিখেছ, 'জ্যোৎস্না-বাসর' ? আচ্ছা চাঁদের আলো দেখলেই এমন একটা অসহ্য ন্যাকামি তোমাদের মগজে ঠেলে ওঠে কেন বলতে পার ?

অনুপমা জবাব দেয়নি।

—এগুলো ইন্‌ডাইজেশনের লক্ষণ—স্টমাক ঠিক থাকলে ওসব ব্যাধি কাছে এগোয় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গদাই যা বলেছে তার সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

—হুঁ।

—তুমি রাগ করছ হয়তো—চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে উদাত্তভাবে কথা ছুঁড়ে দিল সোমনাথ : কিন্তু সেন্টিমেন্টের দোহাই আমি সব সময়ে মেনে যে চলতে পারি না, নিজের এই দুর্বলতাটাকে স্বীকার করি। বী হেল্‌দি—শরীরে এবং মনে। সুস্থ কবিতা লেখো, সুস্থ জীবনের মন্ত্র উচ্চারণ করো।

মাসিকপত্রের পাতাটা উলটে সোমনাথ পড়লে :

চাঁদের আলোয় দুধের সায়রে পাখা মেলে উড়ে যায়
ময়ূরপঙ্খী নায়ের মতন ভাবনা-বিভল্‌ মন—

—ননসেন্স অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড। যেমন দুধের সায়র, তেমনি ময়ূরপঙ্খী, আর মনের ডানার ব্যাপারটাও ঠিক সেই রকম অপরূপ বস্তু একটা। কবিতা লিখতে চাও—লিখতে পার ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো—'I sing the body electric'— !

সেই থেকে বাইরের কাগজে লেখা ছেড়ে দিয়েছে অনুপমা। অন্তত সোমনাথের চোখে না পড়ে। বস্তুবাদী, বুদ্ধিবাদী সোমনাথ। দেহে মনে প্রচণ্ড বলশালী আভিজাত্য। যেন জনমণ্ডলের মণ্ডলেশ্বর হওয়ার জন্য ভগবানের ফরমাস দিয়ে তৈরি। তার বিরাট শক্তি আর দম্ভের কাছে—কবিতা বল, জীবনের যা কিছু ললিত আর কোমল বল, সবই silly আর অর্থহীন।

অথচ নির্মল। কী চমৎকার রসগ্রাহী মন। কেমন দরদ তার গলায়, কেমন গভীর উপলব্ধি তার পড়ার ভেতরে। হঠাৎ ছন্দপতনের মতো অরুণ এসে না পড়লে তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা নিতান্তই অসম্ভব ছিল না অনুপমার।

খুব কি খারাপ হত ? হয়তো নয়।

কিন্তু নির্মলও থাক। যা হয়ে গেছে, তাই সত্য। অভিযোগ করে লাভ নেই। সোমনাথের সঙ্গে তার মন হয়তো মেলেনি—কিন্তু এমন একটা দিক সেই সঙ্গে আছে যার মূল্য কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। নির্ভর করতে পারে, নিশ্চিন্ত হতে পারে। সহস্র সংকটের মধ্যেও একা বুক পেতে দাঁড়াবে সোমনাথই। বজ্রধর ইন্দ্রের মতো সে একচ্ছত্র এবং একক। কোনো দুর্বল মুহূর্তেই অনুপমার কাছে এসে অসহায় গলায় বলবে না : এখন কী করা যায় বল তো অনু ?

নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, নিদ্রা। মৃত্যুর মতো। ভয় নেই, ভাবনা নেই—অতএব প্রাণও নেই। তা ছাড়া যা তাকে হয়তো খানিক পূর্ণ করে তুলতে পারত, সেই সন্তানের আশীর্বাদেও বঞ্চিত অনুপমা। একটা অসাড় আচ্ছন্নতায় সে যেন তলিয়ে আছে, তলিয়ে আছে হিমাচ্ছন্ন একটা শীতলতার মধ্যে।

আজ কিন্তু এই বিকালের স্নিগ্ধ-ছায়ায়, দূরের নিঃসঙ্গ প্রান্তর আর জল-বিস্তারের পটভূমিতে বহুদিন পরে একটা ছোট কবিতা লিখে ফেলেছে সে। বলা বাহুল্য, নিতান্তই রোমান্টিক ব্যাপার, সোমনাথের অতি-প্রিয় 'লাস্ট্‌ রাইড্‌ টুগেদার' নয়, হুইটম্যানের 'I sing the body electric'-ও নয়। এ কবিতা তার অবসরের সঙ্গী, নিভৃত মনের ডাইরি, গানের কলির গুঞ্জনের মতো খানিক ছন্দোচ্ছ্বাস।

কবিতাটার ওপরে চোখ বোলাল অনুপমা :

মোর বালুচরে ফোটে না তো ফুল,
নাচে শুধু মরুশিখা,
দিয়ে যাও তুমি দিয়ে যাও সেথা
শ্রাবণ-মেঘের টীকা।
দূর বন-মাঝে কেকা উতরোল
নীল নদী-জলে ওঠে কল্লোল,
আজো কি দেবে না চরণ-চিহ্ন
ওগো মোর অ-নামিকা ?

জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। সোমনাথ উঠে আসছে ওপরে। মুহূর্তে অনুপমার কবিতাটা বুকের ভেতর ব্লাউজের নিভৃত আশ্রয়ে চলে গেল। সব সহ্য হয়, কিন্তু যে কবিতা প্রাণ দিয়ে লেখা তাকে নিয়ে কুশ্রী শ্লেষ—ব্যাপারটা কেমন বরদাস্ত করা যায় না।

চিন্তিত মুখে সোমনাথ ঢুকল। কিছুদিন থেকেই অনুপমা লক্ষ্য করছে সোমনাথের মধ্যে ঘুণ ধরেছে কোথাও। সেই সুস্থ বলিষ্ঠ হাসি নেই, নেই তার স্বাভাবিক উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে চুরুটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগল সোমনাথ। ঘরের আলোতে দেখা গেল তার মুখের ওপর তিন-চারটে কালো কালো রেখা পড়েছে।

অনুপমা বললে, সারাদিন কোথায় ছিলে ?

সংক্ষিপ্ত জবাব এল : বাইরে।

—বাইরে বাইরেই তো ঘুরে বেড়াচ্ছ দিনরাত।

—কী করব ?

—কেন, বিশ্রাম করতে পার না একটু ?

বাইরের দিকে চোখ মেলে সোমনাথ বললে, দরকার হয় না।

ব্যস—এই পর্যন্তই শেষ। অনুপমা জানে সোমনাথের মন এখন কথা বলবার জন্যে তৈরি নয়। কথাবার্তা আরো কিছুক্ষণ টানবার চেষ্টা করলে এমন রূঢ় একটা জবাব আসবে যাতে যে-কোনো লোকেরই অপমান বোধ করা উচিত।

দু রকমের লোক আছে পৃথিবীতে। একদল আছে যারা সামান্যতম অসুখ আর অসুবিধের ব্যাপারটাও নিজের ভেতরে পুষে রাখতে পারে না, চেঁচায়, ছটফট করে, দশ-জনকে ডেকে সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ বিশ্বাস নেই নিজের ওপরে—অথবা সেই সব বিশেষ মুহূর্তে বোধ করে একান্ত একটা অসহায়তা। তখন অন্যের কাছে আশ্রয় চায় তারা—সহানুভূতি কামনা করে।

কিন্তু আর একদল আছে যারা ঠিক এর উলটো। নিজের দুঃখ, নিজের ব্যথাটাকে

তারা যতটা সম্ভব নিজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে ভালোবাসে। বিকৃত মুখে তীব্রতম যন্ত্রণাকেও বহন করে যায়। কেউ শুশ্রূষা করতে এলে বিরক্তি বোধ করে, কেউ সহানুভূতি জানাতে এলে সহ্য করতে পারে না, যেন মনে করে তার অসহায় বিপন্নতার সুযোগ নিয়ে করুণার ছদ্মবেশে আরো দশজনে তাকে অপমান করছে। সজাগ ভাবে না হলেও অবচেতন ভাবে তারা আত্মকেন্দ্রিক—হয়তো অত্যন্ত বেশি স্বার্থপর।

সোমনাথ এই দলের মানুষ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপমা বুঝতে পারছে যে এই মুহূর্তে একটা দুশ্চিন্তার পাথর ওর মনের ওপর চেপে বসে আছে। কিন্তু অনুপমার মতামত চায় না সোমনাথ—সহানুভূতিও চায় না। যেচে সহানুভূতি জানাতে গেলে সেটাকে অসহ্য অনধিকার চর্চা বলে মনে করবে।

সোমনাথই প্রথমে কথা বললে, কেমন লাগছে তোমার?

—ভালো লাগছে না।

—কেন?—সোমনাথ জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালো: এত উৎসাহ করে তো এলে। বললে চারদিকের নির্জনতা তোমার মনের পক্ষে রিক্রিয়েশান হবে, কলকাতার হট্টগোলে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ।

—কিন্তু এখন নির্জনতাই হাঁপিয়ে তুলেছে।

—আই সী!—চুরুটের খানিকটা ছাই টোকায় উড়িয়ে দিয়ে সোমনাথ বললে, হাউ কিউরিয়াস। তোমাদের কবি-মনকে বোঝবার উপায় নেই সত্যি। আমি ভাবলাম এখানে এসে তোমার কবিতার খোরাক মিলে যাবে, আর তুমি প্রাণ খুলে আকাশের নীলিমা আর বনের শ্যামলিমা পান করতে থাকবে। আর কিছু না হোক একটা মহাকাব্য তো আরম্ভ করে দিতে পার।

অনুপমা চুপ করে রইল।

সোমনাথ বোধ হয় খানিকটা স্বাভাবিক আত্মস্থতা ফিরে পেয়েছে। কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে বলে যেতে লাগল: অবশ্য মহাকাব্য মেয়েরা কখনো লিখতে পারে না। সে নার্ভ কিংবা ছন্দের সে ওজস্বিতা তাদের নেই। তা ছাড়া লেখবার মতো উপাদানই বা কোথায়?

অনুপমা মৃদু গলায় বললে, কেন, তুমিই তো আছ।

—গ্রেট স্কট! ঠিক ধরেছ তো—সোমনাথ খুশি হয়ে উঠল: হ্যাঁ, আমি একটা মহাকাব্যের নায়ক নিঃসন্দেহ। একেবারে রামচন্দ্রই বটে। অতটা পিতৃভক্তি নেই সত্যি, কিন্তু রাক্ষস মারবার যোগ্যতা নিশ্চয় আছে। আর রামধনু আছে আমার নতুন রাইফেলটা—একেবারে অমোঘ। আর তুমি নিশ্চয় সীতা?

—তোমার অনুগ্রহ।

—কিন্তু সীতা? ভ্রূ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করতে লাগল সোমনাথ—তোমাকে বোধ হয় স্বর্ণসীতা বলা উচিত। তুমি আছ, অথচ নেই। সোনার প্রতিমার মতো অপরূপ হয়ে আছ, কিন্তু প্রাণ নেই কেন বলতে পার?

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল, তারপরে হঠাৎ হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল।—সাড়ে আটটা বেজেছে। হরেন রাস্কেলকে আসতে বলেছিলাম, কিন্তু এল না তো! আচ্ছা তুমি বোসো অনু, আমি নিচে যাই।

—নিচে থেকে এই মাত্রই তো এলে।

—কী করব, নিরুপায়। সোমনাথ হাসল: তুমি বড় একা-একা আছ। তা এক কাজ কর না, একটা 'বিরহ-শতক' লিখতে শুরু কর—বেশ জমাতে পারবে।

সোমনাথ বারান্দায় চলে গেল, তারপর নেমে গেল সিঁড়িতে।

কিন্তু সোমনাথের একটা কথার জবাব দিতে পারত অনুপমা—অন্তত সে জবাব দেবার অধিকার তার ছিল। স্বর্ণসীতাকে প্রাণ-সঞ্চার করে জীবন্ত করবার যে দায়—তার কতটুকু পালন করেছে সোমনাথ? সোমনাথ ঐশ্বর্যের উপাসক আর অনুপমার রূপ সেই ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত একটা সম্পদ মাত্র। অশ্বমেধ যজ্ঞে রামচন্দ্র যে স্বর্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার বেশি কিছুই নয়।

* * * *

এইবার ফাঁকা মাঠটা পাড়ি দিয়ে চলে এসো সাঁওতাল পাড়াতে। এরা সোমনাথের প্রজা। সভ্য-শিক্ষিত আধুনিক জমিদারের আধুনিক প্রকৃতিপুঞ্জ।

চেহারা মিশকালো। ওরাওঁ কিংবা তুরীদের মতো কটা রঙ এদের মধ্যে সহজে চোখে পড়বে না। কারখানা বা খনিতে যারা চাকরি করে তাদের কথা আলাদা—কিন্তু গ্রামে যারা থাকে, তাদের মধ্যে নৈতিকতার একটা সহজ মানদণ্ড আছে এবং সে অপরাধের বিচার করে এরা নির্মম ভাবে। সেইজন্যে আর্যরক্তের বর্ণসঙ্কর এখনো এদের মধ্যে ঘটতে পারেনি।

মাথায় ঝাঁকড়া চুল—কারো কারো বা কোঁকড়ানো। হাতে কেউ কেউ চাঁদির বালা পরে। মাদলে সেই চাঁদির বালার ঘা দিয়ে উদ্দাম নাচের ছন্দ জাগিয়ে তোলে। বড় বড় নির্বোধ চোখে শিশুর মতো তাকায়—কোনো কোনো মুহূর্তে সে চোখে বুনো বাঘ হিংসা-বর্ষণ করে যায়। দেহে মনে চিরন্তন সাঁওতাল।

সোমনাথের বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে খানিকদূরে এগিয়ে এসে নেমে পড়ো আলের পথে। আলের পথ—কোথাও সোজা টানা রেখায়—কোথাও বা সমকোণ নিয়ে বেঁকে গিয়েছে। দুধারে ধান—'ঝুলন' লেগে পথের ওপরে নুয়ে পড়ছে। ভালো করে তাকালে দেখা যাবে মাঝে মাঝে নানা রঙের ঘাসের ফুল—সাঁওতাল মেয়েদের মতোই অনাদৃত অথচ অপরূপ।

ক্ষেতগুলো ঠিক সমতল নয়। ঢেউয়ের মতো তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে—এক-এক টুকরো ক্ষেত যেন এক-একখানা সিঁড়ির মতো পাতা। এই সমস্ত টিলা-জমির দেশে ধানের ক্ষেতগুলো প্রায়ই এমনি ঢেউ-খেলানো, হঠাৎ দেখলে অনভ্যস্ত চোখে কেমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হয়। আর ঢেউয়ের মতো উঠতে উঠতে ক্ষেতের সীমানাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে যেন পাহাড়ের চুড়োয় সারি সারি তালগাছ সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে। ওইখানে লাল মাটির দাওয়া-লেপা ছোট ছোট খোড়ো ঘর—পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। সাঁওতালদের গ্রাম। মাটি-লেপা উঠোনে ছোট ছোট মরাই, উদূখল। কোথাও কোথাও ঢেঁকি। খাঁচায় শালিক আর ময়না। তেজী শিকারী কুকুর—লেজগুলো ছাঁটাই করা। যাযাবর মানুষেরা পুরোপুরি সংসারী হওয়ার চেষ্টায় আছে।

এইখানে—এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্বদেশীবাবুর আশ্রম। ছোট একখানি ঘর—সামনে একটু ফুলের বাগান। এই অমার্জিত মানুষের দেশে এসেও শিক্ষিত ভদ্রলোক নিজের স্বাভাবিক রুচিবোধটুকু বিসর্জন দিতে পারেনি।

ঘরটি অল্প আয়োজনের মধ্যে সাজানো। দেওয়ালে দু-চারজন দেশনেতার ছবি—তাদের ওপরে শুকনো ফুলের মালা দুলছে। কাঠের তাকে—এখানে ওখানে রাশি রাশি বই। ঘরের তুলনায় বারান্দাটা অনেক বেশি লম্বা, তার একপাশে একখানা তেপায়া বেঞ্চি এবং ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েক টুকরো মাদুর বিছানো। আর একধারে চারখানা তাঁত।

প্রথম সকালের আলোয় সাঁওতাল গুরুর আশ্রমে ক্লাস বসেছিল।

আট-দশটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বসেছে মাদুরে—তাদের সঙ্গে তালপাতার খাতা; শ্লেট কেনবার পয়সা নেই, এদিক থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার রীতিনীতিই এরা অনুসরণ করে চলেছে। প্রাথমিক অক্ষর পরিচয়ের ব্যাপারে বইয়ের প্রশ্নও এখনো ওঠেনি।

যে পড়াচ্ছিল সে সাঁওতাল গুরু নয়, একটি মেয়ে। বছর চব্বিশেক বয়স হবে। রঙ কালো, রূপ নেই। তার চোখ দুটির ওপরে দুটি শাদা পর্দা টানা—অন্ধ। সীমন্তে সিঁদুরের দাগ, হাতে শাঁখা, পরনে ময়লা লালপেড়ে শাড়ি।

সাত বছরের যবনিকার ওপার থেকেও মেয়েটিকে চেনা যায়—সে প্রমীলা।

কিন্তু তার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রমীলা বড্ড বিপন্ন বোধ করছিল। 'র' আর 'ড়'র উচ্চারণটা এরা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। কেউ আর 'র' বলতে পারে না—সব 'ড়'।

প্রমীলা হতাশ হয়ে বললে, কেউ পারছ না? ড় নয় র—র। কেউ বলতে পার না?

একটি ছোট মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হামি পাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে আরো তিন-চারজন দাঁড়িয়ে উঠল : হামি পাড়ি।

—পাড়ি নয়, পারি।

—হাঁ, হাঁ, পাড়ী নয়, পাড়ী। পাড়্-ড়ী।

—থাক, আর পারতে হবে না কাউকে। ওই ড়-ই থাক।

বেলা বেড়ে উঠেছে। বাপেরা গেছে ক্ষেতে কাজ করতে, মায়েরা গেছে লাকড়ি কুড়োতে আর শাক সংগ্রহ করতে। ছেলেমেয়েরা এখন যাবে ক্ষেতে বাপেদের খাবার দিয়ে আসতে। ভাত লঙ্কা আর একটু শাকের তরকারি। ওই খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাজ করবে ওরা। ধান পাকবার উপক্রম করেছে; সেদিক থেকে বিশেষ কিছু করবার নেই। কিন্তু আরো আট-দশটা টুকিটাকি কাজ আছে, গোরু-মোষ চরানো আছে, বুনো ওল সন্ধান করবার দরকার আছে, মাছের সন্ধানে বিলে পলুই নিয়ে যাওয়া আছে।

প্রমীলা বললে, আচ্ছা যাও, এখন ছুটি।

ছেলেমেয়েরা কলরব করতে করতে উঠে গেল। কোমরে ঘুনশি বাঁধা কালো কালো ছেলেমেয়ে। কিন্তু দিনের পর দিন ওদের প্রাণ-চাঞ্চল্যও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। ওদের রক্তে বিষ ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়া, আরো দশটা আধি-ব্যাধি। বাইরের জগৎ সবদিক থেকে ওদের ওপর ভেঙে পড়ছে নিষ্ঠুর আক্রমণে—ওরা এত ছোট বলেই ওদের ওপর কারো করুণা নেই—পৃথিবীরও না।

অরুণ তাঁতে কাজ করছিল খটখট করে। উঠে এল। পায়ের শব্দে প্রমীলা বুঝতে পারল, হাসল ম্লানভাবে।

বললে, বোসো।

অরুণ পাশে কাঠের বেঞ্চটার ওপরে বসল। গায়ে ময়লা খদ্দরের বেনিয়ান, পরনে খাটো খদ্দরের কাপড়। মাথায় খাড়া খাড়া চুলগুলো বড় হয়ে কান আর ঘাড়ের পাশ দিয়ে নিচে ঝুলে পড়েছে। তামাটে রঙ, রোদে-জলে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আর চোখের কোণে কোণে দেখা দিয়েছে কালো ছায়া, কিছুটা ক্লান্তি আর কিছুটা বয়সের দ্যোতক।

অরুণ বললে, তারপর উভয়-ভারতী, বিদ্যাদান কেমন চলছে?

প্রমীলা বললে, ভালোই। কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের তন্তুবয়ন শেষ হল?

—মোটামুটি। তোমার জন্যে ভালো একটা শাড়ি তৈরীর চেষ্টা করছি। চাঁপারঙের জমি, নাগকেশর ফুলের পাড় বসানো।

—কিন্তু ভালো শাড়ি নিয়ে কী করব আমি?

—কেন, পরবে। শাস্ত্রমতে স্বামীর দায়িত্ব তো জানো। স্ত্রীর অশন-বসন অলঙ্করণ

সবই সে পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্গত। অশন-বসন মোটামুটি যা হোক চলছে, কিন্তু অলঙ্কার দিতে পারছি না—সে অপরাধ নিশ্চয় ক্ষমা করেছ।

—অলঙ্কার! প্রমীলার অন্ধ চোখ সপ্রেম কৃতজ্ঞতায় ছলছল করে উঠল।

অরুণের একখানা হাত সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলে, টেনে নিলে কোলের মধ্যে। বললে, আমার সব চাইতে বড় অলঙ্কার সাতরাজার ধন মাণিক তোমাকে পেয়েছি। এর চাইতে বেশি নিয়ে কী করব?

অরুণ স্নিগ্ধ ভাবে হাসল: ওটা পতিব্রতা নারীমাত্রেই বলে থাকে। কিন্তু গয়না দিতে না পারা স্বামীর পক্ষে ঐতিহাসিক ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন—আশা করি স্বীকার করবে।

—না। আরো শক্ত করে প্রমীলা অরুণের হাতখানা চেপে ধরলে: স্বীকার করব না। তোমার আর দুষ্টুমি করতে হবে না। কিন্তু লক্ষ্মীটি, এখন ছাড় আমাকে। রাঁধতে হবে যে।

—বাঃ, আমি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি? তুমিই তো ধরে রেখেছ আমাকে!

—বেশ করেছি।

প্রমীলা চুপ করে রইল। আনন্দে আর আবেগে বুকটা ভরে উঠেছে—সমুদ্রের মতো। যেদিন ভেবেছিল নিজের আর কিছুই নেই, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সব মিথ্যে হয়ে গেছে, সেইদিন এল অরুণ, উদ্ধার করল ওকে। আজ ভালোবাসা ছাড়িয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণই বেশি হয়ে গেছে। অরুণের কাছে নিজেকে মনে হয় দুর্যোগের রাতে বাসা-ভাঙা একটা ছোট পাখির মতো; যেদিন দুর্বল পাখনা আর নিজেকে বইতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল আর অপঘাতের দেরি নেই, সেদিন কেমন করে এই বিরাট বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে আশ্রয় পেল সে!

অরুণ বললে, ছাড়ো, খড়ি নেই বোধ হয়। আমি কিছু কাঠ চ্যালা করে আনি।

—এই রোদে কুড়ুল নিয়ে ঘামতে হবে না তোমাকে। কাঠ-কুটরো যা আছে, তাই নিয়ে চালিয়ে নেব কোনোমতে।

—না না, তোমার কষ্ট হবে।

অরুণ চলে গেল।

দূরের মাঠের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ মেলে দিয়ে প্রমীলা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। ওই মাঠ নয়, বিলের চিকচিকে জল নয়—রৌদ্রের আলোতে সমুদ্ভাসিত সোমনাথের বিরাট বাড়িটাও নয়। বাইরের জগৎ আজকে রুদ্ধ হয়ে গেছে প্রমীলার।

মনে পড়ছিল সাত বছর আগের কথা।

রাজবন্দিনী। বাংলা দেশের কত জেলে ঘুরল। ছ মাস, এক বছর, তিন মাস—পনেরো দিন। নানা ধরনের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হল, পরিচয় হল নতুনতর আর

বিচিত্রতর বহু তরঙ্গিত চিন্তাধারার সঙ্গে। কোনো কাজ নেই, করবার কিছু নেই। পড়াশুনায় মন দিলে। তিনটা বছর নিরবচ্ছিন্ন লেখাপড়ার মধ্যে তলিয়ে রইল প্রমীলা।

তারপর কোথা থেকে কী হল—চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করল। জেলের ডাক্তার এসে বললেন, লক্ষণ খারাপ। ভালো ট্রিটমেণ্ট দরকার, নইলে শুধু চোখ কেন, প্রাণও বিপন্ন হতে পারে। হাসপাতাল—নানা রকমের চিকিৎসা। সরকারের যত দোষই থাক, চিকিৎসার কোনোখানে এতটুকু ত্রুটি যে হয়নি এ কথা কৃতজ্ঞচিত্তেই স্মরণ করবে প্রমীলা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। প্রাণ নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিল না বটে, কিন্তু সে অন্ধ হয়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের সমস্ত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তার ওপর থেকে। সাড়ে তিন বছর পরে জেল থেকে খালাস পেল প্রমীলা, অন্ধ আর অসহায়।

আরো প্রায় এক বছর পরে অরুণ। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে দেখল, এই সাড়ে চার বছরে শহর আর সমস্ত দেশের সব কিছু বদলে গিয়েছে! নতুন পথ ধরেছে, নতুন মত। যে ভাষায় তারা কথা বলে, যে মন দিয়ে তারা ভাবে—সেগুলো সবই তার কাছে অপরিচিত ঠেকল।

পুরনো মফস্বল শহরটাকে যেন আর চেনাই যায় না। সাড়ে চার বছরে পালটে গেছে তার আগাগোড়া চেহারা। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখান দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে মিউনিসিপ্যালিটির নতুন কংক্রীটের রাস্তা। যেখানে পচা ডোবার ভেতর ঘন সবুজ কচুরির দল আনন্দিত গৌরবে মাথা তুলে নাচত সেখানে যেন আলাদিনের প্রদীপের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে ফেরোকংক্রীটের সুন্দর আর নতুন বাড়ি।

অভ্যাসবশে একবার হেঁটে চলল নদীর ধার দিয়ে—সেই ঝাউবীথি-মর্মরিত রাঙা সুরকির পথ দিয়ে। এরও চেহারা পালটে গেছে, এখানেও জেগে উঠেছে নতুন নতুন বহুবিচিত্র বাংলো বাড়ির সমারোহ। শুধু আছে সেই পুরনো নদী—বাংলা দেশের পলিমাটিধোয়া চন্দনবর্ণ নদীর জলে তেমনি স্নেহভরা কল্লোল, সেই ঝাউবনের পুরনো গান। অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা দিয়ে গড়া এই পথ, এই নদী। চলতে চলতে থেমে সে দাঁড়াল, চমক লাগল বুকের ভেতর।

প্রসন্নবাবুর বাংলো। কিন্তু ঢোকবার দরকার হয় না। বাইরের গেটে নিষেধের তর্জনী তুলে আছে কালো রঙের একটা নেমপ্লেট: ইম্যানুয়েল দত্ত এস্কোয়ার, ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার।

ব্যথিত হওয়ার কিছুই নেই, কোনো কারণ নেই আহত হওয়ার। এ স্বাভাবিক—এ অনিবার্য। চার বছর আগেকার স্বপ্ন ঝাউবন আর নদীর অশ্রান্ত বাতাস কোনো শূন্য দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, কোনো প্রান্তে তার এতটুকু চিহ্ন রেখে যায়নি, রেখে যায়নি

একবর্ণ স্বাক্ষর।

ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল অরুণ। ফিরে এল ইস্ট-এণ্ডের খোয়া-ওঠা অনভিজাত পথ দিয়ে। এও বদলেছে, তবু এর রূপান্তরটা অপেক্ষাকৃত মন্থর, নিম্নবিত্ত জীবনের মন্থরতার স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু চেনা মুখ বিশেষ চোখে পড়ল না। দূর গ্রামের ছেলে, চার বছরের জন্যে পড়তে এসেছিল এখানে। যারা তাকে সেদিন চিনত, হয় তারা ভুলে গেছে অরুণকে, অথবা অরুণই তাদের মনে রাখতে পারেনি।

এই তো—এই তো চৌমাথার ধারে তার সেই মেস। ঠিক চেনা যাচ্ছে তো! শুধু একটু জরাজীর্ণ হয়েছে, তার বেশি কিছু বদলায়নি তো এর।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরুণ। বাইরের ঘরে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের রিহার্সাল চলছে দেখা গেল। একজন মোশন মাস্টাব বিকৃত বীভৎস মুখে মুরার পার্টের তালিম দিচ্ছে: ওরে ও হতভাগা, ওরকম করে কাঁদলে তো চলবে না। এই এমনি করে কাঁদ্—একটা বিশ্রী ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করলে সে: "কাঁদো কাঁদো অভাগিনী নারী, এই তোমার পুত্র—মা চেনে না"—

নিঃশব্দ অরুণ সরে এল।

সব অচেনা, সব ফাঁকা ফাঁকা। তারপর আস্তে আস্তে দু-চাবজনের পাত্তা মিলতে লাগল। বেলার বিয়ে হয়ে গেছে, ভালো চাকরে স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে সুখে বসবাস করছে বেলা। সুজিত জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আবার আর একটা ডাকাতিব মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, দশ বছর কন্‌ভিকশন হয়ে গেছে ছেলেটার। রক্তে রক্তে কী যে ওব খ্যাপামির নেশা—ওকে আর সামলানো গেল না।

বাকি যাদের সঙ্গে দেখা হল তারা যেন ভিন্ন গোত্রের মানুষ।

—এখন নতুন প্ল্যান, প্রোগ্রাম।

—জীবনে গণ-সংযোগ ঘটাতে হবে, অস্ত্রের ফুলঝুরি কেটে আর চলবে না।

—তাই আমরা আজ এই নতুন পার্টিকে গড়ে তুলেছি।

—কিন্তু—সংশয়ান্বিত ভাবে অরুণ বললে: কিন্তু আমি তোমাদের এই line of action মেনে নিতে পারছি না।

—কেন, বাধছে কোথায়?

—তোমরা যে জোরটা শ্রমিকের ওপর দিচ্ছ, তার মূল্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কিন্তু ওরাই তো fighting front!

—আমি মানছি না—

বাধল সংঘর্ষ। চিন্তার, কর্মপ্রণালীর। নতুন যুগের যারা নতুন কর্মী, তারা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, রেনিগেড্!

লজ্জায় অপমানে অরুণ ম্লান হয়ে রইল। অনেকগুলো বিনিদ্র রাত কাটাল উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে, চিন্তার বোঝা টেনে। তারপরই দেয়ালে চোখ পড়ল একখানা ছবির ওপর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ত্যাগব্রত ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ।

কিছু নেই, তবু অনেক করবার আছে। তোমরা গণ-সংযোগ ঘটাতে চাও, আমিও তো তাই চাই; যারা ব্রাত্য—যারা সমাজের গোড়া বাঁধে অথচ সমাজ যাদের ভুলে আছে, অনন্তনাগের মতো মাটির তলায় থেকেও প্রসারিত সহস্র ফণায় যারা ধারণ করে আছে পৃথিবীকে, তাদের জাগিয়ে তোলো, তাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে নিজে ধন্য হও। গণ-জীবনের একেবারে নিভৃত পদ্মে সেইখানেই গণ-নারায়ণ শুয়ে আছেন অনন্ত-শয্যায় অপমান আর অবহেলার বিষে কালো তরঙ্গমন্দ্রিত সমুদ্রে। তাঁকে বোধন করবার দায়িত্ব আজ নিতে হবে। নিছক বুদ্ধির পথে নয়, কতকগুলো রাজনীতির বাঁধা আইন-কানুনের ভেতর দিয়েও নয়, অন্তর দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, একাত্মতায়।

বন্ধুরা বললে, এসকেপিজম, বাস্তবকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা।

কেউ বললে, তাহলে সোজা পণ্ডিচেরিতেই চলে যাও—গ্রামে আর কেন?

আর একজন বললে, বন্ধু, ও রিফর্মিজম শুধু নিজেকে ভোলানো মাত্র। ওতে করে দেশের কোনো সমস্যার এতটুকুও সমাধান হবে না। ও দিয়ে তুমি খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পার, হয়তো বা ভাবতে পার দেশের জন্যে অনেক কিছু করছ, কিন্তু—

আর একজন থাবা দিয়ে যেন কথাটা ছিনিয়ে নিলে: কিন্তু জিনিসটা একান্ত ভাবেই রি-অ্যাকশন, বিপ্লববিরোধী। You are not to mend the existing social order but to end it—

আর একজন বললে, তুমি সত্যিকারের কর্মী, আমাদের সঙ্গে ফিল্ডে নেমে এসো। ওসব personal p-rfec'ion-এর মোহ তোমার পক্ষে বিসদৃশ!

কিন্তু অরুণ কোনো কথার জবাব দিলে না। সত্যি অনেক করবার আছে। তোমরা যা দেখতে পাও, যা ভাবো, তার বেশি কি কিছুই নেই, তার বাইরে কি কিছুই নেই? দেশকে ভালোবাসার, দেশের জন্য আত্মনিবেদন করবার দাবি সকলেরই আছে এবং তার অসংখ্য পথ—কোনো বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গির কণ্টকে তাকে আকীর্ণ করবার অধিকার কারো নেই। দলের সঙ্গে আরো কিছু বোঝাপড়া করে নেবার জন্য অরুণ বেরিয়ে পড়ল, এসে পৌঁছুল যশোরে।

ঠিক এই সময় অরুণের সঙ্গে প্রমীলার দেখা হল।

মেয়েদের একটা ছোট প্রতিষ্ঠান—অরুণকে তারা আমন্ত্রণ করেছিল, কিছু বলবার জন্যে। সেইখানে অন্ধ এই নিরুপায় মেয়েটিকে দেখা গেল। এখানে সে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—সামান্য মাইনে পায়, কায়ক্লেশে চলে। কিন্তু পুলিস পিছে লেগেছে, হয়তো এখানেও তার

বেশিদিন জায়গা হবে না। তারপর কোথায় যাবে! জগদীশ্বর জানেন।

অরুণ প্রমীলাকে বললে, চিনতে পারছ?

প্রমীলা উঠে দাঁড়াল, বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড আছড়ে পড়ছে—চোখমুখ দিয়ে যেন সোডার ঝাঁঝের মতো ঝাঁ-ঝাঁ করে বাইরে ছিটকে পড়ছে রক্তের কণিকা। বহুদিনের মরে-যাওয়া গাঙে আবার এমন করে জোয়ার এল কেন?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন? চোখ কী হল?

প্রমীলা জবাব দিতে পারল না, অন্ধ চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল নেমে এল।

অরুণ বললে, যাক, যা হয়ে গেছে সেজন্য দুঃখ করে লাভ নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই কথাগুলো বলবার জন্যে কাউকে খুঁজছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না। যাক, এ ভালোই হল যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বহুদিন পরে আবার দুটো কক্ষচ্যুত জীবনের মধ্যে যোগসূত্র বাঁধা পড়ল।

অরুণ বললে, এই আশ্রমে কি তোমার ভালো লাগে?

প্রমীলা বললে, ভালো মন্দ লাগার তো প্রশ্ন নেই। কোথাও একটা আশ্রয় তো চাই—তাই এখানে মাথা গুঁজতে হয়েছে।

অরুণ ভাবতে লাগল। প্রমীলার দশাও ঠিক তার মতো, ব্যর্থ আর অসহায়। জীবনে পথ পাচ্ছে না—দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না কোথাও, বরং আরো বেশি করুণ তার অবস্থা—দৃষ্টিহীন, সামর্থ্যহীন। তা ছাড়া বয়স আছে, তার অশক্ত দেহের ওপরে সুযোগ নেবার মতো লোকের অভাব নেই, অভাব হয়ও না কখনো।

অরুণ বললে, আমার সঙ্গে কাজ করবে তুমি?

প্রমীলা তেমনি বিষণ্ন হাসল: সে আপনার দয়া।

—বিনয় করতে হবে না। আমার অবস্থাও তোমার সঙ্গে মিলছে প্রমীলা। এদের সঙ্গে আর খাপ খাচ্ছে না আমার। দেশ যে পথে চলেছে, সে পথে আমি চলতে পারলাম না। কিন্তু সে ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে। আমি ভেবেছি গ্রামের একেবারে নগণ্যতম অঞ্চলে চলে যাব, ঘর বাঁধব সেখানে। আত্মবিস্মৃত যে সব মানুষ আছে তাদের গড়ে তোলবার ভার নেবো। এই কাজে তুমি যদি আমায় সাহায্য করো—

এতক্ষণ চুপ করে ছিল প্রমীলা, সহ্য করে ছিল অনেকক্ষণ। কিন্তু আর পারল না। অসহায় একটা কান্নার বাঁধ ভেঙে সে অরুণের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। বললে, তুমি নাও—তুমি নাও আমাকে। আমি আর পারছি না।

অরুণ বিহ্বল গলায় বললে, কী হল?

অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরল প্রমীলা। অরুণের মনে হল তার অন্ধ চোখের মধ্যে

দিয়ে উদ্বেলিত প্রাণটাও যেন বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্ত আকুলি-বিকুলি করছে। বললে, এতদিন-তোমারই জন্যে পথ চেয়ে ছিলাম। আজ তুমি এসেছ—তুমি আমাকে তুলে নাও। যেখানে হয়, যত দূরে হয়। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

অরুণ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তার পায়ের ওপরে টপটপ করে প্রমীলার অশ্রু চোখের জল পড়ছে। নির্জন দুপুর, বাইরে থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, দোলা দিয়ে যাচ্ছে বাতাস; আকাশে 'ফটিক জল'-পাখির কান্না। পৃথিবী দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

অরুণ প্রমীলাকে তুলে নিলে বুকের কাছে। কানে মুখ রেখে বললে, তাই হবে। আজ আমি তোমাকে তুলেই নিলাম সারাজীবনের মতো। এখানে আজ তুমি অনাবশ্যক, আমিও রেনিগেড্, সুতরাং তোমার আমার ছাড়া আর কার ভালো মিল ঘটবে বলো?

তারপর—

তারপর থেকেই এই গ্রাম। স্বামী-স্ত্রীর শান্ত স্নিগ্ধ জীবন। তপস্যাচরণের মতো পবিত্র, প্রাণহীন। সাঁওতালেরা ওদের ভালোবাসে, ওদের শ্রদ্ধা করে, একান্তভাবে আপনার জন বলেই জানে। সে প্রীতি, সে বিশ্বাসের তুলনা নেই।

বুক ভরে গেছে প্রমীলার। অভাব নেই, অভিযোগ নেই। 'সব পেয়েছির দেশ' যদি কিছু থাকে সে তো এই। সামান্যতম প্রয়োজন—প্রচুরতম তৃপ্তি। এতদিন পরে প্রমীলা যেন পৃথিবীতে নিজের সত্যিকারের জায়গাটিকে খুঁজে পেয়েছে।

আর অরুণ? অরুণ সম্বন্ধে কী বলবে সে? মহাসাগরের জলে নিজেকে নিঃশেষে নিমগ্ন করে দিয়ে কেউ কি বিচার করে তার ব্যাস, তার পরিধি? শুধু তার তরঙ্গের দোলা, তার স্পর্শ মৃত্যুর মতো নিশ্চিন্ত শান্তিতে অনুভব করতে হয়।...

হঠাৎ সামনে অপরিচিত পায়ের শব্দ। সংযত হয়ে উঠে বসল প্রমীলা: কে?

—আমি হরেন। হরেন পাল। জমিদারের নায়েব।

—কী চাই?

—একটা খবর আছে। অরুণবাবু কোথায়?

—ঘরে নেই, কাজে গেছেন একটু।

—ওঃ।—হরেন তেমনি চুপ করে রইল আর প্রমীলা তেমনি অনুভব করতে লাগল হরেনের দৃষ্টির আগুন। তারপর অসহ্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কী দরকার আপনার?

—ইয়ে!—হরেন একবার কাশল: তাই বলতে যাচ্ছিলাম। জমিদার সোমনাথবাবু ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। কী সব কথাবার্তা আছে। আপনি একটু যেতে বলবেন বিকেলে।

—বলব। আচ্ছা, আপনি তা হলে আসুন।

—আচ্ছা।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল—হরেন চলে যাচ্ছে, যেতে যেতে তাকাচ্ছে। পেছন ফিরে। কিন্তু হঠাৎ জমিদার অরুণকে ডেকে পাঠাল কেন? কী উদ্দেশ্য? শঙ্কিত একটা সংশয় আর প্রশ্ন-জিজ্ঞাসাতে প্রমীলার সমস্ত মনটা ভারী হয়ে উঠল।

আট

বুড়োমতন একজন সাঁওতাল এল বিকেলের দিকে। হাতে তার গোপীযন্ত্রের মতো একটা কাঠের বাজনা। তারে ঘা দিলে গুম্ গুম্ করে বেজে ওঠে। সেইটি বাজিয়ে জমিদার-বাড়িকে সে খুশি করবে খুব সম্ভব এই আশা নিয়েই এসেছিল।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতেই অনুপমার কানে গেল বিচিত্র গানের সুর। প্রথমটা মনে হল কেউ যেন সুর করে কাঁদছে। কিন্তু ভালো করে কান দিতেই বোঝা গেল, ওটা কারো কান্না নয়—গান।

"আইস কুটুম, বইস কুটুম,
শালি-ধানের চিঁড়া কুটুম খাও—"

বাঃ! অনুপমা কৌতূহলী হয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ালো। নিচের কাছারির পাঁচ-সাতজন দারোয়ানও বেশ মন দিয়ে গান শুনছে। হঠাৎ লোকটার নজর গেল ওপরের দিকে, আর উৎসাহও পাঁচগুণ বেড়ে চলল। নেচে নেচে গাইতে শুরু করলে সে:

"আকাশে দেও ডাকে,
নদীতে বান ডাকে
কেমনে যিবা কুটুম
নদীপারের গাঁও—
শালি-ধানের চিঁড়া কুটুম খাও—"

আকাশে দেওয়া ডাকছে, নদীতে বানের জল ফেঁপে উঠেছে, হে কুটুম্ব, এ সময় নদী পার হয়ে আর কেমন করে যাবে? অতএব আমার ঘরে এসো, শালি-ধানের চিঁড়ে আছে, তাই চারটি খেয়ে যাও। অশিক্ষিত গ্রাম্য-মানুষ, তাই নব-নীপের মালা আর সদ্যোবিকশিত কেয়ামঞ্জরী দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি, নিতান্তই স্থূল উদরের দিকে মনোযোগটা সীমাবদ্ধ রেখেছে। অনুপমার মন্দ লাগছিল না।

খট্-খট্-খট্। দেউড়ির সামনে বিস্তৃত মাঠের ওপার থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে আসছে। প্রথমটা কিছু দেখা যায় না—শুধু মনে হয় মাঠের ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটে

আসছে ধুলোর ঘূর্ণি। তারপর আস্তে আস্তে সেই ঘূর্ণির মধ্যে দেখা যায় একজন ঘোড়-সোয়ার। ঊর্ধ্বশ্বাসে শাদা ঘোড়াটা ছুটে আসছে, তার সোয়ার সোমনাথ।

খট্-খট্-খট্। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এল—থামল দেউড়ির সামনে। আর মুহূর্তে দারোয়ানের দল দুপাশে ছিটকে সরে গেল। সজাগ এবং সচেতন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যাসন্ন দুর্যোগের রূপটা তারা বুঝতে পেরেছে।

বুড়ো সাঁওতাল তখনো কিছু আশঙ্কা করতে পারেনি। সে তখনও ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে অনুপমার দিকে তাকিয়ে নানা মুখভঙ্গি করে গান গেয়ে চলেছে, তার কাঠের যন্ত্রটা বেজে চলেছে ভাববিহ্বল শব্দে:

"আইস কুটুম, বইস কুটুম,
শালি-ধানের চিঁড়া কুটম খাও—"

ব্রীচেস-পরা সোমনাথ বড় বড় স্পর্ধিত পা ফেলে ভেতরে ঢুকল, তারপর দেউড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা আসতেই তার চোখে পড়ল এই অপূর্ব দৃশ্য। লোকটা পাগলের মতো নাচছে, পাগলের মতো গান গাচ্ছে—অথচ জনপ্রাণী নেই। ব্যাপার কি!

সোমনাথ এগিয়ে এল পেছন থেকে, রাইডারের প্রচণ্ড ঘা বসালো লোকটার পিঠের ওপরে। আর্তনাদ করে লোকটা লাফিয়ে উঠল, হাত থেকে গোপীযন্ত্রটা পড়ে গেল মাটিতে। অনুপমার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে পাংশু হয়ে গেল—যেন এই আঘাতটা তারই গায়ে এসে পড়েছে।

সোমনাথকে দেখেই আহত লোকটা পিঠের ব্যথা ভুলে গেল। একগাল হেসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে একটা।

—কী হচ্ছে?

—রানীমাকে নাচ দেখাচ্ছি হুজুর।

—ননসেন্স। বেরো এখান থেকে। পচাই টেনে মাতলামো করবার আর জায়গা পাও-নি!

কি আশ্চর্য, লোকটা এতটুকু দমে গেল না। তেমনি হাসি-মুখে বাদ্যযন্ত্রটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সুড়সুড় করে। যেন নিজের প্রাপ্যই সে পেয়েছে।

অনুপমা ঘরের মধ্যে চলে এল। কালো বিদ্বেষ আর তীক্ষ্ণ ঘৃণায় সমস্ত মনটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। কী প্রয়োজন ছিল এই নিরীহ লোকটাকে এমন ভাবে আঘাত করবার? একটা অহেতুকী জিঘাংসায় যেন সব সময়ে সোমনাথের মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে—যারা দুর্বল, তাদের সম্বন্ধে অণুমাত্রও সহানুভূতি তার নেই।

সিঁড়ি কাঁপিয়ে সোমনাথ এল ওপরে। অনুপমার ঘরে ঢুকল, তারপর লম্বা হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিলে একখানা আরাম-কেদারাতে। বহু দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে, সমস্ত

মুখে ধুলো জমেছে। রুমালে একবার মুখটা মুছে ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল। তার মেজাজ এখন প্রসন্ন নেই, প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায় সেটা।

অনুপমা একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সোমনাথের মুখের দিকে তাকাতেও যেন তার খারাপ লাগছে। সকাল থেকে মনটা খুশিই ছিল আজকে, কিন্তু এই মুহূর্তে কী বিস্বাদ আর বর্ণহীন হয়ে গেল!

সোমনাথ বললে, কী দেখছ?

—মাঠ।

—তা মন্দ নয়। কিন্তু এসব আমার পছন্দ হয় না।

—কী সব?

—এই যাকে তাকে ধরে গান শোনা, নাচ দেখা। তোমার নিজের একটু আত্মসম্মান থাকা উচিত।

আত্মসম্মান! অনুপমা শাণিত দৃষ্টিতে তাকাল সোমনাথের দিকে: ওই লোকটার গান শোনাটাও কি আত্মসম্মানের প্রতিবন্ধক নাকি!

—নিশ্চয়। তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকে নিচে তাকাতে পারবে না। নিচে তাকালে ওদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নীরব বিদ্রোহে অনুপমা চুপ করে রইল। সোমনাথের কথাবার্তাগুলো মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য বলে মনে হয় তার। আভিজাত্যের সীমারেখাটা সব সময়ে ধরতে পারে না সে। কিন্তু যত দিন যায় ততই মনে হয় সে রেখাটা সংকীর্ণ—বড় বেশি সংকীর্ণ। এবং সংকীর্ণ হতে হতে এমন দিন কি আসতে পারে না যেদিন ফাঁসের দড়ি হয়ে তা গলায় এঁটে বসতে পারে?

অনুপমা চোখ তুলে বললে, আমাকে কী করতে বলো?

—কিছুই করতে বলি না। তোমার বই আছে, গ্রামোফোন আছে, এমন কি জংলা-দেশে ড্রাইব্যাটারি দিয়ে একটা রেডিয়োর পর্যন্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তা ছাড়া তোমার নিজের লেখবারও অভ্যেস আছে। সুতরাং সময় কাটাবার অসুবিধে তোমার নেই।

তা ঠিক। সোমনাথের যুক্তিগুলো নির্ভুল। বই আছে, গ্রামোফোন আছে, রেডিয়ো আছে। বাস্—আর কিছুই চাই না। কিন্তু আরো অনেক জিনিসই আছে, যার কথা সোমনাথ বলেনি, হয়তো বিনয় করেই বলেনি। ভালো ভালো শাড়ি আছে, দামী দামী গয়না আছে। সর্বোপরি সোমনাথের মতো লোকোত্তর স্বামী আছে। অতএব আর কী চাই?

অনুপমার ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি দেখা দিল।

—আদেশ পালন করব।

সোমনাথ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল। বুঝতে পেরেছে অনুপমার সংক্ষিপ্ত হাসিটুকু, বুঝতে পেরেছে এই সবিনয় আনুগত্যের অর্থ। ঠাট্টা করছে অনুপমা।

কিন্তু সোমনাথও হাসল—হঠাৎ দেখলে মনে হয় অত্যন্ত স্নিগ্ধভাবে হাসছে।

—তা বেশ, আদেশ পালন করলেই আমি খুশি হই।—সোমনাথ তেমনি হাসছে: আমার ঘোড়াটা দেখেছ অনু, বড় আরবী ঘোড়াটা?

—দেখেছি।

—প্রথম যখন কিনেছিলাম—শান্ত স্নিগ্ধ গলায় সোমনাথ বললে: ভারী বেয়াদবি করত! চলতে চাইত না, সোয়ারীকে পিঠ ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করত। তারপরে কী হল বল তো?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুপমা তাকিয়ে রইল। কী বলতে চায় সোমনাথ?

—আমার এই রাইডারটা দেখতে পাচ্ছ? এই ঘোড়ার চাবুকটা? বহুদিনের সঙ্গী আমার, এরই ঘায়ে ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করে দিয়েছি। আজ ওর চাইতে বিশ্বস্ত অনুচর আমার আর কেউ নেই—বুঝতে পেরেছ?

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল অনুপমা।

—কী বললে তুমি?

সোমনাথ তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে চেয়ারটার উপরে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে। শান্ত স্বরে জবাব দিলে, আমার বড় ঘোড়াটার গল্প বললাম।

—তুমি কি বলতে চাও যে দরকার হলে ওই ভাবে তুমি আমাকে সায়েস্তা করবে?

—কিছুই বলতে চাই না।

অনুপমার ঠোঁট দুটো অসহ্য অপমানে থর থর করে কাঁপতে লাগল: তুমি মনে করো তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারিনি?

সোমনাথ চোখ বুজেছে—যেন ঘুমোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে সে। মৃদু গলায় বললে, কবিতা লিখতে চাও, আবার মল্লিনাথও হতে চাও নাকি? সে বেশ কথা। আর চাবুকটার দরকারের কথা বলছিলে? ছ বছর পরে সত্যিই যদি তেমন দরকার দাঁড়ায় তাহলে আন্তরিক দুঃখিত হবো আমি। এতদিনে আমাকে তোমার চেনা উচিত ছিল অনু।

কিন্তু অনুপমা আর দাঁড়াল না। দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাইরে।

—শোনো শোনো, চটে যেও না। কাজ না থাকে রেডিয়োটা খুলে দাও। সময়টা কাটবে ভালো।

অনুপমার জবাব এল না। নিজের ঘরে এসে সে মুখ বুজে পড়ল বিছানায়। সোমনাথকে চেনার পথে আর এতটুকুও কুয়াশাচ্ছন্নতা নেই মনের কোনো প্রান্তে। অসাধারণ একটা শক্তি সোমনাথ, কিন্তু পশুশক্তি সে। তার কাছে হৃদয়ের দাবি তোলা আর পাথরে

মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হয়ে যাওয়া, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য যে নেই এটা সে বুঝতে পেরেছে।

একটা দিনের কথা তার মনে আছে। নতুন রাইফেলটা যেদিন কিনেছিল সোমনাথ, সেইদিন। পথের একটা নেড়ী কুকুরকে সে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে ডেকে এনেছিল, তার পর অব্যর্থ লক্ষ্যে এক গুলিতেই সেটাকে শেষ করে দিয়েছিল।

ভয়ে আর বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছিল অনুপমা, কিন্তু সোমনাথ হা হা করে হেসেছিল পরম তৃপ্তির সঙ্গে। সেই স্বামী! সেই তার পরিচয়—নিষ্ঠুর, অহঙ্কারী, অমানুষিক।

আর সোমনাথ ইজিচেয়ারে চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল খানিকক্ষণ। অনুপমা ভয়ঙ্কর চটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। চটুক, আর পারা যায় না। পুতুল খেলবার মতো অপর্যাপ্ত সময় বা অতিরিক্ত উৎসাহ এখন তার নেই। চারদিক থেকে সমস্যা মাথা তুলেছে—এমন কি নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে পর্যন্ত ঘা লেগেছে এসে। দেনা—দেনা—দেনা। বন্দুকের গুলি খেয়ে বাঘ যখন লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়েছে মাটিতে, তখন সেই সাফল্যের সঙ্গে দেনার অঙ্কে আর একটা দাগ পড়েছে নতুন করে। রেসিং-কারের স্পীডোমীটারে মাইলের পর মাইল উঠেছে—আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে ঋণের অঙ্ক। এখন কোনো-দিকে যেন আর কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছে না।

বিলের জল প্রায় শুকিয়ে এল—"জোভা" লাগতে আর দেরি নেই। সাতশো টাকার প্রলোভন নিয়ে সিপাই মহলদার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে—একটু কষাতে পারলে আরো কিছু বাড়বে সেটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেও 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু' মাত্র। তা ছাড়া তাতেও বিড়ম্বনা। ওই সাঁওতাল গুরুটা—

মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে একটু বোঝাপড়ার দরকার হবে। ব্যাপার নিতান্ত সহজ হবে না। যার স্বার্থ আছে, তার সঙ্গে রফা করা চলে। কিন্তু নিঃস্বার্থ হিতৈষণা যার উদ্দেশ্য—সে সহজে যে পথ ছেড়ে দেয় না এ সোমনাথের বাস্তব এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু এই লোকগুলো। সোমনাথ হঠাৎ ক্ষেপে উঠল : এরাই যত গণ্ডগোলের গোড়া। গ্রামে গ্রামে গিয়ে এরা শান্ত শিষ্ট নির্বোধ লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, সজাগ করে দিচ্ছে। হরেনের সেই কথাটা মনে পড়ল : যে কখনো মাটিতে পা দিল না, লাঙল ঠেলল না এক কাঠা জমিতে, সে কিসের জমির মালিক! তাকে যে খাজনা দিই সে তো দয়া করে।

দয়া করে! তাই বটে। সোমনাথের চোখ জ্বলে উঠল। দয়ার পরিমাণটা কার কত-খানি সেটা একবার পরখ করে দেখতে হবে।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল, ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। নতুন রাইফেলটা ঠিক আছে, দরকার হলে কয়েকটা গুলি বোধ হয় খরচ করতে হবে। নাঃ, পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয়

মানুষের জায়গা নেই দেখা যাচ্ছে। যদি শিকারী না হতে পারো, শিকার হতে হবে। কিল্ অর্ বী কিল্ড।

দূরে বিলের জল দিনান্তের আলোয় ঝলক দিচ্ছে। জল নয়—সোনার খনি, সাতশো, আটশো, হাজার টাকা। আর শুধু টাকাই নয়—সোমনাথের অধিকার, সোমনাথের প্রতিষ্ঠা। সেইটাই সব চাইতে বড কথা। এক কাঠা জমির জন্যে মামলা করে বিকিয়ে যায় এক লাখ টাকার জমিদারি।

অনুপমা ঘরে এল। সোমনাথ লক্ষ্য করলে দেখতে পেত তার গালের পাশে চোখের জলের দাগ শুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সোমনাথ লক্ষ্য করলে না।

—আবার কী চাই?

—আমার এখানে আর ভালো লাগছে না।

—সে তো অনেকবারই শুনেছি। নতুন কিছু বলবে?

—না। তুমি আমাকে এখান থেকে পাঠিয়ে দাও।

সোমনাথ জবাব দিল না—নীরবে পায়চারি করতে লাগল।

—আমাকে পাঠিযে দাও। আর আমি থাকতে পারছি না।

—নিরুপায়। আমার সঙ্গে যখন এসেছ আমার সঙ্গেই ফিরে যেতে হবে। পারা না পারার তো প্রশ্ন ওঠে না।

অনুপমার চোখ ভরে আবাব জল নেমে এল। কিন্তু সোমনাথের কাছে তার চোখের জল যেমন অর্থহীন, তেমনই মূল্যহান। সাধারণ মানুষের কাছে যা স্নিগ্ধ, যা সুন্দর, যা পবিত্র তাকে অপমান করে চলাই সোমনাথের কাজ। হয়তো এই হচ্ছে শক্তিমানের প্রথা—বলবানের দস্তুর।

অনুপমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমনাথ হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসেছে। অনুপমার কাঁধের ওপর সস্নেহে একখানা হাত রাখল। কিন্তু স্নেহ—না কৌতুক?

সোমনাথ বললে, রাগ করেছ? মিথ্যে সেন্টিমেণ্টাল হয়ো না অনু। পৃথিবীটা অনেক বড়—অনেক কাজ সেখানে। তোমার যদি কিছু কাজ না থাকে, তা হলে স্বচ্ছন্দে কবিতা রচনায় বসে যেতে পারো। আজ কী তিথি জানো তো?

—না।

—কবি মানুষ, জানা উচিত ছিল। আজকে পূর্ণিমা! একটু পরেই দেখবে তালের বন আলো করে দিয়ে চাঁদ উঠেছে, বিলের জলে ঝলমল করছে জ্যোৎস্না। কান পেতে থাকলে চাই কি কোকিলের—নয় তো পাপিয়ার ডাকও শুনতে পাবে দু-চারটে। আর তো ভাবনা নেই, এখন থেকেই কবিতার 'মূড' আনবার চেষ্টা করো গে।

অনুপমা ছিটকে সরে গেল।—থাক, অপমান আর নাই করলে।

—অপমান? কে বলে অপমান? তোমাকে আমি অপমান করতে পারি, এ কথা বিশ্বাস করো তুমি? শাস্ত্রমতে তুমি যে আমার অর্ধাঙ্গিনী! অতএব—অতএব রবীন্দ্রনাথ পড়োনি?—

তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজ অপমান মানে!

এ বর্বরতার উত্তর দেওয়া অর্থহীন। অপরিসীম গ্লানিতে চুপ করেই রইল অনুপমা।

ঠিক এই মুহূর্তেই যেন মেঘ কেটে গেল ঘরের মধ্যে থেকে। চাকর এসে খবর দিলে, নিচে হরেন এসেছে সাঁওতালপাড়ার বাবুটিকে সঙ্গে করে—সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সোমনাথ চাবুকটা হাতে তুলে নিলে। বললে, চলো।

পেছনে অনুপমা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েই রইল।

নিচের ঘরে বসে ছিল অরুণ আর হরেন। হরেনের উদ্দেশ্য ভালো, কোনো একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে তা চায় না। অত্যন্ত শুভার্থীর মতো অরুণের পাশ ঘেঁষে বসলে সে। বললে, বাবু কিন্তু বদমেজাজী লোক।

অরুণ মৃদু হেসে বললে, শুনে রাখলাম।

—তা ছাড়া তাঁর বন্দুক পিস্তল রাইফেল—সব কটারই লাইসেন্স আছে।

—বেশ ভালো কথা। কিন্তু আমি অত্যন্ত নিরীহ জীব—কাজেই ওসবে আমার ভয় পাবার কিছু নেই তো।

—তা বটে, তা বটে।—সম্পূর্ণ সমর্থন করে হরেন মাথা নাড়ল। ছোট ছোট চোখ দুটো কোটরের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে গেল: আপনি অতি সাদাসিদে ভালো লোক, সে কি আমি জানি না? কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন? আপনি নিরীহ কি না সেটা বিচার হয় অন্যের স্বার্থের ওপর দিয়ে। বোধ হয় বুঝেছেন কথাটা।

অরুণ হাসল: না, বুঝিনি।

বাইরে জুতোর শব্দ। মুহূর্তে হরেন সরে বসল।

ব্রীচেস-আঁটা সোমনাথ ঘরে ঢুকল। মুখে ধূমায়িত চুরুট—আর এক হাতে তার রাইডারটা। প্রথম দৃষ্টিতেই তার মনে হল যেন একটা সংঘর্ষের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে সোমনাথ। তার লাল চুলে, লাল মুখে, প্রসারিত কঠিন বুকে আর হাতের চওড়া কব্জিতে একটা সুস্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যঞ্জনা।

সোমনাথও মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিলে তার শত্রুকে। বয়সে তার চাইতে চার-পাঁচ বছরের ছোটই হবে। কোথাও এতটুকু অসাধারণত্ব নেই। শান্ত চোখমুখ— একটা নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে কঠিন। ইচ্ছে করলে একটা চাপ দিয়েই সোমনাথ লোকটাকে গুঁড়ো করে দিতে পারে। কিন্তু মন? সোমনাথের সন্দেহ হল।

অভিজাতসুলভ ভঙ্গিতে দু হাত জড়ো করে সোমনাথ কপালে তুলল: নমস্কার।

অরুণ উঠে দাঁড়াল: নমস্কার।

—বসুন, বসুন।—সোমনাথ সৌজন্যে অভিভূত হয়ে গেল: আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তা আপনি যে দয়া করে আসবেন—

—দয়া? দয়া করবার কী আছে। আপনার জমিদারিতে থাকি, আপনারই প্রজা তো আমি।

—যাক, যাক, সে সব যাক। কিন্তু হরেন, তুমি এখন যেতে পারো। অরুণবাবুর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা আছে।

—আজ্ঞে আসি—প্রাতঃপেন্নাম—হরেন বেরিয়ে গেল।

ঘরে রইল দুজন। সোমনাথের ভারী শরীরের চাপে আর্তনাদ করে উঠল রিভলভিং চেয়ারটা। সোমনাথ আস্তে আস্তে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

—যে জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম। আপনি কত দিন আছেন এখানে?

—প্রায় দু বছর।

—আই সী। সাঁওতালদের সঙ্গেই আছেন?

—কী করা যায় বলুন? ওদের কাছেই আশ্রয় পেলাম।

—যাক, ভালোই মিশন আপনার। ওদের উন্নতি হওয়া দরকার।

—নিশ্চয়। আর সে দায়িত্ব আপনাদের—বিশেষ করে আপনাদের মতো এমন হাইলি এডুকেটেড জমিদারের। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা যে সে দায়িত্ব আপনারা নেন না।

—রিয়্যালি! টোকা দিয়ে চুরোটের ছাই ঝেড়ে সোমনাথ বাঁকা চোখে অরুণের দিকে তাকাল: আপনি বেশ আউটস্পোকেন দেখা যাচ্ছে। গুড্, আই লাইক ইট।

—ধন্যবাদ।

সোমনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করে একবার আকাশের অর্থাৎ কড়িকাঠের দিকে তাকাল: যাক, আই মাস্ট বী ব্রীফ। যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম। এবার "জোভা"র সময়—শুধু "জোভা" কেন—গোটা বছরই আমি আমার বিলগুলো ইজারা দেব। কিন্তু শুনেছি আপনি তাতে আপত্তি করছেন।

—আমি আপত্তি করবার কে? যাদের এতদিনের দাবি, তারাই আপত্তি করবে।

—ডোণ্ট বী—সোমনাথের প্রসন্ন মুখের তলা থেকে মেঘ ঘনিয়ে আসতে লাগল:

আপনিই এখন সব—ওরাই আপনাকে দেবতা বলে মনে করে। আপনি যা বলবেন তাই শুনবে। কিন্তু দাবি? হোয়াট ডু ইউ মীন বাই ইট? আমার জমি—আমার জল—

—সে তো ঠিক কথা। আইনও তাই বলবে। কিন্তু আইনের ওপরেও আর একটা জিনিস আছে—সেটা হয়তো মানবেন আপনি। আপনার তো অনেক আছে—কোনোখানে কোনো কিছুর অভাব নেই। কিন্তু দুটো দিন ওরা যদি মাছ খেয়ে বাঁচে—ওরা গরিব, কেন একটু দয়া করবেন না?

সোমনাথ শেষ কথাটার জবাব দিলে না: অভাবটা রিলেটিভ টার্ম। কেউ আধপেটা খেয়েই পেট ভরায়, কারো বা পৃথিবী গ্রাস করেও খিদে মেটে না। আমার অভাব অভিযোগ কী আছে না আছে সে বিচার আপনি নাই করলেন।

—কিন্তু সব সময়েই বিশ্বগ্রাসী খিদেটা কি ভালো? অরুণ লঘু ভাবে হাসল: বেচারা বিশ্বের তাতে সামান্য আপত্তির কারণ থাকতে পারে।

সোমনাথের চোখ জ্বলে উঠল: দেখুন, আপনার সঙ্গে ন্যায়ের তর্ক আমি করব না। আমার কথা হচ্ছে এবার ওই বিল আমি ইজারা দেবই এবং তাতে কারো আপত্তিই শুনব না।

অরুণ শান্ত গলায় বললে, তাতে হয়তো খানিক অপ্রীতিরই সঞ্চার হবে। সেটা কি ভালো?

—অপ্রীতি!—ধৈর্যচ্যুত হয়ে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল: কতগুলো সাঁওতালের অপ্রীতিকে আমি ভয় করি না—আই নো হাউ টু ডীল্ উইথ দেম।

—বাট ইট শুড বী এ স্কোয়ার ডীল্।

—স্কোয়ার ডীল্!—সোমনাথ বাঘের মতো গর্জে উঠল: ওই সাঁওতালদের সঙ্গে স্কোয়ার ডীলের কথাটাও আমাকে ভাবতে হবে নাকি? কিন্তু আমার কথাটা শুনে রাখুন। যদি বাধা দেন—হয়তো সেটা খুব সুবিধে হবে না।

—অসুবিধে! কত আর হবে! কিন্তু একটা কথা আপনারও জানা উচিত মিস্টার দত্ত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ—তাদের শক্তিও অনেক। আজকে তাদের ওপর জুপিটারের মতো বজ্রবাণ ছুঁড়তে গেলে তারা সহ্য করবে না।

—রিয়্যালি?—সোমনাথ থমকে দাঁড়াল—চোখ দিয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল আগুন। যেন এখনি সে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে অরুণের ওপর।

মুখোমুখি দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে গেল নাটকীয় ভাবে। হঠাৎ ঘরে ঢুকল অনুপমা—এ কি, মাস্টারমশাই, অরুণদা!

—সে কি, অনুপমা যে!

সোমনাথ বললে, তার মানে?

অনুপমা বললে, মানে আবার কি? ইনি আমার মাস্টারমশাই যে। ছেলেবেলায় ওঁর কাছে পড়তাম—চমৎকার লোক।

--রিয়্যালি! রিয়্যালি!—স্তম্ভিত সোমনাথ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে এক পা এগিয়ে বললে, অত্যন্ত দুঃখিত! কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারিনি তো। কিন্তু অনু, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? মাস্টারমশাইয়ের জন্যে চা করতে বলো শীগগির।

নয়

জীবন নাটক নয়—তবু নাটক।

এইভাবে সকলে এমন করে বৃত্তাকারে এসে মিলবে এমন কথা কে ভাবতে পেরেছিল! বরেন্দ্রভূমির এই গ্রামে—দিক-চিহ্নহীন আকাশ-পৃথিবীর এই দেশে আশ্চর্য ভাবে এসে জড়ো হল সোমনাথ, অরুণ, প্রমীলা আর অনুপমা। অন্ধ-বিধাতা এলোমেলো আঁচড় কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে হয়তো বা ভুল করেই গল্প রচনা করে বসেন।

সবটা শুনে সোমনাথ বললে, রিয়্যালি—রিয়্যালি! বসুন অরুণবাবু, চা খান। আপনি তা হলে তো আমাদের বন্ধু—একেবারে ঘরের লোক।

বাইরের ঘরে চায়ের আসর বসল। অরুণ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, নিশ্চয়, তাতে আর কথা কী! কিন্তু আমার আসল কথাটা ভুলিনি মিস্টার দত্ত। ওই বিল আপনি কিছুতেই মহলদারকে দিতে পারবেন না।

সোমনাথ কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলল। মানবতার দিক থেকে নয়, শুধু আভিজাত্যের প্রশ্ন থেকেও নয়। ওই বিল যে আজ সোমনাথের কতবড় জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সে-কথা সে বোঝাবে কেমন করে! আজ দেনায় দেনায় যে অবস্থা তার হয়েছে—

কিন্তু সে স্বীকারোক্তি সোমনাথ কিছুতেই করতে পারল না। বাধে মর্যাদায়, বাধে নিজের দৃঢ়-কঠিন আভিজাত্যে। নতি বা দীনতা তার চরিত্রে কখনো ঠাঁই পায়নি। সোমনাথ তাই খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসল।

—আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু প্রজাগুলো বড্ড ইম্পার্টিনেন্ট—

—কিছু না মিস্টার দত্ত, কিছু না। ওরা একেবারে শিশুর মতো। একটুতেই যেমন ক্ষেপে ওঠে, অল্পেই আবার তেমনি শান্তও হয়ে যায়। আপনি দুদিন একটু ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করুন, দেখবেন আপনার কথা ছাড়া একটি পাও নাড়বে না।

—আই সী!—সোমনাথ আবার হাসল: আপনি তা হলে অনুর সঙ্গে একটু গল্প

করুন অরুণবাবু। ও এখানে বড্ড একা একা থাকে—সঙ্গী পায় না।

—কেন—অরুণ সকৌতুকে বললে, এই নিরালা কাব্যময় অবকাশে আপনিই তো ওকে সব চাইতে বেশি সঙ্গদান করতে পারেন।

এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি অনুপমা। এইবারে হঠাৎ সে চোখ তুলে তাকাল। আর তার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে মুহূর্তে চমক লেগে গেল অরুণের। এ কি অনুপমা না জাপানী পুতুল! আয়ত কালো চোখের মধ্যে দৃষ্টি স্থির আর নিস্তরঙ্গ হয়ে আছে—যেন সমস্ত মনটা কোথায় স্তব্ধতার একটা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেছে অনুপমার।

দৃষ্টিটা কি সোমনাথ লক্ষ্য করেছিল? দু আঙুলের মধ্যে চুরুটটাকে শক্ত করে চেপে ধরলে সে। তারপর দেওয়ালে লিওনার্দ-দ্য-ভিঞ্চির নকল একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, আমি চাষাভুষো লোক—মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াই। রোমাণ্টিক অবকাশ আমার হয় না।

অরুণ বললে, অন্যায়। আর অনু কবি-মানুষ।

—কবি!—সোমনাথ হঠাৎ হেসে উঠল হো হো করে। প্রবল হাসির শব্দে দেওয়ালের গা থেকে থপাস করে মেজেতে পড়ে গেল মোটা-সোটা একটা টিকটিকি। অনুপমার শরীর শিউরে উঠল, মনে পড়ল, কুকুরটাকে গুলি করে মেরেও ঠিক এমনি করে হেসেছিল সোমনাথ: সেণ্টিমেণ্ট্ ফর অ্যানিমল? ওটাও অ্যানিমলের ধর্ম, মানুষের নয়। অমন করে হাসলে কী ভয়ঙ্কর পৈশাচিক দেখায় সোমনাথকে! আর অরুণের মনে হল এই হাসির ভেতর দিয়েই সোমনাথের মনটা তার কাছে যেমন স্পষ্ট, তেমনি প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। সোমনাথের দাঁতগুলি অত্যন্ত বেশি শাদা, অত্যন্ত বেশি নির্মমতার দ্যোতক।

সোমনাথ বললে, হ্যাঁ, কবিতা ও লেখে বটে।

এতক্ষণ পরে প্রতিবাদ করলে অনুপমা, না, আমি কবিতা লিখি না।

—লেখো না? কেন, সেই যে

চাঁদের সাগরে দুধের পঙ্খী ময়ূরের মতো লেজ?—

অনুপমা উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

অরুণ সবিস্ময়ে বললে, কী হল?

—ভগবান জানেন।—নিরুদ্বিগ্ন মুখে সোমনাথ চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল: ওকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না অরুণবাবু। কথায় বলে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—তার উপরে উনি স্ত্রীরত্নং—অর্থাৎ স্ত্রীকুলে রত্ন কিনা।

সোমনাথের কথার ভঙ্গিটা যেমন অশোভন, তেমনি বর্বরোচিত। অরুণের মনে হল যেন এতক্ষণে সে অনুপমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারছে।

—না, না, ওকে একটু খুশি রাখবার চেষ্টা করবেন।

—খুশি! সোমনাথ ভ্রুভঙ্গি করলে: তার চাইতে এভারেস্ট ডিঙোনো সহজ ব্যাপার বলতে পারেন। স্ত্রী-চরিত্র আমার বুদ্ধির অগম্য। মেয়েরা সবাই এমন কেন বলুন তো? এত sensitive—এমন unpractical—

—কারণ মেয়ে বলেই।

—নাঃ, বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে যাচ্ছি। এ ধরনের মেয়েলী মেয়ে যে-কোনো শক্তিমান পুরুষের পক্ষেই দুর্বহ। আমার ডার্লিং শেখভের প্রিয়া নয়—I dream of an Amazon!

সোমনাথের স্বগত যেমন দুঃসহ, তার সাহিত্যালোচনা আরো পীড়াদায়ক। অরুণ এবারে উঠে দাঁড়াল। তারপর সহাস্যে বললে, তা হলে চলি মিস্টার দত্ত। মাঝে মাঝে আসব।

—আচ্ছা নমস্কার।

—কিন্তু আমাব অনুরোধটা ভুলবেন না—মানে ওই বিলটা সম্বন্ধে।

সোমনাথের মনটা যতখানি রসস্থ হয়ে আসছিল, মুহূর্তে তা যেন তীব্র একটা তিক্ততায় কালো হয়ে গেল। দাঁতের গোড়ায় চুরুটটা চিবিয়ে বললে, আমি ভুলব না।

—ধন্যবাদ—অরুণ বেরিয়ে এল।

টিলার ওপরে সিঁড়ি-কাটা ধানের ক্ষেতে বিকেলের রোদ। তামাক পাতা খসখস করছে হাওয়ায়; আলের ওপর এখানে ওখানে উঠেছে বুনো-ভাঙের অযত্ন-বর্ধিত রাশি রাশি মঞ্জরী। দূরে বিলের জল ঝকঝক করছে আয়নার মতো।

অরুণ আল বেয়ে হেঁটে চলল। মাথার ওপরে একঝাঁক টিয়া উড়ছে—ধানের শত্রু ওরা। অকারণে ক্ষেতে নেমে পড়ে ধারালো ঠোঁটে ধানের শীষ কেটে নিয়ে ছত্রাখান করে দেয়। একটা কালো উলঙ্গ সাঁওতাল ছেলে গুলতি বাগিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ঝাঁকটাকে লক্ষ্য করছিল—সুবিধে পেলেই একটাকে পেড়ে ফেলবে।

অরুণ ভাবছিল অনুপমার কথা। কী আশ্চর্য একটি মেয়েকে দেখেছিল কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে—দেখেছিল তার মধ্যে তার চাইতে আশ্চর্য সম্ভাবনা। কী স্বপ্ন দেখেছিল সে অনুপমার সম্বন্ধে, কী মোহ তাকে ক্ষণিকের জন্যে আচ্ছন্ন করেছিল! সব ভালো মনে নেই। দীর্ঘদিন কারাপ্রাচীরের অন্তরাল—জীবনে নানা বিচিত্র বিপর্যয় ঘটনা। প্রমীলা অন্ধ হয়ে গেল—তার সঙ্গে বাঁধা পড়ল অচ্ছেদ্য বন্ধনে। আর মফস্বল শহরের সেই পরিবেশ। ঝাউবন-মর্মরিত বীথিপথ—রাঙা সুরকির রাস্তা। পাশে নদী, জোয়ারের স্ফীত আনন্দে একেবারে রাস্তাটার নিচে চলে এসেছে, খেলা করছে ঘন-শ্যামল ঘাসগুলোর সঙ্গে। স্টীমারের আকাশ-কাঁপানো গম্ভীর বাঁশি। প্রসন্ন সরকার, শিবানী সরকার, কুকুর, আয়া,

সোফার, মোটরগাড়ি। লন—সীজন ফ্লাওয়ার। সেদিনের সেই পটভূমিতে সেই তরুণী স্কুলের ছাত্রীটি অরুণের নতুন রিক্রুট। সে কি এই—জমিদার সোমনাথ দত্তের গৃহিণী?

কিন্তু অনুপমা সুখী যে হয়নি এর মধ্যে এতটুকু সংশয় নেই কোনোখানে। বড় বেশি আত্মপ্রত্যয়শীল সোমনাথ—বড় বেশি দাম্ভিক ; সে কাউকে ভালবাসতে পারে না, কাউকে মর্যাদা দিতে পারে না একমাত্র নিজেকে ছাড়া। অনুপমা আজ বড়লোকের বউ হয়েছে বটে, কিন্তু সে আজ আর বেঁচে নেই। সোমনাথের হাতে পড়লে কেউ বাঁচতে পারে না।

ক্যাঁচ—চ—চ—

একটা আর্তনাদ। কালো সাঁওতাল ছেলেটা গুলতি ছুঁড়েছে। একটা টিয়াপাখি ঝট-পট করতে করতে ঠিকরে গিয়ে ধান-ক্ষেতের মধ্যে পড়ল। বাকিগুলো প্রচণ্ড চিৎকারে উড়ে পালাচ্ছে। ছেলেটা শিকারের সন্ধানে ক্ষেতের মধ্যে ছুটল।

অনুপমার জন্যে একটা অসীম সহানুভূতিতে অরুণের মনটা কোমল হয়ে গেল। যেন ওই টিয়াপাখিটার মতোই মুক্ত আকাশ থেকে একটা নিষ্ঠুর আঘাত খেয়ে সে আছড়ে পড়েছে মাটিতে। তার দৃষ্টির ভেতর দিয়ে কি সেই মৃত্যু-যন্ত্রণার আভাস দেখতে পেয়েছে অরুণ? কিন্তু কী করা উচিত তার, কীই বা করতে পারে সে?

আশ্রমের বারান্দায় ছোট মাদুর পাতা। একদল সাঁওতাল ছেলেমেয়ে যোগাড় করে নিয়ে তাদের গল্প শোনাচ্ছে প্রমীলা। দেশের গল্প, স্বাধীনতার গল্প। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল। ভারতের মুক্তিকামী সৈনিকের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে প্রাণ দিয়ে তিল তিল তপস্যা। অরুণ একটু হাসল, চলে গেল ঘরের মধ্যে।

প্রমীলা বলে চলেছে: এঁরা কাউকে ভয় করলেন না। যা সত্যি বুঝলেন তার জন্যে লড়াই করলেন। সরকার এঁদের ধরে ধরে হাজতে পাঠাল, একজন নয় দুজন নয়—হাজার হাজার মানুষকে। তাদের মধ্যে কে নেই? পুরুষ আছে, মেয়ে আছে, তোমাদের মতো—এমন কি তোমাদের চাইতেও ছোট ছোট ছেলেপুলে আছে। কত দুঃখের ভেতর দিয়ে যে তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার—

প্রমীলা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাদান করছে। লম্বা বারান্দার একপাশে লেখার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে বসল অরুণ। তারপর সবে লেখায় মন দেবার উপক্রম করছে এমন সময় পাশে এসে দাঁড়াল প্রমীলা। ছাত্রদের বিদায় করে এসেছে।

অরুণ হেসে কলম বন্ধ করলে।

—কি খবর?

—'নিবেদন আছে শ্রীচরণে।'

—'কভু কি অপূর্ণ রয় প্রিয়ার প্রার্থনা ?'

কোমল উচ্ছল গলায় প্রমীলা হেসে উঠল, কাব্যচর্চা থাক। রাজবাড়ির খবর বল।

—রাজবাড়ির খবর ? আমি তো রাজা নই।

—তুমি রাজা নও, রাজবন্দী—সে আমি জানি। তোমার অনুপমার খবর বল।

—আমার অনুপমা ?—একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও সপ্রতিভ গলায় অরুণ জবাব দিলে, পুরনো কথাটা এতদিনেও ভোলনি দেখছি। তোমার ভেতরেও জেলাসি আছে নাকি মিলা ?

—আছেই তো—দু হাতে প্রমীলা অরুণের গলা জড়িয়ে ধরল : তুমি যে এককালে ওকে ভালবাসতে সে খবর বুঝি আমি জানি না ?

আর একটা দীর্ঘশ্বাসকে অরুণ সংযত করে নিলে।

—কিন্তু সে এককাল তো আর নেই মিলা। পরস্ত্রী সম্বন্ধে এ ধরনের পরিহাসেও অপরাধ আছে।

প্রমীলা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। যে লঘু পরিহাসে কথাটাকে সে তুলতে চেয়েছিল, অরুণ সে-ভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। কোথায় ওর নিজের মধ্যে একটা অলক্ষ্য কাঁটা রয়ে গেছে সামান্য আঘাতেই সেটা খচখচ করে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা সরে বসল।

অরুণের খেয়াল হল কথাটা যেন একটু রূঢ় হয়ে গেছে। শেষ কথাটা না বললেও চলত, সহজ পরিহাসের মধ্যেই জিনিসটাকে অনায়াসে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আজ সমস্ত মন ওই সহজ হওয়ার ক্ষমতাকেই হারিয়ে ফেলেছে। অনুপমা দোলা দিয়েছে মনে—স্মৃতির সামনে স্বপ্নের আলোয় প্রতিফলিত করে তুলেছে সেই ঝাউবন—সেই কল্লোলিত নদী। কী হতে পারত—কী হয়ে গেল। রোজা লুক্সেমবার্গ আর ক্রুপসকায়াকে যার মধ্যে একদিন রূপায়িত করে তোলবার কামনা করেছিল সে—আজ সে সোমনাথের—এবং ব্যক্তিসচেতন অতি দাম্ভিক সোমনাথের স্ত্রী !

প্রমীলা বললে, চা খাবে তুমি ?

—নাঃ, ও বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

—ওঃ।—প্রমীলার গলায় অনাসক্তি। মনের মধ্যে আর-একটা খোঁচা লেগেছে। এ স্বাভাবিক—সহজ ভদ্রতার কথা। তবু আজ প্রমীলার ভালো লাগল না। মনের দিক থেকে সে কি বড় বেশি ছোট হয়ে গেছে—বড় বেশি সংকীর্ণ ? কিন্তু সেটা কি একান্তই সজ্ঞান ও সচেতন অপরাধ ? বাইরের আলো নিবে গিয়েছে তার—বাইরের দৃষ্টি অবরুদ্ধ। এত বড় পৃথিবী—এত বহুধা বিচিত্র এবং বিস্ময়বিপুল, তার কাছে তা তলিয়ে গিয়েছে সীমাহীন কৃষ্ণতার অন্ধকারে। আর সব কিছু ছোট, একান্ত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে একটিমাত্র

ব্যক্তি-মানবের মধ্যে—সে অরুণ। তাকে হারানো, তার কাছ থেকে অণুমাত্র সরে যাওয়ার সম্ভাবনাও আজ প্রমীলার জীবনে কঠিনতম দুর্যোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই জন্যেই কি এত ভয়, নিজের মধ্যে এই জেলাসির আক্ষেপ?

দুজনেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

অরুণ বললে, তুমি যদি একটু চায়ের ব্যবস্থা করে দাও তা হলে খেতে পারি।

—থাক, বারে বারে চা খেয়ে লিভার নষ্ট করতে হবে না তোমাকে। তা ছাড়া গুড়ের চা, সে তো তোমার ভালো লাগবে না।

—গুড়ের চা!—অরুণ যেন হঠাৎ অত্যন্ত বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। চিনির চা রোজ আমার কোথায় জোটে বলতে পার? মিলা, এভাবে আক্রমণ করে তোমার কি কোনো লাভ আছে? নিজেকে এমনভাবে ছোট করে ফেলো না।

প্রমীলার অন্ধ চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। অরুণকে আঘাত দেবার উদ্দেশ্য তার ছিল না—তবু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। তা ছাড়া যে অরুণ অত্যন্ত কঠিন দুঃখ-সংকটের মধ্য দিয়েও নিজেকে হারায়নি কোনদিন, আজ এত সামান্য ব্যাপারে এই জাতীয় বিকলতা কেন তার!

—ক্ষমা কোরো—

প্রমীলা হঠাৎ উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

—মিলা, শোনো শোনো!

জবাব পাওয়া গেল না।

অরুণ একা বসে রইল। আজ বিকেলের এই আলোয়, দিনান্তের সোনা-ঝরানো বিলের ওই আয়নার মতো প্রসারিত বিশালতায়—সিঁড়িকাটা টিলা জমির ধান-ক্ষেতের অনাবরণ মুক্তিতে, তারও চেতনার সত্য স্বরূপ কি অকৃত্রিম উদারতায় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে? প্রমীলাকে কেন সে গ্রহণ করেছিল? ভালবেসেছিল কি? জেলখানার অবরোধের ভেতরে যেখানে দেখা যেত একফালি আকাশ—দুধের ফেনার মতো হালকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়া নিশ্চিন্ত মেঘ, হংসবলাকা, চিল, হলদে পাখি, বন্দীশালার কার্নিশে বন্ধনহীন চড়ুই পাখি আর দূরে আলোড়িত তাল-নারিকেলের বীথি—সেখানে নিভৃত অবকাশে কাকে মনে পড়ত—মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিত কে? সে প্রমীলা নয়। তবু প্রমীলাকে গ্রহণ করলে সে। দয়া—অনুকম্পা। অন্ধ অসহায়। গ্রহণ নয়, আশ্রয় দেওয়া। আজ অরুণের হঠাৎ মনে হল দয়া অনুকম্পাই শেষ কথা নয়, তার একটা ভার আছে, এমন একটা অলক্ষ্য শৃঙ্খল আছে যা মাঝে মাঝে বেদনার মতো বেজে ওঠে।

—অরুণদা!

অরুণ চমকে দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের দৃষ্টিকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সামনে

দাঁড়িয়ে রয়েছে অনুপমা—অনুপমাই তো। রানীর মতো তার দেহবল্লরী। যেন আকাশ থেকে নেমে এল হঠাৎ। সবুজ শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। মরাল-গ্রীবার নিচে সোনার হারের সঙ্গে মিনে-করা লকেট বুকের ওপর একখানা মণির মতো জ্বলছে। আর চারদিকে সোনা-জড়ানো রোদ যেন উদ্ভাসিত—জ্যোতিঃসিক্ত।

—আরে অনু যে! তুমি এখানে কোত্থেকে?

অনুপমা ধুলোভরা মাদুরটার ওপরে বসে পড়ল: কেন, আসতে নেই নাকি?

—বাঃ, তুমি জমিদারের বউ। এই গরিব মাস্টারের আশ্রমে! তা ছাড়া কার সঙ্গে এলে? সঙ্গে তো লোক-লস্কর দোলা-চৌদোলা কিছুই দেখছি না।

—ঠাট্টা কোরো না। মাঝে মাঝে ওসব বড় মর্মান্তিক লাগে।

—আচ্ছা, আচ্ছা—তা যেন হল। কিন্তু সত্যি বল তো ব্যাপার কি? এইভাবে একা একা তুমি এখানে চলে এলে? সোমনাথবাবু কি বলবেন?

অনুপমার স্বর হঠাৎ চোখা হয়ে উঠল: একা হাঁটবার শিক্ষা বা অভ্যেস আমার আছে। তা ছাড়া সোমনাথবাবু কি বলবেন না বলবেন তা নিয়ে সব সময়ে ভাবতে গেলে আমার চলে না। আমারও একটা স্বাধীন মন—স্বাধীন সত্তা থাকতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অরুণ। কিন্তু এই সময়ে কোথা থেকে এল প্রমীলা! ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল তা নয়—দরজার কাছে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। তার অন্ধ চোখে তীব্র আকাঙ্ক্ষার একটা জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করে অনুপমাকে দেখবার চেষ্টা করছে।

প্রমীলার মুখের দিকে অরুণ একবার সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাল। অবচেতনা থেকে ক্রমাগত মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখা দিয়েছে বিস্ফোরণের একটা সম্ভাবনা।

—আমার স্ত্রী প্রমীলা—অবশ্য অন্ধ। প্রমীলা, অনুপমা এসেছে।

প্রমীলা মৃদু কণ্ঠে বললে, বেশ। বসুন।

—আপনি বসবেন না? দাঁড়িয়ে রইলেন?

—আমি তো দিনরাত বসেই আছি। দাঁড়াবার শক্তি আর আছে কোথায় বলুন।

গভীর সহানুভূতি ভরে অনুপমা বললে, সত্যি, ভারি দুঃখের কথা।

সত্যিই দুঃখের কথা এবং অনুপমার পক্ষে সহানুভূতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—তবু যতটা হওয়া উচিত, সেই পরিমাণ সহানুভূতি সত্যিই কি বোধ করল অনুপমা? বরং কেমন একটা সূক্ষ্ম এবং অলক্ষ্য ঈর্ষা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে সে আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে প্রমীলার। এই কি অরুণের সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী হওয়ার যোগ্য মেয়ে? এমন বিরাট শক্তি—এতবড় বিরাট প্রাণ—তার পাশে রূপহীন এই অন্ধ মেয়েটা! এ কি চলবার সহায় না পায়ের শিকল?

অনুপমা আবার বললে, আপনাকে বোধ হয় চিনতাম আমি।

প্রমীলা হাসল : বোধ হয়।—কিন্তু তার সমস্ত সত্তা যেন অনুভব করছে সব, অনুপমার অবজ্ঞা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে বুঝতে পারছে সে। চোখ নেই বলেই অন্যান্য যা কিছু অনুভূতি অত্যন্ত স্পর্শাতুর হয়ে উঠেছে। মুহূর্তে একটা অসহ্য ক্রোধে আর অন্ধ-হিংসায় প্রমীলার সারা গায়ে যেন আগুন জ্বলে গেল।

অরুণ বললে, কিন্তু অনু, তুমি এই ময়লা মাদুরটার ওপরেই বসলে?

—তাতে ক্ষতি কি?

প্রমীলা হঠাৎ ব্যঙ্গ করে বলে ফেলল, গরিবের মাদুর থেকে ময়লা লেগে আপনার অমন দামী শাড়িটা যে নষ্ট হয়ে যাবে।

অনুপমার চোখ হঠাৎ দপদপ করে উঠল : আমার আরো শাড়ি আছে।

প্রমীলা নিষ্ঠুর, বিষের মতো তেতো গলায় বললে, তা ঠিক। যখন বাংলা দেশের শতকরা নব্বইটি মেয়ের ইজ্জত রাখবার মতো একটি কাপড়ের ফালি অবধি জোটে না, তখন একখানার জায়গায় দশখানা কাপড় নষ্ট করবার অধিকার আপনাদেরই আছে বটে!

কথাটা পড়ল বজ্রাঘাতের মতো। অরুণ অস্ফুট শব্দ করলে একটা—কিন্তু ততক্ষণে দরজার গোড়া থেকে প্রমীলা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

—এর মানে কি, অরুণদা?

লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে অরুণ বললে, কিছু মনে কোরো না অনু। প্রমীলার শরীর আজ বড় খারাপ—কী বলতে কী বলে ফেলেছে। ওর কথা গায়ে পেতে নিয়ো না তুমি।

—তাই বোধ হয়।

দুজনেই চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। বিকেলের রঙ ঘন হয়ে আসছে—আয়নার মতো স্বচ্ছ বিসারিত বিলের জলে নামছে দিনাবসানের ম্লানিমা। ধানের ক্ষেত থেকে কেমন একটা গন্ধ উঠে আসছে—শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর প্রাণ-সুরভি।

অনুপমার দৃষ্টি পড়ল অরুণের তাঁতের ওপর। একখানা চাঁপা রঙের সুন্দর শাড়ির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। অনুপমা খুশি হয়ে উঠল : বাঃ, চমৎকার কাপড়খানা হচ্ছে তো!

—হ্যাঁ, আমি তৈরি করছি।

—বাঃ! তুমি!—সপ্রশংস বিস্মিত চোখে অনুপমা বললে : ভাবতেও কী চমৎকার লাগছে। আচ্ছা অরুণদা, তোমার এই কাপড়খানা দেবে আমাকে?

—তুমি জমিদারগিন্নী—তাঁতের কাপড় দিয়ে কী করবে?

—ঠাট্টা নয়। আমি কিনব। কত দাম?

—দাম?—অরুণ হাসল : দামের জন্য নয়। ও কাপড়টা মিলার জন্যেই তৈরি হচ্ছে কিনা।

—ওঃ। অনুপমা যেন নিবে গেল।—বৌদির ভাগ্য ভালো।

কিন্তু ক্রমাগতই মনে হচ্ছে অরুণের এই প্রেম—এর যোগ্য কি প্রমীলা? কোনো দিক থেকেই কি সে এই বিশাল শক্তি—বিরাট ব্যাপ্তির পাশে এসে দাঁড়াতে পারে? তার চলার পথে দিতে পারে কতটুকু পাথেয়? ভীরু, দুর্বল, কুরূপ, অসহায়। আর আগুনের মতো অরুণের মন—প্রখর, প্রচণ্ড। তার জীবনে কি প্রমীলা একটা দুঃসহ বন্ধন মাত্রই নয়?

অরুণ বললে, সব হোম ইণ্ডাস্ট্রি। নিজের হাতে কেমন তরকারির ক্ষেত করেছি দেখবে অনু? একটা কুমড়ো হয় প্রায় দশ সের।

অনুপমা কী বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি চলে গেল দিগন্তে। সোমনাথের শুভ্র-প্রাসাদ উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাসাদ নয়—কারাগার। সোমনাথের ঐশ্বর্য আছে, প্রতিপত্তি আছে, দম্ভ আছে। সুতরাং শিক্ষিতা স্ত্রী তার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ ঐকতান মাত্র। প্রয়োজন নয়—স্বতঃসিদ্ধ। আত্মম্ভরিতার যজ্ঞে স্বর্ণসীতা। যত নিষ্প্রাণ হয় ততই ভালো—প্রতিবাদ করতে পারবে না, বাধা দিতেও পারবে না।

আর অরুণ? কী মন্ত্র নিয়ে এসেছিল—নিয়ে এসেছিল কী বিরাট আদর্শ মুক্তি! সর্বাঙ্গীণ শৃঙ্খল থেকে—সর্ববিধ দাসত্ব থেকে। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মানুষ।

অনুপমা হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সে বলে বসল, আচ্ছা, আজ চলি অরুণদা।

—এখনি? অরুণ ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, চল, এগিয়ে দিয়ে আসি তবে।

—দরকার হবে না।—অদ্ভুত করুণ আর বিষণ্ণ ভাবে হাসল অনুপমা, একটা পলাতক, ভীত প্রাণীর মতো সে দ্রুত ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল, এগিয়ে চলল তার পরিচিত আর অভ্যস্ত পিঞ্জরে।

দশ

অনুপমা চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল অরুণ। অস্বীকার করে লাভ নেই, আজ অনুপমার জন্যে তার কষ্ট হচ্ছে, একটা তীক্ষ্ণ আর নিবিড় যন্ত্রণা যেন কোথায় বুকের মধ্যে উঠেছে পাক খেয়ে খেয়ে। এ কী হল—এই কি হওয়া প্রয়োজন ছিল অনুপমার জীবনে ?

সোমনাথকে চিনেছে। সে সেই জাতের মানুষ যারা নিজের চারদিকে সাধুতার কুজ্ঝটিকা তৈরি করে নিজেকে আড়াল করে রাখে না। তার বক্তব্য সরল, তার আত্মপ্রকাশ

দ্বিধাহীন। নিজের ইচ্ছার আলোতে শুধু যে জগৎকে দেখে তাই নয়, চালাতেও চেষ্টা করে তাকে। স্ত্রী তার জীবন-যাত্রার সহচরী নয়, একচ্ছত্রতার পূজারী সোমনাথ একাই পথ চলতে চায়। অনুপমা তার গৃহিণী মাত্র, কিন্তু গৃহের অধিস্বামীও যে সোমনাথ নিজেই, একথা ভোলবার কোনো উপায় নেই তার।

অথচ!

সেই শহর, সেই নদী আর ঝাউবন। স্বপ্নভরা চোখ অনুপমার। সে চোখে মায়া-লোকের ছায়া থাকতো প্রথম বর্ষার নীল মেঘের মতো ঘনিয়ে, তার পর সেই মেঘে উঁকি দিয়েছিল বিদ্যুৎ, স্বপ্নের খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল বিপ্লবিনীর তরবারি। কিন্তু তার পরিণতি! এই অবস্থায় আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই তার ওপর যবনিকা নেমে এল!

আচ্ছা কী করতে পারে অনুপমা? কোন্ উপায়ে আজ সে আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার হারানো মর্যাদায়? বন্দিনী বিদ্যুৎশিখা কোন্ রন্ধ্রকে অবলম্বন করে দিকে দিকে বইয়ে দিতে পারে তার দীপ্তির প্লাবন?

অথবা নিবে যাবে সে? নিবে যাবে সে চিরদিনের জন্য? শুধু প্রাণহীন একটা রূপের পিণ্ড পড়ে থাকবে বজ্রদগ্ধ খানিক ভস্মস্তূপের মতো?

মনের কাছে উত্তর মেলে না। শুধু বেদনা বোধ হচ্ছে—বোধ হচ্ছে মর্মান্তিক যন্ত্রণা। আচমকা একটা খেয়ালের মতো বোধ হয়, কেমন হত যদি মিনার বদলে তার পাশে এসে দাঁড়াত অনুপমা? শুধু চোখের জল ফেলত না, শুধু পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরত না লতার মতো। হয়তো গ্রামের ভেতর আজ তার এই নির্বাসন—

না, কোনো মানেই হয় না এসব যা-তা ভাববার, এই সমস্ত এলোমেলো অবাস্তব কল্পনা দিয়ে নিজের মস্তিষ্ককে পীড়ন করবার। অরুণ উঠে নিজের তাঁতে গিয়ে বসল।

খট্-খট্-খট্—

মাকু চলতে লাগল। হাত-পা কাজ শুরু করলে বটে, কিন্তু চিন্তাটা থেমে রইল না কোনোখানে। সেদিন জেদের মাথায় বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু আজ তো সংশয় জেগে উঠেছে। আজ তো মনে হচ্ছে—বারে বারেই মনে হচ্ছে, বন্ধুরাই বোধ হয় ঠিক কথা বলেছিল সেদিন।

—ও একটা মস্ত বড় মোহ। কিন্তু ব্যক্তিগত মহত্ত্বই বড় জিনিস নয়।

—গ্রামে একটা আশ্রম গড়ে তুমি সংস্কার করতে পার, কিন্তু বদলাতে পার কি?

—আর সে সংস্কারের পথেও যে পদে পদে বাধা। যতটুকু এগোবে, পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে হবে তার দশগুণ। শেষে একদিন মনে হবে বন্ধু, যে দেশসেবার নাম করে শুধু

শূন্যতার সাধনাই করেছ তুমি।

—এবং সেদিন একটা স্বর্গীয় আত্মিক তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই সঞ্চয় থাকবে না তোমার।

কথাগুলোকে এখন আর উড়িয়ে দিতে পারা যায় না, ভাবতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে আর একবার বিচার করে দেখতে।

সত্যিই তো। নতুন চিন্তা এসেছে, এসেছে নতুন কাজের জোয়ার; খবরের কাগজে প্রবাহিত হয়ে আসে নতুন সত্যের ইঙ্গিত—আসে নতুন চিন্তার বৈপ্লবিক বিবর্তনের সংকেতবাণী। সংস্কার নয়, পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের মূলসূত্রটি ধরতে পেরেছে ওরা, এগিয়ে চলেছে তারই দিকে নিশ্চিত নির্ভুল পা ফেলে। কিন্তু সে—

এ কি সত্যি নির্বাসন? সত্যিই কি একটা স্বর্গীয় আত্মতৃপ্তির চেয়ে কিছু বেশি দেবে না তাকে? দেশের যা কিছু সমস্যা, তার কিছুমাত্রও সমাধান নিহিত নেই এর ভেতরে? এ কি বাস্তবিকই একটা পলায়নী চিন্তার বিলাস, ব্যর্থ রাজনৈতিক কর্মীর অহমিকাকে চরিতার্থ করা মাত্র?

দোষ তার আছে, বোঝবার ভুল তার হয়েছে। কিন্তু আজ তিন বৎসর ধরে এই অজ্ঞাতবাস কেমন করে সহ্য করে যাচ্ছে সে, কেন বেরিয়ে পড়তে পারছে না একটা বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত উল্কার মতো? যদি মনে হয় যে এখানে তার কর্মশক্তির খানিকটা অর্থহীন অপচয় ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না, তাহলে কেন সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না নতুন কর্মীদের পুরোভাগে?

কারণ—

প্রমীলা। এই অন্ধ মেয়েটার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছে বলেই কি এই শিথিলতা এসেছে তার মধ্যে, দেখা দিয়েছে এই আড়ষ্ট আত্মতৃপ্তির প্রলোভন? সোমনাথ শক্তি দিয়ে যে আগুনকে নিবোতে চায় অনুপমার ভেতরে, সে আগুন কি প্রমীলা তার ভেতরেও নিবিয়ে দিয়েছে চোখের জল দিয়ে? বাস্তবিকই কি সোমনাথ আর প্রমীলার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই—দুজনের পদ্ধতি আলাদা হলেও লক্ষ্য এক?

অরুণ আর অনুপমা। বারুদ আর আগুন। কিন্তু—

নিজের চিন্তার গতিটা লক্ষ্য করে অরুণ শিউরে উঠল। আর তাঁতে মাকু চলতে লাগল তার: খট্-খট্-খটাখট্—

কিন্তু প্রমীলা। করুণা অনুকম্পারও একটা সীমা আছে—সে সীমাকে ডিঙিয়ে গেলে নিজেকেই দাঁড়াতে হয় অনুকম্পার পাত্র হয়ে। সহানুভূতির পায়ে নিজেকে বলি দেওয়া কি সত্যিই মহৎ কাজ, না তার পরিণতি এই সাঁওতালদের উদ্ধার করবার ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুতেই পর্যবসিত?

—শুনছ ?

অরুণ দৃষ্টি ফেরাল। দরজার চৌকাঠে ভর দিয়ে প্রমীলা দাঁড়িয়ে আছে।

—আজ সারাদিনই কি কাজ করবে? সন্ধ্যে হয়ে এল যে!

—হোক।

—না, উঠে এস এখন।

একটা তীব্র বিরক্তিতে যেন গা জ্বলে গেল অরুণের। তিক্তকণ্ঠে বলে বসল, আমাকেও একটু নিজের মধ্যে থাকতে দাও প্রমীলা, সব সময়ে অতটা জোর খাটাতে চেয়ো না।

—কী বললে ?—প্রমীলা যেন অস্ফুট ভাবে আর্তনাদ করে উঠল একটা।

—যা বললাম সে তো শুনতেই পেয়েছ তুমি।—কথা আরম্ভ করে অরুণের তিক্ত অনুভূতিটা অবলীলাক্রমে মাত্রা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল: তুমি সব সময় নিজেকে বুঝতে পারো না মিলা। মাঝে মাঝে এতটা বাড়াবাড়ি করে ফেল যেটাকে স্বীকার করা শক্ত।

অসহায় আহত স্বরে প্রমীলা বললে, কী করেছি আমি?

—অকারণে অনুপমাকে অপমান করবার কী দরকার ছিল তোমার?

—অপমান করেছি ?

—করেছ বইকি! অর্থহীন ঈর্ষায় তুমি জ্বলে মরছ প্রমীলা, অথচ একটা সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান অবধি আজ তোমার লোপ পাচ্ছে।—তাঁত ছেড়ে অরুণ দাঁড়িয়ে পড়ল: আমি একটু ঘুরে আসতে চললাম।

বেরিয়ে গেল অরুণ, চলে গেল টিলাটা পার হয়ে সাঁওতাল-পাড়ার ওদিকে। আর প্রমীলার মনে হতে লাগল পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে তার। আজ চার বছরের মধ্যে এমন নিষ্ঠুরভাবে কখনো কথা বলেনি অরুণ, এমন করে নির্মম ক্ষমাহীন আঘাত দেয়নি তাকে। আঘাতের বেদনায় সমস্ত স্নায়ুগুলো এমনভাবে অসাড় হয়ে গেছে যে কথাগুলো সত্যি সত্যিই অরুণ বলেছে বলেও সে ভাবতে পারছে না।

যে মানুষ জলে ডুবে যাচ্ছে অনেকটা তারই মতো করে যেন একবার ওপরের আকাশটার দিকে তাকাল প্রমীলা। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে—দিনের ঘন নীলিমা কালো হয়ে যাচ্ছে একটা অলক্ষ্য বিষক্রিয়ার মতো। সে আকাশ প্রমীলা দেখতে পেল না, কিন্তু মনের কালো আকাশে অরুণের মতোই যেন একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নির্ভুল অদৃশ্য অক্ষরে।

অরুণ আর অনুপমা! এদের মাঝখানে সে যেমন বেমানান তেমনি নিরর্থক। সাত বছর আগে যা মনে হয়েছিল তাই ঠিক। আজো তো এতটুকু বদলায়নি।

প্রমীলা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই বসে পড়ল। অন্ধ চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল তার বুকে, কিন্তু আজ আর সে জল কেউ মুছিয়ে দিলে না।

* * *

একটা বিশ্রী অস্বস্তির মধ্যে দুজনেরই কয়েকটা দিন কেটে গেল।

অরুণ গম্ভীর আর নীরব হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে প্রমীলা। কিন্তু কিছুতেই অরুণের কাছে আসতে পারে না। এতদিনের স্নিগ্ধ, সহজ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কুয়াশার পর্দার মতো কী একটা যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আজকাল, কেউ কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কেউ কারো কাছে আত্মপ্রকাশ করে না স্বভাবসিদ্ধ পরিচ্ছন্ন ভাষায়।

সীমাহীন অভিমানে তলিয়ে আছে প্রমীলা। অপেক্ষা করে আছে অরুণের জন্যে। কিন্তু অরুণের চোখে পড়ে না প্রমীলার মুখের ব্যথার রেখাগুলোকে, সে দেখতে পায় না তার অন্ধ চোখে ফুটে-ওঠা কান্নার আকুল দৃষ্টিকে। তার কাছে সব জিনিসের রঙ বদলাচ্ছে আজকাল।

এবারে আর ভুল নেই যে সে নিজেকে বঞ্চনা করেছে। সংস্কারের পথে যে সত্যি সত্যিই কত বাধা তা তো প্রতিমুহূর্তেই দেখা যাচ্ছে। এ কথা ঠিক যে বিলের ব্যাপার নিয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেনি সোমনাথ। কিন্তু তাই বলে তার শক্তিকে এতটুকুও ওরা হটাতে পেরেছে তা নয়। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চেষ্টার সামনেই যেন জমিদার স্থির দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটা কঠোর দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো!

বিশেষ করে সোমনাথের নায়েব হবেন।

তার অত্যাচার আর দাপটে চারদিক কম্পমান। জমিদারের ভোগে লাগবার জন্যে ইচ্ছেমতো নিয়ে যাচ্ছে পাঠা-মুরগী, তরি-তরকারি। দামের কথা বললে একেবারে পাগলা কুকুরের মতো তেড়ে আসে।

—বারো মাস হুজুরের খাচ্ছিস আর আজ তাঁকে দুটো ভালোমন্দ দিতেই আপত্তি করিস? ওরে ব্যাটারা, মরে তোদের নরকেও ঠাঁই হবে না রে!

নরকের ভাবনাটা পরের কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে সাঁওতালেরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ওদের যে মাথা—শশী সাঁওতাল—সে অল্প-স্বল্প লেখাপড়া-জানা লোক। সে একদিন বলেছে, মাস্টারবাবু, যদি হুকুম দেন তবে ও ব্যাটাকে মুণ্ড কেটে বিলের পাঁকের নিচে চালান করে দিই। কাকে-বকেও টের পাবে না।

অরুণ শিউরে উঠে বলেছে, না, না, শশী, ও সমস্ত যা-তা মতলব ছাড়ো।

কিন্তু কিছু যেন করা যাচ্ছে না। ছেলেরা দু পাতা লেখাপড়া শিখছে, শিখুক, তাতে আর চরকায় নিজের পরবার কাপড় তৈরী করছে, করুক; স্বাবলম্বী হচ্ছে—খুব আনন্দের কথাই সেটা। কিন্তু ওইখানেই কি শেষ? ওর পরে আর কতটুকু এগোবে ওরা? কতটুকু পরিবর্তন ঘটবে আজকের এই দারিদ্র্যের, এই সীমাহীন মূঢ়তার? পাথরের প্রাচীরের মতো পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ আর সোমনাথের শক্তি—তার ভেতর দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার এই কি উপায়?

বোঝা যায় না।

একটা বড় সংঘর্ষ চাই—চাই একটা চরম নিষ্পত্তি। শুধু "জোভা"র মাছ খেতে পারাই সব চেয়ে বড় পুরুষার্থ নয়। সব কিছুই চাই, চাই সব দিক থেকেই পূর্ণ হয়ে ওঠবার একটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ অধিকার। কিন্তু সে অধিকারকে পাওয়া যাবে কেমন করে?

উত্তর মেলে না।

শহরে ফিরে যাবে? কাজ আরম্ভ করবে নতুনভাবে? নতুন পথে পা বাড়াবে নতুন পাথেয় নিয়ে? কিন্তু বন্ধন আছে। আর সে বন্ধন প্রমীলা।

তাই স্বল্পভাষী আর নিরাসক্ত হয়ে গেছে অরুণ। তাই সে শুনতে পায় না মিলার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। বুঝতে পারে না তার দৃষ্টিহীন দৃষ্টির আকূতি।

কী করা যাবে?

কী করা যাবে? ওদিকে যেন ঠিক এই কথাটা নিয়েই মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছে সোমনাথ। ডাক এসেছে বিকেলে, এসেছে খানতিনেক খাম। প্রথমখানা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল একখানা চিঠি: "যদি আগামী দশদিনের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য টাকা আপনি পরিশোধ না করেন তবে বাধ্য হইয়া আমরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিব—"

—রাস্কেল!—সোমনাথ গর্জে উঠল অগ্নিকণ্ঠে। মাত্র সাড়ে চারশো টাকা! এর জন্য এমনভাবে তাকে শাসাবার স্পর্ধা পেয়েছে! হাতের কাছে একবার পেলে—। দাঁতের গোড়ায় সোমনাথ চুরুটের গোড়াটাকে চিবুতে লাগল। আর সেই সময় ছায়ামূর্তির মতো অনুপমা এল ঘরে।

—একটা কথা বলতে এলাম।

নীরসভাবে সোমনাথ বললে, সংক্ষেপে।

এতদিন পরে বন্দিনী বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল: হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলব। তুমি এখানে থাকতে চাও, থাকো। কিন্তু আমি আর পারছি না, কাল আমি কলকাতায় যাব।

—একাই?

—তাই ভাবছি।

—আমার রসিকতার সময় নেই অনু।

—রসিকতা করতে আমিও আসিনি—অনুপমা ঝাঁঝিয়ে উঠল: আমি যা বলছি তা—

সোমনাথ বাধা দিয়ে বললে, থামো।

—না, আমি থামব না। কাল আমি কলকাতায় যাব।

—কেন? হঠাৎ সোমনাথের মুখে ক্রোধ আর কুটিল ব্যঙ্গ একসঙ্গে পরম তিক্তভাবে আত্মপ্রকাশ করল: পুরনো প্রেমে হঠাৎ কি অরুচি ধরে গেল নাকি?

—পুরনো প্রেম? তার মানে?

পাওনাদারের চিঠি আর মহলদারের হাজার টাকার প্রলোভন এই দুটোর সংঘাতে যেন বিপর্যয় ঘটে গেল সোমনাথের চিন্তায়: ন্যাকামি কোরো না। ভালবাসার মাস্টারের খাতিরে ওই বিল ইজারা দেওয়া বন্ধ করলাম, আর তুমি এমন অকৃতজ্ঞ যে—

অনুপমা হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: চুপ করো। তুমি অত্যন্ত অভদ্র, অত্যন্ত ইতর!

—তাই নাকি?—তীরের মতো ঘুরে দাঁড়াল সোমনাথ: খুব বেশি কথা বলছ যে। আমার কুকুরমারা চাবুকটার কথা কি আবার তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

—কুকুরমারা চাবুক?

—হ্যাঁ,—বজ্রগম্ভীর স্বরে সোমনাথ বললে, অথবা ঘোড়া-দাবড়ানো রাইডারটা। You may have your option!

—যথেষ্ট হয়েছে।—অনুপমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—সেন্টিমেন্টাল ইডিয়টস।—পেছন থেকে কথাটা ছুঁড়ে দিলে সোমনাথ।

কিন্তু মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে অনুপমার। অগ্রপশ্চাৎ ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। কখন যে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পেরিয়ে এসেছে পাগলের মতো এই মস্ত ধানক্ষেত আর আলপথটা, তা সে নিজেই টের পায়নি। যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। এবার যেমন করে হোক সব ভেঙে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে, নইলে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

যখন আশ্রমের সামনে এসে সে দাঁড়াল, তখন অরুণ কাজ করছিল তার ছোট ক্ষেতে। অনুপমাকে ওভাবে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখে সে বিস্মিত বিহ্বল চোখে তাকাল।

—কী ব্যাপাব অনু?

নেশাগ্রস্তের মতো অনুপমা বললে, আমাকে মুক্তি দাও অরুণদা!

—সে কী? এর মানে?

—আমি আব পারছি না—একেবারে পারছি না—অনুপমা হাঁপাতে লাগল: এই সাত বছরের জীবন, বিষের মতো লাগছে আমার—যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

অসীম অস্বস্তিতে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠলেও সহজ হওয়ার চেষ্টা করল অরুণ। মৃদু হেসে বললে, মিস্টার দত্তের সঙ্গে ঝগড়া করে এলে বুঝি? ও কিছু না—দাম্পত্য কলহে চৈব—

অনুপমা আর্তস্বরে বললে, অরুণদা!

অরুণ সভয়ে বললে, সত্যি, কেন বিচলিত হচ্ছ? নিজেকে প্রতিষ্ঠা করো। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ, কেন নিজের ইচ্ছেকে প্রমাণ করতে পার না? কেন বরাবর স্বামীর কাছে এমন করে হার মানো বল দেখি?

বাঁধভাঙা একটা ঝড়ের ঝাপটার মতো অনুপমা উত্তাল হয়ে উঠল : না, অরুণদা, সে অসম্ভব। আমার স্বামী অসাধারণ শক্তিমান—অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব। তার ইচ্ছার ওপরে কোনো জোর আমি করতে পারি না—করবার ক্ষমতাই আমার নেই।

অরুণ চুপ করে রইল। হয়তো অনুপমার কথার মধ্যে সত্যি আছে। সোমনাথকে যতটুকু সে দেখেছে তাতে এ কথা সত্যিই মনে হতে পারে যে তার শক্তি অপরিসীম দুর্বার এবং প্রবল। তাকে রোধ করবার ক্ষমতা অনুপমার আয়ত্ত নয়।

অনুপমা পাগলের মতো বলে চলল, আমায় বাঁচাও অরুণদা। তোমার কাজের অংশী করে নাও।

—কী রকম ?

—তোমার কাছে এসে থাকব আমি। তাঁত চালাব, সাঁওতাল ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব—ক্ষেতের মাটি নিড়িয়ে দেব। আমাকে তোমার পাশে টেনে নাও।—অনুপমার হাত অরুণের পায়ের ওপর এসে পড়ল।

সাপের ছোবল লেগেছে—ঠিক এমনি করে ছিটকে তিন হাত সরে গেল অরুণ : ছিঃ ছিঃ, এ কী করছ তুমি ? পাগল হয়ে গেলে নাকি ? ঘরে ফিরে যাও অনুপমা। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, মিস্টার দত্ত কী ভাববেন বল তো। তিনি হয়তো--

—যা খুশি ভাবুক।—আবেগে অনুপমার গলা কাঁপতে লাগল : আমি চলে আসব আমার ঘর ছেড়ে। থাকব তোমার কাছে।

-কী সর্বনাশ। অরুণ এবার শঙ্কিত হয়ে উঠল : তোমার শরীর নিশ্চয় খারাপ হয়েছে অনু—চল, তোমাকে বাড়িতে রেখে আসি।

—না, আমি বাড়িতে যাব না।—অনুপমা এবার ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগল : আমি তোমার কাছে থাকব—তোমার কাছেই থাকব।

—কী মুশকিল ! কি সব যা-তা বলছ ? মিস্টার দত্ত থাকতে দেবেন কেন ?

—না দিন। আমি জোর করে থাকব।

অরুণ এবার পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল। কঠিন গলায় বললে, ছেলেমানুষি কোরো না অনু। বাড়ি ফিরে যাও।

—কেন ? প্রমীলা বৌদিকে কাছে থাকতে দিয়েছ আর আমি থাকতে পারি না ?

—না, তুমি পরস্ত্রী।

—পরস্ত্রী ! অনুপমার চোখের দৃষ্টিতে এবারেও কোনো বিকার বা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না : কিন্তু আমি যদি বলি আমার স্বাধীন সত্তা আছে ! যে স্বামী আমার মনের কেউ নয়, তাকে আমি স্বীকার করব না !

—অনু !

—না, বলতে দাও আমাকে। তা হলেও কি প্রমীলা বৌদি যে অধিকার পেয়েছে তার এতটুকু আমি দাবি করতে পারব না?

এবারে তীব্র গলায় অরুণ বললে, না, তবুও না। প্রমীলা অন্য ধাঁচের মেয়ে। কিন্তু সে সব থাক। তুমি যে কী বলছ নিজেই জান না। এবারে বাড়ি যাও অনুপমা।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এবারে অনুপমা উঠে দাঁড়াল। ঋজু—দীপ্ত—যেন বিদ্যুৎশিখা ঝলকে উঠল অরুণের দৃষ্টির সামনে। কাঠে কাঠে সংঘর্ষ জ্বলল, চকমকি পাথরে পাথরে স্ফুলিঙ্গ।

অনুপমার চোখের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে গেল অরুণ।

একটা অসহ্য উত্তেজনায় বুনো-জানোয়ারের মতো নিশ্বাস ফেলতে লাগল অনুপমা। বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়ল—সেদিকে লক্ষ্য রইল না তার। কর্ণাভরণে দুখানি পান্না বিকেলের আলোয় চকচক করতে লাগল।

—নিজেকে তুমি কী ভেবেছ অরুণদা! এত অহঙ্কার? আমি ছোট হয়ে এসেছিলাম —তাই তাই তুমি আমাকে এভাবে অপমান করবার সাহস পেলে!

- তার মানে?

-তার মানে? অনুপমার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল: তার মানে তুমি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জান। তুমি শুধু নিজে নও, আসবামাত্র তোমার স্ত্রীকে দিয়েও তুমি আমার অপমান করিয়েছ। কিন্তু আমিও জানিয়ে যাচ্ছি এ আমার স্বামীর জমিদারি—তোমার কত ক্ষমতা আমি দেখে নেব!

—অনু? —বিহ্বল অরুণ এ ছাড়া কোনো কথাই বলতে পারল না।

—না, অনু নয়—মিসেস দত্ত। আমার শক্তি তুমি টের পাবে। আমি স্বর্ণসীতা নই। নিজেই যদি বাঁচতে না পারি—তা হলে মরবার আগে উড়িয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দিয়ে যাব—হ্যাঁ —এই আমার শেষ কথা বলছি!

অনুপমার তীব্র চিৎকারে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল প্রমীলা। কিন্তু ততক্ষণে অনুপমা নেমে গেছে আশ্রমের বারান্দা থেকে। বিকেলের আলো নিবে আসছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার। আর সেই প্রায়ান্ধকারে ধানক্ষেতের আলপথ ভেঙে ঝড়ের গতিতে চলে যাচ্ছে অনুপমা।

আশ্চর্য হয়ে প্রমীলা বললে, কী, কী হয়েছে?

অপস্রিয়মাণ ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে অরুণ জবাব দিলে, ভগবান জানেন। বড়লোকের মেজাজ তো।

কিন্তু মনের মধ্যে খচ করে একটা খোঁচা বাজল। মিথ্যা বলল না তো? সত্যিই কি অনুপমাকে সে এতটুকুও বুঝতে পারেনি?

প্রমীলা বললে, একা একা এসেছিল, এই ভরসন্ধ্যেবেলায় একাই আবার ফিরে যাচ্ছে। তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে নাকি ওকে?

—থাক, দরকার নেই।

এগারো

সহিসের হাতে ঘোড়াকে জিম্মা করে দিয়ে নিচের ঘরে চলে এল সোমনাথ। ক্লান্ত—ভয়ানক ক্লান্ত। সোমনাথও আজকাল ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, অবসন্ন বোধ করছে। এটা সুলক্ষণ নয়। বাইরের দিক থেকে মরে যাচ্ছে সে কি মনের জন্যেই—না, তারই মন মরে আসছে বাইরের সংঘাতে?

ঘরের মধ্যে সোমনাথ অন্যমনস্কের মতো পায়চারি করতে লাগল। একটা অত্যন্ত প্রবল, গুরুভারের মতো অবসাদ এসে যেন দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার। ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলে কাজ হত। কিন্তু সে চিন্তাতেও মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বড় বেশি ঘ্যানঘ্যান করে অনুপমা—অত্যন্ত বেশি অভিযোগ করে। সব সময়েই যেন একান্ত করে নিজের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়—জীবন নিয়ে পুতুল খেলতে ভালবাসে। এই জিনিসটাই বরদাস্ত করতে পারে না সোমনাথ। বলিষ্ঠ হও—নিরঞ্জন, নির্ভীক হও। বীরমাতা না হলে বীর-সন্তানের জননী হবে কেমন করে?

ওপরের ঘরে রেডিয়ো বাজছে। সোমনাথ কান পেতে শুনলে কয়েক মুহূর্ত:

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়,
শ্রান্ত ভালে য়ূথীর মালে পরশে মৃদু বায়—

নাঃ—বিরক্তিকর। শুধু অর্ধেক ঘুম—অর্ধেক স্বপ্ন, চুম্বন আর যূথীর মালা। এ ছাড়া কি আর গান নেই? এই গান যারা গায় এবং এই স্বপ্নের মধ্যে যারা তলিয়ে থাকে তাদের বোধ হয় পেট, হাত, পা বলে কিছু নেই—শুধু সবুজ রঙের হৃৎপিণ্ডই তাদের সর্বস্ব আর সেই হৃৎপিণ্ড থেকে নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুধু রজনীগন্ধার গন্ধ বেরুচ্ছে!

জীবনে যখন এত অভাব—এত প্রয়োজন—এমন দুর্বিষহ সংঘাত—তখন "সব-পেয়েছির দেশে" এরা পৌঁছে গেল কী করে? সোমনাথ কেন গড়তে পারে না এমন একটা 'ফুলস প্যারাডাইজ'—একেবারে তলিয়ে যেতে পারে না আত্ম-বিস্মৃতির মোহান্ধকারে?

—হুজুর?

—কে?

—আমি হরেন। মহলদারকে নিয়ে এসেছি।

—এসো। কি খবর?

মহলদার আর হরেন ঘরে ঢুকল। দুজনে বসল একটা বেঞ্চের ওপর। মাথার হলদে পাগড়িটা খুলে গিঁট-বাঁধা টিকিটায় একবার হাত বুলিয়ে নিলে মহলদার—যেন সেখান থেকে আত্ম-বিশ্বাসের খানিকটা বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করে নিলে।

—হুজুর সেলাম।

সোমনাথ রিভলভিং চেয়ারে আসন নিয়ে একটা চুরুট ধরালে। বললে, সেলাম তো আগেই দিয়েছ—বারে বারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করলেও আমি রাগ করব না। এবারে তোমার বক্তব্য বলো।

মহলদার ঠিক সোমনাথের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারল না। হাতের ভেতর খৈনির ডিবেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে: আমার কী করলেন হুজুর?

—বিল?

—জি।

—হবে না। বিল ইজারা দেওয়া চলবে না।

—চলবে না?—হরেন আর মহলদার একসঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠল দুজনে। হরেনের ছোট চোখ দুটো সাপের মতো এমন ভাবে চিকচিক করে উঠল যেন সে সোমনাথকে একটা ছোবল মেরে বসবে। আর মহলদারের হাত থেকে ঠন করে খৈনির কৌটোটা নিচে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল।

মহলদার খানিকটা ধাতস্থ করে নিলে নিজেকে। পাগড়িটা পরলে মাথায়। বললে, কেন হুজুর? টাকা কি কম হয়েছে? যদি বলেন তো আরো বেশি টাকা দিতে রাজী আছি।

টাকা? সোমনাথের মনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল। চারিদিকে সংকটের আসন্ন প্রতিচ্ছবি। দেনা, দেনা আর দেনা; রিভলভিং শেল আর রেসিংকার যথাসর্বস্ব ডোবাতে বসেছে। কিন্তু তবু—

সোমনাথ বললে, না।

এবারে হরেনের চোখ আরো বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। আর্থিক ক্ষতি শুধু সোমনাথেরই নয়। তার দিক থেকেও যথেষ্ট আশা ভরসা ছিল। সেলামি এবং পেশকারি বাবদ কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগও ছিল। হরেন মহলদারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ পকেটস্থ করেছিল এবং ভরসা দিয়েছিল যেমন করেই হোক ওটা সে মহলদারকে পাইয়ে দেবে। সুতরাং এ পরাজয়—এ ক্ষতির অংশ তারও সমান।

হরেনের মনের মধ্যে জ্বালা করতে লাগল। জালিয়াত-মামলাবাজ লোক কখনো সহজে হার মানেনি—আইনের কূট ব্যাপারে কখনো কেউ ছুঁতে পারেনি তাকে, সহজে তার চালে ভুল হয় না। না হলে এতকাল এমন সাধু আর বিশ্বাসী সেজে থেকে সে কিছুতেই

ভেতরে ভেতরে মহলটাকে ফোঁপরা করে ফেলতে পারত না।

হরেন সাপের মতো হাসল।

—হুজুর আমার বড় দুঃখু হচ্ছে।

—হঠাৎ ?

—বুড়ো কর্তার কথা ভেবে। তিনি থাকলে আজ অন্তত কতকগুলো সাঁওতাল প্রজা আর একটা স্বদেশী বাবুর কাছে কিছুতেই হার মানতেন না।

—ক্লিচ—

একটা তীব্র শব্দ করে রিভলভিং চেয়ার ঘুরে গেল। লাল চুল আর পিঙ্গল চোখ ঝিকিয়ে উঠল কেশর-ফোলানো সিংহের মতো।

—তার মানে ?

—মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। নিজের প্রজার চোখরাঙানিকে ভয় করলে কর্তাবাবু এতবড় জমিদারি রেখে যেতে পারতেন না। ঢের আগেই তাঁকে ফকিরি নিতে হত।

আর কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই মহলদার হেসে উঠল। অত্যন্ত রূঢ়—অতিশয় কর্কশ। অন্ধকারে নলবনের ভেতরের বাঘের পেছনে পেছনে হায়না যেমন করে হাসে—তেমনি দীর্ঘ এবং নির্মম টানা টানা ভাবে সে হাসল।

—বাঙালি জমিদার এমনিই আছে। পরজার ভয়ে মাথা গুটিয়ে থাকে। হইতো আমার দেশের জমিদার তো পরজাকে কাটিয়ে গঙ্গাজীমে ডারিয়ে দিত।

কিন্তু শুধু হায়না নয়—বাঘও ছিল। বিস্ফোরকের পলিতায় লাগল আগুন। সোমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠল। একটা কাতর শব্দে কোঁ করে রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরে গেল একপাক।

—কী বললে ?

নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ মহলদার নির্ভীক হয়ে উঠল। তীব্র তিক্ত গলায় বললে, ঠিকই বলছি। বাংলা দেশের জমিদারের মধ্যে জোয়ান নেই—মানুষও নেই।

—তাই নাকি ?

দাঁতে দাঁতে চেপে এগিয়ে এল সোমনাথ। থাবার মতো প্রকাণ্ড মুঠিতে মহলদারের একটা হাত আঁকড়ে ধরলে, আঙুলগুলো একসঙ্গে মড়মড় করে উঠল।

যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে মহলদার বললে, হাঁ-হাঁ-হাঁ—

—বাঙালি জমিদারের গায়ে জোর নেই বলে মনে হচ্ছে ?

—হাঁ-হাঁ—হুজুর। কসুর মাপ কীজিয়ে হুজুর। আমার হাড্ডি চুরমার হয়ে গেলু—উঃ উঃ।

সোমনাথ মুঠি খুলে দিলে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে রাইডারটা তুলে নিয়ে

বললে, গেট-আউট। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আর কোনোদিন এখানে পা দেবে তো গুঁড়িয়ে দেব।

—হুজুর—

—গেট-আউট—সোমনাথের হাতে রাইডারটা উদ্যত। হলদে পাগড়িটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নিয়ে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো নত মস্তকে মহলদার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—রাস্কেল—ইডিয়েট!

হরেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। হাঁটুটা ঠকঠক করে কাঁপছে তার। সোমনাথের সর্বাঙ্গে প্রলয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। এবার তারই পালা পড়বে না তো?

—হরেন?

—হুজুর?

—কী করা যায়?

—আমি আর কী বলব হুজুর?

—শাট আপ! সোমনাথ যেন একটা চড়ই বসিয়ে দিলে হরেনের মুখে: ন্যাকামি কোরো না, ন্যাকামি আমি সহ্য করতে পারি না। এতক্ষণ তো দিব্যি বুলি ফুটছিল দাঁড়ের ময়নার মতো—আর এখন একেবারে ভালো মানুষ বনে গেলে?

বেঞ্চিটার সঙ্গে নিজেকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম হওয়ার চেষ্টা করলে হরেন। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে বললে, কী করতে বলেন?

—মহলদার কী ভেবেছে? আমি সত্যি ভয় পেয়েছি?

হরেন বললে, আপনি ভয় পাননি হুজুর। কিন্তু প্রজারা তাই মনে করবে।

—বটে!

হরেন আস্তে আস্তে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল: তা ছাড়া আর কী বলুন? সাঁওতাল গুরু এল—দুকথা বললে, আর আপনি সুড়সুড় করে তার কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন! যে জমিদার ভালো মানুষ, প্রজার কথা শোনে, দয়া করে, আড়ালে তাকেই ওরা ঠাট্টা করে, ভীরু বলে। জুতো মারতে না জানলে ছোটলোকের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না হুজুর।

—হুঁ।

চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে সোমনাথ ঘরময় পায়চারি করে এল—জুতোয় আর ব্রীচেসে মচমচ শব্দ বাজতে লাগল। ওই অরুণ মাস্টার। সব কিছুর গোড়াতেই ওই লোকটা, সাঁওতালদের গুরু হয়ে লোকগুলোকে সব একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে। তা ছাড়া কী ইম্পার্টিনেন্ট, কী দুঃসাহসী লোক—সোমনাথের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দাবিকে অসংকোচে প্রতিষ্ঠা করে যায়! ওই মাস্টারকে কচমচ করে চিবিয়ে খেতে পারলে যেন

সোমনাথের আক্রোশ মিটত।

—তা ছাড়া—হরেন বলে চলল : টাকার দিকটাও তো দেখতে হবে। যে অবস্থা হয়েছে, হাজারখানেক টাকা এই সময়ে পেলে তবু কিছুটা রক্ষা করা যেত।

—আচ্ছা, তুমি যাও। আজ রাত্রে দরকার হতে পারে—সোমনাথের গলার স্বরে একটা কিছুর আভাস লাগছিল : কোথাও বেরিও না, হয়তো ডেকে পাঠাতে পারি।

—যে আজ্ঞে।

—যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—আজ্ঞে তাহলে মহলদারকে—

—হেল!—সোমনাথ গর্জে উঠল : আমার সামনে এলে ওই মেড়োটার মগজ উড়িয়ে দেব। ইম্পার্টিনেন্ট—উল্লুক!

শেষ গালটা তাকে না মহলদারকে—হরেন সেটা বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা বুঝতে পারল যে এখন বুদ্ধিমানের মতো তার এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

—আজ্ঞে, প্রাতঃপেন্নাম।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দেউড়ির পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের মনেই হাসতে লাগল হরেন। ওষুধ ধরেছে। সোমনাথের দুর্বলতা সে ধরতে পেরেছে—ঠিক কোন্ জায়গায় সময়মতো এবং জুতমতো ঘা দিতে পারলে সোমনাথ ঝনঝন করে নড়ে উঠবে সে রহস্যও তার আর অজানা নেই। ওই মহলদার আবার আসবে—টাকাব অঙ্ক বাড়াবে এবং হরেন যে শেষ পর্যন্ত হক্কের ধন থেকে বঞ্চিত হবে না—কোনো সন্দেহই নেই এ বিষয়ে।

আর সোমনাথ জুতোয় আর ব্রীচেসে তেমনি শব্দ তুলে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—যেমন করে বন্দী সিংহ পায়চারি করে সার্কাসের লোহার খাঁচার মধ্যে। চলার তালে তালে হাতের রাইডারটা দিয়ে ঠুকতে লাগল ব্রীচেসটা।

ওই অরুণ মাস্টার। অনুপমার মাস্টার। যেমন ছিচকাঁদুনে অনুপমা—তেমনি এক মাস্টার এসে জুটেছে তার। মাস্টার আছিস—শহরে গিয়ে ছেলে চরা, তবু দুটো পয়সা পকেটে আসবে। কী দরকার বাপু তোর এখানে নিঃস্বার্থ পরহিত ব্রত নিয়ে? দেশ স্বাধীন! কেন, শহরে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন করলেই তো হয়—সেখানে সোমনাথ আপত্তি করবে না, আপত্তি করবার দরকারও নেই তার। সব ভালো ভালো জায়গা ছেড়ে দিয়ে, কংগ্রেসের সভা, ট্রেড ইউনিয়ন—কলকাতার পার্কে মাইক্রোফোন-ফাটানো বক্তৃতা, সব কিছু পেছনে ফেলে, এখানে এসে নাক না ঢোকালেই কি চলত না? যেন দীনা হীনা ভারত-মাতার মুক্তি শুধু এই কটা সাঁওতালের জন্যেই আটকে আছে! আর সে মুক্তি-সাধনার পথটা কি? জোভার সময় আমরা প্রাণপণে বিল থেকে মাছ ধরে খাব, আর সঙ্গে সঙ্গেই কটাস করে পরাধীনতার শৃঙ্খলটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। অর্থাৎ

মাছ খাওয়া আর দেশ স্বাধীন করা এ দুটো একেবারে আলাদা।

—ইডিয়েট—ননসেন্স—ফুল!—সোমনাথ চুরুটে টান দিতে ভুলে গিয়ে চিবুতে লাগল চুরুটের গোড়াটা। নাঃ, আর চলবে না। প্রজারা তাকে ভাববে কাপুরুষ—তাকে ভাববে অপদার্থ। তাকে—সোমনাথ দত্তকে? জীবনে যে কখনও কাউকে ভয় করেনি—সেই তাকে? নাঃ, অসম্ভব। বাস্তব কাব্য নয়—অনুর মাস্টারকে আর খাতির করা চলবে না, কিছুতেই না।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনো বাকি ছিল খানিকটা। ঝড়ের মতো বেগে ঘরে ঢুকল অনুপমা। চাকর একটা টেবিল ল্যাম্পের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—সেই আলোতে অনুপমার একটা আশ্চর্য মূর্তি সোমনাথ দেখতে পেল। দৃষ্টি দিয়ে আগুন ঝরছে—সমস্ত শরীর তার বিস্রস্ত -পড়ছে বড় বড় ক্লান্ত আর দ্রুত নিশ্বাস।

—কি হয়েছে, অনু?

অনুপমা দু হাতে মুখ ঢেকে একটা সোফার ওপর বসে পড়ল।

—কী হয়েছে? এমন করে ছুটতে ছুটতে কোথা থেকে এলে?

মুখ না তুলেই অনুপমা ভাঙা গলায় জবাব দিলে: আমাকে অপমান করেছে।

--অপমান করেছে? তোমাকে? কে অপমান করেছে?

—-অরুণদা।

--অরুণদা?—বজ্রাহতের মতো সোমনাথ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সমস্ত চেতনা যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে—নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না: কী বলছ তুমি? তোমার অরুণদা, তোমার মাস্টার মশাই?

--কেউ না, আমার কেউ না!—হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে অনুপমা আর্তনাদ করে উঠল: তোমরা সবাই সমান—মেয়েদের অপমান করা ছাড়া তোমাদের কোনো কাজ নেই। তোমরা তাদের স্বীকার করতে চাও না—তাদের মর্যাদা দিতে চাও না, কিন্তু—অনুপমা হঠাৎ জলে-আগুনে-ভরা দুটো অসুস্থ চোখ মেলে ধরল সোমনাথের মুখের ওপরে: কিন্তু কেন? কেন তোমার প্রজা আমাকে অপমান করবে? তুমি আমার স্বামী, এখানকার জমিদার, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারো না? কেন শিখিয়ে দিতে পারো না ওই সব অরুণ মজুমদারদের, যে তারা ছাড়া পৃথিবীতে আরো অনেক বেশি শক্তিমান মানুষ আছে?

আত্মস্থ হয়ে সোমনাথ সামনে এগিয়ে এল। বললে, কী অপমান অরুণ মজুমদার তোমাকে করেছে আমি জানি না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো অনু—অরুণ মজুমদারকে শেখাবার ক্ষমতা আমার আছে। তার পরিচয় তুমি আজই পাবে।

উঠে দাঁড়াল অনুপমা। তারপর দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল অন্তঃপুরের দিকে—সে অত্যন্ত

—অত্যন্ত বেশি অসুস্থ বোধ করছে।

হাতের রাইফেলটা তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সোমনাথ বাইরে নেমে গেল।

* * *

ঘরের দাওয়ায় বসে একটার পর একটা বিড়ি পোড়াচ্ছিল হরেন।

মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। সচরাচর এমনভাবে সে এর আগে কোনদিন ঠকেনি। মহলদারের সঙ্গে কথাই ছিল বিলের ব্যবস্থাটা করে দিলে শ দুই টাকা তারও পকেটে আসবে। কিন্তু সব হয়তো ভণ্ডুল হয়ে গেল।

সোমনাথের মেজাজটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। গিরিশনাথকে চেনা কঠিন ছিল না, স্পষ্টভাষী, প্রখর মেজাজ। প্রজাদের ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু কোনোদিন মাথায় পা দিয়ে চলবার সুযোগ তিনি কাউকে দেননি। খাজনা মাপ করেছেন, দরকার হলে চাবুকও মেরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। প্রজারা তাঁকে যেমন ভালোবাসত, ভয়ও করত তেমনি।

কিন্তু কী ধরনের মানুষ সোমনাথ? এত শক্তি এত অহঙ্কার—সব আছে, তবু যেন কিছু নেই। সে বন্দুক ছোঁড়ে, রাইফেল ছোঁড়ে, ঘোড়ায় চাবুক হাতে নিয়ে বেড়ায়। প্রজাদের ভালোবাসাকে সে গ্রাহ্য করে না, তাই ভয়ের অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। হরেন বুঝতে পারে না এ কী রকমের লোক। যুগের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও কি এইভাবে বদলে গেছে নাকি? সাধারণ বুদ্ধিতে এটা হরেন বেশ বোঝে, যে জমিদার প্রজাদের কাছে নেমে তাদেরই মতো ছোট হতে জানে না, নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে, সাধারণের কাছে সে অনাত্মীয়, অনধিকারী।

তবে কি গিরিশনাথ সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে বেমালুম সাঁওতাল বনে গিয়েছিলেন? না তা নয়। তিনি ছিলেন মোড়লের মোড়ল, সর্দারের সর্দার। তাঁর প্রতাপ ছিল, কিন্তু নিজেকে বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে দূরে সরিয়ে রাখবার মতো মন ছিল না। সেইখানেই গিরিশনাথের ছিল জিত আর সেইখানেই হার হয়েছে সোমনাথের।

—মরুক গে—হরে কৃষ্ণ একটা হাই তুলে হরেন বিড়ি ধরাল: সব যে বিশ বাঁও জলের নিচে ডুববে এ তো চোখের সামনে দেখাই যাচ্ছে। সেও যা হোক কিছু গুছিয়ে নিয়েছে, একেবারে পথে বসবে না। কিন্তু ওই দু-দুশো টাকা—

—হরেন!

হরেনের আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে উঠল। যেন শ্মশানের রাস্তায় যেতে যেতে ব্রহ্মদৈত্যের হাঁক শুনেছে। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য নয়, তার চাইতে শতগুণে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার।

সোমনাথ!

হরেন সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলে ফেলল, প্রাতঃপেন্নাম!

কেউটের গর্জনের মতো তীব্র শিশটানা চাপা গলায় সোমনাথ বললে, চুপ !

—আঁ—আজ্ঞে।

অন্ধকারের মধ্যেও সোমনাথের চোখ দুটো হরেন দেখতে পাচ্ছিল। সে চোখ মানুষের নয়। প্রখর হিংসা সোমনাথের রাইফেলের চকচকে নলের মতোই উজ্জ্বলে উঠছিল সেখানে।

বুশকোটের পকেটে হাত ঢোকালে সোমনাথ। বার করে আনলে কতগুলো নোট। হরেনের কম্পিত হাতের ভেতর গুঁজে দিয়ে বললে, নাও।

—কী এ হুজুর ?

—টাকা।

—কিসের টাকা ?

—বকশিশ।

—বকশিশ।—হরেন হাঁ করে রইল। মাত্র দু ঘণ্টা আগেই সোমনাথ চাবুক হাতে তাড়া করে এসেছিল, আর এর মধ্যেই এমন কী ঘটল যার জন্যে হুজুরকে স্বয়ং ছুটে এসে তাকে বকশিশ দিতে হচ্ছে! স্বর্গ-মর্ত-পাতালে এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা কেউ কল্পনাও করেছে নাকি কখনো ? না, হঠাৎ মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে সোমনাথের ?

—বকশিশ হুজুর।

—হ্যাঁ।—তেমনি কেউটে সাপের গর্জন গলার সঙ্গে মিশিয়ে সোমনাথ বললে, কিন্তু এমনি নয়। এত যোগ্যতা তোমার নেই যে খুশী হয়ে অকারণে তোমাকে এতগুলো টাকা আমি খয়রাত করে দেব। আমার কাজ চাই।

—আমি তো হুজুরের শ্রীচরণের ধুলো। যা হুকুম করবেন—

—থামো, অত প্রভুভক্তি দেখিয়ো না। তোমাকে আমি চিনি—অন্ধকারে একবার রাইডারটা আস্ফালন করলে সোমনাথ—একটা তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসে আর্তনাদ করে উঠল।

—কী করতে হবে হুজুর ?

সোমনাথের চাপা গলার স্বরটা বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল : আগুন লাগাতে হবে।

আগুন ! হরেনের বক্ষপিণ্ড দুটো দুদিকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোলা খেল যেন বার কয়েক। গরম হয়ে ফুটবার আগে জলের মধ্যে যেমন একটা শাঁ শাঁ শব্দ হয়, তেমনি একটা ধ্বনিতরঙ্গ হরেনের রক্তের ভেতর অনুরণিত হয়ে গেল। নেশা ছেড়ে দেবার বহুদিন পরে আবার মদের গ্লাসে চুমুক দিলে যে অনুভূতি জাগে, নিজের মধ্যেও যেন তেমনি একটা কিছু অনুভব করলে হরেন। দুটো খুন আর জালিয়াতির মামলায় প্রথম যৌবনে সে ফৌজদারির আসামী হয়েছিল—শিরায় শিরায় সেই দিনগুলোর ডাক সে যেন নতুন করে শুনতে পেল।

এবার শুধু সোমনাথের নয়—হরেনের চোখেও ঝিকিয়ে উঠল ছুরির ফলা।

—কোথায় আগুন লাগাতে হবে?

—ওই মাস্টারের আশ্রমে। অনাসক্তভাবে কথাটা উচ্চারণ করলে সোমনাথ, চুরুটে আগুন ধরালে। জিজ্ঞাসা না করলেও উত্তরটা হরেন সহজেই বুঝতে পারত।

—যো হুকুম হুজুর। কবে?

—আজ রাত্রে। কাল সকালে আমি দেখতে চাই একটা ছাইয়ের গাদা ছাড়া মাস্টারের আশ্রমের কোনো চিহ্নই ওখানে নেই।

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু কী?—সোমনাথের স্বর শাণিত হয়ে উঠল।

—এই বলছিলাম, সাঁওতালরা যদি টের পায় তা হলে তীরের ফলায়—

—কাওয়ার্ড, রাস্কেল!—মাটিতে এমনভাবে পা ঠুকলে সোমনাথ যেন আর একটু হলেই ভূমিকম্পের মতো একটা কিছু ঘটে যেত। অগ্নিগর্ভ গলায় বললে, কতকগুলো সাঁওতালের তীরকে ভয়! কোনো চিন্তা নেই, আমার রাইফেল আছে, দুশো রাউণ্ড গুলি আছে। আমার জমিদারি থেকে দরকার হলে একটা গ্রামই আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব। অঙ্গ বিষাক্ত হয়ে গেলে তাকে কেটে ফেলাই ভালো। সেজন্য যদি আমাকে ফাঁসি যেতেও হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

হরেন আতঙ্কে চুপ করে রইল, জবাব দিল না।

সোমনাথ আবার বললে, আমি কাজ চাই। আজ রাত্রের মধ্যেই।

হরেন ম্লান কণ্ঠে বললে, যে আজ্ঞে।

—যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে নয়—আবার সজোরে পা ঠুকলে সোমনাথ: আমি কাজ চাই। যদি খুশী করতে পার, দুশো টাকা। না পার—ভেব না আমি চুপ করে থাকব। তা হলে নতুন রাইফেলটা তোমার ওপর দিয়েই পরখ করে দেখব এবারে।

কথাটা বলে সোমনাথ আর দাঁড়াল না। যে ভাবে এসেছিল, ভারী জুতোর শব্দ করে তেমনি ভাবেই আবার ফিরে চলে গেল।

হরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল আর নির্নিমেষ চোখে দেখতে লাগল ক্রমে মিলিয়ে আসা সোমনাথের চুরুটের আগুনটা। হঠাৎ তার মনে হল, ঘর থেকে একখানা দা এনে পেছন থেকে সোমনাথের গলায় পরিষ্কার হাতে বসিয়ে দেবে নাকি!

ছায়াপথের প্রসারিত পুচ্ছে ঝকঝকে কালো আকাশ। তারাগুলো কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে এত বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন? হরেনের মনে হতে লাগল যেন কোন একটা আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে অন্ধকারটা বড় বেশি ফিকে হয়ে গেছে। ভয় করছে—গা শিউরে

উঠছে শিরশির করে। অনেক দিনের অনভ্যাস, বহুদিনের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পরে একটা অতি কঠিন দায়িত্ব! ঝোপের আড়াল থেকে সাঁওতালের একটা আচমকা তীর এসে বুকের ভেতর বিঁধে যাবে না তো?

ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বুকসমান ধান আর হাঁটুসমান জলকাদা ভেঙে হরেন এগোতে লাগল। আল দিয়ে হাঁটবার সাহস নেই, পাছে হঠাৎ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অথচ ক্ষেতের মধ্যে এখন সাপের সম্ভাবনা প্রচুর। বর্ষার জলে প্রচুর ব্যাং আর চ্যাং মাছের ঝাঁক গজিয়েছে ধানবনে। তাদের সন্ধানে ঢোঁড়া, হেলে থেকে শুরু করে চন্দ্রবোড়া কেউটের পর্যন্ত আমদানি হয় ক্ষেতে।

—রাম মারলেও মরি, রাবণে মারলেও একই দশা—নিজেকে সান্ত্বনা দিলে হরেন। ঝপঝপ করে জলকাদা ভেঙে বুনো শুয়োরের মতো এগোতে লাগল। অন্ধকারের পটভূমিকায় টিলার ওপর অরুণের আশ্রমটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

হরেন এদিক ওদিক তাকালে বার কয়েক। কোনোখানে কারো সাড়াশব্দ নেই। অরুণের ঘর অন্ধকার—ঝিঁঝির ডাক ছাড়া কোনোখানে কিছু শোনা যায় না। মাস্টার ঘুমিয়েছে নিশ্চয়।

বুদ্ধি করে হরেন সাবধানে আগে দরজার শিকলটা টেনে দিলে। হাতের ছোট ক্যানেস্তারা থেকে ভালো করে তেল ঢাললে তাঁতগুলোর ওপরে, তারপরে কাঠের দরজায়, খড়ের চালে। তারও পরে গুটি কয়েক দেশলাইয়ের কাঠি। পরক্ষণেই বুলেটের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলে। তার কাজ হয়ে গেছে।

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার উঠল একটা দমকা বাতাস। একবার পেছন ফিরে তাকাতেই হরেনের চোখে পড়ল আশ্রম জ্বলে উঠেছে। একসঙ্গে সবগুলো। তাঁত, দরজা, ঘরের চাল।

হরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার ইচ্ছে করল চোখ ভরে নিজের কৃতিত্বটা উপভোগ করে নেয়। বাঃ—বেশ ধরছে। চালের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে আগুনের শিখাগুলো এগিয়ে চলছে। বাহবা—সাবাস! আর একটু জোর বাতাস—আর একটু—বাঃ—লাল ঘোড়া দিব্যি কদম ফেলছে! কেল্লা ফতে!

হঠাৎ সাঁওতালপাড়ার দিক থেকে কোলাহল উঠল। ওরা টের পেয়েছে এতক্ষণে। রাত্রির বুক চিরে বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল: আগুন—আগুন!

হরেন আবার ছুটল। এবারে আর দেরি নয়; যে কোনো মুহূর্তে যা-তা ঘটে যেতে পারে। চোখ বুজে সে হাঁটতে লাগল, আরো অর্ধেকটা পথ এগোতে পারলে তবে নিশ্চিন্তি।

ধানের আলের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে একটা মানুষ ছুটে আসছে—সেও আগুন দেখতে

পেয়েছে। দুজনে সংঘর্ষ হয়ে গেল, পা হড়কে ক্ষেতের মধ্যে পড়ে গেল হরেন। তারপর যখন উঠে দাঁড়াতে পারল, তখন সামনে যাকে দেখতে পেল, সে আর কেউ নয় স্বয়ং অরুণ। তার হাতে একটা লণ্ঠন।

অরুণ বললে, একি—একি!

হরেন উঠে দাঁড়িয়ে পাশ কাটিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারল না। মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা অরুণের কাছে দিবালোকের মতো স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল হয়ে গেছে। কঠিন মুঠোতে সে হরেনের হাত আঁকড়ে ধরলে, বকসী মশাই?

হরেন বললে, অ্যাঁ—অ্যাঁ—

—আপনার হাতে ও কী?

জবাবের দরকার ছিল না। আড়াইসেরী ছোট একটা কেরোসিনের টিন। হরেনের সর্বাঙ্গে তখনো কেরোসিনের তীব্র দুর্গন্ধ।

—বকসী মশাই, এ আপনি কী করলেন?

—আ—আ—আমি—প্রাণপণে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলে হরেন।

—বুঝতে পেরেছি! অরুণের গলায় বাজ ডেকে উঠল: আপনি আমার ঘরে আগুন লাগিয়েছেন। কেন এমন সর্বনাশ করলেন আপনি, কেন করলেন?

—আ-আমি জানি না,—আমি কিছু জানি না—

—আপনি জানেন না—মুহূর্তের জন্যে সত্যাগ্রহীর সংযম সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিময় ঘরটার মতোই লেলিহ আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল: এইবারে জানবেন। ওই আগুনে আপনাকে ফেলে দেব, আপনাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। আপনি মানুষ?

হরেন আর্তনাদ করে উঠল: দোহাই বাবা—ছেড়ে দাও আমাকে। আমি কিছু জানি না—নিমকের চাকর। জমিদারের হুকুম—রানীমার হুকুম।

—রানীমার হুকুম!

অরুণের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যেতে লাগল।

—হ্যাঁ—রানীমার হুকুম—

অরুণের অবশ হাত হরেনের কবজি থেকে নিঃশব্দে খসে পড়ল। চোখের সামনে পৃথিবী দুলছে, আগুনটাও দুলছে সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিশোধ নিয়েছে অনুপমা। তার বিকৃত বিক্ষত মন শেষে আত্মপ্রকাশের পথ এই ভাবেই খুঁজে পেয়েছে!

—যান আপনি—

কিন্তু কথাটা বলবার বহু আগেই হরেন অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে।

অরুণ দাঁড়িয়ে রইল। সাঁওতালপাড়ায় কোলাহল উঠেছে—লোক ছুটোছুটি করছে, রক্ত আলোয় নাচছে ছায়ামূর্তির দল, হাহাকার করছে। কিন্তু মনের দিক থেকে এতটুকু

উৎসাহ পাচ্ছে না অরুণ। সব শূন্য হয়ে গেছে, শরীর থেকে শক্তির বিন্দুটুকু অবধি যেন চুষে নিংড়ে শেষ করে দিয়েছে কেউ।

কিন্তু মিলা?

মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে উঠল: প্রমীলা? অন্ধ—অসহায়। আশ্রমের চালে আগুনের ভৈরবী নৃত্য।

পাগলের মতো ছুটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে অরুণ। কিন্তু আশ্চর্য, পায়ে এতটুকুও জোর পাচ্ছে না।

* * *

সাঁওতালপাড়ায় কার ছেলের খুব বেশি অসুখ করেছে। সন্ধ্যার পরেই লোক এসে গেছে কয়েকবার, তাই খানিক আগে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অরুণ। বলে গিয়েছিল ফিরতে রাত হবে। আর যদি অসুখের খুব বাড়াবাড়ি দেখে তাহলে আজ রাত্রে আদৌ নাও ফিরতে পারে।

একা ঘরে অন্ধকার বিছানায় চুপ করে শুয়ে ছিল প্রমীলা। তার কাছে এখন সবই অন্ধকার—ঘরে আলো জ্বেলেও কোনো লাভ নেই আর। পৃথিবীর আলো নিভে গেছে, সে জন্যে দুঃখ নেই। কিন্তু তার আলো আছে: অরুণ—তার মনের আলো, ভালোবাসার আলো। প্রমীলা তাইতেই ধন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কেমন অস্বস্তি লাগছে আজকে। বিশ্বাসের ভিত্তিতে দোলা লাগছে তার। অরুণ সত্যিই কি ভালোবেসেছে তাকে, না দয়া করেছে? যেমন লোকে দয়া করে রাস্তার ভিখিরি দুঃস্থকে, রেল-স্টেশনের অন্ধ সুরদাসকে?

আজ অনুপমা কেন এসেছিল এভাবে? কেন ঝগড়া করে গেল অরুণের সঙ্গে? প্রমীলা কিছু বুঝতে পারেনি। অরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিন্তু অরুণও ভালো করে কোনো জবাব দেয়নি তার কথার। প্রমীলার মনের মধ্যে মেঘ ঘনিয়েছে। সত্যিই কি অরুণের জীবনে সে অত্যাবশ্যক? অনুপমাই কি বাস্তবিক তার সহধর্মিণী হতে পারত?

বাইরে রাত বাড়ছে। বাতাসে ধান-ক্ষেতের গন্ধ—মাটির গন্ধ, অরুণের সবজী-বাগান থেকে কুমড়ো ফুলের গন্ধ। একরাশ সুতো থেকে কোরা গন্ধ। শেয়াল ডাকছে, ঝিঁঝি ডাকছে। ঘরের খুঁটি কোথাও ঘুণে খেয়ে চলছে—শব্দ হচ্ছে কুট কুট কুট। চিকচিক শব্দে গোটা দুই ছুঁচো জরুরি একটা আলোচনা করতে করতে দৌড়ে গেল।

নিজেকে অত্যন্ত শূন্য মনে হতে লাগল প্রমীলার। নিজের ফাঁক ভরেছে, কিন্তু সেই-জন্যে অরুণকে ফাঁকি দেয় নি তো! অরুণ কি আজ অনুতপ্ত—তাকে বয়ে চলতে চলতে ক্লান্ত এবং পীড়িত! কথাটা ভাবতে গিয়েও প্রমীলার বুকের ভেতর টনটন করে উঠল—

যেন একটা কী সেখানে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে যাবে। অন্ধ চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিন্তু ও কী ? হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রমীলার। সমস্ত শব্দ আর গন্ধকে ছাড়িয়ে ঘরের চালে পটপট করে ওটা কিসের আওয়াজ ? ঘর পুড়ছে নাকি ? একটা পোড়া গন্ধ —একটা তীব্র উত্তাপ !

প্রমীলা বিছানার ওপরে উঠে বসল।

ধোঁয়ায় দম আটকে আসছে। তীব্র উত্তাপ লাগছে গায়ে। অন্ধ চোখেও যেন প্রমীলা দেখতে পাচ্ছে চারদিকে নেচে চলেছে রাঙা আগুনের শিখা—অরুণের আশ্রমটাকে গ্রাস করবে।

তীব্র চিৎকার করে দরজার দিকে ছুটে গেল প্রমীলা। অভ্যাসবশে দরজাটা ধরে প্রাণপণে টানলে সে। দরজা খুলল না—কিসে আটকে গিয়েছে।

ঘরের চালে শোঁ শোঁ করে গর্জাচ্ছে আগুন। বেড়া ধরছে—আড়া জ্বলছে। প্রমীলার আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। ধোঁয়া আর আগুন তার চারদিকে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল মৃত্যুবেষ্টনী হয়ে। অন্ধ দৃষ্টির সামনে অন্ধ পৃথিবী নিঃসীমতায় মিলিয়ে গেল।

ওদিকে অনুপমা ঘুমুচ্ছে অকাতরে। ঘুমের মধ্যেই বলছিল, ক্ষমা করো অরুণদা, ক্ষমা করো। অন্যায় বলেছি তোমাকে। কিন্তু আর কাকে বলব ? মানুষ যখন দুঃখ পায় তখন সব চাইতে প্রিয়জনকেই যে সে আঘাত করে, একি তুমি বুঝতে পারো না ?

দ্রুতগতিতে ঘরে ঢুকল সোমনাথ : অনু, অনু !

অনুপমা চমকে উঠে বসল : কে ? কে ?

—ভয় পাচ্ছ কেন ? আমি।

—এখন ডাকাডাকি করছ কেন ?

—অনু, ওঠো, দেখ।

—কী দেখব ?

—দেখে যাও সোমনাথ দত্তের শক্তি আছে কিনা। দেখে যাও, অরুণ মাস্টারকে সায়েস্তা করতে আমি জানি। আমার স্ত্রীকে যে অপমান করে তাকে আমি ক্ষমা করতে শিখিনি।

অনুপমার মাথাটা সংশয়ে এবং আশঙ্কায় বোঁ করে ঘুরে গেল। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল একটা পৈশাচিক উল্লাসে সোমনাথের সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

—কী করেছ, কী করেছ তুমি ?

—এসো, জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

অনুপমা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। দাউ দাউ করে জলে যাচ্ছে আগুন—অন্ধকারের বুক ফেটে রক্ত উছলে পড়ছে। অরুণের আশ্রম পুড়ে ছাইখার হয়ে যাচ্ছে। আগুনের তীব্র আভায় ছায়ামূর্তির মতো কতগুলো মানুষ যেন ছুটোছুটি করছে—চিৎকার করছে। ফট ফট করে বাঁশ ফাটবার শব্দ। দূরাগত জলকল্লোলের মতো আগুন গর্জে উঠছে।

—এ কী ?

—যা হওয়া উচিত, তাই। তুমি খুশী হয়েছ অনুপমা ? সোমনাথ রাক্ষসের মতো হাসছে :

রক্তমাখা হাতে

এইবারে দিব বাঁধি পাঞ্চালীর বেণী—

—তুমি আগুন লাগিয়েছ ?

—নিশ্চয় !—উচ্ছল গলায় সোমনাথ বললে : সবে শুরু। আর বেশিদিন অরুণ মাস্টারকে মোড়লি করতে হবে না এখানে। দ্য ব্লকহেড্‌! আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসে !

নিচে থেকে কে যেন চিৎকার করছে—হুজুর, হুজুর !

—কে ?

—আমি হরেন।

—কী বলতে চাও ?

—একটা বড় অন্যায় ব্যাপার হয়ে গেছে। দরজায় শিকল লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অন্ধ বৌটা আগুনে পুড়ে মরেছে।

—অ্যাঁ !—সোমনাথের মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরুল।

আর জানলার নিচে মেঝের ওপর মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল অনুপমা।

* * *

প্রমীলা মরেনি, কিন্তু মরতে আর দেরি নেই। অনুপমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায় সে। কী অন্যায় কথা বলেছে, কী অপরাধ করেছে তার কাছে। সে জন্যে ক্ষমা চাইবে।

সকালের আলোয় সোমনাথ আর অরুণ দুজনেই অনুপমাকে খুঁজতে চলেছে। পাশাপাশি ওরা হেঁটে চলেছে—কারো মুখে কোনো কথা নেই। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। হয়তো অতবড় একটা আগুনের পরে ঘণ্টাখানেক পৃথিবীকে জুড়িয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ করে তোলবার জন্যে নেমেছিল খানিকটা ঘন বর্ষণ।

আশ্চর্য ভাবে সব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে। অগ্নিদগ্ধ প্রমীলা যার ওপর সেতু রচনা

করেছিল, অনুপমা হারিয়ে গিয়ে যেন সম্পূর্ণ করে দিয়েছে তাকে। এক মুহূর্তে সোমনাথের মনে হয়েছে নিজের অস্ত্র আর নিজের শক্তি কী ব্যর্থ, কী মূল্যহীন! কিন্তু কোথায় গেছে অনুপমা?

সোমনাথের বাড়ির খিড়কি পেরোলেই ওপারে খানিকটা ধূ ধূ বালি-বিস্তার। প্রায় এক মাইল এগিয়ে বালুশয্যা কলোচ্ছলা মহানন্দায় গিয়ে নেমেছে। এই রিক্ততার উপর দিয়ে মানুষ তো দূরের কথা—গোরু পর্যন্ত হাঁটে না। একগুচ্ছ ঘাস নেই সেখানে—শুধু কন্টিকারীর কাঁটাগুলো পৃথিবীর বুক-নিংড়ানো বেদনার্ত আনন্দের মতো জেগে আছে!

এই ভিজে বিশাল বালুবিস্তারের ওপর একজোড়া ছোট ছোট পায়ের ছাপ। নরম মাটিতে আরো নরম পায়ের দাগ লক্ষ্মীর পদলেখার মতো কোমল বিষণ্ণ চিহ্ন রেখে এগিয়ে গিয়েছে। সে পদচিহ্ন আবাহনের নয়—বিসর্জনের। তার মাঝে মাঝে জল জমে রয়েছে—সকালের আলোয় জমাট অশ্রুচিহ্নের মতো সে জল ঝলমল করছে।

শেষ রাত্রে কোন অবসরে এই পথ দিয়ে চলে গিয়েছে অনুপমা। দুজনে তেমনি এগিয়ে চলে অনুপমার পদচিহ্ন অনুসরণ করে। সে চিহ্ন কখনো সোজা কখনো আঁকাবাঁকা। কখনো বালির মধ্যে অনেকখানি গভীর হয়ে বসেছে, চলতে চলতে কখনো কি কোন কারণে থেমে দাঁড়িয়েছিল অনুপমা? ভেবেছিল যাকে ফেলে এসেছে তার কাছেই ফিরে যাবে!

সম্মুখে সংকেত দিচ্ছে পদচিহ্ন। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে দুজন—অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তার পর খানিক এগিয়ে আর কিছু নেই। শুধু মহানন্দা তীব্র ছন্দে বয়ে যাচ্ছে—প্রখর স্রোতে ওপার থেকে ঝুপঝুপ শব্দে ভেঙে পড়ছে বালির চাঙাড়।

অনুপমার যাত্রা কোথায় শেষ হয়েছে? এই মহানন্দার জলে? সকালের আলোয় উল্লসিত এই বিস্তৃত খরধারা স্রোতে? না না, এ বিশ্বাস হয় না। সোমনাথ ভাবে: এত অভিমান করতে পারে না অনুপমা! তার তো অভাব নেই কিছু! গয়না আছে, শাড়ি আছে, ড্রাই ব্যাটারি দিয়ে চালানো রেডিও আছে—সোমনাথ তাকে তৃপ্তি দেবার আয়োজন অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেনি এতটুকুও। আর অরুণ ভাবে: এ অসম্ভব। আশ্চর্য মেয়ে অনুপমা—স্থির বিদ্যুতের মতো শিখায়িত। তার মধ্যে যে ক্রুপসকায়ার অঙ্কুর আছে—তার রক্তে জেগে উঠতে পারে ভেরা ফিগনার। না, না—এ বিশ্বাস করা অসম্ভব।

তা হলে! তা হলে কি নদী পার হয়ে? ওই অন্ধকার বনরেখা আর দিগন্ত প্রান্তরের অলক্ষ্য পথে? যেখানে চক্রবালে হাঁসের ঝাঁক উড়ে চলেছে—ওর থেকেও দূরে, ওরও সীমা ছাড়িয়ে?

রহস্যময়ী নদীর কল্লোলে কোনো জবাব মেলে না। সকালের আলোয় নদীর চরে সোনালি বালি চিক চিক করে। যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগেই স্বর্ণসীতার বিসর্জন হয়ে গেছে—সোনালি বালিতে আর সোনা-মাখানো নদীর জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেছে সে।

উপনিবেশ

প্রথম খণ্ড

নৃত্যশিল্পী

বুলবুল চৌধুরী এম-এ

প্রিয়বরেষু

উপন্যাসের ভূমিকা

উপন্যাস লেখবার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল—যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়ো।

খুব পুরানো দিনের কথা খুব সহজ ভাষায় বলা হল। কিন্তু নিজের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন উপন্যাস লেখবার পক্ষে এই একটিমাত্র কৈফিয়ৎই আমি খুঁজে পাই।

প্রকৃতি আমার মন ভুলিয়েছিল চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই। ধূ-ধূ বালির বুকে একটা ক্ষুরধারা নদী—নাম কাঞ্চন। এমন অপূর্ব নাম তার কে দিয়েছিল জানি না। বর্ষায় রাক্ষসী হয়ে উঠে রেলের মস্ত পুলটাকে যেন ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইত—বালির ডাঙা থেকে উপড়ে নিয়ে যেত বৈঁচির বন। তার এক ধারে ছিল শীতে লাল-হলুদের রঙ্-মাখানো একটা আদিগন্ত ফুলের জঙ্গল—আর পাড়ে ছিল পঞ্চাশ বছর আগে পরিত্যক্ত পুরানো আমগাছের ছায়ায় ঢাকা একটা ইয়োরোপীয় গোরস্থান। নদীর ধারে সমান্তরাল ওই ফুলের বন মনটাকে সামনের দিকে হাতছানি দিত, ওই গোরস্থানটা ঘনিয়ে আনত থমথমে অন্ধকার।

এই হল সূচনা।

বলা যেতে পারে, আমার মন দিয়ে প্রকৃতিকে আমি দেখিনি, প্রকৃতিই আমার মননকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে একেবারে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ নিসর্গরসে তন্ময় হয়ে থাকা যাবে—এমন সুযোগ এ যুগে কে পায়? আমিও পাইনি। অহিংসার রাজনীতি থেকে বিপ্লববাদের পথেও পদক্ষেপ করতে হল একদিন। আমার প্রকৃতির মধ্যে মানুষ এসে দাঁড়ালো। আকাশ, জল, মাটি পেল একটা নতুন তাৎপর্য—পেন্‌সিলের রেখায় ভৌগোলিক পৃথিবীর একটা আদ্‌রা এঁকেছিলাম, রক্ত মাংসের রঙ্ পড়ল তাতে।

অর্থাৎ পটভূমি আগে সৃষ্টি হল, তারপর এল চরিত্র। আমার মাটি থেকে আত্মাকে গ্রহণ করল মানুষ। একটা লোক নদীতে সাঁতার দিয়ে পার হচ্ছে—এইটিকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রথমে নদীটাকেই আমার মনে পড়বে; তার তীর, তার তরঙ্গ, তার খাড়া পাড়ের ফাটলে গাং-শালিকের বাসা, তার আধ-ডুবো চড়ার ওপর একসার বন-ঝাউ। যে মানুষটা সাঁতার দিয়ে চলেছে, সে এই পরিপার্শ্বের সঙ্গেই একাকার হয়ে থাকবে; নিজের একটা উগ্র ব্যক্তিত্ব দিয়ে একে আচ্ছন্ন করে দেবে না। তাকে এই নদীটিরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হবে।

সুতরাং কাঞ্চন নদীর ধার থেকে যখন বরেন্দ্রভূমির আচক্রবাল মাঠের দিকে পা বাড়ালাম, তখন এমন একটা পৃথিবীকে দেখলাম, যা আমার কল্পনাকে ছাড়িয়ে তরঙ্গিত

রাঙা মাটির টিলায় টিলায় মহাশূন্যতায় অগ্রসর। আর তার ওপর চোখে পড়ল আমার দেশের মানুষকে। তিন মাসের বেশি তার খোরাকীর ধান থাকে না, পাঁচ মাস পরে তার দু'পয়সার লবণ জোটে না এবং অন্তত তিন মাস তাকে বুনো ওল সেদ্ধ করে পেটের জ্বালা জুড়োতে হয়। আমার মহা-পৃথিবীতে এসে মিশল মহা-বুভুক্ষা; লাল মাটির ওপর বৈশাখী ঘূর্ণি আমার চোখে দীর্ঘশ্বাস হয়ে উঠল।

আমার প্রথম উপন্যাস 'উপনিবেশে'র জন্মও এই ভাবেই। নিম্ন বাংলার নদী সমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার একটা অপরূপ রূপ, আমার কিশোর-কল্পনাকে রোমাঞ্চিত করে রেখেছিল। তার সঙ্গে কী করে যে একদিন মিখেইল শোলোকভের যোগাযোগ ঘটল, তা আজ আর আমার ভালো করে মনে পড়ছে না। কিন্তু ডন কোজাক্‌দের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি—সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলিতী অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রের হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেই রকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইস্‌মাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহুচরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল। তাই এই উপন্যাসের, অন্তত প্রথম খণ্ডের মানুষগুলি উপনিবেশেরই সৃষ্টি—তারা উপনিবেশকে গড়ে তোলেনি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্তিকা

পৃথিবী বাড়িতেছে।

দিনের পর দিন নদীর মোহনা-মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে, আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।

আবার ওদিকে যখন মেঘনার কালো জলে কল্ কল্ করিয়া ঘূর্ণি ঘুরিতে থাকে, আকাশের একপ্রান্তে এতটুকু বৈকালী মেঘ দেখিয়াই বৈশাখী নদী হিংস্র উদ্দাম হইয়া উঠে, তেঁতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'ষাঁড়ের' জল ছুটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলাটিতে বসিয়া জীবনকীট অন্ধ-প্রেরণায় রচনা করিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে অতলস্পর্শ নদীগর্ভে স্টীমার কোম্পানীর লোক আসিয়া বড বড় বাঁশ পুঁতিয়া যায়, রাত্রে সেই বাঁশের মাথায় লাল আলো মিট্ মিট্ করে, জানাইয়া দেয় এখানে বাঁও মিলিবে। আরো কিছুদিন পরে ভাঁটার সময় সেখানে মহাজনী নৌকার হাল আট্‌কাইয়া যায়, ইলিশ মাছের ডিঙ্গিগুলি লগি পুঁতিয়া অবসর সময়ে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়। তার পর আস্তে আস্তে সেই অথই জল ঠেলিয়া অতিকায় তিমির মতো একটা প্রকাণ্ড চড়া জাগিয়া ওঠে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে চড়ার নোনা ক্ষয় হইতে থাকে, আগাছা জন্মায়, তার পরে আসে মানুষ। অমনি সোনার কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া যায় যেন। পৃথিবী বিস্তৃত হয়—নতুন মাটিতে নতুন ফল ও শস্য জন্মিয়া প্রয়োজনের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলে।

ইহাই উপনিবেশ। জাতিভেদে নয়, দেশভেদেও নয়। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত সৌর-জগৎ, মহাকাশ ও মহাকাল ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ রচনা হইয়া চলিয়াছে।

এক

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা মনে পড়িতেছে।

নবাব আলীবর্দী তখন বাংলার সিংহাসনে। মাকড়সার জালের মতো ধীরে ধীরে ইংরেজের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি বাংলাময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর পলাশীর প্রান্তরে যে ঝড় একদিন করাল মূর্তি নিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, দিকে দিকে তাহারি নিঃশব্দ আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছে।

সেই সময় এবং তার বহু আগে হইতেই নিম্ন বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। এই 'আরমাডা' বা হার্মাদদের ভয়ে তখন সমুদ্রের মুখে নদীনালাগুলি এতটুকুও নিরাপদ ছিল না। এই পর্তুগীজদের দল কেবল যে বড় বড় জাহাজ লইয়া সমুদ্রে বা নদীতে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত তাহাই নয়, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর চরে তাহারা সুরক্ষিত অনেকগুলি কেল্লা তৈয়ার করিয়াছিল। বড় বড় তোপ পাতিয়া এই সব কেল্লাতে তাহারা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিত, বোম্বেটে জাহাজে পাল তুলিয়া তাহারা গ্রামের উপর, জমিদার বাড়ির উপর হানা দিত। তাহাদের সেই সমস্ত অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় আর ক্ষীয়মাণ জনস্মৃতির উপরে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। এই পর্তুগীজদেরই স্মরণ-চিহ্নে চিহ্নিত তেঁতুলিয়ার মোহনায় চর ইস্মাইল।

অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার অশ্রান্ত সাধনার মধ্য দিয়াও চর ইস্মাইল সেদিনের কথা অনেকখানি মনে রাখিয়াছে। নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ—ইটের দেওয়াল দুদিনেই জীর্ণ হইয়া আসে, তবুও পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজ অবধিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। চরের দক্ষিণ দিকের যে অংশটা নদীতে ভাঙিয়া নিয়াছে, মাত্র দশ বছর আগে আসিলেও ওখানে তাহাদের প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ অন্তত দেখিতে পাওয়া যাইত। বালির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া একটা লোহার কামান দেখিয়া তাহাদের বলবিক্রম আজিকার দিনেও খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে।

চর ইস্মাইল।

আজ কিন্তু সেখানে মস্ত বাজার বসিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ছোটখাট একটি কাছারী। বাসিন্দা যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি হইতে আসা একদল দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ আর একদল জেলে।

কম করিয়াও এখন প্রায় দেড়হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া

হাট বসে, আশেপাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যাহারা দিন গুজরাণ করে, এই একটি দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা—আশা করা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর্-এস্ এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত স্টিমারের একটা লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে।

কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে স্নেহের কঠিন বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

নদী—অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশ্টে, তেমনই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণগন্ধসমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইস্মাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরে মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ—সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু'চারিটি বুনো ফুল ফুটিতে শুরু করে, অমনি পাটির মতো শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদ্লাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয়—আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দ বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগড় খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক গাছের শাল্তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইলসা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।

অতএব বৎসরে ছয় মাস চর ইস্মাইল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া নদীর নিভৃত বুকের মধ্যে দিন কাটাইয়া চলে। কেবল ডাকের নৌকাই যা একটু যাতায়াত করে, কিন্তু তেমন-তেমন প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটিলে তাও যায় বন্ধ হইয়া। সেই সময়ে চর ইস্মাইল একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো তার সভ্য এবং অর্ধ-সভ্য একদল মানুষ লইয়া নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে।

এমন একটি সময়ে, সেই সব সভ্য ও অর্ধ-সভ্য মানুষদের লইয়াই এই কাহিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজেরা আর নাই।

তেঁতুলিয়ার জলে বোম্বেটে জাহাজগুলির ভাঙা দাঁড় আর হালের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কঙ্কালগুলিও লোপ পাইয়াছে। চরের দক্ষিণ দিকে বিলুপ্ত গীর্জাটার সঙ্গেই ছিল তাহাদের গোরস্থান। আজ সেখানে নোনাজলে তির্ তির্ করিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণি ঘোরে।

তাহারা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের স্মৃতি যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াই গেছে সে কথাও বলা চলে না। এই চর ইস্‌মাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট্ করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটা বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কানে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষায় শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায় কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ করে এবং বিবর্ণ একটা ধর্মসিক্ত কালো কারের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা একটা নিকেলের ক্রস্ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।

আর বাড়্‌তির মধ্যে যা আছে তাহা হইতেছে তাহাদের নাম।

ইহাদের একজন ডি-সুজা সকাল বেলাতেই অত্যন্ত চিৎকার করিতেছিল। বোঝা যাইতেছিল লোকটা চটিয়াছে। বয়সের প্রভাবে সামনের তিনটা দাঁত ঝরিয়া পড়িয়াছে, কথার মধ্যে আসিয়াছে খানিকটা জড়তা। তাই কী সে বলিতেছিল সেটা ঠিক স্পষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু যে রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল, তাহা হইতে ইহা বুঝিয়া লওয়া চলে যে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি সে আপ্রাণ-চেষ্টায় গালিবর্ষণ করিতেছে।

গালির চোটে অস্থির হইয়া পাশের বাড়ি হইতে জোহান বাহির হইয়া আসিল।

জোহানের বয়স অল্প। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় লোকটি শৌখীন। চুলটি কাঁধের উপর দিয়া বেশ করিয়া বাব্‌রী করা, পরনে একটি ফর্সা পায়জামা। এই সাত সকালেই সে একমুখ পান লইয়া চিবাইতেছিল।

জোহান বলিল, কী হয়েছে ঠাকুর্দা, এই সকাল বেলাতে অমন ভাবে চ্যাচাচ্ছ কেন?

এমন মোলায়েম সম্বোধনেও কিন্তু ঠাকুর্দা খুশি হইল না, বরং আরো ক্ষেপিয়া উঠিল:

—চ্যাচাচ্ছি মানে? তুমি যেন এর কিছুই জানো না। ন্যাকা আর কি!

জোহান বিস্মিত হইল না, রাগও করিল না। আবার তাকেই প্রশ্ন করিল, আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা তাই খুলে বলো না?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি যে একেবারে গাছ থেকে পড়ছ, বলি আমার বড় বাওয়া মোরগটা গেল কোথায়?

—তোমার বড় মোরগটা? কেন, সেটার আবার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? দন্তহীন মুখটাকে ডি-সুজা বিকট রকমে ভ্যাংচাইল: সেটা তোমার

পেটে গেছে কিনা সেই খবরটাই তোমার কাছে জানতে চাই।

জোহান বলিল, আমার ? আমার পেটে গেছে একথা তোমায় কে বললে ?

ডি-সুজা সরোষে কহিল, তবে কার পেটে গেল শুনি ? মুরগী তো আর নিজে নিজেই খোঁয়াড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এইবার জোহানের চটিবার পালা।

—তাই বলে আমিই চুরি করতে গেলাম ! চোরের অভাব আছে দেশে ? গ্যাখো ঠাকুর্দা, তুমি বুড়ো মানুষ বলে কিছু বলছি না, নইলে—

ডি-সুজা ইহাতে ভয় তো পাইলই না, বরং আরো তিন পা আগাইয়া আসিল। বলিল, নইলে কী করতে, করতে কী সেটা শুনি ? তুমি তো পারো কেবল—একটা নিতান্ত অশ্লীল মুখখিস্তি করিয়া সে তাহার বক্তব্যটা শেষ করিল।

গেঞ্জির আস্তিন নাই, তবু অভ্যাস বশে দুই হাতে খানিকটা কাল্পনিক আস্তিন গুটাইয়া জোহান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। বলিল, মুখ সামলে কথা কোয়ো ঠাকুর্দা। ভালো হবে না বলছি।

ডি-সুজা আগুন হইয়া উঠিল। দুঃসাহসী পিতৃপুরুষদের রক্ত তাহার শিরা-উপশিরায় ফেনাইয়া উঠিয়াছে। অথবা জোহানের অপেক্ষা বয়সে খানিকটা বড় বলিয়াই হয়তো পূর্ব-গামীদিগের সহিত রক্ত-সম্পর্কটা তাহার নিকটতর। সেই মুহূর্তে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, রফা করা অপেক্ষা মারামারিটা বেশ করিয়া বাধাইয়া তোলার ইচ্ছাটাই তাহার অধিকতর প্রবল।

ডি-সুজা শাসাইয়া কহিল, তুইও মুখ সাম্‌লে কথা বলবি ছোঁড়া। নইলে—

কুরুক্ষেত্র-জাতীয় কিছু একটা হয়তো বাধিয়াই বসিত, কিন্তু বাধিল না। পরিপাটী হইয়া-আসা আয়োজনটির মধ্যে চট্ করিয়া একটা ছন্দপতন ঘটিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই ডি-সুজার সাম্‌নে কোথা হইতে একটি তরুণী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সস্নেহে একটি ধমক দিয়া বলিল, কেন পাগ্‌লামি করছ ঠাকুর্দা, তোমার চা হয়েছে, এসো।

ডি-সুজার গলার স্বর চড়া-পর্দা হইতে সেই মুহূর্তেই একেবারে অতি কোমল নিখাদে নামিয়া গেল। বলিল, কিন্তু আমার বড় মোরগটা—

মেয়েটি বলিল, আবার !

ডি-সুজা করুণ স্বরে বলিল, তুই কিছু বুঝিস নে লিসি—

লিসি বলিল, সব বুঝি। তোমার বড় মোরগটা শেয়ালে খেয়েছে, এসো তুমি।

মাথাটি নত করিয়া ডি-সুজা আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

জোহান তখনও তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া লিসি শাসনের

স্বরে বলিল, ঠাকুর্দা না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু তোমারও তো একটু মাথা ঠিক রেখে চলা উচিত ছিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে কী একটা তো তো করিয়া উত্তর দিবার আগেই লিসি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, এবং খটাং করিয়া জোহানের নাকের সামনেই দরজাটা দিল বন্ধ করিয়া।

জোহান দাঁড়াইয়া রহিল তো দাঁড়াইয়া রহিলই।

খাসমহল কাছারীর নূতন তহশীলদার মণিমোহন পোস্টাপিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখের ভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রকট একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছিল।

কাল রাত্রিতে টানা বৃষ্টি হইয়াছে এক পশলা। সেই বৃষ্টিতে সামনে খানিকটা গর্তের মতো জায়গায় এক হাঁটু জল এবং কাদা জমিয়াছে। মণিমোহন রবারের জুতাজোড়া খুলিয়া হাতে লইল, তারপর কোঁচার কাপড় হাঁটু অবধি তুলিয়া ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া সেই জল-কাদাটা ডিঙাইয়া সোজা পোস্টাপিসে আসিয়া উঠিল।

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহা তখন এক হাতে হুঁকা লইয়া উবু হইয়া বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিলেন। সকালের ডাক আসিয়াছে। মেজের উপর একরাশ চিঠিপত্র চারিদিকে ছড়ানো—পিয়ন কেরামদ্দি সেগুলি বাছিতেছিল আর পোস্টমাস্টার একটু দূরে বসিয়া রেজেষ্ট্রি, বেয়ারিং ও মণি-অর্ডারগুলি আলাদা করিয়া লইতেছিলেন।

মণিমোহন জানালা দিয়া উদ্‌গ্রীব ও উদ্বিগ্ন চোখে চিঠি বাছাই দেখিতে লাগিল। একরাশ লম্বা সরকারী খাম একপাশে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—ওগুলি নিশ্চয়ই খাস-মহল অফিসের চিঠি। মণিমোহন ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নামে কোন পার্সনাল চিঠি এসেছে, মাস্টারমশাই ?

চোখ তুলিয়া চাহিয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, পার্সনাল চিঠি ? আপনার নামে ? কই, চোখে তো পড়ল না। একবার ভাল করে দেখে দাও দিকি কেরামদ্দি।

দু'হাতে চিঠির স্তূপগুলি ছড়াইয়া দিয়া কেরামদ্দি বলিল, না বাবু, নেই। যোগেশবাবুর নামে পোস্টকার্ড এসেছে খালি একখানা।

—নেই ? মণিমোহন মুহূর্তে বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আজ প্রায় সাতদিন ধরিয়া তাহার চিঠি আসিতেছে না। মাঝে একবার সে তিন-চার দিনের মতো আদায়ে বাহির হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল আসিয়া অন্তত চিঠিখানা সে পাইবেই ; কিন্তু আজও চিঠি আসিল না।

পশ্চিমবঙ্গের ছেলে। ওপারে বর্ধমান মেদিনীপুর, আর এপারে রাণাঘাট—ইহার বাহিরে আর কোনদিন পা বাড়ায় নাই। চলিতে চলিতে দেখিয়াছে রেল লাইনের দু'-

পাশে মাঠ—ঘন সবুজ শস্যের ঐশ্বর্যে দিক দিগন্তে রঙের সমুদ্রের মতো দুলিয়া উঠিতেছে। উঁচু বাঁধের পাশে পাশে কল্‌মি শাকে ঢাকা টুক্‌রা টুক্‌রা চিক্‌চিকে জল—দু'দিকের প্রসারিত উদার সমতলের বুকে বিস্ময়ের মতো নিঃসঙ্গ বা শ্রেণীবদ্ধ তালের গাছ; আমের বাগানে ঘেরা বাঁশবনের ছায়ায় চাষাদের গ্রাম—পাকুড় প্যাসেঞ্জার, গয়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বা নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে বসিয়া সেগুলিকে নিতান্তই কাব্যময় ও স্বপ্নময় বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আরো অনেকের সঙ্গে এক ঝাঁকে বি এস্-সি পাশ করিয়া মণিমোহন আদাম্লুন খাইয়া জীবন সংগ্রামে ভিড়িয়া গেল। অবশ্য বাঙালীর জীবন সংগ্রাম বলিতে যা বুঝায় ঠিক তাই। সংগ্রামটা যে কাহার সঙ্গে করিতে হইবে আজ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিত করিয়া বলা গেল না। এ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—সফলতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই—বাঁচিয়া থাকার একান্ত শক্তিহীন প্রয়াস: নো ভ্যাকান্সি, অবিশ্রান্তভাবে জুতার তলা ক্ষয় করিয়া চলা, স্তূপাকার দরখাস্ত, ফুটপাথের পাশে খড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা জ্যোতিষীদের দিয়া হাত দেখানো, নবগ্রহ-কবচ এবং কখনো কখনো এক-একটা টাকা খরচ করিয়া এক-একখানা রেঞ্জার্সের টিকেট্।

কিন্তু আর কিছু না যাক, অন্তত একটা ব্যবসা এখন পর্যন্ত খোলা আছেই। ব্যবসা না বলিয়া বরং লটারী বলিলে অর্থটা পরিষ্কার হয়। ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী নয় বটে, কিন্তু লোভ, লাভ এবং লভ্ এখানেই যা হোক খানিকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যায়।

অতএব চাকুরি জুটিবার আগেই মণিমোহন বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রীভাগ্যে ধন"—এবং এই সার্থক উক্তিটি প্রমাণ করিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এই সুদূরতম প্রান্তে মণিমোহনের চাকুরি লাভ ঘটিল।

এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটা রূপ আছে। সে-রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না—দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করালজিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে—গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতঙ্কে থর থর করিয়া দুলিতে থাকে।

কিন্তু এই রাক্ষস-মূর্তির যে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত সৌন্দর্য, তাহাকে উপভোগ বা অনুভব করিবার মত দৃষ্টি বা অনুভূতি আজও এই মণিমোহনদের আসে নাই। যেদিন আসিবে, সেদিন হয়তো জীবন-সংগ্রাম কথাটার সমস্ত অর্থটাই যাইবে বদলাইয়া। আগুন-মুখার ষোলো মাইল পাড়ির মুখে আকাশ ঘিরিয়া কালো মৃত্যুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হয়তো সত্যকারের জীবন সংগ্রামের ইঙ্গিতটাকে খুঁজিয়া পাইবে। হয়তো দেখা যাইবে কে আসিয়া বৈশাখী বিপ্লবের সর্বনাশী মুখোশটাকে এক টানে খুলিয়া ফেলিল; তাহার

পশ্চাতে এক নবীন রূপ আসিয়া উঁকি মারিতেছে—বজ্রের প্রখর আলোকে তাহার মাথার স্বর্ণ-মুকুট জ্বলিতেছে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া।

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহা কিন্তু আতিথেয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন না ভেতরে, একটান তামাক খেয়ে যাবেন।

মণিমোহন আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করিল না। ভিতরে ঢুকিয়া সে কাঠের একখানা টুল টানিয়া লইয়া বসিল ; তারপর পোস্টমাস্টারের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া কহিল, চিঠি কেন এল না বলুন দেখি ?

পোস্টমাস্টার রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, গিন্নীর চিঠি বুঝি ? তা ভয় নেই মশায়, আমরা লুকিয়ে রাখিনি। বয়েস গেছে, বুঝলেন না ?

মণিমোহন হাসিল, না হাসিটা এ ক্ষেত্রে অশোভন। তবুও হাসিটা তাহার তেমন দানা বাঁধিল না।

পোস্টমাস্টার মণিমোহনের মুখভাবটা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ও গভীর হইয়া উঠিলেন। লোকটা হাঁপানির রোগী। বুকের হাড়গুলি কালো চামড়ার তলায় জিল্‌জিল্ করে—সেই কারণে চামড়াটাকে মাঝে মাঝে অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখায়। গলায় কালো সুতোর সঙ্গে শাদা একটা কড়ি বাঁধা, ডান হাতে রূপার তারের মধ্যে নানা আকারের একরাশ তামার কবচ।

যতক্ষণ তিনি হাসেন, কালো মুখটা তবু একরকম দেখায় ; কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মানুষের ভয় করে। মনে হয় বহু দিনের কাল-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া বর্তমানের ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে লোকটা। এই সাগরের উপর দিয়া যে সব ঝড় বহিয়া গেছে—তাহাদের ঝাপ্‌টা তাহাতে একেবারেই এড়াইয়া যায় নাই। কপালের কুঞ্চিত রেখা-সমষ্টিতে, বুকের জিরজিরে হাড়গুলিতে আর কাঁধের উপরকার প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্নে অনেক ইতিহাস অব্যক্ত হইয়া আছে।

পোস্টমাস্টার বলিলেন, এখন তো তবু দু'তিন দিন অন্তর চিঠি-পত্তর আসে, আর একটা মাস গেলে হয়তো দশ-বারো দিন, চাই কি পুরো এক মাসই ডাক বন্ধ থাকবে।

মণিমোহন ভীত হইয়া কহিল, কেন ?

—ডাক আসবে কী করে বলুন ? নদীর অবস্থা তো দেখছেন। একবার ক্ষেপে উঠলে কারও সাহস আছে, না সাধ্য আছে, এর ভেতর নৌকো ভাসায় ? এক পারে কিছু কিছু মগেরা, কিন্তু ও ব্যাটাদের বিশ্বাস কী বলুন ? গলা কেটে মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিলে তো মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই।

মণিমোহন হুঁকোটা নামাইয়া বলিল, কিন্তু আমি তো ভাবছিলুম চৈত্র মাসে একবার

কিছুদিনের ছুটি নিয়ে—

—দেশে যাবেন, এই তো? কিন্তু সে গুড়ে বালি মশাই, সে গুড়ে বালি। এ তো আর আপনার দেশ নয় যে মর্জিমাফিক এক সময় রেলগাড়িতে চেপে বসলেই গড়গড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে ভগবানের মর্জির ওপরেই নির্ভর করে থাকতে হয়। তার উপর মাঝিই পাবেন না বোধ হয়। বেশ কিছু টাকা কবলিয়ে যদি বা একখানা নৌকো জোটাতে পারেন, কিন্তু তাতে চড়ে পাড়ি জমানো আপনাদের মতো মানুষের কাজ নয়।

মণিমোহন আরো বিবর্ণ হইয়া কহিল, কেন নৌকো ডুব্‌বে নাকি?

—তা কি আর সব সময়ে ডোবে? এ দেশের মাঝিরা অমন কাঁচা নয়। নৌকা ডুব্‌বার লক্ষণ দেখলে তারা পাড়িই ধরবে না।

—তা হলে আর ভয়টা কিসের?

—সেই তো বলছিলুম। জাহাজে চেপে সমুদ্দুরে পাড়ি দিয়েছেন কখনো?

—না তো।

—ব্যাপারটা বুঝবেন না তবে। সমুদ্রের রোলিং জানেন তো? বেশি দূর যেতে হবে না, ববিশাল থেকে চাটগাঁর স্টিমারে একটিবার ঘুরে এলেই টের পাবেন। এ হচ্ছে সেই জিনিস—যার অনিবার্য ফল হচ্ছে সী-সিক্‌নেস্‌ এবং একমাত্র ওষুধ হচ্ছে লেবুর আরক; কিন্তু নোয়াখালির মাঝিদের নৌকোয় তো আর চামড়ার কৌচ কিংবা লেবুর আরক পাবেন না।

মণিমোহন বিস্ফারিত চোখে বলিল, নদীতেও কি সে-রকম রোলিং হয় নাকি?

—হয় না? আর নদীই বা আপনি কোথায় দেখছেন মশাই! নদী আর সমুদ্দুরে কি এখানে কোন তফাৎ আছে? জল একবার মুখে দিয়ে দেখবেন, মেসিনের সাহায্যে চেষ্টা করলে এ দিয়ে লবণ তৈরি করা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ আর চর ইস্‌মাইল, আসলে এরা পুরাপুরি এক জাতের—বুঝেছেন? শ্রাবণ-ভাদ্দরের আগে এ রোলিং আর থামবে না। এসেছেন তো ঠাণ্ডা সময়ে।

—আপনি এই রোলিঙের ভেতর পাড়ি দিয়েছেন কোনোবার?

পোস্টমাস্টার নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখের উপর দিয়া মেঘের মতো কালো একটা ছায়া যেন বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার কোটরে-বসা চোখ দুইটা যেন অনেক দিনের ঘুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। বহুদিনের মহাকাল-সমুদ্র পার হইয়া স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া যেন মণিমোহনের সামনে অপরিচিতের মতো আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

—দিইনি আবার? বছর পনেরো আগে সে অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিল।

তারপর থেকেই এইসব সীজনে নদী পাড়ি দেবার দুঃসাহস আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমিও ঢাকা জেলার ছেলে মশাই, পদ্মা নদীর সঙ্গে সঙ্গেই মিলে মিশে বেড়ে উঠেছি, জলের ভয়টাকে তেমন বিশেষ করিও না ; কিন্তু সেবারের সে ব্যাপারে আমারও বুকটা দশ হাত দমে গেছে।

তা হলে ঘটনাটা বলি শুনুন। আমি তখন রণপুরায় ছিলুম। সে জায়গাটাও ঠিক এই রকম—একেবারে নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশ যাকে বলে। বাড়তির মধ্যে সেখানে এক-রকম কুকুর পাওয়া যায়—সমস্ত বাংলা দেশে সে কুকুরের জোড়া নেই। পর্তুগীজেরা এনেছিল। নেকড়ে আর বন-কুত্তোর ব্রিডিং, বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর, গ্রেহাউণ্ডের চাইতেও বিশ্বাসী। এরই একজোড়া কুকুর আমি সেবারে কিনেছিলুম।

চৈত্রের শেষ—বুঝতেই তো পারেন সময়টা কেমন। অর্থাৎ কথায় কথায় যখন কাল-বোশেখী ঘনিয়ে আসে, ঠিক সেই সব দিন। বহু কষ্টে একখানা নৌকা যোগাড় করে দুর্গা বলে এক সকালে ভেসে পড়লুম। সঙ্গে সেই কুকুরজোড়া।

পান্‌সী চলতে লাগল। নদীতে অল্প অল্প বাতাস—প্রথমটা তো ভালোই লাগছিল, ভাবলুম, এমনিই চলবে, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

কিন্তু মশাই, কলির সন্ধ্যে তখনো আসেনি। এল যখন, আমরা ডাঙা ছাড়িয়ে তখন প্রায় মাইল চারেক এসে পড়েছি। নৌকো ঘন ঘন দুলতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, গা বমি-বমি করতে লাগল, তারপর চোখ বুজে নৌকোর খোলের ভেতর সোজা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়লুম।

না, ঝড় আসেনি। আকাশের কোনো প্রান্তেও দেখা দেয়নি এক-টুকরো কালো কিংবা সোনামুখী মেঘ ; কিন্তু অথই অন্তহীন নদীর বুক থেকে হু হু করে বাতাস উঠে এল—একটু মলয়-পবন বলা যেতে পারে। সে বাতাসের তালে ফুলে উঠল অসংখ্য ঢেউ—আর নৌকোটা একবার শাঁ করে ঠেলে আকাশে, আর একবার সোজা পাতালে নেমে যেতে লাগল।

দুদিনের পাড়ি ; কিন্তু পুরো দেড়দিন আমার একরকম জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। নৌকো ডুববে কি ডুববে না সে ভাবনা ভাববার সময় ছিল না, কেবল থেকে থেকে অস্পষ্ট ভাবে এই চেতনাটাই মাথার ভেতর ঘা মারছিল যে এই দুলুনির চোটেই আমার সোজা স্বর্গলাভ ঘটবে। বড় বড় জাহাজের ওপর চেপেও মানুষ যার ধাক্কায় হিমসিম খেয়ে যায় মশাই, একটুকু একখানা পান্‌সীর ভেতর তার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় না বললেও সেটা টের পাচ্ছেন আশা করি।

সেই বাঘা-কুকুরদের একটাকে তো নদীর মধ্যেই ফেলে দিতে হয়েছিল, আর একটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঙায় এসে যখন পৌছলুম, তখন তারও জীবনী-শক্তি একেবারে নিঃশেষ

হয়ে গেছে। কোনোমতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলুম, কিন্তু বাঁচল না, দু'তিন দিন পরেই মরে গেল। আর আমি-? সে-ধকল সামলাতে পুরো দশটি দিন বিছানাসই হয়ে থাকতে হয়েছিল, বুঝেছেন!

পোস্টমাস্টার কাহিনী শেষ করিলেন।

মণিমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া অবস্থাটা কল্পনা করিতে লাগিল। বলিবার ক্ষমতা আছে পোস্টমাস্টারের। চোখ মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোড়ন পর্যন্ত তাঁহার বর্ণনাটাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে কোন ঘটনাকেই বিশ্বাস করাইয়া দেওয়ার একটা অদ্ভুত প্রতিভা তাঁহার আছে—তাই বহুক্ষণ ধরিয়া মণিমোহনের মনের সামনে দিগন্তব্যাপী বিরাট নদীর রোসিঙের দৃশ্যটা যেন ছবির মতো ভাসিতে লাগিল।

খানিক পরে বড় করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল সে। বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিটা মেলিয়া দিয়া বলিল, কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আদায় করতে। ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরি হবে। এর ভেতর পিয়ন পাঠিয়ে খবর নেব—চিঠি এলে তার হাতে দিয়ে দেবেন।

পোস্টমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা; কিন্তু এবার কোন্ দিকে বেরোবেন?

—ভাবছি, কালুপাড়ার দিকে নামব। অনেক টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে—তা ছাড়া —টি-এ বিলটাও বেশ—বুঝলেন না?

পোস্টমাস্টার মৃদু হাসিলেন। তা আর বুঝি নে মশাই? ওই করেই তো ইংরেজ রাজত্ব চলছে।

আজ্ঞে হাঁ—মণিমোহন হাসিয়া বিদায় লইল।

দুই

নদীর ধার দিয়াই বেলে-মাটির পথ। পূর্ণিমার জোয়ারে জল তীরের অনেকখানি অবধি ছাপাইয়া গিয়াছিল, তাই পথের উপরে একরাশ এঁটেল মাটি জমিয়া গিয়াছে। রবারের জুতাটাকে অত্যন্ত চাপিয়া চাপিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। বেশ ছাপ পড়িতেছে কাদায়। চরকা মার্কা জুতা। সস্তা, টেঁকেও অনেকদিন।

এপাশে নদী। বসন্তের ছোঁয়ায় জলের ঘোলাটে বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে অনেকটা। পরপারহীন অসীম জলের বুকে যতটা চোখ যায় অসংখ্য জেলে-নৌকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিয়া উঠিতেছে। এ বৎসর ইলিশ-মাছ পড়িতেছে বেশ। দু'পয়সা করিয়া এক-একটা বড় বড় মাছ বিক্রয় হয়। পশ্চিমবঙ্গের ছেলের কাছে ইহা পরম বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

ওই যে—শাদা বড় নৌকাটা আবার আসিয়াছে।

মাসে একবার করিয়া নৌকাখানা এই বন্দরে আসিয়া ভেড়ে। নৌকাখানা বর্মিদের। তাহারা এখানে নাকি ব্যবসা করিতে আসে। কখনো কিছু সুপারি কেনে, কখনো ধান, কখনো বা নারিকেল। আকিয়াবে নাকি তাহাদের কারবার আছে।

দুইজন বর্মি এ পাশে বসিয়া নিজেদের মধ্যে কী আলোচনা করিতেছে, একজন একটা স্টোভ ধরাইতেছে; আর একজন নৌকার ছৈয়ের উপর বসিয়া চোখ বুজিয়া একটা লম্বা চুরুট টানিতেছে। চরের উপর দুইটা মস্ত মস্ত লোহার নোঙর—জোয়ারের জল আসিয়া নৌকাটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে তাহারই ব্যবস্থা।

বেশ আছে ওরা। বাঁচিতে হয় তো ওদের মতো করিয়াই। সুদূর বর্মা—মেঘের মতো মাথা তুলিয়া পাহাড়, তাহার কারুকার্য-খচিত গুহাগর্ভে অপূর্ব ভাস্কর্য; উপত্যকা ভরিয়া নানা রঙের ফুল যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। ধূপের ধোঁয়া—ফুলের গন্ধ, রেশমী ঘাগরা পরা চূড়া-বাঁধা মেয়ের দল। প্যাগোডার উদ্ধত শিরে সোনার দীপ্তি ঝল্‌মল্ করিতেছে। সমুদ্রের নীল জল পান করিয়া ইরাবতী যেন নীলকণ্ঠ।

সেই দেশ হইতে ওরা আসিয়াছে। পাহাড়, নদী, সমুদ্র ডিঙাইয়া। ঘরের টান এই সাত সমুদ্র তের নদীর পারেও ওদের বিচলিত করিয়া তোলে না। আর এই ছয়টি মাস মাত্র সে পশ্চিমবঙ্গ হইতে নিম্নবঙ্গে আসিয়াছে, অথচ ইহারি মধ্যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের ধানক্ষেত থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

তা যে যাই করুক, এখানে সব চাইতে ফলাও ব্যবসা লইয়া বসিয়াছেন, কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

ভদ্রলোক বলিলে বাংলাদেশের যে বিশেষ সম্প্রদায়টি বোঝায়, তাহাদের সংখ্যা এখানে নাই বলিলেই চলে। এক আছেন পোস্টমাস্টার—তিনি একাই বেশ আসর জমাইয়া নিতে পারেন। খাসমহলের কর্মচারীদের দু'একজন মাঝে মাঝে আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি মণিমোহন আসিয়াছে, কলেকসনের ফাঁকে ফাঁকে টাকা জমা দিতে আসিলে সেও কখনো কখনো এখানকার তাসের আড্ডায় আসিয়া যোগ দেয়।

আতিথেয়তার ব্যাপারে বলরামের তুলনা নাই।

খাটো চেহারার দোহারা গোছের লোকটি, মোটামুটি সুপুরুষ বলা চলে। ঠিক চাঁদির উপরে খানিকটা জায়গা লইয়া চুল পাতলা হইয়া আসিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যেই টাক পড়িবে বোধ হয়। মুখখানা গোলগাল—বেশ খানিকটা পরিতৃপ্ত আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তাসের সঙ্গী কোনো বন্ধুবান্ধবকে দেখিলেই সে পরিতৃপ্তিটা যেন বন্যার

মত উচ্ছল হইয়া ওঠে, মাথার অপরিস্ফুট টাকটিও যেন আনন্দে জলজল করিতে থাকে।

ডাকিয়া বলেন, ওরে তামাক দে।

গড়গড়ায় করিয়া তামাক আসে। উগ্র মধুর গন্ধে ভরিয়া যায় ঘরটা। ফণীর নলটা আগন্তুকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলরাম ময়লা বালিশটার তলা হইতে এক প্যাকেট তাস বাহির করেন। চটকদার তাস—উপরে অনাবৃতা বিদেশী নারীমূর্তি।

সজোরে তাস জোড়াকে ভাঁজিয়া বলরাম বলেন, আসুন, হয়ে যাক একবাজি। কি খেলবেন, ব্রীজ? ওঃ, আপনি তো আর ব্রীজ জানেন না, তা হলে ব্রে-ই হোক।

তিন বাজি ব্রে হইতে তিনবারই হয়তো তামাক আসিয়া যাইবে।

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম আয়োজন হয়। যেদিন বেশি রাত্রে খেলাটা বেশ করিয়া জমিয়া যায়, সেদিন কবিরাজমশাই মদনানন্দ মোদকের বৌটাটি নামাইয়া আনেন। সে অমৃত এক এক দলা পেটে পড়িলে আর কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না—এই চর ইস্‌মাইলকেও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কবিরাজের যে হাতযশ আছে সেটা মানিতেই হইবে।

এ হেন মানুষ বলরাম। এই পাণ্ডব-বর্জিত নদীর চরে তিনি একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। রোগীর জন্য এমন উৎকণ্ঠার কিছু নাই। চরে যথেষ্ট জমি আছে, নোনা জলের পুকুর আছে, সুপারির বাগান আছে, প্রায় পঞ্চাশটি মহিষ আছে—একরকম ছোটখাটো জমিদার বলিলেই চলে। সুতরাং কবিরাজীটা তাঁহার পেশা নয়—নেশাই বলিতে হয়।

নদীর ধার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মণিমোহন ভিষক্‌রত্নের আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু অন্যদিনের মতো ভিষক্‌রত্নকে আজ বাহিরের ঘরে পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বোঝা গেল, কবিরাজ কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মণিমোহন বিস্ময় বোধ করিল। কবিরাজ যে এখানে নারীসঙ্গহীন নিরাত্মীয় দিন কাটাইতেছে, এই কথাই সকলে জানে। সুদূর ফরিদপুর অঞ্চলে তাহার দেশ—আজ দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছে। সুতরাং কোথা হইতে আবার একটি স্ত্রীলোক জোটাইয়া আনিল সে?

ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়া মণিমোহন আশে-পাশে আরো কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল। ওদিকে বারান্দায় তারের উপর দু'খানা শাড়ি শুকাইতেছে। অন্দর ও বাহিরের ঘরটির মাঝখানকার অবারিত দ্বারটির উপরে পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে একটা। তামাক-সরবরাহকারী সদাপ্রস্তুত ভৃত্য রাধানাথকেও দেখিতে পাওয়া

গেল না—সম্ভবত তাহাকে কোনো কাজে পাঠানো হইয়াছে।

মণিমোহন একটা গলা খাঁকারি দিয়া ডাকিল, মণ্ডলমশাই!

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলরাম বলিলেন, কে? বসুন, আসছি।

মণিমোহন ফরাসের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ালের গায়ে একটা ওয়াল-ক্লক অশ্রান্তভাবে টক্ টক্ করিতেছে, পেণ্ডুলামের উপরকার ফাটা-কাচের উপর এক খণ্ড কাগজ আঁটা—তাহাতে লেখা: "বুধবার"। অর্থাৎ বুধবারে দম দিতে হইবে। তিন-চারখানা ক্যালেণ্ডার—তাহাদের দুখানা গত বৎসরের। একখানা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ, কালের ছোঁয়াচ লাগিয়া প্রায় ফেড্ করিয়া আসিয়াছে। দু'খানা বড় বড় চীনা ছবি—কিছুদিন আগে শহর হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। একখানি যুদ্ধের ছবি—ট্রেঞ্চ্‌ফাইটিং হইতেছে, এরোপ্লেন বোমা ফেলিতেছে, ট্যাঙ্কগুলি পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে। আর একখানা আদিরসাশ্রিত—একটি মেয়ে বেশবাস অসম্বৃত করিয়া অশোভন-ভঙ্গিতে বসিয়া।

একটু দেরি করিয়াই কবিরাজ বাহিরে আসিলেন। সাধারণত, তাঁহার আতিথেয়তার পক্ষে ইহা ব্যতিক্রম। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এত দেরি করিয়া তিনি কখনো তাহাদের অভ্যর্থনা করেন না।

বাহিরে আসিয়া কবিরাজ একগাল হাসিলেন।

—এই যে আপনি! কবে এলেন?

—কাল।

—বেশ, বেশ, ভালো ছিলেন তো? আজকাল আবার যে-রকম নোনার হিড়িক, প্রায়ই আমাশা-টামাশা হচ্ছে। পথে-ঘাটে ঘুরতে হয়, একটু সাবধান থাকবেন আর কি।

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ। এবার ভাবছি আপনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ-পত্তর নিয়ে যাব।

—তা যাবেন। ভাস্কর-লবণ আর কৃষ্ণ-চতুর্মুখ, পেটের অবস্থা পরিষ্কার রাখতে ওর আর জুড়ি নেই—বুঝলেন না?

—বেশ তো, দেবেন ওষুধ দুটো।

কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকেই মণিমোহন লক্ষ্য করিতেছিল, কেমন যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ। বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণত যে-ভাবে সে খুশি হইয়া উঠিত, আজ যেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যেন তাহার উপস্থিতিটা বলরামের কাছে তেমন প্রীতিকর ঠেকিতেছে না। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে মণিমোহন দেখিল, ইহার মধ্যে বলরাম একবারও তামাক আনিতে আদেশ দিল না, অথবা তাকিয়ার তলা হইতে তাসজোড়া বাহির করিয়া একবারও বলিল না, হবে নাকি এক বাজি ব্রে! আসুন না।

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করিতে হইল মণিমোহনকেই।

—বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি ? কোনো আত্মীয় ?

বলরাম খানিকটা হাসিলেন—তবে হাসিটা যেন একটু অপ্রতিভ ঠেকিল। বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—অনেকটা তাই বই কি। হাত পুড়িয়ে আর রেঁধে খাওয়া যায় না, তাই গ্রামের একটি পরিচিত মেয়েকে নিয়ে এসেছি কিছুদিনের জন্যে—অন্তত দেখাশোনাটা তো করতে পারবে।

কোথা হইতে এক বোঝা পুঁই শাক আনিয়া রাধানাথ ঝুপ করিয়া ভিষক্‌রত্নের সম্মুখে ফেলিল। ঘোষণা করিল, চিংড়ি মাছ পাওয়া গেল না বাবু।

—পাওয়া গেল না ? কেন পাওয়া গেল না শুনি ? সকাল থেকে বার বার ক'রে বলছি, বাবুর আর বেরোতে সময়ই হয় না। চিংড়ি মাছ পাসনি তো ও জঙ্গলগুলো এনে হাজির করেছিস কী জন্য ? দূর ক'রে টেনে ফেলে দে সব।

রাধানাথ কহিল, না পাওয়া গেলে কী করব বাবু ? জেলেরাই পায় না, জল থেকে মাছগুলো কি আমার হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে আসবে নাকি ?

—যা যা হয়েছে, আর তকরার করিসনি। এগুলো ভেতরে নিয়ে যা। এতটুকু উপকার নেই, তক্কের বেলায় চওড়া চওড়া কথা।

রাধানাথ বিড়বিড় করিতে করিতে শাকের বোঝাটা তুলিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া বলরাম বলিলেন, দেখছেন তো ব্যাপারটা। মেয়েটা ভালোবাসে পুঁই চিংড়ি, কাল থেকে বলছি—তা আজ এসে বলছে মাছ পাওয়া গেল না। দূর ক'রে দেব হতভাগা অকর্মাকে।

মণিমোহন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল, আচ্ছা, এখন উঠি কবিরাজ মশাই।

কবিরাজ অসংকোচেই কহিলেন, আসুন, মাঝে মাঝে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আর কি। তা ছাড়া কৃষ্ণ-চতুর্মুখ আর ভাস্কর-লবণ—

—বিকেলে নিয়ে যাব'খন,—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মণিমোহনের মনে বলরামের পরিবর্তনের কথাটা বিশেষ করিয়া বাজিতে লাগিল। এতদিন এই চরের নির্বাসনে বসিয়া যে নিঃসঙ্গ নিরাত্মীয় জীবন কবিরাজকে যাপন করিতে হইয়াছে, সে জীবনটাকে সে সামাজিকতা দিয়াই পূর্ণ করিয়া নিতে চাহিয়াছিল। তাই তাম্রকূট বিতরণে তাহার কৃপণতা ছিল না, সুযোগ এবং সময় পাইলেই একজোড়া তাস ভাঁজিয়া লইয়া খেলিতে বসিতে তাহার বাধে নাই। বাহিরের জগৎটাকেই সংসারে পরিবর্তিত করিয়া বেশ সুখী এবং পরিতৃপ্ত হইয়া ছিল সে।

কিন্তু সামাজিকতারও একটা সীমা আছে মানুষের। প্রয়োজনের বাহিরে নিজেকে

দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে হয় তাহাকে। সেই মুহূর্তে নিজের বহুল প্রসারিত সত্তাটাকে তাহার সংকুচিত করিয়া আনিতে হয়, একটি কেন্দ্র-বিন্দুর চারিদিকে নিজেকে ঘন করিয়া সে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বহুদিনের অতিরিক্ত আত্ম-প্রসারের ক্লান্তি তাই আজ নবাগতার সীমানাতে আসিয়াই বিশ্রাম খুঁজিতেছে। সেই কারণে মেয়েটির প্রতি তাঁর মনোযোগ যে একটু বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়বোধ করিবার কিছু নাই।

আজ স্ত্রীর কথা খুব বেশি করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে। ছয় মাস হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে—একবারও এমন একটু ছুটি পাইল না যে বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসে। তা ছাড়া একটু আগেই হরিদাসের কাছে যা শুনিয়াছে, তাহাতে আরো কিছুদিনের মধ্যেও যাওয়াটা ঘটিয়া উঠিবে কিনা অনুমান করা কঠিন।

চিঠি আসিতেছে না। বাড়িতে কি হইয়াছে কে জানে। এই দূর বিদেশে বসিয়া মনে উৎকণ্ঠা পোষণ করা ছাড়া কিছুই আর করিবার নাই। কয়েকটা টাকার জন্য এভাবে আত্মপীড়ন করার কোনো অর্থ হয় না। আর এক মাস দেখিয়া না হয় চাকরিই ছাড়িয়া দিবে সে। বি এস্-সি তো পাশ করিয়াছে—কিছু-না-কিছু একটা জুটিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই যে—সামনেই কাছারী। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুপুরের মধ্যে কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া নিতে হইবে—না হইলে বিকালে রওনা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। বসিয়া দুটি দিন বিশ্রাম করারও জো নাই—এ মাসের মধ্যে তাহাকে দশ হাজার টাকার কলেক্‌শন দেখাইতে হইবেই।

মুরগী-চুরির ব্যাপারটা ডি-সুজা এত সহজেই ভুলিতে পারিতেছিল না। খাসা বড় মুরগীটা—অন্তত আড়াই সের মাংস যে হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নধর পরি-পূর্ণ শরীরে লালকালো পালকগুলি রোদ লাগিয়া যেন চিকচিক করিয়া দীপ্তি পাইত—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত ডি-সুজা। ধবধবে শাদা যে বড় মুরগাটা অন্যান্য মোরগদের একান্ত লোভের বস্তু ছিল, বিপুল বাহুবলে সেই সর্বজন-প্রিয়াকে সে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। নারী বীরভোগ্যা, তাহার গর্বিত আচরণে এ সত্যটা সব সময়ে প্রকাশ পাইত।

রুখিয়া যখন দাঁড়াইত—তখন একটা দেখিবার মতো বস্তু হইত সেটা। ময়ূর-কণ্ঠী রঙের দীর্ঘ লেজের গুচ্ছটি বিস্তৃত হইয়া জাপানী পাখার মতো ছড়াইয়া পড়িত—গলার পালকগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বুকের সঙ্গে মিশিয়া যাইত, মাথায় চূড়ার লাল রঙ যেন আগুনের মতো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সকাল বেলায় যখন বাড়ির প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করিত, তখন কাহার সাধ্য ঘুমাইয়া থাকিবে! সে-তীক্ষ্ণ

তীব্র চিৎকারে বাড়িসুদ্ধ সবাই তো জাগিয়া উঠিতই—দু'মাইল দূর পর্যন্ত সে-শব্দ ভাসিয়া যাইত।

ডি-সুজা সুতরাং আক্ষেপ করিতেছিল।

লিসি বলিল, তোমার হ'ল কি ঠাকুর্দা? একটা মুরগীর শোকে কি আজ সারাদিন মুখ থুবড়ো ক'রে ব'সে থাকবে?

—একটা—একটা মুরগী! একে তুই এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চাস? এ রকম মোরগ যে দশটার সমান। ক'জনের এমন মোরগ আছে খোঁজ ক'রে ছাখ্ দিকি। তা ছাড়া ক'দিন বাদে গঞ্জালেস্ আসবে, ভেবেছিলুম, তখন ওটাকে কাজে লাগাব, তা আর—

রোষে অভিমানে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ডি-সুজার।

লিসি কহিল, তাই বলে তুমি জোহানের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন?

জ্বলিয়া উঠিল ডি-সুজা।

—জোহান! ওকে তুই বুঝি নিরীহ ভালো মানুষটি ভেবেছিস, তাই না? আমি ক'দিন থেকেই দেখছি মোরগটার দিকে ও প্রায়ই আড়চোখে তাকায়। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

লিসি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ও মুরগীটার দিকে যে একবার তাকাত, তার ওপরেই তো তোমার সন্দেহ হ'ত ঠাকুর্দা। তার চেয়ে এ বরং ভালোই হয়েছে—এখন অন্তত রাত্রিতে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

ডি-সুজা বলিল, হয়েছে, থাম্ থাম্। আজকাল দেখছি, জোহান ছোঁড়াটার ওপর তোর মন ফিরেছে। খবর্দার বলছি, ওকে কক্ষনো আমার বাড়িতে ঢুকতে দিবি নে। ঢুকলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব—এই বলে রাখলুম।

মুহূর্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল লিসির মুখ। পর্তুগীজের মেয়ে—কিন্তু ভিতরে খানিকটা মগের রক্ত আছে বলিয়াই নাকটা একটু খর্বাকার এবং ভ্রূরেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। সবটা মিলিয়া কেমন একটা অপরিচিত বৈশিষ্ট্য আছে সে মুখে। তাই সে রাগ করিলে কেন যেন ডি-সুজার মতো অসংযমী মানুষও ভয় পাইয়া যায়।

লিসি বড় বড় পা ফেলিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল এবং ডি-সুজা খানিকক্ষণ রহিল একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া। বাস্তবিক, এ সত্যটা তাহার কাছে আর চাপা নাই যে লিসির আকর্ষণটা জোহানের দিকে ক্রমশই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সময় অসময়ে জোহান এ বাড়িতে আসিয়া জাঁকাইয়া বসে, পান চিবায় এবং আরো কতটা যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ডি-সুজা অনুমান করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সে যখন বাড়িতে আসে, হয়তো দেখে জোহান লিসির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া অত্যন্ত বেশি পরিমাণে হাসিতেছে; দেখিয়া ডি-সুজার মনের শেষ প্রান্তটা অবধি জ্বলিয়া যায়

যেন। তবু কিছু বলিবার জো নাই। জোহান ছোটবেলা হইতেই এ বাড়িতে আসে যায়, লিসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। তা ছাড়া লিসির চ্যাপ্টা নাক এবং বিরল ভ্রূর উপর দিয়া যখন ক্রোধের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে, তখন ডি-সুজা কেন যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত বোধ করিতে থাকে।

তবু নিতান্ত মনের জ্বালাতেই সে লিসির মুখের উপর এতবড় কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। একেই তো মুরগীটা খোয়া যাইবার ফলে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর জোহানের প্রতি লিসির এই পক্ষপাতের মতো অসহ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। পাত্র হিসাবে জোহান নিতান্ত অযোগ্য নয়, কিন্তু দিনের পর দিন যে সে অধিকার বিস্তার করিয়া ডি-সুজার মন হইতে লিসিকে ছিনাইয়া লইতেছে এ অপরাধ ক্ষমা করিবার নয়। বিশেষ করিয়া মুরগী চুরির সন্দেহটা সেই জন্যই জোহানের উপর তাহার বেশ করিয়া পড়িয়াছে।

বাইরের দরজায় কয়েকটা ঘা পড়িল।

ডি-সুজা বলিল, কে?

দরজার পথে একজন বর্মি মূর্তি দেখা দিল। ইহাদের বড় নৌকাটাই আজ সকালে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ডি-সুজা সুপারির কারবার করে, তাই সুপারির সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইবার জন্যই সে এখানে আসিয়াছে বোধ হয়।

চকিত হইয়া ডি-সুজা বলিল, তোমরা কখন এলে?

বর্মিটি হাসিল। পালিশ-করা তামার উপর চিত্রকরা মুখ, সে মুখে এতটুকু ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায় না। মনের অসংখ্য ওঠা-পড়া তাহার বাহিরের অবয়বে আসিয়া যেন একটি রেখাও আঁকিয়া দিতে পারে নাই। পাথরের একটা প্রতিমূর্তির উপর যেন একটুকরা যান্ত্রিক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, কাল সকালে।

ডি-সুজা চারিদিকে একবার তাকাইল। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়া বাহিরের কবাটটায় শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দিয়া বলিল, ভিতরে এসো।

দুইজনে ঘরে ঢুকিল। অত্যন্ত সাবধানে ডি-সুজা ঘরের সমস্ত দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল, আধা-অন্ধকারে ভরিয়া গেল ঘরটা। শুধু এক কোণে স্তূপাকার রাশীকৃত রসুন হইতে উগ্র খানিকটা গন্ধ উঠিয়া নিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেরোসিনের একটা ছোট ডিবা আনিয়া জ্বালিল ডি-সুজা। ঘরময় একটা বিচিত্র নীলাভ আলো ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার আভাতে বর্মির ঘষা তামায় তৈরি মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকম নৃশংস দেখাইতে লাগিল।

গলা নীচু করিয়া ডি-সুজা কহিল, তারপর, কী খবর?

বর্মিটি পেটের দিকে হাত চালাইয়া রেশমী লুঙ্গির মধ্য হইতে ভাঁজ করা একখানা চিঠি বাহির করিয়া ডি-সুজার হাতে দিল।

চিঠিটা পড়িয়া ডি-সুজা সেটাকে ডিবার শিখার মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল সেখানা। ছাইগুলিকে জুতা দিয়া বেশ করিয়া মাড়াইয়া ডি-সুজা কহিল, দশ সের?

বর্মিটি বলিল, হাঁ।

ফুঁ দিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিয়া ডি-সুজা বলিল, এবার আশে-পাশের অবস্থা গরম। একটু সাবধান হয়ে চালাতে হবে। শুনেছি, গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে।

বর্মিটি হাসিল। আধা-অন্ধকারে সে অনুভূতি-বর্জিত মুখখানা দেখা গেল না—কেবল সামনের সোনা-বাঁধানো দাঁতটা যেন একবার ঝিলিক দিয়া গেল।

বলিল, হুঁ, সে ভয় খুব আছে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে যে পুলিশ আসবে, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। তবে আর দু' মাস মাত্র সময়—এর ভেতরে যদি না আসে তো সাত-আট মাসের মধ্যে এ তল্লাটে আর ভিড়ব না।

ডি-সুজা কিন্তু বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পুলিস আসবে? তা হলে তো এখন থেকেই হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

—তা বই কি। সেই জন্যেই এটা রেখে দাও। দরকার মতো কাজে লাগাতে হবে। অন্ধকারের মধ্যেই এবার সে যাহা বাহির করিয়া আনিল, অস্পষ্টভাবে সেটাকে দেখিয়াই ডি-সুজা চমকিয়া উঠিল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ—অন্ধকারে সাদা ছোট নলটি চিকচিক করিতেছিল।

—হাঁ ভরাই আছে। একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো, ছটা ঘরের একটাও খরচ হয়নি। ধরা যদি পড়তেই হয়, তা হলে খালি খালি ধরা দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। দু'একজনকে মেরে—তবে তো।

তাহার নীরব হাসিটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি—কিন্তু মুখের কথার মতোই তাহা নিষ্ঠুর এবং অর্থপূর্ণ।

বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল ডি-সুজার। তবু হাত বাড়াইয়া সে অস্ত্রটা লইল, বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা হলে আমি চলি।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে। বাহিরে উঠানের উপরে একরাশ সুপারি ও নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়াছে—স্বাভাবিক অপেক্ষা আরো এক পোঁচ গভীর অন্ধকার। দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্র মনে হইল দরজার দিক হইতে কেউ

যেন চট্ করিয়া সরিয়া গেল।

দুইজনেই দাঁড়াইল থম্‌কিয়া। নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ হাতটাকে কোমরের কাছে লইয়া গিয়া বর্মিটি কঠিন স্বরে বলিল, কে গেল ?

দ্রুত গতিতে সাম্‌নে আগাইয়া গেল ডি-সুজা। সদর দরজাটা হাট করিয়া খোলা, বাহিরে হালকা অন্ধকারের বিস্তৃতি। তাহার মধ্যে কাহারও আভাস পাওয়া গেল না।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে মাংস ভাজার গন্ধ আসিতেছে।

ডি-সুজা ডাকিল, লিসি!

একটা ঝাঁজরী হাতে করিয়া লিসি বাহির হইয়া আসিল, বলিল, ডাকছ ?

—বাড়িতে কেউ এসেছিল ?

—না তো।

—সদর দরজা কে খুলে রেখেছে ?

লিসি অবিকৃত স্বরে বলিল, আমি। কেন কী হয়েছে ? তাহার জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বারান্দার লণ্ঠনটার অপরিচ্ছন্ন আলোয় নবাগতের মুখের উপর ঘুরিতেছিল।

ডি-সুজা চাপা গলায় বলিল, না, কিছু হয়নি।

বর্মিটির পাথরের মতো ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ দৃষ্টিটা একবারের জন্য লিসির সঙ্গে মিলিল মাত্র। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে একটা ভয়ের আকস্মিক চমক উঠিয়া লিসির সর্বাঙ্গে যেন শির্ শির্ করিয়া ছড়াইয়া গেল। মনে হইল, মুহূর্তের দৃষ্টিটাকেই একটা সন্ধানী আলোর মতো ফেলিয়া এই লোকটা তাহার ভিতরের অনেকখানিই দেখিয়া লইয়াছে।

বাহির হইয়া যাওয়ার সময় সে আর একবার ডি-সুজার কানের কাছে বলিয়া গেল, সাবধান থেকো, খুব সাবধান।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারের কুঁদটা পাথরের মতো ভারী আর শীতল হইয়া উঠিতেছে। তাহার কপালে জমিয়াছে দুইটা বড় বড় ঘামের বিন্দু।

তিন

পোস্টমাস্টার হরিদাস সাহাকেও এখানে সঙ্গীহীন জীবন কাটাইতে হয়।

তাই বলিয়া তিনি বিপত্নীক নন। রণচণ্ডী একটি স্ত্রী আছেন, আর আছে কাকের মত কালো, বকের মত শীর্ণ একপাল ছেলেমেয়ে। পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহারা যে চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিতেই জন্মিয়াছে, ইহাতে পোস্টমাস্টারের কোনো সন্দেহ নাই। ঢাকা শহরে মামার বাড়িতে তাহারা আছে এবং সম্ভবত কুশলেই আছে বলিয়া হরিদাস অনুমান করেন। রাগের মাথায় কুরূপা স্ত্রীর গায়ে একদিন হাত

তুলিয়াছিলেন বলিয়া ছেলেপিলে লইয়া স্ত্রী জন্মের মতো বাপের বাড়ি গিয়া উঠিয়াছেন। শ্বশুর ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি, ঢাকায় আর নারায়ণগঞ্জে তাঁহার মস্ত কারবার। তিনি নাকি গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁহার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসিলেও তিনি তাহার হাড় মাংস একত্র রাখিবেন না।

শুনিয়া হরিদাস খুশিই হইয়াছিলেন। রাজসাহীতে থাকিবার সময়ে শনিগ্রহরূপী শয়তান পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মৃত্যু সংবাদেও তিনি এতটা খুশি হইয়া ওঠেন নাই। শ্বশুরবাড়ির ত্রিসীমানার কাছে আগানো তো দূরের কথা, তাহারা তাঁহার ছায়া না মাড়াইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সখের খাতিরে একদা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সখের সেই নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া হরিদাস সাহা বহুকাল পরে ভগবানকে একটা নমস্কার করিয়া বসিলেন।

তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিশ্বাস না থাকুক আরোগ্যের আশ্বাসে হাতে গলায় একরাশ মাদুলি ঝুলাইয়াছেন হরিদাস; কিন্তু চর ইস্‌মাইলের এই অনাত্মীয় প্রবাসজীবনে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় যখন সমস্ত মাদুলি আর তাবিজের অনুশাসনকে অস্বীকার করিয়া হাঁপানির টান উঠিয়া আসে তখন হয়তো মাঝে মাঝে কুরূপা তীক্ষ্ণকণ্ঠী স্ত্রীর স্মৃতি সমস্ত বিতৃষ্ণার স্তূপ ভেদ করিয়া ঠেলিয়া ওঠে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া যখন মুমূর্ষু কাতলা মাছের মতো হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বাতাসের যোগাযোগ রাখিতে হয়, যখন রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাটাই মনে পড়ে যে মৃত্যুর রূপটা ইহার চাইতে অনেক বাঞ্ছনীয়, তখন চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভাসিয়া ওঠে স্ত্রীর মুখখানা। এখন কেউ একবার বুকের উপরে একখানা কোমল হাত বুলাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হইত হয়তো।

এপাশ ওপাশ করিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকেন, কেরামদ্দি?

পিয়ন কেরামদ্দি এ সময়টায় প্রায়ই তাঁহার পাশে আসিয়া বসে। পোস্টাপিসেরই এক পাশে সে-ও থাকে। এখানে তাহার বাড়ি নয়—বদলি হইয়া আসিয়াছে। দুই-জনেই বৈদেশিক বলিয়া পোস্টমাস্টারের প্রতি কেমন একটা সস্নেহ সহানুভূতি আছে কেরামদ্দির।

জবাব দেয়, কী বলছেন?

—এ কষ্ট আর তো সয় না। বাড়ির ওদের আনাতেই হয়—না?

কেরামদ্দি তাঁহাকে চিনিয়াছে। তাই মনে মনে এতটুকুও উৎসাহিত বোধ করে না; কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া বলে, আজ্ঞে আনাই তো উচিত।

—শ্বশুরমশাই, গুরুজন। দুটো মন্দ যদি বলেই থাকেন, সেটা ঘাড় পেতে নেওয়াই সঙ্গত। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে লজ্জার কিছু নেই।

—আজ্ঞে তা তো নেই-ই।

পোস্টমাস্টার শ্বাস টানিতে টানিতে বলেন, তা হলে কালই একখানা দরখাস্ত দিয়ে দেব, কেমন? এক মাসের ছুটি—হ্যাঁ, এর কমে দেশে গিয়ে ওদের আর নিয়ে আসা যায় না।

—আজ্ঞে, তা যায় না।

হরিদাসের কণ্ঠস্বর এবারে সন্দিগ্ধ ও বেদনার্ত হইয়া ওঠে।

—কিন্তু যদি ছুটি না দেয়?

কেরামদ্দি আশ্বাস দিয়া বলে, আজ্ঞে তা দেবে না কেন?

উত্তেজিত হইয়া ওঠেন হরিদাস। বুকের উপর হাত চাপিয়া তিনি প্রায় উঠিয়া বসেন: না-ও দিতে পারে—বিশ্বাস নেই ব্যাটাদের। মানুষ মরুক কিংবা বাঁচুক, তাতে ওদের কোনো নজর আছে নাকি? যেমন করে পাবে খাটিয়ে নিলেই যেন হল।

উত্তেজনা বাড়িতে থাকে হরিদাসের। চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া ওঠে—গলার আওয়াজটা পুরোপুরি বসিয়া যায়। শ্বাসের টানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া বলিতে থাকেন, না দেয় ছুটি না দিলে! রিজাইন দেব এমন চাকরিতে। ঘরে কি খাওয়ার ভাবনা আছে যে জান প্রাণ দিয়ে এখানে পড়ে থাকব? ছুটি না পেলে আমি চাকরিতে রিজাইন্ দেব—নিশ্চয় দেব, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম।

কেরামদ্দি ব্যস্ত হইয়া ওঠে। একপাশে টি-পয়ের উপর হইতে মালিশের ওষুধটা লইয়া সে হরিদাসের বুকে ডলিতে থাকে। শান্তস্বরে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না বাবু। যা দরকার তা করা যাবে কাল সকালে।

কিন্তু পরের দিন সকালে উঠিয়া এ সব কথা আর হরিদাসের স্মরণ থাকে না।

বিস্মৃতিই বলিতে হইবে এক রকম। হাঁপানির অসহ্য কষ্টের সময় মুখ দিয়া অবচেতনায় যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেগুলিকে অসুস্থতার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দিনের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আসিয়া যেন অভিভূত করিয়া ফেলে হরিদাসকে। নিশীথের গৃহপ্রবণ পীড়াতুর মনটি দিবালোকের সংস্রবে আসিয়া বিদ্রোহী এবং যাযাবর হইয়া ওঠে। হরিদাসকে তখন সিনিক্ বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কেরামদ্দি মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দেয়।

—ছুটির দরখাস্ত করবেন নাকি বাবু?

সশব্দে হাসিয়া ওঠেন হরিদাস। হাসিতে কৌতুক এবং শ্লেষ মিশানো।

—ছুটি! ছুটি কিসের জন্যে? তুমি কি ভাবছ, ওই কাল-প্যাঁচাদের ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হচ্ছে না? বাপ—যে করে ওগুলোর হাত এড়িয়েছি, আমিই জানি।

—ছেলেপিলের মুখ একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না বাবু?

আর একবার সশব্দ উচ্চ হাসিতে প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দেন হরিদাস। মুখের সামনে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া তিনি চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, কথনো পাহাড় অঞ্চলে বেড়িয়েছ কেরামদ্দি?

—আজ্ঞে না।

—আমি বেড়িয়েছি। সুসঙ্গের পাহাড়ে—যেখানে হাতী ধরে। সে কী জঙ্গল আর কী দুর্গম! একটুর জন্যে বাঘের মুখে পড়িনি সেবারে।

হুঁকা হইতে কল্‌কেটা নামাইয়া লয় কেরামদ্দি। পোস্টমাস্টারের চোখ-মুখ ধারালো হইয়া ওঠে। কালো মুখের উপর দিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ গাম্ভীর্য ঘনাইয়া আসে—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটা প্রত্যাসন্ন গল্পের সংকেত। লোকটা সর্বাঙ্গ দিয়া গল্প বলিতে জানে।

—দু'দিকে দশ-বারো হাত উঁচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে হাত তিন-চারেক চওড়া একটুখানি জংলা পথ। পাহাড়ে শ্যাওলা আর নানারকম আগাছায় বুকসমান জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ নাকে এল বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ—একবার যে শুঁকেছে, সেই টের পায়। থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর তাকিয়ে দেখি—

কেরামদ্দি কল্‌কেটা নামাইয়া রাখে। সাগ্রহ কৌতূহলে বলে, তারপর?

* * *

এমনি করিয়া দিন যায় হরিদাসের। স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন—ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই সুযোগ ও সুবিধামতো তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কত নতুন প্রকৃতির মানুষ, কত বিচিত্র রকমের রীতি-নীতি। নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, ছোট বড় অসংখ্য বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

এই নিজস্ব দর্শন-রীতিটি, ইহা হরিদাসকে জগৎ সম্বন্ধে একরকম অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে বলিলেই চলে।

বলরাম ভিষক্‌রত্নের তাসের আড্ডায় বসিয়া মাঝে মাঝে হয়তো বলেন, নাঃ মশাই, কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়।

শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করে, কিসের কথা বলছেন?

—এই তাসটাস সব। একদিন সব কিছুই হাওয়ায় উড়ে যাবে মশাই—একেবারে ফাঁকা। ওই যে শাস্ত্রে বলছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যে—ওইটেই একমাত্র খাঁটি কথা।

মদনানন্দ মোদকের আমেজে বলরাম ভিষক্‌রত্ন অতিরিক্ত প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন।

—বলি মাস্টারের যে অতিরিক্ত বৈরাগ্য দেখছি। একেবারে সাক্ষাৎ হরিদাস স্বামী—অ্যা!

কঠিনমুখে হরিদাস বলেন, বৈরাগ্য নয়। নর্থ বিহার ভূমিকম্পের সময় আমি জামালপুরে ছিলুম তো। সব অবস্থাটাই নিজের চোখে দেখেছি দাদা। বেশ গড়ে উঠেছিল—হঠাৎ একটা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভেঙেচুরে ছত্রাকার হয়ে পড়ল। তাই মনে হয়, সমস্ত দুনিয়াটাই একদিন এরকম হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—ধরে রাখবার এত যে চেষ্টা এদের কোনোটাতেই কিছু হবার নয়।

মদনানন্দ মোদকের নেশার দুইটা দিকই আছে সম্ভবত। বলরাম হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, যা বলেছ ভাই! ভগবানের মার দুনিয়ার বার—ও ঠেকাবার জো নেই।

হরিদাস যেন বিরক্ত বোধ করেন।

—দৌলতখাঁয় যেবার বান হয়েছিল, জানো সে কথা?

—জানি নে আবার! ওদিকটাকে তো একরকম মুছে নিয়েছিল বললেই চলে। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই সে বানে মারা যায়—ওঃ, সে কী কাণ্ড!

—মনে করো, আবার যদি তেমন কিছু একটা হয়!

বলরাম সভয়ে বলেন, বাপ রে!

হরিদাস হাসিয়া বলেন, মন্দ হয় না তা হলে। যদি বেঁচে থাকি তা হলে বেশ নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, কী বলো বলরাম?

—সর্বনাশ! অমন অভিজ্ঞতা দিয়ে দরকার নেই—বেশ সুখেই আছি মশাই। চরের জমিভরা ধান, সুপুরির খন্দ—এমন সময় অমন কু-ডাক ডাকতে আছে! তার ওপর আসছে চৈত্র মাস—ও সব কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়ো না দাদা।

হরিদাসের মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

—ভয় পাও কেন অমন? স্ত্রী-পুত্র তো কেউ নেই তোমার। একদিন যখন মরতেই হবে, একটা কিছু বিরাট ব্যাপারের মাঝখানে ঘটা করে মরাই ভালো নয়? মনে করো, এখানে লাগল এসিয়াটিক কলেরার মড়ক, আরও দশজনের সঙ্গে তুমিও শেষ হয়ে গেলে, তখন কে ভোগ করবে তোমার এই ক্ষেতভরা ধান আর গোলাভরা সুপুরি!

—হয়েছে, হয়েছে, থামো—রীতিমতো আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন বলরাম: এই সাত সকালে কী সব আরম্ভ করে দিলে? এসো, এসো এক বাজি ব্রে হয়ে যাক্—

তাসজোড়া ময়লা তাকিয়ার তলা হইতে বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু পৃথিবীটা এমন জায়গা যে সম্পর্ক না থাকিলেও এখানে নতুন করিয়া গড়িয়া নিতে

কষ্ট হয় না।

অন্তত বলরামের হইল না। একা দিনগুলি কাটিতেছিল। রাধানাথ যা হোক করিয়া রাঁধিয়া নামাইত, রান্নার স্বাদগন্ধ যাই থাক দুধ ঘি এবং মাছের প্রাচুর্যে সেটা এমন মর্মান্তিক বোধ হইত না। কিন্তু "ভূমৈব সুখম্"—অতএব কোথা হইতে একটি মেয়ে আসিয়া জুটিয়া গেল।

দেখা গেল, বলরামের পৃথিবীটা হঠাৎ বিচিত্র রকমে বদলাইয়া গেছে।

তাসের পাটটা তুলিয়া দিতে পারিলেই বলরাম যেন শান্তি পান একরকম। তবে বহু দিনের অভ্যাস, একেবারে চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ধাতে সহিবে না বলিয়াই মোটামুটি আঁকড়াইয়া আছেন এখনো কিন্তু ব্রীজের জোরালো ডাকের মুখেও একান্ত মনোযোগটা অন্তঃপুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে খেলার সময় তিনি এমন একএকটা ভুল করিয়া বসেন যে তাঁহার পার্টনার চটিয়া-মটিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

তা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ার প্রতি এতখানি মনোযোগ—আপাত-দৃষ্টিতে এটাকে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু ভালোবাসিবার ক্ষমতাটা তো আর সকলের সমান নয়। মানুষের চরিত্রগত তারতম্য বিচার করিয়াই ভালোবাসার পাত্রাপাত্র ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে বলরাম এতখানি বন্ধুবৎসল, যে তামাক এবং মোদক ব্যয়ের দিকে তাঁহাকে একেবারে অকুণ্ঠ বলিলেই হয়, তিনি যে আত্মীয়াকে একটু অতিরিক্তই ভালোবাসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আত্মীয়াটির নাম মুক্তকেশী—সংক্ষেপে মুক্তো।

বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। আঁটো-সাঁটো গড়ন, কপালটা অতিরিক্ত চওড়া। কিন্তু প্রশস্ত কপালটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে অশোভন রকমের বড় একটা মেটে সিঁদুরের ফোঁটায়। গ্রামের মেয়ে হইলেও সে পাতা পাড়িয়া সিঁথি কাটে, পুরু ঠোঁট দু'খানি পানের রঙে সর্বদাই রাঙা হইয়া আছে।

সুন্দরী বলিলে যা বোঝায়—মুক্তো ঠিক তা নয়। তবু মুক্তোর শ্রী আছে। বিবাহ হইয়াছে ছোটবেলায়, কিন্তু বিবাহিত জীবনের কোনো ছাপ পড়ে নাই তাহার শরীরে; দেখিলে এখনো কুমারী বলিয়াই মনে হয় তাহাকে। চোদ্দ বৎসর বয়সে গুড়ের মহাজন নবদ্বীপ সরকারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে স্বামীসেবা করিয়াছে। বিচিত্র ইহাই যে এই পরম নিষ্ঠার কোনো পুরস্কারই সে পায় নাই। পুরা ছয়টি বৎসর আসিল গেল, কিন্তু সরকার কুলধ্বজ কোনও বংশধর আসিয়া তাহার কোল উজ্জ্বল করিয়া বসিল না। শিকড়বাকড়, কালীর দুয়ারে ইঁট বাঁধা, এমন কি পঞ্জিকার পেটেন্ট ওষুধ, কিছুই কাজে আসিল না। সুতরাং পুত্রপিণ্ডলোভী নবদ্বীপ আর একবার হাতে মাকু লইয়া ছাঁদনাতলায় ভ্যাঁ করিতে গেল এবং সেই অবকাশে পিতা

রাখহরি সরকার একখানা গোরুর গাড়ি ডাকিয়া পোঁটলাপুঁটলিসহ মুক্তোকে তাহাতে চাপাইয়া দিল।

তারপর দুইটা বৎসর কাটিল বাপের বাড়িতেই।

কিন্তু পাড়ার দশটা বখাটে ছোক্‌রার অনুগ্রহদৃষ্টি এমনভাবে তাহাকে দিনরাত তাড়া করিয়া ফিরিতে লাগিল যে, সে অস্থির হইয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইল। তাহার দায়িত্ব নির্তে রাজী হইলেন বলরাম ভিষক্‌ স্বয়ং—চর ইস্‌মাইলের সভ্যতা-বিবর্জিত দুর্গম দুর্গে বসিয়া পৃথিবীর ফেনাইয়া-ওঠা কলরব ভুলিয়া থাকা যাহার পক্ষে সব চাইতে সহজ। শুধু ভার লওয়াই নয়—মুক্তোর প্রতি বলরামের স্নেহটা উদগ্র হইয়া উঠিল।

মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছে তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারীসঙ্গহীন নয়। তিন শতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলা দেশের মাটির স্যাঁৎসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।

কিন্তু তাহাদের সহিত বনাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে না। মুক্তোর দিন একাই কাটে একরকম। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া সে দড়ি পাকাইয়া শিকা তৈরি করে, মনে মনে ভাবে সরঞ্জাম পাইলে ছোট ফাঁসের একখানা খেপ্‌লা জালও সে আরম্ভ করিয়া দিতে পারে।

অবসরও অবশ্য খুব বেশি সে পায় না। বলরামের জীবন-যাত্রার যেন বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া চলিতেছে একটা। বাহিরের জগৎকে একসময় খুব বেশি প্রশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় আজ সে জগৎটার উপরে প্রতিশোধ লওয়া চলিতেছে। ওজন করিয়া ধানের বস্তা বড় বড় নৌবায় চাপাইয়া, সুপারির দাদন লইয়া দর-কষাকষি, ইহার ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পাইলেই বলরাম আসিয়া মুক্তোর আঁচলে মাথা গুঁজিতে চান। প্রথম প্রথম মুক্তো খুশি হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল একটু একটু করিয়া সন্দেহ আসিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, শুধু আঁচলের আশ্রয় পাইলেই হয়তো বলরাম খুশি হইবেন।

বাহিরে বন্ধুরা আজো আসিয়া জড়ো হয়; কিন্তু তামাক সরবরাহে রাধানাথের আজকাল উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। গির্দা বালিশটার তলায় রাখা তাসজোড়াকে সব সময় জায়গা-মতো পাওয়া যায় না; আবার যখন পাওয়া যায়, তখন এদিকে ওদিকে অনেক খোঁজাখুঁজ করিয়া বায়ান্নখানার হদিস মিলাইতে হয়।

সবচেয়ে বেশি করিয়া যিনি ব্যাপারটা উপভোগ করেন, তিনি হরিদাস।

হরিদাসের হাসির ভঙ্গিটা মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া ওঠে। হাঁপানির টানের

মধ্যে সে হাসিটা বিচিত্রভাবে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে থাকে। সরু গলা হইতে জিল্‌জিলে বুকখানার উপর ঝুলানো হাঁপানির চৌকোণা মাদুলিটা তাহারি সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া ওঠে, বয়োজীর্ণ কপালের ও গালের কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা নানা আকারে যেন হাসির স্বরূপটা ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দেখিয়া, বলরামের সমস্ত মনটা তিক্ত হইয়া ওঠে।

হাসি থামিলে হরিদাস বলেন, বুড়ো বয়সে বুঝি রং লাগছে কবিরাজের ?

বলরাম লজ্জিত হন ; কিন্তু বর্ণদোষে মুখের উপর লজ্জার রক্তিম আভা না পড়িয়া কালো রংটির উপর যেন বার্নিশ লাগাইয়া দেয়। বলেন, যাঃ, কী বলছ।

হরিদাস অকস্মাৎ চোখ দুটি ছোট করিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলরামের সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। ঘরে আর লোকজন না দেখিলে হঠাৎ তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়েন : বলি, সত্যি সত্যিই গ্রামের মেয়ে তো ? সম্পর্কের মধ্যে ভেজাল নেই তো কোনোরকম ?

বলরাম চমকিয়া বলেন, তার মানে ?

হরিদাসের হাসি অশ্লীল হইয়া ওঠে। তারপর কানের কাছে মুখ লইয়া চাপা স্বরে কী যেন বলেন কবিরাজকে।

বলরামের চোখে মুখে সুস্পষ্ট কাতরতার ছাপ পড়ে।

—কী সব আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছ ? তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না না কি ? ছি—ছি—ছি—

ছি-ছি-র মাত্রাধিক্যে হরিদাস চুপ করিয়া যান। তবু মনে হয় ধিক্কারের মাত্রাটা যেন একটু অসমপরিমাণে অধিক। নিজের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাটাকে অস্বীকার করিবার জন্যই যেন বলরাম এত বেশি পরিমাণে সশব্দ হইয়া ওঠেন ; কিন্তু বুঝিতে পারিয়াও হরিদাস কিছুই বলেন না। প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামাজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গেছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের দৃঢ় গণ্ডিটির মাঝখানে যেখানে প্রাচুর্য আছে, চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব ; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গেছে। মগ কিংবা আরাকানী অথবা পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি মেয়েদের সত্যি সত্যিই এমন কিছু বিবাহ করা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পরিধি যেখানে নাই, সেখানে মুক্তো বলরামের স্বগ্রামবাসিনী অথবা আর কিছু ইহা লইয়া আলোচনা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বৃহস্পতিবার। শেষ রাত্রিতে বোট ছাড়িয়াছে। বুকের নিচে বালিশ দিয়া বাহিরে

আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি—সমস্ত পৃথিবীটাকেই বিচিত্র বলিয়া মনে হইতেছে।

অন্ধকারের গাঢ় রংটা ক্রমশ ফিকা নীল হইয়া আসিতেছে। আকাশটার চেহারা দেখিতে দেখিতে কী বিচিত্র ভাবেই বদলাইয়া গেল—যেন প্রকাণ্ড একখানা কার্বণ পেপারকে কে উল্টাইয়া ধরিল। তারাগুলির রঙ লাল হইয়া গেছে, একটু পরেই ঘষা কাচের মতো ঘোলাটে হইয়া যাইবে। এই মুহূর্তে শুকতারার একটা তির্যক আলোর রশ্মি অদ্ভুতভাবে আমার চোখমুখে আসিয়া পড়িতেছে।

নিজেকে যেন চিনিতে পারিতেছি না। পিছনের হালের গোড়া হইতে ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ করিয়া গোঙানির মতো কাতর শব্দ উঠিতেছে, পালে বাতাস আর ভাঁটার টান পাইয়া বোট আগাইয়া চলিতেছে তর তর করিয়া। মাঝে মাঝে ভাসিয়া চলা কচুরির ঝাঁক হইতে পরিচিত এক ধরনের গন্ধ পশ্চিমা বাতাসে নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মনে হইতেছে, আমার ভিতর হইতে কে আর একজন বাহির হইয়া আসিয়া এই জল-স্থল-নদী আর আকাশকে অনুভব করিতেছে—এতদিন সে আমার মনে প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তবু কোনো সুযোগে আমি তাহার পরিচয় পাই নাই।

পৃথিবীকে আমরা কতটুকু জানি! আদিমতম যুগে আমাদের যে বর্বর পূর্বপুরুষেরা গুহা-গহ্বরে বাস করিত, পাথরের বল্লম ঘষিয়া হিংস্র জন্তু বধ করিত, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য হইতে শুকনা ডাল-পালা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইত, আর সেই চকমকির আগুনে পশুর মাংস আধপোড়া করিয়া ক্ষুধা মিটাইত—তাহারাই তো পৃথিবীকে জয় করিবার সাধনা শুরু করিয়াছে।

তারপরে কত যুগ পার হইয়া গেল। সেই বর্বর মানুষদের মধ্যে বাহুবলে যে বড় হইল, সে হইয়া দাঁড়াইল দলপতি। প্রকৃতির বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চারিদিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া আছে—সে বাধাকে জয় করিবার জন্য সৃষ্টি হইল মন্ত্রতন্ত্রের, রচনা হইল দেবতার। আসিল পুরোহিত বা যাদুকর, তারপর কোন্ মুহূর্তে তাহার মাথায় সর্বশ্রেষ্ঠত্বের রাজমুকুট আর কপালে নবরক্তের রাজটীকা আসিয়া পড়িল, অলিখিত ইতিহাসের পাতা হইতে তাহা মুছিয়া গেছে।

সেই হইতে শুরু হইয়াছে সংগ্রাম। সমাজের বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া অগ্রগামী মানুষ পৃথিবী হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছে। কৌতূহলের আকর্ষণ খানিকটা আছে, কিন্তু দেহে-মনে তাহাকে পূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়া, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া যাইবার স্পৃহা তাহার নাই। তাহার জন্য আছে পার্লিয়ামেণ্ট, আছে আইন, আছে গীর্জা এবং ধর্মমন্দির, আছে বিবাহ, আর আছে যুদ্ধ।

ভোর হইয়া আসিতেছে। সামনে শুকতারাটা একখণ্ড শাদা মেঘের তলায় লুকাইয়া

গেল। অস্তেই নামিল হয়তো। একটা হালকা কুয়াসা দূরের নদীর ওপর ধোঁয়ার মতো ভাসিতেছে, এপার ওপার দেখা যায় না, হঠাৎ চমকিয়া মনে হয়, আমার এ যাত্রা বুঝি কখনো কোনোদিন সমাপ্তির ঘাটে গিয়া পৌছিবে না।

কিন্তু পৃথিবী বিচিত্র। মনে হইতেছে, বাহিরের জল-বাতাস হইতে একটা অনাস্বাদিত গন্ধ, একটা অনমুভূত স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রের ছোঁয়া বুলাইয়া আমাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে, কিন্তু ঘুমাইয়া পডিতে ভয় করিতেছে আমার। হয়তো জাগিয়া উঠিয়া আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইব না—হয়তো দেখিব, আদিম পৃথিবীর আকাশে বাতাসে অসংখ্য জীবাণুর সঙ্গে আমি মিশিয়া গেছি, হয়তো দেখিব প্রথম সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া-বেডানো প্রোটোপ্লাজ্‌মের মতো আমি জীবকোষের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। অন্তরের অণু-পরমাণুতে আমি যেন এই মুহূর্তে প্রথম পৃথিবীর ডাক শুনিতে পাইলাম।

কিন্তু কালুপাডা অনেক দূর। সন্ধ্যার আগে সেখানে গিয়া পৌছানো যাইবে না। সম্মুখে প্রসাবিত নদীপথ সকালেব আলোয় অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সৃষ্টির চিরন্তন রহস্যের মতো দিগন্ত-চক্রবালে তাহা প্রসারিত।”

চার

ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, কিন্তু রক্তের জোব মরিয়া যায় নাই। লোকটা অশ্রান্তভাবে খাটিতে পারে। ধান সুপারির যে কারবাব তাহার আছে, তাহা এমন প্রচুর নয় যে তাহাতে নিশ্চিন্তে সম্বৎসব খাইয়া থাকা যায়। সুতরাং ডি-সুজাকে অত্যন্ত খাটিতে হয়। এই বয়সেও তাহাকে নৌকা লইয়া প্রায়ই ঘুরিতে হয়, ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া সে শহরে যায়। দুইবার তাহার নৌকা ডুবিয়াছিল, কিন্তু সে মরে নাই। প্রথম বারে রাতারাতি মাইল ত্রিশেক সাঁতরাইয়া সে পটুয়াখালির এক চড়ায় হোগলা বনে গিয়া উঠিয়াছিল, দ্বিতীয়বারে শ্যামের হাটের খেয়া ডুবিলে সে এক বোঝা পানের সহায়তায় তেঁতুলিয়ার ভৈরব রূপকে অস্বীকার করিয়াই পারে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল।

সুতরাং ডি-সুজা দুঃসাহসী। এই সমস্ত অঞ্চলের সব রকম বাধার সঙ্গেই সে এক-একবার লডাই করিয়া দেখিয়াছে। ফলে, সে যে শুধু ভয়কেই জয় করিয়াছে তা নয়, ইহার পুরস্কারস্বরূপ ডি-সুজা প্রয়োজনের অনেক বেশিই রোজগার করে।

অবশ্য সেটার বাহিরে কোনো প্রমাণ নাই। লোকে সন্দেহ করে, মাটির নিচে কোথাও কোনো প্রচ্ছন্ন ধনভাণ্ডার আছে ডি-সুজার; অক্লান্ত ভাবে সে টাকা জমাইতেছে; কিন্তু এই টাকাটা কোথা হইতে, কী সূত্রে যে আসিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন।

কোনো আভাস দিলে ডি-সুজা চটিয়া লাল হইয়া যায়।

লোকটার মুখ খারাপ। অশ্রাব্য একটা গালাগালি দিয়া বলে, একটু ভালো দেখছে কিনা, তাই চোখ টাটায় সকলের। আমার টাকা থাক বা না থাক, আমার যা ইচ্ছে করি বা না করি, তাতে কার কী আসে যায়?

ডি-সুজার সম্পর্কে সমালোচনা করে কিন্তু প্রতিবেশী ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ই বেশি। ইহাদের মধ্যে আবার ডি-সিল্‌ভা অগ্রণী। ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণও আছে ডি-সিল্‌ভার।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। লিসি বড় বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোর্টশিপ করিবার ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে চাড়া দিতেছে। লিসির রংটা তামাটে আর নাকটা খাঁদা হইলেও মোটামুটি সুন্দরীই বলিতে হইবে তাহাকে। তাছাড়া নেপথ্য হইতে ডি-সুজার ধন-ভাণ্ডারের একটা দীপ্তি লিসির মুখে পড়িয়া তাহাকে আরো বেশি সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বলা প্রয়োজন, লিসি ছাড়া ত্রিসংসারে ডি-সুজার আর কেউ আছে বলিয়া কাহারো জানা নাই।

অতএব সাহসে বুক বাঁধিয়া ডি-সিল্‌ভা একদা ডি-সুজার কাছে প্রস্তাবটা করিয়াই ফেলিল।

শুনিয়া ডি-সুজা প্রথমটা বিশ্বাস কবিতে পারিল না একরকম। খানিকক্ষণ সে ডি-সিল্‌ভার মুখের দিকে মূঢ়ের মতো চাহিয়া রহিল, রাজহাঁসের পাখার মতো শাদায়-কালোয় মিশানো তাহার ভ্রূ দুইটা চোখের উপরে যেন দুইটা উল্‌টানো জিজ্ঞাসা-চিহ্নের সৃষ্টি করিল। তারপর সেই উল্‌টা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দুইটা একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। চোখ দুইটা রাগে পিট পিট করিয়া ডি-সুজা বলিল, বটে!

সাহস পাইয়া ডি-সিল্‌ভা কাছে ঘনাইয়া বসিল।

—ভেবে ছাখো, কথাটা নেহাৎ মন্দ বলছি না আমি। যা ভেবেছ, বয়সও আমার তেমন বেশি হযনি: তা ছাড়া আমাব যা কিছু আছে—

বৃদ্ধ ডি-সুজা হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো নাচিয়া উঠিল। আনন্দে নয়, অসহ্য ক্রোধে। দুই হাতের দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ডি-সিল্‌ভার নাকের সামনে দোলাইয়া বলিল, তোমার আছে এই কাঁচকলা! তা ছাড়া ওই নাদা পেট, আর চল্লিশ বছরের একটা টাক—কথাটা বলতে একবার লজ্জা করল না?

ডি-সিল্‌ভা চটিয়া গেল: আমার নাদা পেট, আর তোমার পেট বুঝি আমার চাইতে ছোট? নাত্নীর বয়সও তো পঁচিশ পেরোতে চলল তার হিসেব আছে?

—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ভালো মানুষের মতো সুড় সুড় করে বেরোও তো আমার বাড়ি থেকে।

—কী!—অপমানে ডি-সিল্‌ভার মোটা পেটটা একটা বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিল:

আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাও!

—হাঁ! যাও—বেরোলে না? বটে, মতলব আমি যেন কিছু আর বুঝতে পারি না! প্রথম থেকেই দেখছি নজর আমার মুরগীর খোঁয়াড়ের দিকে। বড় মোরগটা নিয়ে কী ভাবে সটকে পড়বে তারই সুযোগ খুঁজছ। আর দ্বিতীয়বার লিসিকে বিয়ে করতে চেয়েছ কি—হয় টাক ফাটিয়ে দেব, নইলে ভুঁড়ি দেব ফাঁসিয়ে। মনে রেখো কথাটা।—ডি-সুজার মূর্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল।

এক পা এক পা করিয়া খিড়কির দিকে পিছাইতে লাগিল ডি-সিল্‌ভা। পেট এবং বুদ্ধি লোকটার একটু বেশি পরিমাণে স্থূল, সাহসের মাত্রাটাও সেই অনুপাতে কম। কেবল যাইবার সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া গেল, মেরীর নাম করে বলছি, এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সিলভা ভীরু মানুষ, সুতরাং অনেকটা হাল ছাড়িয়াই দিল সে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার রসনা মরিয়া গেল না। ডি-সুজা সম্বন্ধে নানারকম অলীক গাল-গল্প ছড়াইয়া বেড়ায় লোকটা। শুধু গাল-গল্পই নয়, গালাগালিও করে।

বলে, হতভাগা বুড়ো মরে জিন হয়ে থাকবে।

কিন্তু জোহানকে আঁটিবার জো নাই। ছেলেবেলা হইতেই সে ডি-সুজার বাড়িতে যাতায়াত করিতেছে, লিসির সঙ্গে একত্র হইয়া খেলা করিয়াছে। চট্ করিয়া তাহাকে কিছু একটা বলিয়া বসা যায় না। তা ছাড়া সে কোনো স্পষ্ট প্রস্তাব লইয়া কখনো সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডি-সুজা অনুভব করে তাহার অজ্ঞতার পশ্চাতে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে জোহান লিসিকে তাহার কাছ হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে, লিসির মনোজগতে ডি-সুজা এখন অনেকটা নেপথ্যে।

এই কারণেই জোহানকে দেখিলে তাহার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যায়। ডি-সিল্‌ভাকে দেখিলেও বোধ হয় তাহার এতটা বিদ্বেষ বোধ হয় না। আর অনেকটা এই মনোভাবের জন্যই বড় মুরগীটা অপহরণের দায়িত্ব জোহানের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।

কিন্তু লিসির বিবাহ দিতে তাহার যে নিতান্ত অনিচ্ছা, তা নয়। আগে হইলে কী হইত বলা যায় না, হয়তো অসংকোচেই সে জোহানের হাতে লিসিকে সঁপিয়া দিতে পারিত, কিন্তু সুনিশ্চিত একটা আলোকে সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবার আগেই নূতন রাহুর ছায়া পড়িল সেখানে। সেই হইতে পাত্র তাহার ঠিক হইয়াই আছে, এবং ডি-সুজার মতে এমন সুপাত্র দুর্লভ।

পাত্রটির নাম গঞ্জালেস্।

গঞ্জালেস্ দেখিতে সুপুরুষ। ছয় ফুট দীর্ঘ চেহারা, গায়ের তাম্রাভ বর্ণে এখনো

আর্মানির খাদ আছে। চোখের তারা পুরোপুরি কালো নয়, চুলগুলিকে মোটামুটি কটা বলা যাইতে পারে। চোয়ালের প্রশস্ত দুখানি হাড়ের মাঝামাঝি দীর্ঘ নাসাটি খড়্গের মতো সমুন্নত হইয়া আছে।

চট্টগ্রামে তাহার সুঁটকি মাছের কারবার। নিম্ন বাংলা হইতে শুরু করিয়া "ভাপ্পির" দেশ ব্রহ্ম এবং চীনের উপকূল পর্যন্ত তাহার ব্যবসা বিস্তৃত। আরাকানী রক্তের মিশাল থাকিলেও গঞ্জালেস্ মূলত এখনো পর্তুগীজ। পূর্বপুরুষদের দস্যুবৃত্তি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিটাকে গঞ্জালেস্ আজ পর্যন্ত জীয়াইয়া রাখিয়াছে। নানা ঘটনাচক্রে ডি-সুজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে এবং সেই হইতেই ডি-সুজা তাহাকে নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছে। গঞ্জালেস্ প্রতিপত্তিশালী লোক। তাহার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে কাজটা যে অনেক নিরাপদেই চালানো যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তা ছাড়া গঞ্জালেসের আর একটি বিশেষত্ব আছে। সেটাও ডি-সুজাকে আকর্ষণ করে কম নয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে নিম্ন বাংলায়, বিশেষ করিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের যে অত্যাচার শুরু হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধর্ম প্রচারের উগ্র গোঁড়ামির সহিত দস্যুতার অবাধ প্রেরণা মিশ্রিত হইয়া পর্তুগীজেরা প্রেত-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন-শক্তি তাহা সংযত করিতে পারিত না, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া সমুদ্রচারী এই দস্যুদলকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তখন বাঙালীর বহির্বাণিজ্য ছিল। সিংহল, জাভা, বলী, সুমাত্রা, শ্যাম এবং সুদূর চীন জাপানেও বাঙালী সওদাগরেরা সপ্ত ডিঙা মধুকর ভাসাইয়া বেসাতি করিতে যাইতেন; 'বস্তু-বদল' করিয়া হরিদ্রার পরিবর্তে আনিতেন স্বর্ণ, আর্দ্রকের পরিবর্তে মুক্তা এবং নারিকেলের বিনিময়ে গজমোতি। 'মঙ্গল-কাব্যে'র রূপকথার পৃষ্ঠাগুলিতে সে সমস্ত দিনের এক-একটা স্বপ্নময় রূপ আজো দেখিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় নদীর ধারে, সমুদ্রের মোহানায় তখন সমৃদ্ধ জনপদের অন্ত ছিল না। এখন যে সুন্দরবনের ছায়াগভীর অন্ধকারের মধ্যে রয়্যাল্ বেঙ্গল টাইগারের ক্ষুধার্ত চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে, বড় বড় নলঘাস আর হিজল বনের আড়ালে আড়ালে শংখচূড়ের বিষাক্ত বিশাল ফণা তুলিয়া ওঠে, আর খাঁড়ির ধারে ধারে—জোয়ারের জল নামিয়া গেলে যেখানে ঝিনুকের অসংখ্য আঁকা-বাঁকা লেখা পড়ে—বড় বড় মানুষ-খেকো কুমীর শালগাছের গুঁড়ির মতো পড়িয়া রোদ পোহায়, ওখানেও একদিন মানুষের বসতি ছিল। সুন্দরীগাছ আর লতা-

পাতার অজস্র জটিলতা ভেদ করিয়া আরো একটু ভিতরে ঢুকিয়া দেখো, চোখে পড়িবে ঘন জঙ্গলে-ঘেরা মস্ত মস্ত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মজিয়া-আসা দীঘির শেষ চিহ্ন। কোথাও কোথাও এখন সাঁই ফকিরদের ধুনি জ্বলে, কোথাও বা বাঘিনী কাচ্চাবাচ্চা লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে, আবার কোথাও বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর মানুষের দল কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল দুলাইয়া খাঁড়া-সড়কিতে শান দিতেছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সমস্ত জায়গা এমনি ভয়ংকরের পীঠস্থান ছিল না। তখন এখানে মানুষ বাস করিত—উৎসর্ব চলিত—বড় বড় নদীর মোহনায় নতুন নতুন উপনিবেশ বসিয়া বাঙালীর ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু এই ক্রম-বিবর্ধমান সমৃদ্ধি বেশিদিন রহিল না। ভাস্কো-ডা-গামার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া হার্মাদেরা একদিন সর্বগ্রাসী পঙ্গপালের মতো বাংলার এই বাণিজ্য অঞ্চলগুলিতে আসিয়া হানা দিল।

যুদ্ধবাদী দুঃসাহসিক জাতি এই পর্তুগীজরা। নিজেদের দেশ তাহাদের ঊষর ও অনুর্বর —দারিদ্র্য সেখানে লাগিয়াই আছে। এই দারিদ্র্যকে জয় করিবার জন্য একদল বেপরোয়া মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়া অলক্ষ্যের পানে ভাসিয়া পড়িয়াছিল। তৃণতরুবিরল পর্তুগালের রুক্ষ উপকূল হইতে যখন তাহারা বাংলা দেশের উচ্ছল-শ্যামলতা-মণ্ডিত সমৃদ্ধ তীরতট দেখিতে পাইল, যখন দেখিল অনুকূল বাতাসে আকাশ-ছোঁয়া রাশি রাশি পাল উড়াইয়া ধনপতি, শংখপতি অথবা পুষ্পদত্ত সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙা দেশ-বিদেশের মণি-মুক্তা লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, তখন তাহাদের আর মাথা ঠিক রহিল না। রাত্রির ঘুমন্তশান্ত আকাশকে শিহরিত করিয়া তাহাদের রক্তরাঙা মশালগুলি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাদের বন্দুকের গর্জনে নিদ্রিত পল্লীর তন্দ্রা টুটিয়া গেল। যুদ্ধবিমুখ, সচ্ছলতায় পরিতৃপ্ত ক্ষীণকায় বাঙালী এই নতুন শক্তির আক্রমণের মুখে শিশুর মতো অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল।

সে অত্যাচারের তুলনা নাই। ভারতবর্ষে শক আসিয়াছে, হূণ আসিয়াছে, তৈমুরলঙ্গ নাদির শাহের আবির্ভাবে রক্তবন্যা বহিয়া গেছে; কিন্তু আরাকানী ও পর্তুগীজের দল তলোয়ারের মুখে সেদিন যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, নাদির শাহের রক্তলোলুপতাও তাহার কাছে হার মানিয়া যায়।

সে অত্যাচারের সীমা ছিল না—বিচার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ কেহই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। চৌদ্দ ডিঙা মধুকরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সেগুলি বঙ্গোপসাগরের নোনা জলে ডুবিয়া গেল, রাশি রাশি মৃতদেহ জোয়ারের জলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বরিশাল আর সুন্দরবনের কূলগুলিতে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল। বাঙালীর বাণিজ্য-যাত্রা চিরদিনের মতো বন্ধ হইল, সমুদ্রযাত্রার উপরে শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বসিয়া গেল।

উপদ্রব তাহাতেই থামিল না। নদী-সমুদ্র ছাড়িয়া পর্তুগীজেরা এবার গৃহস্থ পল্লীতে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিল। হত্যা ও লুণ্ঠন তাহারা নির্বিচারে করিত। বয়োবৃদ্ধ ও অক্ষমদের হত্যা করিয়া সমর্থ যুবকদের বাঁধিয়া লইয়া যাইত—ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য। মেয়েদের উপরে তো অত্যাচার আর নৃশংসতার সীমাই ছিল না। পশুর মতো যথেচ্ছ উপভোগ করিয়া দেশ-বিদেশে তাহাদের বিক্রয় করা হইত। হাতের চেটোয় গর্ত করিয়া সরু বেতের সাহায্যে যেভাবে তাহারা এই সব বন্দীদের 'হালি' গাঁথিয়া রাখিত এবং পাখির আধারের মতো যে ভাবে মাটিতে আধসেদ্ধ ভাত ছড়াইয়া তাহাদের খাইতে দিত—বর্বরতার নিদর্শন হিসাবে সে-সমস্ত কাহিনী অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ এবং বারো ভুঁইয়ার কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খাঁ মসনদ আলী প্রভৃতির সাহায্যে ইহাদের দমন ঘটিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের অত্যাচার আবার প্রবল হইয়া ওঠে। এই সময় ইহাদের নেতা হইয়া দাঁড়ান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্। এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্ যে দুর্ধর্ষ জলদস্যুবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নদীর মোহনায় ছোট ছোট চরে ইহাদের যে-সমস্ত দুর্গ ছিল, সেই দুর্জয় বাহিনী ও দুর্গ-গুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে বাংলার নবাব আলীবর্দীকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল! চর ইস্‌মাইলও পর্তুগীজদের সেই গৌরবদিনগুলিরই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গঞ্জালেস্ এই সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধসূত্র না থাকিলেও সিবাস্টিয়ানের রক্ত তাহাতে আছে।

শুধু সিবাস্টিয়ানের নয়। গঞ্জালেস্ নিজের মধ্যে নাকি হিন্দুত্বের প্রভাবও কিছু কিছু অনুভব করে। সে সম্পর্কে তাহাদের পরিবারে ভারী চমৎকার একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সেটা তাহারই কোনো ঊর্ধ্বতন পূর্ব-পুরুষের গৌরব কীর্তির কাহিনী।...

অবশ্য দেড় শত বৎসর আগেকার কথা। কোনো এক গঞ্জালেসের কাছে সংবাদ আসিল কয়েক মাইল দূরে এক জমিদার বাড়িতে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে। খবরটা পাইয়া গঞ্জালেসের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহাদের লাভ বেশি। অনেকগুলি মানুষ, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোককে একত্রে পাওয়া যায়, তা ছাড়া লুণ্ঠনেরও মন্দ সুবিধা হয় না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গেছে। জমিদার বাড়িতে তোরণে নহবৎ বাজিতেছে, আলোয় চারিদিক আলোময়, কলরব কোলাহলে উৎসব রাত্রি মুখরিত। বর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লগ্নের দেরি নাই, অন্তঃপুরে মেয়েকে কনে-চন্দনে সাজানো হইতেছে।

কিন্তু মুহূর্তে সে উৎসবের সুর কাটিয়া গেল।

বন্দুকের শব্দ আর মশালের আলো—অর্থটা বুঝিতে কাহারো এক মুহূর্ত দেরি হইল না। দু-চারজন পাইক পেয়াদা যাহারা বাধা দিতে সম্মুখে দাঁড়াইল, বন্দুকের গুলিতে

তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বাকী সকলে প্রাণ লইয়া কে যে কখন কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইল, তাহার আর ঠিকানাই মিলিল না। শশাঙ্ক-নরেন্দ্রের যুগের বাঙালী তাহারা নয়, কাশ্মীরের পরিহাসকেশব বিগ্রহ যাহারা চূর্ণ করিয়াছিল তাহারাও নয়; পালানোটাই তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল।

বরযাত্রীরা পলাইল বটে, কিন্তু বর কোথা হইতে একগাছা সড়কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, পরনে রক্ত চেলি, সুশ্রী মুখ চন্দন-লেখায় চর্চিত। তাহার পেশল বাহুতে সড়কির উজ্জ্বল ফলকটি একবার থর থর করিয়া কাঁপিল, পরক্ষণেই সেটা সোজা নিক্ষিপ্ত হইল একেবারে গঞ্জালেসের বুক লক্ষ্য করিয়া। চট্ করিয়া সরিয়া গিয়া গঞ্জালেস্ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল, কিন্তু তাহার পাশের লোকটি বিকট কণ্ঠে একটা আর্তনাদ করিয়া সোজা মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। চক্ষের পলকে বর সড়কিটা আবার হাতে তুলিয়া লইল এবং গঞ্জালেসের বাম-বাহুর পাশ দিয়া আর একজন পর্তুগীজের কণ্ঠ ভেদ করিল।

কিন্তু পর্তুগীজেরা আর নিশ্চেষ্ট রহিল না। একসঙ্গে চার-পাঁচটি বন্দুক গর্জিয়া উঠিল, বর রক্তাক্ত দেহে পৃথিবী গ্রহণ করিল। ভারী বুটজুতার তলায় তাহার দেহটাকে নির্মম ভাবে মাড়াইয়া গঞ্জালেস্ ও তাহার দল ঢুকিল অন্তঃপুরে।

অন্তঃপুরের রুদ্ধ দুয়ার তাহাদের আঘাতে ভাঙিয়া খান খান হইয়া গেল—ভীতা কাতর নারীসংঘের সামনে দাঁড়াইয়া গঞ্জালেস্ আনন্দধ্বনি করিল। তারপর মালায় চন্দনে সাজানো কনেটির দিকে তাকাইয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল—এত রূপ! বাঙালী মেয়ে যে এত সুন্দরী হইতে পারে সে তাহা কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক মুহূর্ত সে স্থাণুর মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাত বাড়াইয়া মেয়েটাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।……

লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং স্ত্রী-পুরুষের সঞ্চয় লইয়া পর্তুগীজদের জাহাজ আবার যখন নদীতে ভাসিয়া পড়িল, তখন সেই বিশাল জমিদারবাড়ি আগুনে ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া পৈশাচিক ভাবে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করিল গঞ্জালেস্। বলিল, সব ঘরে আটকে রেখে এসেছি, মর্ ব্যাটারা, এখন ওখানে ইঁদুরের মতো পুড়ে মর্।

…সেই কনেটিই বিংশ শতাব্দীর গঞ্জালেসের কোনো এক অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী। তাই গঞ্জালেস্ মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া বলে, আমি তো আধাআধি হিন্দু।

…অতীতের এই গৌরবময় ইতিহাসটা পেছনে আছে বলিয়াই ডি-সুজা গঞ্জালেস্‌কে এক হিসাবে শ্রদ্ধা করে। ডি-সুজা নিজে বাঙালী হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে বটে, কিন্তু পিতৃপুরুষের কীর্তি-কাহিনী স্মরণ করিয়া এখনও গর্বে ফুলিয়া ওঠে তাহার মন। এজন্য গঞ্জালেস্ আসিলে সে যে কী ভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহা যেন ভাবিয়াই পায় না।

কিন্তু লিসির মনোভাব এখনো কিছু স্পষ্ট করিয়া জানা যায় নাই। গঞ্জালেস্ সম্পর্কে তাহার ব্যবহারটা খুব পরিষ্কার নয়। তবে তাহাকে দেখিলে সে যে ডি-সুজার মতো অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়া ওঠে না এ তো চোখের উপরেই দেখা যায়। অবশ্য তাই বলিয়া এখনো এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে লিসি গঞ্জালেসের পক্ষপাতী নয়।

ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এর মূলে কোথায় যেন জোহানের প্রভাব আছে। কথাটা ভাবিতেও সে হিংস্র হইয়া ওঠে। বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে জোহান। আচ্ছা দাঁড়াও, বেশিদিন এসব আর চলিতেছে না। এবার গঞ্জালেস্ আসিলেই হয়।

পাঁচ

শীতের গোড়া হইতেই চরের আনাচে-কানাচে বুনো হাঁস পড়িতে শুরু করে।

চরের দক্ষিণ-প্রান্তে সেই কবে একটা ছোটখাটো বিলের সৃষ্টি হইয়াছিল, আশ্বিন-কার্তিক হইতেই সেখানে শাপ্‌লা শালুকের ফুল ফুটিয়া ওঠে। এক জাতীয় ক্ষুদে কচুরীতে বেগুনে রঙের রাশি রাশি ফুল ফোটে, নীল শ্যাওলা আর জলজ-ঘাসের মধ্যে সেগুলি সূর্যের আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করে। তারপর কোনও এক রাত্রে আকাশ যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ধুইয়া গেছে, বাতাস আচম্‌কা থামিয়া গিয়া পর্তুগীজদের ভাঙা গির্জাটার নীচে জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নোনা গাঙের জল থম থম করিতেছে—তখন অনেকগুলি পাখার দ্রুত-বিধূ-ননে ঘুমন্ত রাত্রির যেন সুর কাটিয়া যায়। তেঁতুলিয়ার জল হঠাৎ কল্ কল্ করিয়া ওঠে, নানা রঙের পাখায় জ্যোৎস্নার গুঁড়া-আবির মাখাইয়া বুনো হাঁসের দল ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

জিনিসটা লইয়া অবশ্য কবিতা লেখা চলে, কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে কবিতার দাম বেশি নয়। তা ছাড়া চর ইস্‌মাইলের এই নিঃসঙ্গ বিশেষ পরিস্থিতিটির মধ্যে কবিতার অবকাশ কম। প্রকৃতির সব রকম বিরুদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া মানুষকে অপ্রাকৃতের ভাবনা ভাবিলে চলে না।

সুতরাং সকালের দিকেই জোহান একটা গাদা-বন্দুক লইয়া বিলে হাঁস শিকার করিতে আসিয়াছিল।

বিল নেহাৎ ছোট নয়। কল্‌মি আর বুনোঘাস এবং আল্‌গা-হোগলার বন পার হইয়া প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি দ্বীপের মতো উঁচু জায়গা। হাঁসের দলটা প্রধানত সেই দ্বীপটুকুর উপরেই বসিয়া আছে। সংখ্যায় ষাট-সত্তরটির কম হইবে না। কোনো কোনোটা পালকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আছে, কয়েকটা এদিক ওদিক কাছাকাছি ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং দু-একটা কারণে অকারণে উড়িয়া উড়িয়া এদিক হইতে ওদিকে

পড়িতেছে।

লোভে জোহানের চোখ জ্বলিতে লাগিল। সবে দু-তিনদিন হইল হাঁস পড়িয়াছে এখানে, এখনো 'ফায়ার' হয় নাই। নতুবা হাঁসগুলি আরো সতর্ক হইয়া যাইত।

সরু একটা বেতের সাহায্যে জোহান বারুদ এবং একরাশ চার নম্বরের ছর্‌রা বন্দুকে গাদাইয়া লইল; কিন্তু হাঁসগুলি 'রেঞ্জে'র বাহিরে। জোহান এক মুহূর্ত দ্বিধা করিল, গায়ের জামা এবং গেঞ্জি খুলিয়া হোগলা বনের মধ্যে রাখিল, তারপর জলে নামিয়া পড়িল।

জল খুব বেশি নয়, কিন্তু ঠাণ্ডা নরম কাদা আর শ্যাওলায় তাহার বুক পর্যন্ত ডুবিয়া গেল। বন্দুকটাকে মাথার উপর তুলিয়া ক্ষুদে কচুরীর আড়ালে আড়ালে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ভাবে আগাইতে লাগিল জোহান। ভাগ্যে বাতাসটা বহিতেছে অন্যদিকে। নতুবা হাঁসেরা এতক্ষণে ঠিক তাহার বন্দুকের গন্ধ পাইত—শিকারীদের চাইতে আত্মরক্ষার সহজ চেতনা এবং প্রচেষ্টা তাহাদের অনেক প্রবল।

এতক্ষণে জোহান হাঁসগুলির প্রায় চল্লিশ গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। ইহার চাইতে ভাল সুযোগ সচরাচর দেখা যায় না। এক চোখ বুঁজিয়া ঘোড়ায় আঙুল ছোঁয়াইয়া জোহান লক্ষ্য ঠিক করিতে লাগিল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কাছাকাছি আর কোথাও বন্দুকের শব্দ হইল 'দুম্' করিয়া। জোহান অনুভব করিল, ঠিক তাহার মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়া শাঁ করিয়া একটা গুলি বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই মাথাটাকে জলের কাছাকাছি নত না করিলে আর একটা গুলি তাহার কপাল ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত।

ভয়ে আতঙ্কে হাতের বন্দুকটা লইয়াই জোহান বিলের জলে ডুব মারিল এবং পঙ্কিল জল ও কল্‌মি দামের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে একটা ডুব সাঁতার কাটিয়া প্রায় দশ-বারো হাত দূরে একরাশ হোগলার মধ্যে গিয়া মাথা তুলিল। তারপর ব্যাপারটা আরো কতদূর ঘটে, সেটা দেখিবার জন্যই ভীত চক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুই আর ঘটিল না। গুলি যে ছুঁড়িয়াছিল, আশ-পাশে জঙ্গলগুলির মধ্য দিয়া সে যেন মন্ত্রবলেই অদৃশ্য হইয়া গেছে। শুধু তখনো সমস্ত বিল ভরিয়া গন্ধকের গন্ধ ভাসিতেছে আর একটা হালকা নীল ধোঁয়া রেখার মতো বাতাসে মিলাইয়া যাইতেছে। আর সমস্ত আকাশ ছাইয়া উড়ন্ত বুনো হাঁস, কাদাখোঁচা এবং বকের তীক্ষ্ণ চিৎকার ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জোহান জল হইতে উঠিয়া আসিল। আশে-পাশে কোথাও কোনো মানুষের সাড়া নাই। শিকারের সময় বিলে সর্বদাই বন্দুকের শব্দ শোনা যায়, তাহাতে কাহারো কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। তীরে উঠিয়া জোহান দেখিল, হোগলা বনের মধ্যে

যেখানে সে তাহার গায়ের জামা ও গেঞ্জি রাখিয়াছিল, তাহারই অনতিদূরে মাটিতে দুইটা রয়্যাল্ এক্সপ্রেসের খালি টোটা পড়িয়া আছে। আর তাহারই পাশে নরম কাদার উপর একজোড়া জুতার চিহ্ন।

জোহান ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, জুতার চিহ্নটা যেন চেনা-চেনা ঠেকিতেছে। সাধারণত এই ধরনের জুতা বর্মিরাই ব্যবহার করে।

বলরাম ভিষক্‌রত্ন কয়েকদিন ধরিয়াই অত্যন্ত চিন্তান্বিত বোধ করিতেছিলেন। অসুবিধা বাধিয়াছে মুক্তোকে লইয়া। সে আর এখানে থাকিতে রাজী নয়—দেশে ফিরিতে চায়। এ ভূতের দেশ এবং মুক্তো নিশ্চয়ই সে ভূতের দলের একজন নয় যে এখানে মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে।

বলরাম মহা সমস্যায় পড়িয়া কহিলেন, কেন, বেশ তো আছ। অসুবিধের এমন কী হয়েছে?

মুক্তো ঝাঁজিয়া বলিত, অসুবিধের কী হয়নি? মানুষ নেই, জন নেই, আছে কতকগুলো অদ্ভুত জীব। তাদের কথাই বোঝা যায় না। তুমিও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পড়ে থাকো, আমাব দিন কাটে কী করে?

বলরামের কণ্ঠে করুণতার আমেজ আসিল, কী বলছ, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই থাকি। তুমি আসবার পরে তো একরকম সবাইকেই ছেড়ে দিয়েছি মুক্তো। কাল পোস্টমাস্টার এসেছিল, তাকেও শুধু এক ছিলিম তামাক খাইয়েই বিদেয় দিয়েছি।

মুক্তো রুষ্ট হইয়া বলিল, তোমার ওই পোস্টমাস্টার মানুষটি বাপু সুবিধেব নয়, ওকে দেখলেই কেন যেন আমার গায়ের মধ্যে শির শির করে। লোকটার চেহারা যেন ভূতুড়ে, আমাব মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা অলক্ষুণে ঘটাবার চেষ্টায় আছে ও।

বলরাম দ্বিধা করিতে লাগিলেন। পোস্টমাস্টারের রসনা সব সময়ে প্রীতিকর নয়, তাঁহার কাহিনী এবং কল্পনাগুলি বলরামকে প্রায়ই আতঙ্কিত করিয়া তোলে। তা সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলরামের যেন একটা স্নেহগত দুর্বলতাই আছে। এক কথায় বলিতে গেলে, মুক্তো ছাড়া এই চর ইস্‌মাইলে মাত্র হরিদাসকেই তাঁহার যাহোক কিছু ভালো লাগে।

বলরাম বলিলেন, না, তা ঠিক নয়—হবিদাস মানুষটা খুবই ভালো। তবে মাঝে মাঝে ওর একটু পাগলামি চাপে, তা—

মুক্তো বলিল, মরুক গে। তুমি কবে আমাকে দিয়ে আসবে সেটা ঠিক করে বলো। আমার আবার সব কিছু গুছিয়ে গাছিয়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে তো।

বলরামের স্বর প্রগাঢ় হইয়া আসিল: তুমি বুঝতে পারছ না মুক্তো, এখানে একরকম

একলা দিন কাটাই। কেউ নেই যে একটু যত্ন করে, কেউ নেই যে দুটো জিনিস ভালোমন্দ রেঁধে দেয়। থাকবার মধ্যে আছে ওই রাধানাথ, তাও তো দেখছই—ও ব্যাটা ফাঁকি দেবার যম।

মুক্তোর করুণা হইল না। সে নির্দয় ভাবেই বলিল, তার আমি কী করব! আমি তো আর তোমার সংসার নিয়ে এই ভূতের দেশে পড়ে থাকতে পারব না।

বলরাম সাহসী হইয়া উঠিলেন, একটু একটু করিয়া মুক্তোর কাছে ঘনাইয়া বসিলেন।

—সত্যি বলছি মুক্তো, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমি, আমি তোমাকে—বলরাম বার তিনেক ঢোঁক গিলিলেন, কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

বিদ্যুৎবেগে মুক্তো বলরামের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তাহার দুই চোখের কোণে কোণে খানিকটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি প্রকাশ পাইল। কথার ভাবে মনে হইল যেন আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিয়াছে।

—ছি, ছি—কী বলছ! দেখাশুনো করবার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ, আর তোমার মুখে এই কথা!

বলরামের ব্যগ্রতায় বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

—তোমাকে নইলে আমি বাঁচতে পারব না মুক্তো। তা ছাড়া এ হচ্ছে পাণ্ডববর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই—কেউ কিছু জানবে না। তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না।

উত্তরে মুক্তো শুধু উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ফলাফল যাই হোক, অনির্দিষ্ট কালের জন্য দেশে ফেরাটা স্থগিত রহিল মুক্তোর। খারাপ দিনকাল আসিয়া পড়িতেছে—কিছুদিনের মধ্যেই নদীতে রোলিং শুরু হইবে। এমন সময় প্রাণ হাতে করিয়া ভাসিয়া পড়িলে যে লাভ কী—বলরাম তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

সুতরাং মুক্তো রহিয়া গেল। তারপর একদিন রাত্রে যখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে, বাতাসে চর ইস্‌মাইলের সুপারির বন দুলিতেছে, আর বজ্রের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে তেঁতুলিয়ার জল, তখন মুক্তো এই সৃষ্টিছাড়া দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে আর ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

ফসল

এক

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়া গেল।

অবশ্য খুব সমারোহ করিয়া নয়। নোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায় না। আশেপাশে গাঙের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিকবর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নাইপের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা তুলাইয়া ফুট্‌ফুটে শাদা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা-চখী আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায়—হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।

ঝড় বৃষ্টির দিন আসিয়া পড়িতেছে। কয়দিন হইতেই অত্যন্ত গুমোট গরম। দুপুর-বেলা আকাশটা যেন একটা কাঁসার পাতের মতো জ্বলে, সেদিকে তাকাইতেও চোখ ঝলসিয়া যায়। থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে দমকা বাতাস আসে, সুপারি নারিকেলের বন যেন পাগলের মতো মাথা কুটিতে থাকে।

পোস্টমাস্টারের মনটা খারাপ হইয়া যায়। আকাশে বাতাসে যেন একটা অসীম উদাসীনতা। দূর দিগন্ত হাত বাড়াইয়া আকুল অন্তরের যাযাবরটিকে ডাক পাঠাইতে থাকে। সম্মুখে অজ্ঞাত পৃথিবী একখানা খোলা পাতার মতো মেলা রহিয়াছে। অক্ষর-গুলিকে পড়িতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়, চর ইস্‌মাইলের প্রত্যন্ত ছাড়াইয়া এক-একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ওই হাঁসের দলের মতো অলক্ষ্যের সন্ধানে ভাসিয়া পড়িতে। সুসঙ্গের পাহাড়, সাঁওতাল-পরগণার শালবন, জয়পুরের মরুভূমি, মাদুরার সমুদ্রতীর। হুঁকা হাতে করিয়া পোস্টমাস্টার বসিয়া থাকেন, গলার তাবিজটাকে পর্যন্ত অতিশয় ম্লান দেখায়।

কেরামদ্দি আসিয়া বলে, বাবু আমি বাজারে চললুম। ভাতটা চাপিয়ে দিয়েছি। ধরে না যায়, নামিয়ে রাখবেন।

পোস্টমাস্টার বলেন, হুঁ।

কেরামদ্দি চলিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরিতে থাকে। দু-একজন লোক আসে, কেউ একখানা পোস্টকার্ড, কেউ একটা মণি-অর্ডার। তারপরেই আবার সব নিঝুম হইয়া পড়ে। দূর হইতে বড় বড় নৌকার মাস্তুল দেখা যায়।

খানিক পরেই সচেতন হইয়া ওঠেন পোস্টমাস্টার। স্টোভের একটানা আওয়াজটা

শুধর হইতে কেমন যেন শোনা যাইতেছে। বাতাসে পোড়া ভাতের পরিষ্কার গন্ধ। কেরামদ্দি ভাতটা নামাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া দিয়াছিল বটে।

পোস্টমাস্টার পাশের ঘরে উঠিয়া গিয়া আস্তে স্টোভটি নিভাইয়া দেন। ভাতগুলি পুড়িয়া একেবারে লাল হইয়া গেছে। আবার না রাঁধিলে মুখে তোলা যাইবে না। অবশ্য এক বেলা না খাইলেও এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তা ছাড়া শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে—হয়তো আজ আবার তেমনি করিয়া হাঁপানির টান উঠিবে।

যাযাবর মনটাকে বিশ্বাস নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে গীর্জার ঘাট হইতে ছোট একখানা এক মাল্লাই নৌকা লইয়া সেখানাকে সুদূর দিগন্তে ভাসাইয়া দিলে কেমন হয় কে জানে। স্রোতের মুখে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইবে বঙ্গোপসাগরের মোহনায়—দৌলত-খাঁর বন্দরের আলো যেখানে চোখে দেখা যায় না—সেখানে দিগন্ত-মেখলায় চর কুকুরার শেষ নারিকেল বীথিও ছোট একটা বিন্দুর মতো অস্পষ্ট হইতে আরো অস্পষ্ট হইয়া ধূ ধূ আকাশের নীচে মিলাইয়া গেছে।

—তারপর? তার পরের ইতিহাস কে জানে? এই সমুদ্রের কি শেষ আছে? এই পথের কি কোনোদিন সমাপ্তি ঘটিবে? এই লবণ-সমুদ্রে কোথাও যদি ফলে-পুষ্পে-ঘেরা একটা প্রবালের দ্বীপ চোখে পড়িয়া যায় তো সেখানে তিনটি দিন কাটাইয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। অবশেষে যখন এমন দিন আসিবে যে আকাশ আর সমুদ্রের কোনো কূল-কিনারা নাই, ফল নাই, জল নাই—তখন হয়তো অসহ্য ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এই জীবনটার উপর দিয়া নামিবে শেষের যবনিকা। ছোট নৌকাখানির উপরে শরীরের মাংস গলিয়া পচিয়া ঝরিয়া গিয়া একটা শুকনো হাড়ের পঞ্জর দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুকাইতে থাকিবে।…

—হুম্।

পোস্টমাস্টার চমকিয়া উঠিলেন। ঘরে ঢুকিয়াছেন বলরাম ভিষক্‌রত্ন। একটা বিচিত্র প্রসন্নতায় চোখের তারা নাচিতেছে যেন। বলরামের এমন প্রসন্ন মুখভাব অনেক কাল দেখেন নাই হরিদাস।

—বলি, ব্যাপার কি দাদা! চোখ বুজে কি বৌদিকে ভাবছেন?

হরিদাস সাহা হাসিলেন। হাসিলে তাঁহার কালো মুখটায় এক ধরনের শ্রী দেখা যায়; বলরাম তাঁহার গম্ভীর মূর্তিটা সহ্য করিতে পারেন না—হরিদাসের গাম্ভীর্যের সঙ্গে কী একটা অনিবার্য কার্য-কারণ-যোগে তাঁহার মনটাও যেন খচখচ করিয়া ওঠে। কেন বলা যায় না—মাঝে মাঝে বলরামের মনে হয় হরিদাস প্রেত-সিদ্ধ, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার চোখের সামনে গোটাকয়েক ভূত নামাইয়া যা-তা কাণ্ড করিতে পারেন।

—হুঁ, বৌদিকেই বটে।—হরিদাস বড় বড় চোখ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন:

বিরহ-বেদনা আর কতকাল সহ্য করা যায়, বলো ?

—তা সত্যি।—বলরামের কণ্ঠে সহানুভূতির আমেজ লাগিল : এমন করে ক'দিন কাটাবে ? আর শরীরের অবস্থা তোমার যা হয়েছে দাদা, তাতে সব সময়েই সেবাশুশ্রূষা করবার একজন লোক দরকার। বুড়ো বয়েসে বউ কাছে না থাকলে—

বটে ? বলরামের মনে হইল, হরিদাস যেন তাঁহার দিকে এক রকম চোখ পাকাইয়াই চাহিলেন : হঠাৎ এ সব তত্ত্বকথা যে। স্পষ্ট করেই বলো তো কবিরাজ, দ্বিতীয় পক্ষের চেষ্টায় আছো নাকি ?

বলরাম অকারণে চমকিয়া উঠিলেন : যাও—যাও, দ্বিতীয় পক্ষ। বয়স গেল পঞ্চাশ ছাড়িয়ে, এই বুড়ো বয়সে আর—

—কেন উল্‌টো কথা বলছ ভায়া ? একটু আগেই না বলছিলে যে বুড়ো বয়সে বউ কাছে না থাকলে একেবারে অচল ? তা ছাড়া চেহারাবও তো জৌলুষ ফিরছে দেখছি। মাথায় তো দিব্যি একটি টাক পড়বার জো হয়েছে—ওদিকে গন্ধ-তেলটুকু মাখতে কসুর করোনি। যাই বলো আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে—

—সন্দেহ ? কী সন্দেহ ?—বলরামের আগাগোড়া চেহারাটাই যেন গেল বদলাইয়া। বলরাম জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না। তোমার কথাবার্তা সত্যি ভারী অভদ্র।

—অভদ্র ! কেন শুনি ?—বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া কী একটা অনুমান করিয়া লইয়াই হরিদাস অতিশয় সশব্দে হাসিতে শুরু করিয়া দিলেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক হাসি, যেন কবিরাজের দুইটা কানের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া মগজের মধ্যে করাত চালাইতে আরম্ভ করিল। বলরামের ইচ্ছা হইতে লাগিল, দু'হাতে কান চাপিয়া ধরিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান তিনি।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাটাকে বাঁচাইয়া দিল কেরামদ্দি।

বাজার লইয়া সে ঘরে ঢুকিল, তারপর প্রশ্ন করিল, ভাতটা নামিয়েছিলেন বাবু ?

একবারটি হাসি থামাইয়া হরিদাস আবার হাসিতে আরম্ভ করিলেন, ভাত ? সে অনেকক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে আছে।

—সে কি !

বাজারটা ফেলিয়া কেরামদ্দি ঘরে ঢুকিল। তারপর ভাতের হাঁড়িটার দিকে তাকাইয়াই ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না।

—ছি, ছি, এ যে একেবারে লাল হয়ে গেছে ! আবার রাঁধতে হবে তো ! আপনার কি কোনোদিকেই খেয়াল থাকে না বাবু ?

হরিদাস হাসিমুখেই বলিলেন, কী করে থাকবে ! কবিরাজ এল যে। যাক, তোমার

ভাতের থেকে দুটি আমাকে দিয়ো কেরামদ্দি, এ বেলা তাতেই আমার চলে যাবে!

—আমার ভাত? জাত যাবে যে বাবু!

—ইঃ, জাত যাবে! জাত যাওয়া মুখের কথা কিনা। আমি তো আর বামুন নই যে আমার জাত কাচের মতো ঠুন্ করে ভেঙে পড়বে। এ ভারী শক্ত জিনিস—শাবল-গাঁইতি ছাড়া ভাঙবার নয়।

বলরাম হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন, আমি এখন উঠলুম।

—উঠবে? নিতান্তই উঠবে! তা তুমিও তো একদিন নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করলে পারতে কবিরাজ। তোমার উনি ইদানীং কেমন রাঁধছেন-টাঁধছেন তা—

—যাও, যাও, সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না—এবার কিন্তু বলরাম জোর করিয়াও হাসিবার চেষ্টা করিলেন না। একখানা পাথরের মতো ভারী আর কালো মুখ লইয়া অত্যন্ত দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি রাগ করিয়াছেন।

হরিদাস এক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর সামনের টেবিলটার উপর স্বচ্ছন্দে দুখানি পা তুলিয়া দিয়া শিস দিতে শুরু করিলেন। সত্যি সত্যিই যেন বলরামের কী হইয়াছে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁহাকে এতখানি পরিহাস-বিমুখ কখনো দেখেন নাই হরিদাস। তাসের আড্ডাটাও কদিন ধরিয়া বন্ধ হইয়া আছে।

—ওয়ান মনি-অর্ডার বাবু!

হরিদাস তাকাইয়া দেখিলেন, জানালার বাহিরে একজন বর্মি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখোচোখি হইতেই সে মার্বেল-বাঁধানো কঠিন মুখের ভিতরে একটুখানি হাসিল, ওয়েল, বাবু?

—হাঁ, ওয়েল। তোমরা কবে এলে?

—কাল। তোমাকে একটু কষ্ট দিব বাবু, মনি-অর্ডার আছে একটা।

—কত টাকার?

—ফিফ্‌টি। যাবে পিনাঙে। কবে পৌঁছুবে?

পোস্টমাস্টার চিন্তা করিয়া বলিলেন, নো ক্লিয়ার আইডিয়া। আট-দশদিন দেরি হতে পারে।

—আট দশ দিন! তা কী আর করা যাবে!

পোস্টমাস্টার মনি-অর্ডার রাখিয়া একটা রসিদ দিতে বর্মি অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল। গত পাঁচ বছর ধরিয়া ছয় মাস পর পর ইহারা এখানে ব্যবসা করিতে আসে। কিসের ব্যবসা যে করে তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন না—তবে ধান-চাউলের কী একটা কারবার আছে বলিয়াই তিনি শুনিয়াছেন; কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময় লাগে

যে যাহাদের নিজের দেশ শস্যের অকৃপণ ঐশ্বর্য লইয়া বসিয়া আছে এবং বাংলা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষ যে দেশের মুখ চাহিয়া থাকে, সেই দেশ ছাড়িয়া ইহারা ভারতবর্ষে মরিতে আসে কী করিতে! এখানে আসিয়া ইহাদের এমন কী লাভটা হইবে! আর আসিলই যদি, তবে গোটা ভারতবর্ষের এত জায়গা ছাড়িয়া একেবারে সমুদ্রের মুখের মধ্যে এই সৃষ্টিছাড়া চরে ব্যবসার এমন কোন্ সুবিধাটা হইতেছে! তা ছাড়া দাদন দিয়াই যখন এখান হইতে ধান সুপারি কিনিতে হয়, তখন এখানে তো গাঁটের কড়িই খরচ করিবার কথা; কিন্তু ইহাদের ব্যবহারটা ঠিক উল্টা—ইহারা এখান হইতে পিনাং, মালয়, সাংহাইতে মনি-অর্ডারের পর মণি-অর্ডার করিতেছে!

চুলোয় যাক ও সব। আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খোঁজে দরকার নাই। পোস্ট-মাস্টার একটা হাই তুলিলেন।

কেরামদ্দি নতুন করিয়া কতকগুলি চাউল ধুইয়া আনিয়াছিল। বলিল, ভাত চাপিয়ে দিন বাবু!

—হয়েছে, হয়েছে—ভ্রূভঙ্গি করিয়া হরিদাস বলিলেন, এখন বসে বসে ভাত রাঁধতে আমার বয়ে গেছে। কেন দিক করছিস বাবা, যা হয় চারটি তুই-ই রেঁধে দে না।

—আমি রেঁধে দেব বাবু?—কেরামদ্দি বিস্মিত হইয়া কহিল, আমার ছোঁয়া খাবেন আপনি!

—খাব না? কেন খাব না শুনি? আমার কালী পেত্নী বৌয়ের ছোঁয়াই যদি খেতে পেরেছি, তুমি আর কী দোষ করলে? ভয় নেই—আমি সমস্ত জাতের ওপরে, ওতে কোনো ক্ষতি হবে না।

কেরামদ্দি হাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কালুপাড়ায় আসিয়া মণিমোহনের বোট ভিড়িল, তখন দিক্‌দিগন্ত ঘিরিয়া কালো সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। যেখানে আসিয়া নৌকাটা প্রথম লাগিল সে জায়গা হইতে গ্রাম ঠিক কাছে নয়। সম্মুখে অনেকটা জুড়িয়া বিস্তীর্ণ পঙ্কতট—জোয়ার আসিলে ঘোলা জলে ভরিয়া যায়। তারপর যখন কোনো সময় নদীর জলে বাতাসের দোলা লাগে তখন ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পা-ওয়ালা ছোট ছোট মিনু মাছ কাদার উপরে লাফাইতে থাকে।

এখান হইতে সামনে চাহিলে দেখা যায়: দূরের রিক্ত মাঠের উপর দিয়া যেন অন্ধকারের একটা বেড়াজাল কে ঘিরিয়া দিয়াছে। সারি সারি নারিকেল সুপারির মাঝখান দিয়া এক-একটি আলোর রশ্মি আলেয়ার মতো দেখা যাইতেছে। ওইটাই গ্রাম।

বর্ষার সময় অবশ্য নৌকা লইয়া বড় নদীতেই বসিয়া থাকিতে হয় না। বাঁ দিকে একটু দূরে যে ছোট খালটি শুকাইয়া একটা খাদের মতো পড়িয়া আছে, ওইটা তখন অজস্র জলে টই-টম্বুর হইয়া যায়। শুধু ডিঙি নৌকা কেন—সরকারের এত বড় বোটখানাকেও তখন একেবারে গ্রামের বুক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া চলে।

সন্ধ্যার পর আর কোনো কাজ হইবে না, অতএব চুপচাপ বোটে বসিয়াই কাটাইতে হইবে রাতটা। মাঝিরা ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত চাপাইয়া দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে দশটার উপরে বাজিয়া গেল এবং সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত মাঝির দল যে-যেখানে পারিল পড়িয়া রহিল লম্বা হইয়া। কেবল সারাটা নির্জন রাত্রি ধরিয়া তেঁতুলিয়ার জল অশ্রান্তভাবে বোটটার চারি পাশে খেলা করিতে লাগিল—সম্মুখে পশ্চাতে অপর্যাপ্ত লোনার উপর ফস্‌ফরাস্ চিক্ চিক্ করিতে লাগিল এবং হুহু করা বাতাসে দ্বিপ্রহর অবধি মণিমোহনের ঘুম আসিল না। নিম্ন বাংলার রাক্ষসী নদীটা এই রাত্রে কেমন করিয়া যেন মায়াময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

সকাল বেলা পঙ্কতীর পার হইয়া সামনের মাঠের মধ্যে মণিমোহন ছোটখাটো একটি কাছারী করিয়া বসিল। দেশটা প্রায় আগাগোড়া জেলে আর মুসলমানের—তবে মগও কিছু কিছু আছে। তাহারা এখানে ব্যবসা করে। বর্মা চুরুটের জন্য সুপারির বাল্‌দোর কী দরকার আছে কে জানে, সেগুলি নাকি এখান হইতে সংগ্রহ করে তাহারা।

পেয়াদা গিয়া প্রজাদের খবর দিয়া ডাকিয়া আনিল। দুর্বৎসরে গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহাদের টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। এখন সেই টাকাটা আদায়ের সময়।

এই দূর দুর্গম দেশে প্রজারা অফিস-আদালত এবং সহরের আরো দশটা উপসর্গের চৌহদ্দি হইতে পুরাপুরি বাহিরেই আছে। এক ফৌজদারী জাতীয় আইন-ঘটিত বিশৃঙ্খলাই ইহাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে এবং তাহার মীমাংসা এরা নিজেরাই করিয়া লয়। সুতরাং সরকার-সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র পেয়াদাও এখানে আসিয়া দর্শন দিলে ইহারা তাহাকে অতিরিক্ত সমীহ করিয়া থাকে। সেই কারণে, সরকারী তহশীলদারের আবির্ভাব ইহাদের একটা বিরাট স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথমে যে লোকটি আসিল, তাহার বয়স হইয়াছে। অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ চেহারা, বয়সের স্পর্শে বাঁধুনি ঢিলা হইয়া পড়ে নাই। একমুখ পাকা দাড়ি মেহেদী দিয়া রাঙানো হইয়াছে, কিন্তু বার্ধক্যের পাশাপাশি এই অঙ্গরাগটুকু যেন মানায় নাই। পরনের লুঙ্গিটার রঙ সাদাই ছিল—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ময়লার একটা পুরু আবরণ পড়ায় এখন তাহার জাতিগোত্র নির্ণয় করিবার জো নাই।

এক হাতে একজোড়া মুরগী ঝুলাইয়া আনিয়াছিল। আসিয়াই সে একটা সশ্রদ্ধ সেলাম জানাইল, বলিল, হুজুরের শরীর ভালো আছে তো?

যেন কতকালের চেনা। মণিমোহন হাসিয়া বলিল, হাঁ ভালোই আছে ; কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলুম না।

—চিনতে পারবেন কেমন করে ? আর কখনো এ তল্লাটে আসেননি তো। আগে যিনি এই 'সারখেলে' ছিলেন তিনি আমায় ভালো করে চিনতেন। বান্দার নাম মজাঃফর মিঞা।

—ও, মজাঃফর মিঞা। কত টাকার লোন তোমার ?

—আজ্ঞে সে সামান্যই—হুজুরের চোখে পড়বার মতো নয়।

মজাঃফর মিঞা বিনয়ে জিভ্ কাটিল। তারপর মুরগী জোড়া মণিমোহনের পায়ের কাছে রাখিয়া বিনয়-গলিত স্বরে বলিল, হুজুর যদি কিছু মনে না করেন—

কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মণিমোহন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

—গোপীনাথ !

গোপীনাথ খাতা খুলিয়া বসিয়াই ছিল, আজ্ঞে ?

—দেখ তো মজাঃফর মিঞার কাছে কত টাকা পাওয়া যাবে ?

মজাঃফর বিব্রত হইয়া উঠিল। আর একবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ্ঞে সে কটা সামান্য টাকার জন্যে সরকার বাহাদুরের আর—

কর্তব্য পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে গোপীনাথ। ধমক দিয়া কহিল, বেশি কথা কোয়ো না বড় মিঞা। দেখছ তো স্বয়ং হুজুর সামনে বসে আছেন। বলো, তোমার বাপের নাম কি ?

—বাপের নাম, বাপের নাম ?

অধৈর্য স্বরে গোপীনাথ বলিল, হাঁ হাঁ বাপের নাম। ও কি মাথা চুলকোচ্ছ যে—বলি, সেটা কি ভুলে গেছ নাকি ?

মজাঃফর মিঞা মেহেদী রাঙানো দাড়ির ভিতর দিয়া বিনীত মৃদু হাস্য করিল। লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে ভুলে যাওয়াটা তো তাজ্জব নয়। আমার বয়েস যদি তিন কুড়ি সাত বছর হয়, তবে তিনি কতকাল আগে বেহেস্তে গেছেন ভেবে দেখুন দেখি ?

মণিমোহন অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিল।

গোপীনাথ তখন আঙুলে থুথু লাগাইয়া খস্ খস্ করিয়া একখানা মোটা খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। মৌজে রঘুনাথপুর, মৌজে ভ্যাবলাহাট, মৌজে কালুপাড়া, কালুপাড়া—

—চালাকি পেয়েছ নাকি ? এ জমিদারী সেরেস্তার তহশীলদার নয়—একেবারে সাক্ষাৎ হাকিম। বেশি ওস্তাদি করো তো সদরে যেতে হবে খেয়াল থাকে যেন। বলো শীগগির, বাপের নাম কী ?

মজাঃফর মিঞা যেন মুষড়াইয়া গেল। সদর নামটা এমন প্রবীণ জোয়ান লোকটার

মনের উপরেও অদ্ভুতভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। কাতর কণ্ঠের উত্তর আসিল, আস্রাফ মিঞা।

—হুঁ। এই তো কথা ফুটেছে দেখছি। মণিরুদ্দিন মিঞা, করম গাজী—হাঁ, এই যে মজাঃফর মিঞা। সাং গোবালিয়া মৌজে কালুপাড়া—পিং মৃত আস্রাফ আলী হাওলাদার —ওরে বাপ্‌রে, ৫২৷৶৫ পয়সা!

গোপীনাথ মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবু মুরগী দেওয়ার ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলেন তো?

মণিমোহন হাসিয়া কহিল, সেটা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলুম।

দুটি-একটি করিয়া চারিপাশে তখন অনেক কয়টি প্রজা আসিয়া ভিড় করিয়াছে। খাসমহল কাছারীর তহশীলদারের এই আকস্মিক আবির্ভাবে তাদের মন যে আনন্দে উছলাইয়া ওঠে নাই, সেটা তাদের অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করিয়া লওয়া চলে। তবু একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল—মজাঃফর মিঞার দুর্গতিতে তাহারা অনেকেই খুশি হইয়া উঠিয়াছে।

গোপীনাথ মুখের উপর একটা ভীতিদায়ক গাম্ভীর্য টানিয়া আনিয়া বলে, হুঁ, ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে। হাসি বেরিয়ে যাচ্ছে সব—দাঁড়াও। তারপর বড় মিঞা, টাকার কী হবে?

বড় মিঞা ম্লান হইয়া বলিল, কী হবে তা তো আমিও ভাবছি। সব সুপুরি বাদুড়ে নষ্ট করে দিলে, ধানও এমন পাইনি যে—

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া উঠিল: কেন মিথ্যে কথা বলে এই বুড়ো বয়েসে পাপের বোঝা বাড়াচ্ছ বল তো? বাদুড়ে আর কটা সুপুরি খেয়ে নষ্ট করতে পারে। তা ছাড়া সবাই-ই তো বলছে, এবারের মতো ধান গত পাঁচ বছরেও হয়নি।

মজাঃফর কহিল, নসীব হুজুর, নসীব। যার বরাত ভালো সে পেয়েছে; কিন্তু আমি —ক্ষোভে বড় মিঞার মেহেদী রঙীন্ দাড়িটি যেন কাতর হইয়া গালের দুই পাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

মণিমোহন কহিল, আচ্ছা বেশ, সব না পারো, অর্ধেক দাও। তোমরা টাকা না দিলে আমার চাকরি কী করে থাকবে। তিরিশটা টাকা ফেলে দাও, তা হলেই—

—তিরিশ টাকা! বড় মিঞার চোখ দুইটা প্রায় কপালে উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গোপীনাথ মুখ বিকৃত করিয়া কী একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভিড়ের মধ্য হইতে আর একজন কথা কহিয়া উঠিল।

—তা এমন শক্তটা কী! এই পরশুই তো একজোড়া মোষ আশী টাকায় বিক্রি করেছ চাচা, তা থেকেই টাকা কটা ফেলে দাও না!

বিনা মেঘে কোথা হইতে বজ্রাঘাত হইয়া গেল যেন।

হাকিমের সামনে এতক্ষণ বিনয়াবনত হইয়া থাকিলেও এইবারে মজাঃফর মিঞার আর ধৈর্য রহিল না।—কে, কাশেম খাঁর ব্যাটা বুঝি? বেশ করেছি, বিক্রি করেছি আশী টাকায়, তোকে এখানে মোড়লী করতে কে ডেকেছে?

—কেউ ডাকেনি—হুজুরকে কেবল খবরটা দিয়ে দিলুম।—অত্যন্ত নিরীহ স্বরে কাশেম খাঁর ব্যাটা জবাব দিল। কিছুদিন আগেও গায়ের জোরে গোরু নামাইয়া মজাঃফর মিঞা তাহার ক্ষেতের ধান খাওয়াইয়াছে, সে কথা সে ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যায় নাই।

—ইঃ, মস্ত খবর দেনে-ওয়ালা এসেছে রে!—মজাঃফর মিঞা বারুদের মতো জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, ও ব্যাটাচ্ছেলের কথা বিশ্বাস করবেন না। শত্রুতা আছে বলে আমার নামে যা নয় তাই লাগাচ্ছে।

—আচ্ছা, সে আমি দেখছি। ও মিথ্যে বলছে কিনা তার বিচার পরে করব; কিন্তু অন্তত তিরিশটা টাকা না দিলে তো—

কথাটার মাঝখানেই বড় মিঞা সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত জোড় করিল। গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া কিছু একটা বলিবার উপক্রম করিতেই একটা বিশৃঙ্খল উগ্র কোলাহল আসিয়া সমস্তটারই সুর কাটিয়া দিল।

সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা বিক্ষুব্ধ জনতা। সর্বাগ্রে আধাবয়সী একজন মগ, তাহার কপালে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত নামিয়া আসিতেছে। গালের দুটি পাশ দিয়া, গলার খাঁজ বাহিয়া ময়লা ফতুয়াটার উপর ফোঁটায় ফোঁটায় থক্‌থকে গাঢ় রক্ত টপ্‌ টপ্‌ করিয়া পড়িতেছে। নোংরা বুনো চেহারা, গালে মুখে পাতলা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রক্ত মাখিয়া মা দুর্গার মহিষাসুরের মতো দেখাইতেছে।

গোপীনাথ বলিল, কী সর্বনাশ!

মণিমোহন চমকিয়া বলিল, কী হয়েছে? এমন করে কে মারলে!

লোকটা কোনো জবাব দিল না, দুর্বোধ্য ভাষায় কেবল বিড়বিড় করিয়া কী বকিল খানিকটা। সঙ্গে যে সমস্ত মুসলমান আসিয়াছিল, সমবেত চিৎকারে তাহারা জানাইয়া দিল, মেরেছে হুজুর, মেরেছে।

—মেরেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু কে মারলে?

অপরাধী দূরে ছিল না—জনতার সঙ্গেই সে আসিয়াছিল। অথবা জোর করিয়াই আনা হইয়াছিল তাহাকে। মণিমোহন প্রশ্ন করিবামাত্র তিন-চারজন লোক তাহাকে হিড় হিড় করিয়া সামনে টানিয়া আনিল। সে তো প্রাণপণে গালাগালি করিতে লাগিলই, তা ছাড়া যাহাকে সুবিধা পাইল, সাধ্যমত আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিতে ত্রুটি করিল না।

সেদিকে চাহিতেই মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া গেল।

যেন চারিদিকের এই অমার্জিত অন্ধকারের রাজ্যে এক খণ্ড অঙ্গার কোথা হইতে ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি মগের মেয়ে। সুশ্রী ছিপছিপে দেহ, গায়ের রঙ্‌টি এই নোনার দেশে আসিয়াও মলিন হইয়া যায় নাই। যৌবনশ্রী যেন তাহার পূর্ণায়ত দেহ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—সেদিকে তাকাইলেও নেশা ধরিয়া যায়। তাহার দুইটি নীল চোখ প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিতেছে—যেন দুই খণ্ড হীরার মধ্য হইতে বিষের একটা নীলাভ দ্যুতি ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

বোকার মতো শুধু প্রশ্ন করিতে পারিল : এ কে ?

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন আহত লোকটিকে দেখাইয়া বলিল, এর স্ত্রী।

—এর স্ত্রী!—এমন রাজকন্যার স্বামী হইয়া বসিয়াছে ভালুকের মতো এই কদাকার লোকটা! আত্ম-সংবরণ করিয়া মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল : কিন্তু স্বামীকে এমন করে মারলে কেন ?

মগের মেয়েটি এতক্ষণ পর মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ, কিন্তু সরল। মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে কেবল যে বাঁকা বিদ্যুৎই ঝলকিয়া যায় না—এই দৃষ্টিটা দেখিয়া সে কথাই মণিমোহনের মনে পড়িল। এ তরবারির মতো সোজা এবং শাণিত, কেবল দেখিতে চায় না, বিঁধিয়া ফেলিতে চায়।

সহজ কণ্ঠে, স্পষ্ট প্রাদেশিক বাংলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সদরের সরকারী লোক ?

—হাঁ।

—তা হলে তোমার কাছেই বিচার চাই।

—বিচার!—মণিমোহন বিস্মিত হইয়া বলিল, বেশ তো, বলো।

মেয়েটি কথা না বলিয়া চারিদিকের জনতার দিকে একবার তাকাইল। মণিমোহন তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল। মজাঃফর মিঞাকে ডাকিয়া সে বলিল, বড় মিঞা, এখান থেকে সব ভিড় সরাও—পরে তোমাদের ব্যাপার বুঝবো।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে অসন্তোষের একটা গুঞ্জন উঠিল। অনেক আশা করিয়া তাহারা আসিয়াছে, এত সহজেই তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে! তা ছাড়া মেয়েটা যখন গোপনে আরজি করিতে চাহিতেছে, তখন গুরুতর ব্যাপার একটা কিছু আছেই।

গোপীনাথ চোখ পাকাইয়া বলিল, যাও—এখান থেকে যাও সব।

অতএব যাইতেই হইল। সরকারী কর্মচারী তো নয়, সাক্ষাৎ হাকিম। ইচ্ছা করিলে যখন-তখন সদর ঘুরাইয়া আনিতে পারে। তাহারা দূরে দূরে সরিয়া গেল, কিন্তু একেবারে

চলিয়া গেল না।

মণিমোহন গম্ভীর হইয়া কহিল, কী তোমার নালিশ ?

আহত লোকটা কথার মাঝখানে একবার হাউমাউ করিয়া উঠিল—যেন কী একটা কথা তাহার বলিবার আছে ; কিন্তু একটা বজ্র ধমকেই মেয়েটি তাহাকে দিল থামাইয়া।

—নালিশ ? নালিশ অনেক আছে। ও আমার স্বামী বটে, কিন্তু দিনরাত মদ খায়। আমাকে যখন-তখন মারে। কী একটা মেয়েমানুষ আছে, তার ওখানে রাত কাটিয়ে আসে। তুমি সরকারী লোক এসেছ বাবু, তুমিই এর বিচার করো। আজ তো কেবল ইট মেরেছি, এতে যদি শায়েস্তা না হয় তো একদিন দা দিয়ে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলব—এই বলে রাখছি।

মেয়েটা কথার তোড়ে যেন ঝড় বহিয়া গেল।

গোপীনাথ শিহরিয়া বলিল, বাপস্, সাক্ষাৎ জাত-গোখরোর বাচ্ছা !

রসিকতাটা মেয়েটি বুঝিতে পারিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার চোখ দুইটি তেমনি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

—করবে তো বাবু বিচার ?

—করব বই কি।—মণিমোহন একবার কাশিয়া ফরিয়াদী এবং আসামী স্বামীটির দিকে চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, এ যা বলছে, তা কি সত্যি ?

ধমক খাইয়া লোকটা সেই যে চুপটি মারিয়াছিল, এতক্ষণে তাহার মুখ খুলিল। আউ আউ করিয়া ভাঙা বাংলায় সে বলিল, না—না হুজুর, এ যা বলছে সব—

মেয়েটি আকস্মিকভাবে আবার গর্জিয়া উঠিল। বেচারী স্বামী যে ধমক খাইয়া শুধু থামিয়াই গেল তা নয়, ধপ করিয়া একেবারে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল, করুণা হয় লোকটার অবস্থা দেখিলে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' মনে পড়িল, যেখানে মেয়েরা পুরুষকে ধরিয়া সদর রাস্তায় ঠ্যাঙাইতেছে। এ তো তাদেরই স্বজাতি !

—আবার মিথ্যে কথা বলছ ! চুপ করে থাকো, একেবারে চুপ।

একেবারে চুপ করিয়াই সে রহিল। কপালের ক্ষতটা তাহার এমন বেশি নয়, সাধারণ ভাবে একটু চামড়া কাটিয়া গেছে মাত্র। হয়তো পাঁচ-সাত দিন পরে আপনিই শুকাইয়া ঠিক হইয়া যাইবে ; কিন্তু আপাতত এই মুহূর্তে সে যে স্ত্রীর ভয়েই বেশি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেটা বুঝিয়া নেওয়া কঠিন ছিল না।

তাহার হইয়া জবাব মেয়েটিই দিল। বলিল, ও আর কী বলবে বাবু, ওর বলবার কী আছে। আজ ওকে ইট মেরেছি, বাড়াবাড়ি করলে দা বসাব, সেইটেই বুঝিয়ে দিন।

মণিমোহন হাসিল।

—দা বসাবে? দা বসালে ফাঁসি হবে, জানো?

—ইঃ, ফাঁসি!—মেয়েটির ভ্রূভঙ্গি যেন অদ্ভুত একটা রূপের ছটা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিল। দেখিয়া মনে হইল বাস্তবিকই ইহাকে ফাঁসি দিবার মতো দড়ি আজো সৃষ্টি হয় নাই।

মণিমোহন স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, যাও, কখনো আর এমন কোরো না। স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে মার খেতে হবে, এ তো জানাই আছে।

স্বামীটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে মাথা নাড়িল। যেন পরমব্রহ্ম সম্পর্কিত একটা দার্শনিক তত্ত্ব এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে।

মেয়েটি এইবার ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। আরক্ত ক্ষুদ্র দুইটি ঠোঁটের ভিতর হইতে উজ্জ্বল কয়েকটি তীক্ষ্ণ দাঁত বাহির হইয়া আসিল। দেখিতে মনোরম, কিন্তু তাহার সহিত শ্বাপদের দাঁতের কোথাও একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো।

—আর তুমিও কখনো এমন করে মেরো না। হাজার হোক, স্বামী তো। লোকে কী বলবে?

—নিজের দোষে মার খেলে আমি কী করব? মেয়েটির মুখে হাসিটুকু আল্‌গাভাবে লাগিয়াই রহিল: তুমি বড় ভালোমানুষ সরকারী বাবু, ঠিক বিচার করতে জানো: কিন্তু গাঁয়ের লোকেই কেবল বুঝতে চায় না।

তাহার নীল চোখ দুইটি এতক্ষণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বিষাক্ত হীরা নয়—যেন দুই খণ্ড নীলকান্ত মণি। সেই চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে মণিমোহনের দিকে তাকাইল।

গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, তোদের দেশ কোথায়?

—বর্মা দেশ, মৌলমিন।

—এখানে কী করো?

মেয়েটির ভ্রূভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ পাইল।

—এখানে থাকি আর কী করব। জমি আছে, খামার আছে। তারপর মণিমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, গাঁয়ের ভেতর যদি যাও তবে আমার ওখানে একবার যেয়ো না বাবু! আমার নাম মা-ফুন।

আহত লোকটার রক্তাক্ত মুখখানা মণিমোহনকে পীড়িত করিতেছিল। সে বলিল, আচ্ছা যাব। কিন্তু তার আগে তোমার স্বামীর মাথাটা ভালো করে ধুইয়ে দাও। যে ইট মেরেছ, বেচারা প্রাণে বেঁচে আছে এ ওর জোর কপাল।

—ইঃ, মরবে! ওর মরা এত সস্তা কিনা! মরলে আমাকে এমন করে কে জ্বালাবে? আচ্ছা, চললুম বাবু।

অভিবাদন জানাইয়া আর একবার সহাস্ত কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় স্বামীকে টানিয়াই লইয়া গেল একরকম। কসাইখানার পথে মৃত্যুভীত পশুকে যেমন হিঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায়, ভাবটা সেই জাতীয়।

গোপীনাথ জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দেখলেন হুজুর, কী চীজ একখানা! সাক্ষাৎ মগের মেয়ে তো! বাঘিনীর চাইতে কম নয়!

অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ সামনে নদীর দিকে চাহিয়া রহিল মণিমোহন। তারপর বড় করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হুঁ:, ডাকো ওদের। বসে থাকলে তো চলবে না, আদায়ের বন্দোবস্ত যাহোক একটা করতে হবেই।

তিন

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

কিন্তু বিলের বুকে দুটি-চারটি বুনো-কল্‌মি ফুল ছাড়া সে বসন্তকে বুঝিবার জো নাই। অবশ্য মানুষের মনের কথা আলাদা। প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত জীব-জগতেই যখন বসন্তের চেতনা প্রসারিত হইয়া পড়ে—তখন এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে তাহার রূপ ও রঙ বদলায় মাত্র।

বসন্তের বাতাসে যে চিরন্তন ক্ষুধাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোনো আকার নাই। ক্ষুধা হিসাবে সে সর্বজনীন, কিন্তু কোন্ পটভূমিতে সে যে কী রূপান্তর লইবে সেটা কেউ বলিতে পারে না। মঞ্জরিত বনস্থলীতে কস্তুরীমৃগের গন্ধে তাহার যে ছায়াছবি রূপ পাইয়া ওঠে, অথবা নাগরিক জগতের আলো-ঝলসিত রাজপথে চকিত কটাক্ষের মধ্য দিয়া যে ভাবে সে ধরা দেয়—এখানে সে ভাবে তাকে খুঁজিয়া পাইবার জো নাই।

এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কালবৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মতো ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে।

পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে এই চর ইস্‌মাইল।

তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রবে আসিয়া অনাসৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।

* * * *

জোহান ভয় পাইয়াছিল যেমন, উত্তেজিত হইয়াছিল তেমনই। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলি কে ছুঁড়িয়াছে, সে-সম্বন্ধে সে একটা মোটামুটি আন্দাজ যে না করিয়াছিল

তা নয়। রাগটা তাহার নানা কারণে বেশি হইয়াছিল ডি-সুজার উপরেই। ডি-সুজা যা ভাবিয়াছে তাহার চাইতে -সে-যে অনেক বেশি বিপজ্জনক, সে-কথাটা বুঝাইয়া দিবার সময় হইয়াছে।

সুযোগ করিয়া একদিন লিসিকে লইয়া সে ভাসিয়া পড়িবে চিদাম্বরমে। তাহার এক খুড়া সেখানে মান্দ্রাজ সাউথ্ মারাঠা রেলোয়েতে ড্রাইভারী করে, সে সেখানে যাহোক একটা কিছু চাকরি-বাকরি জুটাইয়া দিবেই।

জোহান আসিয়া যখন লিসির দেখা পাইল, লিসি তখন একরাশ পেঁয়াজ লইয়া ছাড়াইতে বসিয়াছে। ডি-সুজা বাড়িতে নাই, সম্ভবত সহরে গিয়াছে। অথবা কোথায় গিয়াছে জোহানের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়।

জোহানের মুখের দিকে বাঁকা কটাক্ষ করিয়া লিসি বলিল, আবার এলে যে!

লিসির পাশে একটা ভাঙা টুলের উপরে জোহান বসিয়া পড়িল ধপ্ করিয়া। কাতরোক্তি করিয়া কহিল, নাঃ, আর পারা যায় না!

বিরল ভ্রূ-রেখাটাকে লিসি বাঁকাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, কেন, কী হয়েছে?

—হয়েছে অনেক কিছুই। চলো, এখানে আর নয়। আমরা পালাই।

লিসি সত্যি সত্যিই চমকিয়া উঠিল, পালাব। কী বলছ জোহান? কোথায় পালাব?

জোহানের কণ্ঠস্বরে মরীয়া ভাব প্রকাশ পাইল: চিদাম্বরম্ —মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। আমার এক কাকা আছে এম্-এস্-এম্-এর ড্রাইভার। সে-ই চাকরি জুটিয়ে দেবে। তা ছাড়া গোয়াতেও যেতে পারি, সেখানেও--

—ক্ষেপেছ তুমি?

মুহূর্তের জন্য লিসিকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মনে হইল। সে জোহানের মুখের অত্যন্ত কাছে মুখটা আনিয়া কী একটা ঘ্রাণ লইবার চেষ্টা করিল। ভোঁতা ছোট নাকটিকে বার কয়েক সুন্দরভাবে কুঁচকাইয়া স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করিল, কী ব্যাপার? আজ বুঝি আবার খানিকটা তাড়ি খেয়ে এসেছ?

—না লিসি, তাড়ি খাইনি। সত্যি বলছি

একটা ঝট্‌কা মারিয়া লিসি তিন পা সরিয়া গেল। আধখানা কাঁচা পেঁয়াজ কচমচ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কুঞ্চিত মুখে মন্তব্য করিল, সত্যি তো তুমি চিরকালই বলে আসছ! তাড়ি খেলেই তোমার মুখ দিয়ে ভালো ভালো গস্‌পেল বেরোতে থাকে। যাও যাও, বোকো না এখন। আমার বিস্তর কাজ রয়েছে!

জোহান বিব্রত হইয়া বলিল, তাড়ি একটু খেয়েছি বটে, কিন্তু মেরীর নাম করে বলছি লিসি, আমার একটুও নেশা হয়নি। বড্ড দরকারী একটা কথার জন্যে তোমার কাছে এসেছি, রাগ কোরো না।

লিসির অবিশ্বাস গেল না, তবু একটু কাছে আগাইয়া আসিল সে। বলিল, হুঁ। তা দরকারী কথাটা কী, শুনি?

জোহান গলাটা নামাইয়া আনিল, বলিল, কাল বিলে হাঁস মারতে গিয়েছিলুম। জলে নেমেছি, এমন সময় দূরের থেকে দুম্ দুম্ করে কে দুটো গুলি ছুঁড়লে। একটা তো কানের ওপর দিয়ে গেছে। বেঁচে গেছি কেবল মেরীর দয়ায়।

লিসির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—কে গুলি ছুঁড়লে দেখতে পাওনি?

—কী করে পাবো: প্রাণের ভয়ে আধ ঘণ্টা তো বিলের কাদার ভিতরেই ডুবে ছিলুম। উঠে আর কারো পাত্তা পাইনি।

শঙ্কিত মুখে ত্রস্ত গলায় লিসি বলিল, এ নিশ্চয় ও ব্যাটার কাজ। ও তোমাকে সন্দেহ করেছে। ভালো চাও তো আজই এখান থেকে পালাও জোহান!

—পালাবই তো। আর সেজন্যে তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই।

—কিন্তু আমি! আমি কী করে যাব!

জোহান মিনতি করিয়া কহিল, তুমি না গেলে কী করে চলবে লিসি! তোমার আশাতেই কোনো রকমে বেঁচে আছি। চলো, আজ রাত্রেই নৌকো করে—

—জোহান!

দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। চোখ পড়িতেই দেখিল দরজার কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ডি-সুজা। রাগে তাহার চোখ দুটি বাঘের মতো দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

ডি-সুজা বলিল, নিষেধ করে দিয়েছি, তবু আমার বাড়িতে তুমি কেন এসেছ! বেল্লিক, উল্লুক, ভল্লুক, শয়তান কোথাকার!

জোহান গরম হইয়া কহিল, গালাগালি কোরো না ঠাকুর্দা!

ডি-সুজা ভ্যাঙচাইয়া কহিল, না, গালাগালি করবে না, আদর করে চুমু খাবে! যাও, বেরোও আমার বাড়ি থেকে, হতভাগা, পাজী, শুয়োর, গাধা—

জোহানের মাথার মধ্যে পর্তুগীজ রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল। দুই পা সাম্‌নে আসিয়া সে বলিল, আবার গালাগালি করছ ঠাকুর্দা!

—গালাগালি! খুন করে ফেলব তোকে। ব্যাটা—বাপ মা সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া ডি-সুজা অত্যন্ত কদর্যভাবে একটা গালি-বর্ষণ করিল।

জোহানের চোখের তারায় একটা হিংসার আলো চিক্‌চিক্ করিতে লাগিল।

—বেশি কথা কোয়ো না ঠাকুর্দা। জানো তুমি, ইচ্ছে করলে তোমাকে দশ বছরের মতো ঘানি টানিয়ে আনতে পারি?

—কী, কী বললি!—ভয় এবং ক্রোধে ডি-সুজার সর্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল: কী বললি তুই!

—যা বলছি তা সোজা কথা। হাঁ, পুরো দশ বছর। এর কমে যদি মেয়াদ হয় তো আমার নাম বদলে রেখো।

লিসি চমকিয়া বলিল, জোহান!

কিন্তু জোহানকে শয়তানে পাইয়াছিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে একটা ভয়ংকর সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখিয়াও সে এতটুকু ভয় পাইল না। কহিল, বলব না, বলবই তো? চোরাই আফিঙের ব্যবসা করে লাল হয়ে উঠেছ ঠাকুর্দা—

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল ডি-সুজা। আরাকানী রক্তমিশ্রিত তাহার তামাটে মুখ যেন একখণ্ড সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। এতক্ষণ ধরিয়া যেটা দ্বিধার মতো চোখের সামনে ভাসিতেছিল, সেটা আর দ্বিধা নাই; রহস্যের পাতলা স্বচ্ছ আবরণটা সরিয়া গিয়া বহু আশঙ্কার সেই নিদারুণ সত্যটাই প্রকাশ পাইয়া বসিয়াছে।

লিসি আবার বলিতে চাহিল, জোহান! কিন্তু ভয় আসিয়া তাহার গলায় এম্নি জাঁকিয়া বসিয়াছে যে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ছাড়া আর কথা বাহির হইল না।

ডি-সুজার চোখের সামনে দপ্ করিয়া সর্বপ্রথম বর্মিটার মুখখানা আসিয়াই দেখা দিল। অন্ধকার পর্দার উপরে যেমন ভাবে ছবি ফুটিয়া ওঠে—তেম্নি করিয়াই তাহার সেই বিকারহীন পাথুরে মুখখানা তাহার মনের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদে চোখ দুইটা দিয়া একটি মাত্র ইঙ্গিতই বাহির হইতেছিল এবং সে ইঙ্গিত—

ফস্ করিয়া ডি-সুজা পা-জামার মধ্যে হাত পুরিয়া দিল এবং পরক্ষণেই হাতে করিয়া যা বাহির করিয়া আনিল, সে দিকে চাহিয়া জোহানের চোখ টোম্যাটোর মতো বড় বড় হইয়া উঠিল।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারটা তখন অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

জোহান রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, পিস্তল!

—হাঁ, পিস্তল। তোকে খুন করব আমি! ডি-সুজার কম্পিত তর্জনীটা কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রিগারটাকে খুঁজিতে লাগিল।

চট্ করিয়া যেন চমক ভাঙিয়া গেল লিসির। বাঘের মতো একটা থাবা দিয়া সে ডি-সুজার হাত হইতে অস্ত্রটা ছিনাইয়া লইল। বলিল, ঠাকুর্দা, করছ কী! সত্যিই কি তুমি খুন করতে যাচ্ছ নাকি!

অস্ত্রটা লিসির হাতে নিরাপদ জায়গায় গিয়া পৌছিয়াছে দেখিয়া বীরদর্পে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল জোহান। তারপর চোখের পলক না ফেলিতে সে ধাঁ করিয়া

প্রকাণ্ড একটা ঘুষি বসাইয়া দিল ডি-সুজার মুখে।

—খুন করবে! খুন করা এতই সস্তা!

ঘুষি খাইয়া তিন পা পিছাইয়া গেল ডি-সুজা। তারপর আঘাতটাকে সহ্য করিয়া যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন জোহান অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কিন্তু ডি-সুজার দিকে চাহিয়া লিসির আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না।

—ঠাকুর্দা! ঠাকুর্দা!

ঠাকুদার নাক দিয়া তখন ঝর্ ঝর্ করিয়া তাজা রক্ত ঝরিতেছিল। তাহার শাদা গোঁফজোড়াকে ভিজাইয়া সে রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়িতেছিল।

লিসি কহিল, তোমাকে মারলে ও! তাহার মঙ্গোলীয়ান মুখখানা ঘিরিয়া বন্য ব্যাঘ্রীর হিংস্রতা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

ডি-সুজা কী একটা বলার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুই হাতে রক্তাক্ত নাকটা চাপিয়া ধরিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

সপ্তাহে একটি দিন চর ইস্‌মাইলে খুব বড় করিয়া হাট বসে।

চরের উত্তরে যেখানে তিনটি সরু খাল আঁকাবাঁকা বিসর্পিল রেখায় তিনদিক হইতে ঢুকিয়া এক জায়গায় আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে এবং প্রচুর পলিমাটি ও বালি জমিয়া একটা উঁচু ডাঙার সৃষ্টি করিয়াছে, সেইখানেই গ্রামের হাট।

সব জায়গাতেই গ্রামের হাটখোলায় একটি না একটি বারোয়ারী দেবতার স্থান দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের মাঝখানে বড় গাজী কায়েমী হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'শিরণী' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বন-বিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধ-দেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন , শিব, কালী, পীর সকলকে ছাড়াইয়াই ইঁহাদের সম্মান।

গাজীতলার চারপাশ ঘিরিয়া হাট বসিয়াছে। ছোট ছোট খালগুলি ডিঙি নৌকায় বোঝাই। যে সমস্ত বড নৌকা খাল দিয়া আসিতে পারে না, ছোট ডিঙি নামাইয়া দিয়া তাহারা হাট করিতে আসিতেছে।

রাধানাথকে সঙ্গে করিয়া বলরাম হাটে আসিলেন।

কাজটা বলরামের নয়। তিনি সৌখীন মানুষ, এ সব ঝুক্কি পোয়ানো তাঁহার স্বভাবের বাহিরে। তবু আজ নিজেই আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাধানাথ ইহাতে খুশি হয় নাই, লাভের মধ্যে তাহার সাপ্তাহিক বরাদ্দটাই মারা পড়িল।

কাছাকাছি কোথাও তাঁতিদের গ্রাম আছে একটা। প্রত্যেক হাটবারে তাহারা

নানারকমের শাড়ি-গামছা এই সব বিক্রি করিতে আনে। বলরাম সেগুলি দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন।

রাধানাথ বলিল, বাবু, মাছটা আগে না কিনলে—

—হবে এখন দাঁড়া, দাঁড়া—

তাঁতিদের দোকানের সামনে আসিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন।

দড়ির উপর আট-দশখানা শাড়ি ঝুলিতেছিল। একখানা বলরামের ভারী পছন্দ হইয়া গেল। ময়ূরকণ্ঠী রঙ—চিক্‌চিকে রোদ লাগিয়া তাহার জেল্লা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গৌরাঙ্গী মেয়ের গায়ে তাহা কী রকম মানাইবে ভাবিয়া বলরাম মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁতের কাপড় বলিয়াই ঠাস্-বুনানী নয়, সেই জন্য অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয়। তনুদেহের লাবণ্য তাহাতে ঢাকা পড়ে না—বরং মাঝে মাঝে অঙ্গের অস্ফুট আভাস দিয়া আরো মাতাল করিয়া তোলে।

আচ্ছা, মুক্তোকে কেমন মানাইবে? অবশ্য মুক্তোকে খুব ফর্সা বলা চলে না, তা ছাড়া সোনার দেশে আসিয়া তাহার রঙ যেন ময়লাই হইয়াছে আর একটু। তবু ভালোই দেখাইবে তাহাকে। মুক্তোর সুগঠিত দেহটা বলরামের মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া গেল।

বলরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, শাড়ির দাম কত হে?

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যে সন্ধ্যা হইয়া বসিবে, ইহা তো জানা কথা। সেটা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া জুটিলেন!

—কি হে, শাড়ি কেনা হচ্ছে নাকি?

কবিরাজ চমকিয়া তাকাইলেন। তারপর হরিদাসের বাঁকা হাসি বিচ্ছুরিত মুখখানার দিকে চাহিয়া ঠোঁটটাকে একবার চাটিয়া লইলেন। জড়িতস্বরে কহিলেন, কে, কে বলছে আমি শাড়ি কিনছি? একখানা গামছা কেনবার জন্যে—

ময়ূরকণ্ঠী-রঙ শাড়িখানার ওপরে আঙুল রাখিয়া হরিদাস বলিলেন, গামছা; কিন্তু এখানাকে ঠিক গামছা বলে তো মনে হচ্ছে না ভায়া। কি হে জোলার পো, এ তোমাদের কোন্ নতুন ফ্যাশানের গামছা আমদানি করেছ?

রসিকতা উপভোগ করিয়া জোলার পো মৃদু হাসিল। একজোড়া কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক হইতে তিনটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এঁজ্ঞে না, ওখানা গামছা নয় —শাড়িই।

—বটে, বটে? কবিরাজের চোখে তা হলে চাল্‌সে ধরেছে আজকাল। গামছা আর শাড়ির তফাৎ বুঝতে পারো না?

মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া প্রকাশ্যে কবিরাজ অসহায় স্বরে কহিলেন, যাও—যাও।

—যাও মানে? এই গাজীতলায় দাঁড়িয়ে এম্‌নি মিথ্যে বলছ ভায়া, কাজটা কি ভালো হচ্ছে? একটু সাজগোজ করানোর ইচ্ছে মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে—সেটাকে গোপন করে কী লাভ?

বলরামের নির্বিরোধ শান্ত মূর্তিটির তলা হইতে যেন একটা আগ্নেয়গিরি ফুটিয়া বাহির হইল। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা থাকিতে আছে।

—থামো, থামো, ঢের হয়েছে। তোমার মতো অসভ্য ছোটলোক আমি আর দুটো দেখিনি।

—ওরে বাস্‌ রে!—থুঁৎনির নিচে হাত রাখিয়া হাঁ করিয়া হরিদাস বলরামের দিকে চাহিলেন।

—হাঁ—হাঁ। যেন ইয়ে একটা—

বলরাম কথাটা শেষ করিলেন না—বোধ হয় শেষ করিবার মতো কিছু একটা পাইলেন না বলিয়াই। শুধু রাধানাথের হাতটা ধরিয়া হিড হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাধানাথ একটা হোঁচট খাইল, একটা বেগুনের ঝুড়ি উল্টাইয়া পড়িল এবং দোকানদার অশ্রাব্য গালাগালি শুরু করিল। পোস্টমাস্টার বাঁ হাতে একটা তুড়ি বাজাইয়া সজোরে কহিলেন, দুর্গা-দুর্গা।

রাধানাথকে টানিতে টানিতে বলরাম প্রায় খালের কাছে আনিয়া ফেলিলেন।

রাধানাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন বাবু! মাছ কিনতে হবে না? আর দেরি হলে তো—

—মাছ—মাছ! ব্যাটার আছেই তো কেবল খাই খাই। হরিদাসের বেলায় যে দাঁত-খিঁচুনিটা মনে মনে আত্মগোপন করিয়াছিল, রাধানাথের ক্ষেত্রে সেটা আর অপ্রকাশ রহিল না।

রাধানাথ সংকুচিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমার নিজের জন্যে নয়, দিদিমণি বলেছিলেন বোয়াল মাছের কথা—তা নিবটে অ্যাই রাক্ষুসে বোয়াল উঠেছে দেখলুম তাই—

—দিদিমণি!—রাধানাথকে কথাটাও আর শেষ করিতে হইল না: তবে এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিলি, শুনি? কাজে ফাঁকি দিতে পারলে আর কথা নেই। যা, যা, এক্ষুনি যা, দৌড়ে—

হরিদাস ততক্ষণে জোলার পোর সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছেন।—ঢাকায় গেছ কখনো, ঢাকায়?

বিনীত হাসির সঙ্গে বিনীততর প্রত্যুত্তর আসিল, আজ্ঞে না।

—তবে বুঝতে পারবে না। ঢাকাই মসলিন্‌ সে যে-সে ব্যাপার নয়। আমি তখন

মাণিকগঞ্জে থাকি। সেখানকার একজিবিশনে এক তাঁতি একবার একটা আমের আঁটির ভেতর পুরো বিশ গজী এক থান মসলিন পুরে নিয়ে এসেছিল! সে কী সূক্ষ্ম কারবার! তাই দেখে লাট সাহেব নিজে তিন মিনিট ধরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন—হুঁ, হুঁ! একজিবিশন বোঝো তো?

—হেঁ—হেঁ তা আজ্ঞে বসুন না, একছিলিম তামাক সেজে দিই।

চার

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"বাড়ির পত্র পাইলাম। পোস্টমাস্টার মশাই ভদ্রতা করিয়া নিজের লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেশ সৌজন্য আছে। তা ছাড়া ওঁর চরিত্রে কতকগুলি বিচিত্র অভিনবত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই। সাধারণত্বের মধ্যে সেগুলিকে অসাধারণ বলা যাইতে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কুশ্রী চেহারার একটা অশোভন মলাট দিয়া ভিতরের অনেকখানি গভীর রহস্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন লোকটি। এক একদিন সেই রহস্যটাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখিবার জন্য কৌতূহল জাগে।…

……কিন্তু আর কতদিন কালুপাড়ায় থাকিতে হইবে জানি না। আদায়ের দিক দিয়া কতটা সুবিধা হইবে তা-ও বুঝিতেছি না। সবাই মজাফ্‌ফর মিঞার দলে ভিড়িয়াছে। দুর্বৎসর কিনা জানি না, কিন্তু দুর্বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি।…

বাড়ির চিঠিতে রাণী অনেক করিয়া মিনতি করিয়াছে। এমন ভাবে বিদেশে পড়িয়া থাকার কী সার্থকতা আছে? দেশে যে জমিজমা আছে তাহার দেখাশুনা করিলেও তো মোটা ভাত-কাপড় একরকম চলিয়া যায় তবে এই সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য এমন একটা অনাত্মীয় সুদূর জগতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া কী লাভ?

একথা আমি অনেকবার ভাবিয়াছি। এখনও যে না ভাবি তা-ও নয়; কিন্তু জীবন সম্বন্ধে আর একটা যেন দার্শনিক দৃষ্টি খুলিতেছে। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে এই সংশয়-টাই মাথা চাড়া দিয়াছে যে, যেটাকে আমরা এতদিন পরিণতি বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেটাই ঠিক পরিণতি কি না। জীবনের যে সভ্য, মার্জিত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমরা বাস করি, তাহার উল্টা পিঠে দেখিবার মতো কি কিছুই নাই।

কে বলিবে নাই! জীবন যে কতখানি নগ্ন ও অসংকোচ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এখন তো তাহাই দেখিতেছি। এতদিন নগ্নতাটাকে অবিমিশ্র মন্দ বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছি, আজ কিন্তু তর্ক করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে—যেখানে সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে তুলসীতলায় প্রদীপ

জলিয়া ওঠে—শঙ্খের শব্দে আকাশ মুখর হয়, ভাঁট ফুলের গন্ধে গ্রামের বাঁশঝাড়-ঢাকা নির্জন মেটে পথখানি মদির হইয়া যায়, সেখানে জীবনের পরিধি কতটুকু! ওই মেটে পথটা ধরিয়া হাঁটিতে শুরু করিলে গ্রামের ছোট বাজারটি—তারপর আরো একটু অগ্রসর হইলে কালো কাঁকর-পাতা প্ল্যাটফর্ম—টিনের শেড্ দেওয়া ছোট্ট স্টেশন—তারপর ডেলি-প্যাসেঞ্জারী। সন্ধ্যায় ওই পথটি দিয়া যে ফিরিয়া আসে ধূপের গন্ধ ভরা ছোট্ট একখানি ঘরে রাণীর মুখখানা ছাড়া সে আর কী কল্পনা করিতে পারে!

কিন্তু এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত—এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রুদ্রতার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানায় ছোট এতটুকু প্রেম কি এখানে মানাইত? সমস্ত নীতি, সমস্ত শৃংখলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে!

জীবনের কোন্ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

* * * *

বর্মিটা হাসিতেছিল।

হাসিটা অবশ্য তাহার স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। তাই পাথরের মতো কঠিন মুখ হইতে যে হাসিটা বাহির হইতেছিল, তাহা কৌতুকে ক্রুর এবং অনেকটা নৃশংস বলিয়াই মনে হইতেছিল।

অবশ্য তাহার হাসির স্বরূপ বুঝিবার জন্য ডি-সুজার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সে গঞ্জালেসের গুন-গান করিতেছিল, লিসির জন্য এমনি সুপাত্র অন্যত্র দুর্লভ। তাহাদের পূর্ব পুরুষের গৌরব-কীর্তি কে-না জানে। বাহুবলে তারা সমগ্র দেশ জয় করিয়াছে, আগুন লাগাইয়াছে, লুঠ-তরাজের সাহায্যে পৌরুষের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। জোর করিয়া "জেণ্টুর"-দের রূপসী মেয়েবউ ছিনাইয়া আনিয়া অঙ্কশায়িনী করিয়াছে। তাহারা যদি বীর না হয় তো, বীর কে? শুনিয়া বর্মিটার হাসি হঠাৎ থামিয়া গেল।

—তোমাদের ভেতর এটাই কী মস্ত বীরত্বের কথা নাকি?

—কোন্‌টা?—বর্মির প্রশ্নটা ডি-সুজার কানে কেমন বিচিত্র রকমে অপরিচিত বলিয়া বোধ হইল যেন। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন কিছু একটা আবিষ্কার করিতে চাহিল।

—এই মেয়েমানুষ চুরি করে নিয়ে যাওয়াটা?—পাথর বাঁধানো মুখের ভিতর হইতে সামান্য একটু ফাঁক দিয়া আবার এক ঝলক কৌতুকের হাসি পিছলাইয়া পড়িল।

ডি-সুজা অপ্রতিভ বোধ করিল একটু। মনে হইল কথা না কহিলেই বোধ হয় ভালো হইত। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কলাই-করা দুইটা এনামেলের কাপে লিসি চা লইয়া আসিল।

ডি-সুজার বাড়ির ভিতরের আঙনটিকে বেশ ভালোই বলিতে হইবে। সুপারি আর নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়া সেখানে একটা কুঞ্জ রচনা করিয়াছে। এলোমেলো পাতার ফাঁকে খানিকটা রোদ আসিয়া লিসির মঙ্গোলিয়ান মুখের উপর পড়িল।

বর্মিটা সেইদিকে চাহিল। চাহিল স্থির বিকারহীন দৃষ্টিতেই। কিন্তু আজ যেন কী এক মন্ত্রবলে নতুন করিয়া চোখ খুলিয়া গেছে ডি-সুজার। তাহার মনে হইল বর্মির নীরব গাম্ভীর্যের তলা হইতে সাপের মতো প্রলোভনের একটা গুপ্ত ফণা মাথা তুলিতেছে। সে নিজে অনিন্দ্যচরিত্রের লোক নয়, মানবমনের অন্ধকার জগৎটার কোনো রহস্যই অপরিচিত নাই তাহার; বর্মির লোলুপ দৃষ্টিটার মধ্যে তাহার বিগত পাশব যৌবন যেন ছায়া ফেলিয়া গেল।

লিসি চায়ের বাটিটা রাখিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সে সেদিকে যে চাহিয়া রহিল, রহিলই। ডি-সুজার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগিতে লাগিল।

—তোমরা এখান থেকে কবে যাচ্ছ?

বর্মি মুখ ফিরাইল। তাহার সমস্ত অবয়বে আবার সেই অবিচল কঠিনতা: তোমার কাছ থেকে হিসাবটা পেলেই চলে যাব। সব চালান হয়ে গেছে?

—না, তিন সের বাকি আছে এখনো। পুলিসের বড় কড়াকড়ি এবার। তা ছাড়া জোহানের জন্যেও বড্ড ভাবনায় পড়েছি। সহরে এখনো যায়নি বটে, কিন্তু যখন-তখন খবর দিয়ে দিতে পারে। তা হলে তো সব সুদ্ধ—

—আচ্ছা, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। যা বলেছি তা মনে আছে তো?

—তা আছে। কিন্তু—ডি-সুজা অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্তভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল, একটু বেশি হয়ে যাবে না কি? একেবারে—

বর্মির মুখ হইতে সোনা-বাঁধানো দাঁত দুইটা যেন ছিটকাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

—বেশি? বেশি কিছুতেই হয় না। সেদিনের টোটা দুটো নেহাৎই বাজে খরচ হয়েছে; নইলে আজকে আবার এই নতুন খাটুনির দরকার হত না।

—তা বটে।—ডি-সুজাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইল।

—তোমার নাতনী রাজী হয়েছে তো?

এই লোকটার মুখে লিসির কথা শুনিয়া মনটা যেন প্রসন্ন হইয়া ওঠে না। তবু ডি-সুজা কহিল, হুঁ। রাজী না হয়ে কী করবে? তবে সবটা বলা হয়নি—এতখানি শুনলে হয়তো বা—

—যাই বলো, তোমার নাতনীটি কিন্তু দেখতে ভালো। ওসব গঞ্জালেস্-টঞ্জালেসের চেয়ে—কথাটার মাঝখানেই কী ভাবিয়া সে থামিয়া গেল।

ডি-সুজার মুখ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল : গঞ্জালেসের চেয়ে কী ?

—না কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের পর্তুগীজদের বীরত্বটা কিন্তু ভারী চমৎকার। যে যত মেয়ে চুরি করে আনতে পারে সে তত বড় বীর—বাঃ!

ডি-সুজা গম্ভীর হইয়া রহিল।

—আচ্ছা, আমি চললুম। পরশু দিনের কথা মনে থাকবে ?

—থাকবে। তার আগে গাজী সাহেবের কাছে যেতে হবে।

—হুঁ।

অভিবাদন জানাইয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিল ; কিন্তু দরজার মুখে একবারটি থামিয়া দাঁড়াইল। একরাশ পেঁয়াজ-কলি লইয়া লিসি ভিতরে আসিতেছে।

লিসির দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সে মৃদুভাবে একটা শিস দিল, তারপর চুরুট ধরাইয়া বড বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রোজকার মতো সকালেব ডাক আসিয়াছিল।

কেরামদ্দি মেল ব্যাগগুলি বাটিতে প্রথমেই একখানা লম্বা খাম ঠক্ করিয়া একেবারে পোস্টমাস্টারের কোলের কাছে আসিয়া পড়িল।

অফিসের খাম। পোস্টমাস্টার ব্যগ্র হাতে খুলিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছেন—ঠিক তাই। পোস্ট্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মানুষটা তা হইলে নিতান্ত খারাপ নয়। বরিশাল হইয়া যাওয়ার পথে লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইতে হইবে।

—ছুটির অর্ডার এসেছে রে কেরামদ্দি।—পোস্টমাস্টারের মুখ চোখ হইতে আনন্দ উছলাইয়া পড়িতেছিল, কণ্ঠস্বরে সেটা আর চাপা রহিল না।

—ছুটি! দরখাস্ত করেছিলেন বাবু ?

কেরামদ্দি যেমন বিস্ময়, তেমনি ব্যথা অনুভব করিল। এই কুশ্রীদর্শন বিগতযৌবন ছন্নছাড়া লোকটার উপর তাহার যে কেন এতটাই মায়া বসিয়া গেছে কে জানে।

—হাঁ, হাঁ—দরখাস্ত করেছিলুম বই কি। নইলে আবার কোন্ সম্বন্ধীটা আছে যে আগ বাড়িয়ে ছুটি দিতে আসবে ? হুঁ হুঁ—তিন মাসের—সোজা ব্যাপারটি তো নয়।

—তিন মাসের! বেদনায় অত্যন্ত ম্লান হইয়া কয়েক মুহূর্ত কেরামদ্দি চুপ করিয়া রহিল। এই চর ইস্মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়, এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়। পোস্ট-মাস্টারের সাহচর্যেই এখানে একরকম তাহার দিন কাটিয়া যায়। সেই জন্য সে এত আহত বোধ করিল যে কিছুক্ষণ কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইল না। বরং ক্ষণিকের জন্য মনে হইল, তাহার প্রতি মাস্টারবাবুর কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই, নতুবা তাহাকে আদৌ না জানাইয়া

তিনি এমন একটা ছুটির দরখাস্ত করিয়া বসিলেন কী বলিয়া?

নত মস্তকে চিঠি সর্ট করিতে করিতে হঠাৎ সে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে—তা হলে—আফিসের কাজ কী করে চলবে বাবু?

বন্যার মতো অজস্র ধারায় পোস্টমাস্টার হাসিয়া উঠিলেন : শোনো কথা, কাজ কী করে চলবে? আরে, আমি ছুটি নিলুম বলেই কি সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে? রিলিফ আসবে—রিলিফ। কাল পরশুর মধ্যেই এসে পড়বে।

—ওঃ।—কেরামদ্দি আবার চিঠিপত্রের মধ্যে তলাইয়া গেল।

পোস্টমাস্টার একান্ত প্রসন্ন স্বরে কহিলেন, সত্যি ব্যাটারা এবারে ছুটি না দিলে রিজাইন্ দিতুম ঠিক। কাঁহাতক আর পারা যায়? কিছুদিন থেকেই মন চঞ্চল হয়ে উঠছে—কেবল ভাবছি ছুটে বেরিয়ে পড়ি। যাক!

—তা হলে এখন বাড়িই যাবেন তো বাবু?

—বাড়ি!—হরিদাস এমন ভাবে কথাটা কহিলেন যে এতবড় একটা অসম্ভব ধারণা কাহারো কল্পনায় আসাটাই অসঙ্গত ব্যাপার : বাড়ি! বাড়ি কোথায় যে যাব?

—সে কি বাবু। তিন বছর বাদে একবার ছুটি নিলেন—ছেলেমেয়ে রয়েছে—

—ব্যাস্ ব্যাস্! ছেলেমেয়ে রয়েছে তো সাতপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আর কি! আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, ওই কাকের বাচ্ছাগুলো পিণ্ডি দেবে, এই আশংকায় আমার বাপ-ঠাকুরদা গয়ার প্রেত-শিলা থেকে মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

কথাটার অর্থ না বুঝিলেও ভাব গ্রহণ করিতে কেরামদ্দির অসুবিধা হইল না। সে বিস্ফারিত চোখে কহিল, আপনার মনটা কি পাথর দিয়ে তৈরি বাবু? গোরু ছাগলেও নিজের বাচ্ছাকাচ্ছাকে ভালবাসে, আর আপনি -

অসমাপ্ত কথাটাকে ছো মারিয়া তুলিয়া লইয়া পোস্টমাস্টার বলিলেন, আর আমি গোরু-ছাগল নই বলেই ওদের চাইতে আমার বুদ্ধি একটু বেশি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—অ্যাঁ! যে রাস্কেলটা লিখেছিল, তাকে একবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিতুম।

—তা হলে কোথায় যাবেন, বাবু?

—কোথায়? হরিদাসকে চিন্তিত দেখাইল : এখনো ঠিক করিনি। হয়তো কাশ্মীরে যেতে পারি—ভূ-স্বর্গ বলে তাকে। হাউস্ বোটে করে ডাল্ হ্রদে ঘুরে বেড়াব। উলার হ্রদ থেকে পদ্ম তুলে আনব। শ্রীনগর the Venice of the East! আর নয়তো বা তিব্বতেও একবার ঘুরে আসা যায়। লামার দেশ—হাজার হাজার বছর ধ'রে এভারেস্টের ঠাণ্ডা ছায়ার নিচে মানুষ যেখানে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে।...

পোস্টমাস্টারের আবিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া কেরামদ্দি চুপ করিয়া গেল।

পূর্ণিমার দিনে জোয়ারের জল একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে। অন্যান্য দিন ওই কাদা-মাখা তীরটাকে ডুবাইয়া দিয়াই সে খুশি থাকে, আজ কিন্তু পৌঁছিয়াছে সামনের মাঠটার একবারে উঁচু ডাঙাটা পর্যন্ত। বাঁ-পাশের খালটা অনেকখানি ভরিয়া উঠিয়াছে, চেষ্টাচরিত্র করিলে বজরাটাকে একেবারে গ্রামের মধ্য পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন নয়।

বজরাটা জলের সঙ্গে অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। নোঙরের পাকানো মস্ত নারিকেলের দড়িটাতে টান পড়িয়াছে। একটা কাঠের সিঁড়ি নামাইয়া দিতে সেইটা বাহিয়া মণিমোহন একেবারে তীরে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রামের দিক হইতে একটু বেড়াইয়া আসিলে মন্দ হয় না।—আসবে নাকি গোপীনাথ ?

গোপীনাথ ততক্ষণে বজরার সামনে একটা কাঠের চৌপাই টানিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাঝিরা মজাঃফর মিঞার উপহৃত মুরগী দুইটার পালক ছাড়াইতেছে। অমসৃণ লাল্‌চে চামড়ায় ঢাকা পাখী-দুটির পরিপুষ্ট নধর শরীরের দিকে গোপীনাথের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ। একটুখানি ভালো দুধ কিংবা দই যোগাড় করিতে পারিলে ইহাদের একটাকে দিয়া কী চমৎকার স্টু তৈরি করা যাইবে—মনে মনে সে তাহারই গবেষণা করিতেছিল।

মণিমোহনের প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্ত চোখ ফিরাইয়া একবার সে তাকাইল মাত্র। তারপর বড় মুরগীটার ঠ্যাঙ্ দিয়া বিশেষ কোন একটা ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে সম্পর্কে নিবিড় ভাবে চিন্তা করিতে করিতে উত্তর দিল, আপনি ঘুরে আসুন বাবু। আমি একটু এখানে দেখছি—মুরগীটা ভালো করে বানাতে হবে তো ?

—ও, এখন থেকেই জিভে জল পড়ছে বুঝি ? ছেড়ে উঠতে পারছো না ? আচ্ছা থাকো—মণিমোহন হাসিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ—কিন্তু তৃণ-রোমাঞ্চিত নয়। অগোছালো জঙ্গল, মাটিতে কোথাও কোথাও কাদার আভাস। এখানে ওখানে দুই-চারিটা জোঁক লি-লি করে। পশ্চিমবঙ্গের শ্যামল প্রান্তর এই পলি মাটি আর নোনা-ধরা বালির দেশে আসিয়া রিক্ততার নগ্ন শ্রী ধরিয়াছে।

চলিতে চলিতে সে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িল। যেমন হইয়া থাকে, পূর্ববঙ্গের গ্রামের কোনো ঘন-বিন্যস্ত রূপ নাই। বাড়ি, বাগান, গোটা দুই-তিন শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক পুকুর—সেগুলিতে প্রচুর পাতি হাঁস চরিতেছে। আশেপাশে দুটো-একটা ছাড়া-ভিটা এবং সবটা মিলিয়া এক ধরনের ছায়াচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা অনেকটা জুড়িয়া বিরাজ করে। এ-বাড়ির সঙ্গে ও-বাড়ির যোগসূত্রটা অনেকখানি গৌণ বলিয়াই বোধ হয়, যাতায়াতের পথটা তেমন অনুকূল নয়। আধভাঙা কাঠের বা বাঁশের 'চার' পার হইয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া নালা ডিঙাইয়া চলিতে হয়। পরিচ্ছন্ন অঙ্গনে স্তূপাকারে ধান ও খড়ের পালা, দুটি-একটি

গোরু-মহিষ এবং চরিয়া বেড়ানো ছোট বড় অসংখ্য মুরগীই এ সমস্ত গ্রামের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

গ্রামের মধ্য দিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। দেখিবার কিছুই নাই। বসিয়া খাইবার জো নাই, পুরুষেরা বেশির ভাগই সকাল বেলা নৌকা লইয়া "চরে" কাজ করিতে গিয়াছে, জেলেরা গিয়াছে বেড়াজালে মাছ মারিতে। গ্রাম জুড়িয়া এখন মেয়েদেরই আধিপত্য। সন্ধ্যার সময় পুরুষগুলি ফিরিবে, তাই সারাটা দিন তাহাদের ঢেঁকি চালানো, ধান শুছানো, আরো দশটি খুঁটিনাটি কাজ এবং অশ্রান্ত গাল-গল্পের মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। কেহ ছেলেকে স্নান করায়—অপরিচিত লোক দেখিয়া হঠাৎ গায়ে-বুকে কাপড় টানিয়া সংযত হইতে চায়। কেহ বা কালো শাড়ির লম্বা ঘোমটার ভিতরে রূপার নথ্‌টার মধ্যে আঙুল পুরিয়া দিয়া কৌতূহলী চোখে চাহিয়া থাকে।

দু-একজন পুরুষের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হইয়া গেল, তাহারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। কেউ কেউ বা একান্ত বিনীত হইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বেড়াতে এসেছেন না কি হুজুর?

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিল। তাহার মন তখন লক্ষ্যহারা হইয়া কোথা হইতে কোথায় যেন ভাসিয়া চলিতেছে। নদীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা নতুন মাটি—নতুন উপনিবেশ। ঠিক পুরানো পৃথিবীর মতো করিয়াই মানুষ এখানে ঘর বাঁধিয়াছে, কিন্তু দেখিয়া যা মনে হয়, সত্যি সত্যিই তার সঙ্গে কত ব্যবধান রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রথম যুগের মতো গলিত ধাতুপাত্রের উপর শীতল একটা আস্তরণ পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু বুকের মাঝখানে অসংযমের তরল-উত্তপ্ত বস্তুটা টগবগ করিয়া ক্রমাগতই ফুটিতেছে। যখন একটা বিশেষ উপলক্ষ বা ছিদ্র ধরিয়া তাহা বাহির হইয়া আসে তখনি বোঝা যায়—যা দেখা যাইতেছে সেইটাই সত্য নয়।

—এই যে সরকারীবাবু!

সরকারীবাবুটিকে চকিত হইয়া থামিয়া পড়িতে হইল। কোথা হইতে সেই বর্মী মেয়েটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা ছোট গামছায় বাঁধা একরাশ মুরগীর ডিম। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝকমকে মুক্তার মতো দাঁতগুলিকে বিকশিত করিয়া সে কহিল, আমাকে চিনতে পারছ না? সেই যে সেদিন তোমার দরবারে আসামী হয়েছিলুম—আমার নাম মা-ফুন।

চোখ দুটি বড় বড় করিয়া মণিমোহন সকৌতুকে বলিল, চিনতে আবার পারব না? যে ইট মেরেছিলে সেদিন—আর একটু হলেই—

—সত্যিই?—ঝর্ণার মতো কলচ্ছন্দে মেয়েটা হাসিয়া উঠিল: আস্তে মেরেছিলুম বলেই বেঁচে গেছে। ইচ্ছে করলে একেবারেই দিতে পারতুম ঠাণ্ডা করে।

—তা অস্বীকার করছি না ; কিন্তু তোমার স্বামীর মাথায় ঘা সেরেছে তো ?

—সারবে না ?—মা-ফুন ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, মাসের মধ্যে তিনবারই ও একরকম মার খায় যে। পড়ে থাকবার জো আছে নাকি ? তা হলে আর খেতে হবে না।

মাসের মধ্যে তিনবার ! লোকটির জায়গায় নিজেকে একবার কল্পনা করিয়াই আতঙ্কে মণিমোহন শিহরিয়া উঠিল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলে বাবু ?

জাতে বর্মী বা যাহাই হউক এবং স্বামীকে নির্মমভাবে প্রহার করিতে যতই অভ্যস্ত হউক, ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের এই নিরিবিলি পটভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বিদেশিনী যুবতীটির সঙ্গে গল্প করিতে মণিমোহনের নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না। চাঁপার কুঁড়ির মতো সুঠাম কয়েকটি আঙুল গালে রাখিয়া আয়ত জিজ্ঞাসু চোখে সে চাহিয়া আছে, ওই চোখ, ওই আঙুল দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে যে কথায় কথায় একখানা থান ইট তুলিয়া সে যখন-তখন ধাঁই করিয়া মারিয়া দিতে পারে !

মণিমোহন বলিল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

—সত্যিই ? মেয়েটা মৃদু হাসিল, কিন্তু অবিশ্বাস করিল না। বরং তাহার চমৎকার নীল চোখ দুটি হইতে জয়ের গর্ব যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে জানে তাহার রূপ আছে এবং সেই রূপ-সম্পর্কে একেবারে অচেতন থাকিবে এতটা নিষ্প্রাণ কাহাকেও আশা করে না।

মণিমোহনের বয়স বেশি নয়। দেখিতে সে-ও সুশ্রী। হঠাৎ তাহার কাটখোট্টা স্বামীটির সঙ্গে একটা অদৃশ্য তুলনা-বোধ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া যেন তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ? তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চলো না আমার বাড়িতে।

—তোমার বাড়ি ? কোথায় সে ?

হাত দিয়া মেয়েটি অল্প দূরে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে একখানা টিনের ঘর দেখাইয়া দিল, বলিল, ওই যে। এলেই যখন, তখন একবার না হয় দেখেই যাও।

—আচ্ছা চলো। কিন্তু তোমার সঙ্গে যেতে ভয় করে।

—ভয় করে ? কেন ?—মেয়েটা হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল, তাহার স্নিগ্ধ চোখ দুটি যেন নীলার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কিছু একটার প্রত্যাশা করিতেছে সে।

কিন্তু মণিমোহন সেটা বুঝিতে পারিল না।

সে সকৌতুকে বলিল, ভয় করবে না ? তোমার হাত দুখানা যা চলে, তার থেকে যতটা

দূরে দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

—ওঃ,—বলিয়া মা-মুন চুপ করিল।

এই নিরিবিলি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই বাড়িটা যেন আরো-বেশি নিরিবিলি। প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায় ইহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে। ইহারা বৌদ্ধ—আচারে-বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয়—তবু নিজেদের হিন্দু বলিয়াই মনে করে। তা ছাড়া বর্মাদেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্র ভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশীদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।

—এসো বাবু, মেয়েটি ডাকিয়া একেবারে ঘরের ভিতরেই তাহাকে লইয়া গেল।

সামনেই একটা বাঁশের মাচা। এক পাশে কতকগুলো কাপড়-চোপড় জড়ো করা। রংচঙে একটা মশারি ঝুলিতেছে। বেড়ার গায়ে প্যাগোডার একখানা বড় ছবি, দুর্বোধ্য বর্মী হরফে তাহার নিচে কিছু একটা লেখা রহিয়াছে।

মাচার উপর বসিয়া মণিমোহন বলিল, তোমার স্বামী কোথায়?

—স্বামী? সে তো এখানে নেই। সহরে গেছে—তিন-চারদিন পরে আসবে।

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না। মণিমোহন অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল নির্জন ঘরে সুন্দরী তরুণীটির সঙ্গে বেশিক্ষণ না থাকিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।

—আমার ঘরটা কেমন দেখছ সরকারীবাবু?

—মন্দ কী, বেশ তো!

মেয়েটা হাসিল: উঁহু, বেশ নয়। গরীবের ঘর যে। তোমাকে মৌলমিনে নিয়ে যেতে পারতুম তো দেখতে। আমার বাবার সেখানে কাঠের কারবার আছে—অনেক টাকা।

—তা হবে। এখন চলি তা হলে—মণিমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চলে যাবে মানে? এসেই চলে যাবে তাই কি হয়? মেয়েটির কণ্ঠস্বরে যেন বিস্ময় প্রকাশ পাইল: একটু চা করে দিতে পারি। তোমরা বাঙালিরা যা খাও তা-ও করে দেওয়া অসম্ভব নয়—আমি লুচি বানাতে জানি। ভয় নেই, তার সঙ্গে "ঙাপ্পি" মিশিয়ে দেব না।

মেয়েটির কথার ভঙ্গি হইতে এটা বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে হিন্দু-সমাজের সহিত তাহার নিছক অপরিচয় নাই। নিশ্চয়ই কখনো না কখনো ভদ্রলোকদের সঙ্গে সে মিশিয়াছে এবং তাহাদের নিয়ম-কানুন তাহার একেবারেই অজানা নয়।

মনিমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, আমরা যে লুচি খাই তা তুমি কেমন করে জানলে?

—এমন চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথায় তা তো জিজ্ঞাসা করলে না! আমরা অনেকদিন ঢাকায় ছিলুম যে। তোমাদের বাঙালিদের সঙ্গে ঢের মিশেছি। আমার এক বোনেরই তো বিয়ে হয়েছে বাঙালির সঙ্গে।

—তা তুমি এখানে এসে পড়লে কী করে?

—কপাল, সব কপালের ফের। আমার স্বামীটিকে কি সোজা লোক দেখছ? দুনিয়ার আর কোথাও জায়গা হয় না বলে এখানে এসে ঘর বেঁধেছে। ও না মরলে আমার আর শান্তি নেই।

পতিভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই; কিন্তু আর দেরি করা চলে না। উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, কিন্তু আমার কাজ রয়েছে; এখন আর বসতে পারব না।

—কাজ থাকলে কী হবে? তোমাকে চা খেয়ে যেতে হবে যে। এখানে এই সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়ে আছি বটে, কিন্তু চায়ের সব বন্দোবস্তই আছে আমাদের। বাঙালিদের চাইতে আমরা নেহাৎ খারাপ চা করতে জানি না।

মণিমোহন হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু দশটা বাজে। সত্যিই আর বসতে পারব না। আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার চা খেয়ে যাব।

—সত্যি খেয়ে যাবে তো! কবে আসবে?

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া মণিমোহন চমকিয়া উঠিল। তাহার চোখের দৃষ্টিতে যে প্রশ্নটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেটা যেমন আন্তরিক, তেমনই বিচিত্র। নিতান্ত পরিচয়ের সূত্র হইতে যতটুকু আশা করা চলে, তাহার চাইতে অনেক বেশি গভীর।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, প্রশ্নটাকে একেবারে এডাইয়া যাওয়া চলে না। তাই নিতান্ত সাধারণভাবে হইলেও তাহার গলায় একটা প্রতিশ্রুতির সুর আসিয়া গেল।

—পরশু, বিকেল বেলা।

—ঠিক আসবে, ঠিক তো?—মা-ফুনের জিজ্ঞাসা এবার অনেকটা দাবির মতোই শুনাইল।

—ঠিক আসব।

—না এলে—মেয়েটা হাসিয়া উঠিল: আমাকে তো জানোই। বোট থেকে তোমাকে সোজা টেনে নিয়ে আসব। আর নইলে আমার হাতের থান ইট কেমন চলে তার তো প্রমাণ পেয়েছই।

কথাটা ঠাট্টা বটে, কিন্তু একেবারে ঠাট্টা বলিয়াও মনে হইল না। বুকের ভিতরটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল মণিমোহনের। এই অভিনব মেয়েটির নীল চোখ দুইটিকে বিশ্বাস নাই —যখন-তখন নীলকান্তমণির মতো তাহার দ্যুতি বদলায়।

হাসিয়া সে-ও উত্তর দিল, আচ্ছা মনে থাকবে।

ঘর হইতে সে দুই পা বাহির হইতে না হইতেই মা-ফুন চট্ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল : হাঁ, আর একটা কথা, তুমি কিন্তু একাই আসবে সরকারীবাবু, তোমার সঙ্গের ওই খাতা লেখা বাবুটিকে আবার জুটিয়ে এনো না।

সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত কণ্ঠে মণিমোহন কহিল, কেন ?

—এমনি। আমার স্বামী বেশি লোক-জনের গোলমাল সইতে পারে না। ওর আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা ?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল।

—মাথার ব্যারাম ! তা হলে সেটা তোমার জন্যেই হয়েছে, বলো ?

—মেয়েটির মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই রহিল, তা হবে। কিন্তু পরশু বিকেলে তুমি সত্যিই আসবে তো ?

—আসব।—আর একবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মণিমোহন বাহির হইয়া গেল।

রিলিফ্ আসিয়া পড়িল।

যে ভদ্রলোক আসিলেন, তিনি মুসলমান—বরিশাল জেলাতেই বাড়ি। এই চর ইস্‌মাইল হইতে একখানা ডিঙি করিলে আট ঘণ্টায় তাঁহার বাড়ি গিয়া পৌঁছানো যায়। সুতরাং এমন সময়ে এহেন নির্জন চরের দেশে বদ্‌লি হইয়া আসিতে তাঁহাব বিশেষ আপত্তি ছিল না। বরং এখানে স্থায়ী হইয়া থাকার জন্য পোস্ট্যাল্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে একটা দরখাস্ত করিবেন বলিয়াই তিনি স্থির করিয়াছেন।

খুব খুশি হইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন হরিদাস সাহা।

—এসো, দাদা এসো, তোমাদেরই দেশঘর, দেখে শুনে নাও। আমাদের আর কি, যাওয়ার জন্যে তো পা বাড়িয়েই আছি।

নতুন পোস্টমাস্টার আপ্যায়িত হইয়া কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করিলেন :

—যান—বাড়ির থেকে ঘুরে-টুরে আসুন। এ যা দেশ মশাই—এখানে এলে তো দুনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধই থাকে না। কিছুদিনের জন্যে বাড়ির থেকে মুখ বদলে আসুন।

—বাড়ি !—হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন : আমাদের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভায়া—কোন্‌টা যে বাড়ি আর কোন্‌টা নয়, তাই এ পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারলুম না। আরে কবিরাজ যে ! কী মনে করে—শুনি ?

সে কথার জবাব না দিয়াই কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সব কী ব্যাপার ?

—কী সব ?

—তুমি নাকি চলে যাচ্ছ ?

—অগত্যা। থাকতে যখন পারছি না তখন তো যেতেই হবে। ভায়া হে, পৃথিবীটা

অনেক বড়, আয়ুও তো প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই সুযোগ থাকতে বেরিয়ে পড়া যাক্— যতটা দেখে নেওয়া যায়, ততটুকুই ভালো।

—হুঁ:—বলরাম যেমন ক্লিষ্ট, তেমনই বিষণ্ণ হইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার বিষণ্ণতা হরিদাসকে স্পর্শ করিল না। স্পর্শ করিবার মতো মনই তাঁহার নয়। পরিবারের বন্ধন যাকে আঁকড়াইতে পারে নাই, পৃথিবীর ঘাট হইতে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোই যাহার স্বভাব, তাহার মনের স্পর্শাতুরতা বেশি হইবে কোথা হইতে।

হুঃ মানে? ভাবছ কি এত থালি থালি? এই চর ইস্‌মাইলের ছোট্ট ডাঙাটুকুতে একটা মেয়েকে মুখে করে নিয়ে বসে থাকলেই কি চলবে? জানো না রামপ্রসাদ বলছেন—

'এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা—'

—তা হবে। সংক্ষেপে কথাটা বলিয়াই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বলরাম চলিয়া গেলেন। কেন কে জানে হঠাৎ তাঁহার সম্বন্ধে কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল হরিদাসের মনে।

কেরামদ্দি আসিয়া উপস্থিত হইল।

—নৌকো ঠিক হয়ে গেছে বাবু। জোয়ারটা পেলেই রওনা হতে পারবে।

—পারবে তো? যাক বাঁচলুম। তা হলে চট করে মোটঘাটগুলো বেঁধে ফেলো কেরামদ্দি, আর মায়া বাড়ানোটা কাজের কথা নয়।

একটুখানি ইতস্তত করিল কেরামদ্দি।

—আজকেই যাবেন বাবু? তা ছাড়া এই অবেলায় নৌকো ছাড়াটা কি সুবিধে হবে? দিনকাল তো ভালো নয়,—যখন—তখন—

—কী হবে? বাতাস উঠবে, রোলিং হবে, নৌকো ডুববে? তা যা হবার হবে, শুভ-দিনটা ছাড়তে পারি না। একে বেরোস্পতির বারবেলা, তার ওপর অশ্লেষা, নৌকো যাত্রার পক্ষে এর চেয়ে প্রশস্ত দিন আর কী হতে পারে?

মৃদু হাসির সঙ্গে একটা তুড়ি দিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন।

বেলা দুইটার সময় হরিদাসের নৌকা তেঁতুলিয়ায় পাল তুলিয়া দিল।

পাঁচ

চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল।

সমস্ত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া একটির পর একটি ঋতু-বিবর্তন চলিতেছে। যেন কালের অক্ষমালা হাতে লইয়া জীবধাত্রী পৃথিবী ধ্যানে বসিয়াছে—এই

ধ্যানের মধ্য দিয়া বৎসরের শেষে সে পূর্ণতার সিদ্ধিলাভ করিবে। বসন্তের রূপ ধরিয়া সেই পূর্ণতা আসিয়া মানুষের কাছে দেখা দেয়। দিকে দিকে ফুল ফুটিয়া ওঠে—প্রজাপতি উড়িয়া যায়, পিয়াল-বনে কৃষ্ণসার মৃগ শৃঙ্গ দিয়া মৃগীকে কণ্ডূয়ন করিতে থাকে। বসন্তের বাতাসে পুষ্পশরের পাপড়িগুলি স্বপ্ন ছড়াইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। কাব্যে-সাহিত্যে-শিল্পে এই মধু-ঋতুটা অমর হইয়া আছে।

কিন্তু যেখানে বাঁও মিলাইয়া বাঁশ পুঁতিতে হয়—বছরের পর বছর বালির নোনা ক্ষয় করিয়া নতুন মানুষের উপনিবেশ রচনা করিতে হয়—আদি-জননী সিন্ধুর কোল হইতে হামাগুড়ি দিয়া সেখানকার মাটি বেশি দূর উঠিয়া আসিতে পারে নাই, সেখানে ফাল্গুনী বাতাস আলাদা রূপ লইয়া আসে। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার পাশ দিয়া যেখানে নদীর জল ঘূর্ণি রচিয়া খরস্রোতে বহিতেছে, সেখানে বালির মধ্যে পুঁতিয়া থাকা মরচে-পড়া ভাঙা লোহার কামানটা আর এক অভিনব বসন্তের স্বপ্ন দেখে। দক্ষিণা বাতাসে গঞ্জালেসের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মোহনা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—সুরভি-চঞ্চল ফাল্গুন রাত্রিতে বাসরের মিলন-মায়াকে চূর্ণ করিয়া পর্তুগীজদের বন্দুক আর মশাল সামনে আসিয়া দাঁড়ায়।

আর তখনই চর ইস্‌মাইল নিজের সত্যিকারের স্বরূপটাকে চিনিতে পারে: তাহার ঈশান-দিগন্তে খানিকটা সুতীব্র হিংসা মেঘে মেঘে ঘন-কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, নদীর জল শ্লেটের মতো কালো হইয়া যায় এবং তারপর—

* * * *

বিকালের দিকেই মণিমোহনের মনে হইল যে মা-ফুন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুইদিন হইতেই বর্মী মেয়েটির স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলন তুলিয়া ফিরিয়াছে; খানিকটা অনির্বাণ আগুনের মতো মেয়েটির রূপ—মনটাও সে আগুনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। আর তাহার পাতিব্রত্যের আদর্শটাও যেমন বিচিত্র, তেমনই উপভোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের একটি শান্ত গ্রামে, একতলা বাড়ির একখানি কুঠুরীতে বসিয়া রাণী সেটা কল্পনাই করিতে পারে না।

কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিতেছে এবং থান ইঁটের কথাটাও সে ইহার মধ্যেই ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। তা ছাড়া মনের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে একটা আকর্ষণও যেন সে অনুভব করিতেছিল। সমুদ্রের একেবারে মোহনায়—পৃথিবীর উপান্তে এমন একটি বিস্ময়কর বস্তু যে সে আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে এটাও নিতান্ত কম কথা নয়।

সুতরাং বাহির হইয়া পড়িতেই হইল।

বর্মী মেয়েটি বোধ হয় তাহার জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ সে বেশ করিয়া সাজিয়াছে। সিল্কের ঘাঘরার উপর চমৎকার একটি রঙিন জ্যাকেট পরিয়াছে—মাথার

চুলগুলি বেণী করিয়া চমৎকার ভাবে চূড়ার উপরে বাঁধা। কী একটা সুগন্ধিও বোধ হয় সে মাখিয়াছে, গন্ধে বাতাসটা মদির হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হইল অরণ্যের কালো অন্ধকার হইতে রহস্যময়ী কোনো রাজকন্যা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা-ফুন হাসিয়া বলিল, মনে আছে তো?

—মনে না থেকে উপায় আছে নাকি?

—সত্যি তুমি না এলে আমি বড্ড রাগ করতুম সরকারীবাবু। সারা দুপুর বসে খাবার তৈরি করেছি তোমার জন্যে, অবশ্য তোমাদের বাঙালিরা যা খায়।

বাঁশের মাচাটির উপর ভালো করিয়া বসিয়া মণিমোহন প্রশ্ন করিল, কিন্তু কেন এ সব তুমি করতে গেলে?

—কেন করতে গেলুম?—মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিতেই লাগিল: তোমার বড্ড সুবিচার আছে সরকারীবাবু, তাই তোমাকে আমার মনে ধরেছে।

—মনে ধরেছে! কথাটা মণিমোহনের খ্যাঁচ করিয়া বাজিল। এমন করিয়া ভালো লাগাটা প্রকাশ করা ইহাদের পক্ষেই সম্ভব। আচ্ছা, রাণী এমন করিয়া কথাটা কি কখনও বলিতে পারিত? মণিমোহন ভালো করিয়া মা-ফুনের দিকে চাহিল। অপূর্ব রূপসী দেখাইতেছে তাহাকে। প্রসাধনের ফলে তাহার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল রূপ তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে—হঠাৎ মনে হইতে পারে তাহার চোখ দুটি যেন নীল সুরার পরিপূর্ণ দুটি মদের পাত্র। তাহার তীব্র-যৌবনশ্রী দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়া যেন দিক্ দিগন্তকে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করিতে চায়!

মেয়েটি ততক্ষণে একটা চীনা মাটির রাইস্-প্লেটে করিয়া একরাশ খাবার আনিয়া হাজির করিয়াছে। বেশির ভাগই ডিমের তৈরি। মণিমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তোমার স্বামী?

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কৌতুকের কণ্ঠে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল—হাসিটা ধারালো লোহার ফলার মতো নিষ্ঠুর এবং ঋজু। যেন এমন হাসির কথা সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় না।

—আমার স্বামী! ও হতভাগাটার কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না দেখছি। তা সে তো মরেছে।

—মরেছে!—চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল: সে কী!

মেয়েটি হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিল: মরবে! আমার হাতে ছাড়া কি তার মরণ আছে! সে আজও সহর থেকে ফেরেনি।

—কিন্তু তার তো ফেরবার কথা ছিল। এই নির্জন বাড়িতে বিচিত্র সুন্দরী এই তরুণী মেয়েটির স্বামী অনুপস্থিত—ন্যায়শাস্ত্রের দিক হইতে জিনিসটা মনোরম নয়; কিন্তু মণিমোহনের আজ কী হইল কে জানে—তাহার অবচেতন সত্তাটা এই সংবাদে যেন খুশি

হইয়া বলিয়া উঠিল : ঠিক এমনটিই সে আশা করিয়াছিল বটে।

—তা হলে তো—

—তা হলে—তা হলে কী? ভয় করছে আমাকে? কিন্তু যা ভাবছ আমি তত খারাপ লোক নই সরকারীবাবু। সকলকে ইট মারা আমার স্বভাব নয়।

—কিন্তু তাই দেখছি—মণিমোহন খাবারের ডিশটার দিকে মন দিল।

বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে—নদীর উপর রক্ত ছড়াইয়া সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে অস্তে নামিয়াছে। বাঁশ বনের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার এখানে একটু আগে হইতেই ডানা মেলিয়া দিল। মা-ফুন একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল। সেই আলোয় তাহার মুখখানা রহস্যে যেন কোমল ও মধুর হইয়া উঠিতেছে।

মা-ফুন মণিমোহনের কাছে ঘেঁষিয়াই বসিল একরকম। তাহার বেশ-বাস হইতে একটা অপরিচিত সুগন্ধি অত্যন্ত উগ্র হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে—যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বহিয়া সে গন্ধটা সমস্ত শিরা-উপশিরাকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অতিরিক্ত কোমল কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, খাচ্ছ না কেন? বাঙালিদের মতো তৈরি করতে পারিনি বলে?

মণিমোহন ভয়ানক ভাবে চমকিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত চেতনায় যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া অস্বাভাবিক একটা কোলাহল বাজিয়া উঠিতেছে। আর একটু দেরি হইলে হয়তো বা সে ধরা পড়িয়া যাইবে। রক্ত যেন অস্বাভাবিক খরস্রোতে সর্বাঙ্গ দিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

কিছু একটা তাহার বলা উচিত, কিন্তু কোনো কথাই এই মুহূর্তে সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল ইতস্তত করিয়া বলিতে পারিল, না, বেশ হয়েছে, খুব খেয়েছি। তারপরে সে উঠিয়া পড়িল : আচ্ছা, অন্ধকার হয়ে গেল, আমি এখন চললুম।

মা-ফুন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

—কিন্তু যাবে কী করে?

—ওঃ—অন্ধকারের জন্য ঠেকবে না। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

—অন্ধকারের কথা বলছি না—ঝড় আসছে যে।

—ঝড়!—বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল সত্যই ঝড় আসিতেছে। এতক্ষণ যেটাকে সে সন্ধ্যা বলিয়া মনে করিতেছিল, সেটা কাল-বৈশাখীর অকাল ছায়া মাত্র। নিঃশব্দে এবং অগোচরে আকাশ একেবারে কষ্টি পাথরের রঙ্ ধরিয়াছে, তাহার উপর কয়লার জমাট ধোঁয়ার মতো রাশ রাশ কালো মেঘ আসিয়া আরো বেশি করিয়া জমা হইতেছে। একদল শাদা বক সেই কালো পটভূমিটার তলা দিয়া শন্ শন্ করিয়া উড়িয়া গেল—পলকের জন্য বিদ্যুতের একটা দীর্ঘ সরীসৃপ ধূসর দিগন্তটাকে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া জ্বলিয়া গেল যেন।

মনে হইল তেঁতুলিয়ার মোহনা ছাড়াইয়া, চর কুকুরার দীর্ঘ নারিকেল বীথিকে ডিঙাইয়া কোন্ একটা রহস্যময় দেশ আছে—সেখানকার সভা-প্রাঙ্গণে কী একটা বিরাট্ উৎসবের আয়োজন হইল। সেই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে কে মহা মেঘের একটা প্রকাণ্ড মৃদঙ্গে ঘা দিয়াছে; কালো আকাশে তাহার হাতের সোনার বলয়টা ঝিকমিক করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই একটা গম্ভীর নির্ঘোষ সমস্ত অনুষ্ঠানটাই সূচনা করিয়া দিল।

মণিমোহন বলিল, তাই তো! তা হলে আর দেরি করা যায় না। আমি চললুম।

মেয়েটি কিন্তু তাহার পথ ছাড়িল না: কী করে যাবে? পৌঁছবার আগেই তুমি ঝড়ের মুখে পড়ে যাবে যে।

—তা পড়লেও উপায় নেই। বোটে আমাকে যেতেই হবে—মণিমোহনের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস লাগিল।

বর্মী মেয়েটির সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যেন একটা সংকেত ঘনাইয়া আসিতেছিল: এ দেশের ঝড় যে কী তুমি তো তার খবর রাখো না সরকারীবাবু, নইলে—

কথাটা শেষ হইল না। সমুদ্রের ওপারে সেই যে বিরাট্ জলসাটা বসিয়াছিল, সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা দম্‌কা ঝাপ্টায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল—অনেকগুলি পায়ের নূপুরের ঝঙ্কার আকাশকাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধুলা-বালি ও শুক্‌না পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধুলার একটা ঘূর্ণ্যমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রহিল না।

মা-ফুন মণিমোহনের হাত ধরিয়া ঘরের ভিতরে টানিয়া আনিল। খোলা জানালা দিয়া ঝাপ্টায় বাঁশের পাতা আসিয়া পড়িতেছে, পাল্লা দুইটাকে ক্রমাগত আছড়াইতেছে। মা-ফুন জানালাটাকে বন্ধ করিয়া দিতে না দিতেই বার কয়েক দপ্ দপ্ করিয়া ঘরের লণ্ঠনটা নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া ঝড় আসাটা পশ্চিমবঙ্গের ছেলের জীবনে অভিনব, তাই মণিমোহন ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল—মুখ দিয়া তাঁহার অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ বাহির হইল শুধু।

পরক্ষণেই সে অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া কোমল-দেহের একটা অত্যন্ত কঠিন বন্ধন আসিয়া পড়িয়াছে। সেই অপরিচিত সুগন্ধিটার গন্ধ যেন ক্লোরোফর্মে রূপান্তরিত হইয়া তাহার স্নায়ুগুলির উপরে কাজ করিতে চায়।

চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল—তাহার মনের সামনে রাণীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপে যেন অসহ্য অনুভূতি উগ্র হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য

গিয়াও সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল : এখন তুমি আমার—আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন স্পষ্ট একখানা জলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। সেই ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের মধ্যেও ভাঙিয়া পড়িল।

* * *

দরজাটা এমন ভাবে প্রবল একটা শব্দ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল যে, তাহার আঘাতে সমস্ত ঘরখানাই কাঁপিয়া উঠিল। গড়গড়াটা হইতে খানিকটা ছাই উড়িয়া আসিয়া বলরামের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং দেওয়ালের গায়ে চীনামেয়েটির সেই ছবি থট্ থট্ করিয়া ঘরের ওপাশে উড়িয়া চলিয়া গেল। গ্রুপ ফটোগ্রাফ্‌খানা হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় ঝন্ ঝন্ করিয়া দেওয়াল-ঘড়িটার উপরে গিয়া পড়িল এবং পরক্ষণে চারিদিকে রাশি রাশি কাচ ছাড়া কিছু আর দেখিবার রহিল না।

বলরাম চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হইয়াছে। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন—রাধানাথ—রাধানাথ?

কিন্তু কোথায় রাধানাথ? বিকালে সে আড্ডা দিতে গিয়াছিল, ইহার মধ্যে সেখান হইতে ফিরিতে পারে নাই নিশ্চয়ই। ফিরিলে অন্তত দু-একবার তাহার চেহারাটা চোখে পড়িত।

দরজা-জানালাগুলি শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিয়া বলরাম বাড়ির মধ্যে আসিলেন। ঝড়ের গতিটা আজ ভালো নয়—বছরে প্রথম কাল-বৈশাখী উঠিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তাহার সংঘাতটা এমন প্রমত্ত!

—মুক্তো, মুক্তো?

মুক্তোর সাড়া আসিল না।

তিন-চারিদিন হইতেই মুক্তোর যেন কী হইয়াছে। ভালো করিয়া কথা বলে না সে। এমন কি ময়ূর-কণ্ঠী রঙের শাড়িখানা দেখিয়াও সে খুশি হইয়াছে কিনা বোঝা কঠিন। এমনিতেই বলরাম তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারেন না, তার উপর কয়দিন হইতেই ব্যবহারটা তাহার পুরোপুরি দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে। মেয়েদের ব্যাধির খবর কবিরাজ জানেন, কিন্তু তাহাদের আধির সংবাদ লইবার পেশা তাঁহার নয়। সুতরাং বলরাম ভারী দুর্ভাবনায় পড়িয়াছেন।

কিছু একটা অসুখ-বিসুখও করিতে পারে। সেদিন তাহার এত সাধের বোয়াল মাছ কিনিয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু সে খায় নাই। পাতে ফেলিয়াই উঠিয়া গেছে; কিন্তু অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বলরাম কোনো উত্তর পান নাই—মুক্তো যেন তাঁহাকে এড়াইয়া চলে আজকাল।

ঝড়ের গতিটা ক্রমেই বাড়িতেছে—মুক্তোর খবরটা একবার লওয়া দরকার। হয়তো জানালাটা খুলিয়াই বসিয়া আছে সে। ঝড়ের মুখে জোরালো বৃষ্টির ছাট্ আসিতেছে—সব ভিজিয়া যাইবে যে।

—মুক্তো, মুক্তো?

বলরাম মুক্তোর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন।

অনুমান মিথ্যা নয়। জানালাটা খোলাই আছে বটে। বাহিরে অন্ধকার দুর্যোগের দিকে সে চোখ মেলিয়া বসিয়া আছে—থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের একটা প্রখর আলোয় তাহার বিষণ্ণ মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

বলরাম ডাকিলেন, মুক্তো?

মুক্তো উত্তর দিল না।

—মুক্তো, মুক্তো, তোমার কী হয়েছে?

মুক্তো এইবার তাঁহার দিকে চাহিল। অজস্র জল আসিয়া তাহার সমস্ত মুখটা ভাসিয়া গিয়াছে, চুলগুলি গালের দুই পাশে আসিয়া লেপটাইয়া আছে। তাহার মুখ বাহিয়া যে জল পড়িতেছে, মনে হইল তাহার সঙ্গে চোখের জলও যেন মিশিয়া রহিয়াছে।

বলরাম চকিত কণ্ঠে কহিলেন, কেন, এখন তুমি এমনভাবে জানালা খুলে বসে আছো? বাইরে সাংঘাতিক ঝড় চলেছে—তা ছাড়া এ ভাবে ভিজলে অসুখ করবে। জানালাটা বন্ধ করে দাও শীগ্‌গির।

কিন্তু মুক্তো জানালা বন্ধ করিল না—কোনও উত্তরও দিল না। যেন কথাটা সে কানে শুনিতে পায় নাই। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুত ও অপরিচিত ভয়ের অনুভূতি আসিয়া তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া দিল।

দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

—কী হয়েছে তোমার? কথা বলছ না যে মুক্তো?

একটা ঝট্‌কা মারিয়া মুক্তো সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ দুইটি জল টলমল করিতেছে, এবার সে-দুটি হইতে যেন আগুন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইতে লাগিল।

অস্বাভাবিক একটা চিৎকার করিয়া উঠিল সে। শুনিয়া বলরাম যেন কাঠ হইয়া গেলেন।—কেন, কেন তুমি এমন করলে? এমন করবার কী দরকার ছিল তোমার?

জড়িত স্বরে বলরাম আবার নির্বোধের মতো শুধাইলেন, কী হয়েছে?

—কী হয়েছে ? এখনও তুমি জানতে চাও ? তুমি না কবিরাজ ? আমার দিকে চেয়েও কি বুঝতে পারছ না কী হয়েছে ? এখন আমি কী করব—কোথায় যাব ?

ইহার পরেও না বুঝিবার মতো নিবুদ্ধিতা বলরামের ছিল না।

তিনি তো কাঠ হইয়াই ছিলেন, এইবার যেন পাথর হইয়া গেলেন।

জানালা দিয়া বিদ্যুতের আর এক ঝলক আলো আসিয়া মুক্তোর সর্বাঙ্গ উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গেল। বলরাম স্পষ্ট দেখিলেন, আসন্ন মাতৃত্বের স্নিগ্ধ কোমল একটা শ্রী-সম্পাতে সে যেন অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিশীর্ণ মুখ, তাহার মলিন চক্ষু এবং পূর্বের ব্যবহারগুলি—সব কিছু মিলাইয়া বলরামের যেন কোথাও সন্দেহের আভাসমাত্র আর অবশিষ্ট রহিল না। বিস্ময়ে ভয়ে যেন মূঢ় হইয়া গেলেন তিনি।

চর ইস্‌মাইলের নোনা-মাটিতে ফসল ফলিতে শুরু হইয়াছে। ঝড়ের প্রচণ্ড দাপাদাপির সঙ্গে সে সত্যটা বলরামের হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায় তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল।

* * * *

সন্ধ্যার আগে হইতেই জোহান এই জায়গাটিতে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল। চরের দক্ষিণ-দিকে যেখানে পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষটা একটু একটু করিয়া তেঁতুলিয়ার জলে লোপ পাইবার উপক্রম করিতেছে, আর খানিকটা খাড়া পাড়ের ভাঙা গা বাহিয়া রাশি রাশি ঘাসের শিকড় দুলিতেছে, সেইখানে একটা গাছের ছায়াতেই সে অপেক্ষা করিতেছিল। লিসি এখানে আসিবে। সন্ধ্যাটা আর একটু ঘন হইয়া পাড়লে নিশ্চয় আসিয়া পড়িবে সে—এই রকমই কথা আছে।

জায়গাটা পুরোপুরি নিরিবিলি এবং নির্জন। নিচে একটা গাছের সঙ্গে একখানা এক দাঁড়ের ছোট ডিঙি সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সেইখানা তাড়াতাড়ি বাহিয়া গেলে তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমের চরে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহারা। সেখানে বন্দোবস্ত করাই আছে, তার পর একখানা বড় নৌকা লইয়া সোজা চাঁদপুরের পথে। ওখান হইতে রেলে চাপিয়া চিদম্বরম্ তিনদিনের পথ।

ডি-সুজা অবশ্য টের পাইবে রাতারাতিই। কিন্তু সে টের পাইল তো বড় বহিয়া গেল। হৈ চৈ সে করিবে না, করিয়া লাভও নাই। জোহানের হাতেই ডি-সুজার মারণাস্ত্র রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে সে যে কোন সময়েই তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে।

জোহান স্বপ্ন দেখিতেছিল। লিসিকে লইয়া ঘর বাঁধিবে সে। রেলে যদি চাকরি পায়, তবে তো কথাই নাই। লাল-ইটের ছোট্ট একটি কোয়ার্টার। বাহিরে একফালি সব্‌জীর বাগান, একটা ছোট মুরগীর খোঁয়াড়। সারাদিন এঞ্জিন চালাইয়া সে যখন কালি-ঝুলি মাখা দেহ লইয়া ঘরে ফিরিবে, সঙ্গে সঙ্গে লিসি হয়তো গরম জল আনিয়া হাজির করিয়া দিবে। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে।' দুইজনের

হাসিতে আনন্দে চমৎকার কাটিয়া যাইবে দিনগুলি।

কিন্তু গঞ্জালেস?

গঞ্জালেসের কথা ভাবিতেই মাথা গরম হইয়া গেল জোহানের। চেহারা একটু কটা বলিয়াই কি সে এত প্রিয়পাত্র নাকি? গঞ্জালেসের চাইতে সে-ই বা এমন কম কিসের? তাহার দেহেও তো পর্তুগীজের রক্তই বহিতেছে।

কিন্তু লিসি এখনো আসিতেছে না কেন? জোহান চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল, এই তো তাহার আসিবার সময়। তা ছাড়া—চকিতে তাহার চোখে পড়িল—কিসের একটা প্রত্যাশায় তেঁতুলিয়ার জল যেন থম থম করিতেছে। এত ধীরে ধীরে স্রোত বহিয়া চলিতেছে যে হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে নদীর বুঝি কোনো গতি নাই। দুই পাশের গাছপালাগুলি যেন ঊর্ধ্বমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

ঝড় আসিতেছে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ সাধারণ ঝড় নয়। মেঘের কালো স্তূপটাকে ছিঁড়িয়া বিদ্যুতের শিখাটা আত্যন্ত লক লক করিয়া উঠিতেছে। সংকেতটা অশুভ।

কিন্তু লিসি?

লিসি কি প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে ঠকাইলই শুধু, আসিল না?

—জোহান!

ঠিক সেই মুহূর্তেই লিসি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জোহান আগ্রহভরে তাহাকে কাছে টানিয়া লইতে চাহিল, তুমি এসেছ?

—হাঁ এসেছি। কিন্তু যাবে কী করে! ঝড় আসছে যে!

—আর তো দেরি করা যায় না লিসি। এখানে এমন ভাবে আর পড়ে থাকা যায় না। চলো ডিঙি ছেড়ে দিই—তারপর—

কিন্তু তারপরে যে কী হইবে সেটা জোহান আর শেষ করিতে পারিল না।

পিছন হইতে ধারালো একটা দায়ের কোপ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জোহানের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল এবং টের পাইতে না পাইতেই তাহার মাথাটা ছিটকিয়া তিন হাত দূরে চলিয়া গেল।

লিসি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানা রক্তহীন শাদা হইয়া গেছে। অস্বাভাবিকভাবে চিৎকার করিয়া সে বলিল, একি হল?

বর্মীটা হাসিতেই ছিল।

লিসি বলিল, কিন্তু এমন তো কথা ছিল না।

সে বলিল, না। কিন্তু দরকার ছিল।

লিসি জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ডি-সুজাকে অপমান করার জন্য জোহানকে

শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায় ভাবিয়াছিল ঘা কতক খাইয়াই শায়েস্তা হইয়া যাক লোকটা। কিন্তু যা ঘটিল তা প্রলয়—আকাশ-পটে অরণ্যকে ঝড়ের হুঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া তাহারও পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল।

তখন চারদিক কাঁপাইয়া উপনিবেশের ঝড় শুরু হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার ফণা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ভাঙা পাড়ের উপর আসিয়া ছোবল্ মারিতেছে—ইস্‌মাইলের নারিকেল আর সুপারির বন দিক-দিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরাট্ আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল—বরিশাল গান গর্জন করিতেছে!

* * * *

লিসি যখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল—তখন কালো অন্ধকারে ঝোড়ো নদীর উপর পাল তুলিয়া বর্মীদের বজরা উড়িয়া চলিয়াছে।

মাথার উপর একটা কালো লণ্ঠনের আলো বজরার সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছে। লিসি চোখ মেলিয়া ডাকিল, ঠাকুর্দা!

বর্মীটা হাসিল।

—তোমার ঠাকুর্দাকে জোহানের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বেঁচে থাকলে আমরা সবাই ধরা পড়তুম। চর ইস্‌মাইলের ব্যবসা আমরা তুলে দিলুম।

—আর আমি? আমি?

লিসি প্রাণপণে উঠিয়া বসার চেষ্টা করিল।

—গঞ্জালেস্ যা করত তাই করেছি। আমরাও তো বীরপুরুষ—কাজেই তোমাকে বোটে তুলে নিয়ে এলুম। ভালো করিনি?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লিসির জগৎ ক্রমশ বিন্দুবৎ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ফুলিয়া উঠিয়াছে বজরার পাল। নদীর কালো জল বিদ্যুতের আলোয় যেন সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ দাঁত মেলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অট্টহাসি করিতেছে। তিন শতাব্দী আগে বড় বড় কামান লইয়া হার্মাদদের বোম্বেটে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নোনা-মোহনায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, তাহার জের আজও মিটিয়া যায় নাই। দেশ-দেশান্তর কাল-কালান্তর পার হইয়া তাহারই নিঃশব্দ ধারা বহিয়া চলিতেছে। বর্বরতা দিয়া যে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছে, বর্বরতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে আর একদিন।

কেবল পোস্ট অফিসের কাঁচের দরজাটার ফাঁক দিয়া কেরামদ্দী বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। হরিদাস সাহার নৌকা এখন তেঁতুলিয়ায় পাড়ি জমাইতেছে। এত বাতাসের ঝাপ্টায় সে নৌকা ও পারে গিয়া পৌঁছিবে কিনা কে জানে!

হয়তো পৌঁছিবে না। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! বসন্ত যেখানে সুন্দরের তপস্যায়

ধ্যান করিতে বসে নাই—যেখানে সে মুক্ত-জটা উড়াইয়া তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে, যেখানে কস্তুরীর মৃদু সুগন্ধিকে ভীরু প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে আহুতি দিয়া প্রখর বহ্নি-শিখায় কামনার যজ্ঞ চলিতেছে—সেখানে সামঞ্জস্যই সব চেয়ে বড় কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন লইয়া পৃথিবী যেখানে নতুন করিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতে চায়—সেখানে পাওয়া কিংবা হারানো সব সমান হইয়া গেছে।

উপনিবেশের বর্বর যৌবন এমনি করিয়াই পূর্ণতার, প্রবীণতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

উৎসর্গ

আশা দেবীকে

দুপুরের খররৌদ্রে বরেন্দ্রভূমির রুক্ষ রিক্ত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে বাস্‌-এ করে আসছিলাম। সেই দ্রুত গতির মুখেই পাশাপাশি নবীপুর আর কুমারদহকে চোখে পড়েছিল। বাস্তবে এই দুখানি গ্রামের নাম অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনেই আমি এদের নতুন নামকরণ করেছি।

সামান্য কিছু লেখবার পরে পাণ্ডুলিপি অনেকদিন পড়েছিল। 'বঙ্গশ্রী' পত্রের সহ-সম্পাদক আকৈশোর সুহৃদ রণজিৎকুমার সেনের তাগিদে লেখাটি শেষ করি এবং এটি ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয়। মাসিক কিস্তির জন্যে তাঁর অক্লান্ত ও অসহ্য তাগিদ না থাকলে এ বই হয়তো কোনোদিনই শেষ হত না।······

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথামুখ

নিবিড় বিন্নাঘাসের মধ্য দিয়ে কাঞ্চন নদীর নীল জল যেখানে এঁকে-বেঁকে মহানন্দায় নামতে চলেছে, শেষ পর্যন্ত পথটি সেখানে এসেই থেমে দাঁড়াল।

আকাশে বর্ষা-মেঘের অঞ্জন। দূরে সিংহাবাদের হিজল বন যেন একটা সবুজ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে, তার মাথায় শাদা বক ফেনার মতো জমে রয়েছে। ওই হিজল গাছটায় না আছে এমন জন্তু নেই। ওখানে শ্যাওলা-ধরা সবুজ গুঁড়ির গায়ে হরিণেরা শিং ঘষে চলে, আর ঘন ঘাসবনের মধ্যে দু চোখে হিংসার প্রখর আলো জ্বালিয়ে ডোরাকাটা ক্ষুধার্ত বাঘ তাদের পর্যবেক্ষণ করে। মেঘের গুরু গুরু মৃদঙ্গ শুনে হিজলের ডালে ময়ূরেরা পেখম মেলে দেয়, বকের ছানা খাওয়ার আশায় কালো রঙের যে গোক্ষুর সাপটি গাছের আগায় উঠে এসেছিল, ভটস্থ হয়ে সে লুকোবার চেষ্টা করে পাতার আড়ালে। ঘাসের বন দলিত করে নক্ষত্র গতিতে একটা নীল গাই ছুটে চলে যায়, ক্রুদ্ধ শঙ্খচূড় তাকে ধরতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দে ছোবল মারে। কাকচক্ষু জলের মধ্যে প্রকাণ্ড নরখাদক কুমীর মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়।

চলতে চলতে যাযাবরের দল সেখানে এসে বিশ্রাম নিতে চাইল, সেখানে পুরানো দীঘিতে থরে থরে রক্তপদ্ম ফুটে রয়েছে, ভাঙা মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে ওর কণ্টিকারীর বেগুনী শোভা। মৃত্তিকার অণুতে অণুতে মিশে রয়েছে অতীত সভ্যতার বিবর্ণ ইষ্টকচূর্ণ। কাঞ্চন নদীর ওপারে প্রশস্ত বিল, শাপলায় কলমীতে জল আর চোখে পড়ে না। শীত কবে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠেব ওপর থেকে তার শাদা কুয়াশার জাল সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু দূরের যাত্রী বনহংসীর দল এই নির্জনতার মায়া কাটাতে পারেনি এখনো। ঢোলকলমী আর শাপলালতার মাঝখানে একেবারে তীরের কাছে ঘেঁষে তারা বাসা বেঁধেছে, দুপুরের রোদে চোখ বুজে বসে তারা শাদা শাদা ডিমগুলোতে তা দেয়।

বিহারের অনুর্বর কাঁকরের দেশ থেকে যারা এখানে এসেছে, সবুজের এই সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ এক অপূর্ব জগৎ। যেদিকে চাওয়া যায়, রঙের স্নিগ্ধতায় যেন চোখ পরিপূর্ণ হয়ে আসে। শোভায় দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ পৃথিবী—এ যেন কল্পনার স্বর্গলোক।

ঝিনুকের রেখা-আঁকা বালির তীরে বসে নদীর জলে তারা ছাতু ভিজিয়ে নিলে। ক্লান্তি দূর হলে ঢোল আর করতাল সহযোগে উৎসব শুরু হল তাদের :

"আরে বিলাখী বিলাখী করে রোয়ে সিয়া জনকীয়া—"

ওদিকে তিন মাইল দূরে কুমারদহে রায়বর্মারা তখন প্রবল পরাক্রমে জমিদারী করছিল।

বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর সঙ্গে মুসলমান রাজতন্ত্রের যে প্রবল বন্যা এসেছিল, তার খরপ্রবাহে একদিন দেবীকোট-রাজবংশও গেল তলিয়ে। দেবীকোটের নাম হল ঘোড়াঘাট আর ঘোড়াঘাট সরকারের শাসনে উত্তরবঙ্গের একটা বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। প্রাচীন রাজবংশ ইসলাম গ্রহণ করে আত্মরক্ষা করলে, যারা এত সহজেই ধর্মটাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারল না, তাদেরই একটি শাখা এখানে এসে জমিদারদের একটা খণ্ডাংশ নিয়েই খুশি রয়ে গেল। এরাই রায়বর্মাদের পূর্বপুরুষ।

রায়বর্মাদের শিরায় শিরায় পূর্বগামীদের রক্ত। ক্ষাত্রতেজ যা আছে প্রজারাই তার উত্তাপ অনুভব করে। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে তারা নির্বিকার মুখে বিশ বিঘা ব্রহ্মত্র লিখে দেয়, অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে গলায় ইট ঝুলিয়ে হাঁসমারীর খাঁড়িতে ডুবিয়ে মারতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।...

বর্ষা-পিছল গ্রামের পথ বেয়ে জমিদার রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার পাল্‌কী এসে থামল।

রূপো আর হাতীর দাঁতে পাল্‌কীর সর্বত্র খচিত। ভেতরে সবুজ মখমলের তাকিয়া, তাতে হেলান দিয়ে আল্‌বোলা টানছেন রাঘবেন্দ্র। মাথায় জরির কাজ করা শাদা রেশমের পাগড়ি, গায়ে সোনালী পাড় দেওয়া রেশমী আচকান। আগুন শিখার মতো একটা দীর্ঘ দেহ তার মাঝখানে জ্বলছিল।

পাল্‌কী থেকে না নেমেই রাঘবেন্দ্র ডাকলেন, দেওয়ানজী?

দেওয়ানজী সম্মুখে এসে সসম্ভ্রম প্রতীক্ষায় নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাঘবেন্দ্র বললেন, পিছনের পাল্‌কীতে লক্ষ্ণৌয়ের সরযূ বাঈজী এসেছেন। রংমহলে তাঁর থাকবার সব রকম বন্দোবস্ত করে দিন।

সসংকোচে দেওয়ানজী বললেন, যে আজ্ঞে।

প্রতি বছরই রাঘবেন্দ্র একবার করে পশ্চিম ভ্রমণে যান এবং প্রতিবারই একটি করে নারীরত্ন সংগ্রহ করে আনেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নারী বীরের ভোগ্যা এ কথা রাঘবেন্দ্র জানেন। তাই সুন্দরী নারী সম্বন্ধে তাঁর লালসা এবং দুর্বলতা সীমাহীন।

রাঘবেন্দ্র নেমে এলেন পাল্‌কী থেকে।

মদ ও আল্‌বোলা বয়ে অনুচরের দল পেছনে পেছনে এগিয়ে চলল ছায়ার মতো, যেন স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই তাদের।

তারপর দেড়শো বছর পার হয়ে গেল।

রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার স্মৃতি আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু সে ইতিহাস কেউ লিখে

রাখেনি, জনশ্রুতির স্রোতপ্রবাহে নানা কল্পনায় রঙিন হয়ে সে স্মৃতি বেঁচে আছে। 'মারাঠা'র বিলের দক্ষিণ দিকে যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটা জটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপের মধ্যে ছোট একটি থান বিরাজ করছে। এখন ওখানে চৈত্রমাসে রাজবংশীর দল মহা উৎসাহে গাজনের উৎসব করে, মুখোস এঁটে দেখায় কালীর নৃত্য। কিন্তু জনপ্রবাদ বলে, দেড়শো বছর আগে ওখানে অমাবস্যার রাতে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মা কালীপূজো করতেন। তখনও কাঞ্চন নদীর জলে এমন করে বালির পাহাড় জমে ওঠেনি, ভেলার খাল দিয়ে তখনও এমন করে জল বেরিয়ে যেত না। এই নদী তখন ব্যবসায়-বাণিজ্যেব প্রধান প্রাণপথ ছিল। সিংহাবাদের বাঁক ঘুরে, রোহনপুর বন্দর ছাড়িয়ে নদী যেখানে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে, সেখান দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী নৌকো ভোলাহাট, ইংরেজ-বাজার, মালদহ, তারপর আরো দূরে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত চলে যেত। আর মারাঠার বিলের ঘন কাশবনের মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার যে সব ছিপ নৌকো দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত, রাত্রির অন্ধকারে বিলের দামঘাস ঠেলে সে সব নৌকো সোজা কাঞ্চন নদীতে গিয়ে নামত শিকারের সন্ধানে। বৈদ্যনাথপুরের দীঘিতে আজো নাকি রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার টাকার সিন্দুক ভেসে ওঠে, সিঁদুরের মতো টকটকে লাল তার রঙ। ডাকাতি-করা ধন রাঘবেন্দ্র ব্যবহার করতে পারেননি, জঙ্গলাকীর্ণ অতল-স্পর্শ দীঘির শীতল কাদার মধ্যে বসে যক্ষেরা সযত্নে সে ধন পাহারা দিয়ে চলেছে। যাদের খুন করে ওই বিলের মধ্যে তিনি ফেলে দিয়েছিলেন, আজ তারাই তাঁর ঐশ্বর্যের অভিভাবক। শোনা যায়, লোভে পড়ে দু-একজন মানুষ ওই সিন্দুকের পেছনে বিলে ঝাঁপ দিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে তারা আর উঠে আসেনি।

কিন্তু রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার কথা না হয় থাক। তারপর আরো কয় পুরুষ কেটে গেল, সমান খ্যাতি অর্জন করে না হোক, সমান অপব্যয়ের মসৃণ পথে। ইংরেজ শাসনের আওতায় বংশকৌলীন্য ক্ষীণ হয়ে যেমন কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রধান ও মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে দেবীকোট রাজবংশও চলল সমানভাবে লুপ্তশ্রী হয়ে। বংশমর্যাদাকে কে আর মূল্য দেয় এখন! দেবীকোট-রাজবংশ প্রথম এসেছিল রাজপুতানা থেকে, চিতোরের প্রতাপসিংহ তাদেরই সগোত্র, সূর্যবংশের রক্ত তাদেরই ধমনীতে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে, এ সব কাহিনী আজ আর কে বিশ্বাস করবে?

কুমারদহের বর্তমান জমিদার কুমার বিশ্বনাথ রায়বর্মাদের শেষ কুলপ্রদীপ। হাঁ, শেষই বলা যায় বই কি। কুলপ্রদীপ কথাটাও সমান অর্থেই সত্য, কারণ জমিদারীর অবশিষ্ট যেটুকু আছে কুমার বিশ্বনাথের বিলাসের মশাল হিসাবে হয়তো আর বছর কয়েকের মধ্যেই তা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপরে বিস্মৃতির অন্ধকার।

পুরনো সাতমহলা বাড়ি ভেঙে পড়েছে, ওদিকটাতে তো এখন অজগর জঙ্গল।

সাবেকী বাড়ি ছাড়িয়ে প্রায় অনেকটা পূর্বদিকে সরে এসে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে রায়বর্মাদের। সাধারণ ধরনের সাদাসিদে কয়েকটি দোতলা—চোখে পড়বার মতো কিছু নয়। অথচ ওদিকে মৃত সিংহের কঙ্কালের মতো পড়ে আছে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। দোতলা নহবৎখানার ভেতর দিয়ে অশ্বত্থের অসংখ্য শিকড় নামছে এখন, পিলখানায় পাথরের থামগুলোকে ঘিরে ঘিরে উইয়ের মাটি জমছে, অন্দরের দীঘিতে মানুষ-প্রমাণ উঁচু হয়ে কচুরির দল হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা নাড়ছে।

তবু কুমার বিশ্বনাথ আজ পর্যন্ত সত্যিকারের জমিদার। এখনও বহু ব্রাহ্মণ-পরিবার তাঁদের দেওয়া ব্রহ্মত্র ভোগ করে। জগদ্ধাত্রী পুজোয় কলকাতার সেরা যাত্রার দল, খ্যামটা, কোন বার থিয়েটারেরও আমদানী হয় পর্যন্ত। সে জমিদারী নিশ্চিত ভাবে ডুবতেই চলেছে, তাকে বাঁচাবার কোনো ব্যর্থ চেষ্টাই কুমার বিশ্বনাথ করেন না। নিভতেই যদি হয়, তাহলে বুক-জ্বলা প্রদীপের মতো একবার অতি প্রখর আলো ছড়িয়েই সেটা নিভে যাক।

দেড়শো বছর। কেবলমাত্র এক যুগ নয়, একটা মন্বন্তর। রায়বর্মারা যখন দিনের পর দিন এক রকম আত্মহত্যার মতোই নিজেদের সর্বস্ব পুড়িয়ে ছাই করে চলেছে, তখন পারিপার্শ্বিক পৃথিবীটাও নিষ্ক্রিয় আর নিশ্চল হয়ে বসে নেই।

দেড়শো বছর আগে কাঞ্চন নদীর পারে যেখানে যাযাবর পশ্চিমার দল এসে বিশ্রামের জন্যে ডেরা বসিয়েছিল, সে জায়গাটাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারা যাবে না। এখন সেখানে হরিশরণ লালার প্রকাণ্ড ধানের গোলা। শুধু কি একটা? নদীর ধার দিয়ে প্রায় পনেরো-বিশটা গোলার মালিক হরিশরণ লালা। এত বড় ব্যবসায়ী এ জেলায় খুব বেশি নেই।

নবীপুরের বন্দর।

উত্তর-বাংলার শস্যভাণ্ডার এই জেলা। বসতিবিরল মাঠের পর মাঠ জুড়ে এখানে সবুজ ধানের ঢেউ খেলে যায়, হেমন্তের সোনালী রৌদ্রে হাজার বিঘার মাঠগুলো সোনার জোয়ারে ভরে ওঠে। বাংলার নানা অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীদের ছোট-বড় নৌকো ধান কিনবার জন্যে নবীপুরে বন্দরের ঘাটে বসে থাকে নোঙর ফেলে। এইটুকু তো নদী, অথচ ধানের সময় দুই কূল দিয়ে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত নৌকার মাস্তুল উদ্যত হয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই মরানদী দিয়ে হাজার হাজার মণ ধান নেমে যায় দিগ্‌দেশের বুভুক্ষা মেটাবার জন্যে। বর্ষার সময়ে যখন দূরের মাঠগুলো সব তলিয়ে গিয়ে সিংহাবাদ রোহনপুর পর্যন্ত একটা আদি-অন্তহীন বিলের সৃষ্টি করে, তখন সোজাসুজি পাড়ি জমিয়ে সুদূর ভাগলপুর থেকে হাজারমণী নৌকোগুলো অবধি ভিড়ে যায় এখানকার ঘাটে।

আর এই বিখ্যাত বন্দরের কেন্দ্রস্থলে বসে আছেন লালা হরিশরণ।

লালা হরিশরণ পশ্চিমা কায়স্থ। আদি নিবাস ছিল আরায়, এখনো সেখানে সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও স্বজনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাঙল ঠেলে ; এক কাঠা ভুঁইয়ে ফলায় ছোলা আর অড়হর, মহাবীরজীর ধ্বজার নিচে বসে শোনে রামচরিত মানস। পাটনার আদালতে কেউ সামান্য একটু চাকরি করে, আবার কেউ বা ছোট এতটুকু তালুক নিয়েই রাজচক্রবর্তী সেজে বসে আছে।

তাদের কারো সঙ্গেই আজ আর লালা হরিশরণের তুলনা হয় না। কেবল ব্যবসার দিক থেকে ধরলে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না কিছুই। হাঁসমারীর খাঁড়িটা পার হয়ে একবার তাকিয়ে ছাখো সামনে,—ওই যে বিশাল ধানের জমিটা দূর চক্রবালে কালো কালো গাছগুলি পর্যন্ত একেবারে ধু ধু করছে, ওর সমস্তটাই লালা হরিশরণের সম্পত্তি। সমস্তটাই। এত বড় মাঠখানার ভেতরে এক দাগ জমির ওপরেও কেউ দাবি জানাতে পারে না।

কেবল এখানেই ? আশে-পাশে, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে—কোথায় নেই লালা-জীর জমি ? আট-দশটা খামার থেকে গাড়ি গাড়ি ধান বোঝাই হয়ে এসে গোলায় জড়ো হয়—তারপর নৌকোর খোল ভর্তি করে কোথা থেকে কোথায় যে চলে যায়, কে তার এত হিসাব রাখে ? মোটের ওপর, যেদিক থেকেই বলো, অফুরন্ত টাকা আসছে লালাজীর। আর আসছে বললেই যথেষ্ট হল না, ঠিক বন্যার মতো ধারায় আসছে। লোহার সিন্দুক থেকে উপচে ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক থেকে আট-দশটা ব্যবসার মধ্যে টাকাগুলো নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। লালা হরিশরণের নাম শুনলে জেলার ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠেন। কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে তাঁর বিশাল প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন বাংলার গভর্ণর স্বয়ং।

কোথা থেকে কী হয়ে গেল ! যেন যাদুমন্ত্র ! যে যাযাবরের দল সেদিন কাঞ্চন নদীর বালুতটে বসে ছাতু ভিজিয়ে খেয়েছিল, তাদেরই একটা খণ্ডাংশ অনিশ্চিত ভাবে ডেরা বাঁধতে চাইল এখানে। কিন্তু কেবল ডেরা বাঁধলেই তো চলে না, জীবিকারও একটা ব্যবস্থা থাকা চাই। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার অনুমতি নিয়ে তারা ছোট ছোট চালা বাঁধল। তারপর কেউ আরম্ভ করল ভুট্টার চাষ, কেউ হলুদের ব্যবসা, আবার কেউ বা ধানের জমিতে 'জন' খাটতে লেগে গেল।

হরিশরণ লালার পূর্বপুরুষ রামসুন্দর লালা। জমিদারবাড়িতে তার চাকরি জুটল—ঘোড়াকে 'চাল' শেখাতে হবে। আরও অনেক আনুষঙ্গিকের সঙ্গে রাঘবেন্দ্র ঘোড়া সম্পর্কেও দুর্দান্ত নেশা পোষণ করতেন। ঘোড়ার সঙ্গে কোথায় যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে জীবনের দুর্বিনীত বেগবান গতির।

অলক্ষ্য যে চাকাটা চিরকাল ধরে অসংখ্য ভাঙাচুরোর মধ্য দিয়ে ঘুরে চলেছে অব্যাহত

ভাবে, রামসুন্দরের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠল তার আবর্তটা। কিছুদিন পরে রামসুন্দর জমিদারবাড়ি ছেড়ে দিয়ে শুরু করল কাটা কাপড়ের ব্যবসা। ছোট একটা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে কাপড়ের একটা গাঁটরি চাপিয়ে সে এ-হাট ও-হাট ঘুরে বেড়াত। এক মুঠো চানা চিবিয়ে কাটত তার দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ; সে তপস্যা ব্যর্থ হল না। আস্তে আস্তে তার কাটা কাপড়ের গাঁটরি গদীতে রূপান্তর লাভ করল এবং আরো কিছুদিনের মধ্যে কাটা কাপড়ের ব্যবসায় রামসুন্দর একচ্ছত্র হয়ে উঠল এ তল্লাটে।

সময় গড়িয়ে চলল স্রোতের মতো, আর তার তীরে শ্যাওলার মতো জমতে জমতে ক্রমে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নবীপুর বন্দর। রামসুন্দরের আত্মা মর্তে ফিরে এলে সেই কি এই বন্দরকে চিনতে পারে এখন ? সিংহাবাদের হিজল বনটা এখনও দিগন্ত-বিস্তৃত 'ডুবা' বা ঢালু জমির মাঝখান টিকে আছে বটে, কিন্তু তার সে পূর্ব গৌরব আর অবশিষ্ট নেই এতটুকুও। সাঁওতালদের তীর আর শিকারীদের বন্দুকের ভয়ে ডোরাকাটা বাঘগুলি হয়তো বা সন্ন্যাস নিয়েই উত্তরে হিমালয়ের গুহায় সাধনা করতে চলে গেছে ; মানুষের তাড়ায় সন্ত্রস্ত হরিণ আর নীল গাইয়ের দল দ্রুত ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কে বলতে পারে। কাঞ্চন নদীর নীল জলে কালো কালো মেঘের মতো যে সব কুমীর পুত্র-কলত্র নিয়ে নির্ভয়ে ভেসে বেড়াত, এখন তাদের দুই-একটি বংশধর পুরোপুরি মৎস্যাশী হয়ে এবং খালে বিলে লুকিয়ে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করছে। এই তো—বেশি নয়—মাত্র পঁচিশ বছর আগেই এ তল্লাটে এসেছিল "কুমীরমারার" দল। বাড়ি তাদের গোরখপুর জেলায় এবং সব চেয়ে প্রিয় তাদের কুমীরের মাংস। নানা রকমের তুক মন্ত্র জানত তারা ; মন্ত্র পড়ে স্রোতের জলে জবা ফুল ভাসিয়ে দিত, ফুলটা চলতে চলতে হঠাৎ যেখানে গিয়ে থেমে দাঁড়াত, বোঝা যেত সেখানে কুমীর আছে। অমনি কুমীরমারারা ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ত জলে, আর সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, একেবারে খালি হাতেই নাকি তারা জলজ্যান্ত ভয়ঙ্কর কুমীরটাকে নির্ঘাত তুলে আনত। সেই তারা এসেই এদিককার কুমীরগুলোকে একেবারে নির্বংশ করেছে বলা চলে।

আর সাপ ! তা দু-চারটে সিংহাবাদের হিজল বনে এখনো আছে বটে। কিন্তু তাই বলে শঙ্খচূড়েরা কোথায় ? হিজল বনের অন্ধকারে তাদের মাথায় নাকি মণি জ্বলত, সেই মণিসহ তারা দুমকার পাহাড়ে তিরোহিত হয়েছে। তবে কালো কালো গোক্ষুর সাপের এখনো অভাব নেই, বকের ছানা খাওয়ার আশায় এখনো তারা হিজল বনের মাথায় উঠে যায়, কিন্তু ময়ূরের ভয়ে আর তাদের তটস্থ বোধ করতে হয় না। বিস্মৃতিময় উজ্জয়িনীর ভবন-শিখরেই কেকার নৃত্য চলেছে হয়তো।

এ সবই নবীপুর বন্দরের কল্যাণে। বর্ষায় ভরা ডুবার ভেতর দিয়ে মাল বোঝাই নৌকো চলে যায় রোহনপুর ইস্টিশানে, কার্তিক মাসে জল নেমে গেলে আবার গোটা

শুকনোর সময় অসমতল 'লিক' পথ ধরে অসংখ্য গোরুর গাড়ি বুলবুলির পথে যাত্রা করে। ডুবার যে সব উঁচু জায়গাগুলোতে জল উঠতে পারে না, সেই সব পরিত্যক্ত টিলার ওপর ক্রমে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠছে। এই সব নতুন বসতির বাসিন্দা প্রায়ই 'দিয়াড়িয়া' বা মুর্শিদাবাদের একদল ঘরছাড়া মুসলমান—হিন্দুস্থানী গোয়ালা সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। ডুবার মধ্যে পাশাপাশি অনেকগুলো ছোট বড় চালা তুলে এই গোয়ালারা বাস করে, মহিষ চরায়, দুধ, দই, ক্ষীর নিয়ে বিক্রি করে নবীপুরের বাজারে। আশেপাশে সাঁওতাল, তুরী, ওঁরাও, ভুঁইমালী প্রভৃতি ব্রাত্যদের ছোট বড় কতগুলো গ্রাম ছড়িয়ে আছে ছন্দোহীনভাবে।

মোটের ওপর নবীপুর বন্দর যে কেবল বাইরের প্রকৃতিরই রঙ বদলে দিয়েছে, তাই নয়; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সব জায়গায়ই নতুনের ছায়া পড়েছে। এদিকে নবীপুর বন্দরে থানা বসেছে, সরকারী ডাক্তারখানা বসেছে, বসেছে তারশুদ্ধ ডাকঘর। চারদিকের ছোট ছোট গ্রামে যারা বাস করে, তারা তো এটাকে সহর বলেই জানে। অবশ্য মামলা-মোকর্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে যাদের দু-একবার ইংরেজবাজার কিংবা দিনাজপুর থেকে ঘুরে আসতে হয়েছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই নবীপুরকে অদৃশ্য কল্পলোক কলকাতার সমতুল্য বলে ভাবতে ভালোবাসে।

সময় সত্যি বয়ে চলেছে স্রোতের মতোই। তাই তার এ কূল ভাঙে তো ও কূলে বড় বড় চড়া দেখা দেয়। ঠিক এমনই হয়েছে নবীপুর আর কুমারদহের অবস্থা। মাত্র দু-তিন মাইল ব্যবধানে এত বড় দুটো গ্রাম, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত নেই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা! পঁচিশ বছর আগেই কি একথা কেউ ভাবতে পারত! নবীপুর অবশ্য বেড়ে চলছিল, কিন্তু কুমার বিশ্বনাথের বাবা কুমার চন্দ্রনাথের কাছে হাত জোড় করে সারাক্ষণ বসে থাকত হরিশরণের খুড়া বিষ্ণুশরণ লালা। ওরা যখন ময়লা গদীতে বসে হলদে খাতায় দেবনাগরী হরফে হিসাব কষত, তখন এদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ভারতের সেরা বাঈজীর পায়ে ঝুনঝুন করে ঘুঙুর বাজত। দেবীকোট-রাজবংশের রক্ত এদের শরীরে, কুমারদহ এদের রাজধানী। তার সঙ্গে তুলনা চলে যাযাবর পশ্চিমাদের ওই গ্রাম, ওই নবীপুরের?

কিন্তু দিন বদলেছে, কালের হাওয়াও বদলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। তাই কুমারদহ যে পরিমাণে জনশূন্য হয়ে আসছে সেই পরিমাণেই ভরাট হয়ে উঠছে নবীপুরের অন্ত-প্রত্যন্ত। সহরের মতো কাঠা-দরে সেখানেও জমি বিক্রি হয়, অথচ কুমারদহে যে সব পোড়ো ভিটে দাঁড়িয়ে আছে, বিনা পয়সায় দিতে চাইলেও সেগুলি কেউ নিতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।

এই তো যুগ। একালের শীর্ষশিখরে বণিক বসে আছে অধিকারের রত্নমুকুট পরে,

নরপতির চক্রহীন রত্নরথ কোথায় পথের মাঝখানে কোন্ পঙ্ককুণ্ডে যে আবদ্ধ হয়ে রইল, তার সন্ধান কোনো ঐতিহাসিকই বুঝি দিতে পারে না। শ্রেষ্ঠীর লোভ-লোলুপ বাহুতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে সম্রাট্ চলে গেল প্রব্রজ্যা নিয়ে, তার পদধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বিস্মৃতির পরপারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কথারম্ভ

এক

কুমারদহ আর নবীপুরের মাঝখানে শোভাগঞ্জের হাট।

তিথিটা শ্রাবণ-সংক্রান্তি। হাটের মাঝখানে ঝাঁকড়া বটগাছ, বারোয়ারী তলা। তার নিচে সিমেন্টের বেদী, আর সেই বেদীতে দেবী বিষহরী অধিষ্ঠিতা।

অবশ্য দেবী বিষহরী সশরীরে বসে নেই, আছে তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তি। রাজবংশী মেয়েদের মতো ছাঁচে ঢালাই নির্বোধ মুখ, গায়ে যাত্রার দলের সখী আর সেনাপতির মিশ্রিত পোশাক। শোলার সাপগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। দেবীর পায়ের একপাশে একটি রাজহাঁস বসে আছে ধ্যানস্থ হয়ে, আর একপাশে কালো রঙের প্রকাণ্ড একটা সাপ ফণা তুলে রয়েছে। সাপের মুখে ব্যাং জাতীয় কী একটা পদার্থ দেখা যাচ্ছে, তবে সেটা চিংড়ি মাছ হওয়াও আশ্চর্য নয়। অবশ্য শাস্ত্রে বাধে না; কারণ সাপের কাছে দুটোই উপাদেয় হবার সম্ভাবনা।

এটা গ্রামের বারোয়ারীতলা। শ্রাবণ-সংক্রান্তি উপলক্ষে এ অঞ্চলের রাজবংশীরা খুব ঘটা করেই বিষহরীর পুজোর আয়োজন করেছে। অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত একটা বিরাট জনতার সামনে চলছিল আল্‌কাপের গান।

উত্তর-বাংলার পল্লীজীবনের একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশে বাঙালির নিজস্ব এই সব আনন্দ কোনক্রমে টিকে রয়েছে এখনো। কাপ অর্থে রঙ্গ-ব্যঙ্গ। খানিকটা অভিনয় এবং প্রচুর গানের মধ্য দিয়ে খানিকটা অমার্জিত রস সৃষ্টি করাই আল্‌কাপের উদ্দেশ্য। প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত আক্রমণও যে কিছু কিছু না করা হয় এমন নয়। দরকার মতো অনায়াসে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ব্যঙ্গ করতে এরা ভয় পায় না। তবে এই সমস্ত মশক সম্বন্ধে ব্রিটিশ সিংহ কখনই খুব বেশি সচেতন নয়। এদের সম্পর্কে 'জন বুলের' এখনো সুপ্তিভঙ্গ হয়নি বলেই মনে হয়।

দাড়ি-গোঁফ-কামানো ভূষণ মুচি মুখে খানিকটা রঙ মেখে সেজেছিল নায়িকা। তবে কেবল নায়িকাই নয়, নায়িকার শাশুড়ী এবং কাহিনী-বর্ণিত কোনো বিদগ্ধা নাপিত-বধূর ভূমিকাতেও সে একাই অভিনয় করছিল। 'মেক-আপ'টা দেখবার মতো। কোথা থেকে

পুরনো একখানা চেলি সংগ্রহ করে এনেছে, কোনো বিয়েবাড়িতে ঢাক বাজাতে গিয়ে বখশিশ মিলেছে সম্ভবত। কাপড়টার রঙ জলে গেছে, সর্বত্র হলুদের ছোপ লাগা, ঝোলের দাগ হওয়াও বিচিত্র নয়। পাটের তৈরি খোঁপাটার আয়তন দেখে কেশবতী রাজকন্যার ঈর্ষা জাগতে পারে। নাকের মধ্য দিয়ে প্রকাণ্ড একটা পিতলের নথ চালিয়ে দিয়েছে, গোরুর গাড়ির চাকার মতোই সেটা মুখের উপর দুলছিল। তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার মতোই সর্বজনীন 'মেক আপ'।

পনেরো টাকায় কেনা হারমোনিয়মের ছেঁড়া 'বেলো' দিয়ে ভস্ ভস্ করে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু একজন সেটাকে টেপাটেপি করে প্যাঁ-পোঁ শব্দে একজাতীয় সুরের সৃষ্টি করছিল। একজন মাথা দুলিয়ে যে রকম প্রচণ্ড উৎসাহে তবলা ডুগি ঠুকছিল, তা দেখে সন্দেহ হয় ও দুটোকে যে-করে হোক্ ফাটাবে, এই তার স্থির প্রতিজ্ঞা। করতাল ও ঘুঙুরের বেতালা ঝম্‌ঝমানিতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম!

কিন্তু ভূষণ মুচি হারবার পাত্র নয়। যন্ত্রের এই বেসুর কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠবার মতো বিধিদত্ত কণ্ঠস্বর নিয়ে সে অবতীর্ণ হয়েছে আসরে। চেলির আঁচলটা যাত্রার সখীদের ভঙ্গিতে ধরে সে আসরের চারিদিকে বারকয়েক ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে এল, অর্থাৎ নৃত্য-কলা প্রদর্শন করলে। তারপর উদারা-মুদারার পরোয়া না রেখে সোজা তারাতেই শুরু করে দিলে:

> "পতি হে, দুঃখের কথা কী কহিতে পারি,
> পরবাসে গেইলা তুমি ঘরেতে রহিনু হামি
> কৈঁইদা মরি বিরোহিণী নারী—
> খ্যাদেতে হয়্যাছি শীর্ণ
> আহার নাই পান্তা ভির্ণ
> মদনের তুষানলে বুঝি জল্যা মরি হে—"

বেশভূষা দেখে সে যে নারী সেটা স্বীকার করতেই হয় এবং বিরহিণী হওয়াও তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সে যে খেদে শীর্ণ হয়েছে এবং পান্তা ভিন্ন তার আর আহার নেই, চেহারা দেখে সে কথা মনে হওয়ার জো নেই কিছুতেই।

নায়িকার এমন হৃদয়ভেদী বিলাপ শুনে কতক্ষণ ধৈর্য রাখা যায় আর? অতএব নায়ক সেজে রঙ্গমঞ্চে হাবু মুচি আবির্ভূত হল। পায়ে একজোড়া বিবর্ণ ক্যাম্বিশের জুতো, কাপড়ের কালো পাড় দিয়ে তার ফিতে বাঁধা। কাপড়টা পরেছে মালকোঁচা এঁটে। গায়ে হাতকাটা শাদা ফতুয়া, কাঁধে একখানা গামছা। চোখে ছ আনা মূল্যের একজোড়া 'সান গ্লাস্' নায়কের আধুনিকত্ব সম্পাদন করেছে।

এল অশ্বারোহণে। বীরের পক্ষে অশ্বারোহণটাই প্রশস্ত, অন্তত এখন পর্যন্ত মোটর-

গাড়ির কল্পনাটা ওদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি। তাই বলে সত্যিই কিছু ঘোড়া নয়। ছোট ছোট ছেলে-পিলেরা যেমন লাঠি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে, তেমনি একটা লাঠিতে দড়ির লাগাম ঝুলিয়ে নিজেই লাফাতে লাফাতে এসে দর্শন দিলে।

তাকে দেখে নায়িকা আর একবার রঙ্গমঞ্চের চারিদিকে ক্যাঙারু-নৃত্যে ঘাঘরা ঘুরিয়ে এল। ঘোড়াটাকে একটা চেয়ারের পায়ার সঙ্গে বেঁধে নায়ক গান ধরলে। গান তো নয়, নিজের প্রবাস বর্ণনা আর বিরহ-বেদনার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। তার ভেতর না আছে এমন ব্যাপারই নেই। মোটামুটি ভাবার্থ এই: "ওগো প্রিয়া, তুমি তো ঘরে বসিয়া ইনাইয়া বিনাইয়া গান গাহিতেছ। পান্তাই খাও আর যাই খাও ফুলিতেছ নেহাৎ মন্দ নয়। কিন্তু আমার অবস্থা তো আর জানো না। একে তো বিরহ-আগুনে দিবারাত্রি শাল কাঠের মতো ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছি, খাইতে স্বোয়াস্তি নাই, শুইতে স্বোয়াস্তি নাই, তার উপরে আবার জমিদারের অত্যাচার। এমন হারামজাদা জমিদার ভূ-ভারতে মিলিবে না। ধরিয়া ধরিয়া বেগার খাটায়, জমি হইতে জোর করিয়া ধান কাটিয়া লয়—জমিদারের গ্রাসে যথা-সর্বস্ব গেল। সেদিন আবার লইয়া গিয়া বিশ ঘা জুতা মারিয়াছে। পিঠের জ্বালায় তিন রাত ঘুমাইতে পারি নাই, এখানে আসিয়া তোমার বিরহ-যন্ত্রণা নির্বাপিত করিব কী প্রকারে।"

শুনে স্ত্রী খেদোক্তি করলে খানিকটা। অত্যন্ত সযত্নে স্বামীর পিঠটা দু-একবার ডলে দিলে, ক্যাঙারুর ভঙ্গিতে আসরের চারিদিকে ঘুরে নেচে এল একবার। তবে নৃত্যটা এবারে দুঃখ না আনন্দের অভিব্যক্তি—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

দর্শকের হাততালি বেজে উঠল। বাহবা, বাহবা, সাবাস। গান থেমে গেছে কিন্তু তবলচীর উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি তখনো। অথবা ভাবে সে এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছে যে, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে তার। দু হাতে দুমদুম করে সে দুর্দান্ত বেগে তবলা ঠুকে চলেছে।

কিন্তু দর্শকেরা এসেছে তামাসা দেখতেই। ভুলতে এসেছে কিছুক্ষণের জন্যে, পেছনে ফেলে এসেছে অসহ্য ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভরা অন্ধকার ঘরের অভিশাপকে। যে সব সমস্যার বাস্তবরূপ প্রতিদিন তাদের জীবনকে দুর্বহ করে তোলে, সে সব সমস্যা যে আলকাপের আসরেও তাদের তাড়া করে আসবে—এ তারা চায় না। উস্‌খুস্‌ করে উঠল জনতার পাঁচ-সাতজন, চিৎকার করে বললে, "কাপ চাই কাপ, তামাসা।"

নায়ক-নায়িকা ঝুঁকে পড়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল দর্শকদের। হারমোনিয়াম আর তবলায় সুর ফিরল, প্রবল কণ্ঠে দ্বৈত-সঙ্গীত জুড়ে দিলে তারা। সহরের রসিক শ্রোতা কেউ থাকলে হয়তো বলত দৈত্য-সঙ্গীত। কিন্তু সে গানও মাত্র দু-এক মিনিটের জন্যেই। হারমোনিয়াম, তবলা ও করতালওয়ালারাও নিজেদের কণ্ঠ-কাকলির পরিচয় দেবার এই

সুবর্ণ সুযোগটির জন্যেই মুখিয়ে ছিল বোধ করি, মুহূর্তে সকলের সমবেত চিৎকারে বারোয়ারীতলা মুখর হয়ে উঠল। বেদীর ওপর শিউরে উঠলেন দেবী বিষহরী।

গানটা আধুনিক কালকে ব্যঙ্গ করে :

"মাথাতে লম্ফা টেরী
হাতেতে বান্ধা ঘড়ি,
বুকেতে ফন্ট্যানপ্যান
আই এম এ জ্যাণ্টেলম্যান—"

এবং তারপর—

"মিঠাই মোণ্ডা ঘরের ইস্ত্রী পরাণ ভরে খেতে পান,
বাপে মায়ে চাইলে পরেই পয়সার বড় টা—ন্—"

কটাকট করে প্রবলভাবে চারদিকে 'ক্ল্যাপ' পড়ে গেল। এই—এতক্ষণে জমেছে। এ নইলে আবার 'কাপ'। সহরের আলোক-প্রাপ্ত একজন ছিল, সে বললে অ্যান্‌কোর, অ্যান্‌কোর।

কিন্তু সাধারণের ভেতরে একজন ছিলেন "বিশিষ্ট অতিথি"। একপাশে একখানা চেয়ারে লালাজী বসেছিলেন। সারা জেলায় লালাজীর নাম, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে অসাধারণ খাতির। কিন্তু দেশে এলে তিনি ইতর-ভদ্রের সঙ্গে মিশে যান সমানভাবে। এই কারণেই দেশের লোক শ্রদ্ধা করে তাঁকে, বিশ্বাস করে অনেক বেশি। যে লোকটা তাঁর ঋণের জালে পড়ে ফাঁসে-আঁটা প্রাণীর মতো মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাঁর হাসিমুখ দেখে সেও তাঁকে একান্ত সুহৃদ বলেই মনে করে। আর কেনই বা করবে না? দিনের পর দিন চক্রবৃদ্ধির করালচক্রে তিনি যাদের ভিটে মাটি উচ্ছেদ করছেন, তাদের গ্রামেই নিজের ব্যয়ে বসাচ্ছেন ইঁদারা। মহরম থেকে শুরু করে ছট পরব পর্যন্ত, তাঁর কাছে হাত পাতলেই অক্লেশে পাঁচ-দশ টাকা তুলে দেন তিনি।

গানটা লালাজী উপভোগ করছিলেন। বাঙালি নন বটে, কিন্তু বাংলা দেশকেই গ্রহণ করেছেন মাতৃভূমি হিসাবে। উত্তর বাংলার এই সব নগণ্যতম গ্রাম, চাষাভূষার দৈনন্দিন জীবন, তাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আশৈশব পরিচিত তিনি। তাঁদের পরিবারের মধ্যে হিন্দী ভাষাটা এখনো চলে বটে, কিন্তু সে ভাষায় আধাআধি পরিমাণ প্রাদেশিক বাঙলার খাদ মিশেছে। তাঁর ছেলেরা কলকাতায় পড়ে, বাঙালির মতো করে চুল ছাঁটে, কাপড় পরে, লালাজী আশঙ্কা করেন দশ বছর পরে তারা একেবারে বাঙালি হয়ে যাবে। অবশ্য সে জন্য তিনি খুব চিন্তিত নন। পশ্চিমে তাঁর কে-ই বা আছে। আরা জেলার কোন্ গ্রামে তাঁর আদি নিবাস সেটা তিনি নিজেও মনে করতে পারেন না সব সময়ে।

গান শুনে লালাজী বললেন, সাবাস! বেড়ে গান। কোথাকার দল তোমরা?

তবলচী তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে ভালো করে দেখা গেল লোকটাকে। বোঝা গেল সে-ই এদের দলপতি, চলতি কথায় 'মেনেজার'। গায়ে ফুলকাটা পাতলা বিলিতী ছিটের পাঞ্জাবি, তার স্বচ্ছ আবরণের তলায় গোলাপী গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে একটা, গলায় একগাছা সুতোর সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি মেডেল ঝুলছে, টিনের অথবা রুপোর বোঝবার জো নেই। পাঞ্জাবির পকেট থেকে নগ্ন পরীর মূর্তি আঁকা একখানা ছাপা রুমাল মাথা তুলেছে।

তবলচী সামনে ঝুঁকে অসীম সম্ভ্রমভরে অভিবাদন জানাল। বললে, আমরা হুজুর আইহোর দল।

—আইহো? মুচিয়া?

তবলচী আপ্যায়িত হয়ে ঘাড় নাড়ল।

—কত টাকার বায়না নিয়েছ এখানে?

—মোটে সাত টাকা হুজুর।—ম্যানেজারের সুরে নৈরাশ্য: আল্‌কাপ কবির সে সব দিন আর নেই। সহরে বায়স্কোপ, থিয়েটার। এই বিষহরী পূজোর সময়টা কিছু কাজ থাকে, তা ছাড়া সারা বছরে তো কোনো কারবার নেই আর।

—সাত টাকা!—লালাজী সহানুভূতির স্বরে বললেন, তা হলে ভাগে তোমাদের কী থাকে?

—কিচ্ছু না হুজুর, কিচ্ছু না।—ম্যানেজার উৎসাহিত হয়ে উঠল: এখন দল টিকিয়ে রাখাই কঠিন। এই মালদা জেলায় যে দু-চারটে দল আছে, দু-এক বছরের মধ্যেই সব উঠে যাবে। আর আগে-আগে হুজুর, বড় বড় সায়েবরা অবধি আল্‌কাপের গান শুনতে আসতেন।

লালাজী পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস বের করলেন একটা। সেটা খুলে তিনি ম্যানেজারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, নেবে নাকি?

ম্যানেজার জিভ কেটে পিছিয়ে গেল তিন হাত। এত বড় একটা ঘটনা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। লালা হরিশরণ, সারা দেশ জুড়ে যাঁর নাম, যাঁর গোলায় হাজার হাজার মণ ধান মজুত থাকে, স্বয়ং লাট সাহেবের সঙ্গে যাঁর 'খানাপিনা', তাঁর হাত থেকে সিগারেট নেবে সে, আইহোর নগণ্য দোকানদার ব্রজহরি পাল!

লালাজী হাসলেন, নাও।

—আজ্ঞে, এঁ-এঁ—

—লজ্জা কিসের? তুলে নাও না।

কাঁপা হাতে ব্রজহরি একটা সিগারেট টেনে নিলে, অনেকটা যেন স্পর্শদোষ বাঁচিয়েই।

জলন্ত মোমের মতো আবেগে গলে গিয়ে শুধু বললে, এঁ-এঁ-এঁ—

চার-পাশের জনতা দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তারা আরো কিছু অঘটনের প্রত্যাশা করছে। লালাজীর বাক্স থেকে বার্ডসাই তুলে নিয়েছে লোকটা, আকাশ থেকে স্বর্গীয় পুষ্পকরথ নেমে এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেলেও এতটা বিস্মিত হত না কেউ। নির্ঘাত শেয়াল বাঁয়ে রেখে সে বেরিয়েছিল, নইলে লালাজীর এমন অনুগ্রহ! একটা তীক্ষ্ণ ঈর্ষা-বোধ পাঁজরের মধ্যে খোঁচা মারছিল তাদের। দলের অন্যান্য সবাই, বিশেষ করে ভূষণ মুচি রীতিমত মানসিক বিক্ষোভ বোধ করছিল। ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচে গানে সে আসর মাৎ করে দিলে, আর বাহাদুরি যা কিছু সব জুটল ম্যানেজারের ভাগ্যে!

লালাজী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তারপর, আর কোথাও বায়না আছে নাকি তোমাদের?

যেমন করে গাঁজার কলকেতে টান দেয়, তেমনি করে দু হাতের মধ্যে সিগারেটটা নিয়ে ম্যানেজার ব্রজহরি একটা টান মারলে, আর সেই টানে সিগারেটটা পুড়ে এল প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত। ওটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ধোঁয়াটা গিলে সে খানিকক্ষণ বুঁদ হয়ে রইল, অমন দামী সিগারেটের আস্বাদটাকে সহজেই মুখ থেকে ছেড়ে দিতে চায় না যেন। গদ্‌গদ্ স্বরে বললে, আজ্ঞে, আছে বই কি—কুমারদ'য়। তিন-রাত গাইতে হবে।

—কুমারদ'য়?—লালাজী ভ্রূ দুটোকে সঙ্কুচিত করলেন একবার, কত করে দেবে সেখানে?

—দশ টাকা।

—আর সাত টাকা এখানে?

ম্যানেজার হাওয়াটা অনুমান করেছিল আগেই, সুযোগ বুঝে এবার আত্মপ্রকাশ করলে। বললে, এঁ-এঁ হুজুর, নিজেই বুঝে দেখুন না, আপনি থাকতে—গাঁয়েরও অপযশ হয়ে যায় একটা।

—অপযশ হয় বই কি!—লালাজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আসর আর একবার জনতার দিকে তাকালেন। মাথার মধ্যে মতলব খেলছে একটা। কিছুদিন থেকেই দেবীকোট রাজ-বংশের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার বাসনা বোধ করেছেন তিনি।

—সাত রাত গান গাইতে হবে এখানে। এই বারোয়ারী-তলায়। পনের টাকা করে পাবে, রাজী আছো?

—পনের টাকা!—ব্রজহরি নয়, দলশুদ্ধ সকলে একসঙ্গে প্রতিধ্বনি করে উঠল। সাত রাত পনেরো টাকা হিসাবে! উঃ, সে যে অনেক টাকা! তার পরিমাণ ভাবলেও যে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না!

ম্যানেজারের চোখ চকচক করতে লাগল: আজ্ঞে হুজুর, রাজী বই কি, নিশ্চয়

রাজী। কুমারদ'র বায়নাটা সেরে এসেই—

লালাজীর ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা দুলে উঠল একবার। বললেন, না, কুমারদ'র বায়না সেরে নয়, এখানেই গাইতে হবে। কাল থেকে সাত রাত্তির।

ম্যানেজার দমে গেল। অতখানি উৎসাহ তার কণ্ঠস্বরে আর প্রকাশ পেল না। বললে, রাজবাড়ির গান হুজুর, আগাম বায়না দিয়ে গেছে—

—বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

ম্যানেজার চুপ করে রইল, সমস্ত দলটাও রইল মাথা নত করে। এমন প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব। কুমার বিশ্বনাথকে তারা চেনে। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রক্ত তাঁর শরীরে। এতবড় অপরাধ তিনি সহজে ক্ষমা করবেন না এবং তাঁর ক্রোধের পরিণাম যে কী সেটাও অনুমান করা অসম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আর—আর—বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিতে পারে, এতবড় সাহসীই বা কে আছে! কার ঘাড়ে দশ দশটা মাথা! তারা ছা-পোষা সংসারী মানুষ, স্ত্রী-পুত্রকে অনাথ করলে তাদের চলবে না।

দামী সিগারেটের মিঠে ধোঁয়াটা ম্যানেজারের মুখে তেতো আর বিস্বাদ হয়ে গেল। অস্পষ্টস্বরে বললে, না হুজুর, পারব না।

লালাজী সোজা হয়ে উঠে বসলেন : পারবে না? কেন পারবে না?

—রাজবাড়ির বায়না হুজুর। খেলাপ করলে ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

—ঘাড়ে মাথা থাকবে না?—লালাজীর দৃষ্টি ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল মুহূর্তে। কিন্তু গলার স্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না, ব্যবসায়ী জীবনে সংযম জিনিসটাকে আয়ত্ত করেছেন তিনি। বললেন, ইংরেজের রাজত্ব। এ নবাবী আমল নয় যে ইচ্ছে করলেই হাতে মাথা কেটে আনা যায়। আমি বলছি তোমাদের, বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

সিগারেট পেয়ে ম্যানেজার যে পরিমাণ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, একটা কাঁটার খোঁচায় যেন তার দ্বিগুণ চুপসে গেছে। ক্ষীণস্বরে আবার বললে, মাপ করুন হুজুর, ওখান থেকে ফিরে এসে গাইব। রাজবাড়ি!

রাজবাড়ি! লালাজীর মুখ অপমানে কালো হয়ে গেল। বুকের ভেতর যেন বিষাক্ত সাপে ছোবল মেরেছে একটা। শূন্যগর্ভ একটা নাম, রাজ্যহীন রাজবাড়ির এত প্রতাপ যে তার আওতায় তিনি শুদ্ধ চাপা পড়ে গেলেন! অথচ কুমারদ'র রাজবংশের আজ যে কী অবশিষ্ট আছে, সে কথা তাঁর চাইতে ভালো করে আর কে জানে। কিস্তিতে কিস্তিতে একখানি করে মহাল লাটে ওঠে, দেনার দায়ে একটু একটু করে যায় বিকিয়ে। বিশ্বনাথের মদ আর রেসের বিল শোধ করতে ওই বাড়িটাও যে একদিন বিক্রি হয়ে যাবে সে খবর লালাজী কি রাখেন না? তবু ওই নামটা যেন লোকের মনের ওপর যাদুমন্ত্র বিস্তার করে আছে। রাজার নাম শুনলেই তাদের অভ্যস্ত মাথা ভয়ে-সম্ভ্রমে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অথচ

তাঁর পাশে রায়বর্মারা! ইচ্ছা করলে অক্লেশে ওরকম আট-দশটা জমিদারকে তিনি কিনতে পারেন, তাতে তাঁর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।

রাজবাড়ি! কথাটাকে স্বগতোক্তির মতোই একবার উচ্চারণ করলেন তিনি। ওই রাজবাড়িকে একবার দেখে নিতে হবে। কুমারদহ এতদিন যথেষ্ট রাজমর্যাদা ভোগ করে এসেছে, রাজ্যহীন রাজার নামমাত্রে কপালে হাত ঠেকিয়েছে বিমূঢ় প্রজার দল। লালাজী সেদিকে দৃক্‌পাত করেননি কোনো রকম। তখন তাঁর সময় ছিল না। ব্যবসাকে বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে, বড়, বড়, আরো বড়। পৃথিবীব্যাপী ঐশ্বর্যের যে খরস্রোত বয়ে চলেছে, তার তীরে কেবল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই চলবে না। কাজেই জীবনে কুড়িটা বছর এদিকে তিনি চোখ তুলে তাকাবার সময় পাননি। কিন্তু আজ আসন্ন বার্ধক্যে কর্মোদ্যম হ্রাস হয়ে এসেছে, ব্যবসার কাজকর্ম দেখা-শোনা করে ছেলেরাই, এখন লালাজী ভালো করে বাইরের দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় পেয়েছেন। যশ চাই তাঁর, সম্মান চাই। বিশাল ব্যবসা তাঁকে যে সোনার সিংহাসনে তুলে বসিয়েছে, সেই স্বর্ণাসনকে সমস্ত পৃথিবী এখন প্রণাম করুক।

লালাজী বললেন, কুড়ি টাকা করে দেব।

কুড়ি টাকা! ম্যানেজার ঠোঁট চাটল। দলের অন্যান্য সকলের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে কোটরের বাইরে ঝুলে পড়ার উপক্রম করছে। নীলামের ডাকের মতো দর চড়ছে। কুড়ি টাকা করে আল্‌কাপের বায়না! কিন্তু—কিন্তু—রাজবাড়িকে অপমান করে—

ম্যানেজার শুকনো ভীত গলায় বললে, আমরা, আমরা—আমরা ঠিক করে আপনাকে জানাব হুজুর।

—তাই জানিয়ো।—লালাজী উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো দশ টাকার একখানা নোট মুঠো করে ম্যানেজারের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। বরকন্দাজকে বললেন, চল্, শিউ পাঁড়ে।

বিস্মিত অভিভূত জনতা কোনো কথা বলতে পারল না। আর রাজবংশীর নির্বোধ মুখ নিয়ে সেনাপতির সাজ-পরা দেবী বিষহরী নিষ্পলক নির্বোধ চোখে তাকিয়েই রইলেন।

দুই

রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহল।

লক্ষ্ণৌয়ের সরযূ বাঈজীর পায়ের ঘুঙুর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বহুকাল আগেই। বিচিত্র পেশোয়াজের স্বচ্ছ আবরণের তলায় নগ্নপ্রায় দেহবল্লী নেশা জাগাত চোখে, হাজার ডালওয়ালা ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ছুরির আগার মতো ঘন তরল চোখ ঝক্ ঝক্ করে

উঠত, ঈর্ষার রেখাঙ্কিত, সুরায় বিহ্বল। পুরুষের শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটত রক্ত, ঝাড়-লণ্ঠনের আলো আগুন হয়ে গলে পড়ত। বাঘের মতো মানুষগুলো যেন আদিম আর আরণ্য কামনায় উদ্দাম হয়ে উঠত, সুরাপাত্রের আচম্‌কা আঘাত লেগে ঝন্ ঝন্ করে নিভে যেত ঝাড়-লণ্ঠন। তারপর কালো অন্ধকার।

তারপরেই কালো অন্ধকার। সুরাপাত্রের শেষ আঘাত ঝাড়-লণ্ঠনে কবে এসে লেগেছিল কেউ জানে না। কিন্তু সেই থেকে আর আলো জ্বলে না রংমহলে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ্মীরী কার্পেট একপাশে রাশি রাশি ধুলোর মধ্যে জড়ো হয়ে রয়েছে, কতগুলো তারছেঁড়া যন্ত্র বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে এক কোণে। দেওয়ালের গায়ে যে সব ছবি লালসার ইন্ধন দিত, তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, আর তাদের ওপর কঠিন তুলির আঁচড় কাটছে ফাটা ছাদ চুইয়ে নামা বর্ষার জল।

রংমহলে রং নেই, তবু কুমার বিশ্বনাথ এখনো এর মায়া কাটাতে পারেননি। ভাঙা দেউড়ী মুমূর্ষুর মতো ঝুঁকে রয়েছে, সাত মহলা বাড়িতে সাপের রাজত্ব। কিন্তু আজো এই রংমহলেই কুমার বিশ্বনাথের আসর বসে। হুইস্কির পয়সা না জুটলে ধেনো মদ আসে, সরযূ বাঈজীরা দুর্লভ হলেও ওঁরাও মেয়েরা অপ্রাপ্য নয় এখনো। অবশ্য ওঁরাও মেয়েরা রূপবতী নয়, কিন্তু তাদের যৌবন আছে। হিংস্র, তীক্ষ্ণ যৌবন। আর, আর অন্ধকারে সেই যৌবনটাই সত্য হয়ে ওঠে, রূপের প্রশ্ন তখন অবান্তর।

এই রংমহলে যখন কুমার বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙল, তখন বেলা অনেকখানি উঠে এসেছে। জানলার ভাঙা শার্সীর ভেতর দিয়ে অনেকখানি ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চোখে-মুখে। রোদের আলোয় চোখ জ্বালা করছে। অসীম বিরক্তি নিয়ে পাশ ফিরলেন বিশ্বনাথ।

সমস্ত দেহে জড়তা। স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল হয়ে আছে, ইচ্ছার দাসত্ব তারা মানতে চায় না। শেষ রাত পর্যন্ত উন্মত্ত জাগরণ এখনো প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। অলস কণ্ঠে ডাকলেন, মতিয়া ?

গড়গড়া নিয়ে মতিয়া ঘরে এল। সকাল থেকে সে তিনবার তামাক সেজেছে এবং তিনবারই সে-তামাক নিজেই টেনে শেষ করেছে। এর জন্য তাকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঘুম ভাঙবার সঙ্গেই প্রভুকে তামাক দিয়ে আসতে হবে এবং এমন দৈবজ্ঞও সে নয় যে, ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে প্রভু তাঁর সুখনিদ্রা থেকে জেগে উঠবেন সেটা আন্দাজ করে নিতে পারে।

গড়গড়ায় টান দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন, মেলায় লোকজন আসছে রে ?

—আসছে হুজুর। এবার বোধ হয় জাঁকিয়ে বসবে। সোনাদীঘির পাড়ে অনেকগুলো গাড়ি তো জড়ো হচ্ছে সকাল থেকেই।

—জাঁকিয়ে বসবে! তিন বছর থেকে তো ফাঁকাই যাচ্ছে এক রকম।

—সব ওই রূপাপুরের কামারদের জন্যে হুজুর। বড্ড হাঙ্গামা করে ওরা। ওদের ভয়েই মেলায় মানুষ আসতে চায় না। সেবার আট-দশটা দোকান লুট করে নিলে। পুলিসকে পরোয়া করে না, জেল-ফেরত দাগী সব।

—রূপাপুরের কামারেরা!—বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ ঝকমক করে উঠল। দেবীকোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠল শরীরে।

—ওরা কিন্তু দিব্যি তাজা আছে এখনো। ঝিমিয়ে মরে যায়নি। ওদের পোষ মানাতে পারলে মস্ত একটা কাজ হয়, না রে মতিয়া?

মতিয়া চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

—না হুজুর, বুনো বাঘের জাত ওরা। পোষ মানে না।

—পোষ মানে না?—বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন: কিন্তু কুমারদহের রায়-বর্মারা তো চিরকাল বুনো বাঘকেই পোষ মানিয়ে এসেছে। আমার ঠাকুর্দা কুকুর পুষতেন না, শিকলে বাঘ বেঁধে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। এবার কি মেলায় আসবে ওরা?

—কে জানে হুজুর। ওদের মতলবের ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু।

বিশ্বনাথ সামনের দেওয়ালটার দিকে তাকালেন। ছাতের পাশে পাশে যেখানে রঙ-বেরঙের নক্সার বাহার ছিল একদিন, আজ সেখানে সবুজ শ্যাওলা জমে উঠেছে। এত বড় বাড়িটার সমস্ত ভিত্তিমূলই জীর্ণ হয়ে গেছে, আঙুলের চাপ লাগলে ঝুরঝুর করে নেমে আসে চুন-সুরকি, এক-একটা কার্নিশ থেকে ইঁট খসে পড়ে। আর বেশিদিন এর পরমায়ু নয়। সমস্ত জমিদারীর দশাই তো এই রকম। লাঠিয়াল যারা ছিল, তারা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থি আর প্লীহাসার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই রংমহলের নড়বড়ে বড় বড় থামগুলোর মতোই। অস্বস্তিকর একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিশ্বনাথের মন, গড়গড়ার নীল ধোঁয়াটা বঙ্কিম রেখায় ঘরময় খেলা করতে লাগল। এক জায়গায় টিকটিক করে উঠল টিকটিকি। বাইরে কোথায় এই সাতসকালেই সাপে ব্যাঙ ধরেছে, একটা কাতর গোঙানি থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে।

ম্যানেজার ব্যোমকেশ লঘু চরণে এসে দেখা দিলে। কাপ্তান চেহারার লোক, পাকা-চুলে লম্বা সিঁথি কাটা। চেহারার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু যেন কিসের একটা আচমকা ঘা লেগে নাকের অনেকখানি মুখের ভেতর সেঁধিয়ে বসেছে। তাই তার কথাবার্তায় চন্দ্র-বিন্দুর প্রকোপ একটু বেশি।

ব্যোমকেশ বললে, লালাজী চিঠি পাঠিয়েছেন।

মুখ থেকে গড়গড়ার নল সরিয়ে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখেছেন?

—টাকা দেবেন। তবে—

—থামলে কেন ?

—একটা শর্ত আছে। অনেক টাকা তো বাকি পড়ে গেছে, সুদে আসলে কিছুই দেওয়া হয়নি। তাই বলেছেন সোনাদীঘির মেলাটা পাঁচ বছরের জন্যে ওঁকে লিখে দিলে তবেই টাকা দিতে পারেন, নইলে নয়।

—সোনাদীঘির মেলা !

বিশ্বনাথ চমকে উঠলেন এক মুহূর্তের জন্যে। দু বছর থেকে দেশে দেখা দিয়েছে অজন্মা। বছরে একটি মাত্র ফসল হয় ওই অঞ্চলে, পর পর দু বছর ধরে সেই ফসলের অর্ধেকও ঘরে তুলতে পারেনি লোকে। বৃষ্টি হয় না। জলকর কিছু কিছু আছে। কিন্তু মহানন্দায় এবার তেমন করে বান ডাকেনি বলে তার অবস্থাও খারাপ। যে কৃষ্ণ-কালীর বিল পাঁচ হাজার টাকার ডাকে উঠত, সে বিলের দর এবার দেড় হাজার টাকার বেশি ওঠেনি।

ব্যোমকেশ চিন্তিত মুখে বললে, সোনাদীঘির মেলা গেলে সবই গেল। সারা বছর ধরে ওরই ওপরে যা কিছু ভরসা। লালাজী তো সবই জানেন। অবস্থা দাঁড়িয়েছে কী বুঝতে পারছেন। সাপের মতো পাক কষছেন লালাজী, তারপর সবশুদ্ধ এক গ্রাসে সাবাড় করে দেবার মতলব।

বিশ্বনাথ বললেন, হুঁ !—ঘরের সমস্তটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে পাষাণের মতো। রংমহলের ফাটল ধরা রন্ধ্রপথে অশ্বত্থের বীজ কবে পড়েছিল কে জানে, দেওয়াল বেয়ে জালের মতো শিকড় নামছে অসংখ্য। বাইরে সাপের মুখে ব্যাঙটা তখনো কাঁদছে অন্তিম আক্ষেপে। লালাজী সত্যি সত্যিই সাপের প্যাঁচ কষিয়ে চলেছেন।

তীব্র—একটা অতি তীব্র শারীরিক আর মানসিক অস্বস্তি বিশ্বনাথকে যেন পীড়ন করতে লাগল।

—মতিয়া !

—হুজুর—মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—দ্যাখ্ তো সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথায়। মেরে আসবি সাপটাকে।

একটা লাঠি নিয়ে মতিয়া বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ বললে, অথচ টাকা যে করেই হোক দরকার। ডিক্রী তিনদিন পরেই বেরিয়ে যাবে, আজকালের মধ্যে সহরে টাকা না পাঠালে লাটে উঠে যাবে সমস্ত। লালাজী লিখেছেন অনুমতি পেলে তিনিই হুজুরের কাছে এসে দেখা করবেন।

ব্যোমকেশের শেষের কথাটায় শ্লেষের সুর বাজল। আশ্চর্য বিনয় লালা হরিশরণের। তাঁর পূর্বপুরুষ কুমারদহের অন্নেই মানুষ, একথা লালাজী কখনো ভুলে যান না। বিশ্বনাথকে দেখলে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন, ভক্তিতে তাঁর সর্বাঙ্গ তরল হয়ে ওঠে। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি যত বাড়ছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে লালাজীর বিনয়,

দেবীকোট রাজবংশের প্রতি তাঁর অতুলনীয় রাজভক্তি। অথচ এই ভক্তির অন্তরালে নিঃশব্দে একখানা ছুরি যে দিনের পর দিন শানিয়ে উঠছে, ব্যোমকেশের বিষয়ী মন তা অবচেতন ভাবেই অনুভব করতে পারে। করজোড়ে যখন হুজুরের সামনে লালাজী তাঁর বক্তব্য সবিনয়ে নিবেদন করেন, তখন তাঁর দু চোখে মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে ওঠা আগুনের আলো ব্যোমকেশের দৃষ্টি এড়ায় না।

বিশ্বনাথ এ কথা বোঝেন কিনা কে জানে, কিন্তু বুঝতে রাজী নন তিনি। লালা হরিশরণের ঐশ্বর্য যত অভ্রভেদীই হয়ে উঠুক না কেন, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ঘোড়াকে চাল শেখাত রামসুন্দর লালা, সেদিনকার সেই সামাজিক মর্যাদায় এতটুকুও তারতম্য ঘটেনি এ পর্যন্ত। বানরকে রাজার পোশাক পরালেই সে রাজা হয় না। অথচ রাজা প্রতাপসিংহের ক্ষত্রিয়রক্ত এখনো দেবীকোট রাজবংশের শিরাপথে বয়ে চলেছে, রাজ্য না থাকলেও তারা চিরদিনই রাজা।

ব্যোমকেশ বললে, লালাজীকে আসবার জন্যে খবর দেব কি?

কী ভেবে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, না, আমিই যাব। ঘোড়া ঠিক করতে বলুন।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে বললে, আপনি কোথায় যাবেন?

—নবীপুর।

ব্যোমকেশ কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। কুমার বিশ্বনাথ নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছেন লালা হরিশরণের সঙ্গে দেখা করতে! আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় এবং একমাত্র সঞ্চয়—শেষে সেও এই ভাবে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল বণিকের!

ব্যোমকেশ ইতস্তত করে বললে, যদি যেতেই হয় আপনি আর কষ্ট করবেন কেন? আমরাই তো আছি, আর খবর দিলে লালাজী নিজেই—

—না—কথাটাকে সংক্ষেপে শেষ করে দিয়েই বিশ্বনাথ বললেন, ঘোড়া ঠিক করতে বলুন। কালো ঘোড়াটা, যেটা দুনে চলে।

ব্যোমকেশ সনিঃশ্বাসে বললে, আজ্ঞে ঠিক করছি।

তিন

রূপাপুরের কামারেরা একসঙ্গে হাতুড়ি ঠুকে চলেছিল। ঠন্ ঠন্ ঠনাঠন্।

গনগনে আগুনে টকটকে রাঙা ইস্পাতগুলো লোহার আঘাতে মুহূর্তে রূপান্তর নিচ্ছে। গড়ে উঠছে দা, বঁটি, কাস্তে, কোদাল। যাদের হাত ভালো, তারা ছুরি কাঁচি তৈরি করে। সেগুলি বিক্রি হয় বাজারে। তা ছাড়া আরও অনেক কিছুই তারা তৈরি করে, কিন্তু

সেগুলো সূর্যের আলোয় মুখ দেখায় না। সিঁদকাঠি, কার্সা, দু-হাত লম্বা হাঁসুয়া। তাদের কাজ রাত্রির কালো অন্ধকারে।

রূপাপুরের কামারেরা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর জীব। বাংলা দেশের বাসিন্দা বটে, কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি নয়। কথাবার্তায় এবং আচার-ব্যবহারে স্পষ্ট বিহারের ছাপ। অথবা আরো দূরান্তের। আদিতে ছিল যাযাবর, নানা দিগ্‌দেশ ঘুরে শিকড় গেড়েছে বাংলার মাটিতে। পশ্চিমে ওদের চেহারা থেকে হয়তো পণ্ডিতেরা অনার্য রক্তের সন্ধান খুঁজে বার করতে পারেন। ওরা যেন সেই সব মন্ত্রহীন ব্রাত্যের দল—যাদের তলোয়ারের মুখে আর্য-সংস্কৃতির যাত্রারথ বার বার থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। তারপর কালক্রমে ভারতবর্ষের মহা-মানবের মহাসাগর ওদের গ্রাস করে নিয়েছে। এখন বিশাল হিন্দুসমাজের একটা খণ্ডাংশ ওরা। তবু ওদের জীবনযাত্রায় অনার্য-সংস্কার আজ অবধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পেশল সুস্থ শরীরে আসুরিক বলশালিতা।

ঠক্-ঠক্-ঠনাঠ্ঠন্। একসঙ্গে কুড়িটা হাতুড়ির ঐকতান বাজছে। হাজার হাজার ফাটা ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা মৃত্যু-নিঃশ্বাসের মতো শব্দ করছে হাপরগুলো। উনুনে ধাঁ ধাঁ করে জ্বলছে কাঠকয়লার আগুন, ওদের আয়নার মতো উজ্জ্বল চোখগুলো থেকে আগুনের দীপ্তি পিছলে পড়ছে। কব্জী থেকে কাঁধ পর্যন্ত পেশীগুলোয় দোলা লাগছে—যেন দুলে দুলে ফুলে উঠছে শক্তির তরঙ্গ।

সোনাদীঘির মেলা লাগবে কাল থেকে। এ তল্লাটে এত বড় মেলা আর নেই। এক মাস ধরে মেলার কেনাবেচা চলে, তেসরা ভাদ্র থেকে তেসরা আশ্বিন পর্যন্ত। নবাবী আমলে কোন্ এক ফকির এসে দরগা বানিয়ে বসেছিলেন, দীঘি কাটিয়েছিলেন। আজও সেই সোনা ফকিরের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এই সোনাদীঘির মেলায়। একটা মাস তাঁর ভাঙা দরগায় সিন্নী পড়ে, সহস্রচূর্ণ সমাধির ওপর মিট মিট করে চেরাগ জ্বলে। সিদ্ধপুরুষ ছিলেন সোনা ফকির। তাঁর মন্ত্রবলে গাছপালা মাটি থেকে উঠে উধাও হয়ে যেত, আর সেই গাছে বসে তিনি দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। তাঁর আদেশ পেলে পশু-পাখী মানুষের ভাষায় কথা কইতে পারত, তাঁর অনুগ্রহে প্রতিবছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে দরগার দীঘির জল দুধ হয়ে যেত। আর সেই দুধ একবার পান করলে যা কিছু জটিল রোগ নিঃশেষে ভালো হয়ে যেত, সারাজীবন আধিব্যাধির বিড়ম্বনা বহন করতে হত না আর।

তাঁরি স্মৃতি উপলক্ষে সোনাদীঘির পাড়ে মহাসমারোহে মেলা বসে এখনো। দরগার দীঘির জল এখন আর অবশ্য দুধ হয় না, অবিশ্বাসী যুগের আওতায় তার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু শিথিল হয়নি লোকের বিশ্বাস। নানা দূর দেশ থেকে জটিল ব্যাধিগ্রস্ত অসংখ্য লোক এখনো চৈত্রসংক্রান্তির দিনে সোনাদীঘির জল খেতে আসে, ঘড়ায় করে

নিয়ে যায়। আর সেই উপলক্ষে প্রায় ছু মাইল জায়গা জুড়ে মেলা বসে। সহর থেকে দোকানদার আসে, যাত্রা আসে, গণিকা আসে, বদমায়েশদের দল আসে। গিলটির গয়না থেকে গোরু ঘোড়া অবধি বিক্রির জন্য আসে। পঁচিশ বছর আগে হাতী পর্যন্ত আসত, মেলার একটা অংশ হাতীহাটা নামে পরিচিত এখনও।

রূপাপুরের কামারদেব হাতুড়ি বেজে চলেছে একটানা দ্রুতছন্দে। আর সময় নেই। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই কাজ শেষ করে ওরা বেরিয়ে পডবে মেলার উদ্দেশে। সেখানে এক-মাস ধরে কাজ চলবে নিববচ্ছিন্ন ভাবে। তিরিশখানা চালা নিযে দোকান খুলে বসবে ওরা, বিক্রি করবে লোহার যন্ত্রপাতি, কাঁসার ফুটো বলসী আর ভাঙা বাটি ঝালাই করে দেবে। হালের বলদ আর এক্কাব ঘোড়ার পায়ে লোহার নাল পরিয়ে দেবে, গোরুর গাড়ির চাকা বাঁধিয়ে দেবে পাতলা ইস্পাতের পাত দিয়ে। আব একটা মাস ধরে পবিতৃপ্ত করবে বৈচিত্র্য-হীন বৎসরেব তৃষ্ণার্ত সম্ভোগের স্পৃহা। যাত্রা আসবে, খেমটা আসবে, পানের দোকান আসবে, জুয়া আসবে, আর মদের দোকানের ছুপাশে বসবে "খোপর পট্টি"—সুলভপ্রাপ্য নারী-মাংসের সদাব্রত।

আশের পাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে তিনদিন যাবৎ লোকযাত্রা শুরু হয়েছে মেলার অভিমুখে। আধিব্যাধির শান্তিকামী তীর্থযাত্রীর দল চলেছে আর ওদের পেছনে অনুসরণ করে চলেছে একদল লোক—তাদের দৃষ্টি গলাব হার আর বানের মাকডির দিকে স্থির-নিবদ্ধ। কত রকমের লোকই যে চলেছে তাব সীমা নেই। গোরুর-গাড়ির সামনে কালো শাড়ির পর্দা ঝুলিয়ে চলেছে মুসলমান পুরমহিলা, পর্দার ফাঁকে ফাঁকে বোরখা ঢাকা এক-একটা ভৌতিক মূর্তির মতো চোখে পডছে। খঞ্জনী বাজিয়ে চলেছে একদল বৈষ্ণব, তাদের পেছনে চলেছে পাঁচজন বৈষ্ণবী, কপালে রসকলি, চোখের দৃষ্টি তির্যক আর চটুল। কানে সোনার আংটি, সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো, বাসন্তী রঙের কাপড আর পাগড়ী পরা এক-দল হিন্দুস্থানী ধাঙড চলেছে, অহেতুক উল্লাসে ডুম ডুম করে ঢোল বাজাচ্ছে, থেকে থেকে চিৎকার করে করে উঠছে এক-একটা অশ্লীলতম গানের কলি, রঙীন শাড়িপরা বলিষ্ঠগঠনা সঙ্গিনীদের তাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই, সমান উৎসাহেই তারা সে রসিকতায় যোগ দিচ্ছে, উচ্ছল হাসিতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা ঘোড়ার পিঠে দোকান নিয়ে চলেছে, শীর্ণ আর খর্বকায় টাট্টুগুলো বোঝার ভারে ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে। মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে অর্ধাবৃত সাঁওতাল আর রাজবংশী মেয়েদের দল, সাঁওতাল মেয়েরা টুকরো কাপড় দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে শিশুকে, রোদের ঝকঝকে আলোয় তাদের গলার হাঁসুলী আর পায়ের রূপোর খাড়ু ঝিকমিক করছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে চলেছে সাধারণ গ্রামের লোক, কাঁচা চামড়ার জুতোজোড়া হাতে তুলে নিয়ে কেউ বা হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একটা পুরনো সাইকেল চালিয়ে কোথা থেকে-

হাফপ্যান্ট, আর টুইলের শার্ট পরা জুট অফিসের একজন কেরানী এসে দর্শন দিলে; সাঁওতাল মেয়েদের দিকে দেখলে একবার লোলুপ দৃষ্টিতে, ধাঙড় মেয়েদের সঙ্গে একটু রসিকতা জমাবার চেষ্টা করলে, তারপর সাইকেল চালিয়ে বৈষ্ণবীদের দলটাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোরুর গাড়ির মিছিল চলছে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে। ব্যবসায়ীদের গাড়ি, জোতদারের গাড়ি, মালটানা গাড়ি। জাতিগোত্রহীন গোটাকয়েক কুকুরও এই বিরাট জনতার সহযাত্রী হয়েছে, এতগুলো লোক একসঙ্গে দেখে কাছাকাছি কোথাও একটা উৎসব ব্যাপার বোধ করি অনুমান করে নিয়েছে তারা।

রূপাপুরের তলা দিয়ে ছোট রাস্তাটা ধুলোয় অন্ধকার। হাতুড়ি ঠুকতে ঠুকতে কামারেরা আড়চোখে লক্ষ্য করে জনতা। মেলায় খুব লোক হবে এবার। কয়েক বছর আগে বড় গোছের একটা দাঙ্গা হয়ে যাওয়ায় কিছুদিন মেলায় লোক আমদানি কমে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে সে ভাঙন আবার জুড়ে উঠেছে। জাঁকিয়ে মেলা বসবে।

হাতুড়িটা রেখে রামনাথ এতক্ষণে সোজা হয়ে উঠে বসল। বয়স অনেক হয়েছে রামনাথের। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা মানুষটা। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের জন্যে মেরুদণ্ডের কাঠামোটা একটুখানি বেঁকে নেমেছে আজকাল। হাত-পায়ের হাড়গুলো অস্বাভাবিক মোটা, হাতের কব্জী দুটোকে মুঠো করে ধরা যায় না। কালো কপালের ওপর টলটলে ঘামের বিন্দুকে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলে রামনাথ বললে, এবার মেলায় কী রকম লোক আসছে, দেখেছিস?

জ্বলন্ত একখানা দা-কে বাঁটের মধ্যে ঠুকতে ঠুকতে তরুণ স্বরয জবাব দিলে, হাঁ, দাঙ্গার পর এত লোক আর মেলায় আসেনি।

—সব তোদের জন্যে। মারামারির নামে তো আর মাথা ঠিক থাকে না। কথা নেই, বার্তা নেই, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লি, কাপড়-পট্টিতে আগুন লাগিয়ে দিলি।

—নাঃ, লাগাব না?—স্বরয ঝলকে উঠল: পাড়ার সামনে এসে গোরু কাটবে, আর চুপচাপ বসে থাকব?

—তাই বলে তোরা তার বিহিত করতে যাবি না কি? জমিদারের মেলা, তার কাজ সে বুঝবে, তোরা খামাকো যা খুশি তাই গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবি, না?

স্বরয বললে, রেখে দাও তোমার জমিদার। ও শালারা মানুষ না কি। চর্বির ঢিবি সব, পেস্তা বাদাম খায়, বোতল টানে, আর হাতীর বাচ্ছার মতো ফোলে। জমিদারের ভরসায় বসে থাকলে প্রজার মান-ইজ্জৎ থাকে না।

—কথা খুব শিখেছিস দেখছি। রূপাপুরের কামারেরা এবার যে অধঃপাতে যাবে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমি।

স্বরয অকৃত্রিম প্রসন্নতায় হেসে উঠল হো হো করে। রামনাথকে চটাতে ভারী ভালো

লাগে তার। অত বয়স হয়েছে, এমন প্রকাণ্ড জোয়ান, সমস্ত রূপাপুর গ্রামের সে মাথা। যৌবনে সে লাঠির ঘায়ে বুনো জানোয়ার শিকার করেছে, একা ডাকাতি করে এসেছে তালুকদার-বাড়িতে হানা দিয়ে। দশ বছর আগেও সুলতানগঞ্জের মরা নদীতে বানের জলে কুমীর আসত, সেই কুমীর রামনাথের পা আঁকড়ে ধরায় রামনাথ টেনে সেটাকে পাড়ে এনে ফেলেছিল, আর সরকার থেকে পেয়েছিলো একশো টাকা পুরস্কার। সেই রামনাথ ভয় করে জমিদারকে, ভয় করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারামারিকে। এমন শক্তিমান পুরুষের এই রকম মানসিক দুর্বলতা অত্যন্ত তাজ্জব বলে মনে হয় সুরযের কাছে।

সুরযের হাসিতে রামনাথ চটে উঠল : কী যে বোকার মত হাসিস ফ্যাক ফ্যাক করে, ভালো লাগে না। এবার মেলায় গিয়ে কেউ যদি এতটুকু বদমায়েশী করবি, তা হলে ভালো হবে না এই বলে রাখলাম। বলে দিস সবগুলোকে।

সুরয বললে, আমি বলে দিলে কি শুনবে ওরা ? সেবার জুয়োর আড্ডাতে ওরা যখন টিকিধারীর মাথা ফাটিয়ে এল, তখন আমি বার বার নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কথা শুনবে না—আমি আর কী করব বলো।

রামনাথ বললে, আর ভালো মানুষ সাজতে হবে না। তোমাকে আর আমি চিনি না যেন। মায়ের পেট থেকে এই তো সেদিন পড়লি, এর মধ্যেই দেখছি খুব চালাক হয়ে উঠেছিস। সব নষ্টামীর গোড়াতেই তুই—কামারপাড়ার হতভাগাগুলো তোর কথাতেই নেচে বেড়ায় সে আমি জানি।

সুরয জিভ কেটে বললে, রাম রাম। সত্যি তাউই, আমার ওপর এ তোমার অন্যায় রাগ। আমি তোমার নতুন বউয়ের দিব্যি দিয়ে বলছি—

রামনাথ সামনে থেকে একটা বড় হাতুড়ি উঠিয়ে নিলে।

—চুপ কর্ ফক্কড় কোথাকার। দেখছিস তো ! মাথা গুঁড়িয়ে দেব একদম।

সুরযের হাসিটা এবার সমস্ত কামারশালায় সংক্রামিত হয়ে গেল। হাতুড়ি পিটতে পিটতে এতক্ষণ যারা কথার গতি লক্ষ্য করছিল, তারা এইবার একসঙ্গে হাসতে শুরু করে দিলে উচ্ছ্বসিত ভাবে। কর্কশ হাসির প্রচণ্ড তরঙ্গে লোহার কঠিন শব্দ তলিয়ে গেল।

রামনাথ হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে নিরাশ কণ্ঠে বললে, নাঃ, তোদের দিয়ে কিছু হবে না। তোদের জ্বালাতেই বউকে নিয়ে আমায় দেশ ছাড়তে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা হাসির জোয়ার তরঙ্গিত হয়ে উঠল। ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করেছে সুরয। নতুন বউয়ের কথা উঠলেই তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হয়ে যায় রামনাথের। আর তার সমস্ত দুর্বলতার মূল এইখানেই প্রচ্ছন্ন।

আর একটু গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলে নেওয়া ভালো।

জেলার এই অঞ্চলটা ক্রিমিন্যাল বা অপরাধমূলক এলাকা। রূপাপুরের কামারেরা আবার

সেই সব ক্রিমিন্যালদের অগ্রবর্তী। বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলেই থানায় দাগী বলে উল্লিখিত। আশেপাশে খুন জখম চুরি ডাকাতি কিছু একটা ঘটলেই এই সব চিহ্নিত অপরাধীদের নিয়ে টানাটানি পড়ে, বাড়ি খানাতল্লাস হয়, হাজত থেকে দু-চারদিনের জন্য মুখ বদলে আসতে হয় কাউকে কাউকে। কিন্তু রূপাপুরের কামারেরা আজকাল আর সত্যিই তেমন ক্রিমিন্যাল নয়, রক্তের নামে আজকাল আর ওদের মাথার রক্ত চন চন্ করে ওঠে না। সে সব বরং ঘটত দশ পনের কুড়ি বছর আগে। রূপাপুরের কামারেরা তখনো যাযাবর, মাটির মায়া ছিল না, ঘর বাঁধবার তাগিদ ছিল না। চলতে চলতে গ্রামের হাটখোলার পাশে ছাউনি পাতত, দু-একদিন লোহা পিটত, তারপর তৃতীয় রাত্রিতে কারো বাড়িতে চড়াও হয়ে যথাসর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে অন্ধকার দিগন্তে উধাও হয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে সেই পথ চলার ওপর ঘনিয়ে এল শ্রান্তির অতি গভীর অবসাদ। মাটির বুক চিরে যে ঘনশ্যামল চিকন ফসল প্রাণের জোয়ারে জেগে ওঠে, শীতান্তে রবিশস্যের মাঠে যে রঙের আগুন চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়, আর বাঁশবনের ছায়ায় আমের বনের ঘনান্ধকারে জোনাকির আলোয় যে গ্রাম তন্দ্রাতুর হয়ে ঘুমিয়ে থাকে, তারই অদৃশ্য শৃঙ্খল এসে পাকে পাকে জড়াতে লাগল ওদের। রূপকথার বাংলা, কবিগানের বাংলা, আত্মতৃপ্তিতে অলস বাংলা। সেই বাংলা তার ঘুমভরা আঁচল জড়িয়ে ওদের বুকের তলায় টেনে নিলে, তার উচ্ছলিত স্তনক্ষীরে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে রইল রূপাপুরের কামারেরা।

তবু মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠেছে ওরা। যেন ঘুমন্ত বেদুয়িন শুনতে পেয়েছে কোনো দুরন্ত মরুঝড়ের ডাক। ফুলে উঠেছে হাতের মাংসপেশী, বুকের মধ্যে শুনতে পেয়েছে নিদ্রিত অজগরের চকিত জাগরণের গজরানি, আদিম রক্তের কলধ্বনি। খুশিমতো ডাকাতি করেছে, দাঙ্গা করেছে, নিজেদের মাথা ফাটিয়েছে, শত্রুর কাঁধে ফারসা বসিয়েছে, ছাঁচ তৈরি করে স্বদেশী সীসের টাকার পাল্লা চালিয়েছে সরকারী রূপোর টাকার সঙ্গে। রামনাথ সেই যুগের প্রতীক।

তার প্রথম বউ মরেছে আজ কুড়ি বছর আগে। কী হয়ে মরেছে কেউ জানে না। শুধু একদিন সকালে উঠে তাকে আর কেউ দেখতে পায়নি। গভীর রাত্রে রামনাথের ঘরে কেউ কেউ নাকি একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু কারো মনে কিছু-মাত্র কৌতূহলের উদ্রেক হয়নি তাতে। অমন কত হয়!

তারপর থেকে রামনাথের বউকে আর কেউ দেখেনি। জিজ্ঞাসা করবার এতটুকু প্রয়োজনও বোধ করে নি কেউ। জীবনের মূল্য তখনো অত স্পষ্ট আর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে-নি ওদের কাছে। সমুখের মাঠে তখনো সবুজের শীষ তোলেনি প্রথম ফসল।

কাল থেকে কালান্তর। কত নদ-নদীতে চড়া পড়ে, মরা দীঘির শুকিয়ে আসা ফাটল-ধরা মাটিতে নামে লাঙলের আঁচড়। সেই চড়া জেগেছে রামনাথের রক্তে, সেই লাঙলের

আঁচড় পড়েছে বুকের ভেতর। রোদে পোড়া পোড়ো-জমিতে ফসলের স্বপ্ন-কামনা।

কুড়ি বছর পরে রামনাথ বিয়ে করেছে আবার! নতুন বউ, নাম তার কামিনী। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, গায়ের উজ্জ্বল কালো রঙ যেন বার্নিশ লাগানো বলে ভ্রম হয়। পাশের গ্রামের মেয়ে, ছেলেবেলা থেকেই রামনাথ তাকে দেখে এসেছে, কখনো চোখে পড়েনি। কিন্তু হঠাৎ এক-একটা আশ্চর্য দিন আসে, সব ওলট-পালট করে দেয়। রামনাথের জীবনেও তাই হল। প্রথম বর্ষার জল নেমেছে তখন, লাঙল-দেওয়া লালমাটি ধারাবর্ষণে মাখনের মতো কোমল আর নরম হয়ে গেছে, আর সেই মাটিতে বীজ রুইতে এসেছে গ্রামের মেয়েরা। পথ চলতে রামনাথের সেই সময় আচমকা চোখে পড়েছিল কামিনীকে। ঝুঁকে পড়ে মাটিতে কাজ করবার সময় আঁচল সরে গিয়ে পূর্ণায়ত স্তনশ্রী আত্মপ্রকাশ করেছে, কালো মুখে মাটি শুকিয়ে রয়েছে গোরোচনার তিলক চিহ্নের মতো। সেদিকে তাকিয়ে প্রায় ভুলে যাওয়া কী একটা অনুভূতিতে রামনাথের বক্ষোপিণ্ড দুটো দোলা খেয়ে উঠেছিল কয়েকবার। মনে পড়েছিল ঘরটা অত্যন্ত নির্জন—শীতের রাত্রে চাটাইয়ের বিছানাটা অতিরিক্ত আর অস্বাভাবিক শীতল।

বিয়ের পর কামিনী সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি আমাকেও খুন করে ফেলবে?

বিস্মিত হয়ে রামনাথ বলেছিল, খুন করতে যাব কেন তোকে?

—লোকে তো তাই বলে। আমার সতীনকে নাকি তুমি গলা টিপে মেরে ফেলেছ, তাই—

—পাগল!—রামনাথ ঘন করে কামিনীকে টেনে এনেছিল বুকের মধ্যে: তার 'হায়জা' হয়েছিল।

—তা হোক।—রামনাথের বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে কামিনী জবাব দিয়েছিল, আমার ভয়ানক ভয় করে।

গভীর স্নেহভরে কামিনীর জটাবাঁধা চুলগুলোর ভেতর হাত বুলিয়ে দিয়েছিল রামনাথ। বলেছিল, তোকে আমি এত ভালোবাসি, তোর ভয় কিসের?

মিথ্যে বলেনি রামনাথ। নতুন বউকে সত্যিই সে ভালোবাসে, পাগলের মতো ভালোবাসে। এই ভালোবাসাই আজ সব দিক থেকে তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তাই দাঙ্গার নামে সে ভয় পায়, তাই যে কোনো উচ্ছৃঙ্খলতার কল্পনাতেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে তার চেতনা; প্রেমের কাছে পশু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

সুরয আবার বলে, মেলায় তো যাবে তাউই, কিন্তু সাবধানে থেকো। ভিড়ের মধ্যে তোমার বউ আবার হারিয়ে না যায়।

'তিরিশটা হাপরের পেছন থেকে তিরিশ রকম হাসির কর্কশধ্বনি আবার বেজে উঠল

একসঙ্গে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল দূরে মাঠের ওপরে একটা কালো ঘোড়া নক্ষত্রবেগে উড়ে আসছে। কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া।

চার

আলকাপের আসর যখন ভাঙল, রাত তখন বারোটার কাছাকাছি হবে। বারোয়ারীতলায় একখানা চালাঘরেই ওদের থাকবার জায়গা। ঘরখানার তিনদিক খোলা, পেছনে এক মাটির নোনাধরা দেওয়াল। হাটের দিনে এখানে মরিচের দোকান বসে, অন্য সময় রাতচরা গোরুমহিষ কখনো বা গাড়ির বলদ স্বেচ্ছাসুখে রোমন্থন করে রাত কাটায়। রাশি রাশি শুকনো গোবর ও গুব্‌রে পোকার ওপর চাটাই আর চট বিছিয়ে আলকাপের দলের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় ওরা আপত্তি করে না। বাংলাদেশের নিতান্ত অজ পাড়াগাঁগুলিতে এর চাইতে ভাল অভ্যর্থনা আশা করাই অসঙ্গত।

হাটের চৌহদ্দি পেরিয়ে চারদিকে চালু মাঠ। শ্রাবণের ভরা বর্ষাতে মাঠগুলো প্রায় সবই তলিয়ে গেছে। আকাশ-ভরা তারা ঝকমক করছে কালো জলের ওপর, হঠাৎ দেখলে মনে হয় সামনে যেন দুলে দুলে উঠছে সমুদ্র আর দূরে তালের বনের নিচে ঘুমন্ত গ্রামগুলো এক-একটা দ্বীপ মাত্র। ছাগলের মতো গলা কাঁপিয়ে সোনা ব্যাং ডাকছে, অন্ধকারে উড়ছে অসংখ্য পোকা, আধডোবা শ্যাওড়া গাছের মাথায় রাশি রাশি আলোর ফুলের মতো জোনাকি জ্বলছে। শুধু একদিকে সরকারী রাস্তা, তার ওপর বর্ষার জল ওঠেনি, বাঁধের তলা দিয়ে হু হু করে ফেনিল আর প্রখর স্রোত নেমে যাচ্ছে। কারা যেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে কোঁচ দিয়ে সেই বাঁধের নিচে মাছ মারবার চেষ্টা করছে, আর টিমটিমে আলো দুলিয়ে তিন-চারখানা গোরুর গাড়ি চলেছে কুমারদহের দিকে—বোধ করি সোনা-দীঘির মেলায়।

গায়ে কাপড়ের খুঁটটা ভালো করে জড়িয়ে ব্রজহরি বললে, উহুহু, বড্ড শীত ধরেছে রে। এক ছিলিম তামাক সাজ্‌ না রে ভুষ্‌ণা।

ভূষণ চটের বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে ছিল। বললে, এখন আর আমি উঠতে পারব না খুড়ো। সারাদিন নাচানাচি করে হাতে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। তা ছাড়া অন্ধকারে কে এখন হুঁকো খুঁজে বেড়াবে। তার চেয়ে একটা বিড়ি ধরাও বরং।

—আচ্ছা দে, বিড়িই দে তবে।

উবু হয়ে বসে ব্রজহরি বিড়ি ধরাল একটা।

—মাইরি, এ কি ল্যাঠায় পড়লুম বল্ দেখি ?

ভুষ্‌ণার শীত করছিল। ছেঁড়া চাদরের ফাঁকে ঠাণ্ডা আটকায় না, মাঠের ভিজে বাতাস

যেন মাঘের হাওয়ার মতো তীব্র আর তীক্ষ্ণ হয়ে এসে হাড়ের ভেতরটা অবধি কাঁপিয়ে তুলছিল। আরো ঘন হয়ে হাঁটুটাকে বুকের কাছ অবধি টেনে নিয়ে ভূষণ বললে, হ্যাঁ, ল্যাঠা বইকি! আচ্ছা সেই গানটা তোমার মনে আছে খুড়ো?—গুন্‌গুন্ করে শুরু করলে ভূষণ:

"শিবো হে, ই কি ল্যাঠাত্ ফেলিলে হামারে হে,
ভাং-ধুতুরা তুমি খিবা
কুচ্‌নীর বাড়ীত্ যিবা,
কেমনে হে পুজিব তুম্‌হারে হে—"

বিরক্ত কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, থাম্ বাপু, ইয়ার্কী এখন ভালো লাগে না। ব্যাপারখানা বুঝছিস তো?

এক কোণে শুয়ে কালীবিলাস কুণ্ডু কাশছিল। কালীবিলাস আলকাপের দলে পনেরো টাকার হার্মোনিয়মটা বাজায়, গৌরবে বলে, অর্গিন। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। যৌবনের প্রথম দিকটায় বাড়ি থেকে পালিয়ে কিছুদিন বরিশালের চারণ মুকুন্দদাসের সাকরেদী করেছিল। সেই সময় ফরিদপুরের নড়িয়াতে 'যে ইংরাজ প্রাণের ভাইদের হত্যা করল পাঞ্জাবে, সে ইংরাজের মধুর রবে ভোলে কোন্ পিচাশে' (পূর্ববঙ্গে পিশাচকে পিচাশ বলা হয়) গানটি গেয়ে তিন মাস জেল দেখে এসেছিল পর্যন্ত। এই জন্য দলে তথা সমাজেও তার কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে দেশের জন্য 'শহীদ' হতে গিয়েও জেল থেকে কালীবিলাস গাঁজা খাওয়া শিখে এল। দীর্ঘ এবং একনিষ্ঠ গঞ্জিকা সেবনের ফলে দু বছর থেকে কাশি দেখা দিয়েছে। আজকাল মাঝে মাঝে রক্ত আসে, কাশির আস্বাদটা মিষ্টি মনে হয়।

সমস্ত মাথাটা ভার, একটু জ্বরও হয়েছে যেন। একটা ছেঁড়া র‍্যাপার বারো মাস ত্রিশ দিনই সঙ্গে থাকে, সেটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গভীর গলায় কালীবিলাস বললে, টাকাই সব নয়। আগে কথা রাখতে হয়।

ব্রজহরি বললে, কিন্তু এক এক রাত কুড়ি টাকা করে। আলকাপ তো আলকাপ, ওর সঙ্গে আর পাঁচ টাকা জুড়ে দিলে হারাধন সাউয়ের যাত্রার দল এসে আপখোবাকী গেয়ে যাবে।

জ্বর হলেই স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মাথার শিরাগুলো দপ দপ করে, রক্তের মধ্যে যে জ্বালা ধরে, সেটা যেন কালীবিলাসের চিন্তাধারাতেও সংক্রামিত হয়। তার সঙ্গে গাঁজার প্রভাব মস্তিষ্কের মধ্যে এখনও ঘনীভূত হয়ে আছে। এই অশ্লেষা আর মঘার একত্র সজ্ঘটন ঘটলেই কালীবিলাস তার আদর্শ মানব মুকুন্দদাসের ওজস্বিতায় অনুপ্রাণিত বোধ করে।

—টাকা! টাকার পেছনে গোলামী করেই না দেশটা উচ্ছন্নে গেল। সেই জন্যেই তো অধিকারী মশায় (কালীবিলাস মাথায় হাত ঠেকাল) বলতেন :

সোনার পিঞ্জরের পক্ষী সুখে নিদ্রা যায়,
শাদা ইন্দুর আইয়া রে তোর ঘরের আঁধার খায়
ওরে হায় হায় হায়—

কালীবিলাসকে সকলে মান্য করে বটে, কিন্তু তার কথাগুলোকে বিশেষ মূল্য দেয় না। বাস্তব জগতে চলাফেরা করবার পক্ষে তাদের বিশেষ কোনো দাম নেই। তারা মুকুন্দদাস নয়, দেশকে স্বাধীন করবার মহতী ব্রতও তারা নেয়নি। সংসারী মানুষ, একান্তভাবে শান্তি-প্রিয় এবং নির্জীব।

সুতরাং ব্রজহরি এমন ভাবে কথাটাকে উড়িয়ে দিলে যেন শুনতেই পায়নি।

—হাবু যে কথা বলছিস্ না?

হাবু মুচি ভূষণ মুচির মামাতো ভাই এবং দলের চিরন্তন হিরো। তা ছাড়া গানের মাস্টার। সুতরাং তার মতামতের একটা আলাদা এবং গুরুভার ওজন আছে। নিজের এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে হাবুও যথেষ্ট সচেতন, সুতরাং সে সহজে মুখ খোলে না বটে, কিন্তু যখন খোলে তখন একেবারে মোক্ষম। আপ্তবাক্যের মতো এক-একটি সারগর্ভ বাণী উচ্চারণ করে বিরাট হিমালয়ের মতো নীরব ও নিশ্চল হয়ে যায়।

হাবু বললে, ব্যাপার যা দেখছি তাতে আর ট্যাঁ-ফোঁ করা দরকার নেই, চাঁটিবাটি তুলে সোজা চম্পট দিলেই সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

—চম্পট? চম্পট কিসের ভয়ে?—উত্তেজিত হয়ে কালীবিলাস কী একটা বলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলে। কিন্তু কথা এল না। উদ্গত একটা কাশির প্রবল উচ্ছ্বাসে সমস্ত চাপা পড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে কালীবিলাস কাশতে শুরু করে দিলে অমানুষিকভাবে। সামনেই নিম গাছে একটা বাদুড় এসেছিল নিম ফলের আশায়, কাশির শব্দে চমকে ঝটপট করে উড়ে গেল। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে কালীবিলাস শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে।

ভূষণাকে গানে পেয়েছিল। গুন্‌গুন্ করে সে তখনো গেয়ে চলেছে : শিবো হে, ভস্মবিভূতি মাখো, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে থাকো—

ক্ষেপে গিয়ে ব্রজহরি হাতের কাছ থেকে ডুগীটা তুলে নিয়ে এল। বাঘাটে গলায় বললে, থামলি, থামলি হারামজাদা? আর একটা টাঁই মেরেছিস কি এই ডুগী তোর মাথায় ফাটিয়ে দেব। আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর ইদিকে—

ভূষণ চিমটি কাটলে : গান ভালো লাগছে না? একখানা নাচ দেখিয়ে দেব? গম্ভীরার একখানা ডোম কালীর নাচ?

ডুগী উদ্যত রেখেই মেঘমন্দ্রে ব্রজহরি বললে, তা হলে তোর বুকে উঠে চাঁড়ালে

কালীর নাচ নাচতে শুরু করে দেব আমি।

ভূষ্‌ণা বললে, থাক থাক। পায়ে গেঁটে বাত নিয়ে অত কষ্ট তোমায় করতে হবে না, ফুলে শেষটায় ঢোল হয়ে যাবে।

—রাখ্, ফক্কুড়ি রাখ্।—হতাশ কণ্ঠে ব্রজহরি বললে, ওরে ব্যাটা ভূষুণ্ডি, একটা বুদ্ধি বাতলে দে না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে—মরুক গে, কিন্তু আমরা উলুখড়েরা যে গেলাম। লালাজীর বায়না না নিলে এ তল্লাটের কাজকর্ম এই ইস্তক সব কাবার। ও দিকে কুমারদ'র বায়না ফিরিয়ে দিতে গেলে—

হাবু সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সুনিশ্চিত অভিমত জানলে, বেশি কিছু হবে না, শুধু মাথাটা কাটিয়ে সোনাদীঘির পাঁকের তলায় পুঁতে দেবে।

ব্রজহরি পাল উত্তেজনায় হঠাৎ রুদ্রকান্ত সিংহ হয়ে গেল। মাথার ঝাঁকড়া বাবরী দুলে উঠল জটার মতো। ডম্বরুর বদলে ভুঁড়ি দুলিয়ে বললে, যায় যাঃ যাঃ! এ হচ্ছে ইংরেজের রাজত্ব। মাথা ফাটিয়ে পাঁ—থু থু ওয়াক!

একটা উড়ন্ত গুবরে পোকা গোবরের গাদা ভ্রমে ব্রজহরির গর্জমান ব্যাদিত মুখের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করছিল। সফুৎকারে সেটাকে ভূষ্‌ণার দিকে নিক্ষেপ করে ব্রজহরি বললে, থু, থু, শা—। ঢোকবার আর জায়গা পেলে না। ঠেলে বমি আসছে মাইরি! থু থু—

পাশে শিবু ঘুমুচ্ছে অকাতরে। মুখে বিজাতীয় তরলতার স্পর্শ অনুভব করে নিদ্রা-জড়িত স্বরে বললে, আঃ, থুথু ফেলছে কোন্ শা—!

হিংস্রভাবে শিবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব্রজহরি বললে, ওয়াক! আরে ওঠ্ না ব্যাটা গাড়োল। ইদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর—

—ধ্যাৎ—শিবু আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল।

ভূষ্‌ণা বললে, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। এই মাঝরাত্তিরে সবাইকে উদ্ব্যাস্ত করছ কেন?

—হুঁঃ ঘুমুচ্ছে? আমি চোখে অন্ধকার দেখছি আর এরা যেন শ্বশুরবাড়ির রাজশয্যেয় গদীয়ান হয়েছেন। তবু তো রাজকন্যে জোটেনি। নাঃ, যা থাকে কপালে, কালই চলে যাই কুমারদয়।

হাবু বললে, যাও। কিন্তু লালাজীর খালি টাকা নয়, লাঠিও আছে। ফিরবে কোন্ পথ দিয়ে শুনি? হল্‌দিডাঙার মাঠের মাঝখানে ঠেঙিয়ে যদি আটা বানিয়ে দেয়—

ব্রজহরি প্রায় কেঁদে উঠল।—কী করা যায় তা হলে?

—কিছুই করা যায় না। শেষ রাত্তিরে উঠে সিধে আইহোর রাস্তা—বেলা উঠবার আগেই মামুদপুরের টাল পাড়ি দেওয়া। মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই ভালো।

—তবে তাই !—সোডার বোতল ভাঙার শব্দ করে এক দমক ঝড়ো হাওয়ার মতো বুকফাটা খানিকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ব্রজহরির : কিন্তু কুড়ি টাকা করে দিতো যে এক-এক রাত্তিরে ?

ভূষণ বললে, আর খুড়ী যে বিধবা হত। টাকা দিয়ে শেষকালে আমরা তোমার শ্রাদ্ধ করতাম নাকি ?

ব্রজহরি আবার রুখে উঠল : তুই হতভাগা কেবল কুডাক ডাকবি। আমি মরলে আমার শ্রাদ্ধ খাবি এই আশাতেই নোলা শানিয়ে বসে আছিস।

—বালাই ষাট, ষাট। খুড়ী পাকা চুলে সিঁদুর পরুক, মুড়ো চিবোতে গিয়ে নড়া দাঁতগুলো খসে যাক।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব আর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কালো রাত যেন ঝমঝম করছে। ছাগলের মতো শব্দ করে সোনাব্যাং ডেকে চলেছে একটানা। শন্‌শনে হাওয়ায় মাঠভরা কালো জলে তরঙ্গের দোলা লেগেছে। জেলাবোর্ডের বাঁধের তলা দিয়ে খরস্রোতে জল চলেছে কলরব করে। একটু দূরে বারোয়ারী তলায় বিষহরির বেদীর নিচে মিটমিট করছে প্রদীপ। কোন্ সুদূর দিগন্তে গোদাগাড়ী লাইনের একখানা রেলগাড়ি বেরিয়ে গেল, নিস্তব্ধ রাত্রির ইথারে জলভরা মাঠের ওপর দিয়ে গমগম করে ভেসে এল তার অস্ফুট প্রতিধ্বনি !

কালীবিলাস আবার উঠে বসল। কাশির ধমক কিছুটা শান্ত হয়েছে এতক্ষণে। উত্তেজিত গলায় বললে, পালানোর মধ্যে আমি নেই কিন্তু। কথা দিয়েছ, রাখতে হবে। মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত ! কুমারদয়েই গান গাইব আমরা।

বিরক্ত হয়ে ব্রজহরি বললে, বাজে কথা কোয়ো না বুড়োদা। আমরা তোমার মুকুন্দ-দাস নই। জেল খাটা পোষাবে না, লাঠি খেতেও পারব না।

উদ্দীপ্ত স্নায়ুগুলোর মধ্যে জ্বালাধরা রক্ত চনচন করে উঠল কালীবিলাসের।

—খবরদ্দার বেজা ! আমাকে যা খুশি তাই বলবি, কিন্তু অধিকারী মশায়কে (কালী-বিলাস কপালে হাত ঠেকাল) অপমান করিস নে।

ব্রজহরি মনের জ্বালায় বিশ্রী রকম মুখ ভেংচে বললে, ধ্যাত্তোর অধিকারী মশাই। তাকে নিয়ে তুমি ধুয়ে খাওগে, তার সঙ্গে আমাদের কোন্ সাত পুরুষের সম্পক্কো ?

কালীবিলাসের চোখ মুখ দিয়ে আগুনের বিন্দু ঠিকরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তীব্র হয়ে উঠল গলার স্বর : তুই কি মনে করিস যে দশ টাকা মাইনের জন্যে এত অপমান সয়ে তোর এখানে পড়ে থাকব ?

নানা দুশ্চিন্তায় ব্রজহরির মাথা ঠিক ছিল না, সমস্ত বিরক্তি আর অসন্তোষ যেন কালী-বিলাসের ওপরেই গিয়ে পড়ল। তিক্তকণ্ঠে বললে, না থাকো যাও না চলে। পায়ে ধরে

সাধছে না কেউ। একটা ভালো পরামস্যোর নামে খোঁজ নেই, সব কথায় কেবল ওই মুকুন্দদাসের ফ্যাকড়া!

কালীবিলাস গর্জে বললে, খবদ্দার বলছি খবদ্দার। তোর দল ছেড়ে আমি চলে যাব কালকেই। কিন্তু তুই অধিকারী মশাইকে অপমান করলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে।

ভূষ্ণা ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, থামো না খুড়ো। কেন থামোকা ক্ষ্যাপাচ্ছ বুড়োকে?

—না মাইরি, ভালো লাগে না। কেবল মুকুন্দদাস আর মুকুন্দদাস! অতই যদি, তা হলে বেশ তো বাপু, সোজা তার কাছেই চলে যাও না। আমাদের এত ভোগাও কেন?

কালীবিলাস কী বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। অসহ্য উত্তেজনা আর দুর্বার একটা কাশির উচ্ছ্বাসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গলা দিয়ে জলের মতো খানিকটা উত্তপ্ত তবল জিনিস বেরিয়ে এল, কাপড়ের খুঁটে কালীবিলাস মুছে ফেলল সেটাকে। অন্ধকার না থাকলে তাব চোখে পডত সেটা আর কিছুই নয়, টাটকা তাজা খানিকটা রক্ত মাত্র।

আইহোর পথ ধবে চলতে চলতে দলটির সঙ্গে যখন প্রথম সূর্যের দেখা হল, তখন ওরা নবাপুব আর কুমারদহের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। তিনদিকে ডুবার জল ভরা বর্ষায় মহাসাগরের মতো ফুলে উঠছে, ফেনিয়ে উঠছে,—নদী-নালা-জঙ্গল সব একাকার হয়ে গেছে। দূরে ডুবাব বুকে মহাজনী নৌকোর পালে সোনালী রোদ জ্বলছে। ভিজে ঘাস, পচা পাতা আব রাশি রাশি জলের অপূর্ব সুগন্ধি—বিলের অজস্র তরঙ্গে কলধ্বনি, যেন গন্ধ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। বাতাসে উডন্ত জলকণাগুলো এসে লাগছে চোখে-মুখে, যেন নির্মল নির্মেঘ আকাশ থেকে গুঁড়োয় গুঁড়োয় ঝরছে বৃষ্টির ছিটে। একটু দূরেই দিয়াড়িয়াদের গ্রাম মামুদপুর থেকে একখানা নৌকো কেরায়া করে নিয়ে এই বিল পাড়ি জমাতে হবে।

ব্রজহবি বগলের তবলা বাঁয়া দুটো নামিয়ে একটা আমগাছের গুঁড়ির ওপরে বসে পড়ল। বললে, নে ব্যাটা মুচির পো, চিঁড়ের পুঁটলিটা বের কর্। বা-ব্বা, হাঁফ ধবে গেছে। আর ছাখ্, বুড়োদাকে চাড্ডি বেশি করে দিস। রাত থেকে বুড়োদার মাথা গরম হয়ে আছে, ক্ষিদেও নিশ্চয়—কিন্তু বুড়োদা কই?

কালীবিলাস নেই। শেষ রাত্রিতে তাড়াহুড়োর সময় কালীবিলাসও উঠেছিল, তার পোঁটলাও গুছিয়েছিল; তারপরে একসঙ্গে রওনাও যে দিয়েছিল তাও ঠিক। কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালীবিলাস সঙ্গে আসেনি।

ভূষণ ভীত হয়ে বললে, রোগা মানুষ পথের মাঝখানে পড়ে-টড়ে নেই তো?

ব্রজহরির অনুতাপ হচ্ছিল। বললে, তাই তো! একটু খুঁজে আয় না রে।

ভূষণ খুঁজতে গেল। কিন্তু বৃথা। যতদূর চোখ চলে, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে কালী-বিলাসের কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না।

পাঁচ

রূপাপুরের কামারপাড়ার নিচে কুমার বিশ্বনাথের ঘোড়া এসে থামল।

তখন বেলা উঠেছে অনেক। মাথার উপরে দুপুরের সূর্য জ্বলছে। ঘোড়ার চ্যাপ্‌টা আর কালো ঠোঁটের কোণে ফেনার বিন্দু দেখা দিয়েছে, ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় হিংস্র ভাবে কড়মড় করে চিবুচ্ছে মুখের লাগামটাকে। হাঁটু অবধি ধুলো আর কাদা। কুমার বিশ্বনাথের মুখের ওপরেও ধুলোর একটা পুরু আবরণ পড়েছে, মাথার অসংযত চুলগুলো নেমে এসেছে কপালে। চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর উত্তেজনা।

কামারেরা উঠে দাঁড়াল শশব্যস্ত হয়ে। বিশ্বনাথকে তারা ভালো করেই চেনে, ওই ঘোড়াটাও তাদের পরিচিত। তেজী টাঙন ঘোড়া, ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো কেশর-গুচ্ছ। কদম চালে যেন হাওয়ার মুখে উড়ে চলে যায়। অমন ঘোড়া এ তল্লাটে আর কারো নেই।

রূপাপুরের কামারেরা বিশ্বনাথের প্রজা নয়। তবু তারা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বিশ্বনাথকে। রামনাথ হাতজোড়া করে সামনে এসে দাঁড়াল।

—কোন্ ভাগ্যে এখানে পায়ের ধুলো পড়ল হুজুরের ?

—বলছি।

কিন্তু বিশ্বনাথ রূপাপুরে আসবার আগে আরো একটু ভূমিকা আছে।

কুমারদহ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নবীপুরে পৌঁছুলেন বিশ্বনাথ। এতদিন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু আজ আসবার পথে কুমারদহের সঙ্গে নবীপুরের তফাতটা যেন তাঁর বিশেষভাবে চোখে পড়তে লাগল। নবীপুর বেড়ে উঠেছে, অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে উঠেছে। দু বছর আগে যেখানে ফাঁকা মাঠে ঘনশ্যামল ধানের শীষ মাথা তুলত, আজ সেই জায়গায় নতুন নতুন পাড়া বসেছে। কাঁচা ঘর, কোঠা ঘর। ঘরের দরজায় ঘোড়া বাঁধা, খচ্চর বাঁধা। ছোট বড় রাশি রাশি দোকান; পানের দোকান, বিড়ির দোকান, মনোহারী দোকান—এমন কি চায়ের দোকান পর্যন্ত। বাসিন্দারা অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, বালিয়া আর আরা জেলার আমদানী। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পশ্চিমের একটা শহরকে কে যেন রাতারাতি উড়িয়ে এনে বাংলা দেশের এই প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। হাঁ, নবীপুরকে এখন কলকাতার কাছাকাছিই বলা যায় বই কি। আর সকলের ওপরে মাথা তুলে রয়েছে

লালা হরিশরণের প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটা। চিলেকোঠার ওপরে রেডিয়োর তার—সেই তারের ওপর উড়ে উড়ে জটলা করছে এক ঝাঁক কবুতর—সৌভাগ্যের প্রতীক ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কুমারদহের কথা। কুমারদহ! একটা ভাঙাচুরো এলোমেলো কঙ্কাল। রাস্তার দু পাশে ছড়িয়ে পড়েছে বিচূর্ণ কোঠা বাড়ির ইট পাথর। অসংলগ্ন জঙ্গলের মাঝখানে এক-একটা জরাজীর্ণ বাড়ি—যেন অসুস্থতা আর বার্ধক্য সর্বাঙ্গে বহন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। বড় বড় দীঘিতে কলমীদাম; এক হাত পুরু হয়ে পানা জমেছে, আর ওই পানার ওপর একরাশি নীল রঙের ডিম নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে অতি বিষাক্ত আলাদ-গোক্ষুর। ঐশ্বর্য নেই, আছে অরণ্য। মানুষ নেই, আছে ফেনায়িত বিদ্বেষ আর হিংসা।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন দাঁতের চাপ এসে নিচের ঠোঁটটার ওপর পড়েছিল। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে আচমকা কিসের একটা টক্কর লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দাঁত সোজা বসে গেল মাংসের ভেতর। যন্ত্রণাবিকৃত মুখের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে ঘোড়ার রাশ টানলেন বিশ্বনাথ। সামনেই লালা হরিশরণের গদী।

—রাম রাম। আইয়ে বাবুজী, আইয়ে।

দু পাশ থেকে দুজন লোক এসে বিশ্বনাথের ঘোড়া ধরলে। সিঁড়ির সামনেই লালাজীর ভাইপো রামগোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বিড়ি ফেলে দিয়ে সসম্মানে অভিবাদন করে বললে, নমস্তে, আইয়ে, আইয়ে।

প্রতি-অভিবাদন জানালেন বিশ্বনাথ। কিন্তু কিসের একটা সঙ্কোচে তিনি যেন চোখ তুলে রামগোপালের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। যে কুমারদহের জমিদার বাড়িতে একদিন হরিশরণের পূর্বপুরুষ পদসেবা করে অন্নসংস্থান করত, আজ সেই হরিশরণের কাছেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। তিনি, কুমার বিশ্বনাথ! খালি মনে হতে লাগল চারদিক থেকে অসংখ্য অনুকম্পার দৃষ্টি এসে তাঁর গায়ে সূঁচের মতো বিঁধছে। সসম্মানের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে অবজ্ঞার একটা চাপা কৌতুক।

প্রকাণ্ড গদীবাড়ি। প্রায় পনেরোখানা বড় বড় সিঁড়ি পার হয়ে উঠতে হয় দোতলা সমান উঁচু বারান্দায়। ওপরের দিকে সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে সিঁড়ির মাথায় দুদিকে দুটি শ্বেত পাথরের মূর্তি—একটি সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আর একটি গন্ধমাদনবহনরত মহাবীর। মূর্তি দুইটি সিঁদুরে বিচর্চিত। নকল মার্বেল বাঁধানো মেজে, ফুলের কাজ করা। বারান্দার এক পাশে প্রকাণ্ড একটা লোহার দাঁড়ি-পাল্লা, দুজন লোক সেখানে ধান মাপছে। আর এক পাশে আট-দশটা কাপড়ের গাঁট আছে স্তূপাকার হয়ে। শাদা দেওয়ালের গায়ে মেটে সিঁদুর দিয়ে লেখা 'লাভ শুভ' 'লাভ শুভ'। কোথা থেকে বেনেতি-মশলার খানিকটা উগ্র মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছিল।

বারান্দা পেরিয়ে লম্বা একখানা ঘর—এই গদী। ঘরে পুরু জাজিম পাতা, তার উপর ধবধবে শাদা চাদর। তিন-চারটে বিরাটকায় গির্দা বালিশ এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি একটা বিরাটকায় বালিশে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়ে গড়গড়া টানছেন লালা হরিশরণ। পরনে সূক্ষ্ম মলমলের ধুতি, গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবি। লালাজীর ঠিক পেছনেই দেওয়ালের গায়ে ছোট একটা কুলুঙ্গি; সেখানে লাল রঙের আর একটা ক্ষুদ্রকায় গণেশ মূর্তি, তার সামনে রূপোর প্রদীপ, রূপোর ধূপদানী। তার ওপর একটা দেওয়ালঘড়ি আর দেওয়ালঘড়ির দুপাশে দুখানা বড় আকারের ছবি—মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওহরলাল।

লালাজী গড়গড়া টানছেন আর ফরাসেব উপর ভিড করে বসেছে তাঁর কর্মচারী, মোসাহেব আর প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর দল। ঠিক পাশেই নীল রঙের একটা ভারী সিন্দুক, একজন লোক তার ভেতর থেকে একতাডা নোট বের করে গুনছিল।

বিশ্বনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখেই লালাজী সোজা উঠে দাঁড়ালেন, তারপর এগিয়ে এসে এবং বিশ্বনাথ কিছু বলবার আগেই দু হাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, আসুন রাজা সাহেব, কিরুপা করকে গরীবখানামে পা ধারিয়ে!

সাপের কামড খাওয়ার মতো বিশ্বনাথ চমকে দু পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, এ কী করছেন আপনি!

লালাজী হাসলেন—হাসিতে যেন শ্রদ্ধা আর বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, না, না, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো আপনার চাকর, আপনাব খেয়েই তো আমরা মানুষ।

লালাজীর গদীতে যারা বসেছিল, তারা তাকিয়ে আছে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে—যেন কী একটা বিচিত্র অভিনয় দেখছে তারা। কিন্তু বিশ্বনাথের দু কান লাল আর গরম হয়ে উঠল। কপালের উপর ফুটে উঠল ঘামের বিন্দু। জামার আস্তিনে কপালটা মুছে ফেলে বিশ্বনাথ বললেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে লালাজী।

—কথা আছে—বিলক্ষণ! আসুন, আসুন, আমার বসবার ঘরে আসুন। এই রামদেইয়া, রাজাবাবুকো ওয়াস্তে আচ্ছাসে চা লাগাও জলদি—

—জী।—রামদেইয়া বেরিয়ে গেল তটস্থ হয়ে।

—মাপ করবেন, চা আমি এখন খাব না।

—চা খাবেন না, এও কি একটা কথা হল? গরীবের মোকামে যখন কষ্ট করে এসেইছেন,—লালাজী হাসলেন: তখন আর একটু তক্‌লিফ—

গরীবের মোকাম—তাই বটে। কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে আকাশছোঁয়া প্রাসাদ তুলেছেন লালাজী। বাংলার গবর্ণর স্বয়ং তাঁর প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন। বিরাট

ব্যবসা, বিশাল কারবার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক তিনি। সে ঐশ্বর্যের চিহ্ন এই গ্রাম্যবাড়ির সারা গায়েও সোনালী রঙে ঝলমল করছে। ড্রাই ব্যাটারী দিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে, ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের আলো আর পাখা। পুরু পার্শী কার্পেট। মনে পড়ল ধ্বংসশেষ কুমারদহের অপস্রিয়মাণ রাজপ্রতাপ।

লোভনীয় বসবার ঘরটি। লালাজীর গদী থেকে একেবারে আলাদা। গদীর প্রয়োজন ব্যবসায়িক, তার ব্যবহার স্থূল এবং সর্বজনীন। কিন্তু এ একটা বিভিন্ন জগৎ। কাচের শেল্‌ফে বাঁধানো দামী ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা বই ঝকমক করছে। সোফার ওপর হরিণ আর চিতাবাঘের চামড়া বিছানো, লালাজী নিজের হাতেই এদের শিকার করেছেন টেরাই-এর জঙ্গল থেকে। কালো আবলুশ কাঠের ফ্রেমে দামী ক্লক। মেহগনীর টেবিলে ফুলের তোড়া।

লালাজী সবিনয়ে বললেন, বৈঠিয়ে।

বিশ্বনাথ বসলেন। কিন্তু অকারণে, অত্যন্ত অকারণে, তাঁর সমস্ত চোখ মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠতে লাগল। লালাজী টেবিল-ফ্যান খুলে দিলেন। তবু বিশ্বনাথের মনে হতে লাগল, শরীরের ভেতর থেকে যেন অসহ্য একটা উত্তাপ বাষ্পের রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে, যেন তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

লালাজীর মুখে কিন্তু অসীম আর অকৃত্রিম বিনয়—চোখ দুটি শান্ত আবেগে যেন ছলছল করছে। কোমল কণ্ঠে বললেন, ফরমাইয়ে।

বিশ্বনাথ একবার শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করলেন। পিপাসায় গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে উঠেছে, এখন এক পাত্র মদের প্রয়োজন। বড় অসহায় মনে হচ্ছে, বোধ হচ্ছে নিজে না এলেই বোধ করি ভালো হতো। পাঠিয়ে দিলেই চলত ব্যোমকেশকে। কিন্তু এখন আর ফিরবার জো নেই কোনোদিক থেকে।

বললেন, মেলা সম্বন্ধে সেই কথাটা বলবার জন্যেই—

লালাজী বললেন, রাম রাম। সেজন্যে এত কষ্ট করে, কুমার বাহাদুরের আসবার দরকার ছিল কী। কোনো আমলাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। এই দুপুর রোদে এতখানি ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি রাজারাজড়ার সুকুমার শরীরে কখনো সয়!

—রাজারাজড়া, কুমারবাহাদুর!—কথাটা যেন কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করতে থাকে। কিন্তু লালাজীর মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, এতটুকু বৈলক্ষণ্য নেই কোথাও। একরাশ মাখনের মতো নরম আর কোমল প্রশান্ত মুখশ্রী, উদ্বিগ্ন শুভার্থীদের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যি বলছে লোকটা, না অভিনয় করে চলেছে তাঁর সঙ্গে?

রুমালে মুখ মুছে বিশ্বনাথ বললেন, মেলাটা কি আপনি নিতেই চান?

লালাজী হাসলেন। উত্তর দেবার আগে সোনার সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন বিশ্বনাথের দিকে। বললেন, রাজাবাবুর মেলা আমি নিতে পারি এতবড় কথা বলব কী করে। বছর পাঁচেক মেলাটা গোলামের তাঁবে থাকুক, এই আর্জি। মনিবের সম্পত্তি তো চাকরেই দেখাশোনা করে, তাতে অন্যায় কিছু নেই।

ব্রজহরি পালের সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দামী দুর্লভ 'বার্ডসাই' কিন্তু স্পর্শও করলেন না বিশ্বনাথ। তাঁর শিরাগুলো যেন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনা আর উগ্রতাকে গলার নিচে ঠেলে রেখে তিনি শান্তস্বরে বললেন, মেলা না পেলে কি আপনি টাকা দিতে পারবেন না?

—কী করে দিই?—আরো কোমল, অনেকটা অনুনয়ের ভঙ্গিতেই জবাব এল: আমারও বাল-বাচ্চা আছে। তাদের একটা ব্যবস্থাও তো করা দরকার। একেবারে পথে বসিয়ে যেতে পারব না। কুমারবাহাদুর নিজেই বিবেচনা করুন।

উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফ্যানের বাতাসেও শরীরের সর্বত্র প্রধূমিত উত্তাপ এতটুকু শান্ত হতে চায় না। বিশ্বনাথ রুমালে আবার মুখ মুছলেন। গলার কাছে কী একটা আটকে ধরেছে, কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে।

—বেশ, তবে তাই।—কণ্ঠের প্রশান্তি সত্ত্বেও বিশ্বনাথের চোখ জ্বলতে লাগল আর লালাজীর চোখ তেমনি তরল হয়ে রইল বিনয়ের শান্ত কোমলতায়। বিশ্বনাথ বললেন, তা হলে কাগজপত্র তৈরি থাকে তো দিন। আমি সই করে দিই।

—রাম রাম সীতারাম।—লালাজী সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হয়ে গেলেন: তাও কি হয়? গরীবের বাড়িতে এসেছেন, চা-পানি খান, একটু বিশ্রাম করুন। কাগজপত্র আর টাকা আমি কাল নিজেই লোক দিয়ে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। চোখের দৃষ্টিকে স্থির আর দৃঢ় করে রাখলেন লালাজীর মুখের ওপর: আর সে টাকা যদি আমি কেড়ে রাখি? যদি দলিল সই না করে ছিঁড়ে ফেলে দিই?

লালাজী আবার হাসলেন: তা হলে সে টাকা আমি কুমারসাহেবের নজরানা বলেই ধরে নেব।

কথাটা এসে পড়ল যেন কঠিন একটা মুষ্ট্যাঘাতের মতো। স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিশ্বনাথ, কোন উত্তর মুখে যোগালো না। লালাজী টেবিলে কনুইয়ের ভর রেখে অনুসন্ধিৎসু চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। টেবিল-ফ্যানটা অশ্রান্তভাবে কট কট করতে লাগল আর বাইরে থেকে শোনা যেতে লাগল ধান মাপার সুর: রামে রামে দো—দো দো তিন, তিন তিন চার, চার চার—পাঁ—ন্—

ঠিক এমনি সময় চা নিয়ে ঘরে ঢুকল রামদেইয়া। সঙ্গে সঙ্গে যেন জমাট অস্বস্তির

একটা কালো দমকা বাতাস হাওয়া হু হু করে দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল।

এক নিশ্বাসে চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে এবং খাদ্যদ্রব্যের একটি কণাও স্পর্শ না করে বাইরে এসে বিশ্বনাথ ঘোড়ায় উঠলেন। সশব্দে চাবুক পড়ল, তারপরেই ঘোড়া দ্রুতবেগে উড়ে চলল সোজা রূপাপুরের পথে।

রূপাপুরের মজলিশ শেষ করে বিশ্বনাথ যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন বেলা দুপুর। ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে থাকবে?

শুবযের হাতের পেশী ফুলে উঠেছে, দুলে উঠেছে সমস্ত বুকখানা। কালো কঠিন হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে জবাব দিলে, থাকবে।

রামনাথ দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে। বিশ্বনাথ এবার তাকেই সম্ভাষণ করলেন।

—তুমি কী বলছ ওস্তাদ?

রামনাথ মুখ তুলল। ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আপনার হুকুম আমরা মানব।

—হাঁ। মেলা ভেঙে দিতে হবে। যেমন করে হোক। আগুন লাগিয়ে, দাঙ্গা বাধিয়ে —যেমন করে হোক। ধাক্কা সামলাতে আমি আছি। আর টাকা—সে তো আগেই বলা আছে।

—তাই হবে।—কিন্তু মনের দিক থেকে রামনাথ কোনো প্রেরণা পেল না। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার বয়স বা উৎসাহ কোনোটাই তার আর নেই। সেদিনের উত্তপ্ত রক্ত গেছে শীতল হয়ে, যাযাবর জীবন আমের বনের ছায়ায় নিভৃতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, ফসল কাটবার সময় অনেক আশা আর স্বপ্ন ভবিষ্যতের মোহমায়া বুলিয়ে দিয়ে যায়। তারপর রাত্রে কামিনী যখন বুকের মধ্যে একান্ত ঘন আর নিবিড় হয়ে আসে—তখন প্রেমে, পূর্ণতায় আত্মতৃপ্ত পাশবিক জীবন। মারামারি—হাঙ্গামা—অনিশ্চয়তাকে মেনে নেবার সে অনুপ্রেরণা কোথায় আর? এখন মনে হয় যা চলছে এই ভালো, আর কোনো বৈচিত্র্যের আকর্ষণ নেই কোথাও।

তবু রামনাথ বললে, তাই হবে।

রূপাপুরের তলা দিয়ে জনস্রোতের বিরাম নেই। অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলেছে, ধুলোয় কাদায় কোলাহলে পথ মুখরিত করে চলেছে। বিশ্বনাথ আবার ঘোড়ায় চাবুক বসালেন, তারপর শেষবারের মতো মুখ ফেরাতেই রামনাথের ঘরের দাওয়ায় দেখলেন ভানীকে। একবার দুবার তিনবার ফিরে ফিরে দেখলেন তিনি। মাথার ওপর রোদ ঝলকাচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকে একপাত্র মদ পেটে পড়েনি। তবু রোদের সুরা আছে, রক্তের মধ্যে শাণিত তীব্র জ্বালা আছে। তাই বিশ্বনাথ চকিতের জন্যে ঘোড়ার রাশ টানলেন; তারপরেই আবার হাওয়ার মতো ছুটিয়ে দিলেন তাঁর তেজী টাঙন ঘোড়াটা।

ভানী কে?

তার পরিচয় দেব যথাসময়ে

ছয়

প্রায় চল্লিশ ঘর বিদেশিয়া কামারের বসতি গ্রামে। আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কুড়ি বছরেও বাঁধা ঘরবাড়ি ওদের মূলটাকে মাটির মধ্যে বেশিদূর থিতিয়ে দিতে পারেনি। আর পাকাপাকি ভাবে ঘরবাড়ি করে বাস করবার ইচ্ছা থাকলেও তার কি জো আছে আজকাল! একটু বেশি সজীব হয়ে যারা বাঁচতে চায়, প্রতি পদে পদে বাইরের সংঘাত এসে খর্ব করতে চায় তাদের। চুরি ডাকাতি করলে ইংরেজের আইন চার দিক থেকে বাহু বাড়িয়ে আসে, খাজনার গোলমাল করলে জমিদারের রক্তচক্ষু আত্মপ্রকাশ করে নানা খুঁটিনাটি অত্যাচারের রন্ধ্রপথে। খাঁচার ভেতরে বন্দী সিংহ যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না; কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন তার অরণ্যের আহ্বান মর্মরিত হয়ে ওঠে আর তার প্রচণ্ড শক্তি লোহার গরাদগুলোকে ভেঙে চুরমার করবার মতলব করে, তখন তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

তরণী, কান্নু, কেশোলাল—আরো কতজন। কেউ জেলে, কেউ দ্বীপান্তরে, কেউ কেউ বা এখনো ফেরারী। ওই সব ফেরারীদের সন্ধানে পুলিস মাঝে মাঝে এসে হানা দিয়ে যায় রূপাপুরে। বিশেষ করে কেশোলালই তাদের প্রার্থিত লক্ষ্যবস্তু। দু-দুটো খুনের মামলার সে আসামী। সেবার ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির কর্তার গলাটাকে সে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছিল, যেমন করে লোকে মুর্গী জবাই করে অনেকটা সেই রকম। তারপর তাকে ধরতে এল চৌকীদার। চৌকীদারের নাম আলী মহম্মদ, দশাসই জোয়ান, দশটা বাঘে তাকে খেতে পারে না। দুবার সে নিছক বাহুবলে ঝাঁপটে চোর-ডাকাত ধরে ফেলেছে। কিন্তু নিতান্ত কুক্ষণেই কেশোলালকে ধরবার জন্য এগিয়ে এসেছিল সে। অব্যর্থ লক্ষ্যে কেশোলাল ল্যাজা ছুঁড়ল। আলী মহম্মদ মাটিতে পড়ল, আর উঠল না।

তারপর থেকে কেশোলাল নিরুদ্দেশ। পুলিসের রাগ তার ওপরেই সব চাইতে বেশি; তার মাথার ওপর ঝুলছে হাজার টাকার পুরস্কার। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ধরা পড়েনি। কেউ বলে সে নাকি জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত চলে গেছে, কেউ বলে নাগা সন্ন্যাসী সেজে সে হিমালয়ে ধ্যান-ধারণায় মন দিয়েছে। কিন্তু এর কোনোটাই যে সত্যি নয়, রূপাপুরের কামারেরা তা জানে। কেশোলালের মতো মানুষ তো চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। জীবনকে সে রূপান্তর দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে জীবন স্তিমিত ধ্যান-ধারণায় নয়, জাহাজের খালাসী হয়ে কয়লা ঠেলারও নয়।

সাত-আট বছর পেরিয়ে গেল, রূপাপুরের কামারেরা কেশোলালকে প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু রামনাথ ভোলেনি। তার সার্থক মন্ত্রশিষ্য ছিল যে কেশোলাল। শূয়রের মধ্যে সে রক্ত মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে ওঠে, কিন্তু তাই বলে কি কেশোলালের সঙ্গে তুলনা চলে তার? একবার সখ করে অনেকখানি কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেয়েছিল সে। কষ বেয়ে টপ টপ করে পড়েছে রক্ত, রক্তাক্ত দাঁতের সঙ্গে মাংসের ছিবড়েগুলো জড়িয়ে রয়েছে—প্রকাণ্ড মুখখানায় আকর্ণ রক্তিম হাসি হেসে কেশোলাল বলেছিল—একবার মানুষের মাংস খেয়ে দেখতে হবে, স্বাদ কেমন লাগে।

সেই কেশোলাল।

আর একজন তাকে ভোলেনি, সে তার বউ ভানী।

বিশ-বাইশ বছর হবে ভানীর। মোটা খাটো চেহারা, সমস্ত শরীরে মেদ নয়; মাংসের প্রাচুর্য। পুরুষের মতো গঠন—অসুরের মতো খাটে, রাক্ষসের মতো খায়। কোনো মেয়ে যে একসঙ্গে এই পরিমাণ খেতে পারে এ যেন নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। হাসলে গালের দু পাশে মাংসের পিণ্ড গোল হয়ে ফুটে ওঠে আর তাদের আড়ালে ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় তলিয়ে যায় তার। পায়ের পাতা দুটো অস্বাভাবিক বড়, ভারী শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভানী যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় হাতী আসছে।

বেশি কথা বলে না, বোঝেও না। অর্থহীন খানিকটা হাসি দিয়েই সচরাচর সব কথার জবাব দিতে চায়। নিঃসঙ্গ ঘরে একলা দিন কাটায়, অন্য কামারদের খুঁটিনাটি কাজকর্ম করে দেয়, খেতে পায়। স্বামীর বিরহে সে যে খুব বেশি মর্মপীড়া বোধ করছে না—তাকে দেখলেই সে কথা মনে হয়। প্রচুর স্বাস্থ্য এবং আকণ্ঠ আহারে নিজের ভেতরেই সে সব সময়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। কাজকর্ম না থাকলে ঘরের দাওয়ায় বসে গলার নানা রকম সুর করে, কোকিল ডাকে, শিস্ দেয়, বলে 'বউ কথা কও!' খামোকা একটা কুড়ুল নিয়ে কাঠের গুঁড়ি চ্যালা করতে লেগে যায়। স্নান করতে গিয়ে অন্য বউঝিদের ধরে চুবিয়ে দেয়, ডুব দিয়ে এসে পা ধরে টানে, পাঁক ছিটিয়ে দেয় শুকনো কাপড়ে।

মেয়েরা রাগ করে।—অত যে হাসিস, লজ্জা করে না?

লজ্জা? কিসের লজ্জা? ভানীর হাসি তাতে বন্ধ হয় না। মাংসের ঢিবির আড়ালে প্রায় তলিয়ে যাওয়া চোখ দুটো মিটমিট করে। বলে, কেন?

—মরদের পাত্তা নেই সাত বছর, কোন্ সুখে আছিস তুই?

ভানীর চোখ-মুখে ছায়া পড়ে, হাসির রেখাটা হ্রস্ব হয়ে আসে ক্রমে। বলে, সাত বছর পাত্তা নাই থাকল, আসবে তো একদিন।

—ছাই আসবে! এতদিনে সে কবে—

আর একজন বাধা দিয়ে বলে, এলেই বা। তোকে কি আর ঘরে নেবে ভেবেছিস তুই?

—নাঃ, ঘরে নেবে না? কে তবে রেঁধে দেখে দেবে শুনি? কে পাখার বাতাস দেবে, পা টিপে দেবে কে? রাগ হলে লাথি মারবে কাকে?

এর পরে যে কথাটা মনে আসে মেয়েরা তা বলতে পারে না। দুঃখ হয়, সংকোচ হয়, লজ্জা হয়। ভানী কিন্তু নির্বিকার।

—তোদের মরদের চাইতে আমার মরদ আমাকে ঢের বেশি ভালোবাসে।

বুদ্ধিহীন সরলতা অন্য মেয়েদের মনে সহানুভূতির প্রতিক্রিয়া আনে। একজন বলে, বাসে বইকি।

ভানী বলে, তার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

মেয়েরা মনে মনে বলে, যমালয়ে। প্রকাশ্যে জবাব দেয়, নিশ্চয়।

পুকুরপাড়ে আমগাছে কোকিল ডাকছে। ভানী উৎকর্ণ হয়ে শোনে, তার পরেই তার শিশুর মতো অস্থির আর চঞ্চল মনটা চলে যায় সেই দিকেই। উঁচু কণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলে—কু-উ-উ।

কোকিলটা চটে গিয়ে আরো ওপরে স্বরগ্রাম তোলে, ভানীর গলাও পর্দায় পর্দায় চড়ে তার সঙ্গে। বলে, কামিনীদি, এবার আমি একটা কোকিল পুষব।

মেয়েরা মনে মনে আবার বলে, মরণ! তারপর কলসীতে জল ভরে নিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়; বেলা বাড়ছে, জোয়ানগুলো ভোর না হতেই হাপরে বসেছে। ক্ষিদের সময় ভাত ঠিকমতো না পেলে হাতুড়ি পিটিয়ে ওদের মাথাগুলোকে ভেঙে দেবে। ভানীর মতো মনের আনন্দে কোকিল ডাকলে ওদের চলে না।

তবু মেয়েরা রাগ করে না ওর ওপরে। করুণা হয়, সহানুভূতি হয়। কী চমৎকার আত্মতৃপ্ত হয়ে আছে ভানী! নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ, নিঃসন্দেহ। নিজের ভালোমন্দ, নিজের মান-সম্মান কোনো কিছুই তলিয়ে বুঝবার মতো ক্ষমতা ওর নেই। কেশোলাল কোনোদিন ফিরবে না, ফিরলে তার ফাঁসি অনিবার্য। আর যদি এমন হয়, কোনোদিন চুপি চুপি সে ফিরেও আসে, তা হলেও সে ভানীকে কোনোমতে ঘরে নেবে না। নিজের ক্ষতির কথা ভানী বুঝতে পারেনি বটে, কিন্তু ওরা তো সবই জানে। জবানবন্দী দেবার জন্যে পুলিসের লোক এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল থানায়। তখন ভানীর বয়স অল্প—চোদ্দ-পনেরো বছরের বেশি হবে না। জবানবন্দী সে কী দিয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু তিন-চারদিন পরে যখন সে ফিরে এল, তখন দশ মাইল দূরের থানা থেকে হেঁটে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, তাকে আনতে হয়েছিল গাড়িতে এবং দুদিন যাবৎ সে ছিল অচৈতন্য হয়ে। থানার দারোগা থেকে দারোগার গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত কেউই তার নিরুপায় দেহটার ওপর চক্ষুপাত করতে ছাড়েনি।

সকলে মনে করেছিল—ভানী বাঁচবে না, কিন্তু শরীরের প্রচুর প্রাণশক্তিই তাকে

বাঁচিয়ে তুলল। আর শুধু শারীরিক ভাবেই নয়; যে স্বাভাবিক অপমান এবং ঘৃণায় রূপাপুরের কামারের মেয়েরা পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে পারত—অন্তত একটা অসহ্য আত্ম-গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তাদের চেতনা, সে অপমান, সে গ্লানি অনায়াসেই কাটিয়ে উঠেছে, অপরিমেয় একটা জীবনী-শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সামান্য কালির ছিটার মতো যে দাগ তার গায়ে লেগেছিল, অত্যন্ত সহজেই তা ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে গেছে,—শারীরিক একটা দুর্ঘটনার মতোই সে মেনে নিয়েছে সেটাকে।

তাই ভানীর হাসিতে কখনো এতটুকু ছন্দপতন ঘটে না, তাই সে বুঝতে পারে না কোন্ অপরাধে কেশোলাল ঘরে নেবে না তাকে! কিন্তু অন্য মেয়েরা তার মতো নির্বোধ নয়। ভানীর অদৃষ্ট ভেবে তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কত বড় সর্বনাশ যে তার হয়ে গেছে, সে কথা বলতে গিয়েও ওরা থমকে থেমে যায়—থাক না! ভুলেই যদি আছে, তা হলে আর মনে করিয়ে দিয়ে কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কী!

পুরুষেরা অবশ্য সবাই সে দৃষ্টিতে ভানীকে দেখে না। কারো সহানুভূতি হয়, কেউ কেউ দুঃখ করে; আবার ভানীর অসংযত চলাফেরা, নিজের সম্পর্কে অসতর্ক অবচেতনা, কারো কারো মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মাংসল পরিপূর্ণ দেহটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তরুণ সম্প্রদায় মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে—ভানী তো রাত্রে একাই থাকে।

কিন্তু বছর দুই আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। তারপর থেকে ভানীর কাছে কেউ আর ভিড়তে সাহস করে না।

সারাদিন ঢেঁকি কুটে এক সের চালের ভাত খেয়ে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছিল ভানী। অনেক রাত্রে ঝাঁপের দড়ি কেটে কে তার ঘরে ঢুকল। চকিত স্পর্শে ভানীর গভীর নিদ্রা দূর হয়ে গেল, মাথার কাছ থেকে পেতলের একটা ঘটি তুলে নিয়ে সজোরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে দিল।

কুড়ুল ধরা, জাঁতাভাঙা কঠিন হাত—উত্তেজনার আধিক্যে আঘাতটা মারাত্মক হয়ে বসল। ভানীর গায়ের পাশ থেকে ভারী একটা জিনিস প্রবল আর্তনাদ করে পড়ে গেল মাটিতে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে উঠে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। আলো জ্বেলে ভানী দেখল ঘরটা রক্তে ভাসছে।

পরদিন সকালে ব্যাপারটা তার ভালো করে মনেই পড়ল না। আর বৈজু কামার মাথায় একটা রক্তাক্ত ন্যাকড়া জড়িয়ে তিন দিন পড়ে রইল বিছানায়। অন্ধকারে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েই তার এই দুর্দশা। দৈব-দুর্বিপাকে এমন কত বিড়ম্বনাই মানুষকে ভোগ করতে হয় যে!

তারপর থেকে ভানী মোটামুটি শান্তিতেই দিন কাটিয়ে আসছে। আকার-ইঙ্গিত দু-চারজন মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্তু বেশি কাছে এগিয়ে আসবার সৎসাহস আর নেই

কারো। সে সব ইঙ্গিত ভানী ভালো করে বুঝতেও পারে না। পুরুষের মতো স্বাস্থ্য, পুরুষের মতো জীবন-যাত্রা মনের দিক থেকেও তাকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। যে সমস্ত ইঙ্গিত ও কথাবার্তায় অন্য মেয়েরা লজ্জায় মুখ তুলতে পারত না, তাদের সমস্ত শিরা স্নায়ুগুলো চমকে উঠত, সেগুলো ভানীর কাছে নিছক ঠাট্টা আর অর্থহীন মুখভঙ্গি বলেই মনে হয় শুধু। কিন্তু কেশোলালকে সে ভুলতে পারেনি।

ভালো করে মনে কি পড়ে? সবটা পড়ে না—সাত-আট বছরের ব্যবধান একটা সূক্ষ্ম পর্দার মতো তার ওপরে নেমেছে, তার অন্তরালে সে সব দিনগুলো দেখা যায় ছায়ার মতো, কতক দেখা যায়, কতক দেখা যায় না। তা ছাড়া ভানীর বয়স তখন বেশি নয়, বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিও ছিল অপরিণত। তরল অগঠিত চিন্তার ওপরে সে দিনের স্মৃতি কোনো রেখাপাত করেনি, দাগ কাটতে না কাটতেই মিলিয়ে গেছে। কেশোলাল লাথি মেরেছে তাকে, নির্যাতন করেছে নানারকম, কঠিন হাতে টেনে টেনে মাথার চুল অর্ধেকের বেশি উপড়ে ফেলেছে, আর—আর ভালোবেসেছে নির্মমভাবে, নিষ্ঠুরভাবে—রূপাপুরের কামারেরা যেমন ভাবে ভালোবেসে থাকে।

তারই এক-একটা দিন হঠাৎ অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়ে দৃষ্টির সামনে ঝলমল করে ওঠে যেন। যেন পাতলা পর্দাটা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে সূর্যের আলো গিয়ে প্রসারিত হয় তাদের ওপরে। দাওয়ায় বসে আপন খেয়ালে কোকিল ডাকতে ডাকতে ভানী হারিয়ে ফেলে নিজেকে।

ভানীকে বেদম প্রহার দিয়ে বেরিয়ে গেছে কেশোলাল, ফিরেছে অনেক রাতে। গায়ের ব্যথায় চোখের জল ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে ভানী, আচমকা জেগে উঠেছে কেশোলালের নিষ্পেষিত সোহাগের উদগ্র উচ্ছ্বাসের মাঝখানে।

রুদ্ধশ্বাসে কেশোলাল বলছে, খুব রাগ হয়েছে, না? আচ্ছা, এবার হাট থেকে তোর জন্যে ডুরে শাড়ি কিনে আনব আর সোনাদীঘির মেলা থেকে কিনে দেবে নানারঙের কাচের চুড়ি।

কোথায় সেই কেশোলাল! বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে একদিন। অত বড় মানুষটা, অমন শক্তিমান, হাতুড়ির মুখে যার আগুন ছুটত আর চারদিকের সমস্ত মানুষ-জানোয়ার তটস্থ থাকত যার ভয়ে, একদিন একটা দমকা হাওয়ার মতোই উধাও হয়ে গেল সে! সমস্ত রূপাপুর, শুধু রূপাপুর কেন, আশেপাশের সব অঞ্চলগুলো যে জুড়ে থাকত,—আজ কোনোখানে তার এতটুকু চিহ্ন পাওয়া যায় না! এও কি সম্ভব! ভানীর ভারী বিস্ময় বোধ হয়।

সামনে দিয়ে মানুষের শোভাযাত্রা। গাড়ির মিছিল। কত লোক চলেছে, কত অসংখ্য লোক। দূর থেকে সব আসছে—দেখলেই বোঝা যায়। মানুষগুলোর হাঁটু অবধি

ধুলো, জামা কাপড় লাল আর ময়লা হয়ে গেছে। চোখমুখে গভীর ক্লান্তি। মাথার ওপর জ্বলছে জ্যৈষ্ঠের সূর্য, এখনও বৃষ্টি নাবেনি, ফাটা মাঠগুলোর ফাটল দিয়ে আগুন উঠছে, পথের পাশের বিলগুলো এখন শুধুই কাদা। লোকগুলো তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সেই শুকনো বিলগুলোর দিকে, রূপাপুরের দীর্ঘ তাল গাছগুলোর কৃপণ ছায়া তাদের মনে ক্ষণিক বিশ্রাম নেবার প্রলোভন জাগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তাদের। গোরুর গাড়ির চাকায় ধুলো জমে সেগুলো আকারে যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে, চাকার ভেতর থেকে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে উঠছে একটা কাতর আর্তনাদ। গোরুগুলো পা ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে যেন অন্তিম যাত্রায়, মহিষের গালের দু পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে শাদা ফেনা।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভানীর কত কী মনে হয়। মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোনো লোক বাকি নেই, সবাই দল বেঁধে আজ সোনাদীঘির মেলার দিকেই এগিয়ে চলেছে। এত লোকও কি আছে সংসারে! সঙ্গে সঙ্গে মনের সামনে ভেসে ওঠে আর একজনের কথা—সে কেশোলাল!

কেশোলাল। সে কোথায় আজকে? সেও কি এমনি দুপুরের রোদে আজ পথ চলছে ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার মতো? প্রখর রোদের জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছে মাথার ওপরটা, তৃষ্ণায় শুকিয়ে এসেছে কণ্ঠ, কিন্তু কোনোখানে এতটুকু ছায়া নেই, জল নেই একটি বিন্দুও। তবু সে চলেছে, চলেছে—তার চলার শেষ নেই। দুটো খুন করেছে সে, পুলিস তাকে একবিন্দু বিশ্রাম দেবে না, এ কথা ভানীও জানে।

যে লোকগুলো চলছে, তাদের দিকে ভানী আকস্মিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। কে জানে, এদের মধ্যেও হয়তো কেশোলাল থাকতে পারে; হয়তো এদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সেও চলেছে মেলায়। কিন্তু ভানী কি তাকে চিনতে পারবে? ওই যে লোকটা অতি কষ্টে কুঁজো হয়ে পথ চলেছে, ওই কি? কিন্তু কেশোলালের তো অত বুড়ো হবার কথা নয়। কিংবা ওই কে একজন একমুখ দাড়ি নিয়ে সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে, ওই যে কেশোলাল হতে পারে না, এমন কথা কে বলবে! আজ আট বছর আগেকার স্মৃতি, ভানীর তাকে ভালো করে মনে পড়ার কথা নয়।

কামিনী এল পিছন থেকে।

—এত করে কী ভাবছিস ভানী?

চিন্তার সুর কেটে গেল। ভানী জবাব দিলে না, তাকিয়ে রইল বড় বড় নির্বোধ চোখ মেলে।

—এমন করে আছিস যে? ক্ষিদে পেয়েছে? চল্ এক ধামি মুড়ি দেব তোকে।

আমার এক কাঠা ধান কিন্তু ভেনে দিতে হবে।

—নাঃ।—ভানীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

কামিনীর বিস্ময় বোধ হল।—ভাবছিস কী, সোয়ামীর কথা নাকি?

ভানী এবারেও জবাব দিল না, তেমনি করেই তাকিয়ে রইল, কিন্তু এবারে তার নির্বোধ চোখে কী যেন একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল কামিনীর কাছে।

সহানুভূতিতে মন ছলছলিয়ে উঠল কামিনীর। সত্যিই ভানী হতভাগী, আরো নিজের সঙ্গে তুলনা করলে সে দুর্ভাগ্যের রূপ আর রেখাটা যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। রামনাথ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, অস্বাভাবিক সোহাগের উচ্ছ্বাসে আচ্ছন্ন করে রাখে। আর একা ঘরে রাত কাটায় ভানী; ঠাণ্ডা একটা মাদুরে শুয়ে মড়ার মতো নিঃসাড়ে সারা রাত ঘুমিয়ে কাটায়। নিজের কোনো জীবন নেই, সকলের সঙ্গে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকেই সে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রেখেছে।

কামিনী চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

—কাল তো সব মেলায় যাচ্ছি। যাবি তো তুই?

অনাসক্ত কণ্ঠে ভানী বললে, গিয়ে কী হবে?

—খালি খালি পড়ে থাকবি কেন? কত জিনিস আসবে মেলায়, কত দেখবার জিনিস। নাচ, গান আরো কত কী।

ভানীর মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলা থেকে কেশোলাল তার জন্যে বেলোয়ারী কাচের রঙচঙে চুড়ি কিনে আনত; একবার সুন্দর শিশিতে করে ভালো তেল নিয়ে এসেছিল, মাথায় মাখলে তার মিষ্টি গন্ধটা দুদিন পর্যন্ত ভানীকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু ভানী তো তেল মাখতে জানত না, জটাবাঁধা চুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তেল গড়িয়ে পড়ত তার গায়ে। কেশোলাল আদর করে বলত, তুই একটা জংলী, এ সব বাবুগিরি করা তোর কাজ নয়।

পর্দার আবরণটা ছিঁড়ে আরেক ঝলক আলো এসে পড়ল।

ভানী হঠাৎ যেন জেগে উঠল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো কামিনীর মুখে।

—আচ্ছা দিদি—

—কী বলবি?

—মেলায় তো অনেক লোক আসে, তাই না?

—আসে বই কি।

—তা হলে, তা হলে, সেও তো আসতে পারে?

—কে?

!—অস্ফুট উচ্চারণ করলে ভানী।

—সে আবার কে?—ভানীর কোনো হৃদয় আছে এটা কল্পনা করতে না পেরেই জিজ্ঞাসা করল কামিনী। কিন্তু ভানী আর উত্তর দিল না।

এতক্ষণে কামিনী সব বুঝতে পারল। এই নির্বোধ মেয়েটাকে বাইরে থেকে যা দেখায় তাহলে সে তা নয়। তার মনের প্রচ্ছন্ন প্রান্তে এখনো কেশোলাল আসন জুড়ে রয়েছে, তাকে ভুলতে পারেনি সে। আবার সহানুভূতির একটা প্লাবন এসে কামিনীর মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। এখনো প্রতীক্ষা করে আছে: কেশোলাল আসবে, ওকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবে। কিন্তু—

কিন্তু কী হবে সে কথা বলে। কামিনী আস্তে আস্তে হালকা ভাবে ছেড়ে দিলে কথাটা: আশ্চর্য তো কিছু নয়, কত লোক আসে, কেশোলালও আসতে পারে হয়তো।

ভানী সতৃষ্ণ নয়নে সামনের জনতার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, চলো দিদি, তোমার ধান ভেনে দিই।

এইবার কামিনীই বললে, নাঃ, সে থাক এখন।

সাত

কালো একখানা মেঘের মতো মুখ নিয়ে বিশ্বনাথ ফিরলেন। কাছারীতে খবর নিয়ে শুনলেন, ব্যোমকেশ এখনো আসেনি।

জমাদার বললে, ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আনব হুজুর?

—থাক, দরকার নেই।

দেউড়ি পেরিয়ে, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ভাঙা রংমহল ছাড়িয়ে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন বিশ্বনাথ। অন্তঃপুরের এই একটা জীবন—যা বিশ্বনাথের প্রায়ই মনে পড়ে না এবং বিশ্বনাথকে দেখেও মনে পড়ে না কারো। বরেন্দ্রভূমির রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়ার মতো যার ঘোড়া উড়ে যায়, আর রেসের ঘোড়ার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে উড়তে থাকে যার মন, অন্তঃপুরের একটা নিভৃত পরিবেশে আর প্রগাঢ় একটা বিশ্রান্তির মধ্যে তাকে যেন ভাবাই চলে না। কাল থেকে মহাকাল পেরিয়ে চলে ক্লান্তিহীন পৃথিবী —চলে জীবন। ঘুমিয়ে পড়বার সময় নেই তার। কিন্তু বিশ্বনাথের জীবন কি পৃথিবীর মতো নিয়ন্ত্রিত—অথবা শৃঙ্খলিত তার কক্ষপথের সীমানায়? সে জীবন উল্কার মতো লক্ষ্যভ্রষ্ট একটা আগ্নেয় তীরের মতো—মৃত্যুর অতলতায় যার নির্বাণ।

তবু রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে আছে অন্তঃপুর। আর সেখানে আছেন অপর্ণা। বিধ্বস্ত রাজ্যের রাণী। ভাঙা দেউলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-প্রতিমা।

আফ্রিকার কালো সিংহের মতো উদগ্রযৌবনা ওঁরাও মেয়েদের বাহুবন্ধনে জড়িয়ে

রাত্রির নেশা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। খরধার রক্তে রক্তে জেগে ওঠে ক্ষুধার্ত নেকড়ের পালের মতো মাংস-লোলুপতা। দেহ-যমুনায় নামে বাঁধভাঙা বন্যা। কিন্তু এমনও সময় আসে, যখন বন্যার জল থিতিয়ে মরে যায়, পঙ্কলিপ্ত দেহমন মাঝে মাঝে কী একটা দাবি করে অসহায় শ্রান্তিতে। তখন অপর্ণাকে মনে পড়ে যায়।

অপর্ণা কিন্তু অভিযোগ করেন না, অনুযোগ করেন না কখনো। অদ্ভুত একটা অবস্থা-চক্রে তিনি কুলবধূ হয়েছেন রায়বর্মাদের। নিঃসঙ্গ অন্তঃপুরে তাঁর একাকী দিন কাটে। বিয়ের পরেই টের পেয়েছিলেন অপর্ণা—এ তাঁর কঙ্কাল-বাসর। এখানে প্রাণ নেই, এখানে ছন্দ নেই—এখানকার জীর্ণরিক্ত প্রাসাদে শুধু মৃত অতীতের প্রেতচ্ছায়া।, আর স্বামী! শুধু এই বলে একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় যে স্বামীর সমালোচনার অধিকার তাঁর নেই।

অথচ কী ভাবে বিশ্বনাথের সঙ্গে যে তাঁর বিয়েটা হয়ে গেল, ভাবলে মনে হয় রূপকথা।

বাবা ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। তাঁরই আদর্শে অপর্ণা গড়ে উঠেছিলেন—ছেলেবেলা থেকে চোখের সামনে শুধু জেগে ছিল দেশসেবার একটা সুমহৎ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের প্রেরণাতেই আই-এ পড়বার সময় তিন বছরের জন্যে জেলে যেতে হল তাঁকে; যখন বেরিয়ে এলেন, তখন বাবা মা দুজনেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন।

পৃথিবীতে একা দাঁড়ালেন অপর্ণা।

একটা মেয়ে ইস্কুলে চাকরি নিলেন—আর নিলেন টিউশন। শুধু পড়ানো নয়, গানও শেখাতে হত ছাত্রীকে। আর তারই পাশের বাড়িতে তখন কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন কুমার বিশ্বনাথ।

সেদিন সবে ছাত্রীকে গানের পাঠ দিচ্ছেন। পাশের বাড়ি থেকে তার অনুকরণে একটা ব্যাঙ্গের ঐকতান উঠল।

অসহ্য ক্রোধে মুখচোখ লাল হয়ে উঠল অপর্ণার। তিনি উঠে পড়লেন।

ছাত্রী বললে, ওরা ভারী অসভ্য অপর্ণাদি। আমি গান গাইতে গেলেই অমনি করে চ্যাঁচায়।

অপর্ণা বললেন, আচ্ছা, আমি দেখছি।

সোজা এসে কড়া নাড়লেন দোরগোড়ায়। বেরিয়ে এলেন বিশ্বনাথ।

আরক্ত মুখে অপর্ণা বললেন, এ সমস্ত কী! আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, একটু ডিসেন্সি নেই?

অবাক হয়ে বিশ্বনাথ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অপর্ণার মুখের দিকে। এমন স্পষ্ট, তলোয়ারের মতো এমন উজ্জ্বল মুখ যেন তাঁর চোখে পড়েনি আর। কুমারদহের ক্ষত্রিয়-সুলভ 'শিভালরি' উঠল মাথায় চাড়া দিয়ে, বিশ্বনাথ লজ্জিত হয়ে বললেন, ক্ষমা করবেন।

সেই সূত্রপাত। তারপর থেকে বিশ্বনাথ নিষ্ঠাভরে অপর্ণার অনুসরণ করতে লেগে গেলেন। পথে ঘাটে, পার্কে, ট্রামে বাসে।

দিনকতক দেখে শুনে শেষে একদিন ফিরে দাঁড়ালেন অপর্ণা। সোজা বিশ্বনাথকে প্রশ্ন করে বসলেন: আপনি কি আমায় কিছু বলতে চান?

—হ্যাঁ, চাই।

—তা হলে আসুন এই পার্কে—

দুজনে পার্কে প্রবেশ করলেন। একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন অপর্ণা, বিশ্বনাথকে পাশে বসতে আমন্ত্রণ জানালেন।

দ্বিধাভরে বিশ্বনাথ বললেন, থাক না।

—না, থাকবে না। আজ একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াই ভালো। বলুন, কী বলতে চান।

একটা সিগারেট জ্বালতে গিয়ে তিনটে কাঠি নষ্ট করলেন বিশ্বনাথ। তারপরে বললেন, আপনাকে আমার দরকার।

—মানে?

—আপনাকে—একটা ঢোঁক গিলে বিশ্বনাথ বললেন, আমি বিয়ে করতে চাই।

—বিয়ে!—তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন অপর্ণা: আপনি তো শুনেছি কোথাকার এক রাজকুমার। আর আমার কুলশীল কিছুই আপনার জানা নেই। তবু আপনি আমায় বিয়ে করতে চান?

—চাই।—বিশ্বনাথ আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠলেন: আপনার কুলশীলে আমার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু আপনাকে।

—জানেন. আমি তিন বছর স্বদেশী করে জেল খেটেছিলাম?

—ভালোই তো, আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়ল আপনার উপরে। নরম মিন্‌মিনে মেয়ে আমার বরদাস্ত হবে না। আমিও একটা শক্ত কিছু চাই।

তীব্র চোখে অপর্ণা বললেন, ভয় করবে না?

—না। আমার ঠাকুর্দা বাঘ পুষতেন।

দুজনে দুজনের দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অপর্ণা দাঁড়িয়ে উঠলেন: আমি যাই।

বিশ্বনাথ বললেন, আমার উত্তর?

—দু-চারদিন পরে দেব।

তারপর?

তারপর অপর্ণা ভুললেন। গ্যালান্ট্রির মিথ্যে মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সত্যদৃষ্টি।

চরকা আর খদ্দরের শাড়ি পেছনে ফেলে, দামী বেনারসী আর জড়োয়া গয়নায় সর্বাঙ্গ মুড়ে হাতীর পিঠে রূপোর হাওদায় চড়ে কুমারদহের অন্তঃপুরে ঢুকলেন রাজবধূরূপে। তারপর থেকে মৃত্যুর তৃপ্তি, সমাধির শান্তি তাঁকে ঘিরে রইল।

বিশ্বনাথ যখন অন্তঃপুরে ঢুকলেন, তখন অপর্ণা কী একখানা বই পড়ছিলেন।

বিশ্বনাথ ঘরটার দিকে ভালো করে তাকালেন। আশ্চর্য, মাত্র এই ক মাসের মধ্যেই রাশি রাশি বই কিনেছে অপর্ণা। টেবিলে, শেল্‌ফে, বিছানার ওপর অসংখ্য বই ছড়ানো। এত কী পড়ে অপর্ণা, এত পড়তে কেমন করে ভালো লাগে! বিশ্বনাথ এগিয়ে এলেন,—আস্তে একখানা হাত রাখলেন অপর্ণার কাঁধের ওপর। চমকে মুখ তুলে তাকালেন অপর্ণা, লুটিয়ে পড়া আঁচলটাকে বুকে তুলে নিলেন, তারপর বললেন, কে, কুমার বাহাদুর? এতদিন পরে কি দাসীকে মনে পড়ল?

বিশ্বনাথ কথাটাকে মনে করলেন চমৎকার রসিকতা। আকর্ণবিস্তীর্ণ খানিকটা হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অপর্ণা অনুভব করলেন, শরীরে ও মনে আসুরিক শক্তি থাকলেও বিশ্বনাথ কী অস্বাভাবিক রকম স্থূল, কী অশোভন পরিমাণে অমার্জিত। কলকাতার সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র মতো যেন কোনো ধার-করা দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনাথ, এখন নিঃশেষে নিবে গেছেন, একটা হাউইয়ের শূন্য খোলের মতো পড়ে আছেন মিথ্যে হয়ে। এখন হাসলে উঁচু উঁচু দাঁতগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, গলা পর্যন্ত দেখা যায় মোটা জিভটাকে, চোখ দুটোকে কী পরিমাণে ঘোলা আর দীপ্তিহীন মনে হয়! আশ্চর্য, কী দেখে সেদিন তাঁর এই মানুষটিকে মনে হয়েছিল পুরুষোত্তম বলে?

বিশ্বনাথ প্রসন্নমুখে বললেন, কী বললে? দাসীকে? তুমি তো বেশ জবাব শিখেছ অপর্ণা! হেঃ—হেঃ—হেঃ!

অপর্ণা বললেন, হঠাৎ এই অনুগ্রহ কেন? কোনো আদেশ আছে?

বিশ্বনাথ আবার হেসে উঠলেন, হেঃ—হেঃ—হেঃ।—তারপর কৌচের ওপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন অপর্ণার পাশেই। অপর্ণা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন না, সরেও গেলেন না। জীবন সম্পর্কে তাঁর একটা নির্বেদ এসেছে।

লোলুপ ভাবে অপর্ণার সুগোল সুন্দর শুভ্র একখানি হাত নিজের হাতে টেনে আনলেন বিশ্বনাথ। বললেন, তুমি অমন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা কয়ো না অপর্ণা, ভালো বুঝতে পারি না। আমরা চাষাভুষো মানুষ—লেখাপড়া তো তেমন জানি নে।

এটা বিশ্বনাথের বিনয়—বৈষ্ণবী ধরনের বিনয়। রাজকুমার কলেজে এক সময়ে তিনি বছর পাঁচেক পড়াশোনা করেছিলেন, কিন্তু পাস করতে পারেননি। পাস করবার জন্যে অবশ্য মনের দিক থেকে তাঁর কোনো জোরালো তাগিদও ছিল না। তাই বলে বিশ্বনাথ

সত্যিই নিজের সম্বন্ধে এমন দৈন্য পোষণ করেন না। দেবীকোট-রাজবংশ নিজেদের ছোট বলে মনে করতে জানে না। এটাকে স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা বলেই মেনে নেওয়া উচিত।

—কী পড়ছিলে?

—বই একখানা।

—বই তো বটে, কিন্তু কী বই? উপন্যাস নাকি?

—না।

গভীর বিস্ময়ে বিশ্বনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।—উপন্যাস নয়? মেয়েরা উপন্যাস ছাড়া কী পড়ে আর? তবে কি ধর্মের বই পড়ছিলে? যৌবনে যোগিনী হতে চাও?—স্থূল রসিকতার চেষ্টা করলেন একটা।

—না, তাও নয়।

—তাও নয়? তবে কী বই?—বিশ্বনাথের বিস্ময় ঘনীভূত হল। উপন্যাস নয়, ধর্মের বই নয়; তবে আর কী পড়বার থাকতে পারে দুনিয়ায়? বিশ্বনাথ নিজে অবশ্য কিছুই পড়েন না, কিন্তু তাই বলে কোনো খবরও তিনি রাখেন না নাকি? উপন্যাস আর ধর্মের বই বাদ দিলে মাত্র দুটো জিনিস রইল সংসারে—খবরের কাগজ আর হোমিওপ্যাথি।

—দেখি দেখি বইখানা—হাত বাড়িয়ে অপর্ণার কোলের ওপর থেকে বইখানা নিয়ে এলেন। হুঁ—ইংরেজি বই দেখছি।—অপর্ণা কলেজে পড়েছে বটে কিন্তু তাই বলে ইংরেজি পড়ে সে রস পায় তাতেও সন্দেহ নেই। বিশ্বনাথ একবার সশ্রদ্ধ আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বইয়ের লাল রঙের মলাটটির দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—এ যে মস্ত দাড়িওয়ালা মাথা একটা। কার ছবি? রবি ঠাকুরের নাকি?

অপর্ণার চাপা ঠোঁটের কোণা দুটো সামান্য একটু বিচ্ছুরিত হল মাত্র। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন—না, রবি ঠাকুরের নয়।

—তবে, তবে কার?—বিশ্বনাথ এবার বানান করে বইয়ের নামটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন: প্রিন্. প্রিন্, প্রিন্ কাইপলেস্ অফ্—অফ্ মার—মার—এক্স্—আই—এস্—

অপর্ণা রক্ষা করলেন স্বামীকে। বললেন, থাক, এই বেলা দুটোর সময় আর তোমাকে ও নিয়ে হিমসিম খেতে হবে না। এখন দয়া করে স্নান করতে যাও দেখি।

কথা নেই, বার্তা নেই, বিশ্বনাথের চোখ হঠাৎ দপ্ দপ্ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে গেল সোনাদীঘির মেলার কথা, মনে পড়ল লালা হরিশরণের কথা, মনে পড়ল চারদিক থেকে আসন্নপ্রায় দুর্দিন আর দুর্গতির কথা। চরম অসম্মানের মধ্যে সব হারিয়ে যেতে চলেছে, তলিয়ে যেতে চলেছে দেবীকোট-রাজবংশের এই ঐশ্বর্য—এই প্রতাপ। আর সমস্ত অপমানের মধ্যে অপর্ণাও আজ সুর মিলিয়েছে। বিশ্বনাথ অর্ধ-

শিক্ষিত, ভালো করে ইংরেজি পড়বার যোগ্যতা তাঁর নেই, এ সত্য তাঁর স্ত্রীও আজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় !

আশ্চর্য, বিশ্বনাথ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর মাথার ওপর ধারালো একখানা খড়্গ যে-কোনো সময়ে নেমে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে ? তিনি কি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর যথাসর্বস্ব নিঃশেষে আত্মসাৎ করবার জন্যে সাপের মতো প্যাঁচ কষছেন লালাজী ? আর মাত্র দু ঘণ্টা আগেই তিনি রূপাপুরের কামারদের উদ্‌বুদ্ধ করে এসেছেন—ভাঙতে হবে সোনাদীঘির মেলা, লাঠির মুখে ভেঙে ছত্রাকার করে দিতে হবে এবার। দেখা যাবে, ওই মেলা থেকে কত টাকা কুড়িয়ে নিতে পারে লালা হরিশরণ ?

অন্তঃপুরে আসা মাত্র অপর্ণাকে দেখে তিনি কি সব ভুলে গিয়েছিলেন ? তাঁর মন কি আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে ? তাই অপর্ণার কাছ থেকে এই অবজ্ঞা—এই পুরস্কার ! না, এ চলবে না। ঘরে বাইরে দিন কাটানো চলবে না এই অস্বীকৃতির অবজ্ঞায়। বিশ্বনাথের চোয়ালের হাড় দুটো শক্ত হয়ে উঠল। মুহূর্তমধ্যে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বেরুবার জন্য পা বাড়ালেন। স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন অপর্ণা। সবিস্ময়ে বললেন, এখন আবার কোথায় চললে ? খাবে না, স্নান করবে না ?

বিশ্বনাথ জবাব দিলেন না। একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অপর্ণা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, শুনতে পেলেন সিঁড়ি দিয়ে পদধ্বনি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

—

কাছারীর দিকে পা বাড়াতেই মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—একটা লোক দেখা করতে চায় হুজুর।

—কে ?—জ্বালাভরা তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইলেন বিশ্বনাথ।

—আল্‌কাপের দলের লোক—কী একটা জরুরি কথা বলবে।

—জরুরি কথা ?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, ডেকে নিয়ে এসো।

জরুরি কথা, জরুরি কথা ! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে যেন শব্দ দুটো অনুরণন জাগাতে লাগলো। তাঁর কি সবই জরুরি ? সহজ নেই কিছু, নেই কোনো স্বচ্ছন্দ ছুটির অবকাশ, সরল স্বীকৃতি ? তাঁর কোথাও নিভৃতি নেই, নিঃসঙ্গতা নেই, অন্তঃপুরের জীবনে তাঁর সান্ত্বনা নেই—সেখানে অপর্ণাও তাঁকে ব্যঙ্গ করে ! জীবনের স্রোত কোথাও তাঁর থেমে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারে না মুহূর্তের জন্য, তাকে চলতে হয় অবিরাম—সংঘাতে সংকুল, তরঙ্গে ফেনিল।

—আচ্ছা থাক, আমিই যাচ্ছি।

কিন্তু অন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে কয়েক পা আসতে না আসতেই নিজের মধ্যে

হারিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। ভুলে গেলেন আজ সারাদিন তাঁর খাওয়া হয়নি, ঘোড়ার পিঠে তীব্র চাবুক বসিয়ে ঘূর্ণির মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। কিসের একটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ যেন অনুভূতিগুলোকে তাঁর আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। লালাজীর সেই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঙ্গবিদ্ধ হাসি, বিনয়-বিগলিত কথার ভঙ্গিতে উদ্ধত অবজ্ঞা, চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসা সংকটের করাল ছায়ামূর্তি—কোনটাই তাঁকে এত শীর্ণ আর সংকুচিত করে দেয়নি। রূপাপুরের কামারেরা হাতিয়ার ধরেছে—এই সোনাদীঘির মেলায় লালাজীর সঙ্গে সত্যিকারের একটা শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাবে। তার জন্যে দেবীকোট-রাজবংশ চিরদিন প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু অপর্ণা?

একথা সত্যি, তাঁর বিরুদ্ধে অপর্ণার অভিযোগ অনেক আছে। তাঁর নিজের জীবন এত বহির্মুখী যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অপর্ণার অভাব কখনো তাঁকে পীড়া দেয় না। ওঁরাও মেয়েদের বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহে যে প্রখর যৌবনের আগুন জ্বলে—সে দীপ্তি অপর্ণার কোথায়? সত্যি কথা, অপর্ণাকে তাঁর মনে থাকে না। কলকাতায় যে অপর্ণাকে সেই সেদিন অস্বাভাবিক বিচিত্র মনে হয়েছিল, পরিবেশ থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়ে সে অপর্ণা সব গৌরব হারিয়েছে, হারিয়েছে নিজের স্বাতন্ত্র্য। তার ওপর আজ তো বিশেষ করে কোনো লোভ জাগে না বিশ্বনাথের! তা হোক। কিন্তু তাই বলে কোন্ অধিকারে অপর্ণা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে পারে, ব্যঙ্গ করতে পারে তাঁর নিরক্ষরতাকে? আর সত্যিই তো তিনি মূর্খ নন। মোটা মোটা ইংরেজি বই পড়ে অপর্ণা হয়তো বুঝতে পারে, তিনি পারেন না, কিন্তু তাতে কী আসে যায়! তাঁর অমিত পৌরুষ—তাঁর শক্তি—

কিন্তু দাঁড়াও! বিশ্বনাথের মনের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়ে তাঁর চিন্তাকে স্তব্ধ করে দিল। পৌরুষ আর শক্তি! যার জমিদারীর একখানার পর একখানা মহল দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়, লাটের খাজনা দেবার জন্য ঘোড়ার সহিস রামসুন্দর লালার বংশধরের কাছে গিয়ে যাকে নতজানু হয়ে দাঁড়াতে হয়, তার শক্তি আর পৌরুষ! তার দাম কী! তার মূল্য কতটুকু!

তাহলে—তাহলে—অপর্ণার এই ব্যঙ্গের পেছনে তার কি কোনো ইঙ্গিত আছে? কোনো কটাক্ষ কি আছে এই দুর্বলতাকে লক্ষ্য করে? অপর্ণা কি সত্যই ভেবেছে, যেদিন সব দিক থেকে মৃত্যু আর পরাজয় নেমে আসবে বিশ্বনাথের ওপর, সেদিন সে আবার বিজয়িনীর মতো ফিরে যাবে তার মাস্টারীর জীবনে? আবার সে জেল খাটতে চলে যাবে নিজের স্বচ্ছন্দ গৌরব নিয়ে? না, কখনোই তা হতে দেওয়া যাবে না। এতবড় অপমান সইবার আগে—

বিশ্বনাথ একবার থেমে দাঁড়ালেন।

মতিয়া পেছনে ছায়ামূর্তির মতো অনুসরণ করে আসছিল, বিশ্বনাথ তাকে লক্ষ্য করেন-

নি। তিনি থেমে দাঁড়াতেই সসংকোচে নিবেদন জানাল—হুজুর, রাণীজী বললেন—

রাণীজী! দুই চোখে আগুন বর্ষণ করে বিশ্বনাথ মতিয়ার দিকে তাকালেন। ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস। বিশ্বনাথের পায়ের চটিজোড়ার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মতিয়া জানাল—রাণীজী বললেন, চান করে—

—নাঃ, যা তুই সামনে থেকে।—হন হন করে এগিয়ে গেলেন বিশ্বনাথ। মতিয়ার ভারী বিস্ময় বোধ হল—হুজুরের আজকে এত সংযম কেন? ওই চোখের দৃষ্টি তো তার চেনা। কারণে অকারণে ওরা যখনই ধকধক করে উঠেছে, তখনই দু-চার ঘা জুতো ধপাধপ তার পিঠে এসে পড়েছে। রাগের ওপরে অনেকে জিনিসপত্র যেমন আছড়ে ভেঙে ফেলে, বিশ্বনাথের কোপটাও সেই রকম মতিয়ার পৃষ্ঠের ওপরেই প্রশমিত হয়ে থাকে। আজ যেন তার ব্যতিক্রম ঘটল। মতিয়া অবাক হয়ে ভাবতে লাগল: হুজুরের শরীর-টরীর খারাপ করল না তো?

বিশ্বনাথ রংমহলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু মনে পড়ে গেল, আর একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসে বসে আছে। আর একটা লোক। একটা গভীর বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল—একটি মুহূর্ত এরা কি তাঁকে ভাবতে দেবে না, আত্মগোপন করতে দেবে না নিজের অবকাশের মধ্যে? কে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে সবই অনুমান করা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। যেচে কেউ খাজনা দিতে আসেনি, অপ্রত্যাশিত সুসংবাদও বয়ে আনেনি কেউ। হয়তো ফরিয়াদ, হয়তো হাতে-পায়ে ধরে কোনো একটা কিছু মাপ করিয়ে নিতে চায়—নয় কোনো দুঃসংবাদ। কোনো মহাজনের তাগিদদার হওয়াও বিচিত্র নয়। একবার মনে হল লোকটাকে পত্রপাঠ বিদায় দেবার কথা। কিন্তু নাঃ—ও পাপ একেবারে মিটিয়ে দেওয়াই ভালো।

যে এসেছিল, কাছারীবাড়ির দাওয়ার ছায়ার নিচে একটা তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো সে তখন জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। অনেকটা পথ তাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। তার শরীর দুর্বল—রাত থেকে যে জ্বরটা ধরেছে এখনো ছাড়েনি। অসহ্য রৌদ্র আর দমকা হাওয়ায় উড়ে আসা রাশি রাশি ধুলোতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তার গুণে গুণে আসতে হয়েছে; যতবার কাশি এসেছে, ধুলোর সঙ্গে মিশে চাপ চাপ রক্ত বেরিয়েছে, মুখ মুছতে গিয়ে ময়লা চাদরের প্রান্তটা তার রক্তে রাঙা আর আঠালো হয়ে গেছে। লোকটা আর কেউ নয়—কালীবিলাস কুণ্ডু।

দাওয়ার নিচে মূর্ছিতের মতো বসে আছে কালীবিলাস। ক্লান্ত নিশ্বাসে বুকটা থর থর করে কাঁপছে, জিভটা আপনা থেকেই বাইরে ঝুলে নেমেছে। দেউড়ির দারোয়ানটা অনেকক্ষণ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাকে; কী একটা প্রশ্ন জাগছে তার মনে, কিন্তু কাছে এসে কিছু বলতে পারছে না। চোখ দুটো যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে

আসছে কালীবিলাসের, প্রাণপণে মেলে রাখবার চেষ্টা করছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকেই। শুধু একবার স্বপ্নের মতো কাছারীবাড়ি, ফাটলধরা দেউড়ি, দেউড়ির দরজায় পা-ভাঙা একটা সিংহ, অস্পষ্ট আকার নিয়ে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত তন্দ্রা যেন ভিড় করে ভেঙে পড়েছে কালীবিলাসের সর্বাঙ্গে—তাকে তলিয়ে নিতে চায়, তাকে যেন আর জাগাবে না। আচমকা মনে হল সামনে অনেকগুলো ঝাড়-লণ্ঠন, অনেক আলোর কোলাহল। যাত্রার আসর বসেছে নাকি! হ্যাঁ, যাত্রাই তো! বিস্মিত কালীবিলাস দেখতে পেল, বহুদিন পরে আবার অধিকারী মশাই নেমেছেন গাইতে। পরনে গেরুয়া পোশাক, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি; তাঁর তেজস্বী ভারী মুখখানা ঝাড়লণ্ঠনের আলোতে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বেহালার ছড়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বাজছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বাজছে তাঁর কণ্ঠ:

"দিন এসেছে, ডাক এসেছে,
আজকে মায়ের শেষ বলি,
কে দিবি আয় মায়ের পায়ে
রক্তজবার অঞ্জলি।"

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত গলা খেলছে অধিকারী মশাইয়ের! যতদিন কালীবিলাস তাঁর দলে ছিল ততদিন তাঁকে এমন প্রাণ দিয়ে গান গাইতে সে তো শোনেনি! কী আশ্চর্য সুর, কী আশ্চর্য গলার কাজ! এমন করে বেহালা বাজাচ্ছে কে? কালীবিলাস লোকটার দিকে তাকালো, তার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু অপূর্ব বেহালা বাজিয়ে চলেছে সে—যেমন গান, তেমনি তার বেহালার ঝঙ্কার!

"কে দিবি আয় মায়ের পায়ে রক্তজবার অঞ্জলি"—কথা আর সুরের অপরূপ সমন্বয় হয়েছে। অধিকারী মশাইয়ের মুখখানা জ্বলছে, একটা আশ্চর্য জ্যোতি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে যেন ছড়িয়ে পড়ছে। কালীবিলাসের ভালো লাগতে লাগল—অদ্ভুতভাবে ভালো লাগতে লাগল। আকস্মিক একটা আনন্দের জোয়ার যেন বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে। কিন্তু আনন্দ তরঙ্গের দোলায় বুকের ভেতর এত জ্বালা করে কেন, এমন ভাবে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কেন! অধিকারী মশাই কি এবার তাঁর দিকে তাকালেন? গানের সুরটা কি থেমে গেল? বেহালার টান কি আর শোনা যায় না?

—কে তুমি, কী চাও?

কে জিজ্ঞাসা করছে? অধিকারী মশাই কি তাকে চিনতে পারছেন না? পাঁচ বছরেই তিনি কি তাকে ভুলে গেলেন? যাত্রার আসরটা আর দেখা যায় না কেন? মুহূর্তে সব যেন গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সে কোথায়? বুকের মধ্যে সেই তীব্র জ্বালাটা বেশি স্পষ্ট, নিশ্বাস নিতে বড় বেশি কষ্ট হয়।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন? কী হয়েছে?

কী হয়েছে? কী হবে আবার? কালীবিলাসের ঘুম পেয়েছে, বড় বেশি ঘুম পেয়েছে। আর সে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না, তাকাতে চায়ও না। এই ঘুমটা তার অত্যন্ত ভালো লাগছে। কে ডাকে—ব্রজহরি? ভূষ্ণা? নাঃ, সে ওদের দলে আর যাবে না! বেজাটা ছোটলোক, অধিকারী মশাইকে নিন্দে করে, কু-কথা বলে। তার চাইতে এখানে ঘুমোনোই ভালো—ঘুমটি বেশ জমে এসেছে। আর সে সাড়া দেবে না, চোখ মেলেও তাকাবে না!—না—না।

বিশ্বনাথ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, লোকটা কে? অমন করছে কেন?

ব্যোমকেশ কালীবিলাসকে চিনতেন। বললেন, এ তো ব্রজ পালের দলের লোক' কালী কুণ্ডু। কি বলতে এসেছে কে জানে। এতদূর হেঁটে এসে বোধ হয় হয়রান হয়ে পড়েছে—তাই—কিন্তু এ কি? মরে গেল নাকি লোকটা?

—মরে গেল!—বিশ্বনাথ বললেন, সে কি কথা! মরে যাবে কেন?

মতিয়া ঝুঁকে পড়ে একবারটি পর্যবেক্ষণ করলে কালীবিলাসকে। তারপর পেছনে সরে গেল। বললে, হাঁ হুজুর, একদম মরে গেছে। মুখের ভেতর এক চাপ রক্ত জমে রয়েছে।

বিস্ময়-ব্যাকুল চোখে কালীবিলাসের চিরনিদ্রিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বনাথ। মরে গেল, এত সহজেই শেষ হয়ে গেল সমস্ত! এই কি মানুষের জীবনের মূল্য!

ব্রজহরি আল্‌কাপের দল ততক্ষণে খেয়া পাড়ি দিয়ে মামুদপুরের টাল ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

আট

কুমার বিশ্বনাথ চলে যাওয়ার পর লালা হরিশরণ এসে বসলেন বাইরের গদীতে। বেলা অনেক হয়েছে, এ সময়টা হরিশরণ ওপরের মহলে গিয়েই বিশ্রাম করেন। কিন্তু আজ আর গেলেন না। রামদেইয়া গড়গড়া সাজিয়ে নিয়ে এল। মোটা গির্দা বালিশটায় হেলান দিয়ে নিজের ভেতরেই ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন হরিশরণ।

কাজ—কাজ—কাজ। পনেরো বছর বয়সে তিনি ব্যবসায় ঢুকেছিলেন, আজ তাঁর বয়স সাতান্ন। বেয়াল্লিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে নিজেই টের পাননি তিনি। খ্যাতির দিকে লোভ ছিল না, প্রতিপত্তির দিকে লক্ষ্য ছিল না। টাকা চাই, ব্যবসাকে বড় করা চাই। বড় হওয়ার কি শেষ আছে, কোথাও কি কোনো সীমারেখা টানা আছে তার? বিষ্ণুশরণ লালা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে দিন চলে যেত—হয়তো ভালোই চলে

যেত। কিন্তু হরিশরণ বাঙালি জমিদারের ছেলে নন, বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তিকে দু হাতে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত নবাবী করবার মনোবৃত্তি তাঁর নয়। তা যদি হত—তা হলে শূন্যদম্ভের বোঝা নিয়ে আজ তাঁকে কুমার বিশ্বনাথের মতো মহাজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হত ঋণের প্রত্যাশায়।

কুমার বিশ্বনাথ!—লালাজী করুণার হাসি হাসলেন।

কী মূল্য অহমিকার, কতটুকুই বা দাম অর্থহীন আত্মমর্যাদার! বিদ্রোহী প্রজার ঘরে আগুন লাগানো? তার বাড়ির মেয়েদের টেনে এনে কাছারীর পেয়াদার হাতে সমর্পণ করা? কী লাভ হয় তাতে? মামলা হয়, মোকদ্দমা হয়, নিজের জেদের খেসারত দিতে হয় অনাবশ্যক অপব্যয় করে। শুধু কি তাই? একজন বিদ্রোহী প্রজাকে সায়েস্তা করতে গিয়ে দশজন বিদ্রোহী হয়; স্ফুলিঙ্গকে ইন্ধন জ্বালিয়ে তোলা হয় সর্বগ্রাসী বিশাল অগ্নিকুণ্ড, সেই আগুন একদিন এসে নিজেকেই গ্রাস করে বসে। লালা হরিশরণ ইতিহাস পড়েননি—কিন্তু লোকচরিত্র তিনি জানেন। ক্ষমতার অন্ধ অহঙ্কারে অস্ত্রাঘাত করতে করতে সেই অস্ত্র একদিন প্রতিহত হয়ে আসে—লাগে নিজের গলাতেই। অত্যাচারের রূপটা স্পষ্ট হয় যত বেশি—বিদ্রোহের রক্তবীজ ততই বেশি পরিমাণে বংশবিস্তার করে। এ কথা আজ কুমার বিশ্বনাথকে দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেখতে পান। বিশ্বনাথের প্রজারা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়, তারা খাজনা দিতে চায় না, তারা কৃষক ইউনিয়ন গড়ে তোলে, মামলা-মোকদ্দমা করে তাঁর যথাসর্বস্ব আজকে যেতে বসেছে। আর তাঁর এলাকাতে যারা কৃষক ইউনিয়নের পাণ্ডা, তাদের খাজনা তিনি মাপ করেছেন—বিনা সেলামীতে জমি বিলি করে দিয়েছেন। গ্রামে টিউব-ওয়েল বসিয়েছেন, স্কুল খুলে দিয়েছেন। ফল কী দাঁড়িয়েছে? হরিশরণ আবার হাসলেন। আজ তিনি একজন আদর্শ জমিদার, গরীবের মা-বাপ তিনি; গরীবেরা তাঁর জমিদারীকে বলে রামরাজ্য।

আর অহমিকা? পাঁচ বছর আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটা আজো যেমন উপভোগ্য তেমনি উপাদেয় বোধ হয়।

একটা ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স অফিসার, কত টাকা মাইনে পায় সে? তিন শো, চার শো, পাঁচ শো, ছ শো! ঠিক জানেন না তিনি। মনে আছে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের দরবার করতে তাঁকে নিজেই যেতে হয়েছিল তার কাছে। চলনে-বলনে পুরো সাহেবী ধাঁচ লোকটার, চিবিয়ে চিবিয়ে বিলিতী কায়দায় কথা বলে আর পাইপ খায়। লালাজীকে সামনের চেয়ারে বসতে বলা তো দূরের কথা, চোখের কোণে ভালো করে তাকিয়ে অবধি দেখেনি। তারপর খাতাপত্র নিয়ে তার সে কি গর্জন আর হুঙ্কার! যেন গভর্ণমেণ্টের টাকা আত্মসাৎ করবার জন্যে দুনিয়াশুদ্ধ লোক মুখিয়ে বসে আছে, আর যেমন করে

হোক এই সমস্ত দুর্জনদের সায়েস্তা সে করবেই—এই তার ব্রত।

প্রচুর গালাগালি এবং তর্জন হজম করেও লালাজী একটি কথা বলেননি, তাঁর মুখের একটি রেখারও স্থানচ্যুতি ঘটেনি। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন যে পাঁচশো টাকা মাইনের একটা ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসারকে চাকর রেখে তিনি জুতো বুরুশ করাতে পারেন। কিন্তু সেটা তিনি বলেননি। যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর কৃপা না করলে তাঁকে সগোষ্ঠী উপোস করতে হবে, ভাসতে হবে অকূল পাথারে। অতএব—

সময়বিশেষে আরসোলাও পাখি হয়, সুতরাং তিনি যত শান্তিবারি সেচন করেছেন, মহামহিমান্বিত হুজুর দড়ির গিঁঠের মতো ভিজে ভিজে তত বেশি শক্ত আর জটিল হয়ে উঠেছেন। রাশি রাশি অপমান হজম করে কঠিন আর কালো মুখে বেরিয়ে এসেছেন লালাজী। শুধু ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসের কম্পাউণ্ড পার হওয়ার পরে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—'লাট বন্ গিয়া শালা শূয়ারকা বাচ্চা।'

তার দু বছর পরে ছোটলাট যখন সত্যিই জেলা সফরে আসেন, তখন লাটসাহেবের খানাতে লালাজীরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। মাথার জরির পাগড়ি আর দিল্লীর বহুমূল্য আচকান পরে যখন লালাজী টি-পার্টির তাঁবুর সামনে নামলেন তাঁর ঝকঝকে বড় ক্রাইস্‌লার থেকে, তখন সর্বপ্রথম তাঁর চোখে পড়েছিল স্যুট পরে দূরে দাঁড়িয়ে সেই ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসার। তার মুখে সে পাইপ নেই, সে সিংহগর্জনও নেই। ম্লান, বিষণ্ণ এবং ভীত তার চোখের দৃষ্টি; সেই সঙ্গে একটা অক্ষম লোলুপতা—বেশ বোঝা যায়, এখানে ঢোকবার যোগ্যতা সে অর্জন করেনি। তাঁবুর সামনে রেশমী পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত চেয়ার আর টেবিলের সারি, রাশি রাশি ফল, ফুল, আর বিলিতী সুখাদ্যের সমারোহ। তীর্থের কাকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে সেদিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফেলেছে—ঘ্রাণেই যতটুকু হয়। তার আশেপাশে আরো দু-চারজন তার সগোত্রীয়, দেখেই সান্ত্বনা।

লালাজী নেমে কার্ড বার করলেন, তকমাআঁটা চাপরাশী সেলাম করে পথ দেখিয়ে দিলে। ভেতরে ঢুকবার আগে লালাজী একবার পেছন ফিরে তাকালেন হুজুরের দিকে। হুজুর তাঁকে চিনেছে, কোনো সন্দেহ নেই। পলকে তার মুখের চেহারা বদলে গেল, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালটা মুছল একবার, তারপর বড় বড় পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালাজী সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

কিন্তু কাজ—কাজ—আর কাজ—কোনো অপমান, কোনো দাম্ভিকতা কাজের পথ থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেনি। টাকা চাই, যেমন করে হোক বড় হতে হবে। এই বোধটা

যদি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থাকত তা হলে ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসারকে ওভাবে তোষামোদ করে পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক খরচ বাঁচাতে পারতেন না তিনি।

বাইরে বেড়ে চলেছে বেলা। আর অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়ে গেছে প্রসাদা-কাঙ্ক্ষীর দল। গড়গড়ার নল থেকে এখন আর ধোঁয়া ওঠে না, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে পাশে সরিয়ে রাখলেন লালাজী। সত্যি, অনেক করলেন তিনি জীবনে। আর অনেক না করেই কি পাওয়া যায় অনেক? সেদিন ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসারকে খোসামোদ করতে হয়েছিল বলেই পরে বাংলার গভর্ণর এসে দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁর প্রাসাদের?

কিন্তু আর নয়—এবার বিশ্রাম করা প্রয়োজন। ঐশ্বর্য শুধু তো অর্জনের জন্যেই নয়, তাকে তো ভোগ করতেও হবে। বয়স অবশ্য কিছু বেশি হয়ে গেছে, তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতো অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আনন্দ সম্ভোগের স্পৃহাও তাঁর নেই, চরিত্রে নিষ্ঠার মূল্যও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি এবারে বিশ্রাম করবেন আর ভোগ করবেন তাঁর যা প্রাপ্য, তাঁর রাজমর্যাদা। কুমারদহ ফাঁকির ওপর দিয়ে ব্যবসা চালিয়েছে অনেককাল, গায়ের জোরে আদায় করেছে সেলামী। কিন্তু আর সে সুযোগ তাদের দেওয়া চলবে না। সোনাদীঘির মেলা তার প্রথম পর্যায় মাত্র। রামসুন্দর লালা যে একদিন কুমারদহের রাজবাড়িতে ঘোড়ার সহিসের কাজ করতেন, এই সত্যকে মুছে ফেলতে হবে, এই কলঙ্ককে আর সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে আত্মপ্রকাশের অধিকার দেওয়া চলবে না।

হয়তো কুমারদহকে গ্রাস করলেও চলে। হয়তো এমনিতেই আর একটা নতুন গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা যায়—নাম দেওয়া যায় হরিশরণপুর। কিন্তু না—ওই কুমারদহকেই তাঁর চাই। ওরই মৃতস্তূপের ওপর গড়ে উঠবে তাঁর জয়সৌধ, তাঁর কীর্তির গৌরবধ্বজা।

—রামদেইয়া?

—জী!

রামদেইয়া সামনে এসে দাঁড়াল। কোমরের ঘুন্‌সী থেকে এক গোছা চাবি বের করে লোহার সিন্দুক খুলে ফেললেন লালাজী, তারপর বার করে আনলেন এক তাড়া নোট আর কতকগুলো কাগজ, বললেন, একটু বেরুতে হবে, কুমারদহ যাব।

রামদেইয়া কোন প্রশ্ন করল না, কৌতূহলও জানাল না সে, এইটুকুই জানে যে, হরিশরণ ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে তিনি কিছুমাত্র আলস্য বা আরামের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। শুধু জিজ্ঞাসুভাবে যেন নিজের সম্বন্ধে কী কর্তব্য সেটা জানাবার জন্যেই বললে—জী?

—বড় ঘোড়াটা ঠিক আছে?

—জী হাঁ মহাজন!

—কেমন চলবে? জোর কদম?—লালাজীর চোখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: কুমার সাহেবের

ঘোড়াটার চাইতে আরো জোরে ছুটতে পারবে তো?

—কুমার সাহেবের ঘোড়া? ভ্রূ কুঞ্চন করে চিন্তা করতে লাগল রামদেইয়া : না হুজুর, অত ছুটতে পারবে না। ওটা খেলোয়াড় ঘোড়া, বহুৎ তাকৎ।

—তা হলে কুমার বাহাদুরের এখনো কিছু কিছু আছে যা আমার নেই! হরিশরণ হঠাৎ সকৌতুকে হেসে উঠলেন, হাঁ হাঁ আছে বৈকি! ওই দারুর বোতল। আমার সাধ্য নেই—ওখানে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। সাহেব-মেমদের বহুৎ দারু খাইয়েছি, কিন্তু মহাবীরজীর দয়ায় ও হারামী চীজ খাওয়ার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন।

রামদেইয়া এতক্ষণ পরে যেন একটা ভালো কথা বলবার সুযোগ পেল।

—ও বড় শয়তান চিজ হুজুর। মাথায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়।

—হুঁ, সে তো কুমার বাহাদুরকে দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু—কিন্তু—লালাজী নিজের মধ্যেই আবার তলিয়ে গেলেন : ঘোড়াটা অত জোর চলতে পারবে না সত্যিই?

রামদেইয়া নিরাশভাবে মাথা নাড়ল।

—নাঃ। এবার একটা কাম করুন না মহাজন। কলকাতা থেকে বড় একটা ওয়েলার কিনে আনুন, আমি তালিম দিয়ে তাকে ওই ঘোড়ার চাইতে আচ্ছা করে দেব।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। কিন্তু—কিন্তু—লালাজীর চোখ আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল : ঠিক হুয়া। তুই হাওয়া গাড়িটাকেই বার করতে বলে দে।

—হাওয়া গাড়ি?—এবারে রামদেইয়াও যেন বিস্মিত হয়ে উঠল : হাওয়া গাড়ি নিয়ে যাবেন কুমারদয়? রাস্তা যে ভারী খারাপ হুজুর, গাড়ি একদম বরবাদ হয়ে যাবে।

—বরবাদ হয়ে গেলে দোসরা গাড়ি কেনা যাবে। তুই গাড়ি বার করতে বল্, আমি জামা-কাপড় পরে আসছি। আর, আর—লালাজী হঠাৎ হাসলেন : একটা হাতিয়ারও সঙ্গে নিই, কী জানি, রাজারাজড়ার ব্যাপার!

—হাতিয়ার? পিস্তল?

—হুঁ।

রামদেইয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল কপালে : হাতিয়ার কী হবে মহাজন?

—কাজে লাগতে পারে হয়তো।

—মারামারি? হাঙ্গামা? জমি নিয়ে কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?—উত্তেজিত ও সন্ত্রস্ত রামদেইয়া যেন প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে লাগল : তাহলে হুজুরের যাওয়ার দরকার কী? বরকন্দাজ যাক্, লাঠি যাক্, থানায় একটা খবর দেই। আমরা—

হরিশরণ প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন এইবার।

—না, না, ওসব কিছু করতে হবে না। আমি যা বলি তাই শুনে যা খালি। হাওয়া গাড়ি বার করতে বল্। আর আমি একাই যাব, সঙ্গে যেতে হবে না কাউকে।

নোট আর কাগজপত্রগুলো মুঠো করে নিয়ে হরিশরণ অন্দরের দিকে অগ্রসর হলেন।

* * * *

মোটর লালাজীর আছে বটে, আশেপাশেও চলে, কিন্তু কুমারদহের রাস্তা এত দুর্গম যে সে পথে মোটর চালানো প্রায় অসম্ভব। গোরুর গাড়ির কল্যাণে রাস্তার সর্বাঙ্গে রাশি রাশি গর্ত ; প্রতি পদে তার ভেতর আটকে যেতে পারে মোটরের চাকা। মাঝে মাঝে সে গর্ত এত গভীর যে তাতে বছরের প্রায় ছ মাস কাদা জমে থাকে। এঁটেল মাটির সে কাদা আঠার মতই শক্ত—গোরুর গাড়ির চাকা আঁকড়ে ধরে, বলদের পা একবার তাতে পড়লে টেনে তোলা যায় না। তা ছাড়া রাস্তার দুপাশে নয়ানজুলি, পথ তৈয়ারী করবার সময় লোকাল বোর্ড ওখান থেকে কেটে কেটে মাটি তুলেছিল। খানিকটা ঘোলা আর অপরিচ্ছন্ন জল জমে রয়েছে নয়ানজুলিতে, উঠছে কাদার একটা দুর্গন্ধ। মোটরের চাকা একটুখানি বেসামাল হয়ে গেলে সোজা ডিগবাজী দিয়ে ওই জলের মধ্যেই আশ্রয় নিতে হবে।

অসমতল বন্ধুর পথে ক্রমাগত ঝাঁকুনি খেতে খেতে লালাজীর মোটর এগিয়ে চলল। পাঁচ মাইল পথ যেন পঁচিশ মাইলের চাইতেও দুর্গম হয়ে উঠেছে। মোটরের শব্দে দুপাশের মাঠের গোরুর দল চকিত হয়ে উঠল, কেউ কেউ বা উধ্বর্শ্বাসেই ছুটতে শুরু করে দিলে। বাইরে থেকে রাশি রাশি ধুলো এসে পড়তে লাগল লালাজীর মুখে। তারপর আরো খানিকটা এগিয়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি ঢুকল কুমারদয়।

দুপাশের ভাঙা বাড়ি ঝুঁকে পড়েছে, জংলা আমের বনের মধ্যে মজা দীঘির বুকের উপর অন্ধকারের ছায়া নেমেছে। মোটরের আবির্ভাবে এই দুপুরেই কোথা থেকে দুটো প্যাঁচা উড়ে গেল। কচুরীপানার স্তরের ওপরে বসে যে আলাদ গোখুর নিজের একরাশ নীল ডিমের পাহারা দিচ্ছিল—চট করে জলের তলায় লুকিয়ে গেল সে। চোখে পড়ল রায়বর্মাদের ভাঙা দেউড়ি, রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার আমলে যাকে বলত সিংহদ্বার। সিংহ-দ্বারে পাথরের সিংহ এখনো বীরবিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের রঙ মলিন আর বিবর্ণ, একটা দাঁড়িয়ে আছে তিন পায়ে, তার লেজটাও খসে পড়েছে ; আর একটার মাথাই নেই, শুধু গলার ফোলানো কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছে দু-তিনটি চড়াই পাখি। দেউড়ির সামনে মোটরটা থামতেই চড়াই পাখিরা উধ্বর্শ্বাসে পালিয়ে গেল।

অন্তঃপুরের দোতলাতে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অপর্ণা। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে প্রসারিত—যেখানে নীলের বিস্তৃত পটভূমিতে শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, উড়ছে শঙ্খচিল। মন মুক্তি চায়, উড়তে চায় ওই শঙ্খচিলের মতো। কিন্তু সে মুক্তি নিতে হলে বিলিতী বইয়ের 'নোরা'র মতো বেরিয়ে পড়তে হয়, 'আইরীণে'র মতো উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অনুপ্রেরণায় ; কিন্তু অত সুলভ রোমান্স অপর্ণার

নেই। রাজনীতি করেছেন, জেল খেটেছেন, জীবনকে দেখতে শিখেছেন অন্য চোখ দিয়ে। কী জীবন কেটেছে কলকাতায়! শীতের দীর্ঘ নিদ্রার পর পাহাড়ের গুহা থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে ক্ষুধার্ত আর বিশালকায় অজগর—তেমন প্রকাণ্ড এক ভুখা মিছিল প্রসারিত হয়ে গেছে হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রীট পর্যন্ত। ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে জয়ধ্বনি তুলে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা ছাত্র-তরঙ্গ, মিশল সেই বিরাট মিছিলের সঙ্গে। সকলের পুরোভাগে রক্ত-পতাকা বয়ে অপর্ণা। একটা লালমুখ সার্জেন্ট মোটর সাইকেল থেকে নেমে উঠে দাঁড়াল ফুটপাথে, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর শঙ্কিত চোখে লক্ষ্য করতে লাগল এই বিরাট জনযাত্রাকে। তারপর ওয়েলিংটনে জনসভা। নতুন মুক্তি, নতুন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে মানবতার উদয়-দিগন্তে।

আশ্চর্য—সেই অপর্ণা আজ কুমার বিশ্বনাথের স্ত্রী! কুমার বিশ্বনাথ—সমাজতন্ত্রের আত্মঘাতী ধ্বংসস্তূপ! তার সঙ্গে অপর্ণাকে আজ মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু শুধু মানিয়ে নেওয়ার কাজই তো অপর্ণার নয়। জয় করতে হবে বিশ্বনাথকে, তাকে নামিয়ে আনতে হবে তাঁর ব্রতের মধ্যে। অপর্ণা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছেন। সম্রাটের ঔদ্ধত্য, রাজ-শক্তির একটা দৃঢ় কঠোর মর্যাদাবোধ বহন করে বিশ্বনাথ তাঁকে এখনো উপেক্ষা করে চলেছেন, অস্বীকার করে চলেছেন। এই পরিবারে অন্তঃপুরিকাদের যে প্রাণহীন বিলাস-মূল্য পুরুষানুক্রমিক ধরে নির্ধারিত হয়ে এসেছে, সেই মূল্যই পেয়েছেন অপর্ণা। কিন্তু সম্রাটের সাম্রাজ্যে আজ ভাঙন ধরেছে। তাকেও নেমে আসতে হবে, কিন্তু কোথায়? সম্রাট আর সর্বহারার মধ্যে কোনো মাঝামাঝি স্তরভেদ নেই—তার শক্তি দুর্বার আর প্রচণ্ড—শুধু সে শক্তি প্রকাশের প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু সম্রাটের পরিবর্তনও একদিন আসবে—অপর্ণা আছেন তারই প্রতীক্ষাতে।

মোটরের শব্দে অপর্ণার চমক ভাঙল। কে এল? পুলিসের লোক নয় তো? বিশ্বনাথ সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নয়। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। অপর্ণা ডাকলেন, মতিয়া?

মতিয়া সামনে এসে দাঁড়াল।

—মোটরে কে এল দেখে আয় তো।

মোটর? মতিয়ার মনও শঙ্কিত আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। দ্রুতগতিতে নেমে গেল সে।

আর ওদিকে লালাজী দেউড়ি পার হয়ে ঢুকলেন সোজা কাছারীবাড়ির মহলে। কালীবিলাসের মৃতদেহের সামনে বিশ্বনাথ যেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হরিশরণ সেখানেই দর্শন দিলেন এসে। চমকে ফিরে তাকালেন বিশ্বনাথ।

—রাম রাম।

—রাম রাম।—বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে বললেন, এ কি, লালাজী?

—হাঁ, হুজুরের টাকাটা দেবার জন্য—

—এই সময়ে এত কষ্ট করে!—কথাটা বলতে গিয়ে সৌজন্যের চাইতে সন্দেহই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল বিশ্বনাথের গলায়, এর পেছনে হরিশরণের কোনো রকম একটা চাল নেই তো? অথবা সোনাদীঘির মেলাটা যত তাড়াতাড়ি বাগিয়ে নেওয়া যায়, সেই আশাতেই?

বিশ্বনাথের দৃষ্টির প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েই যেন কথা বললেন লালাজী। অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে বললেন, হাঁ—যখন জরুরি দরকার। আমরা তো গোলাম—মর্জিবের সুবিধে সব সময়েই নজর রাখতে হয়। কিন্তু এ কি ব্যাপার? এ লোকটা কে পড়ে আছে এখানে?

অসীম বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিশ্বনাথ বললেন, কে জানে, ঠিক বুঝতে পারছি না। কী একটা খবর দিতে এসেছিল আল্‌কাপের দল থেকে—

আল্‌কাপের দল! লালাজীর ভাবান্তর ঘটল, বিচক্ষণ আর তীক্ষ্ণ চোখ গিয়ে পড়ল কালীবিলাসের মৃত্যুপাণ্ডুর আব রক্তকলঙ্কিত মুখের ওপর। লোকটাকে চিনেছেন। সমস্ত মনটা চমকে উঠল, মনে হল—

বিশ্বনাথ বললেন, থাক, ওপরে চলুন।

লালাজীর কণ্ঠস্বরে কিছু টের পাওয়া গেল না। তেমনি শান্ত কোমল গলাতেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, চলুন।

নয়

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ি। একখানা রামনাথের, একখানা বৈজুর আর একখানা সুরযের। গাড়িতে যাবে জিনিসপত্র, লোহা-লক্কড়, যন্ত্রপাতি আর মেয়েরা। রূপাপুরের কামারেরা যখন দল বেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ে, তখন সহধর্মিণী মেয়েরাও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। অনেকটা প্রাচীনকালের রণ-যাত্রার মতো। দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরকার হলে ওদের মেয়েরাও সঙ্গে হাতিয়ার ধরে। তা ছাড়া শত্রুর অভাব নেই। দু-একজন অথর্ব বুড়ো অথবা বুড়ি ছাড়া যুবতী মেয়েদের অনেকটা অরক্ষিতভাবে গ্রামে ফেলে যাওয়া ওরা নিরাপদ মনে করে না।

গাড়ি সাজানো শুরু হল। হাতুড়ী, হাপর, ছেনী লোহার টুকিটাকি। বড় বড় পাকা বাঁশের লাঠিগুলো মরদদের হাতে, ওরা পেছনে হেঁটে যাবে। মেয়েরা আজকের

দিনে বিশেষ ভাবে প্রসাধন করেছে, রঙীন শাড়ি পরেছে, গায়ে রূপোর গয়না। কটাক্ষগুলি চঞ্চল আর উৎসুক হয়ে উঠেছে। নানা গোলমালে গত দু বছর মেলায় যায়নি, তাই এবারে উৎসাহ আর উদ্যমটা কিছু বেশি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল রামনাথ।

—না রে, তোরা চলে যা। আমার শরীরটা ভালো নেই, আমি আর যেতে পারব না।

সমস্ত কামারপাড়া বিস্ময়ে হতবাক্।

—সে কি কথা তাউই!

—না, আমি যাব না।

স্বরয হো হো করে হেসে উঠল।—ভয় করছে? মেলায় তোমার নতুন বউ হারিয়ে যাবে নাকি?

কিন্তু এ কথাতেও রামনাথ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল না, দপদপ করে ওর চোখে জ্বলে উঠল না সেই স্বভাবসিদ্ধ প্রখর দৃষ্টি। ম্লান আর বিমর্ষ মুখে রামনাথ শূন্য দিগন্তের দিকে নিরুত্তরে তাকিয়ে রইল। কর্দমাক্ত বিলের জলে তাল গাছের ছায়া কাঁপছে। শঙ্খচিল উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে সেই তাল গাছের ওপর—তার সমস্ত ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা ওই বিলের দিকে নিবদ্ধ। কখন একটা দুর্ভাগ্য গজাল মাছ নিশ্বাস নেবার জন্যে চকিত মুহূর্তে জলের ওপর ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ছোঁ দিয়ে—

স্বরয বললে, ভয় নেই, আমরা পাহারা দেব বউকে।

অন্য সময় হলে রামনাথ বলত, হুঁ, পাহারা দেওয়া মানে নিজেরা ভালো করে গিলে খাওয়ার মতলব! আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত পরিমাণে একটা জিভ কাটত স্বরয। নিচু হয়ে রামনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলত: ছি ছি তাউই, আমাদের কি নরকের ভয় নেই!

কিন্তু আজ সব কিছুই অস্বাভাবিক আর স্বতন্ত্র। রামনাথের মনের সুর কেটে গেছে। কোথা থেকে দেখা দিয়েছে সংশয়, দোলা লেগেছে নিজের যা কিছু বিশ্বাসের ভিত্তিতে। ঘর—ঘর—ঘর। ঘরের এত মায়া এ কথা কি রামনাথ আগে জানত কোনো দিন? সবুজ ফসলে সোনালী সম্ভাবনা আজ ওর চোখে মুখে স্বপ্নের মায়া-পরশ বুলিয়ে দিয়েছে। এখন বিলের জলে চাঁদ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এখন মহুয়া বন থেকে পাপিয়ার ডাক শোনা যায়। রক্তের জোর মরে গেছে; তাই কামনা নিয়েছে প্রেমের রূপ। এতদিনের সেই ধু-ধু করা পথ, আশ্রয়হীন শূন্য দিগন্ত—সে সব এখন গত জীবনের দুঃখের স্মৃতি। সোনা-দীঘির মেলাকে আশ্রয় করে আবার সেই অনিশ্চয়তা আর সংঘাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া—নাঃ, রামনাথকে দিয়ে তা আর হবার নয়। নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল রামনাথ—

নিশ্চিত ভাবে কোনো সিদ্ধান্তে এসে সে পৌঁছুতে পারছে না।

বৈজু কামার সামনে এসে দাঁড়াল। রূপাপুরের কামারই বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জাতের লোক। ক্ষীণজীবী মানুষ, পেশীতে জোর নেই, স্বরয বা দূরবিস্মৃত কেশোলালের মতো উগ্র বন্যতায় তার চোখ পিঙ্গল হয়ে ওঠে না। কিন্তু তবু বৈজুকে মান্য করে সকলে, ভয়ও করে অনেকে। লোকটা কুটিল আর কূটবুদ্ধিধারী। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে কলকাতাতে। গাঁজা, চণ্ডু, চরস, মদ, ভাং কিংবা কোকেন সমস্ত নেশায় সে বিশারদ। সারা গায়ে এক সময় বিষাক্ত ক্ষতচিহ্ন ফুটে উঠেছিল—এখন তাদের শুকনো কালো কালো দাগগুলো ইন্দ্রের সহস্র লোচনের মতো তাকিয়ে আছে। তার পর থেকেই শহর ছেড়েছে বৈজু। শহরে শুধু অমৃতের পাত্রই যে পরিপূর্ণ নয়, সেখানে বিষও আছে—এই সত্যটা ভালো করে অনুভব করেছে সে, গ্রামে ফিরে মন দিয়েছে বিষয়-কর্মে। বৈজুর হাত খুব পরিষ্কার, এমন চমৎকার কাজ রূপাপুরে কেউ করতে পারে না। শুধু তাই নয়। লোকে বলে সিসা আর রাঙের কাজেও তার জুড়ি নেই। নবীপুরের কোন্ মহাজনের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত আছে কে জানে, তার তৈরি টাকা সিকি আধুলি নাকি সরকারী জিনিসের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পাবে। পুলিস দু-একবার ও সব জিনিসের সন্ধানে এ তল্লাটে হানা দিয়েছে, বৈজুকে ডেকেও নিয়ে গেছে থানায়, কিন্তু কিছু বার করতে পারেনি।

বৈজু বললে, তুমি যাবে না মানে? কুমার বাহাদুরকে জবান দিয়েছি আমরা।

রামনাথ তবু নিরুত্তর হয়ে রইল।

—রূপাপুরের কামারেরা জবান ভাঙে না কোনোদিন। তুমি না গেলে রহিমগঞ্জের শেখদেব সঙ্গে লাঠি ধরবে কে? এরা তো একটা চোট খেলে চিৎ হয়ে পডবে।

—কেন, স্বরয?

বৈজু হাসল।—হাঁক-ডাক করলেই মরদ হয় না, মুরোদ চাই।

স্বরযের হাতের গুলি শক্ত হয়ে উঠল।

—মুরোদটা একবার পরখ করব নাকি তোর সঙ্গে?

বৈজু একবিন্দু বিচলিত হল না, সাপের মতো কুটিল আর অতি শীতল চোখ পলকের জন্যে এসে পড়ল স্বরযের মুখে।

—বেশ তো, চলে আয়।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট সংকেত। রূপাপুরের কামারদের বেশি আয়োজন দরকার হয় না। শক্তির অভাব যেখানে, গলার তোড়জোড়টা সেখানেই বেশি। দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু সংশয়টা দেখা দিল স্বরযের মুখেই। বৈজুর গায়ে ওর মতো শক্তি নেই এ-কথা সত্যি, কিন্তু কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা ছোরা বের করতে তার সময় লাগে না। আর সাপের ছোবলের মতো নিঃশব্দে সে ছোরা ব্যবহার করতেও সে জানে। দুজনের মাঝখানে

রামনাথ এসে দাঁড়াল।

—নিজেরাই মারামারি করে মরবি নাকি এখন! গায়ের জোর কার কত সে পরখ তো পরে হবে। কিন্তু আমি যাব না। কুমার বাহাদুরের কাজ নিয়েছিস, তোরাই করবি।

সুরয বাঘের মতো ফুলছিল। বৈজুর ওপর একটা জলন্ত দৃষ্টি ফেলল সে। আচ্ছা দেখা যাবে।—অপমান সহ্য করবার পাত্র নয়। বৈজু কিন্তু হাসল। সাপের মতো তীক্ষ্ণ আর শীতল দৃষ্টি, অথচ তীব্র বিষে ভরা।

সুরয রুদ্ধশ্বাসে বললে, আর ভাগের বেলায়?

এবার রামনাথও হাসল। বললে, সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তার সবই তোদের।

কথা চলছিল রামনাথের দাওয়ায় বসে। ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে ঠুন ঠুন করে শিকল নড়ে উঠল। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে—যেন একটা গুমোট অতৃপ্তির ভেতরে খানিকটা মুক্তির ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল।

বৈজু বললে, যাও তাউই, তোমার ডাক পড়েছে। শুধু আমাদের না বললেই তো হবে না—নতুন বউয়ের মত নিয়ে এসো আগে।

রামনাথ বললে—থাম্ হতভাগা।

ঘরের ভেতরে শিকলটা নড়তে লাগল অধৈর্যভাবে। জরুরি তাগিদ। রামনাথ উঠে পড়ল। তারপর বেরিয়ে এল একটু পরেই।

—আচ্ছা যাব, তোদের সঙ্গে যাব। যা থাকে কপালে।

তিরিশটা করাতের মতো প্রখর শব্দ করে তিরিশজন কামার একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল। সে হাসির শব্দে বিলের জলে লাগল চমক, তালগাছের মাথার ওপর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে মৎস্যলোভী শঙ্খচিলটা উড়ে চলে গেল রৌদ্রঝলকিত নীল-দিগন্তে।

পর পর বেরোল তিনখানা গাড়ি। বৈজুর গাড়িতে উঠেছে ভানী, কামারপাড়ার আরো তিন-চারটি মেয়ে। অপাঙ্গকুটিল কটাক্ষে ভানীর দিকে একবার তাকালো বৈজু, তারপর মহিষ দুটোর লেজে শক্ত করে মোচড় লাগালো। লোহা-বাঁধানো ভারী চাকায় বিদীর্ণ পথটাকে আরো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে গাড়িটা ছুটে চলল ঘড়্ ঘড়্ করে—পেছনে লাঠি হাতে যে-সব পুরুষেরা আসছিল, ধুলোর কুয়াশায় মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল তারা।

* * * *

কুমার বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বেশিক্ষণ বসলেন না হরিশরণ। তিনি কাজের লোক, বিশ্বনাথ কাগজপত্র সই করে দিতে অবহেলাভরে ভাঁজ করে তিনি সেখানাকে পকেটে পুরলেন, একবার পড়েও দেখলেন না পর্যন্ত। এসব সামান্য ব্যাপারে খুব বেশি পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আর কটাই বা টাকা! বড় জোর দশ

হাজার। একটা টী-পার্টিতেই দশ হাজার টাকা বেরিয়ে যায় লালা হরিশরণের। ইচ্ছা করলে—

কিন্তু হরিশরণের উদ্দেশ্য পাঁচ হাজার নয়। দরকার হলে আরো পাঁচ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ টাকা তিনি ছড়িয়ে দেবেন ধুলোমুঠোর মতো। মোট কথা, আত্মপ্রতিষ্ঠা চাই। এই কুমারদহকে ধ্বংস করতে হবে—দেবীকোট-রাজবংশকে লুটিয়ে দিতে হবে ধুলোর নিচে। ইতিহাসের পাতা থেকে, জনশ্রুতি থেকে, কুমারদহের আকারহীন, অর্থহীন শূন্যদম্ভ থেকে এই কথাটাকেই নিঃশেষ করে মুছে দিতে হবে যে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার ঘোড়ার সহিস ছিল রামসুন্দর লালা।

আর কুমারদহ! কী আছে কুমারদহের? বহুদিন পরে আজ চোখ মেলে লালাজী কুমারদহের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। ভাঙা বাড়ি, মজা দীঘি, অপব্যয়, ব্যভিচার আর জীর্ণতার প্রেতমূর্তি। একে শেষ করে দিতে হবে। কুমারদহের তলা দিয়েই বয়ে গেছে নীলস্রোতা কাঞ্চন—আর ঠিক দশ মাইল দূরে রেলের ইস্টিশন। ব্যবসার পক্ষে আদর্শ জায়গা। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার সাতমহলা বাড়ি যেখানে অজগর-জঙ্গলে দুর্গম হয়ে আছে, ওখানে বসতে পারে মস্ত গঞ্জ—নবীপুরের মতো সমৃদ্ধ বিরাট বন্দর। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে আরো নানা রকমের প্ল্যান ঘুরছে লালাজীর মাথায়। কয়েকটা চালের কল এখানে বসালে কেমন হয়? খুব মন্দ হবে না বোধ হয়! আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে একটা মোটর চলবার মতো পাকা রাস্তা স্টেশন পর্যন্ত টেনে নেওয়াও খুব শক্ত হবে না। মৃত বিষাক্ত কুমারদহ নতুন করে গড়ে উঠবে প্রাণের ঐশ্বর্য নিয়ে, যান্ত্রিকতার নতুন স্বাস্থ্যে। তখন এর নাম কী হবে? নাম হবে হরিশরণপুর।

বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঠিক এই জিনিসগুলোই লালাজীর মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আর একটা চিন্তাও তারই সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্মমুখ কাঁটার মতো খচ খচ করে বিঁধছিল। কালীবিলাস কুণ্ডুর মৃত্যুটা অত্যন্ত সন্দেহজনক। কী কথা বলতে এসেছিল, কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে কী দরকার ছিল তার! আলকাপ দলের ব্যাপার কী? আজ তো তাদের পৌঁছবার কথা ছিল—কিন্তু? নাঃ, যাওয়ার পথে শোভাগঞ্জের হাট ঘুরে ব্রজহরি পালের খবরটা একবার নিয়ে যেতেই হবে।

চিন্তার অবকাশে নিজের অজ্ঞাতেই একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল লালাজীর ঠোঁটের কোণায়। কিন্তু পরক্ষণেই চমক ভাঙল বিশ্বনাথের কথায়।

—এই যে আপনার দলিল। সই করে দিলাম।

মোটা মোটা বলিষ্ঠ হরফে সই করেছেন বিশ্বনাথ। নিজের মনের ভেতরকার উদগ্র উত্তাপে একটু বেশি চেপেই স্বাক্ষর করেছেন কলমে। কালো কালো টানা হরফগুলো যেন কোনো ধারালো থাবার একরাশ আঁচড়ের মতো দেখাচ্ছে। অবহেলাভরে দলিলটার দিকে

একবার তাকালেন হরিশরণ। মুখের প্রচ্ছন্ন হাসির রেখাটা যেন আর একটু প্রকট হয়ে উঠল। সে হাসিতে আনন্দ, সে হাসিতে বিজয়ের পূর্বাভাস। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্যূতক্রীড়ায় আর একবার নির্ভুল দান ফেলেছেন, সমস্ত মন কলধ্বনি করে উঠছে : জিতং, জিতং!

পকেটে হাত পুরে নোটকেস্ বের করলেন লালাজী, একতাড়া নোট বিশ্বনাথের সামনে ছড়িয়ে দিলেন এক বাজি তাসের মতো। হাতের অবলীলা ভঙ্গিটা যেন পরিষ্কার ঘোষণা করে গেল, ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতো অবাধে তিনি হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন ওই কখানা নোটকে।

লালাজীর হাসির আভাসটা যেন মুহূর্তের মধ্যে মনের ভেতর একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলে বিশ্বনাথের। হারিয়ে গেছেন, ফুরিয়ে গেছেন, সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়ে গেছেন তিনি। রণক্লান্ত সিংহের মুখের সামনে থেকে তার শিকারকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে একটা ইতর শৃগাল!

দলিলটা তুলে নিয়ে লালাজী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আচ্ছা, আসি তা হলে— রাম রাম।

বিদ্যুৎচকিতের মতো বিশ্বনাথও উঠে পড়লেন। সমস্ত শরীরটা তাঁর যেন অস্বাভাবিক ঋজু আর কঠিন হয়ে গেছে। ঘন ঘন চাপা নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে প্রায় অব্যক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, যদি আপনাকে এখান থেকে যেতে দেওয়া না হয়?

—মানে?—প্রসন্ন চোখের ভ্রূদুটোকে চকিতে একটা ত্রিভুজের মতো সংকীর্ণ করে আনলেন হরিশরণ।

—যদি ওই দেউড়ির বাইরে বেরুবার সুযোগ আর না দেওয়া হয় আপনাকে? —বিশ্বনাথের স্বরটা আরো অব্যক্ত, আরো বিকৃত হয়ে উঠল।

লালাজী বিস্বাদ হাসি হাসলেন।

—আমরা গোলাম বটে, কিন্তু হুজুরের খাস তালুকের প্রজা নই। আমাদের কাজকর্ম আছে। আশা করি, এমন অন্যায় আবদার করবেন না কুমার বাহাদুর।

চক্ষের পলকে হাতটা পকেটে চলে গেল হরিশরণের, বেরিয়ে এল রিভলভারটা। প্রশস্ত হাতের চেটোর ওপর অলসভাবে সেটাকে একবার নাচালেন লালাজী।

—রিভলভারটা কেমন দেখছেন কুমারসাহেব? নতুন কিনেছি—পাঁচটা চেম্বারই লোড্ করে রাখি। জংলা দেশ, কখন কী কাজে লাগে বলা তো যায় না!

লালাজী হাসলেন। তাকালেন মণিবন্ধের বহুমূল্য হাতঘড়িটার দিকে। বললেন, কিন্তু আজ আর দেরি করব না—বেলা দেড়টা বাজে। গরীবেরও খানাপিনা আছে তো। কী বলেন?

কিন্তু বিশ্বনাথ কোনো জবাব দিলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মতো। পাঁচটা

চেম্বারই লোড্ করা আছে। হ্যাঁ—জংলা দেশ। কখন কোন্ কাজে লাগে কিছুই বলা যায় না বটে।

—তবে চলি, নমস্তে।

রিভলভারটাকে আবার পকেটে ফেলে লালাজী বের হয়ে গেলেন, দ্রুতপদে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। তারপরেই শোনা গেল তাঁর মোটরের গর্জন। দেউড়ি ছাড়িয়ে, কুমারদহ রাজবাড়ির সীমানা পার হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূর দূরান্তে।

মুহূর্তে বিশ্বনাথকে অসীম অবহেলায় তুচ্ছ করে দিয়ে, মুখের সামনে রিভলভারটাকে তুলে দেখিয়ে অমিত গৌরবে চলে গেলেন লালাজী। কিছুই করতে পারলেন না বিশ্বনাথ। দিতে পারলেন না একবিন্দু বাধা। শুধু পরাজিত কুস্তিগীরের মতো লুটিয়ে পড়ে রইলেন পঙ্কশয্যায়।

কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে টেবিলের ওপরে রাখা নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিশ্বনাথ। ওগুলো যেন নোট নয়—একরাশ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো তাঁর হাতের সামনে ছড়িয়ে রয়েছে। আজ, এই মুহূর্তে নোটগুলো স্পর্শ করতে বিশ্বনাথের কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ হতে লাগল। মনে হল ঃ ওদের প্রত্যেকটি যেন ছুরির ফলার মতো তাঁর বুককে বিক্ষত আর রক্তাক্ত করে দেবে।

শিউরে নোটগুলোর ওপর থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। ওগুলো ব্যোমকেশের হাতে তুলে দিতে হবে—টাকার জন্যে ব্যোমকেশ হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালই সদরে খাজনা পাঠাতে হবে, নইলে সব মহলগুলো একসঙ্গে লাটে চড়ে যাবে। আর নীলামে কিনে নেবার জন্যে লালা হরিশরণই এগিয়ে আসবেন সর্বাগ্রে। সদব। একবার সদরে ওই কাগজপত্রের স্তূপে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যেত—উড়িয়ে শেষ করে দেওয়া যেত সমস্ত। কী দিন গেছে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার আমলে! দেবীকোট-রাজবংশ—রাজা তারা। ইজারাদার দেবী সিংহ সেকালে দু হাতে বাংলা দেশকে লুটে নিয়েছে বটে, কিন্তু সেদিনের জমিদারের ক্ষমতাও ছিল তেমনি সীমানাহীন, তেমনি অব্যাহত। হাঁসমারীর খাঁড়িতে ঠাণ্ডা কাদার তলায় সন্ধান করলে বহু বিদ্রোহী প্রজার শ্যাওলাপড়া কঙ্কাল আজও তুলে আনা যায়। আজও এখানে ওখানে কুয়ো খুঁড়তে গেলে খন্তা-কোদালে ঠন ঠন করে বেজে ওঠে করোটির রাশি।

বেলা তিনটার কাছাকাছি। অস্নাত, অভুক্ত বিশ্বনাথ, অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শিরা-গুলোর মধ্যে প্রখর বিদ্যুতের দীপ্তি বয়ে যাচ্ছে। একটু স্নান করে বিশ্রাম নিতে পারলে শরীরের আগুনটা বোধ হয় অনেকখানি জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বিশ্রাম! বিশ্রামের কথা ভাবতেই মনে পড়ল অন্তঃপুরের কথা—মনে পড়ল অপর্ণাকে। আশ্চর্য, অপর্ণার অবজ্ঞাটা অনুভব করেই কি বিশ্বনাথ আজ তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন! মনে পড়ল, ঘরে-

বাইরে সমভাবে তিনি পরাজিত!

টেবিলের উপর রাখা নোটগুলো তখনো আগুনের হলকার মতো জ্বলছে। আর একবার সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ এক কোণের কাচের আলমারি খুললেন। মদের বোতল, গ্লাস, কর্ক স্ক্রু।

এমন সময় আবার মতিয়ার আবির্ভাব।

—হুজুর?

আরক্ত প্রচণ্ড দৃষ্টিতে বিশ্বনাথ যেন মতিয়াকে দগ্ধ করবার উপক্রম করলেন: কী চাই?

বিশ্বনাথের চটির ঘা খেয়ে পিঠ শক্ত হয়ে গেছে মতিয়ার। সে ভয় পেল না। একবার দ্বিধা করে বললে, রাণীজী ডাকছেন।

সম্পূর্ণ অনিশ্চিতভাবে বিশ্বনাথ কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন। পায়ের চটিটাই খুলবেন, না সিসের ভারী কাগজচাপাটা ছুঁড়ে মারবেন মতিয়ার মাথায়? কিন্তু বিশ্বনাথ কিছুই করলেন না। কী ভাবলেন কে জানে, তারপর ওই অভিশপ্ত নোটগুলোকেই মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে বললেন, চল্ হারামজাদা, কোন্ জাহান্নামে যেতে হবে।

মতিয়া একগাল হাসল।

—আজ্ঞে না, জাহান্নামে নয়, রাণীজী ডেকে পাঠিয়েছেন।

চলতে চলতে বিশ্বনাথ থেমে দাঁড়ালেন। পেছন ফিরে বললেন, বেশি ইয়াকি দিবি তো একদম খুন করে ফেলব রাস্কেল কোথাকার।

দশ

অনেকদিন পরে বিশ্বনাথকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন অপর্ণা। আজ কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেছে, নিজের মধ্যে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করছেন বিশ্বনাথ। মনের মধ্যে কোথায় একটা নিভৃত দুর্বলতার বীজ পড়েছিল—এতদিন পরে সেটা যেন ফুলে ফলে রূপায়িত হয়ে উঠবার সম্ভাবনায় দেখা দিচ্ছে। বাইরে ভাঙন ধরেছে—অজগর সাপের মতো লালা হরিশরণের ঋণের বন্ধন চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে। অবশিষ্ট ছিল সোনাদীঘির মেলা—কুমারদহ রাজবংশের শেষ একচ্ছত্র আধিপত্য, কিন্তু তাও আজ হরিশরণের হাতে তুলে দিতে হল। কোথাও কিছু আর বাকি থাকবে না। তাই কি বিশ্বনাথের মন আজ আকস্মিক ভাবে ঘরের দিকে ফিরে গিয়েছে? তাই কি আজ মনে হচ্ছে অপর্ণার কাছে এমন একটা কিছু আছে যেখানে তার শেষ আশ্রয়? রাত্রির অন্ধকারে ওঁরাও মেয়েদের মাংসস্তূপে কামনার আগুন লেলিহ

হয়ে ওঠে—মদে আর মত্ততার মধ্যে রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার জড়তা-জীর্ণ রংমহলে যেন দূরবিস্মৃত লক্ষ্ণৌয়ের সেই সরযূ বাইজীর নূপুরের নিক্কণ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই রাত যখন শেষ হয়, তখন? তখন? গ্লানি আর অবসাদ। মদ নয়, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। আজ কি সমস্ত জীবনের ওপর থেকে সেই রাত প্রভাত হয়ে গেল? সে কি কোনোদিন ফিরে আসবে না? একপাত্র শীতল জলের মতো অপর্ণা কি সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেবে?

কিন্তু অপর্ণা! অপর্ণা উচ্চশিক্ষিতা। অপর্ণা নিজের বিদ্যার গর্বে বিশ্বনাথকে ব্যঙ্গ করে।

অপর্ণার ব্যবহারে কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না।

বেলা পড়ে এসেছে; দিনান্তের আলোয় ধূসর হয়ে আসছে দিগ্‌দিগন্ত। দেউড়ির ভাঙা সিংহ দুটো বিকেলের ম্লান আলোয় যেন ক্লান্ত বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি। কাছারীবাড়ির কবুতরগুলো দূরের মাঠ থেকে ধান খাওয়া শেষ করে ফিরে আসছে। নীড় আর শাবকের জন্যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ওদের। কিন্তু বিশ্বনাথের শাবকহীন নীড় শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় দুলছে, কখন বুঝি খসে পড়বে মাটিতে।

অসীম শ্রান্তিতে বিশ্বনাথ একখানা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন। পাশে এসে দাঁড়ালেন অপর্ণা। মৃদু কোমল স্বরে বললেন, সারাদিন এমন পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াও কেন?

নীড়মুখী কবুতরগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই নিরুৎসুক গলায় বিশ্বনাথ বললেন, কী করব?

—করবার অনেক কিছু আছে, তুমি পথ খুঁজে পাচ্ছ না।

—পথ খুঁজে পাচ্ছি না?—দেবীকোট রাজবংশের সামন্ত-রক্ত একবার চমকে উঠেই আবার গেল নিরুত্তাপ হয়ে। আলস্য আর অবসাদের মতো পাণ্ডুর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার এত করুণ কোমল রূপ যে আর কখনো বিশ্বনাথের চোখে পড়েনি। আর সেই সন্ধ্যা মোহ ছড়িয়েছে—করুণ প্রশান্তি ছড়িয়েছে বিশ্বনাথের মনে। যেন মাইলের পর মাইল রাস্তা প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এসে একরাশ সবুজ ঘাসের ওপর তিনি এলিয়ে পড়েছেন।

—না।—অপর্ণা তেমনি স্নেহ-মধুর গলাতে বললেন, পথ খুঁজে পাচ্ছ না তুমি। একটা কথা এখনো বুঝতে পারোনি। তিনশো বছর আগে পৃথিবী যা ছিল আজ আর তা নেই।

বিশ্বনাথ নির্বোধ আর হতাশ চোখ মেলে অপর্ণার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথাগুলোর অর্থ তিনি এখনো ধরে উঠতে পারছেন না। শুধু অনাসক্তভাবে তিনি অপর্ণার বক্তব্যের গতিটা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

অপর্ণা লঘুভাবে আঙুলগুলো বুলোতে লাগলেন বিশ্বনাথের রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে।

—আজ নতুন দিন। রাজার অধিকার আজ টলে গেছে, এটা লালা হরিশরণের যুগ। এ যুগে হরিশরণদের জোর বেশি, তারা জিতবেই। তুমি আমাকে তো কিছু বলতে চাও না, কিন্তু এদিকে সব কথাই ব্যোমকেশ জানিয়ে গেছে আমাকে। সোনাদীঘির মেলা চলে গেল, এর পর তুমি দাঁড়াবে কোন্‌খানে?

—সোনাদীঘির মেলা চলে গেল!—ডেক-চেয়ারের ওপর বিশ্বনাথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন, কখনোই না। তুমি দেখো অপর্ণা, ও মেলা কিছুতেই ওর ভোগে লাগবে না —কখনোই না। আমিও এবার দেখে নেব কার জোর কতখানি।

অপর্ণা সস্নেহে হাসলেন। শীতল একখানা স্নিগ্ধ হাত রাখলেন বিশ্বনাথের কপালে। আশ্চর্য, অপর্ণার হাতের স্পর্শ কত মধুর! মনের সমস্ত উত্তেজনা যেন ঝিমিয়ে মরে যায়— যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

—কী করবে? লাঠালাঠি করবে, মেলা ভেঙে দেবে? কী লাভ হবে তাতে? ফৌজদারী? কে জিতবে তাতে? তোমার কত টাকার জোর আছে যে লড়াই করবে তুমি ওই পাকা ব্যবসাদারের সঙ্গে? বরং তোমার যা আছে তাও শেষ হয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। এসব কথা কি কখনো ভাবেননি তিনি? নিশ্চয় ভেবেছেন, অনেকবার ভেবেছেন। মনের দিক থেকে যতটা নির্বোধই তিনি হোন না কেন, এসব অতি সাধারণ সত্যকে বোঝবার মতো বুদ্ধি তাঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু বোঝাটাই তো আর সব নয়। মদের পাত্রে যে মৃত্যুর বিষ ফেনিয়ে ওঠে—উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত রাত্রিগুলো যে নিয়তির মতো একটা নিষ্ঠুর আর অনিবার্য পরিণতিরই ইঙ্গিত—এ তথ্যকে তিনি চেতনা দিয়ে, শিরাস্নায়ু দিয়েই অনুভব করেছেন। কিন্তু দেবীকোট রাজবংশের রক্ত। সে রক্ত একাধারে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। তীব্র বহ্নিজ্বালার মতো তা নিজেকে রাজ-মহিমায় জাগ্রত করে রাখে, আর তেমনি প্রখর অগ্নিশিখার মতোই ইন্ধনের দাবিতে সে নিজেকেই দহন করতে থাকে। সমস্ত বুঝেও রক্তের মধ্যে সেই বংশক্রমের শৃঙ্খল-বন্ধন বিশ্বনাথ অনুভব করতে থাকেন। অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করো—নিজের ইচ্ছার ওপরে কোথাও রাশ টেনে দিয়ো না, ভেঙেচুরে সব শেষ করে দাও। রাজা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি —বিধাতার দূত। তাকে বাধা দিতে পারে কে, কে তাকে রুখতে পারে?

তাই বিশ্বনাথ বাধা দিলেন না, অপর্ণার কথার প্রত্যুত্তর দিলেন না। এর মধ্যে সত্য আছে। যা আর কারো কাছে শুনতে ভালো লাগত না—যা লাগত নিজের আত্মমর্যাদায়, অপর্ণার স্নেহস্নিগ্ধ পরিচর্যার সঙ্গে তা যেন একটা নতুন আবেদন নিয়ে মনের কাছে এসে দেখা দিল। মনে পড়ল: বিয়ের পরের সেই প্রথম দিনগুলি। স্বপ্ন ছিল, প্রেম ছিল,

তখনও জমিদারীর জটিলতা দুজনকে এমন করে দূরে সরিয়ে দেয়নি, রচনা করেনি এমন একটা অপরিচয়ের ব্যবধান। দেউড়ির সীমা ছাড়িয়ে চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দূর-দিগন্তে। সিংহাবাদের হিজলবন যেন গাঢ় কালির রেখায় চক্রবালে আঁকা রয়েছে। ওই জঙ্গলে একদিন বাঘ থাকত, থাকত শঙ্খচূড়—নীলগাইকে পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরত অতিকায় ময়াল সাপ। আজ ওখানে রাখালেরা গোরু চরায়—বাঁশি বাজায় নিশ্চিন্ত আনন্দে। কুমীরমারারা কাঞ্চন নদীর নীল জল থেকে কুমীরের বংশ উচ্ছন্ন করেছে—গোরু চরানো শেষ করে রাখালেরা ওই নদী সাঁতার দিয়ে ওপারের গ্রামে চলে যায়। তিনশো বছর। তিনশো বছর কেন, পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল, তাও কি আর আছে? রামসুন্দর লালা একদিন কুমারদহ রাজবাড়িতে ঘোড়াকে চাল শেখাত, এ কথা আজ কি কারো মনে পড়বে কখনো?

হঠাৎ নিজের অত্যন্ত সজাগ মর্যাদাবোধ, দেবীকোটের রক্তের অনমনীয় ঔদ্ধত্য যেন কি একটা মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল। অত্যন্ত নতুন—অপ্রত্যাশিত গলায়, আশ্রয়ার্থীর মতো অসহায় স্বরে বিশ্বনাথ অপর্ণাকে বললেন, তুমি কী করতে বলো?

অপর্ণা জয়ের পূর্বাভাস অনুভব করলেন—অনেকদিন পরে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন তিনি। কুমারদহের অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূ নয়—পার্টি আফিসের অপর্ণা, ভুখ-মিছিলের অপর্ণা।

—তুমি জমিদার, জমির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। আর সেই জমির মালিক যারা—জমি যারা চাষ করে, তারাই তো তোমার আপনার লোক। তাদের জোরেই তোমার জয় হবে। তুমি একা কেন?

—একা কেন?—বিশ্বনাথ যেন চমকে গেলেন। সত্যিই তো—আজ কেন তাঁর এই নিঃসহায় একাকিত্ব। তাঁর অসংখ্য প্রজা যদি আজ এসে দাঁড়ায়—তা হলে তাঁর মতো শক্তি কার আছে? কোনো হরিশরণের সাধ্য নেই তাঁকে জয় করতে পারে।

অপর্ণা বললেন, তিনশো বছর ধরে ওদের অস্বীকার করে এসেছ তোমরা। ওদের কাছ থেকে শুধুই নিয়েছ, এতটুকুও ফিরিয়ে দাওনি। আজ ওদের কাছে নেমে এস—একবার ওদের স্বীকার করে নাও, দেখবে আর কোন ভাবনা নেই। মনে রেখো ওদের আপনার জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সে জমিদার—জমিদার—জমিদারের সঙ্গেই ওদের হাত মিলবে সকলের আগে। আর মহাজন! সে যে ওদের কতখানি শত্রু—তা বোঝবার দিনও ওদের আসছে।

বিশ্বনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অপর্ণার মুখের দিকে। কিছু একটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছেন না। বাইরে রক্তসন্ধ্যা ক্রমে কালো হয়ে আসছে। আর আধো অন্ধকারে অপর্ণার মুখখানা সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না—কিন্তু কী একটা সম্ভাবনা

আর আশার সংকেতে সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—বিশ্বনাথের অনুভূতির মধ্যে সেটা সঞ্চারিত হয়ে গেল।

—আচ্ছা, ভেবে দেখব।—ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়ালেন। ওঠবার ইচ্ছা ছিল না, এই সন্ধ্যা আর অপর্ণাকে কেমন ভালো লাগছিল, কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল চেতনাকে। কিন্তু উঠতেই হবে—অনেক কাজ। এ সব কথা পরে ভাবলেও চলবে, তার আগে ব্যোমকেশের সঙ্গে লালাজীর টাকাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। রাত্রেই সদরে লোক না পাঠালে লাটের নীলাম রোধ করা যাবে না।

মন্থর বিষণ্ণ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন বিশ্বনাথ, আগে আগে লণ্ঠন ধরে চলল মতিয়া। আর বারান্দায় রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাঁধানো উঠানের ওপর দিয়ে ভারাতুর পায়ে বিশ্বনাথ এগিয়ে চললেন। অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে থেকে থেকে গুঞ্জন তুলছে—এতদিন পরে কোথায় যেন জাগিয়ে তুলছে একটা মৃদু অথচ তীব্র আলোড়ন। ওদের দাবিকে স্বীকার করে নিতে হবে, ওদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে মিলন সম্ভব, কী ভাবে চলবে ওদের সঙ্গে হাত মেলানো, ওদের দাবিকে স্বীকার করে নেওয়া? বিলিয়ে দিতে হবে জমিদারী? ওদের মতো লাঙল ঠেলতে হবে মাটিতে নেমে? কে জানে! কিন্তু দেবীকোট কারো দাবিকে স্বীকার করে না কোনোদিন, শুধু নিজের দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করে যায়। তিনশো বছর ধরে আগুন আর রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আজ কি তার একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল? কিন্তু কী ভাবে?

কাছারীবাড়ির সামনে আসতেই শোনা গেল ব্যোমকেশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তীব্র গলায় সে বলছে, না, এ অপমান, চূড়ান্ত অপমান। কখনোই এ সহ্য করা যায় না। আমরা মরিনি এখনো।

কাছারীতে ঢুকে বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে?

বিশ্বনাথকে দেখে ব্যোমকেশ তেমনি উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল। বললেন, এই যে—হুজুর নিজেই এসেছেন। শুনুন—এই মাণিক ঘোষের কাছে ব্যাপারটা শুনুন।

মাণিক ঘোষ আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হেসে সাষ্টাঙ্গে বিশ্বনাথকে প্রণাম করল। বিশ্বনাথের প্রজা—শোভাগঞ্জের হাটে দই ক্ষীর বিক্রি করে, মোটাসোটা মাঝারি বয়সের মানুষ। অত্যন্ত সাদাসিধে লোক—জমিদারের অতিশয় অনুগত। কুমারদহ রাজবংশের প্রতি তার বংশানুক্রমিক শ্রদ্ধা—চার পুরুষ এখানে তারা নিয়মিতভাবে দই ক্ষীরের নজর আর যোগান দিয়ে আসছে।

—ব্যাপার কী মাণিক?

মাণিক সংকুচিত হয়ে গেল।—আজ্ঞে এই আল্‌কাপের দল!

—আল্‌কাপের দল?—বিশ্বনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। কী একটা কথা মনে পড়ে গেল চকিতের মধ্যে।—ঠিক, ঠিক। আজ তো ওদের সোনাদীঘির মেলায় গান গাইবার কথা ছিল। আসেনি কি?

—আজ্ঞে আসবে কি?—ব্যোমকেশ সশব্দে ফেটে পড়ল: কেন আসবে তারা? নবীপুরের কাঁচা পয়সা—লালা হরিশরণ ওখানকার লাট সাহেব। এক এক রাত পঁচিশ টাকা করে পাবে, দশ টাকা দরে কেন তারা গান গাইতে আসবে সোনাদীঘির মেলায়?

বিশ্বনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, ব্যোমকেশ, তুমি থামো। যা বলবার তা মাণিক ঘোষকেই বলতে দাও। কী করেছে আল্‌কাপের দল?

মাণিক ঘোষ বিব্রত বোধ করল। শোভাগঞ্জের হাটে সমস্ত ব্যাপারটার নীরব দর্শক ছিল সে, ব্যোমকেশের কাছে তারই খানিকটা সরল বর্ণনা দিয়েছিল। কিন্তু এর পেছনে এতখানি গোলমাল আছে, তা সে কল্পনাতে আনতে পারেনি। পারলে কখনই বলত না। সে ছাপোষা মানুষ, সকলের মন জুগিয়ে তাকে চলতে হয়। লালাজির প্রতাপ তারও অবিদিত নয়। কুমার বিশ্বনাথের প্রতি তার আনুগত্য আছে, লালাজীকেও সে ভেট দিয়ে নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করে। ঐহিক এবং পারত্রিক জগতে তেত্রিশ কোটি কেন, তারও অনেক বেশি যত দেবতা আছে, সকলকেই তুষ্ট করবার জন্যেই সে প্রস্তুত।

বার কয়েক দ্বিধা করে টাক চুলকে মাণিক ঘোষ ব্যাপারটা বিবৃত করে ফেলল। ব্যোমকেশ কথার মধ্যেই বার বার লম্ফঝম্প করতে লাগল, বলতে লাগল, এ অপমান সহ্য করে গেলে কুমারদহের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় থাকবে না। আর বিশ্বনাথের সর্বাঙ্গে হিংস্রতার দীপ্তি এমন ভাবে শিখায়িত হয়ে উঠল যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরোল না। এতক্ষণ ধরে অপর্ণার কথাগুলো মনের মধ্যে নেশার মতো যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—মুহূর্তের আগ্নেয় কশাঘাতে—তা মিলিয়ে গেল। প্রজাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিয়ে যদি লালাজীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে তার সুযোগ ঢের পাওয়া যাবে কিন্তু তার আগে—বিশ্বনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দূরে ঢোলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—বহু কণ্ঠের মিলিত চিৎকার ভেসে আসছে। কিন্তু একটু কান পেতে শুনলেই বোঝা যাবে—ওটা চিৎকার নয়, গান। কাল থেকে সোনাদীঘির মেলা, মেলার যাত্রীরা রাত্রে উৎসবের আয়োজন করেছে।

মাণিক ঘোষ বললে, রূপাপুরের কামারেরা খুব গান জমিয়ে বসেছে। ভারে ভারে তাড়ি চলেছে আর তার সঙ্গেই—

রূপাপুরের কামারেরা! ঠিক। মুহূর্তে বিশ্বনাথের মনের মধ্যে সব কিছুর সমাধান হয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিশ্বনাথ বললেন, লাঠি ধরবে ওই রূপাপুরের কামারেরা। ভেঙে দেবে—উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। দেখব এবার সোনাদীঘির মেলা থেকে কত টাকা লুটে নিতে পারে ওই লালাজী।

মাণিক ঘোষ কথাটা শুনে শিউরে উঠল। মেলায় সেও দোকান নিয়ে এসেছে। মেলা যদি লুট হয়ে যায়, তাহলে তারও বিপদ কম নয়। তা ছাড়া মাণিক ঘোষের টাকায় নাকি শ্যাওলা পড়ে—এমন একটা জনশ্রুতি সর্বসাধারণে চলতি আছে। অতএব বুদ্ধিমানের মতো কালই দোকান-পাট তুলে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া বিশ্বনাথের মতলবটাও লালাজীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মাণিক ঘোষ সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সুতরাং দুজনকে খুশি করাই তার উচিত।

বিশ্বনাথ বললেন, ব্যোমকেশ, আমার সঙ্গে এস।

—কোথায়—?

—চলো, রূপাপুরের কামারদের খবরটা একবার নিয়ে আসা যাক!

কুমারদহ রাজবাড়ি থেকে সোনাদীঘি মাত্র ছটাকখানেক পথ। একটা বড় আম বাগান, তার পরে ছোট একখানি তৃণ-বিরল কংকরমণ্ডিত মাঠ পেরোলেই দীঘির উঁচু পাড়টা চোখে পড়ে। আগে ওই পাড়টা ছিল পাহাড়ের মতো উত্তুঙ্গ, কিন্তু বছর বছর ওখানে মেলা বসাতে আজকাল ধ্বসে ঢালু আর জায়গায় জায়গায় প্রায় সমতল হয়ে গেছে।

দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সোনা-ফকিরের ভাঙা দরগা! ওপরে গম্বুজ নেই—প্রায় বারো আনা অংশেরই ছাদ ভেঙে পড়েছে। চারদিকে রাশি রাশি ইট আর পাথর ছড়ানো। দরগায় ঢুকবার প্রধান দরজার দু-পাশে সম-চতুষ্কোণ কতকগুলো কষ্টিপাথর সাজানো—লাল লাল ছোট ইটের সঙ্গে বেমানান। দেখলেই বোঝা যায় স্থানান্তর থেকে সংগ্রহ করে ওদের ওখানে সগৌরবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু সগৌরবে নয়, বিজয়-গৌরবে! গৌড়-বঙ্গজয়ী মুসলমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত দেবমন্দির থেকে সংগৃহীত শিলা-খণ্ড—। তাদের বুকে ক্ষয়ে-আসা পদ্মের চিহ্ন এখনো দেখা যায়, দেবমূর্তির অস্পষ্ট রেখাঙ্কন এখনো চোখে পড়ে! ঠিক সদর দরজার পেছনেই পাশাপাশি দুটি শ্বেতপাথরের সমাধি। একটির ওপরে নানা রঙের কাচের টুকরো দিয়ে মিনে করা, সেটি সোনা ফকিরের, পাশেরটি কার, ইতিহাস সে কথা বলতে পারে না। আর একপাশে কালো পাথরের একটি দীপাধার, ওখানে ফকিরের নামে বারোমাস 'চিরাগ' জ্বলে। তেল পড়ে তার অর্ধেকটাতে একটা পুরু কালো আস্তরণ জমে উঠেছে। দরগাকে কেন্দ্র করে কোথাও উঁচু পাড়ের ওপর কোথাও বা নিচের ইট-পাথর ছড়ানো সমতল মাটিতে অর্ধচন্দ্রাকারে মেলার ছাউনিগুলো

মাথা তুলেছে। আর তারই একটা ছাউনিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে রূপাপুরের কামারেরা। এরই মধ্যে হাপর বসিয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে—সোনাদীঘির উত্তর পাড়ে মেলার সে সমস্ত গাড়ি এসে আস্তানা গেড়েছে, এর মধ্যেই তাদের চাকাতে লোহার পাত পরিয়ে দিতে শুরু করেছে ওরা। ওদের দেখে এখন কে বুঝতে পারে যে মেলা ভেঙে দেওয়াই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তার জন্যে ওরা কুমার বিশ্বনাথের কাছ থেকে একশো টাকা আগাম বায়না নিয়েছে!

কিন্তু দুদিন পরে যা হবার তা হবে, আপাতত ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে। তিন-চারটে বড় বড় মশাল জেলে পুঁতে দিয়েছে মাটিতে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছে মেলার কৌতূহলী দর্শকের দল। সুরয ঢোল বাজাচ্ছে, রামনাথ একটা করতাল পিটছে ঝম ঝম করে। একজন প্রাণপণে বেসুরো একটা বাঁশি বাজাচ্ছে, আর একজন দু হাতে কতকগুলো ঘুঙুর নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাল দেবার চেষ্টা করছে। আর মাঝখানে বসে সমস্বরে গান জুড়েছে ভানী, কামিনী, কামারপাড়ার আরও তিন-চারটি যুবতী আর প্রৌঢ়া। তাড়ির পাত্র চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, গানের মধ্যে আসছে মত্ততার আমেজ—। দর্শকেরা কখনো কখনো এক-একটা অশ্লীল উক্তি করছে, কখনো বা বলে উঠছে বাঃ—বাঃ—বাহবা।

তারই মধ্যে সবটার সুর কেটে দিয়ে একবার চকিত কলরব জেগে উঠল।

—জমিদার।

রসভঙ্গে বিরক্ত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে জনতা উঠে দাঁড়াল। গান বন্ধ করে মেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল এক পাশে। ঢোল, করতাল, বাঁশী আর ঘুঙুরের বাজনা মুহূর্তে থেমে গেল।

বিশ্বনাথ ডাকলেন, ওস্তাদ।

সামনে এসে আভূমি অভিবাদন জানাল রামনাথ। পিছনে এসে দাঁড়ালো সুরয, এল বৈজু।

—সব ঠিক আছে?

রামনাথ মাথা নিচু করে রইল। সুরযের পেশীতে লাগল হিংস্রতার মত্ত-আন্দোলন। বৈজুর দুটো চোখ সাপের মতো কুটিল আর বিষাক্ত হয়ে উঠল—মশালের রাঙা আগুন প্রতিফলিত হতে লাগল সেই চোখে।

জবাব দিল বৈজু। শান্ত গলায় বললে, হাঁ হুজুর, সব ঠিক আছে। আপনার চাকর আমরা।

—বেশ, মনে থাকে যেন।—ঠোঁটের ওপর বিশ্বনাথের দাঁত চেপে বসল: কোনো ভাবনা নেই তোমাদের। শেষ পর্যন্ত যা হবে তার দায় আমার—

রামনাথের মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া। কিন্তু সুরযের সমস্ত চেতনায় রূপাপুরের বিদ্রোহী পূর্বপুরুষেরা সাড়া দিয়ে উঠেছে। অতীতের সম্রাট আর অতীতের সৈনিক।

বিশ্বনাথ বললেন, থামলে কেন, গান চলুক তোমাদের—

একজন কোথা থেকে এর মধ্যেই একটা লোহার চেয়ার যোগাড় করে এনেছে। বিশ্বনাথ চেয়ারে ভালো করে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে গেল ভানীর ওপর। এমন সুগঠিত, এমন পূর্ণায়ত। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার লালসা আর লোভ উত্তর-পুরুষের সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে মাতাল করে দিল। কোথায় রইল অপর্ণা—কোথায় রইল আসন্ন সন্ধ্যার সেই আবিষ্ট আচ্ছন্নতা। কী হবে ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে—কী হবে লালা হরিশরণের কথা ভেবে। আপাতত এই মুহূর্তটাই সত্য—তার চেয়ে অনেক বেশি সত্য ভানীর এই উচ্ছলিত যৌবনশ্রী। বিশ্বনাথ ব্যোমকেশকে ইঙ্গিত করলেন দু বোতল মদ যোগাড় করে আনবার জন্যে, আর দু চোখের তীব্র নির্লজ্জ দৃষ্টি নিয়ে যেন গিলতে লাগলেন ভানীকে! ওপাশ থেকে বৈজুর সাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ বার বার এসে বিশ্বনাথের মুখের ওপর পড়তে লাগল—আর কেউ না হোক, সে বিশ্বনাথকে বুঝতে পেরেছে।

বৈজু মৃদু হাসল। ভানী একদিন ঘটির ঘায়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সেকথা বৈজু ভোলেনি—প্রতীক্ষা করে আছে। আজ তার একটা বিলিব্যবস্থার দিন ফিরে এসেছে হয়তো।

রাত বাড়তে লাগল। মদের পাত্র শূন্য হয়ে যেতে লাগল, এল তাড়ির ভাঁড়—। ওদিকে নিজের ঘরে বসে কী একখানা বই পড়তে পড়তে বার বার উৎকর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন অপর্ণা। জানালার ফাঁকে বাইরে একটা বেপথুমান নক্ষত্র শুধু তাঁরই উদ্বেগ আকুল হৃৎপিণ্ডের মতো জেগে রইল।

এগারো

বৈজু লোকটা চালাক। শেয়ালের মতো ধূর্ত—শকুনের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওদিকে গানের পর্বটা ক্রমেই উদ্দাম আর উতরোল হয়ে উঠেছে—তাড়ির নেশায় সুরয ঢোলে চাঁটি দিচ্ছে বেতালে। মশালের আলোগুলো ম্লানশিখা হয়ে আসছে ক্রমশ! আর বিশ্বনাথের নেশায় বিহ্বল চোখ দুটো তারই প্রতিফলনে পিঙ্গল আর স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে—আয়নার মতো চকচকে, উজ্জ্বল, তার ওপর ছায়া ফেলেছে স্খলিত-বাসা ভানীর দেহ ক্লান্তি—

বৈজু ভাবছে: তার কি প্রতিশোধ নেবার সময় এল? একদিন অসতর্ক অবসরে—ঝাঁপ কেটে সে ভানীর ঘরে ঢুকেছিল আর কুড়ুল-ধরা যাঁতাভাঙা কঠিন হাত থেকে প্রচণ্ড একটা ঘটির আঘাত খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে; যেমন করে একটা আহত

কুকুর আর্তনাদ করে পালিয়ে আসে। কিন্তু সে অপমান সে ভুলতে পারেনি। যেমন করে হোক—এর শোধ নিতে হবে। নিজে না হোক আর কোনো সুযোগে। আজ বিশ্বনাথের নেশায় বিহ্বল লোলুপতায় সে সুযোগ যেন তার কাছে এসে দেখা দিয়েছে। বৈজু উঠে নীরবে এসে বসল বিশ্বনাথের পায়ের তলায়।

রাত বেড়ে চলেছে। মেলার যে সমস্ত কৌতূহলী মানুষ গান শোনবার জন্য এসে ভিড় জমিয়েছিল একে একে সরে গেল তারা। সোনা ফকিরের দরগায় প্রদীপ নিভে গেল—সোনাদীঘির কলমি দামের মধ্যে মানুষের কোলাহলে ভয় পেয়ে যে পানকৌড়ি দুটো সারাদিন মাথা ডুবিয়ে ছিল, এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্তে উঠে এল তারা—থেমে থেমে জলের মধ্যে, বাজতে লাগল তাদের পাখার ঝাপট—। কাপড়পট্টি, লোহাপট্টি, মিঠাইপট্টি—নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘুমের জড়তায়। এমন কি খোপরাপট্টির অভিসারপর্বও আস্তে-আস্তে জন-বিরল হয়ে এল। শুধু আমবাগানের মধ্যে এখনো খানিক আগুন জ্বলছে—ছায়ার মতো—দেখা যাচ্ছে তিন-চারটে মানুষের মাথা। গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানদের কেউ কেউ ভাত রাঁধছে ওখানে। এবার সত্যিই সাড়ম্বরে মেলা বসবে—রাত্রির অন্ধকারেও সেটা অনুভব করা চলে। শুধু টিকিধারীর জুয়োর আড্ডাটা এখনো বসেনি। আশা করা যায়, কাল নাগাদ এসে পড়বে তারা। তাহলেই অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি থাকবে না কোথাও।

বিশ্বনাথের প্রসাদ পেয়ে ব্যোমকেশের নেশাটা তত জমে ওঠেনি! কাপ্তান লোক সে—পাকা এক বোতল 'সাদা ঘোড়া' টানলেও তার পা টলে না—আর সেই যোগ্যতাতেই সে বিশ্বনাথের ম্যানেজার। সুতরাং সে বুঝতে পারল রাত বাড়ছে। এবারে বিশ্বনাথকে টেনে তোলা দরকার।

—হুজুর, উঠুন। ঢের রাত হয়ে গেল।

ভানীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে না নিয়েই বিশ্বনাথ বললেন, ধ্যাৎ, দিনের পর দিন তুমি বেরসিক হয়ে উঠছ ব্যোমকেশ। রাত বাড়ুক, কিন্তু—

কিন্তুটা কী, বুঝতে না পেরে ব্যোমকেশ মাথা চুলকাতে লাগল।

কিন্তু বৈজু বুঝেছিল। কয়েক মুহূর্ত একটা অনিশ্চয়তায় মনটা আন্দোলিত হতে লাগল তার—তারপর সে সোজা এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথের পাশে। কানের কাছে মুখ এনে চাপা অস্পষ্ট গলায় বললে, ঐ মেয়েটাকে চাই হুজুর, ঐ লাল শাড়িপরা মেয়েটা?

বিশ্বনাথের চোখে ঝড়াং করে বিদ্যুৎ জ্বলে গেল—তুমি কে—

বৈজু বিনয়ে গলে গেল।

—আমাকে চিনলেন না হুজুর? আমি বৈজু কামার—রূপাপুরের কামার।

—বেশ।—জড়িত অসংযত পায়ে বিশ্বনাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতের ভর রাখলেন বৈজুর কাঁধে আর হাতে আঁকড়ে ধরলেন ব্যোমকেশের গলাটা—এস আমার সঙ্গে।

এদিকে শেষ মশালটাও দপ করে অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ নিভে গেল। আর চড়াৎ করে একটা বিকট শব্দ হয়ে ছিঁড়ে গেল সুয়ষের ঢোলের চামড়াটা। সোনাদীঘির জলে একটা পানকৌড়ি অস্বাভাবিক প্রেতিনীর গলায় ককিয়ে উঠল; কী দেখে যেন ভয় পেয়েছে।

দেউড়ির বিকলাঙ্গ সিংহ দুটো তারার আলোয় একটু একটু আভাস দিচ্ছে। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহলের পথে ঘন-অন্ধকার—। ওদের তিনজনের পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়মড় করতে লাগল। কোথা থেকে একটা পাতিহাঁস চুরি করে ভারমন্থর একটা শেয়াল ওদের সামনে দিয়েই পালিয়ে গেল ভয়ার্ত পদক্ষেপে। আর টেবিল-ল্যাম্পের মৃত্যু-আলোয় দোতলার ঘরে অপর্ণা প্রহর জাগতে লাগলেন—আজ তাঁর মন বলছে, বিশ্বনাথ আসবেন, আশ্রয় চাইবেন তাঁর কাছেই। তাঁর সমস্ত মন, সমস্ত স্নায়ু তারই জন্যে উদগ্র হয়ে আছে।

কিন্তু একটা খবর ওরা কেউ জানত না। সেটা শুধু ছায়া ফেলেছিল ভানীর চেতনায়। মানুষের অজ্ঞান মনে যেমন করে তার সহজাত-সংস্কার একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়ে যায়।

সোনাদীঘির মেলায় কেশোলাল এসেছে। সেই কেশোলাল। চৌকিদার আলী মহম্মদ যার বল্লমে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল—আর ওঠেনি। খানিকটা কাঁচা মাংস যে একদিন চিবিয়ে খেয়েছিল—তাজা রক্তের আস্বাদ পাবার জন্যে; যার ভালোবাসার পাশব আর কঠিন আলিঙ্গনে ভানীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, আর পুলিসের হুলিয়া যার সন্ধান পাওয়ার জন্যে সমস্ত দেশটা এই সাত বছর ধরে চষে বেড়াচ্ছে।

সেই কেশোলাল—রামনাথের শিষ্য, রামনাথের গর্ব। সেও এসেছে সোনাদীঘির মেলাতে। কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তার চোখে গগল্স, মুখে দাড়ি, পরনে লুঙ্গি। ঘাড়ের ছাঁট চোদ্দ আনা আর দু আনা। বেশে-বাসে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। শুধু কি বেশে-বাসেই? মনের দিক থেকেও তার পুনর্জন্ম হয়েছে। 'খোপরাপট্টি' বা মেলার গণিকাপল্লীর অন্যতমা নায়িকা নিশিবালার সে রক্ষিত। নিশিবালা তাকে ভালোবাসে। বহু পরিচর্যার মধ্যেও প্রেমের জগতে কেশোলাল একক—একচ্ছত্র। নিশিবালা তার সব-রকম খরচ যোগায়,—বেশভূষা থেকে আরম্ভ করে মদ-বিড়ি পর্যন্ত। কেশোলালও অকৃতজ্ঞ নয়, সে তার প্রেমিকার জন্যে দালালী করে, খদ্দের জুটিয়ে আনে। নিশিবালার উন্নতি হচ্ছে—আর দু-এক বছরের মধ্যেই সে কলকাতায় যাবে। তার অনুগ্রাহকেরা বলেছে অনায়াসেই নাকি সিনেমা আর থিয়েটারওয়ালারা লুফে নিয়ে যাবে তাকে। এর জন্যে কেশোলালের কৃতিত্ব প্রচুর এবং সে কথা নিশিবালা মুগ্ধ-কণ্ঠেই স্বীকার করে থাকে।

কৃতার্থতার হাসি হেসে কেশোলাল বলে, আমি আর কে,—তোর গুণেই সব।

অনেক রাতে কেশোলাল এল নিশিবালার ঘরে।

নিশিবালা তখন বিছানাটার ওপর অবসন্নভাবে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে। সান্ধ্য-নর্তন আর অভিসার-সজ্জা এখন আর নেই। রঙীন শাড়িটাকে ছেড়ে ফেলেছে, পরনে আটপৌরে সাদা শাড়ি। স্নান করে এসেছে, ঝুলিয়ে দিয়েছে ভিজে চুলের গুচ্ছ। অর্ধ-নিমীলিত চোখে ওপরের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানছে।

কেশোলাল নিশিবালার পাশে এসে বসল।

—কী খবর ?

নিশিবালা ভ্রূকুঞ্চিত করল।—এই তো বিদেয় করলুম সব। একটার পরে একটা আসছেই, আসছেই। তবু তো মেলা ভালো বসবে কাল থেকে। এলে আর নড়তে চায় না, একেবারে বেদম হয়ে গেছি।

—আর রোজগার ?

নিশিবালা তেমনি উদাস ভাবেই বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

—এক রকম। এই গাঁওয়ার লোকগুলোকে নিয়েই মুশকিল, চার আনা ছ আনার বেশি ফেলতে চায় না। কাল থেকে দরজায় দাঁড়িয়ো তো, একটা টাকার কমে কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।

—আচ্ছা।—কেশোলাল অন্যমনস্ক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে বললে, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কী ?—নিশিবালা ভ্রূকুঞ্চিত করলে, টাকা চাই নাকি ?

—না, ভয় নেই, টাকা চাই নে। তুমি লোক চাইছিলে না ?

—লোক ? আছে নাকি খোঁজে ?

—হাঁ, আমার বউটা। দেখলুম মেলায় এসেছে, ছাউনি গেড়েছে। বলো তো যোগাড় করে আনি।

তীক্ষ্ণ শব্দ করে নিশিবালা হেসে উঠল। হাসিটা বীভৎস আর নির্মম, মুখের কালিমা-চিহ্নের উপর কতকগুলো কঠিন ব্যঙ্গের রেখা উঠল রূপায়িত হয়ে। মোহিনীর হাসি নয়, গজভুক্ত কপিত্থের মতো শূন্য-পকেট পুরনো প্রেমিককে অর্ধচন্দ্র দেবার সময়ে এমনি করেই হেসে থাকে নিশিবালা।

—খুব বাহাদুর সোয়ামী যাহোক। নিজের বৌকে তুলে দিতে চাচ্ছ পেশকারের হাতে।

কিন্তু কেশোলাল লজ্জা পেল না। জীবনে সে কখনো ভয় পায়নি, লজ্জাও পায় না। পাশব-বর্বরতা তার রূপান্তরিত হয়েছে পাশব-নির্লজ্জতায়। পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়।

—বউ বলেই তো। লোকের বাড়ি খেটে খায়, এখন রাজরাণী হয়ে কাটাবে।

—আহা হা, বউয়ের উপর কী দরদ! মরে স্বর্গে যাবে তুমি।

—এই তো আমার স্বর্গ—কেশোলাল নাটকীয় ধরনে এগিয়ে এল নিশিবালার দিকে। সাত বছরে কেশোলাল গ্রাম্য নিরক্ষরতাকে ছাড়িয়ে এসেছে অনেক পেছনে। অনেক সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, সম্পর্কে এসেছে অগণিত পণ্য নারীর। কেশোলালের জীবন-দর্শন আজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

নিশিবালা একটা ঝাপটা মেরে দূরে সরে গেল।

—থাক থাক, অত কাব্যি করতে হবে না। তোমার বউকে নিয়ে যা খুশি করো, আমাকে জ্বালিয়ো না এখন।

সোনাদীঘির মেলার ওপর দিয়ে রাত গভীর হয়ে এল। আমবাগানের আলো নিবে গেছে, শুধু এখানে ওখানে মিটমিট করছে দু-একটা লণ্ঠন। আকাশ ভরা তারার আলোর নিচে মেলার বিস্তীর্ণ জনারণ্য নীরব হয়ে আছে রণক্লান্ত সৈনিকদের শিবিরের মতো। সোনাদীঘির কালো জলে একটা অতিকায় মাছ লেজের ঝাপটা দিলে, ছল ছলাৎ করে প্রচণ্ড একটা শব্দ। যেন কী একটা আকস্মিক ভয়ে কালো রাতটার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক ঝলক রক্ত ছলকে উঠল। এখানে সেখানে কতগুলো পিঙ্গল বন্য চোখ জ্বলে উঠছে, আচমকা দেখলে মনের মধ্যে সংশয়ের খটকা লাগে। কিন্তু ওরা বন্য জন্তু নয়, অন্ধকারের মধ্যে গা মিলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিতান্ত অসহায় এবং অহিংস একপাল গোরু মহিষ। তাদের দৃষ্টিতে হিংস্রতা নেই, আছে পথ চলার ক্লান্তি, নতুন পরিবেশের কৌতূহল।

ছাউনির মধ্যে একপাশে ভানী ঘুমন্ত। অন্ধকারে নিঃশব্দে কে একজন নির্ভুল ভাবে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বৈজু? না বৈজু নয়।

—ভানী, ভানী, ভানী—

গলার স্বরে গভীর ঘুমের মধ্যেও ভানীর চেতনা সাড়া দিয়ে উঠল। সাত বছরেও ভানী সে স্বর ভুলতে পারেনি। সবটা কি মনে পড়ে? পড়ে না। তবু তো ভোলবার নয়। বিস্মৃতির জাল ছিঁড়ে সোনার আলো এসে চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, সমস্ত জানা-অজানা একাকার হয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ ওঠে। হারানো মানুষ কি কখনো ফিরে আসে না? আসে বই কি।

—কে?

—আস্তে, আমি। আমাকে চিনতে পারছিস না?

অন্ধকারেও ভানী চিনতে পারল। আজ আর সে দিন তার নেই। কখন যে কার মন কোনখান দিয়ে জেগে ওঠে কেউ সে কথা বলতে পারে না। এতদিন সে ছিল শিশুর মতো,

খানিকটা নির্বোধ আর প্রায় সবটাই অপরিণত। দেহ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চেতনার কোথাও সে পূর্ণতার ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে দুলে ওঠেনি। জীবনের অনেকগুলো বসন্ত শরতের মেঘ হয়ে ঔদাসীন্যের নীল দিগন্তের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেছে; বাইরের বসন্ত তাকে কোকিলের ডাকে আনমনা করে দেয়নি, তালের ঘাটপাতা পানা-পুকুরের পাশে বসে সে সকৌতুকে কোকিলের সঙ্গে কলহ করেছে। প্রথম কৈশোরে কেশোলালের দুঃসহ প্রেম তাকে কতটুকু আনন্দ দিয়েছিল মনে নেই, তার চাইতে ঢের বেশি দিয়েছে ব্যথা, দিয়েছে ভয়। কিন্তু এত দিন পরে জেগে উঠেছে ভানী। কামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভাঙা ভাঙা আভাস ইঙ্গিতে অনেক কিছুর অর্থ বুঝতে পেরেছে। আজ তার আবার সেই মানুষটাকে একান্ত করে বুকের মধ্যে পেতে ইচ্ছে করে,—সেই বলিষ্ঠ ঘর্মাক্ত বাহুর লোহার মতো কঠিন বন্ধনের মধ্যে এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে। হয়তো মরে যেতে পারলেও খুশি হয় ভানী।

—তুমি?

ভানী স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল, নেশাটা তার এখনো কাটেনি। এ যেন অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভব কিছু নয়। সোনাদীঘির মেলায় আসবার সময়েই তার অচেতন মনে কোথায় একটা সুনিশ্চিত আশ্বাস আর বিশ্বাসের ছায়াপাত হয়েছিল। কেন যেন মনে হয়েছিল, কেশোলালের সঙ্গে তার দেখা হবেই, মেলায় এত লোক এসেছে, নানা দিক থেকে নানা জাতের এত অসংখ্য লোক, পৃথিবীর কোথাও যেন কেউ বাকি নেই। এদের মধ্যে কেশোলাল কি থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে, তাকে এসে দেখা সে দেবেই। ভানী একান্ত-ভাবে দেহে মনে তার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

ভানী এবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল কেশোলালের ওপর, দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলে তাকে। কিন্তু এবারে বিব্রত হওয়ার পালা কেশোলালের, উগ্র আলিঙ্গনে যেন তারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। দিন বদলেছে, মানুষ বদলেছে। সে কেশোলাল নেই, সে ভানীও না। ভানী যতটা এগিয়েছে, কেশোলাল পেছিয়েছে তার চাইতে ঢের বেশি। যাঁতা ঘুরিয়ে আর কুড়ুল চালিয়ে ভানীর হাত আজ লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে, আর ফেরারী নরহন্তা কেশোলাল মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখে কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে স্টেশনে যায় আজকাল। মাঝে মাঝে হাঁপানীর মতো কী একটা অনুভব করে বুকের মধ্যে।

সুতরাং বলা বাহুল্য, বহুদিনের অদর্শনের পরে বাঞ্ছিতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে আনন্দে কেশোলালের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল না। ভানীর অমার্জিত গায়ের দুর্গন্ধ তার অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঠেকল। আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে কেশোলাল বললে, হাঁ, আমি।

চাপা কান্নায় ভানী আবার তার গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল।—এত দিনে তুমি এলে! আমি—

কথাটা কেশোলাল শেষ করতে দিলে না, শশব্যস্তে ওর মুখের ওপর চাপা দিলে হাতটা।

—চুপ—আস্তে আস্তে। তোকে নিয়ে যেতে এলাম, এখন থেকে আমার কাছে থাকবি তুই। কিন্তু গোলমাল করিস নে ; জানিস তো আমার পিছনে পুলিসের হুলিয়া ঘুরছে। কেউ টের পেলে সোজা ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

—না না, গোলমাল করব না।—ভানী আবার প্রাণপণে কেশোলালকে আঁকড়ে ধরল। কী দুর্গন্ধ মেয়েটার গায়ে, স্নান করে না, দাঁত মাজে না নিশ্চয়। মাথার চুলগুলো থেকে একরাশ ধুলো কেশোলালের চোখের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে, কির্‌কির্‌ করছে চোখ দুটো। আর নিশিবালা! দুজনের মধ্যে কত তফাত, কত বৈষম্য! ভানীকে মানুষ করতে নিশিবালার সময় লাগবে। কিন্তু যতই করুক স্ত্রীর প্রেমে পড়বার মতো রুচিবিকার তার ঘটবে না কোনোদিন, সে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পেয়েছে।

বিরক্তি চেপে কেশোলাল বললে, চল্‌ আমার সঙ্গে।

—এখুনি ?

—হাঁ, এখুনি।

—কোথায় যেতে হবে ?

অন্ধকারের মধ্যে কেশোলাল মুখভঙ্গি করলে, কথায় অবশ্য তার আভাস পাওয়া গেল না। জোর করে গলায় খানিকটা মধু ঢেলে দিয়ে বললে, আমি তো তোর সোয়ামী, যেখানে নিয়ে যাই।

পরম নির্ভরে ভানী বললে, চলো।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাত প্রায় দুটো। সোনাদীঘির জলে সপ্তর্ষির রেখাটা বেপথুমান জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো ঝলমল করছে। কামারপাড়ার বামারদের নাক ডাকছে। ঝোপের মধ্যে বসে যে শেয়ালটা এখনো অপহৃত হাঁসের একটা পাখা চিবোচ্ছিল, পরিতৃপ্তির আনন্দে সে হঠাৎ তারস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল। কেশোলালের হাত ধরে ভানী হেঁটে চলল, সোনা ফকিরের ভাঙা দরগায় ছড়ানো ইঁট পাথর তার পায়ে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল বারে বারে।

রাত বাড়তেই লাগল। মেলার গোরু-মহিষেরা জাবরের পোয়াল শেষ করে বসে পড়ল পা ভেঙে, পরিপূর্ণ বিশ্রান্তিতে তাদের চোখ এল ঝিমিয়ে—অন্ধকারে হিংস্র পিঙ্গল আলো আর এখানে ওখানে ঝিলমিল করে উঠছে না। সোনাদীঘির জলে জেগে উঠল ঝপঝপ ঝপাং করে খানিকটা শব্দ, প্রেমকৌতুকে ডাহুকী ডাহুককে তাড়া করেছে।

—এই তো ?

—হাঁ, এই।

নিঃশব্দ চরণে তিনটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে কামারদের ছাউনির সামনে। পেছনের তারা-খচিত আকাশের শ্বেতাভ পটভূমিতে মূর্তিগুলো যেন আঁকা, তাদের কাউকে চেনা যায় না। একজন বললে, দেশলাই জ্বালব?

—না, না।—নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর, যেন শোনা যায় না, অনুভব করা যায়: কিছু দরকার নেই, আমি ঠিক চিনে নেবো। হাঁ—ঠিক ওই ওকেই।

নিদ্রিত একটি নারীর মুখের ওপর শক্ত করে কাপড় চাপা পড়ে গেল মুহূর্তে। অন্ধকার। কী ঘটছে চোখ মেলে দেখবার অথবা সমস্ত চেতনাটা ভালো করে জেগে ওঠার আগেই তিন-চারজন বাহক তাকে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে তিরোহিত হল আমবাগানের মধ্যে। রূপাপুরের সৈনিকদের ঘুমন্ত শিবির থেকে তাদের রাজলক্ষ্মী অপহৃত হয়ে গেল—জন্ম-বিদ্রোহী দুঃসাহসী লৌহপেশল মানুষগুলি তার আভাসও পেল না। শুধু ঘুমের মধ্যে রামনাথ কামিনীর স্বপ্ন দেখতে লাগল। জড়িত স্বরে একবার যেন বললে, কই, কাছে আয়।

আমবাগানের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। এই পথ দিয়ে এমন অনেক গেছে অনেকবার, দু বছর পাঁচ বছর ধরে নয়, তিনশো বছর ধরে। বহু চোখের জলে এই পথ ভিজে গেছে, বহু অভিশাপে জর্জরিত হয়ে আছে এই পথের লতাগুল্মগুলো পর্যন্ত। কেয়া কাঁটার বনে ঘুমন্ত গোখরো সাপ ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে ঠকাস করে একটা ছোবল লাগাল মাটিতে—পোড়ো বাড়ির কোন্ প্রান্তে একটা তক্ষক বিকট শব্দ করে আঁতকে উঠল। এই পথের শেষ প্রান্তেই রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহল।

আর চমকে জেগে উঠলেন অপর্ণা, টেবিলের ওপর মাথা রেখে কখন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন টেরই পাননি। সামনে ঘড়ির কাঁটা চলে গেছে আড়াইটের ঘরে। আজ আর বিশ্বনাথ আসবেন না। অপর্ণা উঠে জানালা বন্ধ করে দিলেন, তার পর একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে নিবিয়ে দিলেন আলোটা। মূর্ছার মতো অন্ধকার এসে সমস্ত ঘরটাকে প্লাবিত করে দিলে—ঠিক সেই রকম অন্ধকার, যার প্রত্যাসন্ন সূচনায় কুমারদহের সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

বারো

মানিক ঘোষ অত্যন্ত সমস্যায় পড়ে গেল।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় হোক, কারো তাতে আপত্তি করার কারণ নেই। বরং দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, যেমন ষাঁড়ের লড়াই দেখে খুশি হয়ে আনন্দে করতালি দেওয়া—

মানুষ। মামলা মোকদ্দমা, মহকুমা কাছারী, সদর, হাইকোর্ট—জল্পনা-কল্পনায় লোকের সময় কাটে ভালো। কিন্তু বিপদটা যখন ধারালো একখানা খাঁড়ার মতো উলুখাগড়ার কাঁধেই নেমে আসতে চায় তখন সেটাকে আর তেমন উপভোগ্য বলে মনে হয় না। রাজবাড়িতে আগুন লেগে যখন তার অভ্রভেদী ঐশ্বর্য পুড়ে ছাই হয়ে যায় তখন আহা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা যায় বটে কিন্তু মজা দেখবার আনন্দটা পরিমাণে অনেক বেশি হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আগুন যখন গরীবের চালাঘরেও ছড়াতে শুরু করে, তখন ?

তখন যে কী হয় সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করছে মানিক ঘোষ। মা বিষহরী, রক্ষে কর মা, শোভাগঞ্জের থানে জোড়া পাঁঠা দিয়ে তোমার পূজো দেবো। রূপাপুরের কামারদের তো বিশ্বাস নেই, মেলা লুট হবে, দই ক্ষীরের ভাঁড় শেষ করবে—তা না হয় একরকম সয়ে যাবে। কিন্তু মানিক ঘোষের অনেক টাকা—তার যক্ষের ধন বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন—সাতখানা গাঁয়ে এ খবরটা অজানা নেই কারো। সেই টাকার জন্যে রূপাপুরের কামারেরা এসে তার পেটটা ফাঁসিয়ে দেবে এটা কাজের কথাই নয়।

অতএব আর বিলম্ব নয়। যা করতে হয়, এখুনি। দেবী বিষহরীকে মানত করা হয়েছে বটে, কিন্তু এই নিদারুণ কলিযুগে দেবতারা সব যোগনিদ্রায় আছেন, তাঁদের ওপর পুরো-পুরি বিশ্বাস রাখা চলে না। আল্‌কাপওয়ালা ব্রজহরি পাল বরং বুদ্ধিমানের কাজ করেছে, পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। মনে হচ্ছে, সেই পথটা অবলম্বন করাই শ্রেয় এক্ষেত্রে। কিন্তু তার আগে—

মাথায় হাত দিয়ে মানিক ঘোষ জবুথবু হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তার পরেই উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। খুড়তুতো ভাই খোকা ঘোষকে ডাক দিয়ে বললে, তুই বোস দোকানে, আমি আসছি।

খোকা ঘোষ অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে তখন ঘিয়ের সঙ্গে বাদাম তেল মিশিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যাপৃত ছিল। চোখ না তুলেই বললে, এই সন্ধ্যেবেলায় আবার কোথায় চললে ? তাগাদায় নাকি ?

—না, তাগাদায় নয়। অন্য কাজ আছে, নবীপুরে যাচ্ছি। একটু রাত হবে। তুই হুঁসিয়ার থাকিস।

খোকা ঘোষ বিস্মিত হয়ে বললে, হুঁসিয়ার কেন ?

—না, এমনি বললাম।—মানিক বেরিয়ে এল।

সন্ধ্যা আসছে কালো হয়ে। রূপাপুরের কামারদের ওখানে গানের কোলাহল। মেলার যাত্রীদের বহু-মিশ্রিত কথায় কলরবে আকাশ মুখর হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবদের আস্তানায় ঝম ঝম টুম টাম করে বাজছে খোল আর করতাল। খোপরাপট্টিতে ভিড় জমেছে, আরো বেশি করে জমেছে নিশিবালার দরজায়। বাতাসে ভাতের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, ধুলোর গন্ধ, সোনা-

দীঘি থেকে শ্যাওলা আর পাঁকের গন্ধ—অনেক দিন পরে জলে আলোড়ন পড়েছে। আর সকলের মাথার ওপরে মেলার দক্ষিণ কোণে দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর একটা নাগরদোলা স্তব্ধ হয়ে আছে—কাল থেকে ওটা চক্রাকারে পরিভ্রমণ করবে।

বাঘের তাড়া খেলে মানুষ যেমন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, ঠিক তেমনি ভাবেই ধাবমান হল মানিক ঘোষ। কুমারদহ থেকে নবীপুর পুরো তিন মাইল পথ। রাস্তা খুব অনুকূল নয়। অসমতল পথ। আমবাগানের ঘন ছায়ায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাশি রাশি ইটের টুকরোয় প্রতি পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে তাকে। তাছাড়া দুপাশে মজা দীঘি, সাপের রাজত্ব। দুটো-একটার তেড়ে আসাও বিচিত্র নয়। কিন্তু মানিক ঘোষের সেদিকে লক্ষ্য নেই, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় লালাজীকে খবরটা পৌঁছে দেওয়া দরকার। লালাজী কুমার বিশ্বনাথের মতো শূন্যদম্ভের পূর্ণপাত্র নন—কিছু বিনিময় তাঁর কাছ থেকে মিলবে। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ, কাজ বোঝেন ভালো।

তিন মাইল পথ চলার অবিরাম গতিতে হাওয়া হয়ে গেল। যাওয়ার পথে শোভাগঞ্জের হাটে বিষহরীর থানে আর একটা প্রণাম ঠুকে গেল মানিক ঘোষ। মা বিষহরী, এযাত্রা রক্ষা করো মা। জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো। যতই ঘুমিয়ে থাকো না কেন, এক জোড়া পাঁঠার লোভ সোজা নয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ঠিক জাগিয়ে দেবে।

লালা হরিশরণের গদীবাড়ি। চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, প্রতিহারী মহাবীরজীর দুটো পিতলের চোখ জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। প্রকাণ্ড লোহার নিক্তিতে ধান মাপা হচ্ছে এখনো। পন্দ্র পন্দ্র—ষোড়ো। একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তার আলোতে দেওয়ালের গায়ে লেখা 'লাভ শুভ' যেন রক্তের অক্ষর বলে মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির নিচে বসে লালাজীর খাস বরকন্দাজ শিউ পাঁড়ে খৈনী ডলছে। অন্ধকারের মধ্যে সংশয়গ্রস্ত পায়ে মানিক ঘোষ থেমে দাঁড়াল একবার। নাকে ভালো করে টেনে নিলে বেনেতী মশলার গন্ধটা। কী করা যায়!

শিউ পাঁড়ে হেঁকে বললে,—কোন্?

ভীত গলায় মানিক বললে, আমি শোভাগঞ্জের লোক।

গলার স্বরে শিউ পাঁড়ে চিনতে পারল।—আরে কে, ও ঘোষ মুশা? কী মনে করে?

আর একবার নাকে বেনেতী মশলার গন্ধ টেনে বুকে সাহস বেঁধে নিলে মানিক।—একবার দেখা করব মহাজনের সঙ্গে।

—কেয়া কাম?

—সোনাদীঘির মেলা…

—সোনাদীঘির মেলা?—চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ আর সন্দিগ্ধ করে তুলল শিউ পাঁড়ে।—মেলা তো এবার হামাদের আছে ঘোষ মুশা। কোনো গোলমাল আছে নাকি

—হুঁ, গোলমাল আছে বই কি। তাই তো লালাজীর কাছে ব্যাপারটা বলতে ছুটে এলাম। দেখা পাওয়া যাবে না এখন?

—জরুর।—শিউ পাঁড়ে উঠে চলে গেল।

সব শুনে লালাজী হাসলেন একটু। মনের ভিতর যে আগুন জ্বলে উঠেছিল বাইরে তার কণামাত্রও প্রকাশ পেল না।…বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর এইটুকুই তফাত। এমন যে হতে পারে লালাজী তা জানতেন। বিশ্বনাথের মতো লোক—মদের বোতল আর রেসের ঘোড়ার সঙ্গে যার জীবনের সুর বাঁধা—দেবীকোট রাজবংশের অর্থহীন অহমিকাই যার সঞ্চয় তার কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু এর জন্যে লালাজী তৈরি। বিশ্বনাথের নিজের অস্ত্রই তাঁর মৃত্যুবাণ হয়ে উঠবে। লাগুক ফৌজদারী, ভাঙুক মেলা। অজগরের শেষ পাক। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহলের শেষ আলোটিও নিভে যাবে, অন্তহীন অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সমস্ত।

লালাজী শান্তস্বরে বললেন, না না, কিছু হবে না ওসব। কুমার বাহাদুর তো আর পাগল নন।

নাক ভরে বেনেতী মশলার গন্ধ টানতে লাগল মানিক ঘোষ।

—আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না মহাজন। কুমার বাহাদুরের হালচালই ওই রকম। যে অবস্থা হয়েছে কিছু অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। এখুনি আপনি পুলিসে খবর দিয়ে—

—পুলিস!—লালাজী অবজ্ঞাভরে হাসলেন: পুলিসের দরকার হবে না, ওটা দুর্বল লোকের ভরসা।

—মনে রাখবেন আমাকে।

—নিশ্চয়, মনে থাকবে বই কি।

আভূমি অভিবাদন করে মানিক বিদায় নিলে।

রামদেইয়াকে তামাক আনতে বলে ফরসীটা টেনে নিলেন লালাজী। বড় হতে হবে—কুমারদহের নাম লোপ করে দিয়ে তাকে করতে হবে হরিশরণপুর। কিন্তু ভারী হাঙ্গামা, বড় হট্টগোল! এর চাইতে ব্যবসায়ী জীবনই ভালো, নিশ্চিন্তে দিন চলে, টাকা আসে, পয়সা আসে, প্রাচুর্যের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে চরিতার্থ বোধ হয়। নদীর ধারে ধারে দশ-বারোটা প্রকাণ্ড গোলায় ধান জড়ো হয়। ধান তো নয়, যেন মুঠি মুঠি সোনা। নিজের মধ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকলেই বোধ হয় সব চাইতে ভালো হত সেটা।

কিন্তু না। নিজের দুর্বলতাকে বজ্রস্বরে একটা ধমক লাগালেন লালাজী, এ চলবে না কোনোমতেই। খেলা যখন শুরু হয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত এর শেষ দেখতে হবে। হার জিত? সে ভাবনা লালাজীর নেই। ব্যবসার চালে এতদিন যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে

এবারে তা হবে না। বিশ্বনাথের মতো রাজত্ব করবার বাসনা তাঁর নেই, কিন্তু রামসুন্দর লালার কলঙ্কিত কাহিনীকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে। কুমারদহ আর কোনদিন থাকবে না, চালের কলের কালো কালো চোঙা নিয়ে মাথা তুলবে হরিশরণপুর।

রামদেইয়া তামাক নিয়ে এল। একবার সপ্রশ্নভাবে লালাজী তার মুখের দিকে তাকালেন।

—রামদেইয়া ?

—জী মহাজন ?

—এবার সোনাদীঘির মেলায় আমি যাব, নিজেই কাছারী করব সেখানে।

—আপনি, হুজুর ? সোনাদীঘির মেলায় ?—রামদেইয়ার বিস্ময় যেন বাধা মানল না।

—হাঁ, আমিই।—লালাজী আবার অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে হাসলেন: রাজারাজড়ার ব্যাপার তো, বিশ্বাস নেই কিছু। কাছাকাছি থাকাই ভালো।

রামদেইয়া আর প্রশ্ন করল না। শুধু কী করতে হবে তাই জানবার প্রতীক্ষাতেই সামনে চুপ করে বসে রইল আর একটু একটু হাওয়া দিতে লাগল ফরসীর কলকেটাতে।

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া হাওয়ায় বিকীর্ণ করে দিয়ে লালাজী বললেন, হাঁ, কাল ফজিরমেই তাম্বু চড়াও ওখানে। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে একটা ভালো জানপহ্‌চান করা যাক।

রামদেইয়া কাজের লোক। ভোরের আগেই সোনাদীঘির পাড়ে লালাজীর তাঁবু বসে গেল। ঝালর দেওয়া লাল-মখমলের পর্দা—মাথার ওপর লাল রঙের একটি পতাকা। সৈনিকদের মাঝখানে রাজার উদ্ধত শিবিরের মতো। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সকালের প্রথম রোদে সেই পতাকাটি দেখতে লাগলেন অপর্ণা। তাঁর বিনিদ্র চোখ হঠাৎ জ্বালা করে উঠল। কাল সারারাত তাঁর শূন্য প্রতীক্ষায় কেটেছে, বিশ্বনাথ আসেননি।

বেলা একটু বেড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রূপাপুরের কামারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সেই চাঞ্চল্য ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল, তারপর গর্জন করে উঠল ঝড়ের মূর্তি নিয়ে। কামিনী আর ভানীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সকালে উঠেই সদাসন্ত্রস্ত রামনাথ সন্ধান করেছিল কামিনীর—কিন্তু কামিনীকে পাওয়া যায়নি। তখন মনে হয়েছিল সে বাইরে কোথাও গেছে, ফিরে আসবে একটু পরেই। ভানীর কথা কেউ ভাবেনি, তার সম্বন্ধে কারো বিশেষ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা ছিল না। কিন্তু বেলা যতই বাড়তে লাগল, ততই রামনাথের সন্দিগ্ধ মন আরো বেশি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

তার পরেই আস্তে আস্তে ব্যাপারটা একটা সুস্পষ্ট রূপ নিতে লাগল সকলের কাছে। কোনো মনের মানুষের সঙ্গে সরে পড়েছে কামিনী। তাকে পছন্দ করে নিতে পারেনি। যেটুকু ভালোবেসেছে তা রামনাথের ভয়ে, তার পাশবশক্তির বশীভূত হয়ে। কিন্তু মানুষের মন শুধু ভয়কেই মেনে চলে না, তার নিজের স্বাধীন ধর্ম আছে, সেখানে সে স্বচ্ছন্দ—সে গতিশীল। অন্তত এই ব্যাখ্যাটাই সহজ। এ ছাড়া কীই বা হতে পারে আর?

তাড়ির নেশা ভেঙে সদ্য-জেগে-ওঠা পাথরের মতো জোয়ানগুলো বসে রইল হতবাক্ হয়ে। কামিনীর ব্যবহারে তারা বিস্মিত হয়নি, তারা ভয় পেয়েছে রামনাথের জন্যে। রামনাথের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রেরণার কেন্দ্র যে আজ কোথায় একথা বুঝতে বাকি নেই কারোই। যাযাবর মন যখন ঘর বেঁধেছে তখন নিজের সব কিছু দিয়েই বেঁধেছে। নতুন ফসল, নতুন আশা, নতুন জীবন অদূরাগত সন্তানের মুখ চেয়ে কী আশায় যে রামনাথ দিন গুনছিল একথা তো অজানা নেই কারো কাছেই।

বৈজু একপাশে বসে বিড়ি টানছে চিন্তাকুল মুখে। ভুল হয়ে গেছে, যা ভেবেছিল ফল হয়েছে তার উল্টো। রামনাথের ওপরে তার বিদ্বেষ নেই কোনো—কামিনীর সম্বন্ধে কোনো শত্রুতাই সে পোষণ করে না। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তাকে ঠকিয়েছে। ভুলটা সে টের পেয়েছিল একটু পরেই, কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিল না। বাঘের মুখ থেকে তার বাচ্চাকে বরং কেড়ে আনবার কল্পনা করা চলে কিন্তু কুমার বিশ্বনাথের উদগ্র উন্মত্ততার হাত থেকে কামিনীকে উদ্ধার করবার এতটুকু সম্ভাবনা ছিল না কোথাও। সে চেষ্টা করলে ভোর হওয়ার আগেই হাঁসমারীর খাঁড়ির ঠাণ্ডা কাদার মধ্যে আরো সংখ্যাতীত, তিনশো বছর থেকে সঞ্চিত কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে তাকেও ঘুমিয়ে থাকতে হত। মদের নেশায় কুমার বিশ্বনাথ তখন নতুন মানুষ—হিংস্রতায় আর লোলুপতায় বন্য পশুও তাঁর কাছে হার মানে। তখন তাঁর সামনে দাঁড়াবার স্পর্ধাও ছিল না বৈজুর।

অনুতাপ বোধ হচ্ছে বৈজুর—অত্যন্ত তীব্র প্রবল একটা অনুতাপ। কিন্তু কিছু বলা চলবে না—রূপাপুরের কামারেরা তাহলে মুহূর্তে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছাতু করে দেবে। আর সব চাইতে আশ্চর্য লাগছে ভানীর ব্যাপারটা। ভানী গেল কোথায়? কোন্ মন্ত্রবলে উড়ে গেল সে? কোথাও তার কোনো চিহ্ন নেই, কুমার বিশ্বনাথের রংমহলেও যে সে অভিসার করেনি, এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহও নেই বৈজুর মনে। তাহলে ভানী গেল কোথায়, কে নিয়ে গেল তাকে?

সংশয়ে আর বিস্ময়ে বৈজুর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল।

হৃদয় কেমন যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। রামনাথের দিকে বার বার সে তাকাচ্ছে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে।

হাঁটুর ওপর মাথা রেখে মোটা মোটা দুখানা কালো হাতে হাঁটু আঁকড়ে ধরে সে চুপ

করে বসে আছে। কোনো কথা বলছে না, বিক্ষোভ প্রকাশ করছে না এতটুকুও। তার উত্তেজিত হয়ে ওঠবার ক্ষমতাটাও যেন কামিনী কেড়ে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা স্বরযের ভালো লাগল না।

স্বরয কাছে এসে ডাকল, সর্দার ?

রামনাথ জবাব দিলে না।

স্বরয আর একবার তাকে স্পর্শ করলে, সর্দার শুনছ ?

রামনাথ এবার মুখ তুলল। রক্তের মতো রাঙা দুটো চোখ, অশ্রুতে ঝাপসা। মুখের চামড়াগুলো যেন শিথিল আর কুঞ্চিত হয়ে ঝুলে পড়েছে। সমস্ত চেহারায় বার্ধক্যের ছায়া নেমেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সর্দার এত বুড়ো হয়ে গেল !

—এখন আমরা কী করব সর্দার ?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় জবাব দিলে রামনাথ। যেন কথাটা সে স্বরযকে বললে না, বললে নিজেকেই।

—কিছুই না।

—কিছুই না ? খুঁজে তো দেখতে পারি ?

—কোথায় খুঁজবি ? একটা অপরিসীম নিরাসক্তি আর গ্লানি এসে যেন আশ্রয় করেছে রামনাথকে : কী হবে খুঁজে ? যে চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াই তো ভালো।

—তুমি, তুমি এ কথা বলছ তাউই ? রূপাপুরের কামার হয়ে তুমি চুপ করে থাকবে ? তুমি সর্দার, তোমার অপমানে আমাদের সকলের অপমান।

ইচ্ছে করেই কথাটা বলেছে স্বরয। রামনাথকে সে আঘাত করতে চায়, খোঁচা দিয়ে উদ্বোধিত করে তুলতে চায় তার পৌরুষকে। এমন মড়ার মতো নিঝুম মেরে পড়ে না থেকে সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক, গর্জন করে উঠুক—একটা হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলুক। সেটা সইবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিরুত্তেজ স্তব্ধতা—সকলের মাঝখানে বসে সর্দারের এই অসহায় একাকিত্ব, এটাকে যেন শুভ সংকেত মনে হয় না। কী একটা অমঙ্গল আশঙ্কা ভারাতুর করে দেয় স্বরযের চেতনাকে, মনে পড়ে তার খুড়ো মটর কামারকে। একমাত্র জোয়ান ছেলেটাকে বুনো শূয়োরে গুঁতিয়ে মারবার পর থেকে এমনি চুপ করে বসে থাকত, এমনি অর্থহীন চোখ মেলে তাকাত। তারপর একদিন সকালবেলায় দেখা গেল, মটর ঘরের মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে। বিস্ফারিত চোখ দুটোয় উড়ছে মাছি, ঠোঁটের পাশে গড়িয়ে-পড়া শুকনো লালার ওপরে পিঁপড়ের ভিড় জমেছে।

স্বরযের মনটা ভয়ে চন চন করে উঠল।

—কথা কও সর্দার, কথা কও।

—কী বলব ?—রামনাথ আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল।

—আমরা খুঁজে দেখব,! এই মেলার কোনো ঘরে যদি লুকিয়ে থাকে। যে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে তাকে পেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব আমরা।

—না।—মাথা না তুলেই রামনাথ বললে, না। আমারই ভুল হয়েছিল। আমার ঘরে ওর মন বসবে কেন? ওর বয়েস কাঁচা, ওর সাধ-আহ্লাদ আছে। যেখানে গেছে যাক। আমার দিন তো ফুরিয়ে এল!

আশ্চর্য রামনাথের কথার স্বর। রূপাপুরের রক্ত ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক দিন। আগের বউকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে রামনাথই গলা টিপে মেরেছিল, বার কয়েক সাঁড়াশীর মতো কঠিন নিষ্পেষণে তার হাত বেয়েই কয়েক ফোঁটা গরম রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। আজো রামনাথের হাতে সেই নরম শিরাগুলোর অন্তিম অনুভূতি লেগে আছে, সেই রক্তের স্পর্শ এখনো তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। রামনাথের সেই শেষ খুন। তারপর থেকে অনুতাপ জেগেছে, বার্ধক্য নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনকে ভারাতুর করে দিয়েছে অতীত দুষ্কৃতির সেই প্রতিক্রিয়া। তাই বড় আশা করেই রামনাথ ঘর বাঁধতে চেয়েছিল—করতে চেয়েছিল সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু অত সহজেই তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি—কামিনী চলে গিয়ে যেন সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করে দিলে। যার গলা টিপে খুন করেছিল, এত সহজেই সে কি তার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে!

চোখ তুলে রামনাথ গভীর গলায় বললে, এই ভালো, এই ভালো।

স্বরয সবিস্ময়ে বললে, কী ভালো?

—কিছু না—

রামনাথ আবার হাতের মধ্যে মুখ লুকালো।

স্বরয ধীরে ধীরে বললে, তা হলে যাব একবার জমিদারের কাছে, দরবার করব?

—না না না।—বিকৃত গলায় অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করে উঠল রামনাথ: কিছু করতে হবে না।

স্বরয তিন পা পিছিয়ে সরে দাঁড়াল।

রূপাপুরের কামারদের হাঁপরগুলো চলতে শুরু করেছে। লোহার পাতের ওপর ঠন্ ঠন্ করে পড়ছে হাতুড়ির ঘা—আগুনের ফুলকি ছিটকে উড়ে যাচ্ছে। মেলায় নতুন লোক আসবার বিরাম নেই। আজ তেসরা ভাদ্র, দলে দলে লোক ঘড়া-কলসী নিয়ে নামছে দীঘিতে, জল ভরে নিচ্ছে। এ জল আর জল নেই, সোনা ফকিরের মন্ত্রপূত দুধ হয়ে গেছে এখন। এই জল খেলে রোগব্যাধি ভালো হয়ে যাবে, মৃতবৎসার সন্তান দীর্ঘায়ু হবে, অপুত্রক পুত্র লাভ করবে, আরো কত কী যে ঘটবে লোকেও তা ভালো করে জানে না। মানুষের হট্টগোলে পানকৌড়ি-দম্পতি পানা আর শ্যাওলার আশ্রয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে। সকলের মাথার ওপর নাগরদোলাটা এর মধ্যেই বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করে

দিয়েছে। ওদিকে কাপড়পট্টিতে নবীপুরের মহাজনেরা দোকান সাজাতে সমস্বরে আহ্বান করেছে সিদ্ধিদাতাকে। ময়রাদের উনুনে আঁচ গন্ গন্ করে উঠেছে, কড়াইতে চিড়্‌বিড়্ করছে কটু-গন্ধী-ভেজাল-তেল—তার মধ্যে ছ্যাক্ ছ্যাক্ করে পড়ছে জিলিপি। ওদিকে একটা দোকানের সামনে কতকগুলো রঙীন বেলুন উড়ছে, ভেঁপু বাজছে। সোনাদীঘির মেলা রাত্রির সুখনিদ্রার পরে প্রখর আর সতেজ হয়ে উঠছে।

আর এদিকে অশ্রান্ত শব্দ করছে কামারদের হাপরগুলো। যেমন রামনাথের ব্যথাবিদ্ধ হৃৎপিণ্ড থেকে এক একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে, শব্দটা সেই জাতীয়। একবার রামনাথের দিকে অনুতপ্ত দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বৈজু সেখান থেকে উঠে গেল।

বৈজু উঠে গেল, কিন্তু মনের দিক থেকে স্বস্তি বোধ করতে পারল না। কিছু একটা করা দরকার, অন্তত কর্তব্যের তাগিদেই দরকার। আর যাই হোক রামনাথকে শ্রদ্ধা করে সে, তার এত বড় ক্ষতি সে কিছুতেই করতে রাজী নয়। লালা হরিশরণের দেওয়া সেই নোটগুলোর একটা বিশ্বনাথের হাত দিয়ে তার হাতে এসে পৌঁছেছে—সেটা যেন বৈজুর হাতখানা পুড়িয়ে দিচ্ছিল জ্বলন্ত টিকার ছোঁয়ার মতো।

মেলার মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে নাগরদোলা। লালা হরিশরণের তাঁবু বসেছে রাতারাতি—যেন জয়োদ্ধত একটা শিবির। পরাভূত কুমারদহকে যেন ব্যঙ্গ করছে। খোপরাপট্টির সামনে ভিড় জমেনি এখনো, এই দিবা দ্বিপ্রহরে ওখানে পাশব-ক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্যে ঢুকতে কিছু সংকোচ বোধ করছে। গোধূলির প্রতীক্ষাতে আছে তারা। আড়-নয়নে সেদিকে একবার তাকালো বৈজু।

সামনে তাড়ির দোকান। ভাদ্রের রোদ আগুন হয়ে ঝরে পড়ছে এর মধ্যেই। গলাটা শুকিয়ে কাঠের মতো লাগছে, ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। কাল সারারাত ঘুম হয়নি এতটুকুও, বৈজু এগিয়ে গেল সেদিকে।

ভাঁড় তিনেক তাড়ি উদরস্থ করে সেখান থেকে উঠে পড়ল সে। শরীরটা বেশ চাঙ্গা বোধ হচ্ছে—চনচন করছে রক্ত। কিছু একটা করা দরকার। টিকিধারীর দল এখনো এসে পৌঁছোয়নি। বিকেল নাগাদ বসবে জুয়ার আড্ডা। খোপরাপট্টির দিকেও এখন যাওয়া চলবে না। উদ্দেশ্যহীনভাবে মেলার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল বৈজু। একবার নাগরদোলায় চড়ে দেখলে কেমন হয়? আকাশে ওড়ার শখটা মিটিয়ে নেওয়া যায় তা হলে।

বৈষ্ণবীদের আড্ডায় গান চলেছে। এও এক রকমের ব্যবসা। খোপরাপট্টির নামান্তর। তিনজন মোহান্ত তেত্রিশজন বৈষ্ণবী দিয়ে কী করে? হাফপ্যাণ্টপরা জুট অফিসের রসিক কেরানীটি একঠোঙা তেলেভাজা জিলিপি নিয়ে কাঁচা বয়সের একজন বৈষ্ণবীকে সাধাসাধি করছে। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সাধু। বৈজু একবার থেমে দাঁড়ালো। ওখানে একটু চেষ্টা করে

দেখলে কেমন হয় ? কুমার বিশ্বনাথের দেওয়া নোটটার অর্ধেক মাত্র খরচ হয়েছে— বাকিটা এখনো সৎকাজে ব্যয় করতে পারে সে। কামিনীকে বিক্রি করা টাকা অন্য কোনো কামিনীর সেবাতেই নয় লাগুক।

—এ কামার ভাই!

ঘাড়ের ওপরে সস্নেহ করস্পর্শ : এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে যে ?

বৈজু চমকে পিছন ফিরল। রামদেইয়া। লালাজীর খাসবরদার। বৈজুর সঙ্গে একটু সম্পর্ক আছে। লালাজীর অগোচরে শোভাগঞ্জের হাটখোলায় দুজনে একসঙ্গে কিছু কিছু গঞ্জিকা সেবন করে থাকে।

—রাম রাম পাঁড়েজী। তুমি এখানে ?

—হাঁ, হুজুরের সঙ্গে এলাম। তারপর, খবর কী ?—রামদেইয়া গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে এল : এবার তো সোনাদীঘির মেলা আমাদের। তোমরা নাকি দল বেঁধে এসেছ, দাঙ্গা করে মেলা ভেঙে দেবার মতলবে ?

বৈজু চুপ করে রইল।

রামদেইয়া বললে, ছি দোস্ত ছি! তুমি যে এমন নেমকহারামী করবে তা কখনো ভাবিনি। এত তামাক খাওয়ালাম গাঁটের কড়ি খসিয়ে, এই তার ফল ?

বৈজু ভাবছিল অন্য কথা। মাথার মধ্যে তাড়ির নেশা বিদ্যুতের মতো কাজ করে যাচ্ছে। রামনাথের মুখখানা মনে পড়ে যাচ্ছে, কী অসহায়, কী সকরুণ! নেশার ঝোঁকে হঠাৎ বৈজুর সব বেসামাল হয়ে গেল। ভারী বিশ্রী লাগছে তার—বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে।

বৈজু হঠাৎ ভেঙে পড়ল : মাপ করো ভাই, মাপ করো। ভারী হারামীর কাজ করেছি আমি, ভারী হারামীর কাজ—

ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে এক পশলা জল নেমে এল।

রামদেইয়া সবিস্ময়ে বললে, একি দোস্ত, একি ? সকালেই বুঝি এক চোট জবর টেনে এসেছ ? এই ভোরে এত নেশা করে মানুষ ?

বৈজু ফোঁপাতে লাগল : না পাঁড়েজী না, না। ভারী অন্যায় করেছি আমি, ভারী ভুল হয়েছে। এমন করে সর্দারের সর্বনাশ তো আমি করতে চাইনি। ভারী তাজ্জব কী বাৎ —ভানী রাতারাতি কামিনী হয়ে গেল, আর তাকে আমি পৌঁছে দিলাম কুমার বাহাদুরের রংমহলে। সর্দার এ খবর পেলে আমাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

পাপীর মর্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি রামদেইয়াকে যেন অভিভূত করে দিল। ঘন হয়ে বৈজুর কাছে এসে দাঁড়ালো, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে সে মূল্যবান রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। বৌ পালিয়েছে, এ খবরটাই গোটা মেলাতে জানাজানি হয়ে গেছে তখন।

—এসো দোস্ত তুমি আমার সঙ্গে, দুটো কাজের কথা আছে। বৈজুকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে রামদেইয়া লালাজীর তাঁবুর দিকে নিয়ে চলে গেল।

তেরো

ভোরের আলো ভালো ফোটেনি তখনো। হিজলবনের ভেতর দিয়ে রাস্তাটায় ঘন অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে, দুপাশে কুঁজি কাঁটা আর ইকর ঘাসে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে গঙ্গা ফড়িং। সমস্ত বনটা নিঃশব্দ আর নিঃসাড়। সারারাত হাল্কা বাতাসে ফিস্‌ফাস করে কথা বলেছে পাতারা, ঘাসের বনের মধ্যে চলা-ফেরা করেছে সাপের দল, বকের বাচ্চারা কান্নাকাটি করেছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অসহায় মানবশিশুর মতো। ভোরের ছোঁয়া লাগতেই রাত্রির জীবন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। একটি দুটি করে বক পাখা মেলে উড়ছে অলক্ষ্য বিলের সন্ধানে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর বনপথটা একটু একটু করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ভানী থেমে দাঁড়াল। —আমার ভয় করছে।

কেশোলাল বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু এখনো সময় হয়নি। সোনাদীঘির মেলা পেরিয়ে ওরা বেশি দূরে আসেনি—দুখানা মাঠের ওপারেই কুমারদহ মাথা তুলে রয়েছে। দিনের আলো ফুটলেই রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহলের ভাঙা চুড়োটা এখান থেকেই চোখে পড়ত। কেশোলালের এই পথটা তাড়াতাড়িই পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, একটু জোরে হাঁটতে পারলে বেলা দশটার ট্রেনটাও ধরা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ভানী হাঁটতে চায় না, কথা বলতে চায়। সাত বছর ধরে অনেক কথা জমে উঠেছে—তার মনে অনেকগুলো অনুযোগ, অনেক বেদনা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেগুলো শুনে যাচ্ছে কেশোলাল, জবাব দিচ্ছে যথাসাধ্য সংক্ষেপে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে নিশিবালাকে। নিশিবালার প্রেম কত মুখর, কত চটুল, কত লীলাচপল। আর ভানী! গায়ে বিশ্রী দুর্গন্ধ, অমার্জিত চালচলন, কতদিন যে দাঁত মাজে না। মুখ থেকে একটা পচা দুর্গন্ধের তরঙ্গ এসে কেশোলালের ক্ষণিক প্রেম-চেষ্টাকেও স্তব্ধ করছে।

তেমনি বিরক্তি গোপন করে কেশোলাল বললে, ভয় করছে কেন?

—যা জঙ্গল!

—আমি সঙ্গে আছি, তোর ভয় কিসের? তাছাড়া—গলাটা আর একবার সাফ করে নিলে কেশোলাল: রাতারাতি এ তল্লাট পার হয়ে যেতে হবে। আমার অবস্থা তো জানিস, দারোগা যদি ধরতে পারে তো শহরে নিয়ে ঠিক ফাঁসে লটকে দেবে। সেই চৌকীদার ব্যাটাকে ফুঁড়ে দিয়েছিলাম মনে নেই তোর? তাই গরুর গাড়ির লিক্ না নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরেছি।

—এতদিন পরেও তোমাকে চিনতে পারবে ওরা ?

—কেন পারবে না ?—এবারে কেশোলাল ধমক দিয়ে উঠল : তুই চিনলি কেমন করে ? পুলিসের চোখ শয়তানের চোখ, সব চিনতে পারে ওরা, সব টের পায়। তুই যদি তাড়াতাড়ি হাঁটতে না পারিস তাহলে চৌকীদার এসে কপ্ করে ঠিক ধরে নেবে দেখিস। আমাকেও, তোকেও।

—তোকেও !—ভানী চমকে উঠল। না, না, পুলিসের হাতে আর তো পড়তে চায় না সে। সাত-আট বছর আগেকার সে অভিজ্ঞতা এখনো ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়নি তার স্মৃতি থেকে। সে দুঃস্বপ্ন ভানী কখনো ভুলবে না। সেই বেঁটে টাকমাথা দারোগা, শেয়ালের মতো চোখ। সেই দাড়িওয়ালা গাড়োয়ানটা, কুকুরের মতো চোখা দাঁতগুলো। আরো কয়েকটা শেয়াল কুকুর—তাদের ভালো করে মনে পড়ে না আজকে। কিন্তু এটা স্পষ্ট মনে পড়ে, তারা সবাই মিলে একসঙ্গে যেন ওকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে খাবার চেষ্টা করেছিল।

সব কথা সে খুলে বলেছে কেশোলালকে। নির্বোধ বিশ্বাসে স্বামীর কাছে অকপটভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে তার সমস্ত লাঞ্ছনা আর অপমানের ইতিহাস। শুনে মুহূর্তের জন্যে কেশোলালের মুখ কালো হয়ে গেছে, শুধু মুহূর্তের জন্যে সমস্ত শরীরের রক্তে যেন সাপের বিষের জ্বালা ধরেছে, ইচ্ছে হয়েছে—

কিন্তু ওই এক মুহূর্ত। তারপরেই আর কিছু নেই। শান্ত হয়ে গেছে সে, স্তিমিত হয়ে গেছে। রূপাপুরের রক্তকে মেরে ফেলেছে নিশিবালা, নিশিবালার মতো আরো অনেকে। সহর আছে, শৃঙ্খলা আছে,—সভ্যতার মোহ আছে। তারা সবাই মিলে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে কেশোলালকে—আর কোনদিন সে-ঘুম ভেঙে সে জেগে উঠবে না। ভানীর কাহিনী শুনে তার মনে আরো খানিকটা তিক্ত বিস্বাদ চাড়া দিয়ে উঠেছে ; আর যাই হোক ঘুণে-খাওয়া বাঁশ নিয়ে ঘর বাঁধা চলবে না কোনো উপায়েই।

ভানী বললে, চলো তাহলে, তাড়াতাড়িই চলো।

কেশোলালের আসল কথাটা পুলিসের জন্য ভীতি নয়। মুখে বসন্তের দাগ পড়েছে, দাড়ি নেমেছে, গলার স্বর বদলে গেছে পর্যন্ত। তার নাম আজিমুদ্দিন ব্যাপারী। পুলিসের চোখের সামনে সে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিন বছর ধরে। সুতরাং সে ভয় তার নয়। নিশিবালা তাকে উপদেশ দিয়েছে রাতারাতি ভানীকে শহরে নিয়ে গিয়ে ঠিকানায় পৌঁছে দিতে। সে বড় চমৎকার জায়গা, কত আন্‌কোরা বউ-ঝি দুদিনেই সেখানে টিট্ হয়ে যায়। দিন তিনেক মুখে কাপড় বেঁধে ঘরের শিকল আটকে রাখলেই চলবে। আর ভানী তো গ্রাম্য আর নির্বোধ মেয়ে, স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, ব্যাপারটা তার ভালো করে বুঝতেও বেশ কিছুদিন সময় নেবে। তারপর সে কেশোলালেরই আয়ের পথ হয়ে যাবে একটা। ভানী টাটকা নতুন জিনিস, সহরের খদ্দেরেরা একরকম লুফে নেবে তাকে। একটা শাঁসালো

মাড়োয়ারীও জুটে যেতে পারে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে কেশোলাল বললে, তোর ভালো শাড়ি চাই, না?

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ভানী শুধু তাকাচ্ছে চারদিকে। ভোরের আলোয় অবয়বহীন হয়ে এলোমেলো জঙ্গল নিস্তব্ধ। মাথার ওপর পাতার নিশ্ছিদ্র আচ্ছাদন, পায়ের নিচে ঝরা পাতা মড় মড় করছে, ইকড় আর বিন্না ঘাসের আগাগুলো থেকে থেকে পা জড়িয়ে ধরছে, সাপের শীতল স্পর্শ বলে সন্দেহ হয়। থেকে থেকে ঝটপট করে উঠছে বক, পালিয়ে যাচ্ছে বাদুড়, একটা ডাল ধরে ঝপ করে ঝুলে পড়ছে। কোথাও গাছের কোটরের মধ্যে পেত্নীর আগ্নেয় চোখের মতো প্যাঁচার গোল গোল চোখগুলো জেগে আছে। কাঞ্চন নদীর জল থেকে সকালের ভিজে হাওয়া এসে গাছগুলোতে দোল দিচ্ছে—যেন ভূতের নিঃশ্বাসে ভানীর বুকটা ছমছম করছে।

কেশোলালের কথায় ভানী চম্‌কে উঠল।

—শাড়ি?

—হাঁ শাড়ি।—বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে কেশোলাল বললে, গয়না। চাই তোর?

কিন্তু ভানীর কোনটাই ভালো লাগছে না—ভয় করছে। কী বিশ্রী এই জঙ্গলটা! কী অস্বাভাবিক অন্ধকার! গাছের শিকড়ে হঠাৎ একটা হোঁচট লাগল তার পায়ে, ভানী দু হাতে কেশোলালকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল।

—ভয় কী, আমি তো আছি।—এক মুহূর্তের জন্যে কেশোলাল ভানীকে বাহুর আশ্রয় দিলে। সে বলিষ্ঠ বাহু আর নেই—আলী মহম্মদকে ল্যাজা দিয়ে ফুঁড়ে যে শেষ করে দিয়েছিল, সে মানুষও আর নেই। শুধু বাহুর মোটা মোটা হাড়গুলোই অবশিষ্ট এখন।

আর এক মুহূর্তের জন্যই কেশোলালের মনে লাগল দুর্বলতার ছোঁয়া। সত্যিই কী এর প্রয়োজন আছে? ভানীকে এমন ভাবে বিলিয়ে না দিলে কী ক্ষতি হবে তার? নিশিবালার আলিঙ্গন মনে পড়ল। কিন্তু তার মধ্যে তো এমন বিশ্বাসের আন্তরিকতা নেই, এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্পর্শ নেই কোনোখানে!

আত্মবিস্মৃতের মতো কেশোলাল বললে, আমি আছি, কোনো ভয় নেই তোর।—সন্তর্পণে ভানীর হাত ধরে সে এগোতে লাগল।

একটু একটু করে আলো ফুটছে—হিজল বনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারের ওপর নামছে সূর্যের রঙ। সেই রঙের স্পর্শ কি লাগল কেশোলালের মনে? কিন্তু এ কতক্ষণ! এই জঙ্গলের পথ শেষ হবে—দূরবিস্তৃত মাঠের সীমা শেষ হয়ে গিয়ে দেখা দেবে রেল স্টেশন, রেলগাড়ি, তারপর সহর। ততক্ষণে কি আত্ম-বিস্মৃতির এই ক্ষণিকতা কেশোলালকে আচ্ছন্ন করে রাখবে?

কী জানি! ভানী পথ চলেছে তার স্বামীর সঙ্গে, চলেছে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। হিজল বনের অরণ্য পার হয়ে দেখা দেবে পৃথিবীর অরণ্য। সে অরণ্য এমন অহিংস নয়; সেখানে এখনো শঙ্খচূড়েরা ফণা মেলে আছে, সেখানে এখনো বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, সেখানে এখনো নদীর জলে কুমীরের ছায়া ভাসছে নীল মেঘের মতো। সে অরণ্যে কে কার পথ চেনে! সেই দুর্গম জটিলতার মধ্যেই ভানীকে আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি—তার সন্ধান আমি আর বলতে পারব না। হয়তো সেখানে নতুন করে ঘর বাঁধবে দুজনে—পুরনো প্রেম দিয়ে, পুরনো কামনা দিয়ে, ফুরিয়ে যাবে তার গল্প। আর যদি নিশীথ-নগরীর অন্ধকার নেপথ্যে কোনোদিন তাকে দেখতে পায় কোনো দরদী মানুষ, তাহলে সেই দিন সে হয়তো নতুন করে রচনা করবে কাহিনী।

* * * *

লালাজীর তাঁবু থেকে আগুনের মতো মুখ নিয়ে ফিরল সুরয। লালাজী ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কামিনীর সন্ধান ঠিক কোথায় গেলে পাওয়া যাবে, সে খবরটা তিনি রূপাপুরের কামারদের ভালো করে বলে দিয়েছেন। যার টাকা খেয়ে ওরা মেলা ভেঙে দেবার মতলব করেছে সে যে কী জাতের লোক এখন ওরা ভালো করেই দেখুক। তা ছাড়া লালাজী মৃদু হেসে বলেছেন: কুমার বিশ্বনাথের মতো অমন দশটা রাজাকে পুষবার ক্ষমতা আজ তিনি রাখেন। ওরা যদি জোয়ানকি দেখিয়েই পয়সা রোজগার করতে চায় তাহলে তিনিও সে সুযোগ দিতে রাজি আছেন। তাঁরও জমিজমা আছে এবং 'দিয়াড়িয়া'দের হাত থেকে পাকা ফসলের ক্ষেত রক্ষা করবার তাঁরও লোক-লস্করের দরকার হয়ে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোনবার ধৈর্য সুরযের থাকেনি। পাগলের মতো ছুটে এসেছে সে। এখনি এর শোধ নিতে হবে। জমিদারকে মান্য করে তারা, তাই বলে এই হারামী, এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! জান কবুল, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

সুরয চিৎকার করে ডাকল, সর্দার?

রামনাথের সাড়া নেই।

—সর্দার কোথায়, তাউই গেল কোথায়?

—এই তো ঝিম মেরে বসে ছিল এতক্ষণ। কোথায় উঠে গেল?—রূপাপুরের বিস্মিত কামারেরা জবাব দিলে।

—বৌয়ের খোঁজ পেয়েছি। সর্দারকে দরকার, বড্ড জরুরী দরকার, খোঁজো তাকে।

সোনাদীঘির মেলা—চারদিকের সমস্ত সম্ভব অসম্ভব জায়গায় রামনাথের খোঁজ চলতে লাগল। আর্তকণ্ঠের চিৎকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল: সর্দার, সর্দার, তাউই! কিন্তু সর্দারের তখন সাড়া দেবার উপায় ছিল না। রামনাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনোখানে।

আর কামারপাড়ার হট্টগোলের সূচনা দেখেই সেখান থেকে সরে পড়ল বৈজু। তার অনেক কাজ। কাউকেই সে বঞ্চিত করবে না—বিশ্বনাথকে নয়, লালাজীকেও না। কাজের মানুষ সে—টাকাটা ভালো করে বোঝে। হাতে মোটা একটা ছোট লাঠি নিয়ে সে নিঃশব্দে এগুতে লাগল আমবাগানের মধ্য দিয়ে।

দিন দুপুর। এমন কাজের সময় এ নয়। বৈজুর গা শির শির করতে লাগল। হয় মাথা রেখে আসতে হবে, নয় পাঁচশো টাকা। কিন্তু লালাজীর মতলবটা ঠিক সে বুঝতে পারছে না। কুমার বিশ্বনাথ হলে একটা কথা ছিল, তার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণও খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু একটা অবলা জীবের ওপর লালাজীর এই আক্রোশ—

থাক—অত ভেবে তার কী হবে! পাঁচশো টাকা—বৈজু কিছু আর কল্পনাই করতে পারছে না এখন। এত টাকা কী ভাবে কোন্ কাজে যে লাগবে, সে তা নিজেই জানে না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে। রূপাপুরের কামারদের কাছে কামিনীর ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না বেশিক্ষণ। যে মুহূর্তে কামারেরা চড়াও হয়ে রংমহল আক্রমণ করে বসবে ঠিক সেই মুহূর্তেই আক্রোশের বশে বিশ্বনাথ তার নাম প্রকাশ করে দেবেন। তারপর? তারপরে যদি সে কামারদের হাতে পড়ে, তাহলে শকুনে যেমন করে মড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, তেমনি ভাবেই ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তারা। অতএব সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠবার আগেই দ্বিতীয় কাজটা শেষ করে ওকে অবিলম্বে টাকা নিয়ে রূপাপুরে প্রস্থান করতে হবে, তারপর সেখান থেকে সোজা কলকাতার জনারণ্য। তার ওপর লালাজীরও এই আদেশ।

সমস্ত জিনিসটাই একটা সুসজ্জিত পরিকল্পনা। মাথা আছে লালাজীর। আয়োজনের কোনোখানে এতটুকু ফাঁকি ধরবার কিছু নেই। পাঁচশো টাকার জন্যে আজ সে দেশ ছাড়ছে, তা সে ছাড়ুক, দেশের ওপর এমন কিছু অমানুষিক আকর্ষণ বা প্রীতি তার নেই। সে নিজের কদর বোঝে। তার হাতের কাজ টাকশালাকেও লজ্জা দেয়। তা ছাড়া দীর্ঘদিন উচ্ছৃঙ্খল বন্যজীবনও সে যাপন করে এসেছে কলকাতায়। মহানগরীর অমৃত আর হলাহল মন্থন করেছে একসঙ্গেই। আজো সর্বাঙ্গে কতকগুলো শুকনো ক্ষতচিহ্ন সে সব দিনের স্মৃতি বহন করে। কিন্তু এবারে সাবধান হয়ে গেছে বৈজু, মাত্রাহীন আনন্দের স্রোতে নিজেকে আর অমন করে ভাসিয়ে দেবে না সে।

আর—আর ভানী? ভানী গেল কোথায়? মনের দিক থেকে বৈজু কিছুতেই এ সমস্যার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসায় আসতে পারছে না। তাকেও খুঁজে দেখতে হবে—কলকাতায় হোক যেখানে হোক। ভারী ফাঁকি দিয়েছে ভানী, সেদিনের প্রতিশোধ বৈজু নিতে পারল না। কিন্তু কোথায় পালাবে! যেখানে যাক খুঁজে বের করবেই। তবে আপাতত—

আবার বাগানের মধ্যে দিয়ে চোরের মতো বৈজু এগুতে লাগল। এই পথটা রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রংমহলের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে কুমার বিশ্বনাথের আস্তাবল পর্যন্ত। সম্প্রতি সেই দিকেই বৈজুর গতি।

হাতের মধ্যে ফাঁপা লাঠিটার ভেতর শাণিত অস্ত্রটা রাক্ষসের জিভের মতো লক লক করছে, থেকে থেকে খট খট করে জানান দিচ্ছে নিজের পরিচয়। ওটা লাঠি নয়—গুপ্তি। দু হাত লম্বা একটা দীর্ঘ খরধার ফলা হাতের ওপর ছোঁয়াবার আগেই খচ করে কেটে যায় চামড়া। তারই মাথাটা মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে এগোচ্ছে বৈজু। ভয়ে শির শির করছে শরীর।

কিন্তু কোনোখানে জনমানুষ নেই। দুপাশে ফণীমনসা আর কেয়াঝোপ ; বাতাসে কেয়ার উগ্রগন্ধ ভাসছে। শুকনো আমের ডাল ঝরে পড়ছে নির্জন পথের উপর। রংমহলের এই অভিসার-পথ চিরদিনই এমনি অভিশপ্ত। তা ছাড়া সোনাদীঘির মেলায় তুমুল কলরোল। নাগরদোলা ঘুরছে, হয়তো জমে উঠেছে টিকিধারীর জুয়ার আড্ডাটা। কুমার বিশ্বনাথের লোক-লস্করেরা এখন ওখানেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে।

একটা ভাট ফুলের ঝোপকে চক্কর দিয়ে জন্তুর মতো বৈজু রংমহলের পেছনে চলে এল। নিজের পায়ের নিচে ঝরাপাতার শব্দে চমকে উঠল একবার। ত্রস্ত চোখে তাকাল চারদিকে। শুধু মাথার ওপর একটা নিমগাছে অসংখ্য থলির মতো ঝুলে রয়েছে হাজার খানেক বাদুড়। আর তালা দেওয়া লোহার দরজার ওপারে আস্তাবলের ভেতর বিশ্বনাথের কালো ঘোড়াটা পা ঠুকছে। নিমগাছের আড়াল থেকে বৈজু উঁকি মেরে সহিসের ছোট ঘরটার দিকে তাকালো। সেটাও তালাবন্ধ, সহিস সপরিবারে গেছে মেলার ওখানে। বৈজু জানে না, কিন্তু লালা হরিশরণ জানেন, এককালে ওই ঘরটাতেই দিন কাটিয়েছে রামসুন্দর লালা। ঘোড়ার সঙ্গে পিতৃপুরুষের নামটা জড়ানো বলেই কি ঘোড়াটার ওপর এত আক্রোশ লালাজীর ?

নিমগাছের আড়ালে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইল বৈজু। নাঃ, কোথাও কেউ নেই। হাতের ফাঁপা লাঠিটা ধরে সে শিক দেওয়া দরজাটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

চমৎকার কালো ঘোড়াটা! ঘাড়ের ওপর সিংহের মতো সমুন্নত কেশরগুচ্ছ। উজ্জ্বল মসৃণ গা থেকে চিক্ চিক্ করে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। কদমে চলে, দুলে চলে, কুমার বিশ্বনাথকে পিঠে বয়ে হাওয়ার মতো পথ কেটে বেরিয়ে যায়। মহিমা আর শক্তির প্রতীক। কয়েক মুহূর্ত বৈজু স্থির অপলক চোখে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারী মায়া লাগছে—ভারী বেদনা বোধ হচ্ছে। কী অপরাধ এই নিরীহ নির্বোধ জীবটার! কারো কোনো ক্ষতি করে না—সমস্ত জেলায় এমন সেরা ঘোড়া আর নেই। এর চলন দেখে বৈজু নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে কতবার। নিজের অজ্ঞাতেই সে পিছিয়ে এল।

কিন্তু নাঃ—বৈজু চমকে গেল মুহূর্তে। এ দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না কোনো-মতেই। রূপাপুরের কামারেরা এখনই জানতে পারবে কামিনীকে বিশ্বনাথের হাতে তুলে দেওয়ার মূলে কে আছে। তারপর—দ্বিধা কেটে গেল। নিজের প্রাণকে বলি দেওয়ার চাইতে একটা পশুর প্রাণ নেওয়া অনেক সহজ। তা ছাড়া পাঁচশো টাকা! বৈজু আবার এগিয়ে এল। নিশ্চিন্তে ছোলা খাচ্ছে ঘোড়াটা, দাঁড়িয়ে আছে একেবারে দরজার কাছ ঘেঁষেই। বৈজুকে দেখে একবার শান্ত জিজ্ঞাসায় তার দিকে কালো কালো চোখ দুটো মেলে তাকালে, তারপর আবার মন দিলে আহারে।

ফস করে ফাঁপা লাঠির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল রাক্ষসের জিভটা। বৈজুর হাতটা শিকের ফাঁক দিয়ে সজোরে চলে গেল ভেতরে, পরক্ষণেই আকাশ-ফাটানো একটা আর্তনাদ করে ঘোড়াটা প্রচণ্ড একটা লাফ দিলে—যেন লোহার দরজাটা ভেঙে বৈজুর ওপরে এসে পড়বে। হাতে একটা প্রবল ঝাঁকুনি লাগল। ঘোড়ার বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে রক্তাক্ত গুপ্তিটা ছিটকে বাইরে চলে এল—ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ সতেজ রক্ত। তারপরেই আর একবার আর্তনাদ করে কালো ঘোড়াটা চার পা বিস্তার করে দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। মুখের দুপাশ দিয়ে সাদা ফেনার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধচর্বিত একরাশ ছোলা গড়িয়ে পড়ল, চোখে চিক্ চিক্ করতে লাগল জল—ফোয়ারার মতো উচ্ছ্বসিত ধারায় রক্ত ছুটে ঘরটাকে ভাসিয়ে দিতে লাগল।

পিছনেই কঙ্কন নদীর জল ভাদ্রের ভরা বানে খরস্রোতে বয়ে যাচ্ছে। রক্তাক্ত গুপ্তিটা জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৈজু দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে ছুটে পালালো। তার সময় নেই, একবিন্দু সময় নেই। এখনই লালাজীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে কুমারদহ ছাড়তে হবে, রূপাপুর ছাড়তে হবে। পাঁচশো টাকা। পারিশ্রমিকটা মন্দ নয়—জীবনকে আবার সে নতুন করে আরম্ভ করতে পারবে, নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, নতুনতর কর্ম-ক্ষেত্রে।

* * * *

রংমহলে একটা তাকিয়া আঁকড়ে পড়ে ছিলেন বিশ্বনাথ। দু-তিনটে শূন্য মদের বোতল আশেপাশে গড়াগড়ি দিচ্ছে তখনও। ব্যোমকেশ উঠে গেছে ভোরবেলাতেই। সমস্ত রাত্রির বীভৎস ঝড়ের পরে এক পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে কামিনী—তার মুখে কাপড়টা তখনো শক্ত করে বাঁধা। তার সমস্ত চেতনা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে মূর্ছিত।

আর স্বপ্ন দেখছেন বিশ্বনাথ। কিসের স্বপ্ন? এই ভাঙা রংমহলে—দেওয়ালের গায়ে যেখানে বহুবিচিত্র ছবিগুলো অর্থহীন নীল শ্যাওলার এলোমেলো দাগে প্রায় মুছে গিয়েছে; ছাদ থেকে চুইয়ে যেখানে অজস্র ধারায় নেমেছে বর্ষার জল, ফাটলের ভেতর দিয়ে বটের শিকড় যেখানে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর একটি জটিল জালবিস্তারের

মতো আত্মপ্রকাশ করছে আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাশ্মীরী কার্পেট পুঞ্জীভূত একরাশ ধুলোর মতো জড়ো হয়ে রয়েছে—সেখানে কী স্বপ্ন দেখছিলেন কুমার বিশ্বনাথ ?

একদিন নয়—তুদিন নয়—দেড়শো বছর। জরির আচকান পরা রাঘবেন্দ্র রায়বর্মা। উন্নত দীর্ঘ দেহটা একটা আগুনের শিখার মতো জ্বলছে, রূপোর পানপাত্রে টলমল করছে ফেনিল সুরা।

ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় লালসার সুতীব্র দীপ্তি। সরযূ বাইজীর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য চলেছে অসংযত পদক্ষেপে—গায়ের স্বচ্ছ বস্ত্রাবরণ সরে গিয়ে দেহবল্লরী বিত্যুৎপ্রভার মতো পূর্ণ-ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আর বাঘের মতো মানুষগুলোর শিরায় শিরায় উদ্দাম কামনার রক্তধারা অরণ্য-ছন্দে নেচে উঠছে।

ঝন্—ঝন্—ঝন্। নেশার ঝোঁকে কে একটা সুরাপাত্র ছুঁড়ে মেরেছে ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে। ঝন্—ঝন্—ঝন্। অসংখ্য ভাঙা কাচ—চারদিকে বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়ল। তারপর অন্ধকার। অন্ধকারের একটা অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দেড়শো বছর নিঃশব্দে পার হয়ে গেল তারপর—

ঝন্-ঝন্-ঝন্—

কুমার বিশ্বনাথ চমকে জেগে উঠলেন। ভাঙা রংমহলের বন্ধ দরজায় ক্রমাগত করাঘাত পড়ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের প্রচুর আলো এসে সমস্ত মুখ চোখকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে যেন। এক মুহূর্তে মনে পড়ে গেল রাত্রিটাকে। চোখে পড়ল দেওয়াল ঘেঁষে একটা নিঃসাড় আর নিস্তব্ধ মাংসস্তূপ। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপছে—এখনো মরেনি।

বিত্যুৎবেগে বিশ্বনাথ উঠে বসলেন। তীব্রস্বরে বললেন, কে ?

দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। পরক্ষণেই সবেগে খুলে গেল সেটা। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মতিয়া—অমানুষিক ভয়ে তার চোখ তুটো বিস্ফারিত। তার হাত পা থর থর করে কাঁপছে, আর তার পেছনে ? নিজের চোখকে বিশ্বনাথ বিশ্বাস করতে পারলেন না।

—অপর্ণা ?

—হাঁ আমি।—অপর্ণার চোখে আগুন। সেই শান্ত পাঠরতা মেয়েটি—বিশ্বনাথ যাকে তুর্বোধ বলে জেনে এসেছেন চিরদিন, নিজের পৌরুষের গর্বে যাকে কোনোদিন স্বীকার করতে চাননি তিনি। সেই অপর্ণার চোখে এ কিসের দৃষ্টি ?

—কী চাও তুমি ?—আড়চোখে একবার কামিনীর দিকে তাকিয়েই বিশ্বনাথ প্রধূমিত হয়ে উঠলেন : এখানে কে আসতে বলেছে তোমায় ?

—কে বলেছে ?—কঠিন দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের সমস্ত পৌরুষকেই যেন অবজ্ঞা করে গেলেন অপর্ণা। বললেন, শুনতে পাচ্ছ ? কী করেছ তুমি ?

বিশ্বনাথ কান পাতলেন। হাঁ, শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অনেকগুলো কণ্ঠে উদ্দাম

কোলাহল। সোনাদীঘির মেলা থেকে কলরব? না, তাঁর সিংহ-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ প্রাণপণে চিৎকার করছে। প্রাপ্য শিকারের জন্যে যেন সমস্বরে দাবি জানাচ্ছে একদল হিংস্র বন্য জন্তু।

বিশ্বনাথ শুধু নির্বোধ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নেশার ঘোর এখনো ভালো করে কাটেনি,—স্নায়ুগুলো এখনো শিথিল আর শৃঙ্খলাহীন—কোনো কিছুকেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না—গ্রহণ করতেও পারছেন না।

অপর্ণা বললেন, ওরা কারা জানো? রূপাপুরের কামারেরা। যাদের তুমি মেলা ভাঙবার কাজে লাগিয়েছিলে তারাই আজ তোমার মাথা ভাঙবার জন্যে এগিয়ে এসেছে।

গভীর বিস্ময়ে বিশ্বনাথ বললেন, কেন?

—ওদের সর্দারের বউকে তুমি কেড়ে নিয়ে এসেছ। তোমার লোভের গ্রাসে তাকে গিলে খেয়েছ তুমি। যে অস্ত্রে তুমি শত্রুকে শেষ করবার মতলব করেছিলে, সে অস্ত্র আজ তোমার দিকেই ছুটে এসেছে। ওরা কী করতে এসেছে জানো?

যন্ত্র-চালিতের মতো বিশ্বনাথ বললেন, কী করতে?

—তোমার ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিতে, আমাকে চূড়ান্ত অপমান করতে।

কয়েক মুহূর্ত সব কিছু নিস্তব্ধ। নিজের মূঢ়তার অপমানে আজ কুমার বিশ্বনাথের মাথা নত হয়ে গেল। দেবীকোট রাজবংশের রক্তে এই প্রথম এল অনুতাপের স্পর্শপাত। দূরে প্রবল কোলাহল। মানুষের বিক্ষোভ ঝড়ের মতো ভেঙে পড়বার জন্য এগিয়ে আসছে।

অপর্ণা পাংশুমুখে বললেন, শুনছ, আর সময় নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়ালেন বিশ্বনাথ। চকিতে নিজের কর্তব্য স্থির করে নিলেন।

—মতিয়া!

—হুজুর!

—আমার ঘোড়া।

অপর্ণা বললেন, ঘোড়া দিয়ে কী হবে?

—কাজ আছে। মতিয়া—

—যাচ্ছি হুজুর।—ভয়ার্ত পদক্ষেপে মতিয়া গেল ঘোড়ার সন্ধানে।

অপর্ণার চোখে ঘৃণার চিহ্ন ফুটে উঠল জ্বলন্ত হয়ে: ঘোড়া নিয়ে কী করবে? পালাবে?

—পালাব!—বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়লেন বিশ্বনাথ: কেন পালাব? দেবীকোট রাজবংশ পালায় না কোনোদিন। কতগুলো কামারের ক্ষ্যাপামিকে শায়েস্তা করবার ওষুধ আমার জানা আছে।

—কী করবে?

—থানায় খবর দেব, পুলিস নিয়ে আসব।

অপর্ণা সব্যঙ্গে বললেন, চমৎকার, পৌরুষ প্রকাশের এটা একটা সত্যিকারের রূপ বটে!

বিশ্বনাথ গর্জন করে উঠলেন, অপর্ণা, তুমি থামো। আমার কাজ আমি জানি, তোমার উপদেশ শোনবার সময় আমার নেই।

অপর্ণা তেমনি ব্যঙ্গের হাসিটাকে মুখের ওপর টেনে রেখেই বললেন, কিন্তু থানায় যাওয়ার সময়ও আর নেই। ওরা তোমার রংমহলের দিকে ছুটে আসছে এখন।

তাই বটে। দূরের অরণ্যকে ভূশায়িত করে দিয়ে ভৈরব হুঙ্কারে এগিয়ে আসছে ঝড়। ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বেরিয়ে যাওয়ার পথও আর নেই। পালাতে হলে এখন ওদের ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে হবে। ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঠোঁট কামড়ালেন বিশ্বনাথ।

অপর্ণা বললেন, কেন তুমি এমন করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলে? কেন তুমি এ কথা ভুলতে পারো না যে তিনশো বছর আগেকার পৃথিবী আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে? এ যুগ লালা হরিশরণের—কোনো অস্ত্র, কোনো রাজার ক্ষমতা নেই আজ তাদের হারিয়ে দিতে পারে। পৃথিবীর চারিদিকে তারা মাকড়সার মতো জাল ছড়াচ্ছে, গ্রাস করে নিচ্ছে রাজাকে, গ্রাস করছে প্রজাকে। এদের লোভের মুখে কারো রক্ষা নেই—রাজারও নয়। আজ যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তিনশো বছর আগেকার ইতিহাস ভোলো। নেমে এসো তাদেরই দলে, যারা—

অপর্ণা কথাটা শেষ করতে পারলেন না। মতিয়া ছুটে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে রাণী মা।

—সর্বনাশ!

—হাঁ রাণী মা। কালো ঘোড়াটাকে কে খুন করেছে। ঘরের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে রক্তের, তার মধ্যে মরে পড়ে আছে ঘোড়াটা।

—খুন করেছে?—একটা আর্ত চিৎকার করে বিশ্বনাথ মেঝের ওপর বসে পড়লেন। যেন শাণিত একটা অস্ত্র এসে বিঁধেছে তাঁরই বুকের ভেতর। কোথায় গেল দেবীকোট রাজবংশের অনমনীয় আগ্নেয়-প্রতাপ, তার শক্তির দম্ভ? অদূরে যে বিক্ষুব্ধ জনতার কোলাহল মৃত্যুর মতো এসে ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছে, সেদিকেও বিশ্বনাথের লক্ষ্য রইল না।

—মরে পড়ে আছে? আমার কালো ঘোড়াটা?

বাইরের প্রচণ্ড কোলাহল রংমহলের দরজায় এসে পৌঁছেছে। রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বিলাসভবন থরথর করে কেঁপে উঠছে একেবারে ভিত্তির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। তিনশো বছরের ব্যভিচার আর পাপের আজ কি চরম প্রায়শ্চিত্ত? কিন্তু বিশ্বনাথ দু হাতে মুখ

ঢেকে চুপ করে বসে রইলেন, তাঁর চোখ থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল—কুমার বিশ্বনাথের চোখের জল! মতিয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মড়ার মতো নিঃসাড় হয়ে, আর অপর্ণার আতঙ্কপাণ্ডুর মুখে এক-একবার খানিকটা রক্তোচ্ছ্বাস এসে সরে যেতে লাগল। ব্যোমকেশ? দেউড়ির দারোয়ানেরা, আর সবাই? সময় বুঝে তারা নিরাপদ জায়গাতেই আশ্রয় নিয়েছে। মনিবের জন্য সব করা চলে, কিন্তু রূপাপুরের বাঘা কামারদের হাতে প্রাণ দেওয়া চলে না—

হঠাৎ কী যেন মন্ত্রবলে বাইরের কলরব নিঃশব্দ হয়ে গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দ করে আবার খুলে গেল রংমহলের দরজাটা—ঘরে ঢুকলেন লালা হরিশরণ। তাঁর পেছনে পেছনে অনুগত বিশ্বস্ত কুকুরের মতো রামদেইয়া।

ঘরের সকলকে চমকে উঠবার সুযোগ না দিয়েই লালাজী একগাল হাসলেন। বললেন, নমস্তে রাজাবাহাদুর, নমস্তে রাণীমা। গোলাম মেলায় এসেছে সকালে। এই বিশ্রী গোলমালের খবরে আর স্থির থাকতে পারলাম না। হাজার হোক—লালাজী আবার চরিতার্থ হাসিতে মুখখানাকে একেবারে উদ্ভাসিত করে দিলেন: রাজবাড়ির খেয়েই আমরা মানুষ তো। তাই ওদের তিনশো রূপেয়া বকশিশ দিয়ে চুপ করিয়ে দিলাম। রাজা বাহাদুর মেয়েমানুষটাকে ফিরিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যাবে।

তিনজোড়া নির্নিমেষ চোখ লালাজীর মুখের দিকে তেমনি অর্থহীন ভাবেই তাকিয়ে রইল। লালাজী আবার বলে চললেন, ছোটলোক নিয়ে কারবার, ভারী ঝকমারী, ভারী ঝকমারী! কিছুতে কি বুঝতে চায়! বললাম, কুমার বাহাদুর দেবতার বংশ। ওঁর ভোগে লাগলে ময়লা হয় না। হুজুরের হয়ে আমি তিনশো রূপেয়া ধরে দিচ্ছি, জ্ঞাতগুষ্টিকে খাইয়ে মেয়েটাকে জাতে তুলে নে।

ঘরের মধ্যে তেমনি স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। বাইরে জনতার গুঞ্জন।

—তা কথা শুনল। আর যদি না শুনত—জামার পকেটে হাত পুরে লালাজী বের করলেন সেই পাঁচ চেম্বার লোড করা রিভলভারটা: এটা লাগাতে হত হুজুরের সেবাতেই। কিন্তু আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকা-পয়সা দিয়েই গণ্ডগোল মেটাতে ভালবাসি, খুন-খারাপীটা তেমন পছন্দ হয় না। আমাদের গায়ে তো রাজারাজড়ার লৌ নেই, কী বলেন?

লালাজী আবার প্রসন্ন আর বিগলিত হাসি হাসলেন। বিশ্বনাথ আবার মুখ লুকোলেন! মতিয়া পাথরের মতো স্তব্ধ। অপর্ণার দু চোখ থেকে শুধু আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—কথাশেষ—

চৌদ্দ

আজ সত্যিকারের পরাভূত মন আর দেহ নিয়ে অপর্ণার ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন বিশ্বনাথ। কোনোদিকে যেন এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে না। এতদিন পরে যেন নিজের মধ্যে কুমার বিশ্বনাথ অনুভব করেছেন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার রক্ত শুধু পুড়িয়েই শেষ করে দিতে পারে; নিজের যুগসঞ্চিত অগ্নিজ্বালায় দাহন করে নিজেকেই টেনে নিতে পারে ধ্বংস আর অপমৃত্যুর মধ্যে। যে অস্ত্র সে শত্রুর জন্যে শাণিত করে রাখে, সে অস্ত্র এসে নির্মমভাবে আঘাত করে তারই বুকে।

কেন এমন হল? কেন এমন হয়? এ কি কেবল লালা হরিশরণের জন্যেই? তা তো নয়। তাঁর দুর্বলতার রন্ধ্র বয়েই তো—শনি-গ্রহের মতো হরিশরণদের আবির্ভাব ঘটে। রূপাপুরের কামারেরা। তাদের সঙ্গে যা সম্পর্ক সেটা যে এই ভাবে রূপান্তর নেবে একথা কি কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছিলেন বিশ্বনাথ? আজ কি সবচেয়ে বড দরকার নিজেকে জয় করা? একথা কি সত্যি যে দেবীকোট রাজবংশের রক্তধারার শৃঙ্খলে বিশ্বনাথ বন্দী, আর সেই শৃঙ্খলের অনিবার্য নিষ্ঠুর আকর্ষণে তিনি তাঁর অন্যান্য প্রাক্-পুরুষের মতো নেমে যাচ্ছেন আত্মহত্যার অতল গহ্বরে?

নিজেকেই জয় করতে হবে? কেমন করে? বিশ্বনাথ জানেন না।

মাথার কাছে চুপ করে বসে ছিলেন অপর্ণা। বললেন, ঘুমোবে?

—না।

—চা খাবে একটু?

—না।

করুণ আর শান্ত চোখে অপর্ণা বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যি বলতে কী, এতদিন স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারেননি তিনি। নির্বোধ বর্বরতার প্রতীক, সামন্ততন্ত্রের ঘুণধরা কঙ্কাল। রাজবন্দিনী অপর্ণা নিজের মধ্যে বিদ্রোহের তাপ অনুভব করেছেন। কতবার ইচ্ছে হয়েছে সব ভেঙেচুরে তিনি বেরিয়ে যান, ঝাঁপিয়ে পড়েন নিজের কাজের ব্রতের মধ্যে। কিন্তু তার পরেই মনের এই দুর্বলতাকে শান্ত করেছেন তিনি। এ স্বার্থপরতা —এ ফাঁকি। বিশ্বনাথকে—নিজের স্বামীকেই যদি তিনি জাগিয়ে তুলতে না পারেন তা হলে পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলবার অধিকার তাঁর কোথায়? তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যলোভী সুলভ রোমান্টিক নোরা নন, আইরীন তাঁর আদর্শ নয়। তাই তিনি প্রতীক্ষা করেছেন, অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেছেন। একদিন মশালের মতো নিজেকে জ্বালাতে জ্বালাতে

নির্বাপিত অবস্থায় বিশ্বনাথকে তাঁরই কাছে ফিরে আসতে হবে, আর সেদিনই আসবে তাঁর সুযোগ।

আজ বিশ্বনাথের ক্লান্ত-করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে অপূর্ব একটা স্নেহের তরঙ্গে অপর্ণার মনটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ভারী ভালো লাগল। প্রেম? না, প্রেম নয়। অসহায় শিশুর ওপরে মাতৃত্বের স্নেহচ্ছায়া। এতবড় বিরাট পুরুষটা কী অদ্ভুত ভাবে নিরুৎসাহ আর মেরুদণ্ডহীন হয়ে লুটিয়ে পড়েছে! লালাজীর হাসিটা মনের সামনে থেকে থেকে ভেসে উঠছে: আমাদের শরীরে তো আর রাজারাজড়ার লৌ নেই, কী বলেন?

পাশার দানে লালা হরিশরণ জিতে নিয়েছেন। এর পরে সব সহজ। বিজয়ের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। লালাজীর কাছ থেকে লাটের কিস্তি দেবার জন্য টাকা নিয়েছিলেন বিশ্বনাথ। কাল সারা দিনরাত যে উন্মত্ত ঝড় বয়ে গেছে, তার মধ্যে সে টাকা সদরে পাঠানো হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার ফল?

কিন্তু কী হবে ওসব ভেবে? লালাজীই লাটে কিনে নেবেন। অজগরের শেষ পাকে মুমূর্ষু পশুর নাভিশ্বাস আসবে ঘনিয়ে। তার পর? তারপর আর কিছুই নেই। কিন্তু অপর্ণা অনুভব করলেন, তিনি আছেন, আরো অনেকে আছে, যাদের রাশি রাশি তলোয়ার পৃথিবীর চারদিক থেকে উদ্যত হয়ে উঠেছে—কুমার বিশ্বনাথদের টেনে নামাবার জন্যে, লালা হরিশরণদের অধিকারকে সমূলে উৎপাটন করবার জন্যে।

বিশ্বনাথ বললেন, চাদরটা আমার গায়ে টেনে দাও অপর্ণা। শীত করছে। বোধ হয় জ্বর আসবে।

জ্বর আসবে? অপর্ণা বিশ্বনাথের কপালে হাত রাখলেন। জ্বর আসা অসম্ভব নয়। বহুদিন, যেন বহুবৎসরের পরে উপযাচিকা হয়ে নুয়ে পড়ে স্বামীর কপালে আলগা একটি চুম্বন দিলেন তিনি। বললেন, না, কিছু হবে না।

ক্লান্ত শিশুর মতো অসীম অবসাদে চোখ বুজলেন বিশ্বনাথ।

বিছানার কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে এলেন অপর্ণা। দাঁড়ালেন জানালার সামনে। দূরে সোনাদীঘির মেলা নিরুপদ্রব, আনন্দ-মুখরিত। এখানে যা হয়ে গেছে তার তিলমাত্র ছোঁয়া যেন ওখানে গিয়ে পৌঁছোয়নি, এতটুকু আলোড়িত করে তোলেনি কোনো কিছুকে। মাথার ওপরে নাগরদোলা ঘুরছে। লালাজীর তাঁবুর ওপরে উড়ছে বিজয়ী মহারাজার স্পর্ধিত পতাকা। বিকালের আলোয় নিশানের টকটকে রংটা চুনীর মতো উজ্জ্বল।

ওই দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ জ্বালা করতে লাগল, জল এল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। যে কথা তিনি বিশ্বনাথকে বলেছিলেন, তাঁর মনের কোণেই সেটা যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল: তুমি একা কেন? এদের মধ্যে নেমে এসো, এরা সবাই তো তোমারই দলে।

অপর্ণা পেছন ফিরলেন। বিশ্বনাথের চোখ দুটি মুদ্রিত। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। গায়ে হাত রেখে অপর্ণা দেখলেন রীতিমতো জ্বর এসেছে, চাদরটা সযত্নে গলার নিচে গুঁজে দিতে বিশ্বনাথের উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস তাঁর হাতে লাগল। স্বামীর চোখের কোণ দুটো কি ভিজে গেছে? নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে কয়েক সেকেণ্ড কী ভেবে নিলেন অপর্ণা। তার পরে সোজা নেমে গেলেন একতলায়।

লালাজীর ভদ্রতা সীমাহীন। খবর দিতেই তিনি এলেন।

বাইরের ঘরে হাতের ওপর মুখ রেখে অপর্ণা চুপ করে বসে ছিলেন। ঘরে ঢুকেই যেন চমকে গেলেন লালাজী! অপর্ণার পরনে টকটকে লাল গাঢ় রঙের শাড়ি। কানের বালা দুটোতে দুখণ্ড লাল পাথর জ্বলছে। অনিন্দ্যসুন্দর দেহের বর্ণে আর মুখশ্রীতে প্রখর একটা দীপ্তি বিচ্ছুরিত। সবটা মিলে যেন অপূর্ব আগ্নেয় সৌন্দর্য একটা।

লালাজী বললেন, নমস্তে।

অপর্ণা প্রতি-নমস্কার করে সহজ সরল দৃষ্টিতে লালাজীর দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টিতে সংকোচ নেই, প্রথম পরিচয়ের জড়তা নেই কোথাও। বললেন, দয়া করে বসবেন একটু? সামান্য গোটা কয়েক কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

লালাজী বললেন, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আপনারা মনিব, যা হুকুম করবেন—

অপর্ণার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: বিনয় করবার কোনো দরকার আছে কি? আজ যে কে মনিব, আর কার ক্ষমতা কতখানি সে তো আপনি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জানেন।

লালাজী আবার চমকে উঠলেন। অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল তাঁর। মেয়েদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা শোনবার অভ্যাস তাঁর নেই। এ জাতীয় মেয়ের সংস্রবে তিনি আসেনওনি কোনো দিন। নীরবে আসন নিলেন লালাজী। চোখের দৃষ্টি সংকুচিত করে তিনি অপর্ণাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন, বলুন।

—আপনি একটু উপকার করুন।

লালাজী মনে মনে হাসলেন। সম্রাটের পূর্ণ পরাজয়। নিজে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না, তাই স্ত্রীকে দিয়ে করুণা ভিক্ষা করছে: আমাকে বাঁচাও, রক্ষা করো। তা লালাজী বাঁচাতে পারেন, রক্ষা করতেও পারেন। দশ-পনেরো হাজার টাকা কিছুই নয় তাঁর কাছে। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—একেবারে অকৃতজ্ঞ হওয়াও তো কোনো কাজের কথা নয়। কুমারদহের ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করলে অধর্ম হবে। রামসুন্দর লালা যেদিন রাঘবেন্দ্র রায়বর্মার বাড়িতে ঘোড়ার চাল শেখাবার চাকরি পেয়েছিলেন, সেই দিনই নবীপুরের গোড়াপত্তন। আর রাজা হওয়া ভারী হাঙ্গামার কাজ। অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তার চাইতে—কুমারদহকে আবার বাঁচাবার সুযোগ নিয়ে

তাঁর অনুগ্রহধন্য করে রাখলে কেমন হয়? শুধু খানকয়েক খতের ব্যাপার। পুড়িয়ে ছাই করে দিলেই মিটে যায় সমস্ত। দশ-পনেরো হাজার টাকা? সে ক্ষতি তাঁর কাছে পাঁচটা টাকা হারানোর চাইতে বেশি নয়।

দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতায় লালাজীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লোক খারাপ নন তিনি—দু-তিনটে ধর্মশালা দিয়েছেন নানা তীর্থস্থানে। স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে বললেন, কী বলবেন, বলুন।

কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পুঁটলি বের করলেন অপর্ণা। তারপর লালাজীকে বিস্মিত হওয়ার অবকাশ মাত্র না দিয়েই ঝর ঝর করে এক রাশ জড়োয়া গহনা ঢেলে দিলেন টেবিলটার ওপরে। বেশি নয়—বিশ্বনাথের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে যৎসামান্য এই অবশিষ্ট।

অপর্ণা বললেন, এগুলোর দাম কত হবে বলতে পারেন?

লালাজী চমকে উঠলেন: কেন?

—একটু দরকার আছে। বলতে পারেন, কত দাম হবে এদের?

চকিতে একটা সন্দেহে হরিশরণের মনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অপর্ণা ভেবেছেন কী? এই একমুঠো গয়নার সাহায্যেই হরিশরণের সমস্ত ঋণ শোধ করবার আশা তিনি রাখেন নাকি? হাসি পেল, দুঃখও হল।

—কত আর হবে? হাজার দুই টাকা হতে পারে বড় জোর।

লালাজীর অনুমানের ধার দিয়েও গেলেন না অপর্ণা।

—তা হলে দয়া করে এগুলো নিয়ে যান আপনি। আপনার ঋণ শোধ করবার দাবি নেই, সে আপনি নিজেই আদায় করে নিতে জানেন। রূপাপুরের কামারদের যে টাকাটা আপনি খেসারত দিয়েছেন, এ সেই টাকা—তার বেশি যদি কিছু থাকে, হিসেবে মিলিয়ে নেবেন।

—এর মানে?

লালাজী যেন আঘাত খেলেন একটা: কামারদের টাকাটা তো আমি চাইনি। মনিবের জন্যে সামান্য কিছু করেছি সাধ্যমত, তাই বলে কি আর—

—আপনি চাকরের উপযুক্ত কাজ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ কী? আপনি আমাদের ঘোড়ার সহিসের বংশধর, সে হিসাবে এটা আপনার কর্তব্য নিশ্চয়ই। কিন্তু—অপর্ণার কণ্ঠস্বরে বিষ ছড়িয়ে পড়ল, চাকরের দান নিয়ে ধন্য হতে কুমারদহ আজো লজ্জা বোধ করে।

যে সদাশয়তা আর করুণার স্নিগ্ধতায় লালাজীর মন পরিপূর্ণ হয়েছিল এতক্ষণ, অপর্ণার নিষ্ঠুর আঘাতে সে মোহের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। চাকরের উপযুক্ত কাজ!

ঘোড়ার সহিসের বংশধর! অপমানে লালাজীর সমস্ত মুখ কালির মতো হয়ে উঠল। নাক কান দিয়ে আগুনের দীপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি লালা হরিশরণ! সারা বাংলাদেশে তাঁর নাম—স্বনামধন্য ব্যবসায়ী! কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে তাঁর আকাশছোঁয়া প্রাসাদের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন বাংলার গভর্ণর স্বয়ং।

স্থির বজ্রগর্ভ দৃষ্টিতে হরিশরণ অপর্ণার দিকে তাকালেন। অচেতন মন থেকে সুস্পষ্ট সাড়া উঠল: এ তাঁর নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বনাথ সরে গেলেন রঙ্গমঞ্চ থেকে, এবার অপর্ণার সঙ্গেই তাঁর বোঝাপড়া করতে হবে। অপূর্ব এই আগ্নেয় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে হরিশরণের মন আশঙ্কায় ভরে গেল, সংশয়ে পীড়িত হয়ে উঠল।

গলার স্বরে তিক্ত বিদ্রূপ মিশিয়ে হরিশরণ বললেন, চাকরের দান এইখানেই শেষ নয়, এ খবর রাণীমা বোধ হয় জানেন না।

তেমনি ঘৃণাভরে অপর্ণা বললেন, না জানি না। কিন্তু ঋণের কথা জানি। সোনাদীঘির মেলা থেকে আরম্ভ করে নানা দিক দিয়েই সে টাকা আদায়ের চেষ্টা চলছে। সেই পাপেই আল্‌কাপ দলের একটা নিরীহ লোক প্রাণ দিয়েছে, আমার স্বামীর ঘোড়াটাকে খুন করা হয়েছে। মহাজন তার প্যাঁচের পর প্যাঁচ বসিয়ে যথাসর্বস্ব গ্রাস করবার চেষ্টা করছে—অসহায় খাতকের কোনো উপায় নেই বলে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন লালাজী।

লালাজী ঠোঁটের ওপরে দাঁত চেপে অপর্ণার দিকে তাকালেন।—মনিবের হয়ে বকশিশ করবার বা খেসারত দেবার অধিকার চাকরের কোনোদিন থাকে না। কাজেই ওই গয়নাগুলো আপনি নিয়ে যেতে পারেন। আর রাজা চিরদিনই রাজা; প্রজার মধ্যে নেমে গিয়ে নতুন করে রাজত্ব করবে সে। কিন্তু বানরকে সোনার মুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসালেই সে রাজা হয় না।

—বেশ।—সমস্ত সংযমের গণ্ডী হারিয়ে গুলি-খাওয়া বাঘের মতন হরিশরণ লাফিয়ে উঠলেন। কঠিন থাবার মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন গয়নাগুলো। বললেন, নমস্তে।

—নমস্কার।

জুতোর শব্দে ঘর কাঁপিয়ে লালাজী বেরিয়ে গেলেন। দরজার গায়ে আবার খটাস করে শব্দ করল পকেটের রিভলবারটা—কী একটা কথা যেন বার বার হরিশরণকে মনে করিয়ে দিতে চায়। মুঠিভরা গয়নাগুলো অবহেলা-ভরে তিনি পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন, সোনায় লোহায় একসঙ্গে ঝম ঝম করে বাজতে লাগল একটা বিচিত্র শব্দ, মৃত্যু আর রূপ যেন মিশেছে একসঙ্গে। এ কি অপর্ণারই প্রতীক?

বাইরে শিউ পাঁড়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষায়। হরিশরণের ওপর চোখ পড়তে সে চমকে গেল। মনিবের এমন মুখ সে কখনও দেখেনি। যেন ঝড়ের আকাশের মতো ভেঙে পড়বার জন্যে থমথম করছে।

জুতোর তলায় ঝরা-পাতাগুলো মাড়িয়ে লক্ষ্মীশ্রীহীন রাজবাড়ির ভাঙা পথ দিয়ে হরিশরণ বেরিয়ে এলেন। দেউড়ির ভাঙা সিংহ-দরজায় বিকলাঙ্গ সিংহ দুটোর শ্যাওলা-পড়া কেশরগুচ্ছের ওপর কোলাহল করছিল চড়ুই পাখিরা। কি একটা অজানিত ভয়ে তারা কিচ্ কিচ্ করে উড়ে গেল।

মেলার দিকে আবার হৈ হৈ রব। নতুন কী একটা ঘটেছে ওখানে। লালাজী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আর সেই মুহূর্তেই দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে রামদেইয়া।

—কী রামদেইয়া, কী খবর ?

ঊর্ধ্বশ্বাসে রামদেইয়া বললে, ভারী গণ্ডগোল বেধেছে হুজুর।

—কিসের গণ্ডগোল ?

—কুমার বাহাদুরের লোক ঢোল দিয়েছে মেলায়। এবার মেলায় কারো খাজনা লাগবে না, তোলা লাগবে না। জমিদারের মেলা, জমিদার তার প্রজাদের এবার বিনা পয়সায় মজা লুটতে বলে দিয়েছে।

লালাজী থমকে দাঁড়ালেন। মুখের ওপর ঝড়ের মেঘ আরো ঘনীভূত। এ চাল অপর্ণার। জমিদার এখন আশ্রয় নিয়েছে তার প্রজাদের মধ্যে, সেখান থেকেই এখন সে তার সঙ্গে লড়াই করতে চায়। বেশ ভালো কথা। লড়াইতে লালাজীও পিছোবেন না। ঘোড়ার সহিসের বংশধর তিনি—তিনি চাকর।

রামদেইয়া বললে, আমাদের যে লোক ট্যাক্সো আদায় করতে গিয়েছিল, তেলের বাঁক দিয়ে তার মাথা ফাটিয়েছে। লোকে মানে না। তারা বলে, মেলা জমিদারের, তা ছাড়া আর কারো কথা তারা জানে না, শুনবেও না। কি করা যায় হুজুর ?

লালাজী বললেন, হুঁ। মুখের ওপর সংশয়ের রেখাগুলো গভীরতর হয়ে পড়েছে। কুমার বিশ্বনাথের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর প্রজাদের সঙ্গে, জনতার সঙ্গে ? রূপাপুরের কামারদের লেলিয়ে দিয়ে মেলা ভেঙে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কার ক্ষতি ?

রামদেইয়া আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কী করা যায় মহাজন ?

পকেটের মধ্যে রিভলবার আর গয়না ঝনঝন করে বাজছে। অপর্ণা তাঁর নতুন শত্রু, কঠিন শত্রু। অন্ধকার মুখে লালাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—পুলিসে খবর দেব ?

কুটিল সংশয়াম্বিত মুখে লালাজী বললেন, না।

সোনাদীঘির মেলায় কোলাহলটা আরো প্রবল হয়ে যেন আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে। রামনাথের মৃতদেহটা এতক্ষণ পরে ভেসে উঠেছে সোনাদীঘির জলে।

বৈতালিক

উৎসর্গ

গোপাল ও গোবিন্দ সান্যাল

স্নেহাস্পদেষু

১৩৫৪-র "শারদীয়া স্বরাজে" এই উপন্যাসের প্রাথমিক কাঠামোটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্রুত লেখনের জন্যে তখন যে ফাঁক এবং ত্রুটিগুলো ছিল সেগুলোকে পূরণ ও সংশোধন করতে গিয়ে গ্রন্থকে অনেকখানি বাড়াতে হয়েছে, অনেক নতুন জিনিস যোজনা করতে হয়েছে।

এই বইয়ে উত্তর বঙ্গের 'কথ্যভাষার বিশিষ্ট রীতিটাকেই আমি গ্রহণ করেছি—কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নয়। তবে এর একটা মূল ভিত্তি আছে—সেটা হল দিনাজপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল।

আর একটি কথা। বইয়ের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি-যুগ আর গণ-আন্দোলন আসবার পূর্বাভাস ॥

—লেখক

এক

ন্যাড়া মাঠটায় ইতস্তত ছোপ ধরেছে সোনালি-সবুজের, ফলেছে সর্ষে, কলাই, ছোলা, মটর। শীতের বিষণ্ন শূন্যতায় এতবড শ্রীহীন মাঠখানার দীনতা তাতে ঢাকেনি, বরং আরো বেশি প্রকট হয়েই উঠেছে মনে হয়। ভাঙাচুরো আল, মাটির ছোট বড়ো চাঙাড, বিবর্ণ ঘাস, মরা মরা কণ্টিকারী আর টুকরো টুকরো গোরুর হাডে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে শ্মশানের ইঙ্গিত। উত্তর বাংলার আদিগন্ত এক ফসলের মাঠ। এলোমেলো এই রবিশস্যের টুকরো-গুলোর পেছনেও কোনো সজাগ চেষ্টার ইতিহাস নেই। খেয়াল-খুশিমতো ছড়িয়ে রেখেছে, গোরু-ছাগলে খাবে, সকালে-বিকেলে আগুন জ্বেলে শাকসুদ্ধ ছোলা পুড়িয়ে খাবে রাখালেরা। পথ-চলতি মানুষ কখনো যদি দু-এক মুঠো কড়াইশুঁটি ছিঁডে নেয়, তাতেও লাঠি হাতে তাডা করে আসবে না কেউ। মাটির ভাণ্ডার থেকে বিনা আয়াসে যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ।

আগে টিপ-সহি দিত, এখন কাঁচা কাঁচা অক্ষরে লেখে শ্রীমহিন্দর রুইদাস। প্রাইমারী ইস্কুলের গুরুট্রেনিং পাশ মাস্টার বংশী পরামাণিক নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছে। অনেক বুঝিয়েছিল বংশী, মহিন্দর কারো নাম হয় না, ওটা হবে মহেন্দ্র।

শুনে চটে গিয়েছিল মহিন্দর। বলেছিল, তুমি ইটা কী কহিছেন হে মাস্টার? বাপ যিটা নাম দিলে, ওইটা বদলামু কেমন করি? হামি মহিন্দর আছি, মহিন্দরই থাকিবা চাহি। বাপের নাম ছাড়িবা কহিছ! কেমন মানুষখানা হে তুমি?

অতএব বংশী পরামাণিক আর কথা বাডায়নি। বলেছিল, আচ্ছা, আচ্ছা, মহিন্দরই লেখ।

—হুঁ—হুঁ—আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে মহিন্দর বলেছিল, হামাক তেমন মানুষ পাও নাই। ওইটা চালাকি হামার ভালো লাগে না।

বংশী বলেছিল, ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।

—কেমন, ঠিক কহিছি কিনা?—মহিন্দর উপদেশ বর্ষণ করেছিল এইবার: বুঝিলা হে মাস্টার, তুমি তো ঢের নিখিছ (লেখাপড়া শিখেছ), কিন্তু ইটা ভালো কথা কহ নাই। বাপের চাইত্ বড় আর কেহ নাই, বাপক না মানিলে নরকত্ যাবা লাগে।

বংশী নিরুত্তরে শুধু ঘাড নেড়েছিল এবারে।

সেই থেকে সগৌরবে মহিন্দর রুইদাস তার পৈতৃক নাম স্বাক্ষর করে আসছে।

একটা মান্যগণ্য লোক—প্রায় আট বিঘে জমি সে রাখে। নানা কারণে মাঝে মাঝে তাকে সই করতে হয়, হাতের মুঠোয় কলমটাকে চেপে ধরে জোর দিয়ে লেখে শ্রীমহিন্দর।

দাস পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই কলমের নিব চিরে বকের হাঁ-করা ঠোঁটের রূপ ধারণ করে।

মহিন্দর তাতেই আন্তরিক গর্বিত। এতকাল অন্যের পায়ে জুতো যুগিয়েছে, নিজের কখনো পরবার সাধ হয়নি। কিন্তু যেদিন থেকে নামসই করতে শিখেছে, সেদিনই নিজের হাতে একজোড়া মোটা কাঁচা চামড়ার জুতো তৈরি করেছে। বর্ষার সময় ভিজে দুর্গন্ধ হয়—বেরুতে থাকে আদি এবং অকৃত্রিম সৌরভ, অনেক কষ্টে রক্ষা করতে হয় কুকুরের লোলুপতার হাত থেকে ; একবার একটা নেড়ী কুকুর ওর একপাটি মুখে করে পালিয়েছিল, প্রায় দেড় মাইল রাস্তা তাকে তাড়া করে সেটা উদ্ধার করে মহিন্দর। সেই থেকে জুতো সম্পর্কে তার সতর্কতার শেষ নেই।

এহেন শিক্ষা-গর্বিত সম্মানিত শ্রীমহিন্দর রুইদাস তার অতিযত্নের জুতোজোড়া হাতে করে আসছিল আল্‌পথ দিয়ে। জুতোটা এখন পায়ে দেবে না, দেবে একেবারে বোনাই বাড়ির সামনে গিয়ে, রাস্তার ডোবায় পা ধুয়ে। প্রথমত জুতো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, দ্বিতীয়ত বেশিক্ষণ পায়ে রাখলে ছাল চামড়া উঠে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার। সুতরাং হাতে করে নেওয়াটাই নিরাপদ তথা নির্ঝঞ্ঝাট।

ন্যাড়া মাঠটার এখানে ওখানে সোনালি-সবুজের ছোপ। ভাঙাচুরো আল্‌পথ বেয়ে চলেছে মহিন্দর, কাঁচা চামড়ার ফাটা ফাটা জুতোজোড়া ঝুলিয়ে নিয়েছে আঙুলের ডগায়। ভারী প্রসন্ন আছে মন। একবার আল্ থেকে নেমে ছিঁড়ে নিলে এক আঁটি ছোলার শাক, দুটো-একটা করে খেতে খেতে এগোতে লাগল। মাঠভরা ঝলমলে ঠাণ্ডা শীতের রোদ, এদিকে ওদিকে উড়ে উড়ে পড়ছে ছোট ছোট চড়ুইয়ের মতো 'বকারি' পাখির ঝাঁক। মন্থর রাশভারী গতিতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে চলে যাচ্ছে একটা সোনালি গো-সাপ, লিকলিকে জিভটা বার করে মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে দেখছে মহিন্দরের দিকে। হঠাৎ চামড়াটার ওপর ভারী লোভ হল মহিন্দরের। কিন্তু থানা থেকে ঢোল পিটিয়ে গো-সাপ মারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কেউ মারলে তার জরিমানা হবে। থানাকে বড় ভয় করে মহিন্দর।

কিন্তু ভারী ভালো লাগছে শীতের ঝলমলে রোদে এমনি করে এই মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে। অকারণ একটা খুশি চন্‌মন্ করে ওঠে রক্তের মধ্যে। প্রথম যৌবনের কথা মনে হয়, মনে হয় অন্ধকার সেই বাদাম গাছটার কথা—যেখানে রাত্রে তারিণীর ছোট বোনটা চুপি চুপি আসত তার কাছে। ভয় ছিল, কিন্তু ভাবনা ছিল না ; রক্ত ঘন হয়ে উঠত, নিঃশ্বাস পড়ত দ্রুত তালে, কী আশ্চর্য নেশায় আচ্ছন্ন ছিল সে-সব দিন! এই মস্তবড় মাঠটার দিকে তাকিয়ে মনে হয়—কেন কে জানে মনে হয়, সেই আশ্চর্য দিনগুলো আবার রক্তের মধ্যে তার কথা কয়ে উঠছে।

একটার পর একটা ছোলার দানা মুখে দিতে দিতে এগিয়ে চলল মহিন্দর।

আজ কত জটিল হয়ে গেছে জীবন। আজ সে মান্যগণ্য লোক—দশজনের একজন। লোকে তাকে খাতির করে, আপদে-বিপদে, মামলা-মোকদ্দমায় শলা-পরামর্শ নিতে আসে তার কাছ থেকে। সবচাইতে বড় পরিবর্তন যেটা ঘটেছে—সেটাকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না মহিন্দর। তারিণীর সেই ছোট বোন সরলার ছেলেদের সঙ্গেই আজ তার দেড় কাঠা জমি নিয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলল মহিন্দর। যে কারণে মনটা খুশিতে তার ভরে উঠেছিল, ঠিক সেই কারণেই কেমন বিস্বাদ আর ক্লান্ত লাগল নিজেকে। বয়স বাড়লে পেছনের দিকে তাকিয়ে যে অহেতুক একটা অতৃপ্তি তীক্ষ্ণভাবে পীড়ন করতে থাকে, সেই অস্বস্তিটা যেন আকস্মিকভাবে পাক খেয়ে উঠল।

এর চাইতে সেই কি ভালো ছিল? আজকের এই নাম দস্তখত করতে-জানা মাননীয় শ্রীমহিন্দর রুইদাস নয়—সেই দুরন্ত চঞ্চল মহিন্দরের বে-হিসেবী জীবন? মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে সেই যখন সে অল্প অল্প সিঁথি কাটত, মুখে ছিল নতুন গোঁফের রেখা, যখন রাতের পর রাত আল্‌কাপ আর গম্ভীরার গান গেয়ে তার গলা ভাঙত না? আর যখন সেই গানের নেশায় মাতাল হয়ে সরলা—

সরলা। আজ আর কেউ নয়। তাকে ভুলে গেছে, তার গান ভুলে গেছে, ভুলে গেছে বাদাম গাছটার তলায় সে রাত্রির কথা; ঝিরঝিরে হাওয়ায় মাথার ওপরে ঘন পাতার রাশি শব্দ করছে, যেন কথা কইছে চুপি চুপি আবছায়া গলাতে; একটা ঘুম-ভাঙা পাখি পাখা ঝাপটালো, বুকের ভেতরে আরো ঘন হয়ে সরে এল সরলা।

—ভয় কি, ভয় কি?

—কে য্যান্ আসোছে।

—ক্যাহো না, শিয়াল যাছে।

—হামার বড় ডর লাগে। ভাই জানিলে হামাক মারি ফেলিবে। কাইল থাকি মুই আর আসিমু না।

কিন্তু পরের দিনও আসত সরলা। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তারপর কবে একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই সরলার আসা বন্ধ হয়ে গেল, সে কথা আজ আর মনেই পড়ে না মহিন্দরের। কিন্তু সে দিনগুলো আছে রক্তের মধ্যে—এমনি একটা মাঠের ভেতর—এই রকম একলা পথ চলতে চলতে স্বপ্নের মতো বাদামগাছটা মাথা তুলে ওঠে। সরলা ভুলেছে, কিন্তু সরলার কি কখনো মনে পড়ে না এমনি কোন একটা মুহূর্তে, একটা নির্জনতার ঝলমলে রোদের ভেতরে?

হয়তো পড়ে, হয়তো পড়ে না।

তবু তার ছেলেদের সঙ্গে মামলা চলেছে। সরলা হয়তো তার মুণ্ডপাত না করে জলগ্রহণ

করে না আজকে। মহিন্দরই কি আজ খুশি হবে সরলা সামনে এসে দাঁড়ালে?

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল মহিন্দর।

খট খট খট। একটা দ্রুত শব্দ। মাটির চাঙাড় গুঁড়ো হয়ে ধুলো উড়ছে ধোঁয়ার রেখার মতো। আর সেই রেখা টেনে শাদা কালো মেশানো একটা বড় ঘোড়া ছুটে আসছে এদিকে। আর কেউ নয়—স্বয়ং হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগা।

মহিন্দর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দারোগা সাহেব আসছেন। চমৎকার চেহারা মানুষটার। ফর্সা রঙ, নধর শরীর, মুখে কালো চাপদাড়ি। থানার পোশাক নেই, একটা শাদা পা-জামার ওপরে পরেছেন একটা খাকী শার্ট, ঘোড়া দাবড়াচ্ছেন মাঠের ভেতর দিয়ে। অর্থাৎ দাগীর খোঁজে যাচ্ছেন না, বেড়াতে বেরিয়েছেন।

মহিন্দর শ্রদ্ধা করে দারোগা সাহেবকে। ভারী চমৎকার লোক—চাপদাড়ির ভেতরে শাদা দাঁত সব সময়েই হাসিতে আলো হয়ে থাকে। এত মিষ্টি করে কথা বলেন যে, শুনলে কে বিশ্বাস করবে, দারোগা সাহেব সরকারের লোক—দেশসুদ্ধ মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? অথচ আগে যিনি ছিলেন, তাঁর দাঁতও বেরিয়ে থাকত, কিন্তু সে থাকত খিঁচিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীসুদ্ধ লোক চোর আর বদমায়েস, তাদের সকলকে তিনি সন্দেহ করতেন, তাঁর চোখ দেখলে মনে হত, হাতের কাছে যাকে পাবেন তাকেই ঠ্যাঙাতে পারলে তবে তিনি খুশি হবেন। একটা গোরু চুরির মামলায় একটু হলেই তিনি মহিন্দরকে ফাঁসিয়েছিলেন আর কি।

কিন্তু এ দারোগা সাহেব ভালো লোক—লোকে বলে মাটির মানুষ। অযথা হয়রান করেন না কাউকে, গালমন্দও না। দুটো ডিম কিংবা একটা মুরগী কেউ ভেট দিতে গেলে দাম নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেন। বলেন, তোরা গরীব মানুষ, বিনি পয়সায় তোদের জিনিস নিতে যাব কেন?

লোকে কৃতার্থ হয়ে যায়।

বলে, না, না হুজুর, মোরা খুশি হই দিনু, আপনার ঠাঁইয়ত্ পাইসা লিবা পারিমু না।

দারোগা হাসেন: তোরা যখন ভালোবেসে দিয়েছিস, তখন না নিলে তোদের কষ্ট হবে। কিন্তু আর দিসনি। এ বে-আইনি—এ আমাদের নিতে নেই।

বে-আইনি! লোকগুলো হাঁ করে থাকে। এতকাল তো এইটেকেই ওরা আইন বলে জেনেছে যে, ঘরে পাঁটা, মুরগী, হাঁস থাকলে, পুকুরে রুইমাছ থাকলে তা দারোগাকে নিবেদন না করে উপায় নেই। ইচ্ছে করে না দিলে জোর করে নেবে। অশ্রাব্য গাল দিয়ে বলবে, ব্যাটারা যে একেবারে লাট সাহেব হয়ে গেলি—অ্যাঁ! থানায় নিয়ে দুদিন হাজতে রেখে দেব, তারপর সদরে চালান করে দেব, টের পাবি কত ধানে কত চাল।

এ দারোগা সাহেব কিন্তু একদম আলাদা—একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

খট খট খট। ঘোড়াটা এগিয়ে আসছে। পাশ কেটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দারোগা সাহেবের চোখ পড়ল মহিন্দরের ওপর। ঘোড়াটাকে এদিকে ঘোরালেন তিনি, থামিয়ে দিলেন জোর রাশ টেনে। তিন পা পিছিয়ে গেল ঘোড়া, আকাশের দিকে তুলে দিলে বিদ্রোহী ঘাড়, কড়মড় করে চিবুলে মুখের লাগামটা। ঘোড়ার ঘাম আর ধুলোর গন্ধের একটা ঝলক মহিন্দরের নাকে ভেসে এল।

হাতের পিঠে কপালের ঘাম আর ধুলোর পাতলা আস্তরটা মুছে ফেললেন দারোগা সাহেব। তারপরে হাসলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হাসি।

—ভালো আছ মহিন্দর?

ভক্তিভরে মহিন্দর সেলাম দিলে: আপনারা যেমন রাখিছেন।

—আমরা আর রাখবার কে?—দারোগার গলায় ফকিরসুলভ বৈরাগ্য ফুটে বেরুল: খোদায়-তালাই রাখছেন সবাইকে। তাঁরই দোয়া সব।

—জী হুজুর।

—তারপর—চলেছ কোথায়?

—কুটুম বাড়ি যাচ্ছি হুজুর।

—ওঃ, সনাতনপুরের ভূষণ মুচির বাড়িতে?

—হুজুর তো সকলই জানোছেন!

দারোগা হাসলেন। আর একবার হাতের পিঠে তেমনি করে কপালের ঘাম মুছলেন, দাড়ি আঁচড়ে নিলেন আঙুল দিয়ে।

—ওহো, ভালো কথা। তোমাদের গাঁয়ে সেই বংশী মাস্টার আছে এখনো?

—আছে তো।

—ইস্কুলে পড়ায়?

—সি তো পঢ়ায়।

—হুঁ।—দারোগার হাসিমুখ ক্রমশ দাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, পড়ানো ছাড়া আর কিছু করে?

মহিন্দর নিজেকে হঠাৎ বিপন্ন বোধ করতে লাগল: পঢ়ানো ছাড়া আর কী করিবে?

—করে, করে। চাষাদের বাড়ি বাড়ি খুব যায়, না?

—জী, সি তো যায়।

—সভা করে? জমায়েৎ?

—আইজ্ঞা?—মহিন্দর ক্রমে উঠতে লাগল শঙ্কিত হয়ে। দারোগার হাসি মিলিয়ে গেছে, একটা নিশ্চিত নিষ্ঠুর কঠিনতা দেখা দিয়েছে কোথাও: আইজ্ঞা?

—বলছি, লোকজন ডেকে জমায়েৎ করে?

—সি তো শুনি নাই।

দারোগা এবারে নিচের ঠোঁটটাকে একবার কামড়ালেন, চোখ দুটো কুঁচকে কেমন একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন মহিন্দরের দিকে : কথাবার্তা কী বলে ?

মহিন্দর এবারে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল : ওইটা তো জী হামি জানি না। হামি কামের মানুষ, উসব শুনি হামার কি হেবে ?

—কিছু শোনোনি কারু কাছে ?

মহিন্দরের অসহ্য লাগছে এতক্ষণে, মনের ভেতরে কোথায় যেন টের পেয়েছে, এই প্রশ্নগুলোর আড়ালে এমন একটা কিছু লুকিয়ে আছে, যা নিতান্তই নির্দোষ কৌতূহল নয়। একটু বিরক্তভাবেই জবাব দিলে।

—হামি শুনিব ফের কার ঠাঁই ? কী আর কহিবে ? মাস্টার ঢের নিখিছে, ভালোই কহে নাগে।

—হুঁ, ভালোই বলে।

দারোগা এতক্ষণে আবার হাসলেন। ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকছে, আল্‌গা করে একটা জুতোর ঠোক্কর দিলেন সেটার পাঁজরে। ঘোড়া চলতে শুরু করল। দারোগা বললেন, আচ্ছা, যাও তুমি।

—জী সেলাম।

তড়বড় তড়বড করে আবার ছুটে চলল ঘোড়াটা—মহিন্দর তাকিয়ে রইল।

সত্যিই চমৎকার চেহারাখানা দারোগা সাহেবের—ঘোড়ার পিঠে তাঁকে খাসা মানায়। এমন নইলে আর দারোগা !

—কিন্তু—

কপাল কুঁচকে মহিন্দর ভাবতে লাগল, মাস্টার সম্বন্ধে হঠাৎ এমন করে সন্ধান নেবার মানে কী ! কোনো মতলব আছে নাকি ? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে ? দারোগা সাহেব একেবারে মাটির মানুষ, তিনি তো কারো ক্ষতি করতে চান না। তাঁর নাম করতেও লোকে যে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে যায় !

মরুক গে, ওসব ভেবে লাভ নেই মহিন্দরের। আদার ব্যাপারী হয়ে কী করবে সে জাহাজের খবর দিয়ে ? তার চাইতে এখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়াই ভালো। বেলা দ্রুত বেড়ে উঠছে, ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপার বোনাই বাড়িতে, বেশি দেরি করলে মান থাকবে না।

মাঠের ভেতর দিয়ে একটা ছোট নদী বেরিয়ে গেছে, তার নাম কাঞ্চন। বর্ষায় ভরে ওঠে, ঢল নামায় দুদিকের বিন্নাবনে ছাওয়া ঢালু জমিতে। তখন কূল থাকে না, কিনারাও না। এখন সে নদী পড়ে আছে নির্জীব একটা সাপের খোলসের মতো। ফালি ফালি

বালির ডাঙা উঠেছে জেগে, তার ভেতর দিয়ে তিন-চারটে ধারায় বেরিয়ে যাচ্ছে বালি-মেশানো চিকচিকে জল। হাঁটুর ওপরে একটুখানি কাপড় তুলেই নদীটা পার হয়ে এল মহিন্দর।

নদীর পরে বিন্নায়-ভরা মাঠ, বেঁটে বেঁটে হিজল গাছ, তারপরেই লাল মাটির উঁচু পাড়ি। পাড়ির ওপরে আমবাগান, খাড়া মাটির এখানে-ওখানে আমগাছের শিকড় ঝুলছে। ওই উঁচু পাড়ির ওপর সনাতনপুরের মুচিপাড়া, আমগাছের ছায়ায় একখানা গ্রাম। গোরুর গাড়ির রাস্তা গ্রামের ভেতর দিয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে গেছে। তিন-চার হাত উঁচুতে বাড়ি, নিচে রাস্তা। শুকনোয় গোরুর গাড়ির পথ—বর্ষায় নৌকো চলবার খাল।

মহিন্দরের বোনাই ভূষণ রুইদাসও অবস্থাপন্ন লোক। আগে জুতো তৈরি করত, হাটবার দিন লাঠির মাথায় জুতো ঝুলিয়ে বেরুত জীবিকার সন্ধানে। কিন্তু এখন আর ওসব উঞ্ছবৃত্তি নেই ভূষণের। কিছু চাষের জমি নিয়েছে, রেখেছে চার জোড়া বলদ আর দুখানা মোষের গাড়ি। জমি থেকে বছরের ধান পায়, আবাদের সময় বলদ ভাড়া দেয় আধিয়ারদের, মোষের গাড়ি বেড়ায় সোয়ারী টেনে—মাল নিয়ে যায় রেল স্টেশনে, এদিক ওদিকের বন্দরে, গঞ্জে।

তারই ছেলের বিয়ে এবং আজ কুটুম খাওয়ানোর দিন।

বলা বাহুল্য, প্রচুর সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে। ভূষণ কার্পণ্য করেনি, তা ছাড়া এমনিতে সে দিল-দরিয়া লোক। গ্রামের মুখে পা দিতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল মহিন্দর, কানে এল গানের সুর। উৎসব শুরু হয়েছে মুচিপাড়ায়।

মহিন্দর থেমে দাঁড়াল, একবার তাকালো হাতের জুতোজোড়ার দিকে। সময় হয়েছে। পাশেই একটা কাদায় ঘোলা ডোবা আকীর্ণ হয়ে আছে সিঙ্গাড়া আর শাপলার লতায়, ফুল ঝরে-যাওয়া গোটা কয়েক ন্যাড়া পদ্মের ডাঁটা শুকোচ্ছে শীতের রোদে। তারই কাঠ-ফেলা ঘাটে মহিন্দর পা ধুয়ে পরে নিলে জুতোজোড়া। এখন নিজেকে বেশ সমৃদ্ধ আর সম্ভ্রান্ত বলে সন্দেহ হচ্ছে। অবশ্য পায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জুতো কামড় বসিয়েছে, মনে হচ্ছে, একটা আঙুল যেন কেটে বেরিয়ে যাবে। তবুও জুতো পায়ে দিলে কেমন মচমচ করে শব্দ হয়, এই খালি-পায়ের দেশে লোকগুলো বুঝতে পারে, উল্লেখযোগ্য কেউ একজন আসছে এগিয়ে।

দুধারে চামড়া-ধোয়া পচা জলের উৎকট গন্ধ, এদিকে ওদিকে কাঠি দিয়ে আঁটা-টান করা চামড়া শুকোচ্ছে রোদে, দরজার গোড়ায় ঝুলছে সমাপ্ত অসমাপ্ত জুতোর রাশ, দুটো একটা ঢাক পড়ে আছে এদিকে ওদিকে। একটা পাঁটার ঠ্যাং নিয়ে শুরু হয়েছে তিন-চারটে কুকুরের কলহ। কিন্তু বাড়িগুলো সব ফাঁকা—কোথাও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। ওদিক

থেকে আসছে প্রচণ্ড গানের শব্দ—নিশ্চয় ভূষণের বাড়িতে। সারাটা গ্রাম বোধ হয় জড়ো হয়েছে ওখানে গিয়েই।

অনুমান মিথ্যে নয় মহিন্দরের। একেবারে আলো হয়ে গেছে ভূষণের দাওয়া। গড়াগড়ি যাচ্ছে দশ-বারোটা তিরিশের বোতল, পচাইয়ের ভাঁড়গুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। একজন করতাল পিটছে ঝমর ঝমর করে, একজন বাজাচ্ছে হারমোনিয়াম, আর তবলার অভাবে একটা ঢাকের উপর কাঠি দিয়ে তাল রাখছে তৃতীয় জন। আর অতি প্রচণ্ড নেশা করেছে সকলে। চোখগুলো টকটকে লাল, ইচ্ছে করে মাথা নাড়ছে, না নেশার ভারে মাথাগুলো আপনা-আপনিই ঢুলে ঢুলে পড়ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সকলের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছে রাসু। বেশ মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারার লোক, কম কথা বলে আর যা বলে তা দস্তুরমতো ওজন করে। এ হেন রাসুকে এখন আর চিনতে পারা যাচ্ছে না। ধুতির খানিকটা পরেছে ঘাগ্‌রা করে, খানিকটা তুলে দিয়েছে মাথার ওপর ঘোমটার ধরনে—তারপর বাইজীর ধরনে কোমর দোলাবার চেষ্টা করছে। অবশ্য তাতে কোমর দুলছে না, দোল খাচ্ছে ভুঁড়িটাই। আর সেই নাচের সঙ্গে গানও ধরেছে তারস্বরে :

"নাগর হে, ইটা তুমার কেমুন কাজ,
লিয়ে করে মোহন বাঁশি,
কুল-মান দিল্যা নাশি,
পরানে পড়াইল্যে ফাঁসি,
কুন্‌ঠে বা মুই রাখিম্‌ লাজ
হে, ইটা তুম্‌হার কেমুন কাজ"—

—হে ইটা তুম্‌হার কেমুন কাজ—তারস্বরে কোলাহল উঠল চারদিকে। প্রত্যেকটা মানুষ সপ্তমে চড়িয়েছে মাতালের জড়ানো গলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে পরস্পরের সঙ্গে। গান হচ্ছে না দাঙ্গা চলছে, ব্যাপারটা বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত। রাসুর নাচের উৎসাহটা ক্রমশ ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে ভব্যতার মাত্রা।

মহিন্দর বললে, সাবাস হে, খুব জমাছ!

—আইস হে বড় কুটুম, আইস—

সাড়া পড়ে গেল মহিন্দরের আবির্ভাবে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল তিন-চারজন, টেনে একেবারে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল তাকে। রাসু এগিয়ে এল, দু হাতে মহিন্দরকে জাপ্‌টে ধরলে একেবারে : আইস হে নাগর, আইস। তুম্‌হার জন্তেই তো কাঁদি কাঁদি চোখ আন্‌হার করি ফেলিছু।

হাসির রোল উঠল।

রাসু বলে চলল, হামার নাগর আসিলে, তুমরা উলু দাও কেনে। পা ধুবার পানি লিয়ে আইস, পিঁড়া দাও।

সমবেত উলুধ্বনির মাঝখানে আসন নিলে মহিন্দর। কিছুটা অপ্রতিভ, কিছুটা লজ্জিত। সভায় ভূষণ উপস্থিত ছিল না, মহিন্দরের আসবার খবরে ভেতর থেকে ছুটে এল সে।

—অ্যাতে দেরি করিলা দাদা ?

—চের ঘাঁটা (পথ) ভাঙি আইনু, তাই দেরি হৈল্।

—তো আরাম করে বৈস। হামি উধার যাছি—

রাসু বললে, হঁ, হঁ, তুমি যাও না কেনে। হামাদের কুটুম লিয়ে হামরা ফুরতি করি।

—তো কর, কে মানা করোছে ?—মৃদু হেসে ভূষণ চলে গেল। তার অনেক কাজ। মাংস রান্না হচ্ছে, তার তদারক করতে হবে, কলাপাতার যোগাড় হয়নি এখনো, সেটা দেখতে হবে। তা ছাড়া লোক যা জড়ো হয়েছে তাতে অন্তত আরো দু হাঁড়ি ভাতের যোগাড় না করলেই নয়।

যাওয়ার সময় ভূষণ বললে, মাতালের হাতে পড়িলা, বেশি নেশা-ভাঙ করিয়ো না দাদা।

—তুমি কেনে বাগড়া দিছ ? যেইঠে যাছ, যাও না ?

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাল হয়ে এল মহিন্দরেরও চোখ, রাসুর গানের সুরে তারও ঘোর লাগতে লাগল। কোমর দুলিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে রাসু কটাক্ষ বর্ষণ করে চলল মহিন্দরের দিকে :

"যৈবন ভাসানু হে সখা নীল যমুনায়"—

নেশা লাগছে, তবু কোথায় যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মহিন্দরের—কিসের একটা ছোঁয়া লেগে ফিকে হয়ে যাচ্ছে সমস্ত। টুকরো টুকরো রবিশস্যে ভরা মস্ত মাঠখানা। বহুদিন ধরে মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করে ওঠা সরলার স্মৃতি। দারোগা সাহেব খোঁজ নিচ্ছেন বংশী মাস্টার সম্বন্ধে। কেমন লোক, কী করে, কী বলে গ্রামের চাষা-ভুষোদের, কী বোঝাতে চেষ্টা করে ?

কোনো সম্পর্ক নেই এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোর মধ্যে, তবু কোথায় যেন সম্পর্ক আছে একটা। ঠিক বুঝতে পারছে না মহিন্দর—অথচ কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মন—কিছুর একটা আভাস পেয়েছে। অন্ধকারে শিকারী কুকুরের মতো চকিত হয়ে উঠেছে তার ইন্দ্রিয়।

—চন্দ্রাবলীর ভাবন নাগিলে নাকি হে নাগর ?

রাসু জিজ্ঞাসা করলে। মহিন্দর উত্তরে মৃদু হাসল। কী যেন হয়েছে তার। কিছুতেই ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, কোথায় একটা দোলা লেগেছে, নাড়া খেয়ে উঠেছে সমস্ত। মাঝে মাঝে এরকম হয়। ঠিক কারণটা খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ একটা বিষণ্ণ বিস্বাদ, একটা নিরাসক্তি এসে আচ্ছন্ন করে। মনে হয়, কে যেন আসবে, কী যেন ঘটবে।

নতুন, অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর।

সরলা? নিস্তব্ধ অন্ধকারে সেই উচ্ছল রক্তের মাতামাতি? সেই আশ্চর্য দিনগুলি? অথবা ঘোড়ার পিঠে দারোগা সাহেবের সেই আবির্ভাব? অথবা কিছুই না? শুধু একটা আদিগন্ত মাঠ, ভাঙাচুরো আল-পথ, গোরুর হাড়ের কতগুলো টুকরো আর এলোমেলো হরিত-হিরণ্যের ছাপ?

ঘোর ঘোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মহিন্দর। চোখে পড়ল ভেতরের উঠোনেও একটা ছোট আসর বসেছে। সেখানে বেশির ভাগই মেয়ে—দু-চারটে মদের বোতল গড়াচ্ছে সেখানেও। এখানকার আসরের সঙ্গে ওখানকার একটু পার্থক্য আছে। ফর্সা করে বিশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে ওখানকার সভা একেবারে আলো করে বসেছে। দিব্যি চেহারা ছেলেটির, গায়ে একটা ফর্সা কামিজ, কানের ওপর দিয়ে সৌখীন বাঁকা সিঁথি। ছেলেটি হাসছে, বোধ হয় রসিকতা করছে—আর মেয়েরা হাসির ধমকে একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জমেছে বেশ।

কপালটা কোঁচকালো মহিন্দর।

ছেলেটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। কখনো দেখেনি, অথচ মুখের গড়নে কোথায় একটা পরিষ্কার পরিচয়ের আদল আসে। আর যেটা সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে এই যে, ছেলেটি এখানকার সব চেয়ে সম্মানিত অতিথি—অবস্থাপন্ন, লেখাপড়া জানা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমহিন্দর রুইদাসের চাইতেও। তাই অন্দরে মেয়েদের মধ্যে নিয়ে তাকে বসানো হয়েছে, স্বয়ং ভূষণ এসে তত্ত্বাবধান করে তার।

হঠাৎ কেমন বিশ্রী বোধ হল মহিন্দরের, কেমন অপমানিত বোধ হল নিজেকে। এ গ্রামে—অন্তত এ বাড়িতে তার চেয়ে মর্যাদাবান কে? ভূষণ তাকে বসিয়ে রেখে নিজের কর্তব্য শেষ হয়েছে মনে করে চলে গেল, অথচ কেন ঘুরে ফিরে ওই ছেলেটির তত্ত্বতালাস করে যাচ্ছে সে? ব্যাপারটা কী?

ছেলেটি সমানে হাসছে, মেয়েরা ভেঙে ভেঙে পড়ছে হাসিতে। বেশ জমিয়েছে ওরা, একটা আলাদা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে ওখানে। মহিন্দরের কেমন যেন মনে হতে লাগল, ছেলেটা তাকে তার আসন থেকে বঞ্চিত করেছে, ভাগ বসিয়েছে তার ন্যায়সঙ্গত এবং চিরন্তন মর্যাদায়। কিন্তু কে ও?

সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্যে, যৌবনে ঝলমল করছে। আসর আলো করে বসবার মতো চেহারাই বটে। আর সেই জন্যেই কি ভালো লাগছে না মহিন্দরের, সেই জন্যেই কি অসহ্য অনধিকারী বলে বোধ হচ্ছে নিজেকে? ওকে দেখে কি নিজের হারানো সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে—মনে পড়ছে রক্তের মধ্যে সেই মাদকতার দিনগুলোকে? একদা ত্রিশ বছর আগে যে গৌরবে জোয়ান মহিন্দর গ্রামের সেরা মেয়ে সরলার চিত্ত জয়

করতে পেরেছিল, সেই গৌরবের নতুন উত্তরাধিকারীকে কি সহ্য করতে পারছে না মহিন্দর ? আজ যে সব মেয়ে কৈশোর-যৌবনের মাঝখানটিতে একটির পর একটি পাপড়ি খুলছে ফুলের মতো, তারা মহিন্দরের কাছে আলেয়ার মতো মিথ্যে হয়ে গেলেও ওই ছেলেটি আজ তাদের পৃথিবীতে একচ্ছত্র ?

মহিন্দরের কপাল আরো বেশি করে কুঞ্চিত হয়ে এল। কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল ওদের আলাপ, ওদের চটুলতা। কিন্তু কিছু শোনা যাচ্ছে না—বোঝাও যাচ্ছে না। ঢাকের বাজনা, করতালের শব্দ আর গানের মাতামাতিতে শোনবার উপায় নেই একটি বর্ণও।

ইতিমধ্যে নাচতে নাচতে বেদম হয়ে পড়েছে রাসু। পাশে এসে বসেছে মহিন্দরের। দু হাতে তাকে জাপটে ধরে বলছে, তোমার কী হৈল্ হে নাগর ? রাধিকার উপর থাকি মন কি সরি গিছে ? তাই তো মনে নাগোছে। হায় হায়রে, হামার নাগরকে কেবা এমন করি ভুলাইলে—

ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ রাসুকে সরিয়ে দিয়ে রূঢ় গলায় মহিন্দর বললে, থামো হে, অত মাতামাতি করিয়ো না। বুঢ়া হইছ—সিটা খেয়াল নাই ? ছোয়া পোয়ার সামনত্ অমন ঢলাঢলি করিলে কি মান থাকে ?

রাসু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য এবং অপ্রত্যাশিত। এরকম ক্ষেত্রে এবং এমন একটা উপলক্ষে এ জাতীয় ধর্মকথা যে কেউ শোনাতে পারে, এটা কল্পনারও অতীত ছিল।

এতক্ষণ সখীনৃত্য করে আপাতত রাসু স্ত্রীভাবে ভাবিত। কথাটা শুনে সে একবার জিভ কাটলে, মাথার পেছনে হাত দিয়ে ঘোমটা টানার চেষ্টা করলে একটা, কিছুক্ষণ নিজের চিবুকটা আঙুলের মাথায় ধরে মেয়েলি ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বললে, হায়রে বাপ, হঠাৎ ইটা কী হইল্ হে ? খুব মানী হই গিলা নাগোছে ?

—ত নাগিবে না তো কী ? বয়েসখানা তো ফের কম হয় নাই। এখন উসব চ্যাংড়ারা করিবে, নাচিবে, কুঁদিবে, যিটা উয়াদের ভালো নাগে সিটাই করিবে। তুমরা উসব ছাড়ি দেন। দেখিতেও ভালো নাগে না—ফের কোমরে অস (বাত) ধরিলে বিছানাত্ পড়ি থাকা নাগিবে।

মহিন্দর স্বরে এবারে তিক্ত নৈরাশ্য ফুটে বেরুল। কথাটা সে কি রাসুকে বলেছে, না বলেছে নিজেকেও ? শুধু রাসুকেই সতর্ক করে দিচ্ছে তা, না বোঝাপড়া করে নিচ্ছে নিজের মনের সঙ্গেও ? এটা আজ আর বুঝতে বাকি নেই যে, তারা আজ ক্রমশ জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে—সবে যাচ্ছে আনন্দ আর যৌবনের অধিকার থেকে। আজ কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে যাদের দেহ-মন পদ্মের মতো বিকসিত হয়ে উঠছে, তারা আর ওদের কেউ নয়।

কুড়ি-বাইশ বছরের ওই ফর্সা ছেলেটি সেখানে নিজের সগৌরব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে—ঈর্ষ্যাতিক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া মহিন্দরদের আর গত্যন্তর নেই।

কিন্তু রাসুর এবার আর বাকস্ফূর্তি হল না। কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টি মেলে। তারপর বললে, তোমার কী হৈল্ হে আইজ!

—কী আবার হেবে? বয়েস হইছে, সিটাই মনে পঢ়াই দিমু! এখন নিজের মান রাখি চলিবা নাগে—বুঝিলা?

—বুঝিনু—

রাসু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মহিন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করতে তারও চোখ চলে গেল ভেতরে ওই ছোট আসরটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু একটা বুঝল রাসু—যেটা অস্পষ্ট ছিল সেটা প্রত্যক্ষোজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে মহিন্দর মনটা যেন ধরা পড়ে গেল তার কাছে এবং একই সঙ্গে, একই সময়ে, একই প্রশ্ন আর একই উত্তর বেরিয়ে এল :

—ওই ছোঁড়াটা কে হে?

—কে জানেবা!

—কখনো দেখিছ?

—ঠাহর পাছি না।

—উয়াক কোথা থাকি আনিলে ভূষণ?

—কে কহিবে? ভিন্ গাঁয়ের কুনো কুটুম হবা পারে।

—সিটাই নাগোছে।

এই সময় ভূষণ এসে হাজির। পেছনে পেছনে কলাপাতার রাশি, মাটির গেলাস। খাবার তৈরি।

—বসি যান, বসি যান সব।

একটা কলরব উঠল। নেশায় বিহ্বল মানুষগুলো এতক্ষণে উঠেছে সজাগ হয়ে। ফুটন্ত ভাতের গন্ধ আসছে, আসছে মাংসের মনমাতানো গন্ধ। ক্ষিদেটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল হাঁড়িয়া আর দেশী মদের নিচে, মাংসের এই পাগল-করা গন্ধে এবার সেটা আত্মপ্রকাশ করলে উদগ্রভাবে।

—কই লিয়ে আইস, লিয়ে আইস।

—আইজ তোমার হাঁড়ি ফাঁক করি দিমু হে ভূষণ। কয় মণ মাংস রাঁধিছ?

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিমু—কে কেমুন জোয়ান আছ, কত খাবা পার।

পাতা পড়ল, পড়ল গেলাস। ভূষণ সবিনয়ে এসে দাঁড়াল সকলের সামনে—বিশেষ করে মহিন্দরের।—পেট ভরি খাইও হে কুটুম, বদনাম করিয়ো না।

কেমন বিরক্ত দৃষ্টিতে মহিন্দর ভূষণের দিকে তাকালো। একবার বলতে ইচ্ছে করল, আমাকে আর অভ্যর্থনা করা কেন, ওই ছোকরাটাকেই করো গে। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করলেই বলা যায় না. মহিন্দর নিজেকে সামলে নিলে। শুধু সংক্ষেপে জবাব দিলে, হুঁ।

একটুখানি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল ভূষণ।

—তোমার কী হইছে কুটুম ? অসুখ করিছে নাকি ?

—অসুখ আর কী করিবে ? হাম্রা এখন বুঢ়া হই গেনু—অসুখ তো হামাদের নাগিই রহিছে।

—বুঢ়া !—ভূষণ রসিকতার চেষ্টা করলে : তুমি তো চিরকালই জোয়ান রহিছ কুটুম—তুমি ফের কবে বুঢ়া হইলা ?

একটা অকারণ রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল মহিন্দরের। কেন কে জানে, একটা চড় বসিয়ে দেবার ইচ্ছে জাগছে ভূষণকে। ভূষণের হাসিটা অস্বাভাবিক রকমের কদর্য মনে হচ্ছে, যেন দাঁত বার করে সে ঠাট্টা করছে মহিন্দরকে।

অনেক কষ্টে এবার নিজেকে সামলে নিলে মহিন্দর। শুধু বললে, হুঁ।

কয়েক মুহূর্ত বিস্মিতভাবে কুটুমকে পর্যবেক্ষণ করে ভূষণ সরে গেল সেখান থেকে। কিছু বুঝতে পারেনি—বোঝবার সময়ও নেই তার। শুধু সম্মানিত কুটুমই নয়, নিমন্ত্রিত যেসব অভ্যাগত আছে, তাদের সম্পর্কেও করণীয় আছে তার, আছে দায়িত্ব। শুধু কুটুমকে আপ্যায়ন করলেই চলবে না—জাত-ভাইদেরও খুশি করা দরকার।

মহিন্দর বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ঝুড়ি বোঝাই করে এল লাল চালের ভাত—গরম ভাতের ধোঁয়ায় ভরে গেল জায়গাটা।

কলার পাতায় পুরো এক এক সের চালের ভাত পড়তে লাগল। কিন্তু কী যে হয়েছে মহিন্দরের কে জানে। সেই ন্যাড়া মস্ত মাঠটা, সেই সরলার স্মৃতি—সেই ঘোড়ার পিঠে দারোগা সাহেব, না এই বিশ-বাইশ বছরের সুদর্শন ছেলেটা ? কিছু পরিষ্কার ধরা যাচ্ছে না। অথচ থেকে থেকে বিরক্তিতে ভরে উঠছে মন। শুধু খেতে ইচ্ছে করছে না তা নয়, এখান থেকে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করছে—গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে কোনো একটা নির্জনতায়—যেখানে মনটাকে স্পষ্ট করে যাচাই করে নেওয়া চলে, যেখানে খোলা আকাশের নিচে, অজস্র অপর্যাপ্ত বাতাসে তার বিব্রত স্নায়ুগুলো আশ্বাস পায়।

—মাংস—মাংস লিয়ে আইস—

লুব্ধ কলরব উঠেছে। যাদের তর সয়নি তারা ইতিমধ্যেই শুধু ভাত মুঠো মুঠো করে খেতে শুরু করে দিয়েছে। আসরটার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে মহিন্দর, এক-বার মনে হল—চারদিকের লোকগুলো অত্যন্ত লোভী, অত্যন্ত ইতর, এদের মাঝখানে সে

বেমানান, এখানে আসাটা তার উচিত হয়নি।

—নাগর, খাও কেনে—

—হঁ, খাছি—অন্যমনস্ক ভাবে ভাত নাড়াচাড়া করতে লাগল মহিন্দর। ইতিমধ্যে মাংসের পাত্র এসে পৌঁছেছে। একশো জোড়া সলোভ দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে মাংসের ভাণ্ডের ওপর—স্ফীত নাসারন্ধ্রগুলো সাগ্রহে শুঁকছে তার উগ্র উত্তেজক গন্ধ।

ভাতের ওপর এক হাতা মাংস পড়তেই চমকে উঠল মহিন্দর। সেই ছেলেটি মাংস পরিবেশন করছে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই কী একটা জিনিস বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত হয়ে গেল মনের ভেতরে। কে এই ছেলেটি, কার ছেলে? কার আদল এর মুখে?

হঠাৎ মহিন্দর প্রশ্ন করে বসল, তুম্‌হাক তো কখুনো দেখি নাই। তুমার বাড়ি কুন্‌ঠে হে বাপু?

সলজ্জ স্বরে ছেলেটি বললে, মীরপাড়া।

মীরপাড়া! মহিন্দরের বুকের ভেতর ধক্‌ করে উঠল, থেমে দাঁড়াতে লাগল হৃৎস্পন্দন।

—তুমার বাপের নাম কী?

—কেষ্ট রুইদাস।

হিংস্রভাবে দাঁতে দাঁত চাপলো মহিন্দর: তুমি সরলার ব্যাটা?

মায়ের নাম শুনে ছেলেটি আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, হঁ। আমার মাকে আপনি চিনেন?

কিন্তু ততক্ষণে পাতা ফেলে তীরের মতো মহিন্দর উঠে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে ডাক দিয়েছে, ভূষণ?

ভূষণ শশব্যস্তে ছুটে এল। ত্রস্তস্বরে বললে, কী হৈল্ কুটুম, অমন করি পাতা ছাড়ি উঠিলা ক্যান?

বজ্রকণ্ঠে মহিন্দর বললে, হামাক কি অপমান করিবার জন্য এইঠে ডাকি আনিছ?

—অপমান? অপমান কেনে?

সমস্ত বৈঠক বিস্ময়ে ভয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। সবে মাংসের মন-মাতানো গন্ধটা বাস্তব রূপ ধারণ করে সম্মুখে এসে পৌঁছেছে। এমন সময় এ কি বিঘ্ন!

—কী হৈল্ কুটুম, হৈল্ কী!

মহিন্দর রুদ্রস্বরে বললে, কী হৈল্ না, সেইটাই হামাক কহ। সরলার ব্যাটা হামার সাথ মামলা করে, হামাক হাজতে পাঠাবা চাহে। তাক দিয়া হামাক খিলাবার চাহিছ, হামার অপমান হয় না?

ভূষণ বললে, ইটা তুমি কী কহিছ কুটুম! মামলা হছে—সিতো আদালতের কারবার;

এইঠে খানাপিনা হেবে, জাত-গোত্তর সব এক সাথ মিলিবে, এইঠে উসব ঝামেলা ক্যানে উঠাছ ?

—ক্যানে উঠামু না ? হামার মান নাই ? উয়াদের ডাকি আনি অ্যাতে যে খাতির নাগাছ, সিটা হামাকে বে-ইজ্জত হয় না ? হামি চইন্থ—

কথার সঙ্গে সঙ্গে আর অপেক্ষা করল না মহিন্দর। কাঁচা চামড়ার জুতোটা আঙুলের মাথায় তুলে নিয়ে বললে, যাছি। আর কুনোদিন আসিমু না।

রাসু বললে, আরে নাগর—বৈস বৈস। তোমার কি মাথা খারাপ হৈল্ ?

—হঁ, হৈল্। খারাপ হবার হৈলে আপনি হয়—কাউক কহিবার নাগে না। হামি যাছ্।

ভূষণ বললে, কুটুম, কাণ্ডটা কী করোছ্ একবার ভাবি দেখ।

—দেখিছু—

—হামি হাতজোড় করি কহছি—

এক ঝাপটায় ভূষণের হাত সরিয়ে দিয়ে তিক্তস্বরে মহিন্দর বললে, খুব হৈছে। নতুন কুটুমগুলাক খাতির কর—উসবে হামাদের কাম নাই।

মুহূর্তে আনন্দিত ভোজের আয়োজনে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল মহিন্দর—নেমে গেল কাঁচা রাস্তায়। উত্তেজনার বশে জুতোটা পায়ে দেওয়ার কথা পর্যন্ত খেয়াল রইল না তার।

সমস্ত বৈঠকটা নির্বাক। সরলার ছেলে পাংশু রক্তহীন মুখে একটা প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে রইল সেইখানেই।

দুই

সেই মাঠটার ভেতর দিয়েই যখন মহিন্দর ফিরে চলল, তখন কেমন হালকা হয়ে গেছে তার মন। নিজের প্রতি অপমানের একটা মিথ্যে ছুতো করে অপমান করতে পেরেছে সরলার ছেলেকে, সেই সরলা, যৌবনে যে মহিন্দরের রক্তের ভেতরে বিষ বিস্তার করেছিল নাগিনীর মতো—আর আজও যে তেমনি নাগিনীর মতো ছোবল মারবার চেষ্টা করছে তাকে।

কিন্তু—

কিন্তু এতটা কি করবার দরকার ছিল ? সরলার ছেলে তাকে পরিবেশন করতে এসেছে এটা কী এমন মারাত্মক অপরাধ, যার জন্যে ওভাবে পংক্তিভোজন নষ্ট করে বেরিয়ে আসতে হবে ? অথবা শুধুই হিংসা—ওই জোয়ান ছেলেটার সমৃদ্ধ যৌবনের ঐশ্বর্যকে মহিন্দর সহ্য

করতে পারল না ?

কারণ যাই থাক, এটা ঠিক যে তার ভালো লাগছে না। আর এই ভালো না লাগাটা সঞ্চারিত হয়েছে সেই নির্জন মাঠের ভেতরে—সেই শীতের ঘুমন্ত রোদে। হঠাৎ মনে হল যেন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে—নিজের ভেতরে কোথাও কিছু একটা বিশৃঙ্খলা ঘটেছে তার।

সেই বিরক্ত বিস্বাদ দীর্ঘপথ পেরিয়ে যখন সবে নিজের গ্রামে এসে পা দিয়েছে এবং যখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা কী ঘটল, এমন সময় ডাক শুনতে পেল পেছন থেকে।

—মহিন্দর, মহিন্দর ?

ডাক দিয়েছে বংশী মাস্টার।

সঙ্গে সঙ্গে দারোগা সাহেবের চাপ-দাড়ির আড়ালে হিংস্র হাসির ছটাটা মনে পড়ে গেল মহিন্দরের। ঠিক সহজ মানুষ নয় বংশী পরামাণিক, অন্তত এতদিন যে দৃষ্টিতে মহিন্দর তাকে দেখে এসেছে, সেটা বংশী মাস্টারের আসল পরিচয় নয়। তার ভেতরে আরো একটা কিছু আছে—যেটাকে দারোগা সাহেব আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এবং মহিন্দরের মন বলছে, লক্ষণটা শুভ নয়, একটা ঝোড়ো মেঘের সংকেত শিখায়িত হয়ে উঠেছে সেখানে।

বংশী মাস্টার একটা খুরপি হাতে করে বাগান খুঁড়ছিল। একটা পাতলা গেঞ্জি গায়ে, এই শীতের বিকেলেও পরিশ্রমে সে ঘেমে উঠেছে। একটা বিলিতি বেগুন গাছের গোড়া পরিষ্কার করতে করতে বংশী ডাক দিচ্ছে, শোনো, শোনো মহিন্দর—

মহিন্দর দাঁড়িয়ে গেল অনিশ্চিতভাবে। মনের ভেতর কেমন এলোমেলো লাগছে, ভালো লাগছে না এখন আর কথা বলতে। তবু বংশী মাস্টারকে উপেক্ষা করা চলে না, তার কাছে নানা দিক থেকে কৃতজ্ঞ আছে মহিন্দর। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললে, কেন ডাকোছেন ?

—একবার এসো না এদিকে।

মহিন্দর ফিরল—গিয়ে দাঁড়ালো মাস্টারের বাগানের সামনে। প্রাইমারী ইস্কুলের লাগাও একখানা আটচালা খড়ের ঘরে বংশী মাস্টার বাস করে। বাইরে থেকে এসেছে এখানে—বিদেশী মানুষ। থাকে একাই—পরিবার-পরিজন আছে বলে কেউ জানে না।

তবু বেশ উৎসাহী করিৎকর্মা লোক। চুপচাপ বসে থাকতে পারে না কখনো। ঘরের সামনে এক টুকরো ফালতু জমি যা পেয়েছে, দিব্যি বাগান গড়ে তুলেছে তাতে। লাগিয়েছে কপি, মুলো, বেগুন, বিলিতি বেগুন, কড়াইশুঁটি। নিজে একা হাতেই সব করেছে মাস্টার। মাটি কুপিয়েছে, ইস্কুলের পাতকুয়ো থেকে বাগান বরাবর খুঁড়ে এনেছে জলের নালা, নিজের হাতে সজি লাগিয়েছে, নিজেই তত্ত্বাবধান করেছে তার। ফলে এখন প্রসন্ন সবুজের

দীপ্তিতে সারা বাগানটা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। টুকটুকে লাল হয়ে পেকে রয়েছে বিলিতি বেগুন, উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে -মূলোর শাক, গাঢ় নীল রঙের পুরু পুরু পরিপুষ্ট পাতা-গুলো জড়িয়ে ধরে আছে দুধের মতো সাদা নিষ্কলঙ্ক কপির ফুল। সারা বাগানটায় যেন লক্ষ্মী তাঁর আঁচল বিছিয়ে দিয়েছেন—হাতের গুণ আছে মাস্টারের।

অনিচ্ছুক পায়ে এসেও মহিন্দর মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে তাকালো বাগানটার দিকে। বললে, সাবাস হে মাস্টার, খাসা বাগানখান করিছেন হে তুমার।

মাস্টার তৃপ্তির হাসি হাসল।

—সেই জন্যেই তো ডাকছিলাম তোমাকে—বড় একটা ড্রামহেড্ বাঁধাকপির গায়ে সস্নেহ হাত বুলোতে বুলোতে মাস্টার বললে, তোমরা এসব ভালো জানো, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কপিগুলো তো এখনো আঁট বাঁধল না, বেঁধে দেব?

মাস্টার অনেক 'নিখলেও' এমন অনেক কিছুই জানে না যা মহিন্দর জানে। সুতরাং মহিন্দরের তিক্ত বিস্বাদ মনটা আপনা থেকেই খানিকটা পুলকিত আর সহজ হয়ে এল। প্রাজ্ঞতার ভঙ্গিতে মহিন্দর বললে, না না, এখন বাঁধিবেন না। ভালো জাইতের জিনিস, আপনি ধরি যিবে।

—আর পাতাতেও পোকা লাগছে।—কপির পাতা থেকে একটা সবুজ কীট বার করে আনলে বংশী: সব খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

—তো হুঁকার জল ছিটাই দাও—পালাই যিবে।

—হুঁকার জল?—বংশী আবার হাসল: হুঁকো তো খাই না, জল পাব কোথায়?

সস্নেহ মৃদু ভঙ্গিতে মহিন্দর ভৎর্সনা করলে মাস্টারকে: কেমন মাস্টার হে তুমি? বিড়ি খাও না, তামাকু খাও না তো ছাত্র পঢ়াও কেমন করি? আচ্ছা, হামি তোমাকে হুঁকার জল দিমু।

কথা হচ্ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাতের খুরপিটাকে নামিয়ে রেখে বংশী বললে, একটু বসবে মহিন্দর? খুব তাড়া নেই তো?

একটু আগেই খুব তাড়া ছিল মহিন্দরের—কোথাও দাঁড়াতে ইচ্ছে ছিল না, স্পৃহা ছিল না কারো সঙ্গে কথা বলবার। ভাবছিল, বাড়ি ফিরে যাবে। ভুবণের ওখানে গিয়ে একটা অর্থহীন দুর্বোধ্য উত্তেজনায় যে কেলেঙ্কারিটা করে এসেছে, নিজের ভেতরে দেখবে সেটাকে বিচার করে, একটা হিসাব নেবে তার; একবার থিতিয়ে নিয়ে বুঝতে চাইবে, যা করে এসেছে তার আসল তাৎপর্য কী, তার মূল কোথায়। কিন্তু এখন মনে হল, একটু অন্যমনস্ক হওয়া দরকার, দরকার দুটো-চারটে কথা বলা—যা সেই অপ্রিয়, অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

—না, তাড়া নাই।

—তবে একটু বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা! তার সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে বংশী পরামাণিকের? বসতে সে পারে, খোস গল্প করতে পারে খানিকক্ষণ, শাকসব্জি কী উপায়ে ভালো করা যায়, বাড়ানো চলে দ্রুত গতিতে, সে সম্বন্ধেও উপদেশ দিতে পারে মহিন্দর। কিন্তু কথা! শুনলেই কেমন একটা খটকা লাগে, লাগে একটা অপ্রত্যাশিত চমক। দারোগা সাহেবের সেই জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে এর কোনো রকম সম্পর্ক নেই তো? কে জানে!

—কী কহিবা চহোছেন?

—এসো, বোসো এই দাওয়ায়।

মহিন্দর দাওয়ায় বসল এসে। এদিক থেকেও একটা বিশেষত্ব আছে বংশী পরামাণিকের —যা আগেকার কৈবর্ত পণ্ডিতের ছিল না। এটা যে মুচিদের গ্রাম এবং এরা যে জুতো সেলাই করে অবসর সময়ে জমিতে চাষ দিয়ে কালাতিপাত করে থাকে, এ কথাটাকে কৈবর্ত পণ্ডিত কখনো ভুলতে পারত না। চামারদের প্রতি অনুকম্পার সীমা ছিল না তার এবং সেজন্য সব সময়েই তার নাক খাড়া হয়ে থাকত আকাশের দিকে। এক কথায় সে মুচিদের ঘৃণা করত—চলত নিজের দূরত্ব বাঁচিয়ে। গলায় একগাছা পৈতে ঝুলিয়ে নিয়েছিল বামুনদের অনুকরণে, বুড়ো-আঙুলের ডগায় সেটাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সগর্বে বলত, হুঁ, হুঁ, আমরা জাত কৈবর্ত, তোদের মতো ছোট লোক নই।

বংশী পরামাণিক তার দলের নয়। নিজে জলচল নাপিতের ছেলে হয়েও মুচিদের সে করুণার চোখে দেখে না, ওসব বালাই নেই তার। সযত্নে এবং সসমাদরে সকলকেই সে দাওয়ায় এনে বসায়, গল্পগুজব করে। জাত-বিচার নেই, ছোঁওয়া-ছুঁয়িও নেই।

বেলা পড়ে এসেছে, অল্প অল্প উঠেছে শীতের হিমেল হাওয়া। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে বংশী বললে, তুমি তো গাঁয়ের সব চাইতে বিচক্ষণ লোক মহিন্দর, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। এবারে আমাদের ইস্কুলে সরস্বতী পূজো করলে কেমন হয়?

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না মহিন্দর: কী পূজা করিবা কহিছ?

—সরস্বতী পূজা।

—হায়রে বাপ! ইসব খেয়াল তুম্‌হার কেনে হৈল্ মাস্টার?

—কেন, দোষটা কী? ইস্কুল বিদ্যার জায়গা, আর সরস্বতী হলেন গিয়ে তোমার বিদ্যার দেবী—এটা তো জানো?

—হঁ, সি তো জানি।

—তা হলে যেখানে বিদ্যা হয়, সেখানে বিদ্যার দেবীর তো পূজা করা উচিত?

—হঁ, সি তো উচিত।

—তবে পূজার ব্যবস্থা করি।

—থামো হে মাস্টার—বংশীকে বাধা দিলে মহিন্দর: তুমি ঢের নিখিচ, যিটা কহিবা সিটা তো হেবে। কিন্তু পূজা কে করিবে?

—কেন—পূজো যে করে?

—কে বাম্‌হন্?—মহিন্দর ম্লানভাবে হাসল: ইবারে হামাক তুমি হাসাইলেন হে মাস্টার। বাম্‌হন্‌কে চিন নাই। উয়ারা মুচির পূজা করিবা আসিবে—এমন মানুস নহ। কহিবা গেলে গালি দি তাড়াই দিবে।

—তবে তোমরা পূজো করো কী করে?—বংশীর মুখে বেদনার ছায়া পড়ল: তোমাদের পূজো করে কে?

—হামরা উসবের মধ্যে নাই। তো কালীপূজা হয়—ভিন্ গাঁয়ের সরকার মশাইয়ের নামত্ সংকল্প করিবা নাগে। ওই হামাদের পূজা—বাস্। ফের যে পূজা করি সি তো মদ আব হল্লা হয়, বাম্‌হন্ আর কী কামে নাগিবে!

বংশী চুপ করে রইল। নিচের ঠোঁটটাকে চিবিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে, কী একটা কথা ভাবছে। মহিন্দর আবার বললে, তাই কহিছু, যেমন চলিছে ওই রকমটাই চলিবা দাও। নাহক ঝামেলা বাড়াই কি ফায়দা হেবে?

বংশী মুখ তুলে বললে, না, পূজো হবেই।

—কে করিবে?

—তোমরাই।

—হামরা!—মহিন্দর হাঁ করে রইল। অনেক লেখাপড়া শিখলে এই রকম হয় নাকি মানুষের! মাথার ঠিক থাকে না? বংশী মাস্টার প্রলাপ বকছে নাকি?

—কী কহিছ তুমি?

—যা বলছি, ঠিকই বলছি।

কিছু বুঝতে পারছে না মহিন্দর। অবাক বিস্ময়ে একবার মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিলে। যেন নিজের মস্তিষ্কের ভেতরের ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা আর বিভ্রান্তিকে নিতে চাইল পরিচ্ছন্ন করে। বললে, তুমি যে কী কহিছ, হামি কিছু বুঝিবা পাইনু না।

—এতে না বোঝবার কী আছে?—মিষ্টি করে বংশী হাসল: তোমরাই পূজো করবে।

—হামরা? হামরা কেমন করি করিমু? হামরা কি বাম্‌হন, না হামাদের মন্তর-তন্তর আছে?

—কিচ্ছু লাগবে না, পূজো করলেই হবে।

আর সন্দেহ নেই যে মাস্টারের মাথা খারাপ। মহিন্দর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, উসব মতলব ছাড়ি দাও মাস্টার। দেবতাকে লিয়ে উসব চালাকি করিলে মুস্কিল হেবে।

—বোসো বোসো, অত চটে যেয়ো না।—বংশী বললে, আমি তো অনেক লেখাপড়া শিখেছি। কোন দোষ হবে না।

—দোষ হেবে না? তুমাক্ কে কহিলে?

—বইতে লেখা আছে—ছাপার বইতে।

হাঁ!—এবার আর কথাটাকে মহিন্দর অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিতে পারল না। এইখানেই দুর্বলতা আছে তার—বন্ধন আছে। ছাপার বইয়ের মতো বিশ্বাস্ত এবং নির্ভরযোগ্য আর কিছুই নেই তার কাছে।

—হাঁ? চোখ বড় বড় করে মহিন্দর বললে, বইয়ত্ নিখিচে?

—হ্যাঁ—লিখেছে।

—তো তোমার যিটা খুশি হয়, সেটাই করেন। হামি আর কী কহিব।—মহিন্দর জবাব দিলে আস্তে আস্তে। মাস্টার যে যুক্তি দিয়েছে, তার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই তার—অথচ সেটা মেনে নেওয়াও শক্ত। তাই অর্ধসংকুচিতভাবে মহিন্দর বলে গেল, হামরা তো নিখি নাই। হামাদের ফের পুছি কী হেবে?

বংশী বুঝল হার মেনেছে মহিন্দর, কিন্তু তার মন মানেনি এখনও। তা নাই মানুক, তার জন্যে আর উৎসাহ নষ্ট করা চলে না। বংশী বললে, বেশ তাই হবে। কিন্তু পূজো করতে হলে খরচ-খরচা আছে, কিছু চাঁদা তো চাই।

—চাঁদা? আচ্ছা, দিমু চাঁদা।

—শুধু তাই নয়। গাঁয়ের সকলের কাছ থেকেও কিছু কিছু আদায় করে দিতে হবে।

—হুঁ—সিটাও পারা যিবে। কিন্তু তুমি হামাক ভাবনাত্ ফেলিলেন মাস্টার।

—কিছু ভাবতে হবে না, ঠিক হয়ে যাবে সমস্ত।

বেলা পড়ে এল, গ্রামের বাঁশবনের ওপারে অস্তে নামল সূর্য। দেখতে দেখতে ঘনালো শীতের ঠাণ্ডা সন্ধ্যা। মাস্টারের সব্জি বাগান থেকে মূলোর ফুলের একটা বুনো গন্ধ সঞ্চারিত হতে লাগল বাতাসে। মহিন্দরের শীত করতে লাগল, বংশী মাস্টার আরো ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলে কাপড়ের খুঁটখানা। কথা শেষ হয়ে গেছে—ঠিক নতুন করে কোন্-খানে আরম্ভ করা যাবে সেটা এখনও কিছু স্থির করতে পারছে না কেউ। আর সেই কয়েক মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে মহিন্দরের সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত মন আবার ফিরে গেল সেই ফসলহীন ন্যাড়া মাঠটার রৌদ্র-ঝলসিত পটভূমিকায়। মনে পড়ল, দারোগা সাহেবের সেই অশ্বারোহী মূর্তি। চাপ-দাড়ির ভেতরে বাতাস চিরে চিরে খেলা করে যাচ্ছে—একটা মিশ্রিত বিচিত্র গন্ধ—ঘোড়ার ঘামের আর ধুলোর।

ইতস্তত করে মহিন্দর বললে, আচ্ছা মাস্টার!

—কী বলছিলে?—অনাসক্ত কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল বংশী।

মহিন্দর আবার ইতস্তত করল। একবার ভেবে নিতে চেষ্টা করল প্রশ্নটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে নেওয়াটা সঙ্গত হবে কিনা। কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে দারোগা সাহেবের সন্ধান নেওয়ার পেছনে শুধুমাত্র নির্দোষ কৌতূহলই প্রচ্ছন্ন নেই।

—কহিতেছিনু—গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিয়ে মহিন্দর বললে, কহিতেছিনু, ই গাঁয়ের মানুষগুলাক কেমন দেখিছ ?

বংশী হাসল : হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

—না, এমনি শুধাইনু। এইঠে—এই চাষার গাঁয়ে তুমার ভালো নাগে ?

বংশী তেমনি হাসিমুখে জবাব দিলে, ভালো লাগে বলেই তো এখানে আছি।

—হুঁ, তুমার ঠাঁই পড়ি ছোক্রাগুলান মানুষ হবা পারে নাগিছে। চাষার ছোয়া—নাম সহি করিবা পারিলেই কাম হই যিবে।

—শুধু নামসই করবে কেন ? অনেক লেখাপড়া শিখবে, শহরে পড়তে যাবে।

—হায় হায়—কপালে হাত চাপড়ালে মহিন্দর : অমন বরাতখানা করি কি আর আসিছে। বলদ তাড়াবা আর জুতা সিলাবা পারিলেই প্যাটের ভাত করি লিবে। উসব ছাড়ি দাও।

প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা থাকলেও বংশী করল না। মহিন্দরের কথায় বাধা দিয়ে কোনো লাভ হয় না, বরং তাকে আরো বেশি উত্তেজিত করে তোলা হয়—এ অভিজ্ঞতা তার আগেই হয়েছে। বংশী চুপ করে রইল।

উসখুস করতে লাগল মহিন্দর, তারপর বলে ফেলল, আচ্ছা মাস্টার, দারোগা সাহেবকে তুমি দেখিছেন ?

বংশী চকিত হয়ে উঠল : কোন্ দারোগা সাহেব ?

—হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগা ?

—না, কেন ?

—এমনি কহিতেছিনু—মহিন্দর হঠাৎ উঠে পড়ল : তবে এখন হামি চলি। তোমার হুঁকার জল পাঠাই দিমু।

মাস্টারকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত চলে গেল মহিন্দর। সজি বাগানের পাশ দিয়ে নেমে গেল গাঁয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন কাঁচা রাস্তাটায়।

সে দিকে তাকিয়ে একবার ভ্রূকুঞ্চিত করলে বংশী। শেষ প্রশ্নটার ভেতরে সন্দেহের অবকাশ আছে। অত্যন্ত অকারণে এবং নিতান্ত অসংলগ্ন ভাবে ও কথাটা চট করে জিজ্ঞাসা করবার অর্থ কী হতে পারে ? এবং পৃথিবীতে এত লোক থাকতে হাবিবগঞ্জ থানার বড় দারোগার সঙ্গে তার পরিচয় আছে কিনা এই কথাটা বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য কী ?

বংশী বুঝতে পারল এক ফালি মেঘ দেখা দিয়েছে আকাশের প্রান্তে। কালো মেঘ—সে মেঘে অনাগত দুর্যোগের সংকেত। হয়তো এখানেও থাকা চলবে না, যেখান থেকে যে স্রোতে সে এসেছিল, সেই স্রোতের টান আবার তাকে ডাক দিয়েছে। অন্তত মহিন্দর কথার মধ্যে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল।

অন্ধকার দাওয়ায় চুপ করে বসে থাকতে থাকতে বংশী মাস্টারের পিছনের জীবনটা চোখের সামনে দেখা দিলে কতগুলো ছেঁড়া ছেঁড়া ছবির টুকরোর মতো। কী হতে চেয়েছিল, কী হল শেষ পর্যন্ত। নিষ্ঠুর কঠিন ঘা লেগে বিপর্যস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল সমস্ত—একটা ভঙ্গুর ধাতুপাত্রের মতো চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে গেল এদিকে ওদিকে। আজকের বংশী মাস্টার তাই একটা সম্পূর্ণ জিনিস নয়—নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই তার। নিজের বিচূর্ণ সত্তার একটা খণ্ড মাত্র—নিজেরই একটা ভগ্নাংশ।

শুধু কি একাই বংশী মাস্টার? অথবা তার মতো আরো অনেকে—আরো অসংখ্য গণনাতীত মানুষ—যারা মধ্যবিত্তের সন্তান। তাদের চাইতে ঢের ভালো এই মুচিরা, যাদের আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কোনো মোহের অস্তিত্বমাত্রও নেই নিজেদের সম্পর্কে। কোনো মতে নামসই করতে পারলেই শিক্ষার এতবড় বিপুল বিস্তীর্ণ জগতের ওপর থেকে সরে যায় তাদের দাবি। ক্ষেতে হাল দিতে পারলে কিংবা চামড়ায় শক্ত করে সেলাই দিতে জানলেই তারা পরিতৃপ্ত—তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত।

কিন্তু—

কিন্তু আশ্চর্য জটিল মধ্যবিত্তের জীবন, তার পরিকল্পনা। সঞ্চয় অল্প, কিন্তু শেষ নেই আকাঙ্ক্ষার, সীমা নেই দুরাশার ব্যাপ্তির। তাই মন যত ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে ততই টান পড়ে পেছনের লোহার শেকলে। অসহায় আক্রোশে নিজেদের ক্রমাগত আঘাত করে যায়, তারপরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—চরম পরাজয়ের গ্লানিকে মেনে নেয় অবসন্ন একটা জানোয়ারের মতো।

শীতটা বড় বেশি করে ধরেছে, মাঠের পার থেকে আসছে কনকনে উত্তুরে বাতাস। আর দাওয়ায় বসে থাকা চলে না। একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল বংশী মাস্টার, ঘরে এসে ঢুকল, জ্বালালো লণ্ঠনটা।

ময়লা লণ্ঠন, চিম্‌নিতে ধোঁয়ার লাল আস্তর। তবু তারি আলোতে স্তব্ধ শীতল অন্ধকারটা বিদীর্ণ হয়ে গেল। ঠাণ্ডায় ভিজে ভিজে দেওয়াল থেকে মাটির গন্ধ উঠছে, মেজে থেকে উঠছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সবটা ভালো করে আলো হয়নি, টুকিটাকি জিনিসপত্রের আড়াল আবডালে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি গুঁড়ি মেরে আছে। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল বংশী মাস্টার—যেন নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে চাইল কাদের অতি সতর্ক নিঃশব্দ সঞ্চার। তারপর আলোটা আরো একটু তেজ করে দিয়ে উঠে বসল ঠাণ্ডা শক্ত বিছানাটার ওপরে।

বসবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা মচ মচ করে উঠল—আর একবার চমকে উঠল বংশী।

নিজের ছেলেমানুষি ভয়ে নিজেরই হাসি পেল। তবু সাবধান হওয়া ভালো। বংশী একবার মাথা ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে দেখল বিছানাটার নিচে অনুজ্জ্বল ছায়ার ভেতরে। বিছানাটা খাটের নয়, বাঁশের মাচার। খাটের রেওয়াজ এদেশে বড় নেই—মাচাতেই শোয়ার ব্যবস্থা। পাতলা কম্বলের নিচে বাঁশগুলো প্রথম প্রথম পিঠে লাগত, লাল হয়ে দাগ ধরে যেত সকালে, হাত লাগলে চিনচিন করত। এখন আর ওসব হয় না—অভ্যস্ত হয়ে গেছে সমস্ত।

মাচার সবটাই বিছানা নয়, তার একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে গোটা দুই টিনের তোবড়ানো স্যুটকেস্। একটা স্যুটকেস্ ছোট—আর একটা বেশ প্রমাণসই চেহারার। এরাই মাস্টারের সম্পত্তি। ছোট স্যুটকেস্টা এককালে সৌখীন ছিল, ওপরে গোটা কয়েক গোলাপফুল আঁকা ছিল তার। ছেলেমানুষি খেয়ালে ওই গোলাপফুলগুলোর ওপরে ভারী একটা মোহ ছিল মাস্টারের। কিন্তু সেগুলিকে রাখা যায়নি, রঙ চটে গিয়ে বসন্তের দাগের মতো কতগুলো রঙের ছিটে ছড়িয়ে আছে শুধু।

ময়লা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসতে মাস্টারের নতুন করে যেন চোখ পড়ল ওই বাক্সটার ওপরে, হাসি এল। শুধু ওই বাক্সটার ওপরে আঁকা গোলাপ ফুলগুলোই নয়, সমস্ত জীবনেই আজ ক্ষতচিহ্নের মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে চটে যাওয়া রঙের ছিটে।

অনেক স্মৃতি আছে ওই বাক্সটার সঙ্গে। ওটা যে কিনেছিল তার নাম ছিল অতুল মজুমদার, তখন কাটিহারের একটা হিন্দুস্থানি হোটেলে একটা অন্ধকার খুপ্‌রিতে সে পড়ে থাকত, খেত পুরী আর অড়হরের ডাল। তারপর বাক্সটার অধিকারী হল নুরুদ্দিন তালুক-দার, গায়ে মস্ত শেরওয়ানি আর এক মুখ চাপদাড়ি নিয়ে সে আমিন গাঁ প্যাসেঞ্জারে চড়ে চলে গেল। তারও পরে আরো অনেকে ওটাকে ভোগ করেছে মালিকানা স্বত্বে, হরেন চৌধুরী, শিবনাথ সাহা, ইব্রাহিম দফাদার—সবগুলো নাম মনেও পড়ে না। এখন ওর মালিক বংশী পরামাণিক—কে জানে আরো কত হাত বদলাবে? কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ দারোগা সাহেবের কথাটা কেন বলল মহিন্দর? কেমন খটকা লাগছে। লক্ষণ ভালো নয়। কাল একবার ভালো করে খবরটা নিতে হবে।

তবু আজ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে এর যেন শেষ নেই। নিজের সম্পর্কে এই অতি প্রখর সতর্কতা, এই যাযাবরবৃত্তি। আর নয়—আর সহ্য হয় না; চিরদিন এই ক্লান্তি-কর চলার চাইতে কোথাও এসে ঢের ভালো থেমে দাঁড়ানো, হোক সে পাথরের প্রাচীরে ঢাকা একটা শ্বাসরোধী অবক্ষয়, তার সামনে থাক কঠিন লোহার গরাদে। তবু সে এক-রকমের বিশ্রান্তি, একটা নিশ্চিত প্রশান্তির প্রতিশ্রুতি। শিবনাথ সাহা একবার প্রায় নিরুপায় হয়ে নিজের বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, খুব কি ভুল

করেছিল সে ?

হঠাৎ বংশী মাস্টারের মনে পড়ল একটি মেয়ের কথা। পিঠভরা চুল ছিল, আর ভারী মিষ্টি দুটি ডাগর ডাগর চোখ। শ্যামবর্ণ ছোটখাটো একটি মেয়ে, হালকা পাতলা ঠোঁট দুটি দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না এত ক্ষুরধার তার রসনা। অতুল মজুমদারের সঙ্গে কলহের তার আর বিরাম ছিল না। দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। তর্ক সে করবেই, যুক্তি নাই থাকুক, ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে, না, না, তোমার কথা কিছুতেই আমি মানব না!

মানেওনি শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য, এমন একটা উল্লেখযোগ্য মানুষ অতুল মজুমদার, বেশ সম্মানিত একটি ছোটখাটো নেতা, এত কাজ, এত দায়িত্ব। তবু সে দায়িত্বের ভিড়ের ভেতরেও অতুল মজুমদার ভুলতে পারেনি যে একটি অতি দুর্বল অথচ অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তার—যাকে তর্কে না হোক, জীবন দিয়ে জয় না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

আজ পর্যন্ত সংকল্প সিদ্ধ হয়নি। আজ কোথায় অতুল মজুমদার—একবিন্দু জলের মতো যেন মুছে গেল মাটির বুক থেকে, ঝরে গেল ঘাসের শিসের একটুকরো শিশিরের মতো। যারা তাকে মনে রেখেছে তাদের আকর্ষণটা প্রেমের নয়। সেই ছোট মেয়েটি—নাম বোধ হয় ছিল শান্তি—তার তো ভুলে যাওয়া আরো বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু অতুল মজুমদার যদি কোথাও বেঁচে থাকে, তার ভোলা চলবে না। তাকে মনে রাখতে হবে—

সুতরাং বংশী পরামাণিক হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। সব যেন গল্পের মতো মনে হয়, মনে হয় উপন্যাসের ছেঁড়া পাণ্ডুলিপির পাতা এলোমেলো ভাবে পড়ে চলেছে সে। কী লাভ এতে, কতটুকু দাম এর ? শুধু এইটেই সত্য যে থামলে চলবে না, এখনো থামবার সময় হয়নি। পাথরের শক্ত প্রাচীর আর লোহার গরাদের অন্তরালে যে বিশ্রাম, তা অপমৃত্যু, তা আত্মহত্যা—সেদিনকার ছোট মেয়েটিকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির চূড়ান্ত অমর্যাদা !

কিন্তু আর বসে থাকা ঠিক নয়, রান্না করতে হবে। এবারের কাঠগুলো ভিজে, সহজে জ্বলতে চায় না। অনেকখানি উৎসাহ আর উদ্যম অপব্যয় করতে হয় তার পেছনে। সুতরাং এখন থেকেই অবহিত হওয়া দরকার।

মাচার বিছানা থেকে মাটিতে একবার পা ঠেকিয়েই বংশী মাস্টার আবার জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিশ্রী ঠাণ্ডা পড়েছে আজ—এই সন্ধ্যে বেলাতে যেন আড়ষ্ট আর অসাড় করে দিতে চাইছে শরীরটাকে। শুধু উনুন ধরানো নয়, জল ঘাঁটাঘাঁটির কল্পনাতেও মন বিদ্রোহ করে বসল। থাক, আজ আর ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই। কিছু মুড়ি চিঁড়ে সঞ্চিত আছে, সন্ধান করলে একখানা তালের পাটালিও মিলতে পারে, ওতে করেই আপাতত কুলিয়ে যাবে একরকম।

টিনের ছোট স্যুটকেস্‌টা খুলে একখানা বই বার করলে মাস্টার, তারপর লণ্ঠনটা কাছে

এগিয়ে এনে পড়তে শুরু করলে। সারা গায়ে মাটি লেগে আছে, পা একবার ধুয়ে নিলে ভালো হত। কিন্তু বড্ড শীত ধরেছে আর ভারী আরাম লাগছে মোটা চাদরটার উষ্ণমধুর স্নেহাশ্রয়। মাস্টার পড়ায় মনোনিবেশ করলে।

বাইরে অদ্ভুত প্রশান্ত হয়ে গেছে রাত্রি। ইস্কুলটা একটু নিরালায়—একটা ছোট ঘাসে ভরা মাঠ, তারপর একটুখানি বাগান, সেইটে ছাড়িয়ে গ্রাম শুরু। ওখানকার মানুষের কলকণ্ঠ এখানে এসে পৌঁছোয় না, তা ছাড়া এমনিতেই তো সন্ধ্যা হতে না হতে গ্রামের লোক কোনো রকমে দুমুঠো গিলে ছেঁড়া কাঁথা আর জীর্ণ পাতলা লেপের তলায় আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। পড়তে পড়তে মাস্টার বার কয়েক মাথা তুলল, কান পেতে যেন কিছু একটা শোনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু অনেক দূরে একসঙ্গে গোটাকয়েক শেয়াল আর্তনাদ করে উঠল, প্রত্যুত্তরে খেঁকিয়ে উঠল গ্রামের গোটা কয়েক কুকুর।

রাত বাড়তে লাগল, পড়ে চলল মাস্টার। সময় কাটতে লাগল। বাইরে অন্ধকারের ভেতরে ফিকে জ্যোৎস্না পড়েছে, শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। অল্প অল্প কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে ধোঁয়ার মতো। সেই ধোঁয়াটে ধূসরতার মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলি কালো ছায়া অতি দ্রুতগতিতে হাওয়ার ওপরে নাচতে নাচতে চলে গেল—একদল চামচিকে। সামনের সব্জি বাগানে দুধের মতো শাদা টাটকা কপির ফুলে চিকমিক করছে জ্যোৎস্নার গুঁড়ো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সঞ্চারিত হচ্ছে ভিজে ঘাস আর মূলোর ফুলের বুনো গন্ধ।

ঘরের বাইরে 'ঠক্-কোঁ-ঠক্-কোঁ' করে একটা টানা সুরেলা আওয়াজ উঠল। তক্ষক ডাকছে, এ ঘরের দাওয়াতেই কোথাও বাসা করে আছে। মাথার ওপরে ঘরের চালে কুর্ কুর্ কুট্ কুট্ করে একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন শব্দ—বইয়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল খানিকটা মিহি হলদে গুঁড়ো, আড়ার বাঁশ কাটছে ঘুণে। মাস্টারের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বই বন্ধ করে বংশী পরামাণিক একবার তাকালো আকাশের দিকে, দৃষ্টি মেলে দিল ম্লান জ্যোৎস্না আর লঘু কুয়াশায় বিবর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জের শূন্যতায়। আকাশের শোভা দেখবার জন্য নয়, রাত কত হয়েছে সেইটেই যেন অনুমান করতে চাইছে। তারপর মস্ত একটা হাই তুলে সমস্ত শরীরের আচ্ছন্নতা যেন কাটিয়ে নিলে একবার, আড়মোড়া ভেঙে সরিয়ে দিলে এতক্ষণের শীতার্ত জড়তার প্রভাব। আর দেরি করা চলে না, এই রাত্রেই তার অনেকগুলো কাজ সেরে নিতে হবে।

মাস্টার খাট থেকে নামল। ঘরের কোণা থেকে বার করে আনলে একটা ছোট মেটে হাঁড়ি, কানা-উঁচু একটা কাঁসার থালা। হাঁড়ির ভেতরে চিঁড়ে গুড় দুই ছিল, বসে বসে তাই কাঁচা অবস্থায় কড়মড় করে চিবিয়ে নিলে খানিকটা। এইতেই বেশ কেটে যাবে রাতটা। অতুল মজুমদারের কথা মনে পড়লে এখনও কষ্ট হয় তার। কী বিলাসী ছিল

লোকটা, খাওয়া-দাওয়ার কতরকম বাছ-বিচার ছিল তার। আশ্চর্য, সে লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

যে-কোনো রকম খাওয়া তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু বেশিক্ষণ চিঁড়ে চিবুতে কষ্ট হয়, আটকে আসে চোয়াল, পেটের মধ্য থেকে কেমন বিশ্রী একটা শীতলতা নাড়ি বেয়ে শিউরে শিউরে উঠে আসে, ঝাঁকুনি লাগে মাথার ভেতরে। চিঁড়ে খাওয়া বন্ধ করে মাস্টার ঢক ঢক করে ঘটিখানেক জল ঢেলে দিলে গলায়। কনকনে ঠাণ্ডা জল—দাঁতগুলো একসঙ্গে যেন ঝনঝন করে নড়ে উঠল তার। পেটের থেকে উদ্গত সেই শিহরণটা মাথার ভেতরে যেন আরও জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। বংশী মাস্টার উঠে পড়ল।

দেওয়ালের কোণে দড়িতে ঝোলানো ময়লা ছিটের কোটটা চড়িয়ে নিলে গায়ে, পরলে ছাত্রদের উপহৃত শক্ত বেঢপ জুতোজোড়া। আর একবার সন্দিগ্ধ শঙ্কিত চোখে তাকালো বাইরের বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায়-ভরা ঘাসের মাঠটার দিকে, আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ আর বিবর্ণ নক্ষত্রের সভার দিকে। তারপর মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে লণ্ঠনটা যতদূর সম্ভব ক্ষীণ করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

টেনে দিলে দরজার শিকল, পরিয়ে দিলে ছোট একটা পেতলের তালা। না, কোথাও কেউ নেই—নিঃসাড় শান্তিতে তেমনি করেই ঘুমুচ্ছে পৃথিবী। চাঁদের ঘোলাটে চোখে ধোঁয়ার মতো উড়ন্ত কুয়াশা—দুধের মতো শাদা নতুন ফুলকপিতে জ্যোৎস্নার গুঁড়ো। মূলো শাকের পাতা কাঁপছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে ফলন্ত বিলিতি বেগুনের ঝাড়। গ্রামে কুকুর কেঁদে উঠল—অস্বাভাবিক অস্বস্তিকর স্বরে। তারপরেই কেঁউ করে একটা কাতর আর্তনাদ—কেউ বিরক্ত হয়ে একটা ঢিল ছুঁড়েছে অথবা বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা লাঠি।

দাওয়ার ওপর কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে কী ভাবল মাস্টার, একবার কামড়ে নিলে একটা কড়ে আঙুলের নখ, তারপর সতর্ক পায়ে নিচের মাঠে নেমে গেল। তারও পরে জ্যোৎস্নায় তার দীর্ঘ দেহ আর দীর্ঘাকার কালো ছায়াটা ক্রমশ একাকার হয়ে হারিয়ে গেল ধূসর শুভ্রতার মধ্যে।

তিন

বড় ভাই সুরেন বাড়িতে নেই, মেজ ভাই হারাণও না। সুরেন গেছে শ্বশুরবাড়ি, তার শাশুড়ীর যায়-যায় অবস্থা, খবর দিয়ে গেছে পথ-চলতি লোক। সুরেনের যাওয়ার অবশ্য খুব বেশি ইচ্ছে ছিল না, রোগা খিটখিটে হাড়কিপ্পন শাশুড়ী সম্পর্কে কোনরকম মোহও নেই তার। খবরটা যখন আসে তখন সে মন দিয়ে বড একটা ঢাকে ছাউনি দিচ্ছিল। শুনে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, মরিবে তো মরুক। বুড়ী হই একটা শকুনের মতো বাঁচি থাকিলে

কিবা লাভ হেবে সিটা কহ।

পথ-চলতি মানুষটি বলেছিল, তভো তো শাশুড়ী, তুমার একবার যাওয়া নাগে দাদা।

—হামি যাবা নি পারিমু—আঙুল দিয়ে ঢাকের কোণাগুলো ঠুকে ঠুকে স্থরেন বলেছিল, হামরা কামের মান্ষ না? বুঢ়ী মরিলেই মঙ্গল। বাপ, যখের মত টাকা আগলাছে বসি বসি। শ্বশুরর ঠাঁই একটা ভালো পিরহান চাহিনু তো ফের হামাক খ্যাঁক খ্যাঁক করি শিয়ালের মতো কামডাবা চাহেলে। হামিও কহিনু, তুই তোর পাইসা লিয়ে ধুই ধুই খা—হামি যদি কেষ্ট মুচির ব্যাটা হই তো তোর বাড়িত্ ফের না আসিম্।

—যিটা হইছে—ওইটাক যাবা দাও কেনে।

—ক্যামন করি যাবা দিমু হে? বুঢ়ীর যেমন শিয়ালের মতো মুখ, উয়াক অম্নি করি শিয়ালে খিবে, ইটা তোমাকে সাফা বাত্ কহি দিনু—বুঝিলা?

স্থরেন মানুষটা ওই রকম। এমনি মনটা খুব খারাপ নয় তার, কিন্তু একবার চটে গেলে আর তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। একটা জামা চেয়ে না পাওয়াতে শাশুড়ীর ওপরে সেই যে বিরূপ হয়ে আছে, এ পর্যন্ত সে বিরূপতা তার কাটেনি। স্থতরাং লোকটি তাকে যতই সদুপদেশ দিক, সে ভ্রূক্ষেপ করল না, নিবিষ্ট চিত্তে ঢাকে ছাউনি দিয়ে চলল।

প্রতিজ্ঞায় শেষ পর্যন্ত হয়তো বা অটল থেকে যেত স্থরেন, কিন্তু বিঘ্ন ঘটে গেল। খবর পেয়ে স্থরেনের স্ত্রী হাউ মাউ করে কান্না শুরু করলে। এমন প্রচণ্ড চিৎকার ধরে দিলে যে, বহুক্ষণ দু হাত দিয়ে কান চেপে রইল স্থরেন। তারপর বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল, থাম বাপ, আর চিল্লাছিস্ ক্যানে। হামার খুব আক্কেল হইছে—চল্ চল্, কুন্ঠে মরিবা যাবু সেইঠেই চল্।

অতএব স্থরেনকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়েছে। আজ রাত্রেই যদি শাশুড়ী মরে, তা হলে কালই তাকে পুড়িয়ে কিছু মদ আর মাংস খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসবে, আর যদি মরতে দেরি করে তবে ফিরতেও দু-চারদিন দেরি হতে পারে। অবশ্য স্থরেন আশা করে যে, গিয়ে দেখবে, যাওয়ার আগেই বুড়ীর হয়ে গেছে। হারাণও বাড়ি নেই। কোথায় বিয়েবাড়িতে একটা ঢোলের বায়না নিয়ে গেছে, সেখানে বাজিয়ে ফিরতে পরশুর আগে নয়। তা ছাড়া আর একটা জিনিসও অনিশ্চিত হারাণের সম্পর্কে। মদটা একটু বেশি-মাত্রায় খায়—এবং খেয়ে বরদাস্ত করতে পারে না। স্থরেনও মদ খায় বটে, কিন্তু ওজন করে, কখনো মাতাল হয় না। হারাণের ঠিক উলটো। মাত্রা ঠিক রাখতে পারে না, দু-চারদিন নেশায় বেহুঁস হয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারে। সংসারের দায়িত্বটা একান্তই স্থরেনের—হারাণকে বাড়ির সকলে একরকম খরচ লিখে রেখেছে। বিয়ে একটা করেছিল, কিন্তু এমন প্রচণ্ড উৎসাহে বৌকে ঠ্যাঙাত যে, রাতারাতি বৌ বাপের বাড়িতে পালিয়ে বেঁচেছে। আনতে গেলে নথ নাড়া দিয়ে বলেছিল, বাপ, ডাকাইতের ঘরে হামি

ফের নি যামু। হামাক মারি ফেলিবে।

সেই থেকে আরো উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে হারাণ। চরিত্রটাও ভালো নয়। হাড়ীপাড়া থেকে দুদিন মার খেয়ে এসেছে, তবু লজ্জা হয়নি। এখনো এপাড়া ওপাড়ায় ঘুর ঘুর করে। সুরেন চটে গিয়ে সাংসারিক সম্পর্কটা ভুলে গাল দিয়ে বলেছে, উ শালাক একদিন কাটি গাঙে ভাসাই দিমু, তবে হামি কেষ্ট মুচির ব্যাটা।

কিন্তু হারাণের সংশোধন হয়নি।

আর বাকি আছে যোগেন।

বাড়ির ছোট ছেলে—সেই জন্যই দাদাদের চাইতে একটু ব্যতিক্রম। লেখাপড়ার দিকে একটু ঝোঁক ছিল তার, তাই উচ্চ প্রাইমারীতে বার দুই ফেল করলেও এ গ্রামে সেই সবচাইতে শিক্ষিত ব্যক্তি। চেহারা আর চালচলন দেখলে তাকে কেষ্ট মুচির ছেলে বলে মনে হয় না। হাটের বারে চার পয়সা দামের রঙীন সাবান কিনে আনে, অনেকক্ষণ ধরে সেইটে গায়ে ঘষে ঘষে নিজের বর্ণ-গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করে। অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাতে করে বেশ মাজা রং হয়েছে যোগেনের। মাথায় টেরি কাটতে শিখেছে, জামা-কাপড় একটু ময়লা হলে সেগুলোকে ক্ষার দিয়ে কেচে না নেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। মদ একটু-আধটু হয়ত খায়, কিন্তু ঝোঁকটা সস্তা সিগারেটের দিকে। অবশ্য সেটাও যে খুব ভালো লাগে সুরেনের তা নয়। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, বড় ভুল হই গিছে হে। লাট সাহেবের ব্যাটা হই তুমি চামারের ঘরে আসিলা ক্যানে?

মৃদু হেসে যোগেন টেরির দিকে মনোনিবেশ করে।

তবু গজর গজর থামে না সুরেনের। চামড়া কাটতে কাটতে বিতৃষ্ণা-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, সকলে যদি গায়ে ফুঁ দিই বেড়ায়, তো হামি চালামু কেমন করি? যার যিটা লিয়ে সে ভাগ হই যাও, হামাক মাপ কর কেনে।

কিন্তু মুখে যা বলে মনে মনে তা ভাবে না সুরেন। তাই হারাণ নিশ্চিন্তে বেড়ায় স্বেচ্ছাভোজন করে, তাই টেরি বাগানোতে কখনও বিঘ্ন ঘটে না যোগেনের। জমি-জমা, মামলা-মোকদ্দমা সব কিছু সুরেনই দেখা-শোনা করে, বাকি দু ভাই তাই যেন পাহাড়ের আড়ালে বাস করছে।

যোগেনের শুধু বাইরের পরিচ্ছন্নতাটাই একমাত্র লক্ষণীয় বিশেষত্ব নয়, শুধু যে সে গ্রামের সবচাইতে বিদ্বান ব্যক্তি তাও নয়, আরো অনেকগুলো গুণ আছে তার। যেমন স্বাস্থ্য-ঝলমল সুন্দর চেহারা, তেমনি তার গানের গলা। মাঝখানে কিছুদিন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গিয়েছিল, যোগ দিয়েছিল ওখানকার ছোট একটা যাত্রার দলে। গান গেয়ে নাম করেছিল, এক জায়গায় চাঁদির মেডেলও পেয়েছিল একখানা কিন্তু কেন কে জানে ওখানকার আবহাওয়াটা তার ভালো লাগেনি—মনের সঙ্গে সুর মেলেনি যাত্রার দলের

জীবনযাত্রার। দর্শক হিসেবে যে জগৎটাকে স্বপ্নপুরী বলে তার ভ্রম হয়েছিল, সান্নিধ্যে যেতেই সে সম্পর্কে তার মোহভঙ্গ ঘটল। একটা রগচটা অধিকারী, কথায় কথায় হুঁকো নিয়ে মারতে আসে। গাঁজাখোর ভীমের সঙ্গে মাতাল শ্রীকৃষ্ণের চুলোচুলি লেগেই আছে। রোজ রাত্রে আসরের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে অধিকারীর সঙ্গে কুশ্রী কলহ, কদর্য খাওয়ার ব্যবস্থা। অবশ্য যোগেন চাষী চামারের ছেলে, বাড়িতে যে নশো পঞ্চাশ রকমের খায় তাও নয়, কিন্তু সে খাওয়ায় তৃপ্তি আছে, পেটভরা ভাতের ব্যবস্থা আছে। রাতের পর রাত জেগে গোরুর জিভের মতো মোটা রাঙা চালের আধপেটা ভাত, জলের মতো বিউলির খেঁসারীর ডাল আর শুকনো ডাঁটার সঙ্গে পুঁইপাতা এবং কুমড়োর চচ্চড়ি, এটা বরদাস্ত করা শক্ত। একদিন আসরে যখন 'সাবিত্রী সত্যবান্' নাটক খুব জমে এসেছে, তখন সত্যবান্‌বেশী যোগেন অধিকারীকে অথই দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে—ফিরে এসেছে গ্রামে।

কিন্তু যাত্রার দলের মোহ কাটলেও যাত্রার নেশা কাটেনি। জমজমাট আসর, ঝাড়-লণ্ঠনের আলো আর ঘন ঘন হাততালি মাদক স্বপ্নের মতো ঘন হয়ে আছে তার রক্তের মধ্যে। আরো অনেকটা দূরে সরে এসে আজ সেই আলোকোদ্ভাসিত আসরটা একটা মায়াময় রূপ পরিগ্রহ করেছে কল্পনার নেপথ্যলোকে। যোগেন ভাবছে, এবার নিজেই একটা যাত্রার দল খুলবে—এমন দল গড়বে যে, অন্যান্য দলগুলোর এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত গর্ব-গৌরবকে ম্লান করে দেবে একেবারে। কিছুদিন থেকে সে চেষ্টাই সে করে আসছে।

কিন্তু মুশকিল এই, ভালো পালা পাওয়া যায় কোথায়? যে সব পুরনো পালা এতদিন ধরে চলে আসছে, সেগুলোকে নিয়ে বাহাদুরী দেখানো শক্ত। আশপাশের নানা দল এক একটা বই নিয়ে এমন খ্যাতি জমিয়ে বসেছে যে, সেখানে দাঁত বসানো সম্ভব নয়। হারাধন অপেরা পার্টির মতো 'রাম বনবাস' কেউ করতে পারে না, শশী অধিকারীর দলের মতো 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' করা সম্ভব নয় কারুর পক্ষে, দাস কোম্পানির মতো 'পাণ্ডব-বিজয়' আর 'মহিষমর্দিনী' কেউ জমাতে পারবে না। মোটামুটি সব ভালো পালাগুলো সম্পর্কেই এই এক অবস্থা—ওদের কোনো একটা নিয়ে আসরে নামলেই হাজার ভালো হলেও মুখ বাঁকাবে লোকে, বলবে, দূর দূর, রাম অধিকারীর দল না হলে এ পালা কি কেউ করতে পারে?

কাজেই মুশকিলের কথা। দলকে নাম কিনতে হলে ভালো বই চাই, চাই নতুন বই। খুব ভালো না হোক মাঝামাঝি হলেও চলবে, কিন্তু যেমন করে হোক, নতুন বইয়ের দরকার। সে বই কোথায় পাওয়া যায়?

সাত-পাঁচ ভেবে দিশেহারা যোগেন ঠিক করলে, একটা আল্‌কাপের দল দিয়েই আরম্ভ করা যাক। আল্‌কাপের পালা বাঁধা শক্ত নয়, খানিকটা রসিকতা আর প্রচুর গান

থাকলেই দলের নাম হয়ে যাবে। আশেপাশে দল নেই বললেই চলে, অথচ চাহিদা আছে প্রচুর। কাজেই এদিক থেকে প্রায় একচ্ছত্র হতে পারবে যোগেন। তা ছাড়া আরো একটা দিকও আছে। গোড়াতেই যাত্রার দল গড়ে বসতে গেলে বিস্তর খরচপত্তর, বাদ্যি-বাজনা কিনতে হবে, পোশাক কিনতে হবে, কিনতে হবে টিনের খাঁড়া তলোয়ার। তার মানে বেশ কয়েকশো টাকার ধাক্কা। গোড়াতেই সে ধাক্কা সামলানো দস্তুরমত শক্ত। তার চাইতে আল্‌কাপের দল গড়ে যদি কিছু টাকা পয়সা কামিয়ে নেওয়া যায় তবে তাই দিয়ে পরে বেশ ভালো রকম একটা যাত্রার দল তৈরি করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

সুতরাং অনেক বিচার বিবেচনা করে যোগেন ঝোঁক দিয়েছে আল্‌কাপের দলের দিকেই। প্রথমটা সুরেন চটে উঠেছিল : নাচি কুঁদি বেড়াইলেই খালি চলিবে, ঘর বাড়িটা দেখিবা হয় না?

সংক্ষেপে জবাব দিয়েছে যোগেন : তুমি দেখিবে।

—হামি দেখিমু!—ক্ষেপে গিয়ে সুরেন বলেছে : ত তোরা সব আছেন কোন্ কামে?

অনাবশ্যক বোধে দাদার কথার জবাব দেয়নি যোগেন।

—হামি পারিমু না—ই কথাটা সাফ সাফ কহি দিনু।

কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সাফ সাফ জবাব দিয়ে এ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারেনি সুরেন। আজও পারল না। যোগেনের গান শুনে প্রথম প্রথম বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তার মুখ, তারপর আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেছে সে মুখ থেকে, দেখা দিয়েছে প্রসন্নতার দীপ্তি। আগে কানে হাত দিত, এখন যোগেনের গানের সুর ভেসে এলেই কান খাড়া করে সুরেন। সত্যি ভালো গায় যোগেন, নিজের ভাই বলে নয়, এমন মিষ্টি গলা সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। আজকাল ভাইয়ের জন্য গর্ব বোধ হয় সুরেনের। আগে যাদের কাছে, অনেক নিখিয়াও হামার ভাইটা মানুষ নি হৈল্, বলে আক্ষেপ করত, এখন তাদের কাছে গিয়ে সগৌরবে ঘোষণা করে : বড় মিঠা গলা হামাদের যোগেনের। হামাদের ভাই তিনটার মধ্যে ওই একটাই বা মানুষ হৈল্।

তাই বাড়িতে এখন অবাধ প্রশ্রয় যোগেনের।

শুধু ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতে কুটতে মাঝে মাঝে বকাবকি করে যোগেনের মা।

—হাঁরে, তুই এমন করিই সারাটা জীবন কাটাবু নাকি?

—সিটাই তো ভাবিছু—দুষ্টামিভরা হাসিতে উত্তর দেয় যোগেন।

—উসব ক্ষ্যাপামি রাখি দে কেনে। সুরেনকে তো কহি চ্যাংড়াটার বিহা দে—এত বড়টা হৈল্, পাখির মতন উড়ি উড়ি এইঠে ওইঠে বেড়াছে। বিহা দিলে ঘরত্ মন নাগিবে, সংসারের দুইটা চাইরটা কামও তো করিবে।

—হামি বিহা নি করুম।

—বিহা নি করিবু তো কি করিবু ?

—গান করিমু। আল্‌কাপের দল করিমু—গাহি বেড়ামু। বিহা করিলেই তো ঘরত্‌ বসি বৌয়ের খোঁটা শুনিবা নাগিবে।

—ত যেইঠে খুশি যা—বিরক্ত হয়ে মা জবাব দেয়। মনে মনে খুশিও হয়। ছেলেদের বিয়ে দিয়ে খুব সুখী হয়নি যোগেনের মা। বৌয়েরা ঘরে এসেই নিজেদের নির্দিষ্ট অধিকারকে চিনে নিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করতে শিখে নিয়েছে তাদের দাবি। বিশেষ করে বড় বৌ যেমন মুখরা, তেমনি প্রচণ্ডা। তার ক্ষুরধার রসনার সামনে দাঁড়াতে ভয় করে। নাক নাড়া দিয়ে বলে, হামি ক্যাঁহোকে ডর খাই না। কাহারো খাছি, না পরোছি ?

যোগেনের মা কোণঠেসা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঝগড়া করতে চেষ্টা করে না তা নয়, কিন্তু এটা বেশ বোঝে যে, একটা দুর্বল ভিত্তির ওপরে সে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো মুহূর্তে তা পায়ের নিচে থেকে ধ্বসে পড়তে পারে। এখন বৌদের যুগ। তাদের মেনে চললেই মান থাকবে, নইলে নয়। ছেলেরা মুখে যতই মাতৃভক্ত হোক, মনে মনে সব বৌয়ের আঁচলের তলায় চাপা পড়ে আছে, নালিশ করলে বৌকে দুটো-চারটে ধমক হয়তো দেবে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে, কিন্তু মনে মনে একবিন্দুও খুশি হবে না। এবং পালটা মাকেও হয়তো উপদেশ দিয়ে বলবে, তুমরাই ক্যের অ্যাতে গজর গজর করোছ ক্যানে ? একটু চুপ মারি থাকিলে তো হয়!

তাই যতদিন যোগেন একান্ত করে নিজের আছে, ততদিনই ভালো। বয়স বাড়ছে, বিয়েও করবে, কিন্তু যোগেনের মা আশা করে ততদিন পর্যন্ত সে বাঁচবে না। সে মরে গেলে বউয়েরা এসে যত খুশি ঝগড়া করুক, কূটকচাল করুক, সংসার ভাগাভাগি করুক, তাতে তার এতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, একটা কথাও সে কইতে আসবে না।

আজ সন্ধ্যায় বাড়িটা ফাঁকা। সুরেন গেছে বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে, হারাণ কোথায় গেছে ঢাকের বায়না নিয়ে। যোগেন রক্ষা করতে গেছে নিমন্ত্রণ। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে, তুলসীমঞ্চটায় প্রদীপ দিয়ে যোগেনের মা যখন দাওয়ায় উঠে এল তখন ঠাণ্ডাতে হাত-পা কালিয়ে উঠেছে তার। আজ বড় বেশি শীত পড়েছে—মাঘের বাতাসে দাঁত বেরিয়েছে যেন। তাছাড়া বয়েস হয়েছে যোগেনের মার। আগের মতো জোর নেই শরীরে, রক্তে নেই আর যৌবনের সে উত্তপ্ত চঞ্চলতা। এখন একটু খাটলেই কেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়, কেমন বিশ্রী রকমের শীত ধরে।

একটি মাটির মালসায় আগুন নিয়ে এসে বসল যোগেনের মা। কাঠকয়লার বেশ গনগনে আগুন উঠেছে, আড়ষ্ট আঙুলগুলো তাতে সেঁকে নিতে লাগল। সত্যিই বয়েস হয়েছে এখন, দুর্বল আর অশক্ত হয়ে পড়েছে শরীর। সংসারের জন্যে আর খাটতে ইচ্ছে

করে না, ভালোও লাগে না। সমস্ত শরীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেবার জন্যে—নিশ্চিন্ত একটা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায়।

ভালোই হয় যোগেনের বউ এলে। হয়তো বড় বউয়ের মতো মুখরা হবে না, কথায় কথায় নাক নেড়ে ঝগড়া বাধাবে না তার সঙ্গে। অথবা হারাণের বউয়ের মতো সামান্য ছুতো করে পালিয়ে যাবে না বাপের বাড়িতে। গাঁয়ের একটি মেয়ের ওপরে নজরও আছে তার—কিন্তু হতভাগা ছেলেটার যেরকম ক্ষ্যাপাটে মেজাজ, যদি ঘাড় বাঁকিয়ে বসে তাহলে সহজে তাকে আর বশে আনা যাবে না।

ছেলের কথাটা মনে পড়তেই স্নেহের একটা মধুরতায় যেন প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত অনুভূতিটা। চমৎকার গানের গলা হয়েছে যোগেনের। এত মিষ্টি—এমন দরাজ! ওর বাপের গলার আওয়াজে কাক চিল উড়ে যেত, ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত কুকুর, কিন্তু এমন অপূর্ব মাতাল-করা গলা কোথায় পেল যোগেন?

হঠাৎ চমকে উঠল যোগেনের মা। ঠাণ্ডা হিম হয়ে-আসা রক্তের ভেতরে কী একটা শিউরে শিউরে বয়ে গেল তার। বিয়ে হওয়ার পরেও নিজেদের মধ্যে কী একটা সামাজিক গণ্ডগোলে অনেকদিন তাকে ঘরে নেয়নি যোগেনের বাপ। আর সেই সময়—সেই সব দিনে—

এমনি কণ্ঠ—এমনি গান,—এমনি রূপ। সে গানে সে মাতাল হয়ে গিয়েছিল, সে রূপে সে জ্বলে গিয়েছিল। কত নির্জন রাত্রিতে কত নিঃশব্দ দেখাসাক্ষাৎ—কত ভালোবাসা। সে ভালোবাসার আস্বাদ সে কণামাত্রও পায়নি স্বামীর কাছ থেকে, মনে হয়েছে তার স্বামী যেন পরপুরুষ, তার ছোঁয়ায় শরীর শিউরে শিউরে উঠেছে তার। স্বামীর বুকের ভেতরেই মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে অসীম তিক্ততায় সে চোখের জল ফেলেছে রাতের পর রাত। স্বামী কিছু বুঝতে পারেনি, সন্দেহও করেনি। মোটা বুদ্ধির চোয়াড়ে লোক, ভেবেছে এ কান্না বাপ মাকে ফেলে আসবার জন্য এবং তার সাধ্যমতো সান্ত্বনাও দিতে চেষ্টা করেছে সে। সে মানুষকে ভুলতে পারেনি তবু—তাকে ভোলা কি কখনো সম্ভব? সে লুকিয়ে ছিল তার ভাবনায়, সে ঘুরে ঘুরে দেখা দিয়েছে তার স্বপ্নে। তাই হয়তো যোগেন হয়েছে তারি প্রতিমূর্তি—অবিকল তারি ছবি হয়ে জন্ম নিয়েছে যোগেন—সেই নাক, সেই মুখ, সেই গানের গলা।

জ্বলন্ত মালসাটার ওপরে যোগেনের মার অস্থিসার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। কাঠ-কয়লার রক্তাক্ত টুকরোগুলো থেকে একটা লাল আলোর প্রতিফলন এসে পড়েছে আঙুল-গুলোতে—নিজের হাতটাকে যেন চিনতে পারা যায় না। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যোগেনের মার ঘোর লাগতে লাগল। যেদিন প্রথম যৌবন এসেছিল তার—সেদিন আঙুলের রং শুধু আগুনের প্রতিফলক ছিল না, তাতে সত্যি সত্যিই ছিল গোলাপী

আমেজ। কত দিন এই হাত দুটিকে সে টেনে নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা বুকের ভেতরে চেপে ধরেছে, বলেছে—

ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল, তার পরেই আর একটা শব্দ উঠল ঝনাৎ। সদরের টিনের ঝাঁপটা খুলে কেউ ভেতরে আসছে। নিজের সর্বাঙ্গে যেন জোর করে একটা ঝাঁকি দিয়ে সজাগ হয়ে উঠে বসল যোগেনের মা। উঠোনটা পার হয়ে কে আসছে ঘরের দিকে। ওই পায়ের শব্দটা চেনা—যোগেন ফিরল।

—আইলু রে বাপ?

—হুঁ, আইমু।

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে যোগেন এগিয়ে এল দাওয়ার দিকে। তাকিয়ে দেখল, মালসার সামনে বসে তার মা হাত সেঁকছে।

—উঃ, বড় বেয়াড়া জাড়া নামিলে আজ।—যোগেন বসে পড়ল মায়ের পাশে, নিজেরও হাত দুটো আগুনের ওপরে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, মাঠের ভিতর দি আসিবা সময় মনে নাগিল কি শরীরখানা মোর কাটি দুখান হই যিবে।

—হুঁ, ইবারে জাড়াটা বেশি নাগোছে—যোগেনের মা বললে, এইঠে বসি একটু গরম হই লে বাপ।

মালসার ওপরে হাত বাড়িয়ে নিরুত্তরে বসে রইল যোগেন। মায়ের মন থেকে এখনো স্মৃতির রেশ কাটেনি—সহজভাবে ছেলের সঙ্গে কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তার ফিরে আসেনি এখনো। আর যোগেন কী ভাবছে কে জানে, তার উৎসাহ-উজ্জ্বল মুখ কালি-মাড়া। শুধু কয়েক মিনিট পরে মা-ই প্রথম কথা বললে।

—গেইলছিলু কুটুমবাড়ি?

—হুঁ।

—ভালো খিলাইলে?

—হুঁ।—তেমনি সংক্ষেপে উত্তর দিলে যোগেন।

—কী কী খিলাইলে রে?

—ভাত, মাংস, মিঠাইও আছিল্।

—পেট ভরি খালু তো রে?

এবার বিরক্ত স্বরে জবাব দিলে যোগেন। অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃস্নেহের নিতান্ত নির্দোষ প্রশ্নটাকে আঘাত দিয়ে বসল, : বোকার মতো কথা শুধাইছ ক্যানে? কুটুম বাড়ি গেমু তো ফের না খাই চলি আসিমু?

সন্দিগ্ধভাবে মা তাকালো ছেলের দিকে। আগুনের আঁচ অল্প অল্প মুখে পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে ছেলের মুখের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু কেমন যেন খটকা

লাগছে. সন্দেহ হচ্ছে, একটা গোলমাল জড়িয়ে আছে কোথাও।

—কী হৈল্ তোর রে ?

—কিছু হয় নাই।

—কিছু নি হইছে তো অমন করোছিস্ ক্যানে ?

—কি করোছি ? বাজে কথাগুলান ক্যানে কহিছ, চুপ মারি থাকো ক্যানে।

যোগেন আর বসল না, বিরক্তভাবে উঠে চলে গেল সামনে থেকে।

যোগেনের মা কিছু বুঝতে পারল না, ইচ্ছে করেই কোনো কথা বললও না যোগেন। বলে কোনো লাভ নেই—অকারণে একটা লোক তাকে অপমান করেছে, অথচ সে অপমান তাকে নীরবে পরিপাক করে যেতে হল, এটাকে স্বীকার করতে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে তার।

দোষ তার নয়, তার মায়েরও নয়। তবু খামোকা লোকটা কতগুলো কটু কথা শুনিয়ে গেল—বেরিয়ে গেল মেজাজ দেখিয়ে। অবশ্য তার জন্যে কেউ তাকে ভালো বলেনি, ছি ছি করেছে সকলেই। ভূষণ তো গালাগালি করেছে অশ্রাব্য ভাষায়। যোগেনের কাছে এসে জোড়হাতে বলেছে, তুমি হামাক মাপ করো বাবাজী।

ভূষণকে সে ক্ষমা করেছে বইকি, কিন্তু ভারী একটা আফসোস রয়ে গেছে নিজের মধ্যে। সে কেন কিছু করতে পারল না, দিতে পারল না একটা মুখের মতো জবাব ? এক হাতে বুড়োর গলাটা চেপে ধরে আর এক হাতে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল না তার গালে ? শক্তি তার নিশ্চয়ই ছিল, সাহসেরও অভাব ছিল না, কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল সমস্ত। আক্রমণের অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই দেখল, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

আচ্ছা, ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়ে একটা কঠিন নিষ্ঠুর সংকল্প গ্রহণ করলে যোগেন।

রাত বাড়তে লাগল। যোগেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছে, খেয়ে এসেছে অবেলায় তাই রাত্রে সে আর কিছু খাবে না। যোগেনের মা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন শুতে গেল, তখন একবার উঁকি মেরে দেখলে ছেলের ঘরের ভেতরে। লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে একটা কাগজে সে নিবিষ্ট মনে কী যেন লিখে চলেছে।

—বেশি রাইত জাগিস্ না বাপ।

—তুমার কিছু ভাবিবা হেবে না, তুমি শুতি যায়েন।

মা চলে গেল। মনটাকে সংযত করে নিয়ে যোগেন বসল হাট থেকে কেনা চার পয়সা দামের একটা একসারসাইজ বুক আর কাগজ-কলম টেনে। কয়েকটা গান লিখতে হবে। আকৃলাপের পালা তৈরি হচ্ছে, তারই গান।

লেখবার আগে গুন্ গুন্ করে সুর ভাঁজতে লাগল। সুর এলে তারপরে আসবে কথা, মনের ভেতরে অসংলগ্ন ভাবনার নীহারিকাপুঞ্জ একটা সুনিশ্চিত রূপ ধারণ করবে আস্তে আস্তে। যোগেনের সুরের সঙ্গে সঙ্গে কথা সঞ্চারিত হতে লাগল :

হায় হায় কলির কাণ্ড—কিবে চমৎকার—
মার পরনে ছিঁড়া কাপড় বৌয়ের গলাত্ রত্নহার—

বাঃ—মন্দ শোনাচ্ছে না! বেশ নতুন জিনিস দাঁড়াচ্ছে, লোকে খুশি হবে। কাগজে কলম চলতে লাগল :

আপন ভাইয়ক পর করিয়া,
ফুর্ত্তি করে শালাক লিয়া—
শ্বশুরক্ বাপ বুলিয়া
বাপক্ কহে নফর তার—
হায় গো কলির কাণ্ড দাদা—কিবে
চমৎকার।

সত্যিই চমৎকার। নিজের রচনায় যোগেন মুগ্ধ হয়ে গেল। এইরকম গোটা কতক জমাট গান বাঁধতে পারলেই দলের নামডাক পড়ে যাবে, সাবাস সাবাস করবে সকলে। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয়-ভরা আসরে গলায় চাদর জড়িয়ে যোগেন যখন গান গাইতে উঠে দাঁড়াবে তখন ঘন ঘন হাততালি পড়তে থাকবে, চিকের আড়ালে ছল ছল করে উঠবে তরুণীদের বুকের রক্ত। পথ দিয়ে যখন যাবে তখন লোকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলবে, ওই যাচ্ছে যোগেন আল্‌কাপওয়ালা!

ওই যাচ্ছে যোগেন আল্‌কাপওয়ালা!

তারপর—তারপরে সামনে আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আরো উজ্জ্বল সম্ভাবনা। শেষ পরিণতি শুধু আল্‌কাপের দলই নয়। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে একটা যাত্রার আসর। কালীয়দমন না অনন্তব্রত? লক্ষ্মণ-বর্জন না সীতার পাতাল প্রবেশ?

যোগেন হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল বংশী পরামাণিকের কথা। লোকটার সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় ঘটে গিয়েছিল তার।

হাটের মধ্যে পরিচয় করে দিয়েছিল জগবন্ধু সাহা। তার কাটা কাপড়ের দোকানে বসে ছিল বংশী মাস্টার—কাপড় কিনছিল। যোগেন গিয়েছিল একখানা গামছার সন্ধানে। জগবন্ধু বলেছিল, ইয়াক চিনেন মাস্টার?

মাস্টার ঘাড় নেড়েছিল। তারপর আশ্চর্য ঝকঝকে দুটি চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছিল যোগেনের দিকে। কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল যোগেন, কেমন মনে হয়েছিল মাস্টারের দৃষ্টিটা বড় বেশি তীক্ষ্ণ, বড় বেশি জ্বলন্ত। অমন অদ্ভুত ভাবে কাউকে কখনো

কারো দিকে সে তাকাতে দেখেনি।

জগবন্ধু বলেছিল, খুব ভালো গান করে, আল্‌কাপ।

—আল্‌কাপ! আল্‌কাপ কী?

এবারে মাস্টারের প্রশ্নে দুজনেই হেসে উঠেছিল। জগবন্ধু বলেছিল, আল্‌কাপ? আল্‌কাপ জানেন না? রসের গান, কেচ্ছার গান।

মাস্টার তবু প্রশ্ন করেছিল, সে কী রকম?

তখন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জগবন্ধু। পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল জিনিসটা।

সমাজের যেসব গলদ আর ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, রসিকতার সঙ্গে বিদ্রূপের কড়া চাবুক মিশিয়ে সেগুলোকে পরিবেশন করা হয়। দরকার হলে বাস্তব নরনারী পর্যন্ত বাদ পড়ে না—তা সে যতই ক্ষমতাশালী হোক—সমাজে যা খুশি প্রতিপত্তিই তার থাকুক। তবে শুধু আক্রমণই নয়—লঘু কৌতুক, হালকা হাসি ও কাহিনীর আকারে নাচে এবং গানে শুনিয়ে দেওয়া হয়।

বর্ণনা শেষ করে উচ্ছ্বসিত ভাষায় জগবন্ধু বলেছিল, ভারী চমৎকার জিনিস মাস্টার মশাই, ভারী চমৎকার। একবার শুনিলেই বুঝিবেন। হাঁ হে যোগেন, মাস্টার বাবু তো এদেশে লৌতুন আসিছেন, উয়াক একদিন গান শুনাই দাও না কেনে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—শুনামু তো—সাগ্রহে যোগেন জবাব দিয়েছিল।

মাস্টার তেমনি তাকিয়ে ছিল তার দিকে—তেমনি জ্যোতির্ময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কেমন উসখুস করছিল যোগেন—একটা লোক অমন নির্মম বিশ্লেষণভরা চোখে তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগে না। গামছা কেনবার প্রয়োজনের কথাটা ভুলে গিয়েই উঠে গিয়েছিল জগবন্ধুর দোকান থেকে।

কিন্তু মাস্টারকে এড়াতে চাইলেও এড়ানো গেল না। হাট থেকে যখন সে ফিরছিল, তখন আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে—শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। গাঁয়ের মেটে রাস্তায় আমের জামের ছায়া, বাতাসে সে ছায়া দুলছে—তার ভেতরে জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো যেন মস্ত একটা কালো জালের ভেতর এক ঝাঁক উজ্জ্বল চাঁদা মাছের মতো দোল খাচ্ছে। মনসা কাঁটাগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে—মনে হচ্ছে রাত্রি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বনগোলাপের সঙ্গে মিশেছে ধুতরোর গন্ধ—একটা রঙীন নেশায় আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে তুলেছে সন্ধ্যাকে।

পায়ের নিচে বালি মেশানো মেটে রাস্তা, জ্যোৎস্নার টুকরোগুলো যখন তার ওপরে পিছলে পিছলে যাচ্ছে তখন সেখানেও যেন কী সব উঠছে চিকমিক করে। বালির ভেতরে কী মিশে আছে ওগুলো? সোনার কণা না রূপোর বিন্দু? আজকের রাতটাই যেন

সোনার রাত—আজ আকাশ থেকে যেন রূপো গলে গলে পড়ছিল। গান পেয়েছিল যোগেনের—বেশ চড়া সুরে সে ধরে দিয়েছিল :

বঁধুর লাগি মাথায় নিলাম কলঙ্কেরি ডালা
সেই কলঙ্ক ফুল হল মোর হল গলার মালা—

আগে আগে একটা লোক চলেছিল, জ্যোৎস্নায় মাঝে মাঝে তাকে চোখে পড়ছিল বটে, কিন্তু যোগেন লক্ষ্য করেনি। ভেবেছিল, হাট-ফেরত সাধারণ মানুষ, মনোযোগ দেবার মতো কোনো কারণ আছে বলে মনে হয়নি। কিন্তু যোগেনের গান কানে যেতেই লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সোনায় ভরা রাত্রি—জ্যোৎস্নায় রূপোর কণা ঝরে পড়ছে। ধুতরো আর বন-গোলাপের গন্ধ নেশার মতো ঝিকমিক করছিল স্নায়ুতে। দেখেও দেখেনি যোগেন। আধ-বোজা চোখে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছিল :

কলঙ্কিনীর মরণ ভালো
শুকায়নি নদী—

পথের পাশে একটুখানি সরে একেবারে নয়ানজুলীর পাশ ঘেঁষে ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। যোগেন কাছে এসে পড়তেই বললে, বাঃ—খাসা গলা তো তোমার।

চমকে থেমে গেল যোগেন। বংশী মাস্টার।

বংশী মাস্টার বললে, গান থামালে কেন? দিব্যি লাগছিল।

লজ্জিত ভাবে যোগেন জবাব দিয়েছিল, ইসব গান আপনাকে শুনাইতে সরম লাগে।

বংশী মাস্টার লঘুস্বরে বললে, কেন, আমাকে এত বেরসিক ভাবছ কেন?

কথাটার অর্থ যোগেন বুঝেছিল। তেমনি লজ্জিত ভাবে শুধু মাথা নেড়েছিল, জবাব দেয়নি।

ততক্ষণে দুজনে একসঙ্গে পথ চলতে শুরু করেছে। যোগেনের পাশাপাশি চলেছে বংশী মাস্টার—অকারণেই নিজেকে অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করছে যোগেন। তার মনের ভেতর একটা ব্যক্তিত্বের সুনিশ্চিত ছায়া পড়েছে—অন্ধকারেও কি তেমনি জ্বলজ্বল করছে বংশী মাস্টারের চোখ?

কয়েক মুহূর্ত শুধু শোনা গেল ধুলোয় ভরা পথের ওপর প্রায় নিঃশব্দ দুজোড়া পায়ের শব্দ। তারপর বংশীই কথা কইল।

—তুমি কতদূরে যাবে যোগেন?

—মীরপাড়া।

—ওঃ, তাহলে একসঙ্গেই অনেকটা যাওয়া যাবে। ভালোই হল।—বংশী মাস্টার আবার হাসল : তোমাদের দেশটা এখনও আমার ভালো করে চেনা হয়নি। বামুনঘাটের

চৌমাথায় এলে মাঝে মাঝে আমার পথ ভুল হয়ে যায়—ঠিক ঠাহর করতে পারি না। একবার তো ভুল করে কাঞ্চন নদীর ঘাট পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

যোগেন এবারে সহজ ভাবে কথা বলতে পারল। বললে, ভুল হেবে ক্যানে? পুবদিকের ঘাঁটাটা ধরিলেই সিধা চামারহাটা চলি যাবেন।

মাস্টার এবার শব্দ করে হেসে উঠল: ওই তো মুশকিল। এখনো পুব পশ্চিমই ঠাহর করতে পারলাম না এদেশে।

আবার স্তব্ধতা। আবার মেটে রাস্তার ওপরে প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে দুজনে। হঠাৎ মাথার উপরে একটা দোয়েল শিস্ দিয়ে উঠল। যেন চমক ভেঙে গেল দুজনের। মাস্টার বললে, একটা কথা বলব যোগেন?

—কী কহোছেন?

—তোমাদের আল্‌কাপ গানের কথা শুনলাম। বড় ভালো জিনিস, বড় ভালো লাগল।

বিনয়ে মাথা নত করলে যোগেন।

—যারা মন্দ লোক, যারা অন্যায় করে—মাস্টারের গলা কেমন ভারী-ভারী হয়ে উঠল: তাদের পরিচয় লোককে জানিয়ে দেওয়ার মতো বড় কাজ সত্যিই কিছু নেই। এদিক থেকে তোমরা দেশের কাজ করছ যোগেন, সত্যিই দেশের কাজ করছ।

এবার আশ্চর্য হয়ে গেল যোগেন। দেশের কাজ—সে আবার কী? জিজ্ঞাসু চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল মাস্টারের দিকে, অন্যমনস্ক ভাবে চলতে গিয়ে হোঁচট খেল একটা।

মাস্টার বললে, কিন্তু এর চাইতেও তো বড় কাজ আছে যোগেন। সে কাজ কেন করো না?

—কী করিবা কহছেন?

মাস্টার যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল: কতই তো করবার আছে। অন্যায় কি শুধু একদিকেই? ছোট জাত—সবাই তোমাদের ছোট করে দেখে। তোমরা লেখাপড়া জানো না, জমিদার চল্লিশ টাকা নিয়ে চেক লিখে দেয় পনেরো টাকার, তাতে তোমরা টিপ সই করে দাও, তারপর তিন মাস পরেই আসে উচ্ছেদের নোটিশ। মহাজনের কাছ থেকে সাত টাকা ধার করলে সুদে বাড়তে বাড়তে হয় সাতাত্তর টাকা—ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়ে দেনা শোধ হয় না। কেন এর প্রতিবাদ করতে পারো না যোগেন, কেন একে গানে রূপ দিতে পারো না?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল যোগেনের। মাস্টার বলে কী!

—জমিদারের নামে গান বাঁধিমু?

—বাঁধবে বই কি।

—মহাজনকে গালি দিমু?

—হাঁ,—তাও দেবে।

—হায়রে বাপ!—ভীত কণ্ঠে যোগেন জবাব দিলে, উয়ারা ফ্যাসাদ করি দিবে যে।

মাস্টার শান্তস্বরে বললে, দিতে পারে।

—তবে?—যোগেন আড়চোখে মাস্টারের মুখের দিকে তাকালো, যেন এই জটিল কঠিন সমস্যার সমাধান দাবি করলে।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বংশী মাস্টার বললে, আচ্ছা যোগেন?

—হুঁ, কহেন।

—তুমি তো খানিকটা লেখাপড়া শিখেছ?

—হুঁ, পঢ়িছি তো।

—চারণ কাকে বলে জানো?

এতক্ষণে দুপাশের আমের জামের ছায়া সরে গেছে। চতুর্দশী চাঁদের আলো উজাড় হয়ে পড়েছে পথের ওপর—সম্মুখে মেটে রাস্তার ওপরে প্রসারিত দুটি দীর্ঘ ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই কোথাও। দুদিকে চন্দ্রোজ্জ্বল মাঠ। বাতাসে এখন আর সেই মাদক গন্ধটা নেই। শুধু ধুলোর একটা সৌরভ উঠছে।

বংশী মাস্টারের চোখ কি সত্যিই জ্বলছে, না জ্যোৎস্নায় চকচক করছে ওই রকম? সে চোখের দিকে একবার তাকিয়ে যোগেন দ্বিধাজড়িত ভাবে বললে, কী কথাটা কহিলেন?

—চারণ?

—না, সিটা কখনো পঢ়ি নাই।

—শোনো। আগে যখন শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করত—মাস্টার বলতে শুরু করল, তার মনের ভেতর থেকে কোথায় যেন একটা পাথর চাপা সরে গেছে, সরে গেছে একটা অবরোধের আবরণ। অনেক দিন পরে অতুল মজুমদার কথা কয়ে উঠল, সাড়া দিয়ে উঠল কোনো একটা গভীর বিস্মৃতির সুপ্তিলোক থেকে। বহু বছর আগে যে লোকটা ঘাসের বুকে শিশিরের বিন্দুর মতো হারিয়ে গেছে বিস্মরণের নেপথ্যে, সে যেন বংশী পরামাণিকের সামনে এসে দাঁড়াল।

অতুল মজুমদারের কথাগুলো বলে যেতে লাগল চামারহাটের প্রাইমারী ইস্কুলের ষোলো টাকা মাইনের মাস্টার বংশী পরামাণিক। কাকে বলছে খেয়াল রইল না, যাকে বলছে, সে কতটুকু বুঝতে পারছে লক্ষ্য করল না। এই সোনার রাত্রিতে,—রূপো-ঝরা জ্যোৎস্নায় মনের ভেতরে হঠাৎ যেন খুলে গেল বহুদিনের মরচে-ধরা কঠিন একটা লোহার কবাট।

যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল বংশী মাস্টার।

ইতিহাসের কথা, চারণদের গল্প। সেই তাদের কথা, যারা নিজেদের যা কিছু কণ্ঠ যা কিছু সুর—সমস্তই দেশের জন্য নিবেদন করে দিয়েছিল। অত্যাচারী শত্রু যখন পঙ্গপালের মতো এসে হানা দিয়ে পড়ত দেশের ওপর, তখন তারাই সকলের আগে বীণা হাতে বেরিয়ে আসত। দেশের প্রান্তে প্রান্তে তারা ঘুরে বেড়াত—তাদের গানে গানে ঝরে পড়ত দেশ-প্রেমের আগুন—দেশের গৌরব রক্ষা করবার নির্মম কঠিন সংকল্প। যারা ভীরু—সে ডাক শুনে ফুটে উঠত তাদের হিমরক্ত—যারা কাপুরুষ, তারা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে অসংকোচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত মৃত্যুর মধ্যে। ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে দিত তারা, নির্জীবতার মধ্যে সঞ্চার করত প্রাণের সাড়া। আবার যখন অত্যাচারী রাজা নিজের খামখেয়ালে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত, তখন তারাই সকলকে উদ্দীপ্ত করে তুলত এই অন্যায়ের প্রতীকার করবার জন্যে, এই অবিচারের সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে। রাজার অস্ত্র তাদের শাসন করতে পারত না, তাদের কণ্ঠরোধ করতে পারত না কোনো অত্যাচারীর নিষ্ঠুর মুষ্টি। তাদের আগুন-ঝরা সুর লাঞ্ছিত, অপমানিত দেশে দাবানল জ্বালিয়ে দিত—সেই আগুনে রাজার সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যেত—ভস্মসাৎ হয়ে যেত তার অস্ত্রের আর শক্তির অহঙ্কার।

কিছুটা বুঝল, অনেকটাই বুঝল না যোগেন। শুধু শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। মাস্টার কি পাগল ? হয়তো পাগল, হয়তো বা পাগল নয়। কিন্তু আশ্চর্য তার কথা বলবার ভঙ্গি—শুনলে মাথার ভেতরে শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে—শরীর শিউরে শিউরে উঠতে থাকে। যোগেনের মনের সামনে বহুদূরের একটা শহরের কতগুলো এলোমেলো আলোর মতো কী যেন ঝলমল করতে লাগল। তাতে ঠিক বোঝা যায় না, অথচ কী একটা দুর্বোধ্য সংকেত আছে তার ; তাকে জানা যায় না, অথচ অসীম একটা কৌতূহল সমস্ত অনুভূতিগুলোকে প্রখর আর উৎকর্ণ করে তোলে।

আকাশভরা জ্যোৎস্না যেন জ্বলে উঠেছে। সোনাঝরা ঘুমভরা রাত্রিটায় যেন কোথা থেকে আগুনের একটা উত্তাপ লেগেছে এসে। মাঠের মিষ্টি বাতাসেও শরীর ঘেমে উঠতে লাগল যোগেনের। বুকের ভেতর থেকে শুনতে পেল হৃৎপিণ্ডে একটা চঞ্চল আলোড়নের শব্দ।

মাস্টার বললে, সে চারণেরা আজ নেই, কিন্তু তাদের প্রয়োজন তো ফুরোয়নি। অন্যায় আজ চরমে উঠেছে। বিদেশী রাজা কেড়ে নিচ্ছে দেশের মানুষের মুখের ভাত। যে সত্যি কথা বলতে চায় তার টুঁটি টিপে ধরছে—তাকে পাঠাচ্ছে আন্দামানে, তাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে ফাঁসিতে। কেন এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না, কেন তোমার গানের সুরে এই সত্যকে ধরে দেবে না সকলের সামনে ? চারণরা আজ নেই, কিন্তু তাদের কাজ তোমরা তুলে নাও, গ্রামের মানুষগুলোকে মাথা তুলে দাঁড়াবার শিক্ষা দাও।

যোগেন শুধু বলতে পারল, হুঁ।

এতক্ষণে চমক ভেঙে গেল বংশী মাস্টারের। বড় বেশি বলে ফেলেছে অতুল মজুমদার, বড় বেশি পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছে। এ স্থান নয়, কালও নয়। কিন্তু বহুদিন পরে মনের ভেতরের লোহার কবাটটা খুলে যেতে সে নিজেকে সংযত করতে পারেনি, কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে অবারিত অনর্গল ধারায়। যোগেন একটা উপলক্ষ মাত্র—আসলে সবগুলোই স্বগতোক্তি—সবটাই আত্মপ্রকাশের একটা অহেতুক উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর তা ছাড়া—এই কি যোগেনকে বোঝাবার ভাষা? সে ভাষা অতুল মজুমদার শেখেনি, বিপ্লবী যুগের নেতা যাদের ভেতরে তার কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিল তারা যোগেন নয়। তাদের পৃথিবীর কথা যোগেনদের কাছে দুর্বোধ্য, তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এদের কাছে একটা রূপকথার চাইতে বেশি বাস্তব নয়। "দেশমাতার পায়ে আজ শৃঙ্খলের বন্ধন—তাঁর সর্বাঙ্গে আজ অত্যাচারীর কশাঘাতের রক্তধারা"—এ জাতীয় ভালো ভালো কথা তাদের কাছে অর্থহীন প্রলাপ। পৃথিবীর জাতিসংঘে আমাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, সমুদ্রের ওপারে কালো জাতিরা ঘৃণা আর করুণার বস্তু, স্বায়ত্তশাসনের নামে আমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা একটা বিরাট কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়—এসব কথা এদের কাছে পাগলের মতো শোনাবে। চোখ বড় বড় করে শুনে যাবে, মাঝে মাঝে হাঁ করে থাকবে, তারপর যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, দেশের এই অবস্থা শুনে তাদের প্রাণ কাঁদে কিনা তখন তারা পরিষ্কার জবাব দেবে: বাঃ, বেশ কথা কহিছেন। খালি খালি কাঁদিমু ক্যানে?

—দেশের জন্যে তোমাদের কষ্ট হয় না?

—উসব কথা ক্যানে কহিছেন বাবু? হামরা খাবার পাছি না—কেমন করি দুটা ভাত ডাইল জুটিবে, সিটা কহিবা পারেন তো কহেন, না তো যেঠি থাকি আসোছেন ওই-ঠিই চলি যান। উসব চালাকির কথা ভালো লাগে না।

ঠিক, ওদের কাছে এসব চালাকির কথা ছাড়া আর কিছু নয়। বড় বড় বুলির সার্থকতা কিছুমাত্র ওরা বুঝতে চায়ও না। খেতে দাও আমাদের, চাল দাও, জমি চাষ করে যাতে ঘরের খোরাক ঘরে রাখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও, মহাজনের জালে সর্বস্বান্ত না হই তার উপায় করে দাও, রক্ষা করো দারোগার উপদ্রবের হাত থেকে। এই ওদের কাছে সব চেয়ে বড় জিনিস—সব চাইতে বড় সত্য। এর অতিরিক্ত স্বাধীনতা বলে যদি কোনো জিনিস থাকে, তার কানাকড়িরও মূল্য নেই ওদের কাছে। দেশমাতার শৃঙ্খল সত্যিই মুক্ত হল কি না এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করে কোনো দেশনেতা তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহে মলম মালিশ করে দিলেন কিনা এটা না জানলেও কোনো ক্ষতি হবে না ওদের, কোনো ব্যাঘাত হবে না ওদের মাঝির ঘুমিয়ায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো কথা ভেসে চলে গেল বংশী পরামাণিকের মনের সম্মুখ দিয়ে। এগুলো অতুল মজুমদারের অভিজ্ঞতা—পরীক্ষিত নির্ভুল সত্য। যে ভুলের জন্যে অতুল মজুমদার ব্যর্থ হয়ে গেছে সে ভুল সে করবে না। ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে সে আগুন ধরাতে পারেনি, সে জানত না নিচে থেকে বাতাস দিলে আপনা থেকেই শিখাগুলো জ্বলে উঠবে লক্‌লক্‌ করে।

এতক্ষণে চৌমাথাটা এসে পড়েছে। অপ্রতিভ ভাবে হাসল বংশী মাস্টার : তোমার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল, আর একদিন গল্প করা যাবে।

তারপর বিস্মিত যোগেনকে আর কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই চলে গিয়েছিল পূবদিকের রাস্তাটা দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল তার ছায়াটা।

পরিচয়টা ওইখানেই শেষ হয়নি। তারও পরে হাটে দেখা হয়েছে অনেকবার—হাট থেকে একসঙ্গেই দুজনে ফিরেছে বামুনঘাটের চৌমাথাটা পর্যন্ত। যে কথা প্রথম দিন একটা অপরিচিত রহস্যলোকের মতো মনে হয়েছিল, তা রূপ ধরেছে ক্রমশ, নিচ্ছে একটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আকার।

…যোগেনের চটকা ভাঙল। অনেক রাত হয়ে গেছে। পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে আলকাপের গান লেখা কখন যে বন্ধ হয়ে গেছে টেরই পায়নি। আরো মনে পড়ল একটা অস্ফুট বিরক্তি মৃদু একটা তিক্ত স্বাদের মতো চেতনায় ছড়িয়ে আছে তার—আজ অত্যন্ত অকারণে একটা লোক কুশ্রী কটু ভাষায় অপমান করেছে তাকে।

অন্যায়—অবিচার। চোরের মতো মাথা পেতে নিয়েছে যোগেন, সহ্য করেছে নির্বোধের মতো। প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, শক্ত হাতে গলাটা টিপে ধরা উচিত ছিল লোকটার। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল—

—ধ্যাৎ—

বিরক্তভাবে যোগেন আবার দোয়াতে কলম ডুবোতে যাবে, এমন সময় ঘরের বাইরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। দরজার কড়াটা নড়ে উঠল খট্‌ খট্‌ করে।

চার

প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে যোগেন চেঁচিয়ে উঠল : কে?

—আমি।

—আমি কে?

—বংশী।

কাগজ কলম সরিয়ে দিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল যোগেন। খুলে দিলে দরজা—এক

ঝলক শীতের বাতাস দুরন্ত ভাবে ঘরের ভেতরে এসে আছড়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবীর একটা আকস্মিক আঘাতে লন্ঠনের শিখাটা মিট্ মিট্ করে উঠল বার কয়েক।

বংশী মাস্টার ঘরে ঢুকল।

—মাস্টার বাবু? এই রাইত করি যে?

—বড় দরকার। সব বলছি, তার আগে দরজাটা বন্ধ করে দাও—শীতে সমস্ত শরীর কালিয়ে গেছে আমার।

—হঁ, ঠাণ্ডাটা বড জোর পড়িছে আইজ—

দরজাটায় শক্ত করে হুড়কো এঁটে দিলে যোগেন। কিন্তু তখনো বংশী মাস্টার থর্ থর্ করে কাঁপছে, ময়লা ছেঁড়া কোট আর সুতির চাদরে উত্তর বাংলার এই দুরন্ত শীত পোষ মানেনি—হাড়ে হাড়ে ঝাঁকানি ধরিয়ে দিয়েছে একেবারে। জুতোর যে অংশটুকু অনাবৃত ছিল একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সেখানে, মনে হচ্ছে নিষ্ঠুর হাতে কেউ ছুরির পোঁচ দিচ্ছে তার ওপরে। ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কাঁপছে, কয়েক মিনিট ভালো করে কথাই কইতে পারল না মাস্টার।

—শীত জোর ধরিছে। একটু আগুন আনি দিমু?

কাঁপা গলায় মাস্টার বললে, থাক।

—থাকিবে কেন, লি আসোছি হামি।

একটা মালসা যোগাড় করে তাতে কাঠকয়লার আগুন দিয়ে নিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না যোগেনের। এসে দেখল মাস্টার তখনো শীতে কাঁপছে বটে, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। অত্যন্ত মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে পড়ছে যোগেনের লেখা আলকাপের সেই গানগুলো।

লজ্জিত যোগেন মাস্টারকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে সাড়া দিলে: এই লেন জি, মালসা লিয়া আসিনু। হাত পাও সেঁকি লেন।

মাস্টার চোখ না তুলেই বললে, নিচ্ছি।

যোগেন বিব্রত ভাবে বললে, উগ্‌লাক্ না দেখেন!

মাস্টার হাসিমুখে বললে, কেন?

—হামার লাজ নাগে।

এবার বংশী মাস্টারের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল: কেন, এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? আসরে তো গাইতেই হবে।

—সি যখন হেবে তখন হেবে। এখন রাখি দেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

যোগেনের আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টারের করুণা হল। বললে, তবে তাই হবে,

আসরেই গান শুনব তোমার। কিন্তু বেশ গান লেখা হয়েছে যোগেন, ভালো হয়েছে।

—ভালো হইছে?—চরিতার্থতায় যোগেনের মুখ আলো হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, চমৎকার হয়েছে।

এবার যোগেনের আর কথা বেরুল না। সাফল্যের ছেলেমানুষি আনন্দে আর বিনয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল সে। আর আগুনের মালসার ওপরে হাতটা তুলে দিয়ে আরামে মাস্টারের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল—আঃ!

এখন অনেক রাত। বাইরের আকাশে ফিকে চাঁদ অস্ত গেছে, অন্ধকারে এখন জমাট বাঁধছে হলদে কুয়াশা। চাঁচের বেড়ার গায়ে মাটি লেপা—যেখানে যেখানে মাটির আস্তর খসে বেড়ার ফাঁক বেরিয়ে পড়েছে, সে সব জায়গা দিয়ে সরু সরু ধোঁয়ার রেখার মতো কুয়াশা ঢুকছে ঘরে। কাল সকালে সূর্য উঠবে অনেক দেরিতে—বহুক্ষণ পর্যন্ত গভীর কুয়াশার তলায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে পৃথিবী।

রাত অনেক হয়েছে—কোথা থেকে যেন বিচিত্র একটা শব্দ বাজছে—ঝিম্ ঝিম্। আর সব চাপা পড়েছে নীরবতায়। পাশের ঘরে যোগেনের মা ঘুমের ঘোরে কথা কয়ে উঠল। বংশী মাস্টার আগুনের উপর হাত সেঁকছে। মাঝে মাঝে চট্‌চট্ করে এক একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে মালসাটার ভেতরে, চটা খসে পড়ছে। আর মাস্টারের নিশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসছে অত্যন্ত জোরে। সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে মালসার ওপরে ঝুঁকে রয়েছে সে। চাপ পড়েছে বুকে, তাই একটা জোর নিশ্বাস টেনে সে চাপটাকে হালকা করতে চাইছে।

কয়েক মুহূর্ত যোগেন তাকিয়ে রইল মাস্টারের দিকে। চোখ দুটোকে এখন আর সে রকম জ্যোতিষ্মান্ বলে মনে হচ্ছে না—কেমন একটা ক্লান্ত আরামে যেন নিষ্প্রভ হয়ে আছে। এতদিন পরে আরো বোঝা গেল, বেশ বয়েস হয়েছে মাস্টারের, তার চোখে মুখে দীর্ঘ ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতার চিহ্ন আঁকা। কপালে কতগুলো কালো কালো দাগ স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে, চোখের কোণায় কালির পোঁচড়া রয়েছে সজাগ হয়ে। রাতে কি ঘুমোয় না মাস্টার, কখনো কি বিশ্রাম করে না? আর এত ভাবেই বা কী? এই প্রায় ছমাস ধরে পরিচয়, তবু যেন যোগেন সম্পূর্ণ করে জানতে পারল না মাস্টারকে, তার সত্যিকারের পরিচয় পেল না। শুধু বুঝতে পারা যায় যতটুকু দেখেছে মাস্টারকে তার চাইতে অনেক ব্যাপ্ত, অনেক গভীর। মাস্টার যা—তা এখনো তার অজ্ঞেয় এবং রহস্যনিবিড়।

যোগেন বললে, ত কহেন, এত রাতে এইঠে আসিবার কি কামটা পড়িল?

—আমি একটা ইস্কুলের মাস্টার—সে তো জানো?

—হঁ, সিটা জানি।

—সেখানে সরস্বতী পূজা হবে।

বিস্ফারিত চোখে যোগেন তাকিয়ে রইল : কী পূজা হেবে কহিলেন ?

—সরস্বতী।

—ইটা ফের কেমন কথা ? চামারের গাঁয়ে পূজা ?

—কেন চামারও তো মানুষ।

যোগেন বললে, মানুষ হবা পারে, কিন্তু বামহন কায়থ, ত নহে। হামরা বামহন কায়থের জুতার তলা।

—এখন আর কেউ কারো জুতোর তলা নয়।

—নহে ?

—না।

যোগেন দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে টিপে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কথা সে আপাতত ভাবছে না, কিন্তু আজ দুপুরের সে বিশ্রী অপমানটার কথাও সে ভুলতে পারেনি। নিতান্তই জাতিগোত্রের ব্যাপার, কারণটাও একান্তই ব্যক্তিগত, মাস্টারের বড় বড় কথার সঙ্গে কোনো সম্পর্কও তার নেই। তবু একথা ঠিক, যোগেন তার প্রতিবাদ করতে পারেনি, প্রতিকারও করতে পারেনি। শুধু কি একটা বিশ্রী গণ্ডগোল এড়াবার জন্যেই সে তখন মুখ বুজে সব সহ্য করে গিয়েছিল ? অথবা ভয় করেছিল লোকটার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে, তার ক্ষমতাকে ? জমির ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে মামলা করছে সুরেন, করুক। তার মীমাংসা হবে আদালতে। কিন্তু কেমন করে এমন একটা স্পর্ধা পেল লোকটা যে এই সামান্য ছুতো নিয়ে তাকে যা খুশি তাই অপমান করে গেল ?

যোগেন বললে, হুঁ, বুঝিনু।

মাস্টার মৃদু হেসে বললে, কী বুঝলে ?

—আর কাহারো কাছে নিচু হই থাকিমু না।

—না, কারো কাছেই না।

—বামহন, কায়থ, বড়লোক—কাহারো কাছেই না।

—না।

যোগেন আবার কামড়ে ধরলে নিচের ঠোঁটটাকে : ত হামাকে কী করিবা কহিছেন ?

—বলছিলাম আমাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা হবে।

—বেশ তো, কর।

মাস্টার বললে, সেই জন্যেই তোমার কাছে এলাম।

—হামি কী করিব তা কহ।

—সেদিন তোমাকে গান করতে হবে।

যোগেন আশ্চর্য হয়ে বললে, হামি!

—হ্যাঁ, তুমি।

যোগেনের তবু বিস্ময় কাটছে না: হামাকে গান গাহিবা হেবে!

—সেই কথাই তো বলতে এলাম। নতুন গান শোনাতে হবে যোগেন, শোনাতে হবে নতুন কথা। তোমরা যে আর ছোট নও, একথা এবার বলে দেওয়ার সময় হয়েছে।

যোগেন অভিভূত ভাবে বললে, কী গান লিখিমু?

—লিখবে অন্যায়ের কথা, অবিচারের কথা। বলবে বামুন-কায়েতেরা কেমন করে তোমাদের ছোট করছে, কেমন করে জমিদার-মহাজন অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে তোমাদের ওপরে। নতুন করে চামারপাড়ায় আমরা সরস্বতী পূজো করছি—তাই নতুন করে তোমাকে গানও লিখতে হবে যোগেন! পারবে না?

তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিতে যোগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বংশী মাস্টার। অন্তর্নিহিত একটা প্রখর জ্বালার মতো তার চোখ জ্বলতে লাগল, তার দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন করে আনতে লাগল যোগেনকে। বাইরে শীতের রাত। চাঁচের বেড়ার ফাঁক দিয়ে হলদে কুয়াশা ধোঁয়ার সরু সরু সাপের মতো ঘরের ভেতরে ঢুকে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। খড়ের চালের ওপর টুপ টুপ করে শিশির পড়বার শব্দ—মালসার গন্‌গনে আগুনটার ওপরে অল্প অল্প ছাইয়ের আভাস।

যোগেন চুপ করে রইল। ঠিক কী উত্তর দেবে, বুঝতে পারছে না। সরস্বতী পুজো হবে, বেশ নতুন রকমের জিনিস। সেখানে আল্‌কাপের গান গাইতে হবে—সেটাও ভালো কথা, খুশি হওয়ার মতোই প্রস্তাবটা। কিন্তু নতুন সুরে গান রচনা করতে হবে—নতুন কথা বলতে হবে। সে কথা বলবার মতো কি সাহস আছে যোগেনের, সে জোরটা আছে নিজের ভেতরে?

—পারবে না যোগেন?

যোগেন কেমন অভিভূত ভাবে তাকিয়ে রইল। রাত্রির নেশা ধরেছে, চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশের বিচিত্র কুহক জাল। বাইরের হলদে কুয়াশার মতো মনের মধ্যেও একটা কুহেলিকা পড়েছে বিকীর্ণ হয়ে।

মাস্টারের প্রশ্নটা যেন শুনতে পেল না সে। ঠিক যেন বুঝতেও পারছে না। বহু দূরের কোন্ একটা শহরের আলোর মতো কী যেন ঝলমল করছে চোখের সামনে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না অথচ দুর্বোধ্য রহস্যের মতো কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে ভাবনার ওপরে। অথবা শোনা যাচ্ছে কেমন একটা দূরাগত গর্জনের মতো শব্দ,—বর্ষার সময় যখন কাঞ্চন-নদীর কূল-ছাপানো জল খরকল্লোলে বয়ে যায় আর দূর থেকে সে কল্লোল যেমন মনের মধ্যে আতঙ্ক-ভরা একটা কৌতূহলকে সজাগ করে তোলে—ঠিক সেই রকম।

—পারবে না যোগেন?

তৃতীয়বার প্রশ্ন করল মাস্টার। তার চোখে যেন আগুনের বিন্দু চিকমিক করছে। ওই আগুনের স্পর্শ লাগল কি যোগেনের মনেও?

—পারিমু।

—নতুন গান, নতুন কথা?

—পারিমু।

মাস্টার বললে, কিন্তু তার দায় আছে, অসুবিধেও আছে।

যোগেন চুপ করে রইল।

—গণ্ডগোল হতে পারে।

যোগেন জবাব দিল না।

একটা ছোট কাঠি দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে মালসার আগুনটাকে খোঁচা দিচ্ছিল মাস্টার। হঠাৎ যেন আগুনটা জোরালো হয়ে উঠল—ঝেড়ে ফেলে দিলে ছাইয়ের হালকা আস্তরণটা। মাস্টারের হাতের কাঠিটা জলে উঠল দপ্‌ করে।

মাস্টার বললে, যদি ভয় পাও, তবে বলব না। কিন্তু যোগেন, তোমার গাঁয়ের মানুষদের ভেতরে তুমিই খানিকটা লেখাপড়া শিখেছ, এই অন্ধদের ভেতরে তোমারই চোখ খুলেছে। এ কাজ তুমি না করলে কে করবে? তুমি না নিলে কে নেবে এই ভার?

কিন্তু মালসার আগুনটার মতো যোগেনের মনের ওপর থেকেও ছাই সরে গেছে, কী একটা সেখানে ধক্ করে জলে উঠেছে মাস্টারের হাতের ওই কাঠিটার মতো।

মহিন্দরের কাছ থেকে পাওয়া সেই অপমানের যন্ত্রণাবোধটা প্রসারিত হয়েছে একটা অর্থহীন প্রতিবাদে, একটা বহু বিস্তীর্ণ অপমানবোধে। সহসা যোগেনের মনে হল, এ কাজ সত্যিই তার—এ কাজের দায়িত্ব একমাত্র সে-ই নিতে পারে।

যোগেন বললে, আমি কাঁউক ডরাই না। কিন্তু কী গান লিখিমু, তুমি হামাক কহি দেন।

—বেশ আমিই বলে দেব।

মাস্টার উঠে দাঁড়ালো: রাত খুব বেশি হয়ে গেছে, অনেকটা রাস্তা আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমারও ঘুমোনো দরকার। আমি আজ চলি যোগেন।

—অখনি যাছেন?

—হ্যাঁ, এখনি যাব।

—কিন্তু ই কথাটা কহিবার জন্ত ক্যানে এত আইতে আসিলেন?

—কারণ আছে। সে কারণ পরে তোমায় বলব। শুধু একটা কথা বলি যোগেন। এ শুধু শুরু—এ শেষ নয়। তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করাতে চাই আমি, অনেক বড় কাজ। আর সে কাজ তুমিই পারবে। তুমি গুণী, তুমি শিল্পী। আমাদের কথা লোকের

কানে পৌঁছোয়, কিন্তু মনকে ছুঁতে পারে না। সে ভার যদি তুমি নাও—আমাদের দায়িত্বের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে।

বলেই আবার লজ্জিত হয়ে পড়ল বংশী মাস্টার। বড় বেশি বলছে, বড় সাজিয়ে বলছে। এর প্রয়োজন নেই, কথার মূল্য কত নিরর্থক, অতুল মজুমদারের জীবনেই তা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত আর প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবু খারাপ হয়ে গেছে অভ্যাস। মাস্টারীর দোষই এই—বড় বেশি পরিমাণে বকিয়ে মারে।

মাস্টার দরজার ঝাঁপটা খুলে বললে, আচ্ছা, চললুম আজ।

—কিন্তু কী লিখিব সিটা তো কহি গেলেন না?

—কাল পরশু আসব। কিন্তু মনে রেখো যোগেন, অনেক বড কাজ তোমায় করতে হবে—অনেক বড় কাজ।

মাস্টার বেরিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিলে। এক ঝলক শীতের হাওয়া এসে যোগেনের লেখার খাতার পাতাগুলোকে উডিযে দিয়ে গেল।

আর অন্ধকারে এগিয়ে চলল বংশী পরামাণিক—ফিরে চলল শূন্য মাঠের কন্‌কনে উগ্র বাতাসের মধ্য দিয়ে। চাঁদ ডুবে গেছে—কুয়াশায আকাশের তারাগুলো বিচিত্রভাবে ঝাপসা হয়ে আছে। স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন রাত্রি—শুধু বহুদূর থেকে একটা ক্ষীণ কান্না যেন ভেসে আসছে। মডাকান্না নিশ্চয়—ওর একটা অস্বস্তিকর ধবন আছে, ওর সুরের ভেতর আছে অবাঞ্ছিত অনিবার্যতার চিরন্তন-সংকেত।

শীতের বাতাস সর্বাঙ্গে দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে, ঠাণ্ডায যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছে কান দুটো। তবু মনের মধ্যে যেন পথ হাঁটতে লাগল মাস্টার। সেখানে শীতার্ত রাত্রির আডষ্টতা নেই, আচ্ছন্নতাও নেই। একটা তীব্র উত্তাপ, অসহনীয় একটা আগ্নেয় জ্বালা। এই নির্জন মাঠের ভেতর শুধু বাংলা দেশেব কযেকটি বিচ্ছিন্ন জনপদই রূপ ধরেনি, সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ। ওই মডাকান্নার শব্দ তারই বুকের কান্না, ওই রাত্রির শিশিরে তারই চোখেব জল ঝরে পডছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

তবু নির্জন পথ। তবুও নিঃসঙ্গ রাত্রি।

উপায় নেই, ডাক শুনে তো কেউ এল না, তাই 'একলা চলোরে'। আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে একা পথ চলেছে অতুল মজুমদার, তার জন্যে সহানুভূতি হয় বংশী মাস্টারের। আর অতুল মজুমদারও তো মানুষ। তারও একটা মন আছে, একটা অতি দুর্বল জায়গা আছে, যেখানে সে স্পর্শাতুর—যেখানে ছোঁয়া লাগলে আজও টনটন করে ওঠে।

আচ্ছা আজ কোথায় সে, সেই ছোট মেয়েটি?

নাম বোধ হয় শান্তি। ময়লা রঙ, ছোটখাটো মেয়ে। বয়স যতটা বেড়েছে মন তার *অর্ধেকও বাড়েনি। কপালে উজ্জ্বল একটি সবুজ টিপ। কথায় কথায় সে এত বেশি তর্ক*

করে যে সামলানো মুশকিল। অতুল মজুমদারের মতো একটা মূল্যবান ভারিক্কি মানুষকে পর্যন্ত তুলত নাস্তানাবুদ করে। আর তার সেই হাসি। বাঁধভাঙা ঝর্ণার জলের মত উৎসারিত হয়ে পড়ত—অকারণে যে কত খুশি হয়ে হাসতে পারে মানুষ, শান্তিকে না দেখলে তা বুঝতে পারা যায় না।

আজ কোথায় শান্তি, কতদূরে? সে সব খেলাঘরের দিনগুলো কি এখনো মনে আছে তার? এই রাত্রে—এই মুহূর্তে হয়তো তার ঘরে একটি নীল রঙের ইলেকট্রিক বাতি জলছে, হয়ত উষ্ণ লেপের ভেতরে কারো উষ্ণ বুকের আশ্রয়ে তার দুচোখে অপরূপ স্বপ্নভরা ঘুম জড়িয়ে আছে।

কিংবা—

কিংবা নিদ্রিত চোখের কোণ বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ছে অসতর্ক স্বপ্নের অবকাশে। হয়তো একটা মানুষ একদিন তার জীবনে এসেছিল, স্বপ্নের মধ্যে মৃদু বেদনার মতো সেদিনের স্মৃতিটা সাড়া পেয়েছে তার চেতনায়!

ধ্যেৎ! মাস্টার নিজেকেই একটা ধমক দিলে। বাজে রোমান্টিসিজম্। কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর শন্‌শনে শীতের বাতাস। চাঁদ ডুবে যাওয়া কুয়াশায় মেশানো ঘোলাটে অন্ধকার। দূরে মড়াকান্নার আকৃতি।

এই সত্য—এই তো পথ! 'একলা চলো, একলা চলো, একলা চলোরে।' সঙ্গী? স্বপ্ন-বিলাস। ভালবাসা? বিপ্লবীর পাথেয় নয়, বন্ধন।

মাস্টার জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। রাত শেষ হওয়ার আগেই পৌঁছুতে হবে তাকে। অনেক কাজ, অনেক কাজ বাকি।

পাঁচ

বেলা বেশ চড়েছে, ঘরের মধ্যে তখনো অঘোরে ঘুমুচ্ছিল বংশী মাস্টার। জানালাটা দিয়ে রোদ পড়েছে মাচার বিছানায়, শীতের সকালের সোনালি-রোদ এসে ছড়িয়েছে মাস্টারের রাত্রি-জাগরণক্লান্ত চোখে-মুখে। বাইরের সব্জি বাগান থেকে ঘরের মধ্যে শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে আসছে কপির পাতার গন্ধ, মুলো ফুলের গন্ধ। ময়লা লেপটাকে শরীরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ করে নিয়ে নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন আছে মাস্টার।

এমন সময় মহিন্দর এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে।

—ওহে মাস্টার, মাস্টার হে?

ঘুমের মধ্যে মাস্টার শুনতে পেল অস্পষ্ট ডাকটা। কিন্তু তখনো জাগবার অবস্থা নয়, বিরক্ত ভাবে কী একটা বিড় বিড় করে সে পাশ ফিরে শুল। পিঠের নিচে মড়মড় করে

উঠল মাচাটা।

—শুনিছেন হে মাস্টার, আর কত ঘুমাছেন।

এইবার টকটকে লাল দুটো চোখ খুলল মাস্টার, শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাকাল ওপরের দিকে—যেখানে ঘরের চালে কালো ঝুলের ওপরে সূর্যের আলো এসে পিছলে পড়েছে। অর্ধচেতন মনের কাছে সমস্ত পরিবেশটা কেমন নতুন আব খাপছাড়া বলে মনে হল।

—মাস্টাব উঠিছেন ?

মহিন্দর অধৈর্য হয়ে উঠেছে। এবার এসে নাক গলিয়েছে খোলা জানলায়, ডাক দিচ্ছে: উঠো হে উঠো। ঢের বেলা চটি গিছে।

মুখ বিকৃত করে মাস্টার বললে, আঃ—তারপর গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে লেপটা সরিয়ে উঠে বসল। একটা হাই তুলে বললে, আঃ, এই সকাল বেলায় কেন ডাকাডাকি শুরু করলে ?

—সকাল তুমি কুন্ঠে দেখিলা মাস্টাব। বেলা পহব চটি গেইছে।

—নাঃ, তোমাদের জ্বালায আর ঘুমোনো যাবে না।

বিছানার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে মাস্টার মাচা থেকে নেমে পড়ল। ময়লা চাদরটা গায়ে জড়িযে দবজা খুলে দিলে, বেরিয়ে এল দাওয়ায়। বললে, কী খবর ?

—তুমার হুঁকার জল লি আমু। গাছগুলাত্ ছিটাই দাও, পোকা পালাই যিবে।

—তা তো যিবে।—মহিন্দরেব হাতেব ভাঁডটার দিকে তাকিয়ে মাস্টার বললে, এত জল পেলে কোথায় ?

—পাম্ ফের কুন্ঠে। বাড়িত্ যত মানুষ মাইন্দার দিনরাইত বড়র বড়র করি হুঁকা টানোছে, পানির অভাব হেবে ক্যানে ?

—যাক্, ভালোই করেছ।

ভাঁডটা বেখে মহিন্দর বললে, শুধু ওইটা কামের জন্যই হামি আসি নাই।

—তবে আবো কী কাজ আছে ?

—সিটাই কহিতে তো আসিনু। নায়েব আলছে, তোমার সাথ্ দেখা করিবা চাহোলে।

—নায়েব।—বংশী বিস্মিত হয়ে বললে, কোন্ নায়েব ?

মহিন্দব অনুকম্পাভরে বললে, অনেক 'নিখিলে' কী হেবে, তুমি বড বোকা আছেন মাস্টার। নায়েব কেব নায়েব—কোন্ নায়েব হেবে আবার।

—ওঃ, বুঝেছি। তোমাদের জমিদাবেব নায়েব।

—ইবারে ঠিক ধরিলে—মহিন্দব বললে, হামাদের জমিদার বড়াল বাবুর নায়েব।

—কোথায় উঠেছেন নায়েব মশাই ?

—তুমি কেমন লোক আছেন হে মাস্টার ? মহিন্দর এবার বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে,

হাস কান্দরের উপরে টিনের চালাখান দেখেন নাই? ওইটাই তো কাচারী। নায়েব আসিলে উথানে উঠে, জশিল করে। হামাদের সবজনার ব্যাগার দিতে হয়।

—তা আমাকেও ব্যাগার দিতে হবে নাকি? তাঁর পা ধোয়ার জল দিতে হবে, রান্নার কাঠ কেটে দিতে হবে, নয়তো পা টিপে দিতে হবে?

মাস্টার হাসল।

মহিন্দর জিভ্ কাটল: ছিঃ ছিঃ ইগ্‌লান কী কহিছ! তুমি হামাদের মাস্টার, ঢের লিখিছ, তুমার মান নাই? উগ্‌লা ছোটলোকের কাম—উগ্‌লা তোমাকে ক্যানে করিবা হেবে? হামরা আছি না? আর হামাদের নায়েব মশাই সিরকম মানুষ নহ, মানীর মান রাখিবা জানে।

—তাই নাকি?—মাস্টারের মুখে কৌতুকের রেখা দেখা দিলে।

মহিন্দর বললে, হঁ হঁ! একবার নায়েব হামাক কছু আনিবা কহিলে। তো কছুর সময় নহে, কুনঠে কছু পামু হামি? ঢের খুঁজিনু, না মিলিল্। আসি কহিতেই, হায়রে বাপ, আগি (রাগি) একদম রাগুন (আগুন) হই গেল্। কহিলে, শালা, কছু নাইতো জাল মাছ (চিংড়ি) খামু কেমন করি! বলি মারিলে এক লাথি, হামি পড়ি গেনু।

মাস্টার রুদ্ধস্বরে বললে, লাথি মারলে?

—মারিলে তো। বামহনের ছোয়া একটা লাথি মারিলে তো কী হৈল্? তো লাথি খাই ভারী রাগ হই গেল্ মোর, হামি চলি আনু বাড়িত। এক ঘড়ি বাদ পেয়াদা পাঠাইলে। হামি ভাবিনু, বাপ, ইবার জুতা মারি হামার পিঠ উড়াই দিবে।

—উড়িয়ে দেয়নি?

—হুঁঃ, কী যে কহিছেন মাস্টার! তেমন মানুষখান পাও নাই উয়াক। হামি যাইতেই দুঃখ করি কহিলে, মহিন্দর, আগ (রাগ) করি তুমাক মারি হামার মন বড খেদ করোছে। তুমি মানী লোক—কামটা হামার ভুল হই গিইছে। তো আগ করিও না—ই টাকাটা লিই যাও, তোমার চ্যাংড়াগুলাক্ মিঠাই খাবা দিও।

—যাক—মাস্টারের মুখে একটা বিকৃত হাসির রেখা ফুটে উঠল: তা হলে সত্যিই মানীর মান রাখতে জানে দেখছি।

—না তো কী? তুমাক ঝুটাই কহিনু?

—হুঁ, বুঝলাম। মাস্টার বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তা হঠাৎ আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইছেন কেন?

—হামি কহিনু না? কহিনু, মাস্টার বড় পণ্ডিত লোক—ভিনদেশী মানুষ। হামাদের বড় উপ্‌কার করে, ঘর ঘর যাই খোঁজ খবর লেয়। শুনি কহিলে, হামার ঠাই মাস্টারক ভেজি দিও মহিন্দর, হামি আলাপ করিমু।

মাস্টার হাসল : আচ্ছা যাব। বিকেলে দেখা করব।

—না, না। এবার মহিন্দর শঙ্কিত স্বরে বললে, সকালেই যাইও। কহিছে যখন তখন মানী লোকটার কথাটা তো রাখিবা হয়।

—আচ্ছা বেশ, একটু পরেই যাচ্ছি।

—হঁ—হঁ, জলদি যাইও। মহিন্দর বললে, হামার ফের তাড়া আছে, গোরুর দুধ যোগাড় করিবা হেবে, খাসি আনিবা নাগিবে। হামাকেই ফের বরাত দিলে কিনা। তুমি কিন্তু যাইও হে মাস্টার—ভুলেন না।

—না ভুলব না।

দ্রুত চলে গেল মহিন্দর, অত্যন্ত তটস্থ আর বিব্রত মুখের চেহারা। নায়েব মহাশয়ের অভ্যর্থনার দায়িত্ব লাভ করে অত্যন্ত চরিতার্থ হয়েছে বুঝতে পারা যায়। গ্রামে এত লোক থাকতে এসব ব্যাপারে নায়েব তাকেই অনুগ্রহ করে থাকেন, এই গর্ববোধটা বেশ প্রত্যক্ষ আর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে মহিন্দরের সর্বাঙ্গে।

মাস্টার সকৌতুকে হাসল, মানীর মান রক্ষার আসল তাৎপর্যটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। নায়েব চালাক লোক, গোরু মেরে জুতো দানের বিদ্যাটা আয়ত্ত আছে তার।

কিন্তু হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানোর অর্থটা কী? সংশয়ে মাস্টারের চোখমুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শুধুই পরিচয়, শুধুই খানিকটা আলাপ এবং অনুগ্রহ বিতরণ? অথবা?

মাস্টার বড় করে একটা হাই তুলল, তারপর হুঁকোর জলের ভাঁড়টা নিয়ে নেমে গেল সব্জী বাগানে। মুলোর পাতা তার সর্বাঙ্গে স্নেহের ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে, বিলিতী বেগুন গাছ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা অবশিষ্ট শিশির ঝরে পড়ল তার পায়ের ওপর, তার মুখের দিকে তাকিয়ে দুগ্ধশুভ্র কপির ফুল যেন আনন্দে হাসতে লাগল।

কাঁদরের সামনে উঁচু ডাঙার ওপরে কাছারী বাড়ি। একখানি টিনের চালা, একফালি বারান্দা। সেইখানেই দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে নায়েব দীনেশ চট্টরাজ। পাকানো শরীর, শকুনের মতো ধারালো চোখ। দেখলেই বোঝা যায়, নায়েবী করে করে নিজেকে একেবারে তৈরি করে নিয়েছে। কেউ যখন আসে তখন সম্পূর্ণভাবে তার দিকে তাকায় না। একটা চোখ বন্ধ করে আর একটা সংকুচিত করে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কেমন বিচিত্র ভঙ্গিতে। অর্থাৎ মানুষকেই শুধু দেখে না, তার ভেতরে যেন আরো একটা কিছুকে সে আবিষ্কার করতে চায়।

আপাতত সকালের রোদে তৈলাভ্যঙ্গ চলছে তাঁর। সারারাত গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে এসেছেন, এই তৈল মর্দনের সাহায্যেই গায়ের ব্যথা দূর করবার বন্দোবস্ত। বসেছে একখানা জলচৌকির ওপরে। খালি গা, ঠেঁটি কাপড় পরনে। কালো কুচকুচে হাড় বের করা শরীর সম্পূর্ণ অনাবৃত; গলায় ক্ষারে কাচা পৈতেটা মালার মতো করে জড়ানো।

মাথার ঝোঁটা টিকিটায় এমন কায়দা করে গিঁট দেওয়া হয়েছে যে সেটা নেতিয়ে পড়েনি, বেশ দৃঢ় আত্মমর্যাদায় একটা রেফের আকারে আকাশকে সংকেত করছে।

সম্ভাষণের আগেই বংশী মাস্টার এক পলকে জিনিসটা বিশদভাবে অনুধাবন করবার চেষ্টা করলে। সত্যিই দেখবার এবং পুলকিত হওয়ার মতো। তুজন লোক যে রকম ঘর্মাক্ত দেহে ওই ক্ষীণ দেহযষ্টিটিকে দলাই মলাই করছে, ঘোড়া কিংবা তেজালো মহিষ না হলে তা বরদাস্ত করা শক্ত। কালো শরীরটি থেকে যেন আলো পিছলে পড়ছে, অন্তত সেরখানিক তেল খরচ হয়ে গেছে তাতে সংশয়মাত্র নেই।

কিন্তু ওই প্রচণ্ড মর্দন ব্যাপারেও চট্টরাজ সম্পূর্ণ অনাসক্ত। তৈল-সিঞ্চনে চির-অভ্যস্ত নায়েবের ওতে আর ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। হাতের হুঁকোটা থেকে নিয়মিত ধূমপান করছেন এবং সেই সঙ্গে কথামৃত বর্ষণও চলছে সমানভাবে।

বেশিক্ষণ নীরবে দেবদর্শনের সৌভাগ্য হল না মাস্টারের। চট্টরাজ তাকে দেখতে পেলেন। নায়েবের হিসেবী চোখ, প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে ভুল হল না।

—এই যে, নমস্কার। আসুন আসুন।

প্রতিনমস্কার করে মাস্টার এগিয়ে এল।

—আপনি এখানকার স্কুলের মাস্টার নয়?

বংশী মৃদু হেসে বললে, আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু আপনি চিনলেন কী করে?

—আরে এই বয়সেও মুখ দেখে মানুষ ঠাহর করতে পারব না? আপনি হাসালেন মাস্টার মশাই। আসুন, বসুন এখানে।

একটা জলচৌকির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন চট্টরাজ। বংশী বসল। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, একটা পাখা নিয়ে পিছনে মাটিতে বসে বাতাস করছে মহিন্দর। এইবারে কথা বলবার সুযোগ পেল সে: হামাদের মাস্টার খুব পণ্ডিত, ঢের নিখিছে, ছাপার হরফে কথা কহিবা পারে নায়েব মশাই।

—তাই নাকি?—অপত্য স্নেহের মতো একটা কোমল হাসি হাসলেন চট্টরাজ: বেশ, বেশ। কিন্তু পণ্ডিত হলেও তো ব্যাটাদের লাভ কি রে? তোদের বিদ্যে তো ওই জুতো সেলাই পর্যন্ত। তোদের পক্ষে পণ্ডিত মাস্টার যা—একটা গোরুও তো তাই। কী বলিস রে?

নিজের রসিকতায় নায়েব মশাই হাসলেন, মহিন্দর হাসল। যারা পা টিপছিল তারাও হাসল। কিন্তু চট্টরাজ আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন, বংশী মাস্টার হাসল না। জ্র তুটোকে একটু কুঞ্চিত করলেন সন্দিগ্ধ ভাবে, তারপর হুঁকোয় একটা লম্বা টান দিলেন।

—কতদূর পড়েছেন আপনি?

—এই সামান্য সামান্য।

—ইস্কুলে পড়েছেন?

—হাঁ, তাও পড়েছি।

হুঁকোটা মুখের সামনে খাড়া রেখে খানিকক্ষণ চোখ মিট মিট করলেন চট্টরাজ: নর্ম্যাল পাস করেছেন?

—না, তা করিনি।

—ওঃ, নর্ম্যাল পাস করেননি!—নায়েবের গলার স্বরে যেন স্বস্তির আভাস পাওয়া গেল: আমিও গোড়ার দিকে পণ্ডিতী করেছিলুম কিনা। নর্ম্যাল পাস করেই শুরু করি। আর তখন পড়েছিলুম 'মেঘনাদ বধ কাব্য'—আহা, তার কী ভাব!

চট্টরাজ হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। মেঘনাদ বধের স্মৃতিতে তাঁর চোখ বুজে এল, কণ্ঠ হয়ে উঠল আবেগবিহ্বল। হুঁকোসুদ্ধ হাতখানা একদিকে, আর একখানা আরেকদিকে এমন ভাবে বাড়িয়ে দিলেন যেন কাউকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন তিনি। তারপর বিশ্রীভাবে শুরু করে দিলেন:

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর চূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি
তোমা হেন ধনে!
হায়রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি?
কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে?"

যন্ত্রণা যে অসহ্যই হচ্ছে তাঁর মুখ দেখলে সে সম্পর্কে আর ভুল করবার কারণ থাকে না। এবারে বংশী মাস্টারের সত্যিই হাসি এল—কিন্তু এ অবস্থায় আর যাই হোক হাসা চলে না।

চট্টরাজ হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠ এবং বাহু-তাড়নায় ইতিমধ্যেই অঙ্গসেবাটা বন্ধ হয়ে গেছে, থেমে গেছে মহিন্দরের হাতের পাখা। হাঁ করে সব তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। সবার ওপর দিয়ে গর্বিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চট্টরাজ বললেন, কী বলেন মাস্টার মশাই, ঠিক হয়নি?

—আজ্ঞে চমৎকার হয়েছে।

—তবু তো বয়েস নেই—চট্টরাজ বললেন, এককালে যাত্রাও কর্বেছিলুম। কিন্তু কী আর করব মশাই, পেটের তাগিদে রস-কষ কিছু কি আর রইল? কাব্যটাব্য আর নেই এখন, এখন শুধু বাকি-বকেয়া, আদায় তশীল, লাটের কিস্তি আর দেওয়ানীর হাঙ্গামা।

—আজ্ঞে সে তো বটেই।—বিনীত ছাত্রের মতো মাথা নাড়ল মাস্টার।

—যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভারী আনন্দ হল। তা এখানে আপনার ছাত্রেরা

পড়ে কেমন ?

—ভালোই পড়ে।

—হুঁ, ভালোই পড়ে !—চট্টরাজ মুখ বিকৃত করলেন : এরাও পড়বে, উচ্চিংড়েও হবে শিকরে বাজ। জেলাবোর্ড ইস্কুল করে দিয়েছে—এইড্ দিচ্ছে। আপনার মতো একটি ভদ্র-সন্তান ছুটি করে খাচ্ছেন—এই যথেষ্ট। কী বলেন, অ্যাঁ ?—নায়েব হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলেন, মুখটা একবার কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে নিলে বংশী মাস্টার। কথার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো থুথু ওড়ে চট্টরাজের। মাস্টার জবাব দিলে না, অল্প একটু হাসল মাত্র।

—আপনার দেশ কোথায় মাস্টার মশাই ?

—ফুলবাড়ী।

—কোন ফুলবাড়ী ?—নায়েব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—দিনাজপুর।

—ওঃ, হিলির পরে সেই ফুলবাড়ী ? বেশ বেশ। তা ফুলবাড়ীর কোথায় আপনার বাড়ি ?

বংশী একবার কপালটাকে মুছে নিলে : ওই স্টেশনের কাছেই।

—স্টেশনের কাছেই ? কোন্ বাড়ি বলুন তো ?

বংশী একটা ঢোঁক গিলল. পরামাণিক বাড়ি।

—পরামাণিক বাড়ি !—চট্টরাজ বললেন, ঠিক চিনলাম না তো। ওখানেই আমার মামার বাড়ি কিনা। কোন্ পরামাণিক ?

বংশীর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল : জলধর পরামাণিক।

—অঃ !—চট্টরাজ বললেন, তা হলে নতুন পত্তন। আমি যখন আগে গেছি তখন দেখিনি সে বাড়ি।

অকূলে যেন কূল পেল বংশী : হাঁ হাঁ, নতুন পত্তন। মাত্র সামান্য কিছুদিন—

—অঃ—চট্টরাজ এবার চুপ করে গেলেন। তারপর হুঁকোয় আর একটা টান দিলেন। কিন্তু বুকের ভিতরে তখনও দুরুদুরু করছে মাস্টারের। যদি ওইখানেই চট্টরাজ না থামেন, যদি আরো আগেবার খবর জানবার জন্যেও তাঁর কৌতূহল প্রখর হয়ে ওঠে তবে সে অবস্থাটা সুখের হবে না। মরিয়া হয়ে যা খুশি একটা বলে দেবে—কয়েম্বাটুর কুয়ালালামপুর কিংবা কামস্কাটকা। কিন্তু চট্টরাজ আর প্রশ্ন করলেন না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনলুম, আপনি নাকি এখানকার ইস্কুলে সরস্বতী পূজো করতে চাইছেন।

—হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।

মাঝখানে কথায় আবার একটা ফোড়ন দিলে মহিন্দর : হুঁ, মোরা ঠিক কইরু।

চট্টরাজ ধমক দিলেন : তুই চুপ কর দেখি। সব কথায় তোদের কথা কইতে আসা কেন ? যাকে জিজ্ঞেস করছি সে-ই জবাব দেবে।

—হুঁ, সিটা তো বটে।—মানী লোক মহিন্দর নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

চট্টরাজ আবার বংশীর দিকে তাকালেন : পূজো তো করবেন কিন্তু কেমন করে করবেন ?

—যেমন করে পূজো হয়।

—তা তো হবে না।—চট্টরাজ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন : পুরুত তো পাবেন না। কোনো বামুন রাজী হবে না চামারের পূজো করতে।

—তা হয়তো হবে না।

—তা হলে ?

—আমরাই পূজো করব।

—আপনারা !—জলচৌকির ওপরে প্রায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন চট্টরাজ : তার অর্থটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মন্ত্র পড়বে কে ?

বংশী মৃদু হাসল : দরকার হলে আমিই পড়বো।

—আপনি !—চট্টরাজ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন : আপনি কী জাত ?

—পরামাণিক।

—পরামাণিক ? নাপিত ?

—হাঁ, তাই।—বংশী শান্ত স্বরে জবাব দিলে।

—আপনার কি মাথা খারাপ ?

—না, মাথা আমার ঠিকই আছে।

—অঃ !—চট্টরাজ আশ্চর্যভাবে সংযত হয়ে গেলেন। তারপর মাস্টারের দিকে শাণিত দৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাপিতও আজকাল বামুন হয়ে উঠেছে নাকি ?

—দোষ কী !

—হুঁ ?—চট্টরাজ তেমনি সংযত স্বরে বললেন, পূজো করা ছেলেখেলা নয়, তা জানেন ?

—জানি।

—হিন্দুধর্ম হেলাফেলার জিনিস নয়, সেটা জানেন ?

—হ্যাঁ, তাও জানি।

হুঁকোর আগুনটা নিবে গিয়েছিল, কলকেটাকে এবারে মাটিতে ঝেড়ে ফেললেন চট্টরাজ : তবুও আপনি পূজো করবেন ঠিক করেছেন ?

—তাই তো ভাবছি।

—আচ্ছা, করুন। মন্দ কী। কলিকাল—এই চামার ব্যাটারাও কবে পৈতে গলায়

দিয়ে চাটুয্যে বাড়ুয্যে হয়ে উঠবে বোধ হয়। কিন্তু এটা জানেন তো, জমিদার এই গ্রামের মালিক? দেশটা একেবারে অরাজক নয়?

—তা জানি।—বংশী চাপা ঠোঁটে বললে, ইস্কুলটা কিন্তু জেলা বোর্ডের, জমিদারের সম্পত্তি নয়।

—হুঁ, আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি। যাক—আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দ হল। পরে আসবেন এক সময়—চট্টরাজ হাত তুললেন।

—নমস্কার।—সম্ভাষণ জানিয়ে বংশী বিদায় নিলে।

ছয়

সকালে পৌঁছেই খুব হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে সুরেন, যেন কোথা থেকে মস্ত একটা দিগ্বিজয় সেরে এসেছে। বাড়ির দরজা তখনো খোলেনি, চড়া গলায় সুরেন চ্যাঁচাতে লাগল: একটা মানুষও যে সাড়া দেয় না হে, সব মরি গেইল্ নাকি?

যোগেনের মা বেরিয়ে এল বিরক্ত হয়ে: অমন চিল্লাছিস ক্যানে? হৈল্ কী?

—হৈল্ কী?—সুরেন ক্ষেপে উঠল: চউখ নাই, দেখিবা পাও না?

সত্যিই দ্রষ্টব্য। সুরেন বউ আনেনি, কোত্থেকে একটি মেয়েকে এনেছে যোগাড় করে। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে—কপালে উল্‌কির দাগ। ভীরু চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে নতুন পরিবেশটাকে অনুধাবন করতে চাইছে।

—ওমা!—যোগেনের মা চোখ কপালে তুলে আনলে: ই কাক্ নি আলু?

—ফের কাক্? হামার শালী।

—আইস মা, আইস।—যোগেনের মা আপ্যায়ন করলে: তা ইয়াক তো লিয়ে আইলি, বউক্ কুনঠে রাখি আলি?

—মা মরি গেইছে, বউ কাঁদোছে। হামাক্ কহিলে, কয়দিন বাপের ঠাঁই থাকিমু, তুমি বহিনটাক্ লিয়ে যাও। উয়াক্ তো এখন দেখিবার কেহ নাই। বড় হইছে, বাড়িত্ দেখিবার মানুষ নাই—কয়টা দিন থাকি আসুক।

যোগেনের মা বললে, তো বেশ। তুমার নাম কী মা?

মেয়েটি নির্জীব গলায় বললে, সুশীলা।

—সুশীলা? আইসো মা, বাড়ির ভিতর আইসো।

সুশীলা নীরবে সসংকোচে অগ্রসর হল। যোগেনের মা এক পলক তাকিয়ে দেখল, তার চোখ দুটো লাল—মুখখানা ফোলা ফোলা। বোঝা গেল সারারাত কেঁদেছে মেয়েটা, মায়ের শোকেই চোখের জল ফেলেছে। কেমন একটা করুণায় যোগেনের মার মন ভরে

গেল, মনে হল সত্যিই বড় ভালো মেয়েটি—রসিক চামারের মেয়ের চাইতে অনেক ভালো।

যোগেন কোথায় বেরিয়েছিল। ফিরল বেশ বেলা করে। বাড়ির সামনে পৌঁছুতে দেখে বাইরের দাওয়ায় বসে চামড়া কাটছে সুরেন। যোগেনকে দেখে মুখ বিকৃত করল।

—এই যে লবাব-পুত্তুর, হাওয়া খাই ফিরিলা ?

যোগেন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুরেন আবার জিজ্ঞাসা করলে, হারাণ এখনো ফিরেনি বাড়িত্ ?

—না।

—কুন্ঠে গেইছে হারামজাদা ?

—হামি কহিবা পারি না।

—সিটা পারিবা ক্যানে ? খাছ, দাছ, গায় ফুঁ দিই বেড়াছ। হামি খাটি খাটি মরি গেইনু। তুমাদের ভাবনা-চিন্তা তো কিছু নাই। ইবারে উ শালা আসিলে জুতা মারি বাহির করি দিমু বাড়ির থাকি।

—তো দিয়ো। খালি খালি হামার উপর চিল্লাছ ক্যানে ?

—চিল্লামু না ?—চটে গিয়ে অশ্রাব্য গালাগালি শুরু করলে সুরেন। ঠিক চটে গিয়েও নয়, এটাই অভ্যাসে দাঁড়িযে গেছে সুরেনের। খুব খানিকটা বকাবকি করতে না পারলে স্বস্তি বোধ হয় না, কাজে মন বসতে চায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই পর্বই চলতে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। অতএব যোগেন আর দাঁড়ালো না, সোজা বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল।

আর সেই মুহুর্তেই দৃষ্টি থমকে গেল যোগেনের। উঠোনে শীতের নরম রোদ্রে বসে চালের খুদ্ ঝাড়ছিল একটি কিশোরী মেয়ে। চমকে দাড়িয়ে পড়ল যোগেন। প্রথম সূর্যের আলোয় ঝলমল করে ওঠা কিশোর কোমল মুখখানি ভারী চমৎকার লাগল, বড় সুন্দর লাগল শান্ত দুটি চোখের চকিত দৃষ্টি। পিঠের ওপর রাশি রাশি কোঁকড়া চুল ভেঙে পড়েছে, সবটা মিলিয়ে যেন অপূর্ব একখানা ছবির মতো বোধ হল যোগেনের।

তারপরেই এল বিস্ময়। কে এ, কোত্থেকে এল ? গ্রামের কেউ নয়, এমন ঢলঢলে মুখ নেই গ্রামের কোনো মেয়ের—সকলকেই সে চেনে। আকস্মিকভাবে তাদের বাড়িতে এমন একটি মেয়ের আবির্ভাব ঘটল কী করে ?

পাশের ডোবাটা থেকে বাসন মেজে খিড়কি দিয়ে ঘরে ঢুকছিল যোগেনের মা। একবার তাকালো ছেলের দিকে, একবার তাকালো নতমুখিনী মেয়েটির প্রতি। তার পরে মৃদু হাসল।

—উ সুরেনের শালী—সুশীলা। অর মা মরি গিইছে, তাই কয়টা দিনের জন্ম এইঠে বেড়াবা আসিছে। বড় ভালো মেইয়া সুশীলা।

—ওঃ —যোগেন ঘরের ভেতর চলে গেল।

অনেকগুলো নতুন গান মনে এসেছে, তাই লিখতে বসবার ইচ্ছে ছিল যোগেনের। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসেও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পথে চলতে চলতে যেগুলো নীহারিকার মতো আকারহীনভাবে মনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা সুস্পষ্ট রূপ নেবার চেষ্টা করছিল, যে গানের কলি গুন্ গুন্ করে ভেসে আসছিল বার বার—হঠাৎ তাদের সবগুলি যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। একটা নতুন কিছুর সঞ্চার হয়েছে সেখানে, এতক্ষণের গুছিয়ে-আনা সূত্রগুলিকে আর যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ আকস্মিক বাধাটা চেতনাকে বিস্বাদ করে দেয়নি—বরং ভালোই লাগছে। একটা অর্থহীন ভালো লাগা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে বুকের ভেতরে।

বেশ মেয়েটি। ফুলের মতো ঢলঢলে মুখ। নামটিও সুন্দর—সুশীলা। যোগেন ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছে, সুশীলা কথাটা সে জানে, অর্থও বোঝে। চেহারার সঙ্গে নামটির কোথায় বেশ চমৎকার সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল যোগেনের। ভারী মিষ্টি করে নত চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল তার দিকে। সোনালি রোদে কালো চোখ দুটি তার জ্বলজ্বল করে উঠেছিল লজ্জায় আর কৌতূহলে।

কালিতে কলম ডুবিয়ে যোগেন আচড় কাটতে লাগল এক্সারসাইজ্ বুকের রুল করা পাতার ওপরে। হঠাৎ মনে হল, ভারী চমৎকার আজকের সকালটা। কাঁচা চামড়া, জুতোর কালি আর বাড়ির পেছনের স্তূপাকার পচা গোবরের গন্ধকে ছাপিয়েও একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। কিসের গন্ধ, ঠিক বোঝা যায় না। ঘাসের, না শিশির-ভেজা মাটির, না অচেনা একটা ফুল ফুটেছে কোনোখানে? ভারী ভালো লাগতে লাগল। মাস্টার যে গান-গুলো শিখিয়েছে, তারা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে এই নতুন অনুভূতিটিকে প্রসন্নমুখে পথ ছেড়ে দিলে। আরো খানিকক্ষণ কাগজে আঁচড় কাটলে যোগেন, কলমটা কামড়ালো বার কয়েক, আস্বাদন করে নিলে মনের এই লঘু চঞ্চলতাকে, সকালের এই মাদকতাকে, বাইরের এই বিস্ময়বিচিত্র অপরিচিত গন্ধটাকে। কান পেতে শুনল, মেয়েটি মাঝে মাঝে তার মায়ের সঙ্গে কথা কইছে। কী বলছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু কথার সুরটা বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা গানের রেশের মতো যোগেনের কানে বাজতে লাগল।

তারপরেই লিখতে শুরু করলে যোগেন।

খানিকক্ষণ লিখেই সে চকিত হয়ে উঠল। আরে, আরে—এ কী হচ্ছে! এ তো আল্‌কাপের পালা নয়, রসের গানও নয়। এ যে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস! নিজের লেখাটার দিকে যোগেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল:

তোমারে দেখিলাম হে সুন্দরি,
মরি মরি!

কালো দুটি নয়ন যেন ভ্রমর উড়ি যায়,—
ফুলের মতন বদন যেন সুগন্ধ বিলায়,—
পলকে দেখাইয়ে ও রূপ
　　　　পরাণ লিলে হরি—
　　　　মরি মরি!
রাজার কইন্যা কেশবতী, মেঘের মতন চুল,
দেখাইয়া সকল হিয়া করিলা আকুল
তোমার রূপে মন মজিল—
কি করি, সুন্দরি!

এ কার রূপ? এ কার বন্দনা?

যোগেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, সন্ধ্যাবেলাতেই যোগেনের মা কথাটা পাড়ল সুরেনের কাছে। বড় বড় গ্রাসে সুরেন মুখে মোটা মোটা লাল চালের ভাত তুলছিল কড়াইয়ের ডাল মেখে। মায়ের কথায় সে চোখ বিস্ফারিত করলে।

—কী কহিলা?

—কহিনু তো ভালোই।

—ভালোই কহিলা?—সুরেন এবার চোখ পাকালো দস্তুরমতো: ইটাক্ ভালো কথা কহিছ তুমি? ইটা কেমন ভালো কথা?

—ক্যানে, ছেইল্যা খারাপ নাকি হামার?

—ছেইল্যা তো তুমার লবাব-পুত্তুর, উয়াক খারাপ কহিবে, এমন মাথা আছে কার ঘাড়ত্? কিন্তু উসব ছাড়ি দাও এখন।

—ক্যানে, ছাড়িমু ক্যানে?—মার এবার রাগ হল।

সুরেন চড়া গলায় বললে, ক্যানে ছাড়িবা না? তুমার ছেইলা তুমি নি চিন! দিনরাত এইঠে ওইঠে ঘুরি বেড়াছে, ঘরের আধখানা কামেও নাগে না। উয়ার সাথ বিহা দিলে মেইয়াটার দুঃখের শেষ রহিবে না।

—হুঁ, ত্তোক্ কহিছে!—মা রাগ করে বললে, ছোয়াপোয়া কবে সংসার লিয়ে বুঢ়ার মতন বসিবা পারে? বিহার আগে তোমহাক্ হামি দেখি নাই? বাপ যদ্দিন আছিল্, খাটি খাটি মইচ্ছে বুঢ়া, তুমিও তো লবাবী করি ঘুরি বেড়াছ। তুমার বিহা আটক থাকে নাই তো, উর বিহা ক্যানে থাকিবে?

সত্যটা অনস্বীকার্য। আজকের বৈষয়িক এবং বিচক্ষণ সুরেন চিরদিনই এমন পাকা

হিসেবী ছিল না, তারও পেছনে আছে ছেলেবেলার অনেক কুকীর্তির ইতিহাস। তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে জড়িয়ে পড়েছিল একটা রাহাজানির মামলায়, অনেক খেসারত দিয়ে বাপ তাকে উদ্ধার করে আনে সে-যাত্রা। স্থরেন আজকে অবশ্য সাধু মহাত্মা সেজে বসেছে, কিন্তু মাকে বেশি ঘাঁটাতে গেলে এমন বহু ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে যার তুলনায়—

স্থতরাং প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দিলে স্থরেন।

—একটার বিহা দিয়া তো দেখিলা। ওই হারামজাদা হারাণ—

মার মুখ বেদনার্ত হয়ে উঠল: উটার কথা ছাড়ি দে ক্যানে বাপ। উটা হামার ব্যাটা নহ, শয়তানের ছাও। বহুত পাপ করিছিনু, তাই হামার প্যাটে আসি জুটিলে। তো হামার যোগেন অমন হয় নাই—তুমরা দেখিবেন, ওই ব্যাটাটাই হামার মান রাখিবে, তোদের নাম রাখিবে।

স্থরেন মুখ বিকৃত করে বললে, রাখি দাও, রাখি দাও। ওই যে কহছে না?—

হাথী ঘোড়া ডহ না জানি,
ব্যাং কহে ক্যাতে পানি?

যোগেনের মা বললে, তু থাম্ না কেনে? হামি দেখিমু।

—ত দেখিয়ো। স্থশীলার বাপক্ কহ, যদি বিহা দিবা চাহে, তবে না?

—তাই কহিমু। মেইয়াটাক্ বড় ভালো নাগিছে হামার।

—হুঁ।—স্থরেন আর কথা বাড়ালো না, অতিকায় একটা ভাতের গ্রাস পুরে দিলে মুখের মধ্যে, গলা পর্যন্ত আটকে গেল। তার এসব বাজে কথা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করবার মতো উৎসাহ নেই।

কিন্তু কথাটা চাপা রইল না। শেষ পর্যন্ত কানে এলো যোগেনেরও।

প্রেম কাকে বলে, অন্তত নারীর রহস্য সম্পর্কে যোগেন এখনও যে একেবারে নাবালক তাও নয়। শহরে থাকতেই এ ব্যাপারে প্রথম দীক্ষালাভ হয়েছিল তার। একটা বখাটে সঙ্গী জুটিয়েছিল, সে-ই তাকে চাপা গলায় ফিস ফিস করে মাদকতাভরা একটা মায়া-লোকের সন্ধান দিয়েছিল। প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিল যোগেন। বলেছিল, না, না, হামার ভর নাগে।

বন্ধু বলেছিল, পুরুষ মানুষ না তুই?

তারপর সেই অন্ধকার সন্ধ্যা। প্যাচপেচে গলির ভেতরে সারি সারি খোলার বাড়ি। মফস্বল শহরের মিটমিটে আলোয় কানা গলিটা যেন ভূতুড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দুটি-একটি মেয়ে, অল্প অল্প আলোয় তাদের ভালো করে চেনা যায় না। খোঁপায় এক এক ছড়া করে ফুলের মালা জড়িয়ে নিয়েছে, বিড়ি টানছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু দূরে দেশী মদের দোকান, প্রচণ্ড হল্লা উঠছে সেখান থেকে।

তাদেরই একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দুজনে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কত ?

মেয়েটি অনাসক্তভাবে বিড়ি টানতে টানতে বলেছিল, কতক্ষণ ?

—এক ঘণ্টা।

—এক এক টাকা করে লাগবে দুজনের।

—আট আনা করে হবে ?

মেয়েটি কটু ভাষায় গাল দিয়ে বলেছিল, ওদিকের ওই বুড়ীর কাছে যাও, দু আনায় রফা হয়ে যাবে।

তারপর বারো আনা করে দাম ঠিক হয়েছিল। ঝিয়ের দু আনা, পান খাওয়ার এক আনা। মেয়েটির হাত ধরে ভেতরে ঢুকেছিল সঙ্গী—পেছনে পেছনে যোগেন।

ঘরের মেঝেতে ময়লা রাজশয্যা। ছোট ছোট তাকিয়া। হারমোনিয়ম, তবলা-ডুগি। কিন্তু এক ঘণ্টা সময়ের মেয়াদ মেয়েটি তাড়াতাড়িই শেষ করে দিতে চেয়েছিল।

তারপর—

তারপরের কথা মনে পড়লে এখনো যোগেনের শরীর শিউরে ওঠে—চোখ বন্ধ হয়ে আসে। নির্লজ্জ কুশ্রীতার চূড়ান্ত রূপ দেখেছিল যোগেন, দেখেছিল কত অবলীলাক্রমে ঘরভরা আলোতেও সে বীভৎসতার লীলা। যোগেন থাকতে পারেনি, ছুটে পালিয়ে এসেছিল, বাড়িতে ফিরে সেই রাত্রেও কুয়ো থেকে ঘটি ঘটি জল তুলে স্নান করেছিল। আর সেই থেকেই মনটা অদ্ভুতভাবে বিমুখ আর বিতৃষ্ণ হয়ে গেছে নারী-দেহের সম্পর্কে—চোখের সামনে সে কদর্যতার ছবি এখনো জ্বলজ্বল করছে তার।

গ্রামে যখন ফিরে এল তখন তার মনটা ও সম্পর্কে বিচিত্রভাবে স্থির আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে। মেয়েদের দেখে, ভালো লাগে তাদের হাসি-গল্পের গুঞ্জন, কিন্তু তার অতিরিক্ত কিছুই সে কল্পনা করতে পারে না। একটি মাত্র আঘাতেই একটা আশ্চর্য নিস্পৃহতা সঞ্চারিত হয়েছে যোগেনের মধ্যে,—প্রথম যৌবনের সহজ মোহাচ্ছন্নতাটা রূপান্তরিত হয়েছে একটা শান্ত বিতৃষ্ণায়।

বেশ ছিল এতদিন—কিন্তু এ কী !

মনের একটা একমুখী প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠছিল জীবন সম্পর্কে একটা নিশ্চিন্ত দৃষ্টি। বংশী মাস্টার। আগুনের মতো জ্বলজ্বলে চোখ। গলার স্বরে মেঘমন্দ্র গম্ভীরতা। এ কাজ তুমিই করতে পারবে যোগেন, এর দায়িত্ব একমাত্র তুমিই নিতে পারো। তুমি কবি, তুমি শিল্পী, এর ভার তুমি না নিলে আর কে নেবে ?

গা ছম ছম করে উঠেছিল, রক্ত চন চন করে উঠেছিল। কাজ করতে হবে অনেক বড়, অনেক কঠিন কাজ। জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের অন্যায়। ব্রাহ্মণেরা তাদের ছুঁতে চায় না, মুচির পুজোয় পৌরোহিত্য করতে রাজী হয় না তারা। প্রতিকার চাই এর,

প্রতিবিধান চাই। কথা দিয়ে যা বলা যায় না তাকে গান দিয়ে বলতে হবে; কানের কাছে যা শুধু ব্যর্থ আঘাত দিয়ে যায়, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনের ভেতরে—সঞ্চারিত করে দিতে হবে বুকের রক্তধারায়। চারণেরা পথে পথে বীণা বাজিয়ে বেড়ায়, ডাক দেয় মানুষকে, জাগিয়ে তোলে তাদের, হাতে এগিয়ে দেয় খোলা তলোয়ার। যোগেন কি হতে পারে না তাদের মতো? না, শুধু তাদের মতোই নয়—তাদের চাইতে বড়, ঢের বড়!

কথাগুলো বলেছে বংশী মাস্টার। গলার স্বরে যেন মেঘ ডাকে। চোখে যেন খর-বিদ্যুৎ চমক দিয়ে যায়। বর্ষার সময় দু কূল ভরে ওঠা কাঞ্চন নদীর ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো একটা উগ্র ভয়ঙ্কর কলধ্বনি কানে এসে লাগে, একটা অজানা ভয়ে, একটা অনিশ্চিত সংশয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে—স্তব্ধ মধ্যরাত্রে ওই শব্দটা শুনে শুনে চোখে ঘুম আসতে চায় না।

কিছু একটা নতুন করতে যাচ্ছে যোগেন। পা বাড়িয়েছে সংশয়াকীর্ণ ভয়ঙ্করের পথে। যার ভবিষ্যৎ অজানা—যার পরিণতি দুর্বোধ্য। লড়াই করতে হবে—লড়াই করবার উৎসাহ দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে এই চাষা-চামারদের। যারা সকলের পায়ের তলায়, সকলের পায়ের জুতো যোগানো ছাড়া বাঁচবার আর কোনো অর্থই নেই যাদের কাছে।

মাস্টারের নির্দেশমতো এই গানটা লিখেছিল সে:

হায় হায় দেশের একি হাল,
যারা ক্ষেতে যোগায় ফসল,
তার ঘরত্‌ই নাইরে চাল।
মুখের গরাস লিলে কাড়ি,
লিলে জমি, লিলে বাড়ি,
বড় লোকের জুলুমবাজী
সহিমু আর কতকাল,
হায়রে কহ, দেশের ইটা কেমন হাল।

এই তো সত্যিকারের গান, এই তো মানুষকে জাগিয়ে তোলার সুর। এই সুরেই এবারে গান বাঁধবে যোগেন। আল্‌কাপের গান নিয়ে আর সে শুধু তামাসা তৈরি করবে না, দেখিয়ে দেবে জীবনের সত্যিকারের তামাসাটা কোন্‌খানে। তারা জানবে, তারা বুঝবে, তারা বাঁচতে শিখবে। আর—আর শিখবে এর প্রতিবিধান করতে।

—সুশীলা, সুশীলা!

যোগেন উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মা ডাকছে। সুশীলা। দিব্যি নাম—গানের মতো মিষ্টি। কান পেতেই রইল যোগেন। মা ডাকছে—সুশীলা?

মিষ্টি গলার সাড়া পাওয়া গেল, কী কহছেন?

—উঠানে ধান সিদ্ধ চড়াইছি। উটাক একটু লাড়ি দে মা, ধরি যিবা পারে নাগোছে।

—যাছি হামি।

বেশি কথা বলে না সুশীলা, প্রায়ই চুপ করে থাকে। লক্ষ্য করেছে যোগেন, শান্ত অনাসক্তভাবে বসে থাকে দাওয়ায়, দৃষ্টি মেলে দিয়ে রাখে আকাশের দিকে। বিহ্বল চোখ, অপূর্ব একটা করুণতায় ভরা। ওই তো এতটুকু মেয়ে, তবু চঞ্চলতা নেই, ছটফটানি নেই। কী একটা পেয়েছে মনের মধ্যে, পেয়েছে একটা স্থিরতা। সব সময়েই ভাবে, কী ভাবে কে জানে। নতুন জায়গায় এসে পড়বার সংকোচ? অপরিচিত মানুষের ভেতরে এসে একটা স্বাভাবিক অস্বস্তি? হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। যোগেন মাঝে মাঝে ফেলেছে চোরা চাহনি, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেছে ওর পিঠ-ভাঙা রাশি রাশি কালো চুল একবার হাতে তুলে নেয়, ওর মুখখানা তুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে বোবা ভাবনায় আচ্ছন্ন দুটি কালো চোখের অতলে।

মেয়েদের একটা রূপ সে দেখেছে—সে সেই মহকুমা শহরে। সেই প্যাচপেচে বিশ্রী গলিতে, সেই লণ্ঠনের আলোয় উদ্ভাসিত খোলার ঘরের ময়লা বিছানায়। কিন্তু এ তো তা নয়। এ নতুন—এ বিচিত্র। সেদিন বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, আজ বুকের ভেতরে কী একটা ঢেউয়ের মতো দোলা খেয়ে খেয়ে উঠছে। সেদিন দেহের ভেতরে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই দেহই রূপ ধরেছে অপূর্ব একটা ইন্দ্রজালের মতো।

সুশীলা—সুশীলা! জমিদারের অত্যাচার সত্য, মহিন্দরের অপমানটা সত্য, বংশী মাস্টারের কথাগুলোও নির্ভুল সত্য। কিন্তু এও তো সত্য। নিজের ভেতরে এই দোলাটাও তো আজ কোনো দিক থেকেই এক বিন্দু মিথ্যে নয় যোগেনের কাছে! কিছুক্ষণের জন্যে যেন সে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল, সুর দিয়ে যেতে লাগল নিজের লেখা সেই গানটিতেই:

রাজার কইন্যা কেশবতী, মেঘের মতন চুল
দেখাইয়া সকল পরাণ করিলা আকুল
তোমার রূপত্ মন মজিলে—কি করি,
হে সুন্দরি!

—হাঁরে, ও যোগেন!

স্বপ্ন কেটে গেল। বাজখাঁই কটকটে গলা। সুরেন ডাকছে। যোগেনের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হল—আর ডাকবার সময় পেল না নাকি সুরেন?

—হাঁরে যোগেন, মইল্লু নাকি?

নিশ্চয় তাড়ি খেয়েছে, গলার স্বরে বোঝা যায়, বেশ চড়া হয়ে আছে সুরেনের মেজাজ। এখন সাড়া না দিলে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দেবে।

কলম ফেলে যোগেন উঠে এল: কী, কহোছ কী?

—কী আর কহিমু, হামার মুণ্ডু কহোছি।—সুরেন মুখভঙ্গি করলে : ঘুমের ব্যাঘাত্ হৈল্ নাকি লবাবের ছোয়ার ?

—খালি খালি ক্যান্ গালি দিবা নাগিলে ?

—নাগিমু না ? হামি খাটি খাটি সাড়া হই গেনু, হামার ভাই আল্কাপঅলা হই টৈবুহি বাগাই বাগাই বেড়াছে। হামি আর পারিমু না—সাফ কহি দিনু—হাঁ !

যোগেন বিতৃষ্ণ সুরে বললে, তো কী করিবা হেবে, সিটাই আগে সাফ করি কহ না ?

—তাইতো কহিবা চাহোছি। আলকাপঅলাক্ সংসারের কামও তো করিবা নাগে। একবার আজই চামারহাটা যিবা হেবে তোকে।

—ক্যানে, চামারহাটা ক্যানে ?

—ওইঠে আজই নায়েব আসোছে। উয়ার সাথ দেখা করিবা নাগিবে।

যোগেনের সমস্ত মন ভরে গেল অপ্রসন্নতায় : নায়েবের সাথ দেখা করি হামি কী কামটা করিমু ?

—বাঃ, শালা মহিন্দরের সাথ মামলা হছে না ? নায়েবের সাথ কথা কহিবা হেবে।

বিরক্তি এবং ক্রোধে, আর সেই সঙ্গে সেদিনকার সেই অপমানের স্মৃতিতে সর্বাঙ্গ যেন শক্ত হয়ে উঠল যোগেনের : হামি নি পারুম।

সুরেন চেঁচিয়ে বললে, ক্যানে ?

—ক্যানে ফের কী ? সব শালাই সমান হছে, যেমন মহিন্দর, তেমন নায়েব। কাঁউক ত্যাল্ মাখাই কোনো কাম হেবে না। ওই দুই শালার মাথায় ডাং মারি মগজ ফাঁক করি দিবা নাগে।

—হায়রে বাপ, ইটা কী কহিলুরে ? বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সুরেন তাকিয়ে রইল : নায়েবক ডাং মারিবা চাহোছিস, খুব তো বুকের পাটা হছে তোর।

—সিটা হছে—

আর অপেক্ষা না করে যোগেন চলে গেল সামনে থেকে।

—পারবু না তুই ?

—কহিছিই তো—

যোগেন অদৃশ্য হয়ে গেল, তাড়ি খাওয়া গলায় সমানে চিৎকার চালিয়ে চলল সুরেন। আর সেইদিনই সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল যোগেনের জীবনে।

সবে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এই সময় বাড়ি ফিরল যোগেন। এটা ব্যতিক্রম—এমন সাধারণত হয় না। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরতে একটু বেশি রাতই হয় তার। কিন্তু কী যেন হয়েছে আজ—মনটা যেন ক্রমাগত বাড়ির দিকে ঘুরে ঘুরে আসছে। আজ বাড়ি শুধু বাড়িই নয়, একটা নতুন রূপ খুলেছে তার—একটা নতুন বৈশিষ্ট্য বিকসিত হয়ে

উঠেছে। সুরেনের গালাগালি, কাঁচা চামড়ার গন্ধ, বাড়ির পেছনে গোবরের স্তূপ—সব মিলিয়ে এর যে একটা অপ্রীতিকর রূপ ছিল, আজ যেন কী একটা অপরূপ মন্ত্রে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

কেমন মোহাচ্ছন্নতা ধরেছে যোগেনের। মৃদু জ্বরের মতো আড়ষ্ট শিথিল অলসতা, বুকের ভেতরে অহেতুক আলোড়ন। লঘু পায়ে কে যেন আসছে, কে যেন সতর্ক পা ফেলে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদে কিশোরীর একখানা কচি কোমল মুখ। সূর্যের আলোয় ঝলমলে দুটি চোখে বিস্ময়ের অতলতা।

সুরেন বাড়িতে নেই, যোগেনকে প্রাণপণে গালিগালাজ করে চলে গেছে চামারহাটিতে, নায়েবের সঙ্গে দেখা করাটা একান্তই দরকার। গেছে বিকেলের দিকেই, তার মানে ফিরতে অনেক রাত হবে। ভালোই হল, যোগেনকে দেখলেই চ্যাঁচাতে শুরু করত।

বাড়িতে পা দিয়ে ডাকল, মা?

একটা প্রদীপ হাতে করে গোয়ালের দিক থেকে আসছিল সুশীলা। যোগেনের ডাকে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভীরুস্বরে বললে, মাউই বাড়িত্ নাই।

বুকের মধ্যে যোগেনের ধক্ করে উঠল চকিতের মধ্যে।

—বাড়িত্ নাই? কুন্‌হে গেইছে?

হাতে প্রদীপটা ধরে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল সুশীলা। প্রদীপের উর্ধ্বমুখী শিখা থেকে তার মুখে শান্ত নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে, ঘনপক্ষ্ম গভীর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে উঠেছে কমনীয় সৌন্দর্যে। যোগেনের গলায় যেন আপনা থেকেই গান ভেসে আসতে চাইল: কালো দুটি নয়ন যেন ভ্রমর উড়ি যায়-

বুক কাঁপতে লাগল যোগেনের, গলা কাঁপতে লাগল।

—কুন্‌ঠে গেইছে মা?

—হাজাকুর বাড়িত্। উয়ার বউটার ছাওয়াল হেবে, ব্যথা উঠিছে, তাই ডাকি লি গেইল্। —সংকুচিত মৃদু স্বরে সুশীলা জবাব দিলে। এত আস্তে—যেন বাতাসের সঙ্গে তার কথা ভেসে এল, অত্যন্ত উৎকর্ণ এবং সজাগ না থাকলে তা শুনতে পাওয়া যায় না।

যোগেন ঘামতে লাগল।' একদিন যে নারীর সান্নিধ্য একটা কুৎসিত দুঃস্বপ্নের মতো ভাবনার নেপথ্যে সঞ্চারিত হয়ে ছিল, তাই ধরল একটা অপরূপ যাদুমন্ত্রের কুহক। রক্তে রক্তে জোয়ারের জলের মতো কী একটা উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তার। শিল্পীর মনের ভিতরে ফুঁসে উঠল অন্ধ আবেগের আকূতি, নিষেধ মানতে চাইল না, বাধাও না।

আত্মবিস্মৃত যোগেন এগিয়ে এল। প্রায় নিঃশব্দ আর গভীর অপূর্ব কোমল গলায় ডাকল, সুশীলা?

সুশীলা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল, সাড়া দিলে না।

যোগেন আরো এগিয়ে এল : সুশীলা ?

এবারে একবার চোখ তুলেই সুশীলা আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। কিন্তু সে দৃষ্টির চকিত কটাক্ষ যেন মুহূর্তে চকিত করে দিলে যোগেনকে। মেয়েটিকে সে যত ছোট ভেবেছিল তা নয়। কিশোরীর মন অনেক আগেই জেগেছে, অনেক আগেই সে বুঝতে পেরেছে পুরুষের ওই ডাকের পেছনে কী লুকিয়ে আছে, আছে কিসের একটা নির্ভুল সুনিশ্চয়তা। যোগেন লক্ষ্য করল, একটু সরু হাসির রেখাও যেন সুশীলার অধরে মুহূর্তের জন্যে খেলা করে গেল।

আর সত্যিই তো, যোগেন লক্ষ্য করবে না বলেই কি থেমে থাকবে পৃথিবীর মানুষ, ঘুমিয়ে থাকবে তার মন, আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে থাকবে তার বয়ঃসন্ধির বাসন্তী-চেতনা ? চোদ্দ পনেরো বছরের সুশীলা কি তার আশেপাশে দেখেনি যৌবনের উদ্দাম প্রণয়লীলাকে, তার বিবাহিতা সখীদের কাছে শোনেনি পুরুষের সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা ? কতবার তো চোরাদৃষ্টির সামনে স্বামী-স্ত্রীর দুটি-একটি আবিষ্ট মুহূর্তের অপরূপ ছবি ধরা পড়ে গেছে। তা ছাড়া তাদের ছোটলোকের ঘর। মানুষের জিভ আলগা, ধেনো আর পচাইয়ের নেশা একটু বেশি চড়ে উঠলে আচার-আচরণের মাত্রা সব সময়ে যে সীমা মেনে চলে তাও নয়। কতবার নিজের অজ্ঞাতেই রক্ত ছলছলিয়ে উঠেছে সুশীলার—ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে কান, বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড করেছে মাতামাতি।

আর যোগেন! সুন্দর, সুকণ্ঠ। নিজের বোনের মুখে কতবার শুনেছে তার কথা। শুনেছে তাদের জাতের ভেতরে এমন ছেলে আর হয় না। এখানে এসে দেখেছে তাকে, লক্ষ্য করেছে তার মুগ্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য দৃষ্টি। তারপর শুনেছে যোগেনের মার মুখে বিয়ের সেই প্রস্তাবটা। যোগেনকেও দেখল—কল্পনার মানুষটির চাইতেও সুন্দর। তাই মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ের ভেতর দিয়েও যেন কতগুলো বছর একসঙ্গে আবর্তিত হয়ে গেছে সুশীলার—তৈরি হয়ে গেছে মন—কে জানে প্রতীক্ষাও করে আছে কিনা।

পা কাঁপতে লাগল যোগেনের—আরো কাছে এগিয়ে এল সে। নেশা ধরেছে। হঠাৎ-ভালো-লাগার অপরূপ আবেগে শিল্পীর বুকে জেগেছে চিরকালের জীবন-শিল্প। এগিয়ে চলল যোগেন। সুশীলার মুখে প্রদীপের আলো পড়ে একটা অপরূপ রঙে রাঙিয়ে তুলেছে তাকে। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে গেছে অসংখ্য দণ্ড, প্রহর, দিন, মাস, বৎসর।

যোগেন এগিয়ে এল। শীতের বাতাসে ঠাণ্ডা অথচ কোমল-কান্ত সুশীলার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর মধ্যে। ফিস্ ফিস্ করে বললে, সুশীলা, সুশীলা ?

—উঁ ?

—তুমি বড় সুন্দোর—ভারী সুন্দোর।

—যাও, কে বা আসি পড়িবে!

—না, কেহ্ আসিবে না। সুশীলা, তুমাক্ হামি ভালোবাসি।

পুরনো কথা, পুরনো প্রেম, পুরনো প্রকাশ, পুরনো আবেগ। তারপর তেমনি পুরনো ধরনেই দপ করে নিভে গেল প্রদীপটা।

উঠোনের ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু গরম রক্তের চঞ্চলতা বুকে বুকে কথা কইতে লাগল—যতক্ষন না দরজার বাইরে শোনা গেল যোগেনের মার কথার শব্দ।

সাত

বংশী মাস্টার বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা ঠিক হল কিনা।

চট্টরাজের ভঙ্গিটা ভালো নয়। চোখের দৃষ্টি সন্দেহজনক, মুখের কথায় বেশ পরিষ্কার একটা হুঁশিয়ারীর ইঙ্গিত আছে। তা ছাড়া পরিচয়ের ব্যাপারে কেমন সন্দেহ করেছে মনে হয়, হঠাৎ চুপ করে গেল, আর কথা বাড়াল না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, চামারের সরস্বতী পুজো করার উদ্দেশ্যটা ভালো লাগেনি। ভালো না লাগার কথাও বটে। শাস্ত্রে আছে দেবতারা সব ব্রাহ্মণ, আর দেবীরা হলেন ব্রাহ্মণী। শুধু ব্রাহ্মণী নন, ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তাঁরা এত বেশি সচেতন যে, অল্প একটুখানি ত্রুটির জন্যে অভিসম্পাত দিয়ে ভক্তকে নির্বংশ করতে তাঁদের বিবেকে বাধে না। আর সরস্বতীর তো কথাই নেই—তিনি একেবারে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপা,—আর সে জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণের। শূদ্র যদি একবার সে পথে পা বাড়িয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে রাম-রাজ্যে অশান্তি দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে মারী-মড়ক-অন্নাভাব, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের অকালে পুত্রনাশ হয়েছে। ফলে ধর্মপ্রাণ রাজা তৎক্ষণাৎ খোলা তলোয়ার হাতে এগিয়ে এসেছেন আর শূদ্রের মুণ্ডটি পত্রপাঠ এবং একান্তই বিনা নোটিশে খচাং করে নামিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যার একচেটে মালিক ব্রাহ্মণের গড়া শাস্ত্র চড়া গলায় ঘোষণা করেছে: শূদ্র যদি বেদ-পাঠ করে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবে, অতঃপর তাহার গাত্রচর্ম উৎপাটন করিয়া তাহাকে ঘৃতে ভর্জন করিবে, তৎপর খণ্ড খণ্ড করিয়া নদী-জলে নিক্ষেপ করিবে এবং সেটা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে।

কিন্তু কালটা কলি। দেশে ম্লেচ্ছ রাজা। তার না আছে ধর্মজ্ঞান, না আছে ব্রাহ্মণে ভক্তি। হাড়ির ছেলে হাকিম হয়ে ব্রাহ্মণকে জেলে দিচ্ছে—আশ্চর্য, তবু এখনো মহাপ্রলয় হচ্ছে না, আকাশে দ্বাদশ সূর্য উদিত হয়ে ভস্মীভূত করে দিচ্ছে না সংসারকে! কৃষ্ণবর্ণ কল্কি অবতার অগ্নিবর্ণ তরবারি হাতে ম্লেচ্ছ আর কুকুরগুলোকে (বংশী আশ্চর্য হয়ে ভাবে

কুকুরের ওপরে হঠাৎ এ অহেতুক অকৃপা কেন !) পটাপট সাবাড় করে দিচ্ছেন না ! তাই দায়ে পড়ে অনেক কিছুই হজম করে যেতে হচ্ছে। চাটুয্যে দাদা, বাড়ুয্যে মামা, লাহিড়ী খুড়ো আর ভাদুড়ী পিসের হাতের হুঁকোতে অভিমানে তামাক পুড়ে যাচ্ছে, দুর্বাসার বংশ-ধরেরা কাল-মাহাত্ম্যে ঢোঁড়া সাপের খোলস হয়ে ব্যাঙের লাথি খাচ্ছে—নইলে চামারদের গ্রামেও কিনা প্রাইমারী ইস্কুল এবং এখনো তাতে বজ্র পড়েনি !

চট্টরাজের উদ্বেলিত টিকির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এই বেদনাবোধটা অনুভব করেছে বংশী পরামাণিক। আর সেই সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছে যে, চট্টরাজ শুধু ঢোঁড়া সাপের খোলসই নন, সাপত্ব তাঁর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে এখনো। ছোবল তিনি মারতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত মারবেন কিনা, এখনো সেটাকে সঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে এটা স্পষ্ট যে, সরস্বতী পূজোর প্রস্তাবটা তাঁর পছন্দ হয়নি এবং ধর্মনিষ্ঠ জমিদার যে আজো প্রবল প্রতাপান্বিত, এটা জানাতেও বিন্দুমাত্র ভুল করেননি তিনি।

কিন্তু সব মিলিয়ে কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? উচিত হচ্ছে কি আকাশে সংঘর্ষের এই নিবিড় নিকষকালো ঝোড়ো মেঘকে ঘনিয়ে তোলা? সরস্বতী পূজো। অনধিকারী শূদ্রের অনধিকারী বিদ্যায়তনে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীকে আবাহন জানানো একটা ছোট গণ্ডির ভেতরে মস্ত বড় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বটে, কিন্তু এর চাইতে বড় কি কিছু করবার নেই?

আছেই তো। সমস্ত দেশ সেই বড় কাজের মুখ চেয়ে আছে—প্রতীক্ষা করে আছে তারি জন্য। শুধু আকাশে ঘনিয়ে তুলবে না অকাল বৈশাখীর নাচ, একফালি ঝড় টেনে আনবে না মাত্র ছোট একটুখানি জনপদের ওপরে। সমস্ত পৃথিবীর মাটিকে তা নাড়া দেবে, চিড় ধরিয়ে দেবে আকাশে, তুফানের মাতলামি জাগাবে ক্ষ্যাপা সমুদ্রের বুকে।

মাটির তলায় ঘুমন্ত সেই গণ-বাসুকিকে জাগিয়ে তোলাই তো আজকের কাজ। মহাতল-রসাতল-সপ্ততলের অতলে যেখানে মহানাগের সহস্র ফণায় একগাছি মালার মতো বিধৃত হয়ে আছে পৃথিবীর ভারকেন্দ্র, সেই অতলে, মনুষ্যত্বের সকলের নিচের তলায়, সেইখানেই ধাক্কা দিতে হবে, সেই কেন্দ্রে। এই ব্রতই তো ছিল।

কিন্তু অতুল মজুমদারের অসুবিধেটা আজকে বুঝতে পেরেছে বংশী পরামাণিক। এ কাজ করবার জন্যে যে মন চাই, যে প্রস্তুতি চাই, যে ভাষা আয়ত্ত করা চাই—সে ভাষা জানা নেই তার, সে প্রস্তুতি নেই, সে মন তো নেইই। ভদ্রতা আর সংস্কার উঁকি দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, মাথা তুলছে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সহজ পথ চলার আরো সহজ সমাধান। গোটা কয়েক রিভলভার, কিছু বোমা, কিছু আগুন ঝরানো সাহিত্য আর হাসিমুখে মরতে পারার অম্লান গৌরব, ফাঁসির দড়িকে মণিহারের মতো কণ্ঠে জড়িয়ে নেওয়ার নেশা-গ্রস্ত প্রলোভন। এর সীমা অতুল মজুমদার অতিক্রম করতে পারেনি, ঘাসের শিষে একফোঁটা রাত্রিশেষের শিশিরের মতো সে হারিয়ে গেছে সত্যি, মুছেও গেছে—কিন্তু অতুল

মজুমদারের আত্মা তো হারায়নি। 'বাসাংসি জীর্ণানি'—এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণে রেখে সে দেহ থেকে দেহান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু অজরামর আত্মা যাবে কোথায়! চার বছর ধরে নানাভাবে সে আত্মা দেখেছে এক নতুন দেশকে—জাতির এক নতুন প্রাণকেন্দ্রকে। বুঝেছে স্বাধীনতার এক নতুন আশ্চর্য অর্থ, অনুভব করেছে মুক্তির একটা অচিন্ত্যপূর্ব তাৎপর্যকে! আর এও জেনেছে—পথ এত সোজা নয়। মরতে পারার চাইতে বাঁচবার এবং বাঁচাবার কাজ অনেক বেশি কঠিন, অনেক বেশি দরকারী।

তবু জানলেই তো হয় না। জানাকে কাজে লাগানো চাই। আর সে কাজ কঠিনতর তার পক্ষে। অতুল মজুমদারের প্রতিনিধি বংশী পরামাণিক মিশেছে চাষী-চামারদের সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখের ভাব নিয়ে দিতে চেয়েছে নিজের মন্ত্র, কিন্তু বৃথা হয়ে গেছে। এ হয় না, এ হবার নয়। আজ যেমন বুঝতে পেরেছে, এর জন্যে আসবে নতুন মানুষ নতুন কর্মীর দল। এ তারাই পারবে, অতুল মজুমদার কিংবা বংশী পরামাণিক নয়।

তাই অস্বস্তি আর অস্থিরতা। মধ্যে মধ্যে মনটা যেন অসহ্য একটা যন্ত্রণায় বিকল হয়ে ওঠে। পথ পেয়েছে কিন্তু এগোতে পারছে না—পাথেয় নেই। থেমে দাঁড়িয়ে নিজের অকর্মণ্যতার জন্যে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আর এই লুকিয়ে থাকা, একটা জানোয়ারের মতো শিকারীর প্রখর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলা—এ যেন গুরুভার বলে মনে হয় এখন। দু বছর আগেই সকলের সঙ্গে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—দুঃসহ একাকিত্বে যেন মরুভূমির ভেতরে পথ চলবার মতো বোধ হচ্ছে আজকাল। তাই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে, নইলে মনে হয় লোহার গরাদের আড়ালে পাথরের পাঁচিলের যে ঠাণ্ডা অন্ধকার সেখানে আশ্রয় নেওয়াই ভালো।

তারপরেই মনে হয় শান্তিকে!

আজ যেখানেই থাকুক শান্তি, প্রতিশ্রুতি তো ভুললে চলবে না। একমাত্র অতটুকু মেয়েটাই সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তার, চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তাকে। যতটুকু হোক, যে ভাবেই হোক, সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হবে। এই অতুল মজুমদারের শেষ কথা। বড় কাজ করতে না পারো, অন্তত ছোটর ভেতরেও যতটা পারা যায় তাই করো। নিজের কাছে নিজেরই হার মানা অসম্ভব। তাই—

তাই এই ভালো।

বংশী একবার অন্যমনস্ক ভাবে তাকাল নিজের সব্জি বাগানটার দিকে। কেমন খচ্ খচ্ করে উঠল, কোথায় যেন লাগল কাঁটার খোঁচা! শীতের ফসলে এইটুকু বাগানটা কী চমৎকার অর্ঘ্য সাজিয়েছে। মুলো, কপি, টম্যাটো। উজ্জ্বল, মসৃণ, সতেজ। দেশকে ভালোবেসেছে প্রাণ দিয়ে, দেশের মাটি দিয়েছে প্রতিদান—কণামাত্র কৃপণতা করেনি তো। আর এই তো—এই তো সত্য। বংশীর চোখ জলজ্বল করে উঠল। হ্যাঁ—সে তার পথ পেয়েছে

বইকি। দেশ জুড়ে ফসল ফলাতে নাই বা পারল সে, কিন্তু ক্ষতি কী যদি এইটুকু জমিতে সে এমনি প্রাণবন্ত শস্যকে জাগিয়ে দিতে পারে। সামান্য সরস্বতী পুজো—কিন্তু তার ভেতরে অসামান্যতার সম্ভাবনাও যে প্রচ্ছন্ন আছে! শেষটা নাই বা দেখে যেতে পারল, কিন্তু শুরুর যে মূল্য তাকে কে অস্বীকার করবে?

শীতের সব্জি—মসৃণ, ঘন শ্যামল, প্রাণে আর স্বাস্থ্যে সমুদ্ভাসিত। দেশের মাটি তাকে ভালোবেসেছে। কেমন কষ্ট হতে লাগল। মায়া পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে এ হলেও নেহাৎ মন্দ ছিল না। এই নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য পাড়াগাঁ—ভূগোলের হট্টগোলের বাইরে ভানুমতীর কুহক-লাগা আত্মবিস্মৃত চামারদের নগণ্য জনপদ। ক্ষতি কি ছিল এইখানে ভুলে থাকলে, দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি জুড়িয়ে নিলে এখানকার ঘন পাতায় ছাওয়া চিরপুরনো অতিকায় বংশীবটের ছায়ায়! সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে যে তুফান ওঠবার আশঙ্কা, তাতে এই নোঙর থাকবে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া আরো একটু কথা আছে। মহিন্দর হঠাৎ নতুন দারোগা সাহেবের কথাটাই বা অমন করে জিজ্ঞাসা করে বসল কেন?

মায়া লাগছে নোঙর ছিঁড়তে, কষ্ট হচ্ছে এই মাটির ভালবাসাকে পেছনে ফেলে যেতে। কিন্তু উপায় নেই। শান্তির সেই শামলা মুখখানা দৃষ্টির সামনে ভাসছে। প্রতিজ্ঞা ভুললে চলবে না। আর—আর এই সব্জি ক্ষেতের অন্য একটা দিকও তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে তার কাছে। ছোট দিয়ে শুরু করতে হবে, সারা যদি অনেক দূরে থাকে তো থাক না। যারা আসবার তারা পেছনে আসবে, তার শুধু বীজ ছড়িয়ে যাওয়ার পালা।

তাই বড় ভালো লেগেছে যোগেনকে। বংশী মৃদু হাসল: চার বছর পরে অতুল মজুমদারের প্রথম রিক্রুট। রিভলভারের পথে নয়, রোমাঞ্চ-জাগানো রক্ত-গরম-করা বই পড়িয়ে ক্ষিপ্ত করে তুলেও নয়! মাটির মানুষের মাটির ভাষা অতুল মজুমদার জানত না, যোগেন জানে; তাদের প্রত্যক্ষ বেদনার সঙ্গে অতুল মজুমদারের পরিচয় নেই, যোগেনের আছে, তাদের প্রতিদিনের অপমান আর তুচ্ছতার আঘাত অতুল মজুমদারের কাছে হয়তো অনেকটাই দুর্বোধ, কিন্তু যোগেনের কাছে তা অতিরিক্ত সুস্পষ্ট। সবই ছিল, কিন্তু বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবার কেউ ছিল না। সেই কাজটুকুই করেছে বংশী. এবার আগুন নিজের তাগিদেই নিজের কাজ করে যাবে।

—মাস্টার কি ফের বসি বসি ঘুমাবা নাগিলে?

মহিন্দর।

বংশী হাসল: না ঘুমোইনি।

—তো নি ঘুমাও। তোমার সাথে ফের কাজের কথা আছে।

বংশী তেমনি হেসে মহিন্দরের কথার অনুকরণ করে বললে, তো কহ।

মহিন্দর গম্ভীর স্বরে বললে, ইটা হাসবার মতো কথা নহো মাস্টার। মন দিয়া শুনিবা

হেবে, বুঝিবা হেবে, ভাবিবা নাগিবে।

বংশী এবার ভালো করে তাকালো মহিন্দরের দিকে। না, ঠিক অনুকূল আবহাওয়াটা। একটা কিছুর ভারে মহিন্দরের মুখে খানিকটা থমথমে গাম্ভীর্য জমে উঠেছে। এখন, অন্তত এই মুহূর্তে সে নিছক মহিন্দর নয়। শ্রীমহিন্দর রুইদাস—গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি। এখন যেন হাতে কলম পেলেই নিবটাকে দু'ফাঁক করে একখানা রেপ্ কাগজে সে সই করে দেবে। তার মুখ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে তাকে লাথি মারলে নায়েব মশাই পর্যন্ত পার পান না, নগদ নগদ একটি টাকা বখশিশ দিয়ে তবে তাঁকে মানীর মান রক্ষা করতে হয়।

মহিন্দরের ওই গম্ভীর চিন্তিত মুখের দিকে তাকালে কেমন সুড়সুড়ি লাগে বংশী মাস্টারের। কাজটা উচিত নয় তা জানে, তবু হাসি চাপতে পারে না। মহিন্দর উপদেশ দিতে এসেছে। অত্যন্ত গম্ভীর আর বিচক্ষণ চেহারা করে বলবে, বুঝিলা হে মাস্টার, তুমাদের ছোয়া ছেইল্যার উসব চালাকি দিয়া কাম হেবে না—

সুতরাং বংশীকে স্মিতমুখে চুপ করে থাকতে দেখে মহিন্দর উত্তেজনা বোধ করল।

—অমন হাসিছ ক্যানে মাস্টার?

—হাসব না?

—না তো।

—তবে কি কাঁদতে হবে?

—ল্যাও—ইটা কী কহিলে!—মহিন্দর অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলল মুখের চেহারা: ঝুটমুট কাঁদিবার কী হৈল্ হে তুমার? কাঁদিবে ক্যানে?

মহিন্দর চটলে চটাতে ভালো লাগে। বংশী বললে, তবে কী করব?

—হামার কথাটা শুনিবে কি না শুনিবে সিটাই কহ।

—কেন শুনব না? তুমিই তো সে কথা বলছ না, খালি এটা ওটা বকছ। যা বলবার স্পষ্ট করেই বলো না বাপু।

মহিন্দর বললে, হুঁ—তারপর দাওয়ার একপাশে বসে পড়ল।

—কী হল?

মহিন্দর কেমন বেদনার্ত চোখ তুলে মাস্টারের দিকে তাকালো: হেবে না।

—কী হেবে না?

আহত স্বরে মহিন্দর বললে, আমি তো আগতে তুমাক্ কহিছিনু। তুমি ঢের নিখিছ, কিন্তু বুঢ়া মাইন্ষের কথাটা মাইন্লেন না। এখন ফের তো অপমান হৈ গেল্!

মানী লোক মহিন্দরের এমন একটা অপমান চট করে হয়ে গেল কী করে ঠিক বুঝতে পারল না বংশী। অনুমান যা করেছে সেটাকে নিশ্চিত করে নেবার জন্যই সে নির্বাক চোখে মহিন্দরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বুঝিলা মাস্টার, দিবে না।

—কী দেবে না?—মাস্টারের কণ্ঠে এবার অধৈর্য প্রকাশ পেল।

—পূজা করিবা।

—ওঃ, বুঝতে পেরেছি—বংশী নিজের মনেই মাথা নাড়ল একবার। কথাটা আকস্মিক তো নয়ই, বরং এটা শোনবার জন্যেই যেন তার মন নিভৃতে এতক্ষণ আশা করে বসেছিল। বংশী বললে, বাধা দিচ্ছে কে? নায়েব মশাই?

—তো কে?—মহিন্দর ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, উ শালা শয়তানের হাড়।

—তুমি তো খুব ভালো বলছিলে তখন।

—কহিছিনু তো।—মহিন্দর অকপট স্বীকারোক্তি করলে এবারে: সাধ করি কি আর কহিছি নাকি? শয়তানকে উঁচা পিঢ়া দিবা নাগে না? এখন তো দেখিবা পাছি—শয়তানকে পিঢ়া দিয়া বা কী হেবে—উ শালা শালাই থাকে চিরকাল।

কথাটা নতুন রকমের লাগল। নায়েবের প্রতি মহিন্দরের ভক্তিটা বিখ্যাত জিনিস, তার রাজপ্রীতি একবারে শাস্ত্রীয় পথ অনুসরণ করে চলে। কিন্তু হঠাৎ এ ব্যতিক্রম কেন?

বংশী প্রশ্ন করলে, কী বললে নায়েব?

—পষ্ট করি কিছু কহে নাই। তুমি আসিবা পর খুব হাসিলে। কহিলে কি, চামারক লাথি মারিলে গঙ্গাত্ নাহিতে যিবা নাগে, যে চামার পায়ের জুতা গড়ায়, সি শালারা সরস্বতী পূজা করিবা চাহে। তারপর হামাক কহিলে, একটা ছেঁড়া জুতা লিয়া পূজা কর—ওই জুতা সরস্সতীই তুদের দানাপানি দিবে।

বংশী চুপ করে রইল। একথাও শোনবার আশা করেছিল।

মহিন্দরের গলা হঠাৎ কেঁপে উঠল উত্তেজনায়।

—মাস্টার?

—বলো।

—ঢের সহিছি হামরা।

—অনেক।

—কথায় কথায় জুতা মারিলে হামাদের, হামাদের প্যাটের ভাত কাড়ি খালে, হামাদের বৌ-ঝিক আইত্ (রাত) করি লিই গ্যালে কাছারিত্—হামরা সহি গেনু। এত করোছি, খোয়াছি, তোয়াজ করোছি, তাঁয় তবু হামাদের মানুষ বলি মানিবা চাহে না! ক্যানে, অ্যাতে কী দোষ করোছি হামরা?

বংশীর চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তবে ভুল হয়নি। তার সজিক্ষেতের ছোট ফসল বীজ ছড়াবার উপক্রম করেছে। মানী লোক মহিন্দরের মানে ঘা লেগেছে, একদিন —এমনি করে দেশের সমস্ত মানুষের মানেই ঘা লাগবে নিঃসন্দেহে। সেদিন দূরে নয়, তা

এগিয়ে আসছে। সরস্বতী পুজোকে অবলম্বন করে উদ্বোধন হবে চামুণ্ডার—দিকে দিকে তারই রক্তাক্ত সংকেত।

—তুমি কী করবে মহিন্দর ?

—কী করিমু ? সিটাই তো তোমার ঠাঁই জানিবা আইমু।

মহিন্দরের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত ভাববিবর্তন ঘটে গেছে একটা। প্রথমে এসেছিল উপদেশ দিতে, তখন সে মুখে ছিল আতঙ্কের ছায়া, ছিল সাবধানীর সতর্কতার দ্যোতনা। কিন্তু চট্টরাজের কথাগুলো স্মরণ করতে গিয়েই দপ করে শিখায়িত হয়ে উঠেছে মহিন্দর। হঠাৎ বুঝতে পেরেছে, শয়তানকে উঁচু পিঁড়ি দিয়ে আর লাভ নেই, তাতে তার খাঁই মেটে না, বরং লাফে লাফে সেটা বেড়েই চলতে থাকে। তাই হঠাৎ বিদ্রোহী হয়েছে মহিন্দর। জলো ঢোঁড়া এতকাল দাপাদাপি করেছে নিশ্চিন্ত সুযোগে, এবার খোঁচা লেগেছে কাল কেউটের গায়ে।

বংশী বললে, আমার কথা শুনবে ?

—সিটাই শুনিবা আইমু।

বংশী বললে, তবে পুজো করতেই হবে।

—পূজা ?

—হাঁ, পূজা।

—করিবা হেবে ?

—নিশ্চয় করতে হবে। তোমাদের এমন করে অপমান করে যাবে, তোমার মতো মানী লোককে যা মুখে আসে তাই বলবে, তবু তুমি সয়ে যাবে মহিন্দর ?

মহিন্দর এবার চোখ তুলল। আগ্নেয় চোখ।

—না।

—তবে কী করবে ?

মহিন্দর কঠিন স্বরে বললে, পূজাই করিমু।

—যদি বাধা দেয় ?

—সিটা তখন দেখা যিবে। মারামারি করিবা জানি হামরা।—মহিন্দর হঠাৎ উঠে পড়ল : তুমি নাগি যাও মাস্টার—টাকার জন্য ভাবেন না। হামি ঠিক করি দিমু।

—এইটেই পাকা কথা।

—হামার কথা নড়ে না।

—নায়েবকে কী বলবে ?

—কিছুই কহিমু না—কঠিন কণ্ঠে মহিন্দর বলে চলল, উ শালা তো কাইল চলি যিবে। যদি জানিবা পারে, যদি বাধা দেয় তো হামরাও লাঠি ধরিবা শিখিছি। হামরা ছোটলোক,

হামরা মুচি, হামাদের লাথি মাইল্লে গঙ্গা ত্‌ চার্ন করিবা নাগে! হামাদের ছেঁড়া জুতা পূজা করিবা কহে! আচ্ছা দেখিমু!

মহিন্দর চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, বিকালে ফের আসিমু মাস্টার।

আকাশে প্রথম ঝোড়ো মেঘ। জ্বলন্ত বিদ্যুতের কশাঘাত। বংশী মাস্টারের হৃৎপিণ্ড আনন্দে যেন লাফাতে লাগল।

*　　*　　*　　*

একটা গানের আড্ডা আছে যোগেনের, সেই আড্ডাতেই আলকাপের দল করে গড়ে তোলার কথা ভাবছে। মোটামুটি সবই আছে, অভাব শুধু একটা ক্ল্যারিয়োনেটের। যাত্রার দলে থেকে বাদ্যবাজনাগুলো সম্পর্কে তার একটা ধারণা হয়েছে চলনসই রকমের, ক্ল্যারিয়োনেট বাঁশী না থাকলে আজকাল আর গান জমে না। কিন্তু নিতান্তই চামারদের গ্রাম। ক্ল্যারিয়োনেট বাজনা তো দূরের কথা, অনেকে তা চোখেও দেখেনি। কিনে একটা আনা যায় বটে, কিন্তু অনেক দাম, গাঁট থেকে অতগুলো টাকা দেওয়া এখন সম্ভব নয় যোগেনের। মার হাতে টাকা নেই আর সুরেনের ভাইয়ের সুধাকণ্ঠ সম্পর্কে যত অনুরাগই থাকুক, অতগুলি টাকা চাইতে গেলে একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তাড়া করে আসবে। সুতরাং যখন খবর পাওয়া গেল দামড়ি গাঁয়েব ধলাই মুচি আজকাল বিয়েবাড়িতে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যারিয়োনেট বাজিযে বেড়াচ্ছে, তখন উৎসাহিত হয়ে উঠল যোগেন। সকালে উঠেই গেল দামড়িতে। ধলাইকে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মেজাজ দেখে মাথা গরম হয়ে উঠল যোগেনের।

ধলাই বললে, হুঁ, বাজাবা হামি পারি। কিন্তু কী রকম দলের সঙ্গে বাজাবা হেবে সিটা তো হামার জানিবা নাগে।

—না দল ভালোই আছে।

—ভালো?—অনুকম্পার হাসি হাসল ধলাই: সাহার আলকাপের দলে হামি বাজানু, ফের বাজাইনু বদন মণ্ডলের যাত্রার দলে। সি সকলের চাইতেও তুমার দল ভালো নাকি, হে?

ধলাইয়ের কথার ভঙ্গিতে যোগেন অপমানিত বোধ করল। কিন্তু গরজের বালাই যখন তার, তখন খোঁচাটা হজম করে যেতেই হবে। শুষ্ক হাসি হেসে যোগেন বললে, অত ভালো কি আর হেবে হামার দল? একটু কষ্ট করিই বাজাবা হেবে তুমাক।

সৌখিন সরু গোঁফে মিহি করে একটু তা দিলে ধলাই। বেশ বোঝা যায় একটু ওপর থেকে, একটু বাঁকা করুণার দৃষ্টিতে যোগেনকে পর্যবেক্ষণ করছে সে। অহঙ্কারে ফেটে পড়ছে লোকটা—সাতখানা গাঁয়ের ভেতরে একটি মূল্যবান ক্ল্যারিয়োনেটের মালিক সে।

ধলাই বললে, গাহিবে কে?

—হামি।

—তালমান জানো হে ?

এটা চূড়ান্ত। যোগেন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে করে ধলাই তার হাত ধরে ফেলল। হেসে বললে, আরে, আরে চটি যাছ ক্যানে ? বইস, তামুক খাও, দুটা একটা কাজ-কামের কথা কহো। গুণী মানুষের কাছেই তো ফের গুণী মানুষ নিজের কথাটা কহিবা চাহে। অমন ফস করি চটি গেলে কি কাম হয় ?

এবার বোঝা গেল মুখে যেমন করুক না কেন, মনের দিক থেকে একটা তাগিদ আছে ধলাইয়ের নিজেরও। একটা কোনো জায়গা তারও দরকার, তারও প্রয়োজন কোনো একটা জায়গাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। ওটুকু অহমিকা শিল্পী-সুলভ, ওটুকু না থাকলে নিজের ওপর যেন নিজেরই জোর থাকে না। শেষ পর্যন্ত কথা পাকা হয়ে গেল। লাভের চার আনা। একটু বেশিই হল, কিন্তু উপায় ছিল না তা ছাড়া। সত্যিই তো যোগেন ছাড়া এমন গুণী তার দলে আর কে আছে ?

কথাবার্তা শেষ করে যোগেন যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল তখন বেলা দুপুর। শীতের দিনেও এই খোলা মাঠের ভেতরে ধুলোর পথটা গরম হয়ে উঠেছে। পথের এপাশে আমগাছ-গুলোতে এরই মধ্যে 'বউল' পড়েছে, সোনালী সৌন্দর্য আর দুটি-চারটি কচি কোমল পাতায় পুলকিত আত্মপ্রকাশে একটা নতুন ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার যেন বিকশিত হয়ে পড়েছে।

পথ চলতে চলতে একটা মোহন মাদকতায় ভরে গেছে মন। কাল অনেক রাত পর্যন্ত গান লিখেছে, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অতন্দ্র ভাবনার মধ্যে শুনেছে সুরের আশ্চর্য সঞ্চার। কোথায় যেন এতদিন পর্যন্ত বন্ধ দরজা ছিল একটা, তার বাইরে মাথা কুটেছে যোগেনের সমস্ত চেষ্টা, কিন্তু ভেতরে ঢোকবার পথটাকে খুঁজে পায়নি। কখনো কখনো সেই বন্ধ দরজার ফাঁকে ফাঁকে এক-একটা আলোর রশ্মির মতো এসেছে সুরের এক-একটা বিস্ময়-বিচিত্র পুলক। যতটুকু পেয়েছে তা অনেকটা না পাওয়ার ব্যথাকেই তুলছে সজাগ আর সুতীক্ষ্ণ করে। যোগেনের মনে হয়েছে, অনেক কথা আছে তার, অনেক গান আছে —অথচ ঠিক তাদের সে ধরতে পারছে না। অতৃপ্তি বোধ হয়েছে, অভিমান জেগেছে নিজের ওপরে। কিন্তু কী যে হল কাল—কেমন করে যেন সে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গিয়ে অপরূপ অপর্যাপ্ত আলো এসে তাকে যেন স্নান করিয়ে দিয়ে গেল। কাল এক রাত্রির মধ্যে আট-দশটা গান সে লিখে ফেলেছে, সুর দিয়েছে তাতে। নিজের ভেতরে এমন যে সৃষ্টির প্রচুরতা তার ছিল, এ যোগেনের জীবনে একটা আকস্মিক আবিষ্কার। ফুলে ফুলে আলো হয়ে ওঠা শরতের একটা শেফালি গাছকে হঠাৎ নাড়া দিলে যেমন এক মুহূর্তে ঝুর ঝুর করে অজস্র ফুল স্নিগ্ধ হাসির মতো ঝরে পড়ে, তারও ঠিক তেমনি হয়েছে। কথার শেষ নেই, গানের শেষ নেই। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ধরবে বুঝতে পারে না। একটা

গান লিখতে লিখতে আর একটা গান এসে পড়ে, একটা সুরের ভেতরে ঘটে আর একটা সুরের অনধিকারী সঞ্চার। বিস্মিত বিহ্বল হয়ে গেছে যোগেন, সহস্র সুরে মন তার গান গেয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু কেন?

রক্তের ভেতরে মৃদু কল্লোল শুনতে পাওয়া গেল। কী অদ্ভুত সন্ধ্যা! প্রদীপের আলোয় সুশীলার মুখ সন্ধ্যাতারার মতো ঝলমল করছিল। আর একটি প্যাচপেচে গলির একটি বীভৎস অন্ধকারের সঙ্গে এর কত পার্থক্য। মেয়েমানুষের সম্পর্কে একটা কুশ্রী ঘৃণায় যোগেন বিতৃষ্ণ হয়েছিল এতকাল, হঠাৎ দেখতে পেল এর আর একটা দিকও আছে। মনকে কালো করে দেয় না, বন্ধ দরজাটা হাট করে দিয়ে সমস্ত আলো করে তোলে।

এই ভালোবাসা? এই পিরিতী? এরই জন্যে মানুষ এমন করে আকুতি করেছে গানে গানে, এরই জন্য শ্রীরাধা যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিলেন তাঁর যৌবন? আশ্চর্য নয় কিছুই, অবিশ্বাস্য নয় এতটুকুও। যোগেন বুঝতে পেরেছে এবার। বুঝেছে কেন বন্ধুর জন্যে কলঙ্কের ডালা অসংকোচে মাথায় তুলে নিতে বাধে না এক বিন্দুও, কেন বার বার একথা মনে হয়, 'তোমার লাগিয়া কলঙ্কেরই হার গলায় পরিতে সুখ'।

যোগেন গুনগুন করতে লাগল:

আর কত কাল রহি ঘরে পাষাণে বুক বাঁধিয়া,
হায় হায় হায়, জনম গেল কাঁদিয়া।
তিলেক তুমায় না দেখিয়া,
হে, পরাণ আমার যায় জ্বলিয়া
তভু তো মথুরা গেইল্যা, ওরে আমার দরদিয়া—

শরতের শিউলি ডালে ঝাঁকুনি লেগেছে। ফুল ঝরছে, রাশি রাশি ফুল। একটি ছোঁয়ায়, বুকে বুকে কয়েকটি মুহূর্তের মাতলামিতে মাতাল করে তুলেছে সমস্ত জীবন। এবার সত্যিই বড় আলকাপওলা হবে যোগেন, সত্যিকারের গাইয়ে হবে, দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে যাবে তার, লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে ওই যাছে যোগেন আলকাপওলা।

কিন্তু বংশী মাস্টার। হঠাৎ মনের প্রসন্নতার ওপরে লঘু মেঘ ভেসে গেল এক টুকরো। মাস্টার যে মন্ত্র দিয়েছে সে মন্ত্র কি ফুল-ঝরা পথে চলার, না কোনো দূর দুর্গমের অভিযাত্রায়? ফুল না কাঁটা?

যেন যোগেনেব বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করল। কী লাভ তার জমিদারকে আক্রমণ করে, মহাজনকে গাল দিয়ে? জমিদার থাকুক জমিদারের মতো, মহাজন থাক তার নিজের মর্জিমাফিক। আরো তো লোক আছে দেশে, আরো তো বহু মানুষ জর্জরিত হচ্ছে জমিদারের অত্যাচারে! কিন্তু কী দরকার তার—কী প্রয়োজন তারই একমাত্র প্রতিবাদ

জানিয়ে ? সকলের যেমন করে দিন কাটছে, তারও কাটুক। সকলে যেমন করে ঘর বাঁধে, ভালোবাসে নিজের বউকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে, তাইই করবে যোগেন, তাদের থেকে সে আলাদা হতে চায় না, চলতে চায় না কোন দুঃসাহসিক নতুনের দুর্গমতায়।

বংশী মাস্টারের ওপরে রাগ হতে লাগল। অকারণে দুর্বুদ্ধি দিচ্ছে তাকে। ব্যস্ত করে তুলছে দিব্যি জলজ্যান্ত সুস্থ শরীরটাকে। সৃষ্টিছাড়া লোকের সৃষ্টিছাড়া বুদ্ধি, অনর্থক কতগুলো মানুষকে চটিয়ে দিয়ে ঝামেলা বাধিয়ে তুলতে চায়। আর তা ছাড়া প্রতিপক্ষও নগণ্য নয়। জমিদার, মহাজন, বামুহন। সমাজের তিন-তিনটে মাথা, যারা ইচ্ছে করলে চাষার যা কিছু ফোঁসফোঁসানি এক লহমায় সব ইতি করে দিতে পারে। চাষাদের সরস্বতী পূজো ! কী দরকার ওসব বাবুয়ানা করে ! জুতো সেলাই আর জমিতে লাঙল দিয়ে যাদের সাতপুরুষ কেটে গেল, কোনমতে নামটা সই করতে পারলেই যারা সমাজে মাতব্বর হয়ে যায়, তাদের পক্ষে ও সব বদখেয়ালের কোনো মানে হয় না। এরই নাম গরীবের ঘোড়া-রোগ, সবসুদ্ধ ডুবে মরবার মতলব।

তার চেয়ে দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাট সুশীলা। ফুলের মতো নরম। এত সুন্দর, এমন বুকভরা। যোগেন আর কিছু চায় না। রাশি রাশি কথা, রাশি রাশি গান। ঝুর ঝুর করে ফুল ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গে—নিশ্চিন্ত আরামে, অপরূপ একটা আবেশে যেন ঝিম ধরে আসে, যেন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু মাঠের রোদটা হঠাৎ যেন অতিরিক্ত গরম বলে বোধ হল। হঠাৎ যেন মনে হল গায়ের চামড়াটায় একটা মৃদু উত্তাপ লাগছে, জামার ভেতরে ঘাম গলে পড়ছে এই শীতের দুপুরেও। বেলাটা কত চড়েছে সেটাই যেন বুঝবার জন্যে একবার আকাশের দিকে তাকালো যোগেন। আর তখনি—

তখনি চোখে পড়ল আকাশে জ্বলন্ত সূর্য।

জ্বলন্ত সূর্য। ধক্ ধক্ করে আগুন ছড়াচ্ছে—জ্বলছে—হিংস্র নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর একটা চোখের মতো। ছায়া রাখবে না কোথাও, রাখবে না স্নিগ্ধতা, তার তাপে শরতের ঝরা শিউলি শুকিয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। পৃথিবীটা শুধু শরতের শিশিরে ভেজা সকালই নয়।

সূর্যের দিকে চোখ কুঞ্চিত করে বিকৃত মুখে তাকালো যোগেন। যতই তীব্র হোক, অস্বীকার করবার যো নেই ওকে। আর ওই চোখ—

ওই চোখ বংশী মাস্টারের। আজ সন্ধ্যায় তাকে দেখা করতেই হবে বংশীর সঙ্গে। উপায় নেই, সুশীলাকে নিয়ে আচ্ছন্ন আবিষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না অপরূপ অন্ধকারের আড়ালে।

আট

ক্ষেতে ক্ষেতে শীতের সর্ষে ফুল ফোটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। মাঠের ওপর শেষরাত্রে আর তেমন করে সাদা রঙের কুয়াশা ঘন হয়ে নামে না আজকাল। আমের কচি মুকুল ধরেছে, সোনার মতো রঙ। পৃথিবী বদলাচ্ছে। বাসন্তী পূর্ণিমার দিন আসছে এগিয়ে—ফিকে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে গাছের পাতার চেহারা। বাসন্তী রঙের স্বপ্ন ছড়াচ্ছে চারদিকে।

এর মধ্যে সময়টাও এগিয়ে গেছে দ্রুত। মাস্টারের সব্জি ক্ষেতে কপি-মূলো প্রায় নিঃশেষ। একা মানুষ—সামান্যই খেয়েছে, বাকিটা দিয়েছে ইচ্ছেমতো সকলকে বিতরণ করে। দুটি-চারটি যা বাকি আছে তা সরস্বতী পূজোর সময় কাজে লাগবে। টম্যাটো গাছের ঝাড়গুলো ক্রমশ শুকিয়ে আসছে, ফল আর তেমন বড় হয় না—একটু বাড়তে না বাড়তেই কণ্টিকারী ফলের মতো হলদে হয়ে যায়, তারপর পড়ে যায় মাটিতে। মূলোর গাছ অবশিষ্ট দু-একটা যা আছে, তাদের পাতাগুলো ঝাঁঝরা ঝাঁঝরা করে খেয়েছে সবুজ রঙের ছোট ছোট কীট—এক রকমের উড়ন্ত পোকা। মহিন্দরের হুঁকোর জল দিয়ে তাদের ঠেকানো যায়নি।

ইস্কুলের বারান্দায় সরস্বতী তৈরী হচ্ছে। একটু দূরের গ্রাম থেকে এসেছে একজন রাজবংশী। কুমোর-টুমোর এদিকে নেই, একেবারে শহরের কাছাকাছি না গেলে তাদের পাত্তা মেলে না। তাই চাষী রাজবংশী এই সুবল বর্মণই তাদের ভরসা। একটু একটু মাটির কাজ নিজে নিজেই শিখেছিল, প্রথম প্রথম তা দিয়ে খেয়াল-খুশি মাফিক শীতলা আর বিষ-হরী তৈরি করত, এখন রোজগারের একটা নতুন পথ পাওয়া গেছে দেখে দস্তুরমতো এ নিয়ে ব্যবসা করে সুবল। শীতলা বিষহরী তো গড়েই, তা ছাড়া ফরমায়েস অনুযায়ী সব কিছু গড়তে চেষ্টা করে। গত দু বছর থেকে কালীও বানিয়েছে খানকতক। পয়সার খাঁই নেই সুবলের, দু-তিনটে টাকা পেলেই বেশ বড় গোছের মূর্তি তৈরি করে দিয়ে যায়।

ইস্কুলের বারান্দায় সে প্রতিমায় খড় বাঁধছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বংশী। সুবল বর্মণের সরস্বতী সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। যা একটা গড়তে যাচ্ছিল তা ছিন্নমস্তাও হতে পারে—গণেশ হওয়াও আশ্চর্য নয়, অন্তত তার খড় বাঁধার নমুনা দেখে এরকম একটা আশঙ্কাই জাগছিল। তাই হৈ হৈ করে এসে পড়েছিল বংশী মাস্টার। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখিয়ে দিয়েছে—পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে সে ঠিক কী চায়। শুনে মাথা নেড়ে সুবল বলেছে, ই—ই, ইবারে বুঝিনু। খানিকটা বিষহরীর মাফিক করিবা হেবে।

—ঠিক ঠিক।—বংশী উৎসাহ দিলে : তবে একেবারে বিষহরীর মতো নয়। রঙটা ধপ্-ধপে শাদা করে দিতে হবে।

—মেম সাহিবগুলার মতন ?

বংশী হেসে বললে, হ্যাঁ, সরস্বতীর রঙ মেম সাহেবদের মতোই।

—আর কী করিবা হেবে ?

—তাতে সাপ থাকবে না।

—তো কী থাকিবে ?

—বীণা।

—বীণাটা ফের কেমন হৈল্ ?

বীণার আকার প্রকার বোঝাতে গিয়ে বংশী দেখল পণ্ডশ্রম। তাই কাজটাকে সহজ করবার জন্যে বললে, গাব্‌গুবাগুব্ জানো ?

সুবল দাঁত বের করে বললে, হে হে, সিটা আর ক্যানে জানিমু না ?

—ঠিক সেই রকম।

—আর কী করিবা হেবে ?

—পায়ের কাছে একটা পদ্ম আর হাঁস দিতে হবে।

—হাঁস ? কী হাঁস ? পাতি ?

—না না, রাজহাঁস।

—তো ঠিক বুঝিনু—জবাব দিয়ে সুবল কাজে লেগে গেছে। কিন্তু ঠিক বুঝেছে বলাতেও বংশী নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেছে। তবু যতদূর মনে হচ্ছে, হাঁসটা ঠিক হাঁস হবে না, ময়ূর আর শকুনের মাঝামাঝি কিছু একটা রূপ নেবে। কিন্তু উপায় নেই—এর বেশি কাজ সুবল বর্মণের কাছ থেকে আশা করা সম্ভব নয়।

খুব গম্ভীর মুখে কাজ করছে সুবল। ইস্কুলের পড়ুয়া আট-দশটা আধ-ন্যাংটো ছেলে এসে কাছে জুটেছে, এই মহৎ কাজে কিছু একটা ফুটফরমাস্ খাটতে পারলে একেবারে চরিতার্থ হয়ে যাবে। সুবল নিজের উপযুক্ত পদমর্যাদা অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিচ্ছে ছেলে-গুলোকে দিয়ে। হাতের কাছে তারা খড়ের যোগান দিচ্ছে, দড়ি দিচ্ছে এগিয়ে। একটু ভুল হলেই ধমক দিচ্ছে সুবল : হেঃ দেখ দেখ, বোকাটা কি বা করোছে হে।

এরই মধ্যে মহিন্দর এল।

—শুনিলা হে মাস্টার ?

—শুনছি, কী বলবে বলো।

—চল্লিশটা টাকা উঠিলে। আর ক্যাতে নাগিবে ?

বংশী বিস্মিত হয়ে বললে, চল্লিশ টাকা তুলেছ ? তবে তো ঢের হয়েছে—এর বেশি আর লাগবে না মহিন্দর।

—নাগিবে না ? ইতেই হই যাবে ?

—হ্যাঁ।

—হামাদের পূজা হেবে—হামরা ইঠে একটা গানের যোগাড় নি করুম ?

—গানের যোগাড় ?—বংশী আত্মমগ্নভাবে অল্প একটু হাসল : সেজন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমিই করব এখন। কোনো ভয় নেই, গান হবেই।

—কুন্ঠে থেকে গান আনিবা হে তুমি ?—এবারে মহিন্দর আশ্চর্য হল।

—এখন বলব না। কিন্তু কিছু ভাবতে হবে না মহিন্দর, গান ঠিক এসে যাবে তোমাদের।

মহিন্দর আর পীড়াপীড়ি করল না। অনেক লিখিছে মাস্টার, তার সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধা মহিন্দরের। মাস্টার যা খুশি তাই করতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত বোধ করল। তবুও এখনো অনেক সমস্যা আছে—সেগুলোর ভালো করে একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না মহিন্দরের মন।

—হামাদের পূজা, আর সব গায়ের কুটুম-কাটুমগুলাক তো নেওতা (নিমন্ত্রণ) দিবা হয়।

—তা দিয়ো।

—হাঁ, ওই সনাতনপুরের ভূষণকে কহিবা হেবে, রাসুকও খবর দিবা নাগিবে।

—দিয়ো খবর—বংশী নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলে, সকলকে ডেকে এনে পেট ভরে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিয়ো, খুশি হয়ে বাড়ি চলে যাবে।

আনন্দে ঝলমল করে উঠল মহিন্দরের মুখ : ই কথাটাই তো হামি কহিবা চাহোছিনু। পূজা হেবে, জাত-কুটুমক ভালো করি তো খিলাবা নাগে। না তো ফের শালার ঘর বদনাম করি বেড়াবে। তো কয়টা পাঁঠা লাগিবে ?

—পাঁটা ?—বংশী আশ্চর্য হয়ে বললে, পাঁটা কী হবে ?

—ক্যানে, বলি দিবা নাগিবে না ?

—না, এ পূজোয় পাঁটা বলি দিতে নেই।

—তো ফের কিবা বলি দিবা হয় ? ম্যাড়া ?

—না, ম্যাড়াও নয়। কিছুই বলি দিতে হবে না।

—হায়রে বাপ, বলি দিবা হয় না ? মহিন্দরের আনন্দোজ্জ্বল মুখে আশাহত বিস্ময় দেখা দিলে : বলি না হয় তো ক্যামন পূজা ?

—এই নিয়ম। দেবী বোষ্টুম কিনা, মাছমাংস খান না।

—নি খান ?—মহিন্দর নিরাশাক্ষুব্ধ স্বরে বললে, তবে কী খিবে ?

—কুমড়ো, কাঁচকলা, কপি, মূলো, আলু—সবরকম আনাজ। শুধু পেঁয়াজ নয়।

—হুঁ, বুঝিনু—খানিকক্ষণ মুখটাকে হাঁড়িপানা করে রইল মহিন্দর। পুজো সম্পর্কে তার,যা স্বাভাবিক ধারণা সেটা স্পষ্ট। পাঁটা বলি হবে, মাংস রান্না হবে, চলবে মদের শ্রাদ্ধ।

জ্ঞাতি-কুটুম নিয়ে বসা যাবে আসর জমিয়ে। কালীপূজো কিংবা বিষহরী উপলক্ষে এটাই চিরাচরিত রেওয়াজ। কিন্তু নিছক কচু কুমড়োর ঘ্যাঁট খাওয়াতে চায়, এটা কেমন পূজোর ব্যবস্থা মাস্টারের।

ক্ষুণ্ণ স্বরে মহিন্দর বললে, তো কুটুমগুলাক্ কি খিলামু? মাংস না থাকিলে—

মহিন্দরের মনের অবস্থা বুঝলে বংশী। হেসে বললে, তা আলাদা করে তোমরা পাঁটা কেটে রান্না করতে পারো, খাওয়াতে পারো তোমার জ্ঞাত-কুটুম্বদের।

—দোষ হেবে না?

—না।

মহিন্দর প্রসন্ন হল। বললে, তো হামি খাসীর যোগাড় করি।

—কর।

চলে যাচ্ছিল মহিন্দর, মুখ ফিরিয়ে বললে, গানের কথাটা ভুলিয়ো না হে মাস্টার।

শান্ত স্বরে মাস্টার বললে, না না, সে ঠিক আছে, ভুলব না।

মহিন্দর চলে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিমার খড় বাঁধতে সুবল বর্মণ উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। আগ্রহ ব্যাকুল স্বরে বললে, এইঠে কি গানও হেবে?

—হাঁ, হবেই তো।

—কী গান?

—আলকাপ।

—বড় ভালো গান।—লুব্ধ কণ্ঠে সুবল বললে, শুনিবা আসিমু।

—নিশ্চয় আসবে। তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল।

অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রতিমার কাঠামোতে খড় চাপিয়ে চলল সুবল, দেবীর প্রতি হঠাৎ একটা শ্রদ্ধা আর অনুরাগ জেগে উঠেছে তার মনে। আধ-ন্যাংটো ছেলেগুলো দড়ি আর খড় এগিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে: এইঠে গান হেবে—গান হেবে—আলকাপের গান।

বংশী শুধু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দূর প্রান্তরের দিকে। একি অতুল মজুমদারের অপমৃত্যু, না বিচিত্র একটা নবজন্মের সূচনা? আত্মহত্যা না আত্মবিকাশ?

পরিষ্কার জবাব নেই কিছু। শুধু মনের সামনে ভাসছে শান্তির মুখখানা। দুষ্টুমিভরা কালো চোখে শান্তি তাকিয়ে আছে তার দিকে: তুমি পারবে না, তুমি পারবে না।

প্রতিশ্রুতিটাই পালন করতে হবে। কী পারা সম্ভব আর কী নয়—সে কথা ভেবে আর লাভ নেই। এই অন্ধকূপের নির্বাসন—এই সাপের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আর নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা—এইখানেই ঘটুক এর চিরসমাপ্তি। হয়তো নতুনের শুরু, নইলে শেষের পালা।

ছেলেগুলো তখনো ঘুরে ঘুরে নাচছে : গান হেবে, গান।

—গান তো হেবে কিন্তক—

কথাটা আরম্ভ করেই সন্দিগ্ধ ভাবে থেমে গেল ধলাই।

—থামিলে ক্যানে? কী কহিবা চাহো সাফ সাফ কহো।

—কহিম্ ?—ধলাই আবার ইতস্তত করতে লাগল।

কথাগুলো হচ্ছিল যোগেনের বাড়ির দাওয়াতে। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না পড়েছে, সামনের নিম গাছটার পাতাগুলোর ভেতর থেকে আলো-আঁধারি এসে দোল খাচ্ছে দাওয়াতে। কোথায় যেন ভাঁট ফুল ফুটতে শুরু করেছে, বাতাসে আসছে তার সুগন্ধ। চাটাই পেতে বসেছে ওরা দুজন। অস্পষ্ট ছায়া মেশানো জ্যোৎস্নায় ওদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু ওদের মুখের বিড়ির আগুন দুটো ঝিকমিক করছে।

সন্ধ্যার পরে সুরেনের জুতো ঠোকা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এখানে গানের আসর বসায় যোগেন। প্রথম প্রথম তাদের চেঁচামেচিতে জেরবার হয়ে গিয়েছিল সুরেন, একদিন একটা ঠ্যাঙ্গা হাতে করে তেড়েও এসেছিল। কিন্তু ক্রমশ বিতৃষ্ণাটা কেটে গেছে, এখন সে দস্তুর-মতো ভাইয়ের গুণমুগ্ধ। এমন কি এত খুশি হয়েছে যে, বলেছে : দু-চারিটা জায়গাত্ যদি ভালো গাহিবা পারিস তো হামি নিজে তোক্ একটা কলের বাঁশি (ক্ল্যারিয়োনেট) কিনি দিম্।

আর আড়ালে আড়ালে বসে শোনে যোগেনের মা, সুকণ্ঠ সুদর্শন ছেলের গর্বে—গৌরবে তার বুক ভরে থাকে। মাঝে মাঝে দরজা ফাঁক করে এসে চকিতের জন্যে উঁকি দেয় সুশীলা, যোগেনের দৃষ্টি এড়ায় না। রক্তের ভেতরে যেন চঞ্চলতা জেগে ওঠে, মধুবর্ষী কণ্ঠে আরো বেশি করে মধু ঢেলে দিয়ে যোগেন গান ধরে :

কইন্যা, ভ্রমর জিনি নয়ন তোমার
উড়ি উড়ি যায় হে,
হামার বুকের ভিতর ফুল ফুটিলে
তাহার মধু খায় হে—
হায় হায়—।

যোগেনের চোরা চাহনি একজনের চোখে ধরা পড়ে গেছে—সে ধলাই। কোনো মন্তব্য করে না, মাঝে মাঝে মুচকে মুচকে হাসে। আজকাল অবশ্য একটু কাজ বেড়েছে তার, যোগেন বাড়িতে থাকবে না নিশ্চিতভাবে জেনেও সে আসে যোগেনকে ডাকতে। যদি বাড়িতে না পায় তা হলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বাইরের দাওয়াতে, গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে, যে অউদ (রোদ) উঠিছে—বাপ্‌রে বাপ্। একটু পানি না খিলাইলে হামার

চলিবার জোর নাই।

শুধু পানি খায় না, পানও খায়। সুশীলাই মাঝে মাঝে পান এনে দেয় তাকে। কথাটা শুনে, বলা বাহুল্য, যোগেনের ভালো লাগেনি। একবার ভেবেছে, ধলাইকে নিষেধ করে দেবে যখন-তখন তার বাড়িতে আসতে, মাকে বলবে সময়ে অসময়ে ওকে পান বা পানি কিছুই না দিতে। ধলাইয়ের অল্প অল্প গোঁফের নিচে মিটমিটে হাসিটাকে কেমন সন্দেহ করে যোগেন, কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা জাগে। কিন্তু কিছুই বলা যায় না—কেমন সংকোচে বাধে। সুশীলার বাপ বিয়ের প্রস্তাবে এখনও স্পষ্ট করে রাজী হয়নি, অনেকগুলো টাকা চেয়ে বসেছে, এখনো গজর গজর করছে সুরেন। কাজেই যোগেন এখনো দাবিটাকে প্রকাশ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি সুশীলার ওপরে, যেটা চলেছে সেটা একেবারেই আড়ালে আবডালে এবং অনেকখানি সামাল দিয়ে। তা ছাড়া মাকেও কিছু বলা যায় না, যোগেনের বন্ধু বলে এবং ধলাইয়ের মুখ ভারী মিষ্টি বলে মা ও তাকে একটু স্নেহই করে আজকাল। বলাও যায় না কিছু ধলাইকে, সওয়াও যায় না। আরো মুশকিল যে, ধলাই গুণী লোক। ক্ল্যারিয়োনেট রীতিমতো ভালোই বাজায়, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই সে বিষয়ে। তাকে বাদ দিলে নিশ্চিতভাবে দলের ক্ষতি হবে—নইলে যে কোনো একটা ছুতো নিয়ে অনেক আগেই লোকটাকে বিদায় করা যেত। মনের বিতৃষ্ণাটা মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে প্রকট হয়ে পড়ে, এবারেও পড়ল। ধলাইয়ের কথার ধরনে বিরক্ত হয়ে যোগেন বললে, কী কহিছ, সাফ সাফ বলি দাও।

পাতলা গোঁফে একটুখানি তা দিয়ে ধলাই বললে, ইগ্‌লান কী পালা বানাইছ?

—ক্যানে, কী দোষ হৈল্?

—দোষ নি হৈল্?—ধলাই কেমন একটা দৃষ্টিতে যোগেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তুমার মতলবখানা কি হে?

—কুন্ মতলব?—উষ্ণভাবে যোগেন প্রশ্ন করল।

—ই ক্যামন আলকাপের গান, হামি বুঝিবা নি পাইমু।

—ক্যানে?

—ক্যানে?—ধলাই গোঁফে আবার তা দিলে: আল্‌কাপের গান হামরা যিটা জানি সিটা তো কাপ। রং হেবে, তামাসা হেবে। মানুষ মজা করিবে, হাসিবে। কিন্তুক তুমার ই গান দেখি হামার ডর ধরোছে দাদা।

—ডরিবার কী আছে? যিটা সাঁচ্চা ওইটা কহিমু না?—যোগেন আরও উষ্ণ হয়ে উঠল। বয়সে বড় এবং সংসারের ব্যাপারে আরো কিছু অভিজ্ঞ ধলাই হাসল করুণার হাসি। বললে, ছোয়াপোয়ার মতন মন লিয়ে কাম করিবা হয় না। যিটা সাঁচ্চা, দুনিয়ায় ওইটাই কি কহিবার যো আছে? হায়, হায়, সিটা হইলে তো কাম একদম ফতে হই

থিত। সাঁচ্চাটাক্ ঝুটা করিবা পারিলে—তেবে—হুঁঃ!

মস্ত একটা দমক দিয়ে ধলাই বক্তব্যটা শেষ করল।

যোগেন বিদ্রোহীর মতো বললে, হামি কাঁউক নি ডরাই। যিটাক সাঁচ্চা বলি জানিমু, উটাই কহিমু, সাঁচ্চাক মুই ঝুটা করিবা চাহি না।

—তো নি চাহো তো নি চাহিবেন। কিন্তুক্ মুশকিল হেবে।

যোগেন ঘাড় বাঁকিয়ে বললে, মুশকিল হেবে না।

—হায় হায় দাদা দুনিয়াক চিন্হ্ নাই।—যেন খুব ভালো করেই চিনেছে এমনি ভঙ্গিতে ধলাই বলে চলল: দেখিয়ো, শেষে ফাটক যিবা নাগিবে।

—ক্যানে ফাটক?

—ক্যানে ফাটক? দারোগাক গাইল দিবে, মহাজনক গাইল দিবে, আর উয়ারা ছাড়ি কথা কহিবে তুমহাকে? জাত সাপের ল্যাজ ধরি কচলাবা চাহোছ, ফের কাঁদিবা হেবে কহি দিনু।

যোগেন চুপ করে রইল। ধলাইকে সে পছন্দ করে না, মনের কাছে অস্পষ্ট, অথচ অতি নিশ্চিত একটা সন্দেহও তার সম্পর্কে আছে যোগেনের। লোকটার গোঁফ পাকানো আর সেই সঙ্গে অবহেলাভরা মৃদু মৃদু হাসির ভঙ্গিতে তার পিত্ত পর্যন্ত জ্বালা করে ওঠে, এটাও ঠিক। তবু মানতেই হবে, তার বলার মধ্যে অন্তত খানিকটা সত্য আছে। যে গান বংশী মাস্টার তাকে দিয়ে লেখাচ্ছে তা লিখতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভয়ে তার নিজের আঙুলই আড়ষ্ট হয়ে যায়। এ কী লিখতে যাচ্ছে সে, ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে কোন্ ভয়ঙ্কর সর্বনাশের নিশ্চিত শিখাতে!

অথচ নিজের মন তার যে গান আজ লিখতে চায় সে গানের সঙ্গে এর তো কোনো সম্পর্ক নেই। তার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত কল্পনা এখন কিশোরী সুশীলার চারদিকে একটা গন্ধমাতাল মৌমাছির মতো ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেটাকে আশ্চর্য রকমের ঘননীল আর সুন্দর বলে মনে হয়, এখন চাঁদ উঠলে বুকের ভেতরে জোয়ার জাগে। দিনে রাত্রে ঘুমে জাগরণে সে যেন অপরূপ একটা স্বপ্নের গভীরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে—ধলাইয়ের ক্ল্যারিয়োনেট বাঁশির মতো কী একটা মিষ্টি সুর সারাক্ষণ তার কানে যেন ঝঙ্কার দিয়ে যায়। কখনো আবছা আলোয়, কখনো অন্ধকারের আড়ালে সুশীলা তার কাছে আসে, একান্ত হয়ে মিশে যায় তার বুকের ভেতরে, তার চুলের রাশিতে আবিষ্ট মুখখানাকে ডুবিয়ে দেয় যোগেন—নিশি-পাওয়া অবশ মুহূর্তগুলো যেন ঝড়ের পাখায় উড়ে যেতে থাকে।

গান আসে, কত গান। শরতের শিউলি ডালে ঝাঁকুনি লেগেছে। ফুল ঝরে, রাশি রাশি ফুল। পরীরাজ্যের রাজকন্যা নেমে এসেছে তার জীবনে, তাকে বাঁচিয়েছে একটা

বিকৃত সন্ধ্যার বীভৎস স্মৃতির পীড়ন থেকে। সুশীলার কানে কানে তার প্রেমের কথা সুর হয়ে ঝরে পড়েছে :

তুমি আমার পরাণ হে কইন্যা,
সাপের মাথার মণি
তুমারে আগুলি রাখি দিবস রজনী।
দিনে তুমি দিনের আলো,
রাইতে ঘুচাও রাইতের কালো,
মরিব মরিব কন্যা—
তোমা হারাইমু যখনি—

কিন্তু বংশী মাস্টার। জ্বলন্ত সূর্যের মতো চোখ। শিশির উড়ে যায়—ছায়া পুড়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। অনেকবার যোগেন ভেবেছে, রাজী হবে না তার কথায়। চারণ হয়ে তার দরকার নেই, দরকার নেই তার সৈন্যদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার দায়িত্ব নিয়ে। সে ছোটই আছে, ছোটই থাকবে, ছোট একটা ঘর বাঁধবে তার মনের মানুষকে নিয়ে। কিন্তু—

কিন্তু সূর্যের দিকে তাকালে দৃষ্টি যেমন জ্বলে যেতে চায়, সে অবস্থা তারও হয়েছে। অনেক কথা বলতে চায়, বলতে পারে না। শুধু কানের কাছে বাজে : তোমাকে কাজ করতে হবে যোগেন—ঢের কড় কাজ। আর এ কাজের দায়িত্ব তুমি—একমাত্র তুমিই নিতে পারো।

আর কোনো কথা সরে না যোগেনের। মূঢ়ের মতো আবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কাঁচপোকার আকর্ষণে তেলাপোকা নাকি কাঁচপোকা হয়ে যেতে চায়, তেমনি একটা কিছু হতে চাইছে নাকি যোগেনও? আশ্চর্য, সময় বুঝেই কি মাস্টার আসে! গভীর রাত্রে—পৃথিবী যখন অদ্ভুত নির্জনতায় ঝিমঝিম করে, চারদিকের তন্দ্রা-গভীর পরিবেষ্টনী নিজের ভেতরে একটা অপরূপ অনুভূতির সঞ্চার করে, যেন ভালোমন্দ বিচারের সময় থাকে না। যোগেনের মনে হয়, মাস্টার তার দুটো জ্বালা-ভরা চোখ তার চোখের দিকে বিকীর্ণ করে পাহাড়ী অজগরের মতো তাকে যেন আকর্ষণ করতে থাকে। বোবা প্রতিবাদ গলার কাছে এসে অব্যক্ত অসহায়তায় থেমে যায়। মাস্টার বলে, "লেখো লেখো যোগেন, নতুন দিনের নতুন গান লেখো। তুমি কবি, তুমি শিল্পী, নতুন প্রভাতের বৈতালিক।" আর তখনি লেখে যোগেন।

কী লেখে?

যোগেনের ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়ে কথা কয়ে উঠল ধলাই :

তোমাকই হামি কহোছি। ইটা কেমন ধারা গান হে তুমার?

ধলাই গানটা পড়তে লাগল :

হায়রে হায়, দ্যাশের একি হাল,
কুনবা পাপে এমন করি
পুড়িলে কপাল !
মহাজনে রক্তচোষা
জমিদার ফোঁস্ মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল—
মোদের হৈল কাল।
প্যাটের জ্বালায় মৈল মরদ
বউয়ের গলাত্ দড়ি,
চ্যাংড়া-প্যাংড়া বিকায় হাটত
দামে কানাকড়ি।
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
সকল হৈল ঝালাপালা—
ওই তিনটা শালাক মারি খ্যাদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল—
আর কতকাল সহিবা ভাই
দ্যাশের পোড়া হাল।

গানটা পড়তে পড়তে চোখ কপালে উঠছিল ধলাইয়ের, পাগল হৈছ নাকি হে তুমি ?

যোগেন হয়তো কিছুই বলত না, হয়তো চুপ করে শুনে যেত, হয়তো বা সচেতন হওয়ার চেষ্টা করতো নিজের অপরাধের গুরুত্ব সম্পর্কে, হয়তো বা এই দুর্বল বিতৃষ্ণাভরা মুহূর্তে ফস করে বলে বসত, হামার কুনো দোষ নাই। ওই মাস্টারটা হামাকে দিয়া ইসব নেখাছে। হামি নিখিবা চাহি না, কিন্তু ক্যামন যাদু জানে মাস্টার—হামাক য্যান বশ করি ফ্যালায়।

কিন্তু স্বীকারোক্তিটা করতে গিয়েও যোগেন চমকে উঠল।

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে ধলাই। সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণায় একটুখানি হাসি দেখা দিয়েছে তার। হাসির রেখাটা এত সূক্ষ্ম যে, খুব সজাগ চোখ না থাকলে চট করে নজরে পড়ত না। চোখের দৃষ্টি তার কেমন কুঞ্চিত হয়ে গেছে, চোখের তারাগুলো কোণের দিকে ঠেলে সরিয়ে এনে কী একটা চকিতের মধ্যে সে দেখে নিলে। দরজার দিকে পিঠ করে বসেছিল তার মুখোমুখি। লণ্ঠনের আলোয় ধলাইয়ের দৃষ্টির বিশেষত্বটা লক্ষ্য করেই সে সঙ্গে সঙ্গে তাকালো ধলাইয়ের পিছন দিকে। আর দেখল—

দেখল চট করে কে যেন ওখান থেকে সরে গেল তৎক্ষণাৎ। একটা ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ঠিন ঠিন করে অস্পষ্টভাবে সাড়া দিয়ে গেল কাঁচের চুড়ি।

ওই ছায়া, ওই চুড়ির শব্দ যোগেনের একান্ত করেই চেনা। আজ বোঝা গেল, আজ যেন মনের কাছে এটা আর চাপা রইল না যে, চাঁপার বরণী যে বন্যা, যার কালো চোখ থেকে ভ্রমর উড়ে উড়ে পড়তে চায়, তার জীবনে যে সাপের মাথার মণি, সে একান্তভাবে তারই শুধু নয়! সেখানে আজ প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়াপাত হয়েছে। আজ যোগেনের গানের চাইতেও আরো মাদক, আরো বিভ্রম-জাগানো আকর্ষণ এসেছে সুশীলার কাছে—সে ধলাইয়ের ক্ল্যারিয়োনেট। সে বাঁশির সুর—যে সুরে স্বয়ং শ্রীরাধিকাও তাঁর কুলমান যমুনার কালো জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন!

যা বলবে ভেবেছিল, যোগেন বলল না। বরং অত্যন্ত তীব্র কটুস্বরে বলে বসল: হামার গান—হামি যা ভালো মনে কইনু, সিটাই নিখিনু।

—তো নিখ। হামরা তুমার সাথ বাজাবা পারিমু না। ঝুটামুটা ইসব করি ক্যানে জ্যাল্ খাটিবা যিবার কহো?

—না পারিবা চলি চাও—

হঠাৎ বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে উঠল যোগেন: ক্যাহো তুমাক থাকিবা কহোছে না। খালি মেজাজ আর মেজাজ দেখাছ। খুব বাঁশি বাজাবা শিখিছ—দেমাকে পা পড়োছে না মাটিত্।

যোগেনের উত্তেজনায় ধলাই যতটা আহত হল, তার চেয়ে বিস্ময় বোধ করল বেশি। হঠাৎ এরকম চেঁচিয়ে ওঠার মানেটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

যোগেন বললে, চলি যাও—অ্যাখনে চলি যাও।

সূক্ষ্ম গোঁফের নিচে সরু হাসির রেখাটা ফুটতে না ফুটতেই আবার নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ধলাইয়ের।

—চলি যামু?

—হঁ, চলি যাও।

নিচের ঠোঁটটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ধলাই বললে, ফের পাও ধরে সাধিলেও নি আসিমু।

—তুমার মতো ছোটলোকের পাও ধরি সাধিতে হামার বহি গেইছে।

—হামাক্ গালি দিলে? ধলাইয়ের স্বর হিংস্র শোনাল: গালি দিলে হামাক?

—হঁ, দিনু তো।

ধলাই বললে, ইটা পাকা কথা?

—হঁ, পাকা কথা।

—আচ্ছা, হামি চলি—

হাসিয়োলেড়ো বাঁশিটাকে তুলে নিয়ে ধলাই উঠে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, নিজের পা ভেঙে নিয়ে ঘুরে বাইরে। যা করিবা মিছু, স্বামীর বাপ মাথায় হাত দিই কাঁদিবা ভেবে—ইটা কহিছু তুমহাক।

—তখন তুমহাক ডাকিমু না হামি—তীব্র তিক্ত স্বরে প্রত্যুত্তর দিলে যোগেন।

—দিটাই ভেবে মনে রাখিও—

ধলাই দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। শেষবার বললে, বাড়িত ডাকি আনি হামাক তুমি অপমান করিলেন। ইয়ার বদলা নিতে না পারি তো চামারের বাচ্ছা নহো হামি।

তারপরেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। যোগেন রক্তচক্ষে সেদিকে তাকিয়ে রইল, ইচ্ছে করল খরের মধ্যে উঠে গিয়ে প্রাণপণে সুশীলার গলাটাই সে হাতের মুঠিতে নিস্পিষ্ট করে দেয়।

নয়

কিন্তু যোগেন সুশীলাব গলাটা টিপে ধরবে কি, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে দিন কয়েক আগেই।

একটা ছোট দলের সঙ্গে মাইল বারো দূরে বাঁশি বাজাতে গিয়েছিল ধলাই। শেষকালে পাওনা-গণ্ডা নিয়ে গণ্ডগোল লেগে গেল দলের চাঁই ঢোলওলার সঙ্গে।

ঢোলওলা বললে, ওই যা কহিছু পাঁচসিকা, অর বেশি একটা পাইসা বেশি না দিমু।

—আর তুমি লিবেক আঢাই টাকা করি?

—ক্যানে লিমু না? হামার ঢোল, হামার দল। তুমি কুন্ তালুকদারের ব্যাটাটা আইলেন হে? তুহাক পাঁচসিকা দিলে তো ওই বাঁশিঅলাকও দিবার নাগে।

—ত তুমি অক্ পাঁচ পাইসা দাও—হামার বহি গেইছে। হামাক্ দুই টাকা দিবার নাগিবে।

—ক্যানে—ক্যানে? অ্যাতে সখ ক্যানে তুমার?

—সখ হেবে না?—ধলাই চটে উঠল এতক্ষণে: এমন বাঁশি দেখিছ কুনো ঠে? দেখিছ বাপের বয়সে?

—বাপ তুলিয়ো না কহি দিছু—হ্যাঁ!—ষণ্ডা জোয়ান ঢোলওলা রুখে উঠল: ও দাঁত-গুলান্ বেবাক উড়াই দিমু। ওঃ ভারী বাঁশি বাজবা আলোছেন! অমন বাঁশি হামি—

তারপরে ঢোলওলা যা বললে সেটা অকথ্য। ধলাই খানিকক্ষণ রক্তচোখে তাকিয়ে দেখল তার দিকে, দেখল তার শরীরের ফুলো ফুলো পেশীগুলোকে। বুকভরা কালো লোম লোকটার, বাঁকের নিচে বুক পৌঁছে আছে তার ভরাট একসারি দাঁত—যেন একটা বুনো ভালুকের চেহারা। সামনে খুব এখুনি হয়ে যেতে পারে, ও পক্ষ তৈরিও আছে

বোঝা যায়, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে সেটাও কল্পনা করে নিতে খুব বেশি অসুবিধে হল না ধলাইয়ের।

তবু সম্মান রাখবার জন্যে দুর্বল কণ্ঠে বললে, খুব যে তেজ দেখাছ ! মারিবা নাকি হে ?

—মারিমু তো। বেশি চ্যাটাং ফ্যাটাং করিবেন তো হাড়গুলান্ লিয়ে বাড়িত্ ঘুরি যাবা না নাগে—হুঃ !

—হামি নি বাজামু তুমার দলে।

—নি বাজাবু তো নি বাজাবু!—কালো গোঁফের নিচে এবারে কোদালে কোদালে দাঁতগুলোকে একসার গাজরের মতো খিঁচোল ঢোলঅলা। হঠাৎ কতগুলো টাকা পয়সা ছুঁড়ে মারল ধলাইয়ের দিকে, নাকে হাত দিয়ে বসে পড়ল ধলাই।

—লে, তোর দুই দিনের পাওনা আড়াই টাকা। যা চলি যেইঠে তোর মন চাহে। তোর মত বাঁশিওলাক্—আবার একচোট অশ্রাব্য গাল। ধলাই আহত কুকুরের মতো উঠে দাঁড়াল, সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে কুড়িয়ে নিলে পয়সাগুলোকে, তারপর মনে মনে ঢোলঅলার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে ফিরে চলল।

ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিল শেষরাতে। এ দেশের 'মানসিলা'র (মানুষগুলোর) রাতে চলাফেরা করবার অভ্যাস আছে, তার ওপর শরীর গরম করে নিয়েছে একপেট তাড়িতে, গোঁ গোঁ করে হেঁটে চলল ধলাই। ভয়ানক রকম বিগড়ে গেছে মেজাজ। দেশ-গাঁয়ের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে যাচ্ছে ধলাই। এ দেশের বোকা-হাবা দেহাতীগুলো না বোঝে তার কেরামৎ, না বোঝে তার বাঁশির বাহাদুরী। এই 'বরিন্দ' দেশের (বরেন্দ্রভূমি –রাঙা মাটি) 'বারিন্দা'গুলোর চাল-চলনের কথা মনে পড়লেও পিত্তিসুদ্ধ রী রী করে জ্বলে ওঠে তার। তালমানের বালাই নেই, ডুম্ ডুম্ করে ঢোল পেটে আর ট্যাং ট্যাং শব্দে খালি বাজাতে পারে ফাটা-কাঁসর। সানাইতে এক 'বুঢ়া হে, ক্যানে পরিলা বাঘের ছাল' ছাড়া আর কোনো সুরই ওঠে না তাদের। মোটা মোটা চামড়ার জুতো তৈরি করা, পাঁঠা-ছাগল মোষ যা পায় নির্বিচারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে খাওয়া আর গাঁক্ গাঁক্ করে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করা—এই হল রুইদাসদের, তার জ্ঞাত্-গোত্তরদের একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয় !

অথচ, কলকাতা। কত বড় শহর, কেমন সব ফিন্‌ফিনে মিহি মানুষ ! তালুকদার বাড়ির ছোটবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল, কাটিয়ে এসেছিল পুরো একটা মাস। অতি উগ্র মদের তীব্র প্রভাবের মতো তার রক্তের মধ্যে কলকাতা উঁকি দেয়, থেকে থেকে সঞ্চারিত হয় বিভ্রান্ত বিস্রস্ত চৈতন্যের নেপথ্য থেকে। কেমন শির শির করে ওঠে শরীর, রক্ত লাফাতে থাকে রগের মধ্যে। কলকাতা।

দিনের বেলা বাড়ি গাড়ি মানুষ। রাত্রে ঝলমলে আলো। এত আলো—সমস্ত মন-টাকে যেন আলো করে দেয়। কলকাতাতেই চা খেতে শিখল ধলাই। যেখানে খুশি বসে

খাও, ইচ্ছে মতো চা খাও এক ঠোঙা তেলেভাজা দিয়ে, গরম ফুলুরী, নরম আলুর চপ। তিন আনা দিলেই বায়োস্কোপ, আর আট আনা খরচ করলে—

উস্‌স্—শব্দ করে লাল-টানার মতো একটা আওয়াজ উঠল ধলাইয়ের জিভে আর দাঁতে। যেন স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছে গলাভর্তি পচা পাঁকের মধ্যে। এ আর সহ্য হয় না। আলোয় ভরা কলকাতার পাশে পাশে ধুলোয় আর বন-বাদাড়ে ভরা এই 'বরিন্দের' তুলনাটা যখনি মনের মধ্যে এসে দেখা দেয় তখনি যেন দুঃসহ একটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করে তার।

এ তার দেশ নয়। কোন মানুষেরই দেশ নয়। এখানকার বারিন্দাদের মানুষ বললে কলকাতার লাগাম আঁটা ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াগুলো পর্যন্ত হো হো করে হেসে উঠবে বলে মনে হয় তার। এখানকার কন্টিকারী আর মরা ঘাসে ভরা মাঠের মধ্যে চরে বেড়ায় যে গোরুছাগলগুলো, তাদের সঙ্গে কোনো পার্থক্যই নেই এদের। এই ঢোলঅলা লোকটাই তার নমুনা। তবে ও লোকটাকে গোরু-ছাগল বললে কম বলা হয়—আসলে বলা উচিত ষাঁড়।

এক যোগেন কবিওলার মধ্যে একটু ভদ্রতা আছে। গান-বাজনা কিছু শিখেছেও মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধিটা বড় সুবিধের নয় যোগেনের। তার মতলবটা এখনো ঠিক ধরতে পারেনি ধলাই। বুদ্ধিসুদ্ধি তো যথেষ্ট আছে, লেখেও নিতান্ত খারাপ নয়, কিন্তু লেখে কী? রাজ্যসুদ্ধ লোককে গাল দিচ্ছে, গাল দিচ্ছে পুলিসকে, গাল দিচ্ছে জোতদারকে। কিন্তু এ তো ঠিক হচ্ছে না, অকারণে খোঁচা দেওয়া হচ্ছে ঘুমন্ত বাঘের গায়ে। একটা কেলেঙ্কারি হবে শেষ পর্যন্ত—নাকের জলে চোখের জলে একাকার হতে হবে যোগেনকে।

যোগেনের কথা মনে পড়তেই ধলাইয়ের চমক ভাঙল। চোখ তুলে দেখে কালো আকাশে ফিকে হয়ে এসেছে রাত্রির নক্ষত্রগুলো, ছাই রঙ ধরেছে পূবদিকে। পাখির কিচির মিচির শুরু হয়েছে গাছে গাছে। পথ থেকে উঠেছে শিশির-ভেজা ধুলোর গন্ধ, পায়ের পাতায় জড়িয়ে ধরছে ভিজে ভিজে ধুলো। ভোর হয়ে এসেছে। শেষ শীতের ভোর। মাঠের ওপর, গাছের মাথায় আবছা কুয়াশা। তাড়ির নেশাটা মরে গেছে এখন, শীত ধরেছে শরীরে। টপ করে এক ফোঁটা অত্যন্ত শীতল শিশির এসে পড়ল কপালে, ফোসকা পড়বার মতো যন্ত্রণা বোধ হল একটা, কুঁকড়ে গেল গায়ের চামড়া।

একটু গরম হওয়া দরকার। অন্তত এক ছিলিম তামাক। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?

থেমে দাঁড়াল ধলাই। রোদ নেই, তবু বরাবরের অভ্যাসমতো চোখের ওপর হাতটা তুলে ধরে তাকালো সামনের দিকে। চেনা যাচ্ছে সামনের গাঁ-টাকে। ওই তো জোড়-টিলা, বাঁ দিকের টিলাটার মাথার ওপর ত্রিভঙ্গ ধরনে হেলে আছে বাজে পোড়া তালগাছটা।

হাঁ—ওটাই সনাতনপুর।

আঃ—অনেকদিন পরে ভুলে যাওয়া চায়ের স্বাদটা মনে পড়ল। কলকাতার সেই মিষ্টি গরম চা, পাঞ্জাবী দোকানে চায়ের মালাই। সেই রকম এক কাপ চা যদি পেত এই শীতের আড়ষ্ট, ক্লান্ত, মন্থর সকালটাতে! ক্লান্তি জুড়িয়ে যেতো, গরম হয়ে যেতো শীতের বাতাসের ছোঁয়াতে শরীরের মধ্যে জমাট-বেঁধে-আসা হিমরক্ত। এখানে অবশ্য সে চা জুটবার আশা বৃথা। তবু যোগেনের বাড়িতে ছিলিমখানেক তামাক যদি মেলে সেও মন্দ হবে না। বিড়িতে আর শানাচ্ছে না তার, দরকার খানিকটা কড়া দা-কাটা তামাক।

চারিদিকে শীতের কুয়াশা। তাই রাঙা আকাশ ফ্যাকাশে সাদা হয়ে আসছে, চাঁদটাকে দেখাচ্ছে মড়ার খুলির একটা ভাঙা চোক্লার মতো। পায়ে পায়ে লেপ্টে ধরেছে শিশিরে ভেজা ধুলো। আবার হাড়-কাঁপানো একবিন্দু শিশির এসে পড়ল ধলাইয়ের মুখে। কড়া তামাকের সম্ভাবনায় গলাটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে, পথ কাটবার উদ্যমও বেড়েছে খানিকটা। জোরে পা চালিয়ে দিল ধলাই।

কলকাতা। বহুদূর থেকে তার লক্ষ লক্ষ আলোক চোখের মায়াবী সঙ্কেতে ডাক দিচ্ছে ধলাইকে। ছোট জাত বড় জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ, ধুতি পরলেই বাবু। অনায়াসেই ধলাই নিজের জায়গা করে নিতে পারে সেখানে। সে গুণী। ওখানে সমজদার মানুষ আছে, তার গুণের কদর করবে।

জোড়-টিলার কাছাকাছি পৌঁছুতে আরো অনেকটা ফসা হয়ে এল পৃথিবী। পাখির কিচিরমিচির বেড়ে উঠেছে চারদিকে। বাতাসে দূর থেকে মোরগের দরাজ গলা ভেসে এল।

সুরেনের বাড়ির পেছন দিয়ে রাস্তাটা। রাস্তার লাগাও একটা ডোবা, তার ধার দিয়ে পৌঁছুতে হয় বাড়ির সদরে। ডোবার পাড়ির সেই ফালি পথটুকুতে পা দিতেই মুচিপাড়ার দু-তিনটে কুকুর হাঁক দিয়ে উঠল সমস্বরে, আর ডোবার ঘাট থেকে যে মেয়েটি একটা মেটে-কলসী বগলে করে উঠে আসছিল সে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ধলাইয়ের মুখোমুখি।

বাঃ, বাঃ, খাসা। বড় ভালো জিনিস চোখে পড়ল সকালে, দিনটা কাটবে ভালো। চৌদ্দ-পনেরো বছরের দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি, ভোরের প্রথম ছোঁয়াতে মুখখানা ঢলঢল করছে একেবারে। চোখ দুটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু চোখের স্নিগ্ধ শঙ্কিত দৃষ্টিটাকে অনুমান করে নেওয়া চলে।

ধলাই বললে, মোক দেখি ডর খায়েন না। হামি চিন্হা মানুষ—ধলাই।

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। বোঝা গেল ধলাই আগে তাকে না দেখলেও সে তাকে দেখেছে। মৃদুস্বরে বললে, ধলাই বাঁশিওয়াল?

—হঁ, হঁ, বাঁশিওয়াল।—পরিচয় দিতে গিয়ে আত্মপ্রসাদ বোধ হল ধলাইয়ের। মনে হল এমন মিষ্টি করে নিজের নামটা সে কোনোদিন শোনেনি।

—এত ভোরে কুন্ঠে থাকি আইলেন?—আবার মৃদুস্বরে প্রশ্ন এল।

—ভিন্ গাঁওত্ গেইছিনু—

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ধলাই, কিন্তু মুখে আটকে গেল কথাটা। তার চোখের দৃষ্টিটা ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছে তখন। কাঁখে জলভরা কলসী নিয়ে একদিকে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, গায়ের কাপড়টা সরে গেছে। আর সেই অবসরে সম্পূর্ণ আত্ম-প্রকাশ করে বসেছে চন্দনের ফোঁটা পরানো সোনার পাত্রের মতো প্রথম যৌবনের একটি অপূর্ব পরিপূর্ণতা। ধলাইয়ের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে মেয়েটি সন্ত্রস্ত হাতে কাপড়টা ঠিক করে নিলে, আড়ষ্টস্বরে বললে, সরি যান।

এতক্ষণে ধলাইয়ের খেয়াল হল সে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর মধ্যেই শরীর গরম হয়ে উঠেছে তার, বিনা চা কিংবা তামাকেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে হিমরক্ত।

ধলাই নেশাভরা গলায় বললে, একটু খাড়াই যাও ক্যানে। দুইটা কথা কহিলে ক্ষেতি কী হেবে? কী নাম তুমার?

—সুশীলা।

—সুশীলা? বড মিঠা নাম। যোগেন কী হয় তুমার?

—ক্যাহো না, কুটুম।

ধলাই দু পা এগিয়ে এল: হামার বাঁশি শুনিছ?

—হুঁ।

—কলিকাতায় গেইছ কুনোদিন?

—না।

ধলাই বললে, তাজ্জব জায়গা হে ঐ কলিকাতা। ক্যাতে মটর গাড়ি, ক্যাতে বাড়ি, ক্যাতে আলো। কলিকাতা যিতে তুম্হার মন চাহে না?

সুশীলা বললে, চাহে তো। ফের যামু কার সাথ?

—হামি লি যামু। যিবা?

সুশীলা বললে, ধ্যাৎ।

ধলাই নেশাগ্রস্তের মতো বললে, হামি লি যামু। বিহা করিমু তুম্হাক।

—ধ্যাৎ। হামার বিহা হেবে যোগেনের সাথে।

ধলাই বললে, যোগেনের সাথ? উহাক্ বিহা করি কী ফায়দা হেবে তুমহার? উ তো ভাইর ঘাড়ত্ চড়ি বসি খাছে, খ্যাদাই দিলে কী হেবে দশাটা? হামার সাথে চল। শাড়ি দিমু, সোনা দিমু, পাকা বাড়িত থাকিবা দিমু—

এক মুহূর্ত ধলাইয়ের দিকে তাকালো সুশীলা। ভোরের আলোয় চমৎকার লাগছে লোকটাকে। আড়াল থেকে বাঁশিও শুনেছে তার। যোগেন সম্বন্ধে একটু মোহ আছে বটে, কিন্তু দূরের মানুষটিকে এই মুহূর্তে আরো আশ্চর্য, আরো রহস্যময় লাগছে। সুশীলার

মনের ভেতরে যেন কেমন ছলছলিয়ে উঠল। পুরুষের আলিঙ্গন পেয়ে যেমন যৌবন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে সমস্ত চেতনায়, তার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছে মুচিদের সহজ উচ্ছৃঙ্খল রক্ত। বড চেনা হয়ে গেছে যোগেন, বড বেশি স্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কাছে। আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া অত্যন্ত সাবধানী, অত্যন্ত হিসেবী। সময় আর সুযোগমতো মাঝে মাঝে সুশীলাকে বুকেব মধ্যে টেনে নেয় বটে কিন্তু তাতে আশ মেটে না সুশীলার। একটা তীব্র অস্বস্তিতে গায়ের মধ্যে যেন জ্বালা ধরে যায় তাব—আরো কিছু চায় সে, আরো অনেকটা যেন প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা করে শবীরের প্রতিটি রোমকূপে, প্রতিটি রক্ত-মাংসের কণায় কণায়। পিষে যেতে ইচ্ছে করে তার, ইচ্ছে করে যেন ভেঙেচুবে তছনছ হয়ে যেতে। কিন্তু তার সে প্রত্যাশা পূর্ণ করে না যোগেন। সে ভীরু, সে সাবধানী। আগুন জ্বালাতে পারে, কিন্তু নেভাতে জানে না। প্রেম আছে, কিন্তু দাবি নেই তার।

ধলাই আবার বললে, কী ভাবিছ সোনার ববণী কন্যা, কথা কহিছ না যে ?

—ধ্যাৎ।

—ক্যানে ধ্যাৎ ধ্যাৎ কবোছ। তুম্‌হাক দেখি হামার মন মজি গেইছে কইন্যা। হামার সাথ কলিকাতায় চল, রাজার হালত্‌ রাখিম্‌ তুমহাক্‌—এই কহি দিনু।

—পথ ছাড়ি দেন।

—দিমু। তার আগে কহ তুম্‌হার সাথ ফেব দেখা হেবে ?

—হেবে।

—কাইল ?

এতক্ষণে চোখের একটা ভঙ্গি করলে সুশীলা, কথার চাইতেও সে দৃষ্টিব ভেতবে তার বক্তব্য ঢের বেশি স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল যেন। বললে, পথ ছাড়ি দেন।

—দিমু, কিন্তু—

তার আগেই ধলাইয়ের পাশ দিয়ে চট কবে সরে গেল সুশীলা। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক একটুখানি স্পর্শও যেন দিয়ে গেল তাকে। পরক্ষণেই ঝাঁপ ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

এক মুহূর্ত মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ধলাই। চিকচিক করে উঠল বাসনালুব্ধ চোখ দুটো, মৃদু হাসি ফুটে উঠল সরু গোঁফের নিচে বিচক্ষণ ঠোঁট দুটোতে। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জোর গলায় হাঁক দিলে, হে যোগেন, জাগিলা নাকি হে যোগেন ?

পূবের আকাশটা তখন আস্তে আস্তে বাঙা হয়ে উঠছে।

কিন্তু উঠোনে বসে আর ধানসেদ্ধ করতে মন চায় না সুশীলার।

ধলাইয়ের কথাটা কানের কাছে ভাসছে ক্রমাগত।—কলিকাতায় লি যামু, রাণীর হালে রাখিমু—

কলকাতা! সে আশ্চর্য দেশটার কথা কতজনের মুখেই যে শুনেছে! শুনেছে সে কলকাতা না দেখলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যায় মানুষের। এক কলকাতায় যাওয়ার আকর্ষণই ঘর থেকে টেনে বার করে নিয়ে যেতে পারে লোককে। তাদের গাঁয়ের হীরালাল সেই যে কলকাতায় পালিয়ে গেল মা-বাপ-বৌকে ফেলে, আর ফিরলই না। আশ্চর্য দেশ কলকাতা তাকে ফিরতে দিল না।

কিন্তু কারণটা কি শুধুই তাই?

বাঁশের হাতা দিয়ে হাঁড়ির ধানগুলো নাড়তে নাড়তে সুশীলার বুকের ভেতরটা কেমন তোলাপাড়া করতে লাগল। কারণটা শুধু তাই নয়। পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধলাইয়ের চোখে সে যা দেখতে পেল যোগেনের চোখে তা নেই কেন? শান্ত ভীরু যোগেন। তার দৃষ্টিতে কেমন ঘোর লাগা। সুশীলাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে চায়, যেন স্নেহভরে দিতে চায় ঘুম পাড়িয়ে। কিন্তু ঘুমুতে কি চায় সুশীলা?

না। শরীরের রক্ত তার মাতামাতি করতে থাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কী ছিটকে ছিটকে বেড়ায় আগুনের মতো। দু বছর আগে একবার বিছেয় কামড়েছিল তাকে, মনে হয় তার সেই তীব্র ভয়ঙ্কর জ্বালাটা যেন আবার ফিরে এসেছে এতদিন পরে। সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে সুশীলা।

এক-একদিন রাত্রে ঘুমুতে পারে না। ছটফট করে শুয়ে শুয়ে, অস্থিরতায় কী করবে ভেবে পায় না যেন। তারপর যখন যোগেনের মা'র চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে ঘন হয়ে, ঘুমের মধ্যে মধ্যে তার কথা বলা শুরু হয়ে যায়, তখন অসীম অস্বস্তিতে সে উঠে বসে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের ঘরে, তার বুকের মধ্যে নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

—হামি মরি গেলাম, হামি মরি গেলাম—

কিন্তু ছুটে যেমন যেতে পারে না সুশীলা, তেমনি বলতেও পারে না। শুধু বুকের মধ্যে যেন কাঞ্চননদীর বান আসে, ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ নিজের কানেই শুনতে পায় যেন। উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় যোগেনের ঘরের বেড়ার আড়ালে।

রেড়ীর তেলের আলোয় উবু হয়ে বসে লিখছে যোগেন। জ্বলজ্বল করছে তার চোখ, অদ্ভুত একটা দৃষ্টি সে চোখে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারে না সুশীলা, বুঝতে পারে না কিসের জন্যে এমন করে অতন্দ্র রাত কাটিয়ে যাচ্ছে যোগেন, কিসের পাগলামিতে সে কাগজের ওপর হরফের পর হরফের জাল বুনে চলেছে।

মনে হয় একটা আলাদা মানুষ। এ মানুষ তার জানা নেই, তার চিন্তা দিয়ে একে ছোঁয়া যাবে না। খস্ খস্ করে লিখে যাচ্ছে, কখনো বা দোয়াতে কলমটাকে ডুবিয়ে রেখে হাতের আঙুলগুলোকে কামড়াচ্ছে হিংস্র আর ক্ষিপ্তভাবে। যেন নিজের মধ্যে অনবরত কী একটা ভাঙচুর করছে সে, কিছুতে তার স্বস্তি নেই, কোনোমতেই যেন সে তৃপ্তি পাচ্ছে না।

এ কোন্ মানুষ ? এ কোন্ জাতের ? এক-একটা নিভৃত অবসরে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে যে তার চুলে কপালে আঙুল বুলিয়ে দেয় এ সেও নয়। এর সঙ্গে সুশীলার পরিচয় নেই—এও সুশীলাকে চেনে না। এর কাছে গিয়ে সে কি বলতে পারে, আমি ঘুমোতে পারছি না, আমাকে তোমার বুকের ভেতরে আশ্রয় দাও ? বাঁচাও আমাকে, রক্ষা করো এই অসহ্য দুর্বোধ যন্ত্রণা থেকে ?

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছটফট করে সুশীলা। চলে যেতে চায়, চলে যেতে পারে না। কিসে যেন আঁকড়ে ধরেছে তাকে, তার পা দুটো মাটির ভেতরে ঢুকে গিয়ে শক্ত আর অনড় হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়েছে যোগেন, পায়চারি করছে ঘরময়। তারপর গুনগুন করে গান ধরেছে :

ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ফসল ভরা
হামার সোনার মাটি,
সেই ফসলের হতাশ লিয়ে
মিছাই মরি খাটি।
গায়ের লোহু হৈল পানি,
ভুখার জ্বালায় যায় পরানি,
আর ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলিয়া
তুমি খাছ ক্ষীরের বাটি,
হায়রে বরাত, হায়রে—

নড়ে সরে যেতে চায় সুশীলা। হাতের চুড়িতে শব্দ হয়, খস্ খস্ আওয়াজ ওঠে শাড়িতে। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে যোগেন বলে ওঠে : কে ?

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ধ্বক্ করে ওঠে সুশীলার। নির্জন নিঃশব্দ রাত্রি। সমস্ত বাড়ি ঘুমুচ্ছে, কেউ জেগে নেই কোথাও। রাত্রির এই অবকাশে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, আবির্ভাব ঘটতে পারে যে কোনো একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার। যোগেনের মন কি উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে না মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও ?

আবার তীক্ষ্ণ স্বরে সাড়া আসে, কে ?

—ক্যাহো না, হামি। হামি সুশীলা।

—সুশীলা—ওঃ !—একটা নিরুত্তাপ শাস্তি ভেসে আসে যোগেনের স্বরে : অ্যাতে 'আইতে' (রাইতে) জাগি জাগি কী করোছু ?—যাও—ঘুমাও।

যাও—ঘুমাও ! সুশীলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলে ওঠে একসঙ্গে। যেন পাথরের মতো মানুষ—শরীরে গরম রক্ত নেই একবিন্দুও। অথচ এই রকম রাত্রি—এরকম নির্জনে দুটি জোয়ান ছেলেমেয়ের দেখা, তার পরেকার বহু আশ্চর্য মনমাতানো গল্পই তো শুনেছে সুশীলা। শুনতে শুনতে মুখ চোখ দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে যেন রক্তের ঝাঁঝ বেরিয়ে এসেছে, মনে হয়েছে—

আর যোগেন ?

যাও—ঘুমাও ! হিংস্রভাবে সুশীলা ফিরে এসেছে ঘরে।···

···হঠাৎ কেমন একটা গন্ধ—ধান ধরে এল বোধ হয়। সুশীলা অপ্রতিভ ভাবে আবার হাতা দিয়ে নাড়তে লাগল। আর ধলাইয়ের দৃষ্টি ! ভোবের আবছা আলোতেও সে তার নিজের কথা বলে দিয়েছে। সুশীলা বুঝতে পেরেছে তাকে। অত্যন্ত পিপাসার সময় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা জলের স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাবনা বয়ে এনেছে ধলাই।

—কলিকাতায় লি যামু, বাণীর হাল্‌ত রাখিমু—

মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় যোগেন—কিন্তু এ তো তা নয়। আলকাপওলা রাত জেগে শুধু গানই লিখতে জানে, আর কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই তার। কিন্তু বাঁশিওলা জানে। তার দৃষ্টি তার কথা সমস্ত মনের মধ্যে বারে বারে ওঠাপড়া করছে। সে জানে সুশীলা কী চায়, সুশীলা জানে তাকে তা দিতে পারবে বাঁশিওয়ালা।

তা ছাড়া কলকাতা—কত দূরের দেশ ! কত দেশ, কত নদী, কত জঙ্গল পার হয়ে সে কলকাতা ! সেই বহুদূরের হাতছানি সুশীলার কানে এসে পৌঁছয়। বহুবার শোনা বাঁশি-ওয়ালার বাঁশির সুর মনের কাছে নতুন করে বাজতে থাকে।

নতুন করে বাজল বইকি। বাজল পরের দিন ভোরবেলায়।

তখনো ভোর হয়নি, মেটে মেটে কাকজ্যোৎস্না চারদিকে। হালকা হয়ে আসা ঘুম চকিতে টুকরো টুকরো হয়ে যেন ছিঁড়ে গেল সুশীলার। আকুল কান্নার মতো মৃদু বাঁশির শব্দ। শেষরাত্রির শান্ত হাওয়ায়, ভিজে মাটি আর শিশিরের গন্ধের সঙ্গে মিশে সে বাঁশির সুর ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে সুরে ধলাইয়ের উজ্জ্বল তীব্র চোখের দৃষ্টি জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে ছড়িয়ে আছে বহুদূর কলকাতার মোহময় আহ্বান।

যোগেনের মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। একবার তার দিকে তাকিয়েই নিঃশব্দে উঠে পড়ল সুশীলা, অন্ধকারের মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এমন অনেক রাত্রিই তার ব্যর্থ করে দিয়েছে যোগেন, কিন্তু এই সকালটাকে সে নষ্ট হতে দেবে না।

কিন্তু অত কথা কী করে জানবে যোগেন আলকাপওয়ালা ? মহকুমা শহরে মেয়েদের

যে রূপ দেখে সে ভয় পেয়েছে, যে রূপের কথা ভাবলেও তার শরীর আঁতকে ওঠে, তারও যে একটা সহজ তাগিদ আছে সে তা জানে না। তার ভুলের মিথ্যে বোঝা বইতে কেন রাজী হবে সুশীলা, কেন রাজী হবে তার স্বপ্নলোকের সোনার কন্যা? রক্তমাংসকে ভুলে গিয়ে গানের রঙীন ফানুষ তৈরি করতে থাকুক যোগেন, কিন্তু ধলাই হিসেব বোঝে, মাটির কাছে তার যেটুকু ন্যায্য পাওনা, তা সে আদায় করে নিতে জানে কড়ায় গণ্ডায়।

দশ

বংশী মাস্টার চলে যাওয়ার পরে খানিকটা হাসাহাসি করেছিল চট্টরাজ। এই শীতের সকালেও পায়ে তেল ডলতে ডলতে ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছিল মহিন্দর আর চট্টরাজের ধারালো ধারালো কথাগুলো ছুরির ফলার মতো এসে বিঁধছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু জবাব দেবার জো নেই—সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকোবার মতো দুঃসাহস নেই তার।

সামনে 'কাঁদড়ে'র কাদা মাখা এক হাঁটু জল। তিনঘর ডোম বাস করে গ্রামের প্রান্তে, তাদেরই গোটা কয়েক শূয়োর হুটোপুটি করছিল কাঁদড়ে। সেদিকে তাকিয়ে চট্টরাজ বললে, দেখেছিস মহিন্দর?

—দেখিছু।

—তোরা ওই শূয়োরগুলোর মতো—কাদাই ঘেঁটে মরবি চিরটাকাল।

—হঁ—গোঁজ হয়ে জবাব দিলে মহিন্দর।

—অ, বাবুর রাগ হয়েছে বুঝি? মানে ঘা লেগেছে মানী মানুষের?

—হামাদের ফের মান কুনঠে বাবু? হামরা মুচি—ছোট নোক—

—বাঃ, বাঃ, বিনয়ের একেবারে অবতার—অ্যাঁ?—টানের চোটে হুঁকোটাকে প্রায় ফাটিয়ে ফেলবার উপক্রম করে চট্টরাজ বললে, আবার আত্মদর্শনও হচ্ছে দেখি। বেশ, ভালো ভালো। তা এই মাস্টারটি জুটল কী করে?

—ক্যামন কবি কহিমু বাবু? কুনঠে থাকি আসোছে ওই জানে।

—হুঁ, মাস্টারই বটে। আরে ব্যাটা একে জাতে নাপিত, তারপর 'মেঘনাদ বধ'ই পড়েনি। লেখাপড়া শিখতে হলে আগে 'মেঘনাদ বধ' পড়তে হয়—হ্যাঁ, বই বটে একখানা! কী ভাষা, আর কী তার জোর! হাতের হুঁকোটা মাথার ওপর জয়োদ্ধত পতাকার মতো তুলে ধরে চট্টরাজ আবার ভৈরব স্বরে শুরু করলে:

"অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে,
লড়িল মস্তকে জটা, ভীষণ গর্জনে
গর্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ। ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বকে

জ্বলিল অনল ভালে। ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিল ত্রিপথগা—"

বলি, বুঝলি কিছু?

—অ্যাঁ?

বক্তৃতার দাপটে পা টেপা বন্ধ হয়ে গেছে মহিন্দরের, নির্বাক বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে চট্টরাজের অপরূপ মুখভঙ্গির দিকে। অপূর্ব! একটা দেখবার জিনিসই বটে। কোথায় লাগে গাজনের সং? একবার পুতুল নাচ দেখেছিল মহিন্দর—রাম-রাবণের যুদ্ধ; তারই ভস্মলোচনের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে নায়েবমশাই আর আওয়াজ যা তুলছে তা শুনে মনে হয় যেন হামলা করছে একটা এঁড়ে বাছুর।

—বলি, বুঝলি কিছু?

মহিন্দর সভয়ে বললে, আইজ্ঞা না।

—তবু এসব উট্‌কেল-বিট্‌কেল সখ চেগেছে, কেমন? পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার জন্যে। বলি ওরে ও মুচির পো, সেই হাতী আর কোলা ব্যাঙের গল্পটা জানা আছে?

—আইজ্ঞা না।

—ওরে শোন্। শুনে জ্ঞানলাভ কর্। হাতী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, তাই ডোবার কোলা ব্যাংয়েরও সাধ হল হাতীর মতো মোটা হবে। সেই আনন্দে সে তো পেট ফোলাতে শুরু করল। তারপর কী হল জানিস?

—ত মোটা হই গেইল্ নাকি?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে মহিন্দর।

—হঁঃ, মোটা হই গেইল্?—দাঁত খিঁচিয়ে উঠল চট্টরাজ: ওরে ব্যাটা গাড়োলেরা, ও-রকম মোটা তোরাও হবি মনে হচ্ছে। ফুলতে ফুলতে শেষে ফট্টাস্—ফেটে একদম চৌ-চাকলা।

—ফাটি গেইল্?

—হঁঃ, গেইল্ তো।—তেমনি মুখভঙ্গি করে চট্টরাজ বললে, চাঁদ, তোমরাও একদিন যাবে। যা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ তোমাদের আর বেশি দেরি আছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। সুখে থাকতে ভূতের কিল পড়ছে পিঠে, যেদিন সত্যিকারের কিল পড়বে সেদিন ও ভূত ছেড়ে যাবে। ধম্মো এখনো আছে, জমিদারের জমিদারী লাটে চড়েনি আজ পর্যন্ত। হতভাগা গো-ভাগারা, ওসব বদবুদ্ধি এখনো ছেড়ে দে—ওই অলক্ষুণে মাস্টারটা তোদের বরাতে ধূমকেতু হয়ে এসেছে—বুঝলি?

—হঁ বুঝিনু তো।

চট্টরাজের মনে হল ঢের বোঝানো হয়েছে, এতেই শিক্ষা হয়ে যাবে মুচিদের। কিন্তু সন্ধ্যের পর সেরটাক খাসির মাংস আর সেরখানিক ক্ষীর খেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে পড়বার

পরেও ঘুম এল না। পেট গরম হয়ে উঠেছে, গরম হযেছে মাথাটাও। চট্টরাজ উঠে বসে এক ছিলিম তামাক ধরালেন নিজের হাতেই।

কাঁদডের ধারে শেয়াল ডাকছে, বাইরে থেকে আসছে ঝিঁঝির কলধ্বনি। একা ঘরে কেমন ভয় ভয় করে উঠল শরীর। না—এত সহজেই ভোলা যায় না ব্যাপারটাকে—ধামা চাপা দিযে দেওয়া যায না। এসব বড খারাপ লক্ষণ। শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্। এ চোখ মেলবার সূচনা, এমনি করে আস্তে আস্তে চোখ দুটো যদি সম্পূর্ণ খুলে বসে তাহলে হালে আর পানি পাওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত। আজ যেটাকে কেঁচো মনে করে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে সেটা যে ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা কেউটের বাচ্চা নয এমন প্রতিশ্রুতিই বা জোর গলায দিতে পারে কে?

অভিজ্ঞতা অল্পে অল্পে হচ্ছে বই কি। দু হরফ পড়তে শিখেছে কি ব্যাটাদের মাতব্বরীর যন্ত্রণায টেঁকা দায। শহর থেকে আনিযেছে চার পয়সা দামের নতুন প্রজাস্বত্ব আইনের বই, কিছু বলতে গেলেই গডগড করে আউডে দেবে:

> "চক্রবৃদ্ধি সুদ দিব না
> বসত বাটি নীলাম হবে না,
> বিশ বছরের কিস্তিবন্দী—"
> নাযেব মশাই, এই হইল্ নতুন আইন।

নতুন আইনই বটে। সবই নতুন—সারা দুনিযাটাই প্রায নতুন হযে যাচ্ছে আজকাল। আগে দাখিলার চেকে পাঁচ টাকা লিখে দিযে সাত টাকা আদায় করা প্রায় স্বাভাবিক নিয়ম ছিল, পাওনা-গণ্ডা যে কত দিকে ছিল তার প্রায় হিসেবই নেই। আরে বেশিদূর যেতে হবে কেন, একটা কাছারীতে গেলে না হোক পনেরো-ষোলটা টাকা নজর তো মিলতই। এখন নজর দূরস্থান—একটা পাঁঠা, দুটো লাউ বড জোর। তাও দিতে কত রকমের গাঁই-গুঁই যেন ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে ব্যাটাদের।

আর এর জন্যে দায়ী এই ইস্কুলগুলো। জেলা বোর্ডের খেয়েদেযে আর কাজ জুটল না, এই রকম কতগুলো আজেবাজে ল্যাঠার সৃষ্টি করে বসে আছে। মুখ ফুটিয়েছে, চোখও ফুটিযেছে। প্রতিবাদ যেমন করে, তেমনি মাঝে মাঝে রসিকতাও করে: ও তশিলদার মশায়, ইটা কী হইল্? হামি দিনু পাঁচ টাকা, তুমি সাডে তিন টাকা নিখিলেন? ভুল হই গেইছে, ঠিক করি নেখেন।

বলে মিটিমিটি হাসে। কিন্তু সে হাসি বিছুটির ঘায়ের চাইতেও মারাত্মক, তার চেয়েও অসহ্য জ্বালা। একটু সামান্য রসিকতা, কিন্তু তার ধার যেন কেটে কেটে বসতে থাকে বুকের মধ্যে। বেশ বোঝা যায উপরি-পাওনার যুগ শেষ হয়ে গেছে, রস মরে গেছে অমন সোনার চাকরির।

কোত্থেকে এই মাস্টারগুলোও যে আমদানি হচ্ছে ভগবান জানেন। এই বংশী পরামাণিকের হাল-চাল দেখে তো দস্তুরমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে মন। আর একবার নাড়াচাড়া দিয়ে দেখতে হচ্ছে তাকে। কী উদ্দেশ্যে অমন গড়গড় করে অতগুলো মিথ্যে কথা আউড়ে গেল, আসল মতলবটা কী তার?

কোনোরকম দাগী আসামী-টাসামী নয় তো?

হুঁ, আশ্চর্য নয়। চট্টরাজের কপালে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠল। এই বয়েসে অনেক দেখল সে, আর যাই হোক মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাটাও ঘটেছে প্রচুর। কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে বংশী পরামাণিকের মধ্যে। নাঃ, কালই একবার—

খুট্-খুট্—

ইঁদুরের আওয়াজের মতো একটা আওয়াজ এল দরজার কড়ায়।

—কে?

—চাঁপা।

ডোমপাড়ার অনুগৃহীতা মেয়েটা। দিনের বেলা অবশ্য ও পাড়ার ধার দিয়েও হাঁটেন না চট্টরাজ—যা নোংরা! আর তা ছাড়া শূয়োর পোড়াবার গন্ধটা নাকে এলে যেন উঠে আসতে চায় অন্নপ্রাশনের অন্ন। কিন্তু রাত্রিতে যখন ডোমপাড়াটা কালো অন্ধকারে মিলিয়ে যায় আর চট্টরাজের গলার সাদা পৈতেটাকেও স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না, তখনকার ব্যাপার একেবারে আলাদা। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে রাত্রিতে একজন কাছে না থাকলে একটু দেখাশোনাই বা করে কে, কেই বা একটুখানি সেবাযত্ন করতে পারে তাঁকে?

উঠে দোর খুলে দিলেন চট্টরাজ।

* * * *

কিন্তু রাত্রে যা স্থির করে রেখেছিলেন পরের দিন তা হয়ে উঠল না। সকালে উঠতে না উঠতেই একটা বরকন্দাজ খবর নিয়ে এল ভগ্নদূতের মতো। আলীচাক্‌লায় গণ্ডগোল বেধেছে একটা বেয়াড়া প্রজাকে নিয়ে। ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। আদালতের পেয়াদা গিয়েছিল ঢোল-সহরত নিয়ে, কিন্তু গ্রামের লোকে দল বেঁধে এমন তাড়া করেছে তাদের যে তারা পালাতে পথ পায়নি। ঢুলীরও পাত্তা নেই। কাঁইমাই এমন ছুট মারল যে তাকে আর ফেরানো গেল না।

—নাঃ, আর পারা গেল না। যত সব ইয়ে—

চট্টরাজ টাট্টুতে চেপে বসলেন।

আলীচাক্‌লায় পৌঁছেও তাঁর ল্যাঠা কাটে না। সরকারী লোক তো আছেই, পঞ্চাশ-জন লাঠি-সোঁটাধারী লোকও জুটেছে, দরকার হলে খুনখারাপী করবে তারা, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। সবই আছে, কিন্তু ঢুলী নেই। কোঁৎকা দেখে সেই যে দৌড় দিয়েছে, বোধ

ছয় মাইল পনেরো রাস্তা সে পার হয়ে গেছে এতক্ষণ।

চটে আগুন হয়ে গেছে চট্টরাজ।

—যা, যেখান থেকে পারিস ঢুলী যোগাড় করে আন্। ঢোল-সহরত না হলে সাব্যস্ত হবে কেমন করে!

—আইজ্ঞা ও ঢুলী তো ডর খাই পালালে, ফের ক্যাঁহোক্ তো—

—নইলে যেতে হবে চামারহাটি কিংবা সনাতনপুর—চট্টরাজ হুঙ্কার ছাড়লেন: এটুকুও কাজ করতে পারো না, খালি খাও-দাও আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও, কেমন? যা, দৌড়ো সব। ঢোল না পাওয়া যায় তো তোদের পিঠের চামড়া দিয়েই ডুগডুগি বাজাব আমি—মনে থাকে যেন।

কিন্তু চামারহাটি পর্যন্ত আর ছুটতে হল না, তার আগেই ঢুলী জুটে গেল একজন।

লোকটা পড়ে ছিল মাইলখানেক দূরে রাস্তার পাশে একটা বটতলায়। মাথার কাছে একটা ঢোল, পাশে একটা মদের বোতল, আর মুখের সামনে ভনভনে মাছি। পুরোপুরি নেশা করে সে পরম শান্তিতে যোগনিদ্রা উপভোগ করছিল। পাইক শিবু তাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এই, উঠ্, উঠ্!

লোকটা উঠল না, সাড়াও দিল না।

শিবু হাতের লাঠি দিয়ে আবার শক্ত করে একটা খোঁচা দিলে তার পাঁজরে। এবারে লোকটা আড়ষ্ট আরক্ত চোখ মেলে তাকালো, তারপর বিরক্তিভরে কী একটা বিড়বিড় করে পাশ ফিরল।

শিবুর ধৈর্যচ্যুতি হল। হ্যাঁচকা টানে লোকটাকে তুলে ফেলল, তারপর ঢোলটা কাঁধে ফেলে তেমনি হুড়মুড় করে টানতে টানতে তাকে একেবারে হুজুরে এনে হাজির করে দিলে।

ততক্ষণে নেশা কেটে গেছে লোকটার। আতঙ্কে ও বিস্ময়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, টলমলে পায়ে আনতে চেষ্টা করল জোর, তারপরে আবার সটান হয়ে পড়ল চট্টরাজের পায়ের সামনে। কিন্তু সেটা নেশায় না শ্রদ্ধাতে ঠিক বোঝা গেল না। জড়ানো গলায় বললে, দণ্ডবৎ।

চট্টরাজ বললেন, ওঠ্ রে ব্যাটা ওঠ্। ওঃ, ভক্তিতে যেন একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। তবু যদি মুখ দিয়ে ভকভক করে ধেনোর গন্ধ না বেরুত।

—না হুজুর, দারু খাওনি হামি, সাঁচ কহোছি—

—না, না, দারু খাবে কেন, দারুব্রহ্মের পাদোদক খেয়েছে! কিন্তু—চট্টরাজ কপাল কুঁচকে তাকালেন: মুখটা যেন চেনা চেনা ঠেকছে! ব্যাটা তুই সনাতনপুরের সুরেন মুচির ভাই না?

লোকটা বিনয়ে গলে গিয়ে বললে, হুজুর কিবা না জানেন।

—হুঁ। তোর নাম হারাণ নয়?

তেমনি গলিত স্বরে উত্তর এল: হঁ।

—আর তুই না একটা মেয়েমানুষের ব্যাপারে একবার আমার হাতে দশ ঘা জুতো খেয়েছিলি চামারহাটির কাছারিতে?

হারাণ জিভ কাটল: উসব কহি আব ক্যানে সরম দেছেন হুজুর। ভুল হই গেইছিল —হামি খাঁটি মানুষ—

—হ্যাঁ, একেবারে হাড়ে হাড়ে খাঁটি।—চট্টরাজ ভ্রূভঙ্গি করলেন: সে সব যাক— রসালাপের সময় নেই এখন। শোন্, ঢোল বাজাতে পারিস?

—নি পারি তো অস (রস) করি ইটা বহি বেড়াছি হুজুর? একবার কহেন তো একটা ঘাও মারি গোটা গাঁও জড়ো করি দেছি এইঠে। হঁ—হঁ, কেষ্ট মুচির ব্যাটা হামি, ঢোল বাজাই হামার সাতপুরুস নাম রাখি গেইল্ হুজুর—বংশগৌরবে একেবারে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল হারাণ। তারপর টলমলে পায়ে একটা প্রচণ্ড পতনকে অতি কষ্টে সামলে নিলে সে।

—বেশ, খুব ভালো কথা। চল্ তাহলে—ঢোল কাঁধে কর্।

—কুনঠে যাবা হেবে হুজুর?

—অত জেনে কী হবে তোর। বকশিশ পাবি, তা হলেই হল।

—হঁঃ, বক্‌শিশ!—হারাণ দাঁত বের করলে, হুজুরের চরণধুলো পোয়া গিলেই হামার বক্‌শিশ মিলিবে।

—বাপ রে ভক্তিরস একেবারে উথলে পড়ছে! তবু যদি ইস্কুলে ক খ পড়েই উঁচু জাতের মাথায় পা দেবার চেষ্টা না করতিস।—চট্টরাজ তিক্তহাসি হাসলেন: নে, চল্ এখন।

—চলেক, চলেক—ঢোলটাকে কাঁধে করে হারাণ বললে. এমন বাজাই দিমু যে হুজুরের সাবাস্ দিবা নাগিবে— হঁঃ!

কিন্তু যাত্রার আয়োজন দেখেই কেমন খটকা লাগছে হারাণের। নেশাটা যত ফিকে হয়ে আসছে, তত বেশি করে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে মন। ঢোল বাজাতে যেতে হবে কিন্তু এসব কেন তার সঙ্গে? এই লাঠি-সোঁটা, এই লোক-লস্কর?

—হুজুর, হামি কিছু বুঝিবা পারোছি না।

—বুঝি কুন্ কামটা হে তুমার? হুজুর কহিছেন, সিধা ঘাঁটা ধরি চল। বরর বকর কইরছ ক্যানে?—শিবু ধমকে উঠল, অভ্যাসবশে একটা লাঠির খোঁচা বসিয়েও দিলে হারাণের পাঁজরে।

—উঃ, বড় জব্বর খোঁচা মারিলা হে—

—বেশি বাত করিবা তো ফের মারিমু—শিবু শাসিয়ে দিলে। হুজুরের বরকন্দাজ,

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।

—থাউক দাদা, ঢের হইছে—

পোয়াটাক পথ ভাঙতেই সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল হারাণের কাছে। দুরু দুরু করে উঠল বুক, শির শির করে একটা শিহরণ বয়ে গেল শরীরের রোমকূপগুলোর ভেতর দিয়ে। এ উচ্ছেদের ব্যাপার—কারুর সর্বনাশ হচ্ছে, ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কারো সুখের আশ্রয়, জমিদারের অত্যাচারে ছেলেপুলের হাত ধরে পথে দাঁড়াতে হবে আর একজন হতভাগা মানুষকে।

গ্রামের যে সব অত্যুৎসাহী পরোপকারীর দল লাঠি-ঠ্যাঙ্গা নিয়ে সরকারী লোককে তাড়িয়ে দিয়েছিল আর এতক্ষণ ধরে ঘাঁটি আগলাচ্ছিল বসে বসে, হাল-চাল দেখে তারা সব যে যেদিকে পারে সরে পড়েছে। বীরবসের পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে একটা মর্মভেদী দৃশ্যের, একটা বেদনা-করুণ আবহাওয়ার।

লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ি, লক্ষ্মীহীনের সংসার। কুঁড়ে ঘরটার দরিদ্রতা কাউকে ডেকে বলে দিতে হয় না। এক কাঠা জমির ওপরে ছোট একখানি পেঁয়াজের ক্ষেত—রাজবংশী উপাসুর ওইটুকুই উপজীবিকা। উপাসুই বটে। তিন মাস চলে পরের ক্ষেতি-খামারে আধিব কাজ করে, দু মাস চলে দু পয়সা বেচে পেঁয়াজ বিক্রি করে, কিছুদিন চলে বন থেকে তিত্ পোরল আর বুনো কচু খেয়ে অথবা দু মুঠো 'কাওনে'র চাল খেয়ে। বাকিটা বিশুদ্ধ উপবাস—উপাসু নামটা তার সার্থক।

দলবলটা এগিয়ে আসতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল উপাসু। পরনে একটা লেংটি, কিন্তু তাতে লজ্জা নিবারণ হয় না। ম্যালেরিয়ায় টিংটিংয়ে শরীর, কটাশবিবর্ণ রঙের চুল। সারা গায়ে খড়ি উড়ছে। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত তার চোখের দৃষ্টি, হাড়ি-কাঠে ফেলা একটা বলির পশুর মতো কেমন বিচিত্র বীভৎস আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার।

উপাসু ছুটে এল। দু হাতে দুটো ন্যাংটো শিশুর নড়া ধরে টানতে টানতে আনছে। সোজা এসে চট্টরাজের পায়ের তলায় ছেলে দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, নিজে দু হাতে তাঁর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল। বানে ডুবতে ডুবতে যেন আশ্রয় করেছে একটা কিছুকে, পেয়েছে কোনো একটা নিশ্চিত অবলম্বন।

—হামাক বাঁচান হুজুর—হামার ছেইলাপেইলার মুখ চাহি বাঁচান হুজুর—

—পা ছাড়্ হারামজাদা—ভৈরব স্বরে গর্জে উঠলেন চট্টরাজ।

—না হুজুর, পাও নি ছাড়িমু। এই জাড়ার দিনে ঘরর থাকি বাহির করি দিলে ছোয়াপোয়া সব মরি যিবে হুজুর, হামাক ভিটা ছোড়া নি করেন—

—কেন, নিজের হাতেই না আইন তুলে নিয়েছিলি?—অশ্লীল গাল দিলেন চট্টরাজ: গ্রামের সে সব লোক, তোর সেই বারো বাপেরা সব গেল কোথায়? ডেকে আন্ তাদের,

তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে !

—ওরা ভাগি গেইছে হুজুর—

—তবে তুইও ভাগ্—সজোরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে চট্টরাজ একটা লাথি বসিয়ে দিলেন উপাসুর বুকে। কোঁৎ করে একটা শব্দ হল, সাত হাত দূরে ছিটকে চলে গেল উপাসু। ছেলে দুটো আর্তনাদ করে উঠল বকের ছানার মতো।

হারাণের নেশা এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে কেটে গেছে। গায়ের মধ্যে একটা তীব্র জ্বালার মতো কী যেন চমকে চমকে খেলে যাচ্ছে তার, রক্তের ভেতর শব্দ হচ্ছে ঝিন্ ঝিন্ করে। ঠোঁটের পেশীগুলো থর থর করে কেঁপে উঠল হারাণের, কী একটা বলতেও চাইল, কিন্তু বলতে পারল না।

—ভাঙ্, ভাঙ্, ঘর ভেঙে ফেল ব্যাটার। পরনে একফালি ন্যাকড়া জোটে না, পেটে ভাত নেই, তবু তেজ দেখো একবার। সাতখানা গাঁয়ের লোক এনে জড়ো করেছে, হাঙ্গামা করবে জমিদারের সঙ্গে!

লোকগুলো তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দমাদম ঘা পড়তে শুরু করল মাটিখসা পচা বাঁশের বেড়ায়, ছাউনিহীন খড়ের চালে। দেখতে দেখতে একদিকের বেড়া নেমে গেল মাটিতে।

উপাসু চিৎকার করে উঠল। খাঁড়া পড়বার আগে পশুর শেষ আর্তস্বর যেন শুনল হারাণ। তারপরেও শিবু ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উপাসুর ওপর—। কী যে হল কে জানে, মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে রইল উপাসু, আর মাথা তুলল না, প্রতিবাদও করল না আর। শুধু ন্যাংটো ছেলে দুটো তার পাশে বসে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলে।

লাঠির ঘা পড়ছে, ভেঙে পড়ছে বেড়া। মানুষের উন্মত্ত পায়ের চাপে দলে পিষে শেষ হয়ে যাচ্ছে উপাসুর পেঁয়াজের ক্ষেতের নরম সবুজ কলিগুলো—তার জীবনের সঞ্চয়। হিংস্র আনন্দে জলজল করছে লোকগুলোর চোখ—সমস্ত মুখে ঝকঝক করছে আসুরিক আনন্দের দীপ্তি।

—বাজা, ওরে ব্যাটা বাজা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী ?

যন্ত্রের মতো ঢোলে কাঠি দিতে যাচ্ছিল হারাণ, মন্ত্রমুগ্ধের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছিল তার হাত দুটো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

হঠাৎ কাকের বাসা ভাঙবার মতো আওয়াজ করে ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তিনটি নারী। একটি বছর ত্রিশেক—উপাসুর বৌ; আর একটি বছর আঠারো, উপাসুর বোন; তৃতীয়টির এগারো-বারো বছর বয়েস, উপাসুর মেয়ে। ছেঁড়া ফতা-পরা মেয়ে তিনটি একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো এদের দিকে। সে দৃষ্টির তুলনা নেই! তারপর যেমন করে আর্তস্বর তুলেছিল উপাসু, তেমনি বিশ্রী খানিকটা আওয়াজ করে

প্রাণপণে ছুটতে শুরু করে দিলে পেছনের একটা আমবাগান লক্ষ্য করে।

কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা গর্তের মধ্যে পা দিয়ে পড়ে গেল উপাসুর বোন। তারপর ধড়মড় করে যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন দাঁড়ালো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে—একটা কাঁটা গাছে আটকে আছে তার ফতাটা। পরম বিপদের মুখে প্রকৃতিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে।

রাক্ষসের গর্জনের মতো কলরব উঠল প্রবলভাবে—আকাশ-ফাটানো হাসির আওয়াজ মুখর করে তুলল চারদিক, একশো চোখের নির্লজ্জ, কুৎসিত, ক্ষুধিত দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই অসহায় করুণ নগ্নতার ওপরে। পাথরের মতো মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি, এক মুহূর্তের জন্যে যেন নিজের সমস্ত আকৃতি নিবেদন করে দিলে নগ্ন আকাশ আর নিরাবরণ পৃথিবীকে, তারপর তেমনি ভাবেই ছুটে চলে গেল আমবাগানের দিকে। শুধু নতুন কালের নতুন দ্রৌপদীর অভিশাপ আকাশে-বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে রইল।

একশো চোখ তেমনি কুৎসিতভাবে অনুসরণ করতে লাগল তাকে, আবার একটা প্রবল আর পৈশাচিক হাসির আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে উঠল। চট্টরাজও হাসছেন সমানভাবে, লোভে চোখ দুটো কুতকুত করছে তাঁর।

শিবু বললে, ধরি লি আসিমু নাকি ছুঁড়িটাব?

চট্টরাজ স্নেহভরে ধমক দিলেন একটা, কিন্তু আবার সেই উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় তার কথাটা তলিয়ে গেল। কিন্তু লজ্জায় বেদনায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে হারাণ, লম্পট, চরিত্রহীন হারাণ। ইচ্ছে করল হাতে ঢোলটা তুলে ধাঁ করে বসিয়ে দেয় চট্টরাজের মাথায়, গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয় দেড়হাত টিকিসুদ্ধ ওই নায়েবী মাথাটা। কিন্তু পারল না। তার বদলে ট্যাঁক থেকে ছোট ছুরিটা বের করে সজোরে বসিয়ে দিলে ঢোলের মধ্যে, চড় চড়াৎ করে ফেটে গেল চামড়া।

—কই রে হারাণ, বাজা, ঢোল বাজা—

—কার বা সড়কির খোঁচ লাগি ঢোল ফাটি গেল হামার—নি বাজিবে—।—শুষ্ক তিক্তস্বরে উত্তর দিলে হারাণ, তারপর ঢোল কাঁধে করে সোজা হাঁটতে শুরু করে দিলে।

তড়াং করে গালে একটা চড় পড়ল—শিবু বসিয়েছে। মাটিতে বসে পড়ল হারাণ, বসে পড়ল চোখ বুজে।

—ইচ্ছা করি ঢোলটাকে ফাঁসাই দিলু নাকি রে শালা?

—থাক, ছেড়ে দে—চট্টরাজ বললেন: আর ঢোল-শহরতের দরকার হবে না। কাজ হয়ে গেছে।

উপাসুর বাস্তুভিটা তখন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, পেঁয়াজ ক্ষেতে খানিকটা দলিত সবুজের পিণ্ড ছাড়া কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কাল সকালেই লাঙল দিয়ে একে

পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে, বুনে দেওয়া হবে সর্ষে কলাই। বিদ্রোহী প্রজার চিহ্নটুকুকেও মুছে দিতে হবে চিরদিনের জন্যে।

শুধু এতগুলো লোকের মধ্যে একজন চোখ বুজে নিথর হয়ে পড়ে রইল—সে উপাস্থ। আর একজন হারাণ, লম্পট, চরিত্রহীন, মাতাল হারাণ। জমিদারের লোকের মতো ন্যায় আর ধর্মবোধ তার প্রখর নয় বলেই ফাটা ঢোলটা আকড়ে ধরে সে চোখ বন্ধ করে বসে রইল অন্ধের মতো।

এগারো

হাবিবপুর থানার বড় দারোগা সাহেব চা খাচ্ছিলেন। বেশ সৌখীন মেজাজের লোক। দুটি বিবি আর একটি বাঁদী—একুনে এই তিনটি পরিবার। এবং তিনজনের মনোহরণ করবার জন্য সব সময়েই তাঁকে সজাগ থাকতে হয়, ধারণ করতে হয় যথাসাধ্য কন্দর্পকান্তি। সিল্কের লুঙ্গি পরেন দারোগা. গোলাপী আতর দেন দাড়িতে, চোখে মাঝে মাঝে যে সুর্মা মাখেন না, এমনও নয়। গড়গড়ায় ভালো তামাক নইলে তাঁর ঠিক মৌজটা জমে ওঠে না, তাই বিষ্ণুপুরী তামাক চৌকিদার পাঠিয়ে নিয়মিত আনিয়ে নেন শহর থেকে। একটা স্ত্রী বন্ধ্যা, তার ক্ষতিপূরণ করেছেন আর একজন। বছর বছর তিনি যমজ সন্তানের জন্মদান করে থাকেন, তাই দারোগা সাহেব ছয় বছরের ভেতরেই ছয়টি কন্যা আর চারটি পুত্রের সগৌরব পিতৃত্ব লাভ করেছেন। এহেন পুণ্যবান এবং ভাগ্যবান লোক যে সব সময় হাসিতে এবং প্রসন্নতায় একেবারে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন, এটা প্রশ্ন তথা সংশয়ের অতীত। সুতরাং মহিন্দবেরা তাঁর দাড়ি-বিভাসিত পুলকিত মুখখানা দেখে চরিতার্থ বোধ করে থাকে, তাঁকে ভেট নিবেদন করে পিতৃপক্ষে পিণ্ডদানের মতো অক্ষয় পুণ্য অর্জন করে।

দারোগা সাহেব চা খাচ্ছিলেন এবং অবসর সময়ে দাড়িটাকে আদর করছিলেন পুত্র-স্নেহে। সামনে একখানা সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকা খোলা আছে। এসব গ্রাম-মফস্বল জায়গায় এই ধরনের পত্র-পত্রিকাতেই বিশ্বপৃথিবীর খবর আসে। প্রথম পাতাটা সাধারণত দারোগার ভালো লাগে না—বাজে কচকচিতে ভরা থাকে। ওগুলো উলটে গিয়ে তিনি অষ্টম পৃষ্ঠায় চলে আসেন—যেখানে আইন-আদালতের খবর মেলে। আইন-আদালত বড় ভালো জিনিস, মধ্যে মধ্যে ও-পাতায় অনেক রসালো ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। যেদিন তেমন কোনো খবর থাকে না, সেদিন নিরাশ হয়ে তিনি বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করেন এবং বহু আশ্চর্য আশ্চর্য ওষুধের সন্ধান মেলে। "দুর্বলের বল, হতাশের আশা"। ওই সব বিজ্ঞাপন পড়লে নিজেকে অতিরিক্ত পরিমাণে উত্তেজিত মনে হয়, মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করেন দুটির জায়গায় চারটি বিবির জন্যে একবার চেষ্টা করে দেখবেন কিনা। বাদশাহী

ওষুধের গুণাগুণ একবার পরখ করতেই বা আপত্তি কী।

একটু দূরেই একটা চৌকিদার খুরপী হাতে করে দারোগার ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটছে। কাগজ পড়তে পড়তে অন্যমনস্কভাবে দারোগা তাকাচ্ছিলেন তার দিকে। চৌকিদারের নাম কদম আলী। ওর একটা দিব্যি চেহারার বোন আছে—মাসখানেক হল তার খসম তালাক দিয়েছে তাকে। একবার এক লহমার জন্যে মেয়েটা তাঁর চোখে পড়েছিল, সেই থেকে একটা নেশা জমে আছে। বাদশাহী বটিকার বিজ্ঞাপন পড়ে মনে হচ্ছে একবার কদম আলীকে ডেকে নিকার কথাটা পাকা করে নেবেন কিনা। সংসারে একটু অশান্তি হয়তো দেখা দেবে—বিশেষ করে ছোট বিবির তো দস্তুরমতো বাঘিনীর মতো মেজাজ। তবে বাইরে যতই প্রসন্নমুখ সদানন্দ হোন না কেন, অন্তঃপুরে দারোগা অত্যন্ত হুঁশিয়ার—একেবারে সিংহ অবতার। যতই ঘ্যান ঘ্যান করুক না কেন - বেশি ওস্তাদী চলবে না—ঠাণ্ডা করে দেবেন।

প্রথমে অন্যমনস্কভাবে কদম আলীকে দেখছিলেন দারোগা, লক্ষ্য করছিলেন কী করে সে ঘস্ ঘস করে নিপুণ হাতে ঘাস কেটে চলেছে। তারপর ক্রমশ তিনি কাগজটা একেবারে নামিয়ে রাখলেন, ভুলে গেলেন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে। কানের কাছে গুন গুন করে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ হতে লাগল—মন্দ কী, তা নেহাৎ মন্দ কী। ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়। রাজী হবেই কদম আলী, না হলে ওর বাপ হবে। কিন্তু গণ্ডগোল বাধছে সামাজিক মর্যাদাটা নিয়ে। তিনি এই থানার দুর্দান্ত বড় দারোগা, আর ও ব্যাটা নিতান্তই চৌকিদার—অতি ছোট, অতি নগণ্য। ওর বোনকে বিয়ে করলে লোকে ঠাট্টা করবে, আঙুল বাড়িয়ে বলবে থানার দারোগা কদম চৌকিদারের বোনাই। কাজেই মুশকিল আছে। অথচ মেয়েটার কথাও ঠিক ভোলা যাচ্ছে না। দারোগা কদমের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ভাইয়ে দেখেই বোনকে দেখার সাধ এবং স্বাদটা মেটানো যাক যথাসাধ্য।

বিশ্রী একটা চিৎকারে বাদশাহী বটিকার স্বপ্নটা হঠাৎ ভেঙেচুরে গেল দারোগার। একটা লোক আর্তনাদ করছে হাজতে। চুরি সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহ করে ওকে ধরে আনা হয়েছে, কাল রাত্রে জমাদারবাবু ওকে একটু পালিশ করেছেন, তাই গায়ের ব্যথায় আর্তনাদ করছে। অবশ্য এখনো কিছুই হয়নি, আরো বিস্তর দুঃখ কপালে আছে ওর। চুরি করুক আর নাই করুক, যতক্ষণ না স্বীকার করছে সে চুরি করেছে ততক্ষণ এই রকম দলাইমলাই চালাতেই হবে। কি করা যাবে, উপায় নেই। সব চোরকে ধরতে পারে এমন ক্ষমতা খোদা কেন, সাক্ষাৎ ইবলিশেরও নেই। কিন্তু ইন্সপেক্টর ব্যাটা সেটা বোঝে না, কাজেই দায়ে পড়ে চাকরিটা বজায় রাখবার জন্যই এসব করতে হয়।

লোকটা চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে : হামাক ছাড়ি দাও, দোহাই বাপ, ছাড়ি দাও হামাক। খোদার কসম, হামি কিছু করি নাই। ঘরত হামার রোগা ব্যাটাটা মরি যাছে—হামাক—

ক্যাক্। শব্দটা থেমে গেল। ভোজপুরী পুলিস কর্তব্য পালন করেছে, রুলের খোঁচা পেটে বসিয়ে দিয়েছে ঠাণ্ডা করে। ভালোই করেছে। বড্ড চিৎকার করছিল, তিন নম্বর বিবির সম্ভাবনাময় সুখস্বপ্নে বিশ্রী রকমের ব্যাঘাত করছিল। লোকগুলোর যেন ফুলের শরীর হয়েছে আজকাল—দু-একটা খোঁচাখাঁচি খেলেই একেবারে বাপ্‌রে মারে বলে ডাক-চিৎকার শুরু করে দেয়। একেবারে মিহি ফিনফিনে মাখনের মতো চামড়া হয়েছে বাবুদের। অথচ আগেকার ক্রিমিন্যালগুলো ছিল আলাদা জাতের। মেরে আধমরা করে দিলেও টুঁ শব্দ করত না, এমন কি বাঁশডলা দিয়ে যখন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হত তখনও না। আর এ ব্যাটাচ্ছেলেরা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি। নাঃ, সব দিক দিয়েই দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

—শালারা—

অস্ফুট স্বরে প্রায় স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন দারোগা। এইটেই তাঁর প্রধান গুণ, তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গালাগালিটাও তিনি এমন আস্তে আস্তে করেন যে, লোকে বুঝতে পারে না—অনুমান করে তিনি মসনবি আওড়াচ্ছেন। হুকুমটা তিনিই দেন বটে, কিন্তু হুকুম পালনকারী জমাদারবাবু সেটাকে কেন্দ্র করে এমন তর্জন-গর্জন শুরু করে দেন যে, লোকে বুঝে নিয়েছে দারোগার মতো মাটির মানুষ আর হয় না এবং ওই জমাদার-টাই যত নষ্টের গোড়া। দোষ অবশ্য জমাদারেরও আছে। পরের বারে এস্‌আই এর নমিনেশন পাওয়ার আশায় এখন থেকেই সে প্রাণপণে গলাবাজি আরম্ভ করেছে। যেন প্রমাণ করতে চায় সে কেমন কড়া মানুষ, ভবিষ্যতে কি রকম দুঁদে দারোগা হয়ে উঠবে।

দারোগা হাসলেন, দাড়িটাকে আদর করলেন স্নেহভরে। ভুল করছে জমাদার। আজকাল আর ও করে সুবিধে হয় না। দিন বদলাচ্ছে—মানুষ বদলে যাচ্ছে। গরম চোখ দেখিয়ে এখন আর কাউকে বশীভূত করতে পারা যায় না। একটার পর একটা ঢেউ উঠছে। চারদিকের মানুষগুলো এখন আর মাথা নিচু করে সভয়ে মাটির দিকে তাকায় না, কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় বিদ্রোহীর মতো। আজ এটা নিঃসন্দেহ যে, প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠছে দেশের মানুষের মধ্যে। কোথায় যেন অঙ্কুরিত হচ্ছে আসন্ন একটা বিরোধের বীজ। শহরে, মহকুমায়, গঞ্জে মাঝে মাঝে মাথা তুলছে মানুষ, কিন্তু পরক্ষণেই তাদের সে বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আইনের যাঁতার নিচে, গলার জোরালো আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফাঁসির দড়িতে।

কিন্তু—

কিন্তু মরেও মরছে না। থেকে যাচ্ছে চাপা আগুনের মতো। শহর, মহকুমা, গঞ্জের বুকের ভেতর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তা সব জায়গায় নিঃশব্দে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু বোঝা যায়—। বোঝা যায় সব ঠিক আছে বটে, তবু

কোথায় যেন সবই এলোমেলো হয়ে আছে। একদিন একটুখানি ঘা লেগেই হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়তে পারে।

আজকাল ভয় করে। কেমন একটা ছমছমানি এসেছে বুকের মধ্যে, এসেছে দুর্বলতা। আগে রাত-বিরেতে যেখান-সেখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতেন, মাঠ-ঘাট বন বাদাড় কোন কিছুতেই বিন্দুমাত্র পরোয়া ছিল না তার। দারোগা জানতেন, তাঁদের প্রতাপ কত ভয়ঙ্কর—কী নিদারুণ তাঁদের তেজ। সে তেজে শুধু মানুষ নয় জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত পালাবার পথ পায় না। জিনেরা লুকিয়ে যায় কবরের ভেতরে, ভয় পায় ধরতে পারলে হয়তো আবার দারোগা সাহেব তাদের হাজতে নিয়ে গিয়ে বাঁশডলা দেবেন। মরেও সে বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এখন? এখন সব আলাদা।

বাইরে খুব বেশি কিছু যে ঘটেছে তা নয়, ভয়টা জেগেছে নিজের বুকের মধ্যেই। আজকাল অন্ধকারে আসতে ভয় করে। পথের পাশে পাশে কালো কালো ঝোপগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন একটা আশঙ্কা শির শির করে যায় গায়ের মধ্যে। ভয় করতে থাকে, মনে হয় কারা যেন লুকিয়ে আছে ওদের ভেতরে, ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হিংস্র চোখে সন্ধানী আলো জ্বেলে যেন প্রতীক্ষা করে আছে। যে কোনো সময় একটা বল্লম তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে, একেবারে সোজা ফুঁড়ে দিতে পারে পেটটা। অথবা গলার ওপরে নেমে আসতে পারে কোনো ধারালো রামদার অব্যর্থ লক্ষ্য।

তাই—

তাই দারোগা এই আপাত অহিংসার পথটা গ্রহণ করাই সমীচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। যদি কিছু সুবিধে হয়, এতেই হবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন ভরাডুবি যদি হয়, এর তলার আশঙ্কাটা যে একেবারে কল্পনা তাও না—সেদিন এই থেকেই হয়তো কিছুটা আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষা করা সম্ভব। দারোগা সাহেব বুদ্ধিমান লোক, তিনি আগে থেকেই বিবেচনা করে পথ চলাটা পছন্দ করেন। কাজটা হাসিল করার কথা, একটু মিষ্টি মুখ হলে ক্ষতি কী।

ধোৎ। যত এলোমেলো ভাবনা। দারোগা আবার হিতবাদীখানা হাতে তুলে নিলেন।

কোথা থেকে মনটা কোথায় চলে গেছে। ছিল কদম আলীর বোন আর বাদশাহী বটিকা, সেখান থেকে এ সব দুর্ভাবনার মধ্যে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। মনের ভেতরে শয়তানের আস্তানা আছে, খালি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় দুশ্চিন্তার ভেতরে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

দারোগা চোখ তুলে দেখলেন, একটা লাল রঙের বেঁড়ে টাট্টু ঢুকছে কম্পাউণ্ডের মধ্যে। তার ওপরে রোগা কালো রঙের একজন সোয়ারী। মাথার আধপাকা চুলের

ভেতরে একটি খাড়া টিকি আকাশকে খোঁচা দিচ্ছে। চট্টরাজ নায়েব।

দারোগা হাসলেন। রাজ্যপাট যদি বজায় থাকে তা হলে ভবিষ্যতে এসব লোকের জন্যেই থাকবে। পৃথিবীটা যখন দিনের পর দিন মরুভূমি হতে চলেছে তখন চট্টরাজের মতন লোকেরা হচ্ছে পান্থপাদপ। ছায়া দেয়, আশ্বাস পাওয়া যায় অন্তত। পারস্পরিক স্বার্থের সোজা সম্পর্ক।

ঘোড়ার উপর থেকেই অভিবাদন জানালেন চট্টরাজ। দাঁত বের করলেন কৃতার্থভাবে। দারোগাও হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন, সেলাম করলেন অনুরাগভরে। বিগলিত স্বরে বললেন, হঠাৎ কী মনে করে পায়ের ধুলো পড়ল আজকে? ব্যাপারখানা কী?

ঘোড়া থেকে চট্টরাজ নামলেন, পুলিস ব্যারাকের একটা লোহার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললেন সেটাকে। তারপর দারোগার দ্বিগুণ হাসিতে কালো মুখখানা আলো করে বললেন, কেন, হুজুরের সঙ্গে একটু দেখা করতে এলেও কি ক্ষতি আছে নাকি?

জিভ কেটে দারোগা বললেন, তোবা, তোবা।

চট্টরাজ থানার বারান্দায় উঠে এলেন, বসলেন দারোগার পাশের চেয়ারখানাতে। দারোগা চোখ মিট মিট করে বললেন, তারপর কী মনে করে?

—একটু উপকার করতে হবে।

—কী উপকার? দারোগা সাহেব তেমনি চোখ মিট মিট করতে লাগলেন: গরজ না হলে পায়ের ধুলো যে পড়ে না সে তো জানাই আছে।

চট্টরাজ মৃদু গলায় বললেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

আরো চাপা গলায় দারোগা বললেন, কী, খুনটুন নয় তো? তাহলে কিন্তু সামাল দিতে পারব না।

—না না, সে সব নয়। ও সমস্ত করবার দিন নেই আর, সময় বড় খারাপ পড়েছে।—সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চট্টরাজ: একটা লোককে একটু শায়েস্তা করতে হয়েছে।

—বলে যান।—দারোগা চোখ বুজলেন।

—লোকটাকে জুতো-পেটা করা হয়েছে, দুদিন না খেতে দিয়ে কাছারীতে আটকে রাখা হয়েছে।

—খুব ভালো হয়েছে।—দারোগা তাচ্ছিল্যভরে বললেন, এ আর নতুন কথা কী—এ তো আপনারা হামেশাই করছেন। কিন্তু এর জন্যে এত ভয় পাওয়ার কী হল?

—কারণ আছে। লোকটা মানী মানুষ—প্রায় দেড়শো বিঘে জোত রাখে। বেশ শক্ত তেজী মন, টাকার জোরও আছে। বলছে—মামলা করবে।

—করুক না, ভয় কী! ফেঁসে যাবে।

—উহুঁ, ল্যাঠা আছে—

চট্টরাজ ঠোঁট ওলটালো : সাক্ষী-সাবুদ জুটিয়ে আনতে অসুবিধে হবে না ওর। দেশের চাষা-মজুরগুলোকে তো দেখতে পাচ্ছেন আজকাল, বড্ড হারামজাদা হয়ে গেছে। জমিদারের পেছনে না হোক, অন্তত নায়েবকে একটা খোঁচা দিতে পারলেও সে সুযোগটা ছাড়তে চাইবে না। সময়টাই খারাপ।

—বুঝলাম—

—তা সদরে যাওয়ার আগেই একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আর—চট্টরাজ থামলেন।

—আর ?—দারোগা হাসিভরা চোখে তাকালেন।

কথা পাকা হয়ে গেল। চট্টরাজ উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় শোনা গেল বাজনার শব্দ। কোথায় বেশ সাড়া-শব্দ করে ঢাক আর কাঁসর বাজছে।

—কিসের আওয়াজ ?

দারোগা বিস্মিত হয়ে বললেন, জানেন না ? আপনাদেরই তো পরব। পরশু বোধ হয় সরস্বতী পূজা। ওদিকে কোথায় একটা পূজো হচ্ছে—তারই আয়োজন।

—সরস্বতী পূজো ? ওঃ—

কথাটা বলেই ভুলে যাচ্ছিলেন চট্টরাজ—হঠাৎ আর একটা জিনিস মনে পড়ল। ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললেন, ঠিক, ঠিক, আমারও তো একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

—কী কাজের কথা আবার ?

—যত সব কাণ্ড !—বিরক্ত উত্তেজিত গলায় চট্টরাজ বললেন, এই মুচি শালারা আজকাল যেন মাথায় চড়ে বসেছে। না মানে দেবতাকে, না ভক্তি আছে ব্রাহ্মণে। এমন আস্পর্দা যে, সরস্বতী পূজো করতে চায়। ওই চামারহাটির হারামজাদাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—হুঁ ?

চট্টরাজ চটে গিয়ে বললেন, যদি সত্যিই পূজোর ধাষ্টামো করে তা হলে এমন ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করব যে, কোনোদিন ভুলবে না। আর ওদেরও দোষ নেই, ওই ব্যাটা মাস্টারই যত কুবুদ্ধির গোড়া, ও-ই নাচাচ্ছে ওদের। নাপিত হয়ে দেবীর পূজো করতে চায়, হাত খসে পড়বে না কুষ্ঠরোগে ?

দারোগা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। ওই মাস্টারটা কে বলুন তো ? আমি ওর সম্পর্কে যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে যে লোকটা ঠিক সোজা নয়। কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ ব্যাপার নেই বলে নাড়াচাড়া করে দেখতে পারিনি। আপনি চেনেন মাস্টারকে ?

চট্টরাজ মুখভঙ্গি করে বললেন, হুঁ, চেনবার সৌভাগ্য হয়েছে বই কি। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা—আমাদের মানুষ বলেই তিনি মনে করেন না বলে বোধ হল। তাছাড়া—চট্টরাজ হঠাৎ থেমে গেলেন।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, তাছাড়া কী?

চট্টরাজ ভ্রূকুটি করে দারোগার মুখের দিকে তাকালেন: কথাটা আগে আমারই বলা উচিত ছিল দারোগা সাহেব। লোকটাকে দেখে আমার সন্দেহ হল।

—কী সন্দেহ? কী বলুন তো?

—যখন জিজ্ঞেস করলুম, বাড়িটা কোথায়, তখন যা-তা একটা পরিচয় দিলে। বললে, ফুলবাড়ির পরামাণিক বাড়ির লোক। কিন্তু আমার মামার বাড়ি তো ওখানেই. সবই ভালো করে চিনি। ওখানে কোনো পরামাণিক বাড়ি আছে বলে আমি জানি না। তা ছাড়া মুখ-চোখের ভাব দেখে বেশ বুঝলুম মিথ্যে বলছে। কেন মিথ্যে বলল, সেটাই আমি এ পর্যন্ত ঠাহর করতে পারিনি। কিছু একটা গোলমাল আছে বলে বোধ হল যেন।

অসীম আগ্রহভরে দারোগা কথাগুলো শুনছিলেন। চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। বড় গোছের শিকার নয় তো কিছু? অ্যাব্‌স্‌কণ্ডার? কোনো রাজনৈতিক আসামী?

—সত্যি বলছেন?

—আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—তবে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। চামারহাটির মুচিদের বিষদাঁত আমিই ভাঙব। আপনি আমার সঙ্গে একবার ভেতরে চলুন, কয়েকখানা ছবি দেখাব আপনাকে। দেখবেন তো কাউকে চিনতে পারেন কি না।

* * * *

আজ দুদিন থেকে দেখা পাওয়া যাচ্ছে না সুশীলার। এতকাল যার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সচেতনতার প্রয়োজনই ছিল না, আজ তার সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছে সে। হঠাৎ মনে হয়েছে, সত্যিই ভাবান্তর ঘটেছে সুশীলার, সত্যিই বদলে গেছে সে।

চোখাচোখি দু-একবার দেখা হতে না হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। প্রায় এক মাস ধরে যে স্বপ্ন-কল্পনা মনের ভেতর একটা অপূর্ব রূপকথার জগৎ গড়ে তুলছিল, টলমল করে দুলে উঠেছে তার ভিত। যোগেন বুঝতে পেরেছে, যা হওয়া উচিত ছিল, তা হচ্ছে না। তাদের দুজনের মাঝখানে আর কিছুর ছায়া পড়েছে।

কী তা? কী হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাওয়া গেল। রাহুর মতো কে এসে সেখানে হাত বাড়িয়েছে তা আর মনের কাছে দুর্বোধ্য নয়। একটা হিংস্র অন্তর্জ্বালায় ঠোঁটটাকে কামড়াতে লাগল যোগেন। সে খবর পেয়েছে, এর পরও নাকি দুদিন এসেছিল

ধলাই। তেমনি জল আর পান খেয়ে গেছে।

শুনে যোগেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল।

—আসিলেই উয়াক্ খ্যাদাই দিয়ো মা!

—ক্যান, কী হৈল্? অ্যাতে দোস্তি আছিল—যোগেনের মা আশ্চর্য হয়ে গেল।

ঠিক কী বললে ধলাইয়ের দোষটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে পেল না যোগেন। অথচ সোজা কথাতেই বলা চলত। বলা চলত, ওর সঙ্গে আর আমার বন্ধুত্ব নেই, ও আর আমার দলের লোক নয়—ঝগড়া করে চলে গেছে। কিন্তু মনের ভেতরে অবস্থাটা এত সহজ নয় বলেই সহজ সত্যি কথাটা বলতে পারল না যোগেন। শুধু চুপ করে থেকে কোথাও একটা ক্ষুব্ধ ঝড়ের আকৃতি যেন সে অনুভব করতে লাগল।

নাঃ, যা হোক কিছু করতেই হবে। আর সহ্য হচ্ছে না যোগেনের—একটা অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত স্নায়ুগুলো পর্যন্ত তার জ্বলে যাচ্ছে। এ অসম্ভব। সে তো বেশ ছিল। জীবনের এই যে একটা দিক আছে, এর কথা এতকাল তো তার মনে হয়নি। মহকুমা শহরের সেই রাত্রি—সেই কুৎসিত অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া—একটা তিক্ত বিস্বাদে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল তাকে। কিন্তু এল সুশীলা। অন্ধকার নির্জন উঠোনে তার মুখে পড়ল প্রদীপের আলো, প্রথম ফোটা ফুলের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন। অনেক মেয়ের ভেতরেও যে যোগেন হাঁসের পাখায় এক বিন্দু জলের মতো ছিল নিরাসক্ত—মাতলামির মাতন জেগে গেল তার ভেতরে; রাতের পর রাত জেগে কবি লিখে যেতে লাগল একটা আশ্চর্য অনুভূতির কথা, রূপকথার রাজকন্যার কল্প-কাহিনী:

—কাজল কালো চইখে তোমার
ভমর উড়ি যায়—

যতদিন জানত না, ততদিন বেশ ছিল। যখন জানল তখন না পাওয়ার ব্যথাটা সমস্ত সহ্যশক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্ত বোধবৃত্তিকে দুঃসহভাবে পীড়ন করছে তার। যোগেনের ইচ্ছে করতে লাগল, সে তার মাথার চুলগুলো দুহাতে উপড়ে উপড়ে শেষ করে দেয়, অসহায় স্বরে একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

সরস্বতী পুজোর রাত্রে চামারহাটিতে আলকাপের গান গাইতে হবে তাকে। নতুন সুরে, নতুন ভাবনায়, নতুন ভাষাতে। দুটো জ্বলন্ত চোখে তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়ে মাস্টার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু—কিন্তু—

না, সে পারবে না ওসব। তার দরকার নেই চারণ হয়ে, তার প্রয়োজন নেই দেশের যত মানুষকে ভালো ভালো কথা শুনিয়ে জাগিয়ে দিয়ে। ওসব কাজ করবার অন্য লোক আছে, অন্য লোকের সামর্থ্য আছে ও দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার। সে নয়।

তবে কী করবে? হিংস্র একটা আক্রোশে নিজের একটা গানকেই টুকরো টুকরো করে

ছিঁড়ে ফেলতে লাগল যোগেন। সে শিল্পী হতে চায় না, গুণী হতেও চায় না। নিজের প্রাণটাকে ভরে রাখতে পারলেই তার সমস্ত প্রয়োজন মিটে যাবে। আজ যদি তার সবচেয়ে বড় কিছু চাইবার থাকে, তা হলে সে সুশীলা। সুশীলাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছুরই কোনো অর্থ নেই তার কাছে।

সোজা পথ দিয়ে সুশীলাকে পাওয়ার উপায় নেই। ও ব্যাপারের প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সুশীলার বাপের টাকার খাঁই শুনে সুরেন চেঁচিয়ে বলেছে, কাম নাই হামার উয়ার সাথ্ বিহা দিয়া। হামার এমন ভাইয়ের জন্য কি মেইয়ার অভাব হেবে? একটা ছাড়ি অর দশটা বিহা দিমু—এই তুমাক কহি দিনু মা।

মা শুধু দুঃখ করে বলেছে, হৈলে বড় ভালো হৈত—

—তো ফের কী করা যায়। হামার ভাইয়ের ঢের বিহা জুটিবে।

সুতরাং আলোচনাটা চাপা পড়ে গেছে। তাদের ছোটলোকের ঘরে এমন কথা অনেক ওঠে, অনেক ভাঙে। কেউ তার গুরুত্ব দেয় না। তাই বিয়ের প্রস্তাবটা ভেঙে গেলেও কারো মনে কোনো বিকার দেখা দেয়নি। সুশীলা যেমন আছে, তেমনি আছে, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে, এটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় বলে মনে হয় না কারুর। মরণ হয়েছে শুধু যোগেনের। সকলের কাছে যা সহজ, তার কাছে তা তত দুরূহ।

মরণ ছাড়া কী আর বলা চলে একে? খেতে সোয়াস্তি নেই, শুয়ে ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালা। কদিন থেকে সুশীলা স্পষ্ট অবহেলা করছে তাকে। আর তা ছাড়া ভালো লাগেনি ধলাইয়ের সেদিনকার সেই চোখের দৃষ্টি, একটা অস্বস্তিকর সম্ভাবনায় কেমন ছম ছম করছে মন। অথচ যদি পাওয়ার আশাটা পাকা হয়ে থাকত তবে ভাবনার কিছু ছিল না—বরং একটা অপূর্ব মধুরতাই এই প্রতীক্ষাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। কিন্তু এ নিতান্তই গোপন—এ একান্তই তার নিজস্ব, তাই এ অসহ্য, তাই দুদিনের এ অবহেলাও একটা নিশ্চিত অঘটনের সংকেত। একটা মাত্র পথ আছে। চরম পথ—আর উপায় নেই। এ না হলে পাগল হয়ে যাবে যোগেন, ক্ষেপে যাবে। তার কিছুই দরকার নেই। আলকাপের গান সে গাইতে চায় না, প্রকাণ্ড একটা কিছু হতেও চায় না জীবনে। চুলোয় যাক মাস্টার, চুলোয় যাক তার গান। সুশীলাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে। যেখানে হোক—যতদূরে হোক। সেখানে সে একচ্ছত্র, সেখানে তার আর সুশীলার ভেতরে এতটুকু ছায়াসঞ্চার নেই কারো।

বন্দী একটা জানোয়ারের মতো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল যোগেন। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রাত। শুধু সুরেনের নাক ডাকছে—বিশ্রী একটা গাঁ গাঁ শব্দে মুখরিত হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা—যোগেনের অসহ্য তীব্র বিরক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়েছে যেন।

বারো

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে যোগেনের মা'র দৃষ্টিটাও স্বচ্ছ হয়ে এল।

বুড়ো মানুষ, শীতটা এমনিতেই বেশি। তা ছাড়া কাল সাঁঝ রাতে অল্প বৃষ্টি হওয়ায় আজ যেন আকাশ ভেঙে হিম নেমে এসেছে। শেষ রাত্রের দিকে পা দুটো একেবারে কালিয়ে আসতে লাগল, কাঁথার ভেতরটাও যেন জলে ভিজে গেছে বলে মনে হল। হাতে হাতে পায়ে পায়ে ঘষেও একটুখানি গরম হতে চাইছে না শরীর।

এই রকম বিশ্রী শীতে ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল যোগেনের মা'র। ঠিক ঘুম যে ভাঙল তা নয়, ঠাণ্ডায় ফিকে হয়ে এল সুপ্তির ঘন গভীর আবেশটা। অর্ধচেতন ঘরের মধ্যে একটা ইচ্ছে সঞ্চারিত হচ্ছে, উঠে আগুনের তাওয়াটা জ্বালিয়ে হাত-পাগুলো একটু সেঁকে নিলে মন্দ হয় না একেবারে। কিন্তু আলস্য আর ঘুমের ঘোর চেষ্টাটায় বাধা দিচ্ছিল বার বার।

এমন সময় হঠাৎ টের পাওয়া গেল পাশ থেকে উঠে যাচ্ছে সুশীলা। তখন কিছু মনে হয়নি। তারও পরে শোনা গেল কোথা থেকে যেন অতি ক্ষীণ, অতি অস্পষ্ট একটা বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে। চমৎকার লাগল সে সুর। শেষ রাতের স্তব্ধতায়, শীতের হিমাচ্ছন্ন জড়তার মধ্যে যেন চাঞ্চল্যের আলোড়ন একটা। ওই রকম বাঁশি শুনলে মন কেমন কেমন করে ওঠে, ঠাণ্ডা আড়ষ্ট রক্তের মধ্যে যেন একটা উত্তপ্ত আচ্ছন্নতা বিকীর্ণ হয়ে পড়তে চায়।

কখন বাঁশি বেজেছে টের পায়নি যোগেনের মা। আবার যেন ঘন হয়ে ঘুম নামছিল তার চোখের পাতায়। কিন্তু কেমন যেন খেয়াল হল অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে সুশীলার ফিরে আসবার সম্ভাব্য সময়। এতক্ষণ কোথায় কাটাচ্ছে সুশীলা, কী করছে? এই সাঁজ-সকালে এমন কিছু কাজ তাকে করতে হয় না। অবশ্য গেরস্তর বাড়ি, কাজের অন্তও নেই, কিন্তু তাই বলে কুটুমের মেয়েকে খাটিয়ে বদনাম করবার ইচ্ছে নেই যোগেনের মা'র। তা ছাড়া এমনিই একটু আহ্লাদে মেয়ে, কুড়েমিও আছে, যেচে সংসারের এটা ওটা খেটে দেবে এসব আশা যে তার কাছ থেকে করা যাবে তাও নয়। তবে গেল কোথায় সুশীলা?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ওই বাঁশির সুরের কথা। যোগেনের মা'র সম্মুখ থেকে আচমকা যেন একটা পর্দা সরে গেল। তারও একদিন বয়েস ছিল সুশীলার মতো। সেদিন বাঁশি বাজেনি বটে, কিন্তু বহু দূরদূরান্ত থেকে এমনি করেই যেন গানের সুর ভেসে আসতো। সেদিন সেও এরকম দরজা খুলে—

ধড়াক করে উঠে বসল যোগেনের মা। আস্তে আস্তে উঠে এল বিছানা থেকে, স্বাভাবিক অনুমানবশেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলে যোগেনের ঘরের দিকে। কিন্তু কী

আশ্চর্য ! এখানে তো নয়। ছেঁড়া লেপটা মুড়ি দিয়ে যোগেন পড়ে আছে, মাথার সামনে বুক জ্বলছে রেড়ীর তেলের প্রদীপটার, খোলা রয়েছে তার গানের খাতাখানা, দোয়াতের মধ্যে ডুবোনো রয়েছে কলমটা। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছে যোগেন, অনেক রাত অবধি কানে এসেছে তার গুনগুনানি। তার ঘরে তো আসেনি সুশীলা।

তবে ? তবে কি সুরেনের এই কাজ ? রাগে গায়ের ভেতর জ্বালা করে উঠল যোগেনের মা'র। সেই সঙ্গে বিস্ময়ও বোধ হল। বিয়ের আগে অবশ্য খুব খাঁটি ছিল না সুরেন, কিন্তু বিয়ে করবার পরে তো সে সব বদলে গেছে একেবারেই। দিনরাত চোটে-পাটে থাকে, বিব্রত আর বিরক্ত মুখে সংসারের বোঝাটা কাঁধে করে টেনে বেড়ায়, এসব ব্যাপারে মনোযোগ দেবার মতো সময় তো তার আছে বলে বোধ হয় না। তবুও যদি নিজের শালীকে বাড়িতে এনে এ সমস্ত করবার দুর্বুদ্ধি তার হয়ে থাকে তা হলে তাকে ক্ষমা করা যাবে না। চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দেবে যোগেনের মা, ঝাঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে সুরেনের। হোক সে বড় ছেলে, থাকুক তার অমন জাঁদরেল মেজাজ, এ কেলেঙ্কারীকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

যোগেনের মা মনঃস্থির করে ফেলল। দাওয়ার কোণ থেকে সংগ্রহ করে নিলে উঠোন ঝাঁট দেবার মুড়ো ঝাঁটাটা। তারপর সোজা এসে দাঁড়ালো সুরেনের ঘরের সামনে।

ঘরের ঝাঁপ খোলা। ভেতরে হালকা অন্ধকার আর সে অন্ধকারে চামড়ার গন্ধ, জুতোর রঙের মিশ্র গন্ধ। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আবছায়া ভোরের দুটি-চারটি আলোর আভাস লেগে চিক চিক করে উঠছে সুরেনের যন্ত্রপাতিগুলো। কিন্তু সুরেনও যোগেনের মতো একাই ঘুমুচ্ছে, ঘুমুচ্ছে অঘোরে। তবে ?

আর তাও তো বটে। কস্মিনকালে গলায় গান নেই সুরেনের, বাঁশি বাজানো তো দূরের কথা। ঝোঁকের মাথায় ব্যাপারটা খেয়াল হয়নি, অবিচার করা হয়েছে সুরেনের ওপর। কিন্তু গেল কোথায় সুশীলা ? নাকি সমস্তটাই ভুল বোঝা হয়েছে ?

ঘরে ফিরে এসে আবার বিছানার দিকে তাকালো যোগেনের মা। না, সুশীলা ফেরেনি এখনো।

তবে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়। এবং সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কণামাত্রও। কিন্তু কে সে ? কে হতে পারে ?

পরের মেয়ে বাড়িতে রেখে এ কেলেঙ্কারীকে কোনোমতেই বাড়তে দেওয়া যাবে না। শেষে একটা কিছু গোলমাল হয়ে গেলে অপযশটা তারই ছেলেদের মাথার ওপর এসে পড়বে। সুতরাং গোড়াতেই এর মূলোচ্ছেদ করা দরকার।

বাড়ির বাইরে এল যোগেনের মা। একটা স্বাভাবিক সংস্কারবশেই হাঁটতে শুরু করল খিড়কির দিকে। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। শুধু এক-আধটা মোরগের

ডাক ছাড়া পাখ্‌পাখালির সাড়া পর্যন্ত নেই কোনোখানে, শীতে যেন আচ্ছন্ন আর আড়ষ্ট হয়ে আছে। শুধু টুপটাপ করে শিশিরের ফোঁটা ঝরছে এদিকে ওদিকে, বাতাসে আমের মুকুলের গন্ধ।

এমন সময়ও নাকি ঘর থেকে বেরুতে পারে মানুস!

কিন্তু ওই বাঁশি। ও বাঁশির নেশা আলাদা। কিছুতে ঠেকাতে পারে না, কোনো কিছুই বাগ মানাতে পারে না মনকে। যোগেনের গান মনে পড়ল: 'হাতে লিয়ে মোহন বাঁশি, কুলমান দিল্যা হে নাশি'—

কিন্তু কুলমান গেলে সেটা সুশীলার যাবে না, যাবে যোগেনের মা'র। ভাবতেই চড়াৎ করে মাথার ভেতরে ফুটে উঠল রক্ত। যোগেনের মা আবার হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলে ঝাঁটাটা। সুশীলাকে একবার ঠিকমতো ধরতে পারলে হয়। রেয়াত করা চলবে না কুটুমের মেয়ে বলে। কড়া শাসন করতে হবে, নিজের ভালো ছেলেদের মাথায় অকারণ অপযশের বোঝা সে কোনোমতেই চাপতে দেবে না।

প্রখর শীত। বিদায় নিয়ে যাচ্ছে বলেই যেন রাশি রাশি ধারালো দাঁতে শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে তার। ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল যোগেনের মা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না মেয়েটাকে, পালালো কোথায়? অনর্থক আর শীতের মধ্যে কষ্ট করে খুঁজে লাভ নেই, ঘরেই ফিরে যাবে বরং। সুশীলা আসুক, তারপর না হয় দেখা যাবে কতখানি বুকের পাটা বেড়েছে হারামজাদা মেয়েটার।

ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে গেল যোগেনের মা। স্তব্ধ হয়ে কান খাড়া করল। বাতাসের শব্দ? ঘাসের মধ্যে নড়াচড়া করল কোনো জানোয়ার? না, মানুষই কথা কইছে, কথা কইছে ফিসফাস করে। কিন্তু কোত্থেকে আসছে শব্দটা?

একটু দূরেই ভাঙা একটা গোয়াল ঘর। কিছুদিন আগেও দুটো গোরু ছিল যোগেনের মা'র, তারপর গো-মড়কে দুটোই মরল একসঙ্গে। সেই থেকেই ফাঁকা পড়ে আছে ঘরটা। গোরুর ঢের দাম আজকাল, কিছুদিন থেকে চেষ্টায়ও আছে সুরেন, কিন্তু সুবিধেমতো যোগাড় করতে পারেনি এখনো। সেই গোয়ালের ভেতর থেকেই কি আসছে না সন্দেহ-জনক শব্দটা?

অনেক আগেই ঘরটাকে লক্ষ্য করা উচিত ছিল। যোগেনের মা নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ভাঙা বেড়ার কোণে, তারপর তাকিয়ে দেখল ঘরের ভেতরে। চোখের দৃষ্টিতে সন্ধানী তীক্ষ্ণতা সঞ্চার করে পরিষ্কার দেখতে পেল সমস্ত।

স্তূপাকার পোয়ালের নরম বিছানার ওপরে কোনো অচেনা পুরুষের আলিঙ্গনে নিশ্চিন্তে এলিয়ে আছে সুশীলা, কথা চলছে ফিসফাস শব্দে। দু'হাতে সুশীলার মুখখানি তুলে ধরে পুরুষটি—

এতক্ষণের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত প্রস্তুতির পরে এবারে বিকট শব্দে ফেটে পড়ল যোগেনের মা। ধৈর্য এবং সহ্যের শেষ সীমা তার পার হয়ে গেছে। যোগেনের মা গর্জন করে উঠল: হারামজাদী!

যেন বাজ পড়ল।

মুহূর্তের জন্যে নিথর হয়ে গেল আলিঙ্গনবদ্ধ যুগল মূর্তি। তারপরেই পুরুষের স্বাভাবিক প্রেরণাটা চলে এল একেবারে বিদ্যুতের চমকের মতো। এবং এক্ষেত্রেও তাই করল সে—ধাঁ করে লাফিয়ে উঠল, সোজা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে। শুধু গ্রামের সদ্য-জাগা কুকুরগুলোর উত্তেজিত প্রতিবাদ তার পলায়নকে চিহ্নিত করতে লাগল।

সুশীলাও উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে—চোখের দৃষ্টি তার মাটির দিকে।

যোগেনের মা আগুনভরা চোখে তাকাল তার সর্বাঙ্গে, আবার বললে, হারামজাদী।

সুশীলা জবাব দিল না।

—কাক্ লিয়া মজা লুইটবা নাগিছিলু?

সুশীলা উত্তর দিল না।

—কথা ক ছিনালী, কথা ক। কুন্ নাগরের কোলত্ শুতি আছিলু?

হঠাৎ চোখ তুলল সুশীলা। এতক্ষণে তারও দৃষ্টি ঝিকিয়ে উঠেছে। বললে, কহিমু না।

—কহিবু না? ছিনালপনা কইরবু, ফের চোপা দেখাচ্ছিস্ হামাক? ঝাঁটা মারি আজ তোর—

—ক্যানে? ক্যানে মারিবা হামাক?—সুশীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: হামার খুশি, হামি যামু হামার নাগরের ঠাই। তুমার গায়ে ক্যানে জ্বালা ধরোছে?

—মুখ সামাল্, কহি দেছি তোক্।—রাগে আর শীতে যোগেনের মা যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল: মুখ সামাল্। হামার ঘরত থাকি তুই—

—চলি যামু হামি তুমার ঘরত থাকি। হামি তুমার ব্যাটার বৌ নহো যে হামাক চোপা করিবা আসিছো।

—তো যা। যেইঠে মন চাহে চলি যা। হারামজাদী, ছিনাল, শ্যাবকালে—কদর্য ভাষায় একটা অবাঞ্ছিত সম্ভাবনার উল্লেখ করে যোগেনের মা বললে, তখন কী হেবে?

—যা হেবে, সিটা হামার হেবে। তুমার অ্যাতে দরদ হৈল্ ক্যানে?—তীক্ষ্ণ চাপা গলায় সুশীলা বললে, আপনাক সামাল্ দিই রাখ আগত্, পিছে কথা কহিয়ো।

—কি কহিলু?—যোগেনের মা ঝাঁটা তুলে ধরল: আইজ তোক হামি—

দু পা সরে গেল সুশীলা। উগ্র কণ্ঠে বললে, মারিয়ো না হামাক, হামি কহি দেহি, মারিয়ো না।

—ক্যানে? কিসের ডরত্?

—কিসের ডরত্?—সুশীলা মুখভঙ্গি করলে, ওঃ, ভারী সতী সাজোছেন আইজ। চ্যাংড়া বেলাত্ কত সতীপনা আছিল্ জানি হামরা।

মুহূর্তে হাত নেমে এল যোগেনের মা'র। চোখে ক্রোধের আগুন নিবে গিয়ে এক মুহূর্তে রাশি রাশি ভয় এসে আচ্ছন্ন করে দিলে দৃষ্টি। দুর্বল স্বরে যোগেনের মা জবাব দিলে, কী জানোস্ তুই?

—সকলই জানো। বেশি ভালোমানুষী করিবা না নাগে। যৈবনের জ্বালা ধরিলে নাগর সকলেরই আসে, নিজের বুকত্ আগে হাত দিয়া ফের কথা কহিয়ো।

নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলতে হবে! যোগেনের মা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে পঁয়ত্রিশ বছর আগে চলে গেছে মন। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে স্নিগ্ধ অন্ধকার ছায়া-বেষ্টনী, মধু মাদকতায় ভরা অপরূপ রাত্রি।

শেষ চেষ্টা করে যোগেনের মা বললে, হামি কহিমু সুরেনকে।

—কহিয়ো, যাক খুশি কহিয়ো- -

ঝটকা মেরে যোগেনের মা'র পাশ কাটিয়ে চলে গেল সুশীলা।

* * * *

কিন্তু কাউকে বলতে পারল না যোগেনের মা। সুরেনকেও না, যোগেনকেও না।

আশ্চর্য আজকালকার মেয়েরা সব। লজ্জা-সরমের বালাই যে তাদের আছে এমন মনে হয় না। অসংকোচে হেঁটে বেড়াচ্ছে সুশীলা, বুক ফুলিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। সকালে এতবড় কাণ্ডটা যে হয়ে গেল বিন্দুমাত্র অপরাধ-বোধ নেই সেজন্যে। অথচ তাদের দিন হলে—

তাদের দিন। কত যত্নে, কত গোপনতার সঙ্গে পরম 'অতনের' (রতনের) মতো মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হত। পাছে কেউ জানতে পারে, কারো চোখে পড়ে। আঁচল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়েছে প্রাণের মাঝখানকার ধিকি ধিকি আগুনকে। সারা দিন কেটে গেছে তারই স্বপ্নে, সারাটা রাত তার দোলা ঢেউয়ের মতো এসে ভেঙে ভেঙে পড়েছে বুকের মধ্যে।

কিন্তু অনেকদিন পরে আজ কি আবার তেমনি করে দোলা লাগল তার? কেমন উড়ু-উড়ু হয়ে উঠেছে মন, অনেকদিন পরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে একটা নিবিড় আর গভীর উত্তাপ। একদিন ছিল যেদিন চোখের দৃষ্টি এমন ঝাপসা হয়ে যায়নি, তার ডাগর ডাগর কালো চোখের দিকে তাকিয়ে মুচি-পাড়ার চ্যাংড়া আর জোয়ানদের বেভুল

লেগে যেত। কাঁধ ছাড়িয়ে, পিঠ ছাপিয়ে নেমে আসত ঘন চুলের রাশ—লোকে বলত 'মেঘবরন'। রঙ ছিল কালোই, কিন্তু সে কালো রঙের ভেতর দিয়েও যেন তার রূপের জেল্লা ফুটে বেরুত। ভিন্ গাঁয়ের কোন্ একটা ছোকরা তাকে দেখলেই গান ধরত: 'কাল-নাগিনী মাইল্লে ছোবল, পরাণ জলি যায় হে—'

কাল-নাগিনীই বটে। নাগিনীর মতোই উজ্জ্বল লতানে শরীর, সে শরীরে রূপের লহর বয়ে যেত তার। বাপের অবস্থা ছিল ভালো, হাট থেকে নানা রকম সখের শাড়ি কিনে আনত তার জন্যে। সেই শাড়ি পরে কোমর দুলিয়ে যখন সে চলত, তখন তার দিকে তাকিয়ে ভিন্-গাঁয়ের অচেনা মানুষগুলোও থমকে থেমে যেতো একবার, প্রশ্ন করত, ইটা কার বিটি হে?

তারপরে বিয়ে হল তার। টাকার জোরে সনাতনপুরের কেষ্ট মুচি বিয়ে করল তাকে। হাবা ভালো মানুষ লোক, তাড়ি খেত একটু বেশি পরিমাণে, আর নেশায় খানিক জোর ধরলেই তাকে জাপ্টে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করত। লোকটার প্রতি করুণা আছে তার, একধরনের দয়াও আছে। কিন্তু মন সে নিতে পারেনি, তা কেড়ে নিয়েছিল আর একজন।

দাওয়ায় বসে কলাই ঝাড়তে ঝাড়তে আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বয়েসটা হঠাৎ একটা পাক খেয়ে ফিরে গেল পনেরো বছরে। এই স্বামীর ভিটে, ছেলেরা আর ছেলেদের বৌরা, এই ভরপুর সংসার, হঠাৎ এর সব কিছু ছাড়িয়ে ভাবনাটা ফিরে চলে গেল পেছনে। সুশীলাকে শাসন করতে গিয়েছিল, কিন্তু পারল না। তার একটি কথায় পঞ্চান্ন বছরের হিসেবী-বুদ্ধিটা চলে গেল পনেরো বছরের ভয়-ভাবনাহীন ছেলে-মানুষিতে, সুশীলার মুখের আয়নায় যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া মুখখানাকে আবার দেখতে পেল নতুন করে।

বাড়ির পেছনের পুকুরটা। ওখানে দুটি-চারটি শাপলা পাতা, খানিকটা কলমী লতা লকলক করছে। এদিকের জল টলটলে নীল, ঝকঝকে পরিষ্কার। তাতে নিজের মুখও যেন দেখতে পাওয়া যায়।

ঝিমঝিম করছিল দুপুর। রোদ কাঁপছিল কাঠবাদাম গাছটার পাতায়, কাঁপছিল শান্ত জলে। পুকুরের ঘাটলায় দাঁড়িয়ে সেই রোদে ভরা জলের দিকে তাকালো সরলা, দেখতে পেল নিজেকে। আর সেদিন যেন দেখতে পেল তার সর্বাঙ্গে ঢল ঢল করছে প্রথম যৌবন, আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে তার দেহের গড়ন। ঘাটলার নিচে, ঝিলমিলে জলের ভেতরে এই যার ছায়া পড়েছে সে যেন সরলা নয়, আর কেউ; তার মতো অমন রূপবতী কোনোদিন চোখে পড়েনি সরলার।

কতক্ষণ নিজেকে দেখেছিল সে জানে না। রোদে আর বাতাসে মিলে যেন দিশেহারা করে দিয়েছিল তাকে, ওই দুলে ওঠা, ওই ঝিলমিল করা জলের ভেতরে দৃষ্টি স্থির রেখে

দাঁড়িয়ে ছিল বিহ্বলের মতো। তারপর হঠাৎ গানের সুর এল কানে : 'কালনাগিনী মাইল্লে ছোবল, পরাণ জ্বলি যায় হে—'

ভিন্ গাঁয়ের সেই রসিক ছেলেটি। কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঘন-পাতার ছায়ায় ভরা বাদাম গাছটার নিচে। সরলা চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। দিব্যি চেহারা মানুষটার, দিব্যি গানের গলা। ভারী মিষ্টি করে সে হাসল, হঠাৎ ফাগের গুঁড়োর মতো রক্তকণা ছড়িয়ে গেল মুখে।

—কথা কও কইন্যা, তাকাও হামার মুখের দিকে।

—ভারী অসভ্য মানুষ—লজ্জারুণ মুখে জবাব দিলে সরলা।

কিন্তু অসভ্য মানুষটি লজ্জা পেল না, বরং এগিয়ে এল একটু একটু করে।

ঝিমঝিম দুপুর, ঝিলমিলে রোদ। রোদে আর বাতাসে মিলে কী যেন হয়ে গিয়েছিল সেদিন, কী যেন একটা ঘটে গিয়েছিল জলের ভেতরে সেই মেয়েটির আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। মহিন্দর এল সরলার জীবনে, নিয়ে এল গান আর নিয়ে এল ভালোবাসা। আজ সুশীলা যেন সেই দিনটি তার কাছে ফিরিয়ে এনে দিলে।

—মা, পাঁচটা টাকা দিবা হেবে, চামড়া কিনিবা নাগে।

সুরেন এসে দাঁড়িয়েছে। লজ্জিত অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকালো যোগেনের মা, বয়েসের প্রভাবে শুকনো শীর্ণ মুখে কী একটা ঝকমক করে খেলে গেল শুধু মুহূর্তের জন্যে। কবি যোগেন হয়তো লক্ষ্য করত, কিন্তু গদ্যময় সংসারী মানুষ সুরেন লক্ষ্য করল না। সে কাজের লোক, অত সময় নেই তার।

—দেচ্ছে টাকা—একটু ইতস্তত করে যোগেনের মা বললে, একটা কথা কহিমু তোক্?

—কী?

—জমি লিয়ে ওই হুজ্জুতটা মিটাই ফ্যাল্ বাপ। একটা মানী মাইন্ষের সাথ—

কথাটা শেষ করবার আগেই সুরেন চেঁচিয়ে উঠল বিশ্রী গলায়।

—আঁ? ইটা তুমি কী কহিলা মা, আঁ?

যোগেনের মা ভীরু কণ্ঠে বললে, কহিছিনু—

—কিছু কহিবা হেবে না তুমাক্। মানী লোক! ওঃ, অমন ঢের শালা মানী লোক দ্যাখেছি হামি। বে-আইনী করি হামার জমি কাঢ়ে লিবে আর তার সাথ হামি যামু মিট-মাট করিবা। ত্যামন বাপের ছোয়া নহো হামি। তো হাইকোর্ট যিবা নাগে তো যামু হামি —ঘর বাড়ি বিক্‌কিরি করি চালামু মামলা। ইটা সাফ সাফ কহিনু—হঁ!

নতদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল যোগেনের মা।

সুরেন বলে চলল, শালা নায়বক্ হাত করি রাখিছে, গেনু তো হামাক্ আমলই দিলে না। আইচ্ছা, হামিও কেষ্ট মুচির ব্যাটা। দেখি লিমু হামিও। মিট্‌মাট! মিটমাটের

কথা কহিয়ো না, শালা হামার পায়ে ধরি পড়িলেও না।

দুপদাপ করে চলে গেল সুরেন। উত্তেজনার বশে ভুলে গেল চামড়া কেনবার জন্যে পাঁচটা টাকা নিতে এসেছিল মায়ের কাছ থেকে।

সুরেন বুঝবে না, সুরেন কেষ্ট মুচির সন্তান। যে বুঝত সে যোগেন। সেদিনের গান আর সেদিনের ভালোবাসা যেন রূপ পেয়েছে যোগেনের মধ্যে, সরলার প্রাণের ভেতর থেকে, তার স্বপ্নের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে কবি যোগেন। কেষ্ট মুচির ব্যাটা হয়েও সে মহিন্দরের সন্তান—যে মহিন্দরের গানে একদিন সুশীলার মতোই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যেত যোগেনের মা।

কিন্তু যোগেনও বুঝবে না।

কান পাতল যোগেনের মা। ঘরের ভেতর থেকে ছেলের গানের সুর আসছে। কিন্তু কী এ গান ?

প্যাটের জ্বালায় জ্বলি জ্বলি গেল রে দিনমান।
কাঁদি কাঁদি জীবন যাবে, গরীবের নাই ভগমান।
বড়লোক রসের ঠাকুর,
মোরা হইনু পথের কুকুর
লাথি-জুতার বরাত করি সহি ক্যাতে অপমান,
কাঁদি ক্যানে ফুলাছ চোখ, গরীবের নাই ভগমান—

এ কোন্ গান ? এর সঙ্গেও তো সেদিনের সুর মিলছে না। সব আলাদা, সব আরেক রকম। শুধু একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায়, একটা অজানা সম্ভাবনায় মনের আকাশটা থমথম করছে।

তবু সুশীলার কথাটা বললে হত সুরেনকে। নাঃ, থাক। কী বলে বসবে কে জানে। তার চাইতে পরের মেয়েকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারা যায় সেই ভালো।

—টাকা পাঁচটা দিবা কি নাই ?—সুরেনের উত্তেজিত কণ্ঠ কানে এল।

—দেছি—

যোগেনের মা উঠে দাঁড়াল। আচমকা চোখে পড়ল উঠোনের ওপার থেকে কেমন অদ্ভুত কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সুশীলা। সে দৃষ্টির সঙ্গে মিল আছে সুরেনের ঔদ্ধত্যের, মিল আছে যোগেনের এই দুর্বোধ্য গানগুলোর। শুধু মিল নেই সেই বাদাম গাছটার ঘন ছায়ার আর মিল্ নেই রক্তে মাতলামি জাগানো সেই সব গভীর রাত্রির।

নতুন কাল এসেছে—সব নতুন। এদের সামনে দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়, সুশীলার নয়, সুরেনের নয়, এমন কি যোগেনেরও নয়।

তেরো

—মা, মা—

একটা জোর হাঁক দিলে যোগেন : মা, মা—

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অসীম বিরক্তিভরে যোগেন আবার ডাকল : কুন্ঠে গেইলা মা, মরিলা নাকি হে ?

—ক্যানে, এই সকালেই অ্যাত চেল্লাচিল্লি নাগাইলে ক্যানে নবাবের ছোয়া ? মা'র বোখার ধরিছে।—উত্তর এল সুরেনের।

—বোখার ?—যোগেনের চোখে মুখে ফুটে বেরুল উৎকণ্ঠা : ক্যানে, বোখার ধরিলে ক্যানে ?

—কও কথা—বোখার ধরিলে ক্যানে ?—সুরেনের স্বরে বিস্মিত ক্রোধ প্রকাশ পেল : ইস্কুলে নিখি নিখি পাঁঠা হই গেলু নাকি তু ? বোখার ধরিছে—বোখার ধরিছে। ক্যানে ধরিছে উটা কি মানুষ কহিবা পারে ?

কিন্তু সুরেনের মন্তব্যের কোনো জবাব দিলে না যোগেন, কথা বাড়ালেই সুরেন গালাগালি আরম্ভ করে দেবে। দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল সে।

দাওয়ায় ময়লা চটের বিছানা। তার ওপরে একটা ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে হি হি কাঁপছে যোগেনের মা। কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁতে খট খট করে একটা শব্দ উঠছে, মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে একটা অস্পষ্ট আকুতি। মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে সুশীলা, কোনোরকম পরিচর্যা করছে বোধ হয়।

যোগেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কদিন থেকেই কেমন বিস্বাদ-তিক্ত হয়ে আছে মনটা, মা'র এই জ্বরটা দেখে যেন আরো খারাপ লাগতে লাগল। হোক নিজের আত্মীয়, হোক একেবারে আপনার জন, কারো আধি-ব্যাধি দেখলে বড় বিশ্রী লাগে যোগেনের। সহানুভূতি আসে না, করুণায় বিকল হয়ে ওঠে না মন। কেমন ভয় করে, কেমন ছমছমানি জাগে শরীরে। কারো অসুখ দেখলেই তার মনে হয়, কেন কে জানে মনে হয়, বাঁচবে না। হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের, যেন দেখতে পায় তারও চারদিক ঘিরে ঘিরে মৃত্যুর একটা অপচ্ছায়া আসছে ঘনিয়ে।

—আইলু বাপ ?—কম্পিত স্বরে মা বললে, বস্ এইঠে।

যোগেন বিস্বাদ মনে আসন নিলে।

—না, এইঠে আয়, হামার পাশে আয়—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের একেবারে কাছে গিয়ে বসল যোগেন—সুশীলার আঁচলের ছোঁয়া

লাগল তার গায়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন সটকা মেরে উঠে দাঁড়ালো সুশীলা, তারপর সোজা ঘর থেকে চলে গেল বেরিয়ে।

কিছু একটা অনুমান যেন তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগালো যোগেনকে। হঠাৎ তার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল : হামাক দেখি অমন করি পালাছিস্ ক্যানে হারামজাদী ? হামি কি খাই ফেলিমু তোক ?—কিন্তু যা বলতে ইচ্ছে করে তাই বলা যায় না। গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুল কি বেরুল না, দুটো ঝকঝকে চোখে যোগেন শুধু তাকিয়ে রইল সেদিকে।

—বাপ ?

মা ডাকছে। আস্তে আস্তে, স্নেহভরা গলায় ডাকছে : বাপ ?

—কী কহিবা ?—একটা নিশ্বাস ছেড়ে যোগেন জবাব দিলে।

—একটা কথা কহিমু তোক—কাঁপা গলার আওয়াজটা যেন মিনতির মতো শোনালো।

—কহো না—

মা একখানা হাত বার করল কাঁথার ভেতর থেকে, রাখল যোগেনের হাতে। জ্বরের তীব্র উত্তাপে শরীরটা যেন ছাঁৎ করে উঠল যোগেনের। কী গরম, কী ভয়ানক গরম! যেন জলন্ত আগুনের ছোঁয়াচ লেগেছে গায়ে। যোগেনের মনে হল মা'র হাতটা গায়ের থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, যেন ওই হাতের ছোঁয়ায় সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

মা আস্তে আস্তে ছেলের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

—হামি আর পারোছি না যোগেন। বুঢ়া হই গেছি, শরীর ভাঙি গেইছে। কখন বা টপ করি মরি যাই। ইবার একটা বিহা দিমু তোর। আর ব্যাটাগুলানের বিহা দিয়া তো খুব সুখ হইছে হামার, তোর বউ আসি হামাক দেখাশুনা করিবে।

যোগেন উত্তর দিল না।

—তোর বউ হামি ঠিক করি ফেলিছু। ইবারে আর বাগড়া না দিস বাপ।

যোগেনের মনে একটা নতুন চিন্তা তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। ধলাইয়ের সেই হাসি আর ছায়ার মতো সুশীলার সরে যাওয়া—এর পরে কি আগের মতো একেবারে একান্ত করে নিজের বলে ভাবা চলে সুশীলাকে ? কিন্তু ক্রোধ আর বিতৃষ্ণার আক্ষেপে সেটা মনে জাগতে পরক্ষণেই একটা যন্ত্রণাবোধ এসে তাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। না, না, এ ভাবা চলে না। এই পরম দুঃখকর সম্ভাবনাকে কোনোমতেই স্থান করে নিতে দেওয়া যাবে না নিজের চিন্তাতে। হয়তো নিছক একটা যোগাযোগ, একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। তার মন সন্দিগ্ধ বলেই একটা স্বাভাবিক সহজ ঘটনা তার চিন্তাটাকে বারে বারে ঘোলা করে তুলছে।

মা'র উত্তরটা জেনেও দুষ্টুমি করলে যোগেন। লঘুস্বরে বললে, কার বিটির কপাল পোড়াবা চাহোছ মা ?

জ্বরের কাঁপা গলার মধ্যেও মা'র স্বরে রাগের আভাস পাওয়া গেল : কপাল পুড়িবে ক্যানেরে ? হামার এমন সোনার চাঁদ ব্যাটা—কপাল খুলি যিবে, সোনা-কপাল হেবে।

—তুমি সোনার চাঁদ কহিছ, আর মানুষে বান্দর কহে—কথাবার্তার স্বাভাবিকতার মধ্যে এসে মা'র অসুস্থতার কথাটা ভুলে যাচ্ছে যোগেন। গলায় তেমনি তরল কৌতুক সঞ্চারিত করে বললে, কিন্তু কার সোনা-কপাল হছে সিটা তো কহিলে না।

মা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উত্তর এল একটা।

—হাজারুর বিটি।

—হাজারুর বিটি !—যোগেন চমকে উঠল।

—হঁ—হঁ।—যোগেনের মা সন্ধানী একটা দৃষ্টি ছেলের মুখের ওপর ফেলল : ক্যানে, চিনিস নাই উয়াক ? ওই গোরা মেইয়াটা—পদ্ম, পদ্ম। খাসা নাগিবে তোর পাশত্।

যোগেন স্তম্ভিত ভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ।

—কিন্তুক্—

জ্বরের আবার একটা জোর ধমক এসেছে শরীরে। দাঁতে দাঁতে আবার শব্দ উঠেছে ঠক্ ঠক্ করে। যোগেনের হাতের ওপর মায়ের জ্বরতপ্ত হাতখানা কাঁপতে লাগল, শিহরণটা যেন বয়ে যেতে লাগল তার সর্বাঙ্গে।

—হামি বুঝিছু, তোর মনের কথাটা হামি বুঝিছু বাপ। কিন্তু সিটা হবা নহে।

যোগেন কথা বললে না। তাকিয়ে রইল। বেদনা, বিদ্রোহ আর বিস্মিত জিজ্ঞাসায় তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

—হবা নহে বাপ, হবা নহে। ওই পদ্মই ভালো বউ হেবে হামার ঘরে।

—হামি কিছু বুঝিবা না পাইনু, মা।—প্রায় অস্পষ্ট স্বরে কথাটা বললে যোগেন।

—ক্যামন করি বা কথাটা কহিমু তোক ?—বেদনাসিক্ত কম্পিত গলায় যোগেনের মা বললে, হামি কিছু কহিবা পারিমু না। ভুলি যা বাপ, ভুলি যা। পদ্মক্ লিয়াই তুই সুখী হবু, ইটা কহি দিনু হামি।

যোগেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মনের মধ্যে কুটিল সন্দেহের ছায়াভাসটা এবারে যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ একটা অবয়ব গ্রহণ করছে। পায়ের নিচে পৃথিবীতে দোলা লেগেছে হঠাৎ, মাথার মধ্যে সব যেন কেমন ফাঁপা ফাঁপা ঠেকছে। যোগেন উঠে পড়ল, নিজেকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে তার, মনে হচ্ছে তারও বোধ হয় জ্বর আসবে।

* * * *

বাড়ি থেকে দু পা বাড়িয়েছে যোগেন, সুরেন হাঁক দিলে।

—অ্যাখেন ফের কুন্ঠে যাছু ?

তিক্ত স্বরে যোগেন বললে, ক্যানে ?

—কী কামে ফের ? গান গাহিবা যাছ নাকি হে আলকাপওয়াল ?—সুরেনের ক্রুদ্ধ গলার আওয়াজে শ্লেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

যোগেন বললে, খালি চিল্লাছ যে, দেখিছ না ? মা'র জ্বর ধরিছে। ডাক্তারর ঠাঁই যানা নাগে।

সুরেনের স্বর নরম হয়ে এল।

—তা সিটা তো যিবা নাগে ঠিক। তো ম্যালেরিয়া হইছে, আপনি সারি যিবে। ডাক্তারের ঠাঁই গেলেই ফের পাইসা আর পাইসা। বোয়াল মাছের মতন হাঁ করে বসি আছে সব শালা, দিনভর গিলিবা চাহোছে।

—তো মা-টা জ্বর হই মরি যাউক ? পাইসা লিই বউক গহনা করি দিয়ো তুমি—

গস্‌গস্‌ করতে করতে বেরিয়ে এল যোগেন।

ডাক্তারের কাছেই যেতে হবে। কিন্তু ডাক্তার নেই গ্রামে, আছে এক মুচি কবিরাজ—সোনারাম। একটা ঝুলি আছে সোনারামের, আর তার ভেতরে আছে বিস্বাদ কতগুলো ছাতাপড়া কালো কালো বড়ি। জ্বর হোক, আমাশা হোক, এমন কি ওলাউঠা হোক, ওই এক বড়িই সোনারামের সম্বল। লাগে তুক, না লাগে তাক। তবু মাত্র দুগণ্ডা পয়সার বিনিময়েই তাকে পাওয়া যায় বলে তার ওপরে গ্রামের লোকের অখণ্ড বিশ্বাস: কিন্তু যোগেনের কিছুমাত্র আস্থা নেই সোনারাম সম্পর্কে। খানিকটা লেখাপড়া করেছে, ভূয়োদর্শী হয়েছে শহরে বেড়িয়ে, সুতরাং সে সোজাসুজিই বলে : উটা তো কবিরাজ নহে, যমের দূত।—রস দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলে, সোনারামের কামই হইল্, রুগীগুলার আত্মারাম সাবাড করা।

অতএব যেতে হবে বামুনঘাটায়। সেটা ভদ্রলোকের গ্রাম। বড় গঞ্জ আছে, বাজার আছে, আর আছে সরকারী ডাক্তারখানা। সেখানে চার পয়সা দিয়ে টিকেট কিনলে ভালো বিলিতী ওষুধ মেলে। মাইল তিনেক রাস্তা অবশ্য হাঁটতে হবে,—তা হোক। যোগেন সরকারী ডাক্তারখানার উদ্দেশ্যেই দিলে পা চালিয়ে।

মার অসুখ একটা উপলক্ষ্য বটে, কিন্তু আদত কারণটা তাও নয়। আসল কথা, নিজের সমস্ত চিন্তার মধ্যে যেন একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে চলেছে যোগেনের। অমন করে কেন কথাটা বলল মা, কী এমন একটা ঘটেছে যার জন্যে কারণটা মা তাকে খুলে বলতে পারল না ? একটা তীব্র অস্থিরতায় যেন ছুটে বেরিয়ে পড়েছে যোগেন। মনে হয়েছে বাড়ির মধ্যে কোথাও এতটুকু বাতাস নেই, যেন তার দম আটকে আসছে, যেন কে তার গলাটা টিপে টিপে ধরতে চাইছে। সুশীলা, সুশীলা! যার রূপে সে বিভোর হয়ে মজে গেছে, যাকে নিয়ে সে বেঁধেছে তার সেই আকুল-করা গান :

"কইন্যা, ভমর জিনি নয়ন তোমার

উড়ি উড়ি যায় হে,
হামার বুকের ভিতর ফুল ফুটিলে
তাহার মধু খায় হে—"

সেই কন্যা বিশ্বাসঘাতকতা করবে! তার সেই সোনার বরণী কেশবতী, যার মেঘের মতো চুলের মধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে যোগেনের, ইচ্ছে করে নিশ্চিহ্ন, নিঃসত্তা হয়ে মিশে যেতে! অসম্ভব, এ হয় না। একথা ভাবতে গেলে যেন বুকের ভেতর থেকে শিকড়-সুদ্ধ কী একটা উপড়ে আসতে চায়, মনে হয় সব কিছু ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে।

তবে? আসল ঘটনাটা তা হলে কী? মার মত হঠাৎ বদলাল কেন? বেশি টাকা চেয়েছে সুশীলার বাপ? কিন্তু এমন কী বেশি টাকা? তিন রাত যদি ভালো করে আল-কাপের আসর জমাতে পারে যোগেন, তবে কতক্ষণ সময় লাগবে ওই কটা টাকা সংগ্রহ করতে?

কিন্তু মার কথার ভঙ্গিতে তা তো মনে হয় না। কোনো একটা আলাদা ব্যাপার আছে, আছে কোনো একটা নিগূঢ় অর্থ।

পথ চলতে চলতে যোগেন সজোরে একবার নিজের মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিলে। থাকুক এর যা খুশি অর্থ, এর পেছনে নিহিত থাক একটা অজানা আশ্চর্য রহস্য। সে রহস্যকে উদ্ঘাটিত করবার জন্যে কোনো কৌতূহলই নেই যোগেনের। আজ এই সংশয়ের মেঘটা এসে মনের মধ্যে ছায়া ফেলেছে বলে এইটেই কি সত্য? সুশীলার কি আর কোনো পরিচয় পায়নি সে কখনো? কত মুহূর্তে, কত অবসর-নির্জন মুহূর্তে কাছে এসেছে তার, লতিয়ে পড়েছে বুকের মধ্যে, সমস্ত চেতনা যেন আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যোগেনের। এমন একান্ত করে যে সুশীলা তার বুকের মধ্যে নিজেকে ধরে দিয়েছে, সে কি কখনো মিথ্যাচার করতে পারে, সে কি কখনো বঞ্চনা করতে পারে? তা যদি হয়, তা হলে দুনিয়াটাই যে একেবারে মিথ্যে হয়ে যায়।

—যোগেন নাকি হে? কুন্ঠে চলিলা?

ঢোল কাঁধে একটা রাক্ষুসে চেহারার লোক। মস্ত মাথাটায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মাঠের মতো চওড়া বুকে 'ইকড়ি' ঘাসের মতো কাঁচা-পাকা রোমাবলীর সমারোহ। ঠোঁট দুটো পানের রসে টকটকে লাল। রসিক ঢোলওয়ালা।

রসিক বললে, কুন্ঠে চলিলা?

—যামু বামুনঘাটা।

—অঃ।—রসিক পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে করে থেমে দাঁড়ালো, শুইনন্যু আলকাপের দল করিছ তুমি?

যোগেনের বিরক্তি লাগছিল। রসিককে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে, কাকা বলে

ডাকে। সুতরাং এড়িয়ে যাওয়া গেল না। অপ্রসন্ন মুখে বললে, হঁ, কইন্নু তো।

রসিক বললে, বেশ, বেশ। হামাদের মুচির ঘরের দুইটা-একটা ছোয়া ছেইল্যা গুণী হইলে তো সিটা ভালোই হয়। তো ফের শুইনন্নু দামড়ি গাঁয়ের ধলাই মুচিক্ দলে লিছ তুমি?

—হঁ, লিছি—যোগেন জবাব দিলে। কিন্তু ধলাইয়ের নামটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল তার। পরক্ষণেই বললে, তো ছোড়ি দিন্নু উয়াক্।

রসিক বললে, বেশ করিছ, বড় ভালো কাম করিছ। উই কথাটা হামিও তুমহাক্ কহিমু মন করিছিনু। বড় বদমাস উ শালা।

—বদমাস?

—না তো কী?—উত্তেজিত হয়ে রসিক বললে, হামার দলে তার ওই—একটা অশ্লীল বিশেষণ জুড়ে রসিক বলে চলল, বাঁশিটা লিই বাজাবা আসিছিল। তো ফের শালার ত্যাজ্ কত! রোজ আড়াই টাকা করি দিবার নাগিবে, তার মতন বাঁশি দুনিয়াং ক্যাহো কুনোদিন দেখে নাই। হামি শালাক্ খ্যাদাই দিনু।

—ভালোই করিলে—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন জানালো যোগেন।

—অমন ছ্যাচোড় লিয়ে কাম করিবা হয় না, ফ্যাসাদে পড়িবা হয় ঝুটামুটা—বিরক্তিভরে মন্তব্য করে এগিয়ে গেল রসিক। কিন্তু শুধুই কি ছ্যাচোড লোক ধলাই? রসিক জানে না, কিন্তু যোগেন জানে। মর্মে মর্মে সে টের পাচ্ছে কত বড় শয়তান ধলাই। শুধু পয়সার জন্যে নয়, সে এখন তার বুকে ছোবল মারবার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে, এই মাঠের মধ্যে ধলাইকে পেলে যোগেন এখন তার রক্ত-দর্শন করে ছাড়ত।

কিন্তু থাকুক ধলাই, থাকুক তার কূট চক্রান্ত নিয়ে। মা নিষেধ করুক, গাড়ি খেয়ে প্রাণপণে চ্যাচাতে থাকুক সুরেন, কিন্তু যোগেন কোনোমতেই ভুলতে পারবে না সুশীলাকে, কোনোমতেই তার প্রত্যাশা ছাড়তে পারবে না। পৃথিবী একদিকে থাকুক, আর একদিকে থাকবে সুশীলা। বংশী মাস্টারের গান তার চাই না, কবি-যশেও তার দরকার নেই, সুশীলাকে পেলেই জীবনের সব পাওনা তার মিটে যাবে। নতুন গান আসবে, নতুন সুর আসবে, যদি কিছু ভেঙেচুরেই যায়, ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে তার চাইতে অনেক গুণে বেশি। তার সমস্ত মন-প্রাণ ভরে নতুন গানের উৎসব শুরু হয়ে যাবে।

অসুস্থ পা আর অসুস্থ মন নিয়ে যোগেন পৌঁছুল বামুনঘাটায়। বেশ বেলা বেড়েছে তখন, শীতের শীতলতা কেটে গিয়ে পায়ের নিচে গরম হয়ে উঠেছে বালি। ডাক্তারখানা তখন জমজমাট। ডাক্তার প্রিয়তোষ সেন নিশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছেন না। ঘস ঘস্ করে লিখছেন প্রেস্‌ক্রিপশন আর এক-একজন করে রোগীর আত্মশ্রাদ্ধ চলছে।

—কাল কবার ওষুধ খেয়েছিস?

—আজ্ঞে তিনবার।

—তা হলে আরো তিন দাগ তো আছে।

—আইজ্ঞা না।—রোগী বিনীতভাবে হাসল : সব ফুরাই গেইল্ছে।

—সব ফুরাই গেইল্ছে ?—ডাক্তার প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন : বলিস কিরে ব্যাটা ! অতগুলো ওষুধ একসঙ্গে !

—হেঁ—হেঁ—আমি ভাবিনু—

—ভাবলে, একসঙ্গে খেলেই রোগমুক্তি ? আরে হতভাগা, ওতে করে দেহমুক্তি ঘটে যাবে যে ! আচ্ছা ইডিয়ট্ নিয়ে পড়া গেছে সব। দাঁড়া, দাঁড়া, এখন সরে দাঁড়া।—হ্যাঁ, রহিম বিশ্বাস ?

—জী।

—কদিন জ্বর তোর বিবির ?

—জী তা হৈল্ পাঁচ-সাতদিন।

—পাঁচ-সাতদিন !—হাতের কলমটা নামিয়ে ডাক্তার গর্জে উঠলেন : এতদিন তবে করছিলে কী ? হাঁ করে বসে ছিলে ? এখন আর কী করা যাবে, যাও ঠ্যাং ধরে ভাগাড়ে ফেলে দাও গে।

চিকিৎসার নমুনা দেখে যোগেনের যেমন অস্বস্তি, তেমনি বিশ্রী লাগতে লাগল। ঘৃণা আর বিরক্তিতে কালো ডাক্তারের মুখ, অত্যন্ত অনিচ্ছা আর অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে রোগী দেখছেন আর 'টিকিট' লিখছেন। না আছে সহানুভূতি, না আছে যত্ন। অনুগ্রহের দান ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, হাজার গালাগালি খেয়েও কৃতার্থ মুখে মেনে নিচ্ছে মানুষগুলো। হঠাৎ মনে হল এর চাইতে তাদের সোনারাম কবিরাজও ভালো। তাদের সে আপনার মানুষ, তাদের জীবনের সঙ্গে তার যোগ আছে।

বংশী মাস্টারের কথাই ঠিক। এই যে মানুষগুলো এখানে এক ফোঁটা ওষুধের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে—এরাই যোগেনের দেশের লোক, তার জাতিগোত্র। ব্রাহ্মণ, জমিদার আর নায়েবের কাছ থেকে তারা যা পায়, এখানেও ঠিক তাইই পাচ্ছে। কোনো পার্থক্য নেই, কোনো ব্যতিক্রম নেই। সরকারী ডাক্তারখানা, গরীবকে ওষুধ দেবার জন্যেই খোলা হয়েছে। গরীব কতটুকু ওষুধ পায় কে জানে, কিন্তু যা পায় তা অপমান, তা লাঞ্ছনা। ঠিক কথা। ভদ্রলোকেরা আলাদা জাতের। তেলেজলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি ভদ্রলোকের সঙ্গেও তাদের মিল ঘটবে না কোনোদিন।

একপাশে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে যোগেনের ইচ্ছে করতে লাগল উঠে চলে যায়। এর চেয়ে তাদের সোনারাম কবিরাজই ভালো। কিন্তু উঠতে পারল না। তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছে আর মায়ের অসুখটাও কেমন বাঁকা ধরনের। বিরক্ত

বিব্রত মুখে যোগেন বসে রইল।

হঠাৎ ডাক্তারের চোখ গেল সেদিকে।

—ওহে, ওহে, শোনো তো।

ডাকের মধ্যে একটা সাগ্রহ অভ্যর্থনা আছে। যোগেনের বিস্ময় বোধ হল। এতক্ষণ ধরে ডাক্তারের যে কণ্ঠস্বর সে শুনছিল আর দেখছিল যে বিকট মুখভঙ্গি, তার সঙ্গে সুস্পষ্ট একটা পার্থক্য আছে এর। হঠাৎ তাকে এমন সমাদর করবার অর্থটা কী?

—হামাক ডাকোছেন?

—হাঁ, তোমাকেই তো।

যোগেন সভয়ে এগিয়ে গেল।

—সর্ সর্, ওকে আসতে দে—ডাক্তার আশপাশের লোকগুলোকে ধমক দিলেন। ভীত বিস্ময়ে দু পাশে সরে গেল মানুষগুলো, যোগেনকে পথ করে দিলে, তাকালো ঈর্ষাক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে।

—তুমি সনাতনপুরের যোগেন কবিওয়ালা না?

—হঁ। হামাক্ আপনি চিনেন?

—কেন চিনব না, তুমি যে স্বনামধন্য লোক। রায়হাটের মেলায় তোমার গান শুনেছি আমি।—ডাক্তার যেন যোগেনকে বাধিত করবার চেষ্টা করলেন: খাসা গলা তোমার। তারপর, কী মনে করে?

—হামার মার জ্বর ধরিছে কাইল থাকি, তাই—

—কী রকম জ্বর? কম্প দিয়ে?

—হঁ।

—ম্যালেরিয়া—কিচ্ছু ভাবনা নেই। চারটে পয়সা দাও—ডাক্তার খস্ খস্ করে একটা টিকেট লিখে ফেললেন: এইটে নিয়ে একবার কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে যাও, ওষুধ দিয়ে দেবে। শিশি আছে তো?

—হঁ, আছে।

—তবে ওষুধ নিয়ে এসো। আর শোনো, যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। তোমাকে দিয়ে একটা দরকার আছে আমার—বুঝলে?

—বুঝিনু—

টিকেট নিয়ে যোগেন ওষুধের সন্ধানে এসে দাঁড়ালো কম্পাউণ্ডিং রুমের সামনে। কিন্তু খটকা ধরেছে মনে। ব্যাপারটা কী? তাকে দিয়ে কোন্ প্রয়োজন মিটতে পারে ডাক্তারের? এই ভদ্রবাবুর কী দরকারে সে লাগবে? কেমন সন্দেহ হয়। বংশী মাস্টার বিশ্রী রকমের খটকা বাধিয়ে দিয়েছে একটা। ভদ্রলোকদের অত্যাচারটা চেনা, সেটা ধাতস্থ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের মিঠে কথা আরো মারাত্মক—মনে হয় যেন ফাঁদ পাতছে কিছু একটা মতলবে।

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মিলতে বেশি দেরি হল না।

বেলা এগারোটা বাজতে কলম ফেলে ডাক্তার উঠলেন। রোগীর ভিড় তখনো আছে। ডাক্তার বিরক্তিভরে বললেন, সময় হয়ে গেছে, এখন আর নয়। আবার বিকেলে।

—ঢের দূর ঘাঁটা (রাস্তা) ভাঙি আইনু বাবু—মিনতি করলে একজন।

—তুমি ঢের ঘাঁটা ভেঙে এসেছ বললেই চলবে না বাপু, সরকারী আইন তো আছে। যাও, যাও, এখন আর গণ্ডগোল পাকিয়ো না। এসো যোগেন, এসো আমার সঙ্গে।

—কুন্ঠে যামু ডাক্তার বাবু?

—আমার বাড়িতে।

—বাড়িত্?

—হাঁ, আমার মেয়ে জামাই এসেছে। জামাই আবার কলকাতার মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক। সে এদিককার গানটান শুনতে চায়, বই লিখবে। তাকেই তোমার গান শোনাব, বুঝলে?

—কিন্তু—যোগেন বিব্রত স্বরে বললে, বাড়িত্ হামার মায়ের ব্যারাম বাবু, দেরি করিলে—

—কিছু না, ম্যালেরিয়া জ্বর, ওই ওষুধেই ঠিক হয়ে যাবে। এসো—ডাক্তার ডাকলেন।

একান্ত অনিচ্ছা আর মনের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদ নিয়ে ডাক্তারকে অনুসরণ করলে যোগেন। আর যাই হোক, গান গাইবার মতো এখন মানসিক প্রস্তুতি নেই তার। সুশীলা, ধলাই, মা, বংশী মাস্টার—সকলে মিলে যেন তার চিন্তাকে তোলাপাড়া করছে। তাছাড়া ডাক্তার তার গানের যতই প্রশংসা করুক না কেন, মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি যোগেন। চোখের সামনেই সে ডাক্তারের আর একটা চেহারা দেখতে পেয়েছে, অনুভব করেছে ডাক্তারের সঙ্গে তাদের সীমারেখাটা কত স্পষ্ট! যোগেন বলতে যাচ্ছিল, তুমার জামাইক্ গান শুনাইবার জন্য হামি গাহি না—কিন্তু কথাটা আটকে গেল। ভদ্রবাবুদের ওপর যত প্রতিবাদই জেগে উঠুক মনের ভেতর, তাকে ঘোষণা করবার মতো জোর এখনো তাদের আয়ত্ত হয়নি।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ডাক্তারখানার কাছেই। একতলা বাড়ি, সামনে চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছেন ডাক্তারের জামাই। ফর্সা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, চোখে সোনার চশমা। ডাক্তার বললেন, রামেন্দু, এই হল এদেশের একজন কবি। এর নাম যোগেন, বড় ভালো গান গায়।

—তাই নাকি ?—রামেন্দু অনুগ্রহের হাসি হাসল। শহরের হাসি, ভদ্রলোকদের হাসি। কিন্তু সে হাসিতে যোগেন চরিতার্থ বোধ করল না, গা জ্বালা করে উঠল।

রামেন্দু বললে, আমি থীসিস্ দেব, লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করছি। বুঝেছ ?

যোগেন বললে, আইজ্ঞা না।

ডাক্তার একটা চেয়ারে আসন নিয়েছেন ততক্ষণে। জামাইয়ের অনুকরণে তিনিও হাসলেন এইবারে: ওসব ওরা বুঝবে না। বুঝলে যোগেন, তোমার গান নিয়ে ও বই লিখবে, তোমার গান ছাপা হবে বইতে। বুঝলে এইবার ?

—হুঁ—মুখ গোঁজ করে জবাব দিলে যোগেন। অপমান বোধ হচ্ছে, কান জ্বালা করছে। এর ভেতরেও একটা দয়ার ইঙ্গিত, একটা অনুকম্পার ব্যঞ্জন। তার গান নিয়ে বই লিখবে শহরের এই ফিন্‌ফিনে বাবু রামেন্দু। কিন্তু রামেন্দু কি বুঝবে এ গান শুধু গানই নয় ? এ তাদের প্রাণের জ্বালা, এ তাদের বুকের যন্ত্রণা ?

—কই, শোনাও দেখি এক-আধটা গান—রামেন্দু সাগ্রহে বললে।

—কী গান গাহিমু ?—বিস্বাদ মুখে প্রশ্ন করলে যোগেন।

—আলকাপের গান, রসের গান।—ডাক্তার জবাব দিলেন।

—রসের গান আর গাহি না বাবু, রস মরি গেইছে।—শুষ্ক প্রত্যুত্তর দিলে যোগেন।

—তবে কী গান গাও ?

—যে গান গাই সি আপনাদের ভালো নাগিবে না বাবু। আইজ ঢের বেলা চড়ি গেইছে, হামি যাছু—

রামেন্দু ব্যস্ত হয়ে বললে, আরে না, না, ভালো লাগবে না কেন ! সবই ভালো লাগবে। গান ধরো তুমি।

—যন্তরপাতি কিছু নাই—

—দরকার নেই, শুতেই হবে।

যোগেন একটা আগ্নেয় দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে চারদিকে ! আশ্চর্য ! তিন মাইল পথ ভেঙে সে এসেছে। এত বেলা হয়েছে, এখনো এক ফোঁটা জলও তার পেটে পড়েনি। বাড়িতে তার মায়ের অসুখ, এখন কেমন আছে কে জানে। অথচ এতটুকু বিচার নেই এদের, এক-বিন্দু বিবেচনা নেই। কৌতুক-প্রফুল্ল মুখে, ভরা পেটে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছে চেয়ারে, তার গান শুনবে, আমোদ করবে রসের গান নিয়ে।

যোগেনের গলা চিরে একটা তীব্র স্বর বেরুল। বোধ হল যেন আর্তনাদ !

ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা—

মোণ্ডা মিঠাই খাও,

হামরা পুড়ি প্যাটের জ্বালায়

তুমরা মজা পাও!

রামেন্দু চেয়ারের ওপর চমকে উঠল, নড়েচড়ে বসলেন ডাক্তার। দুজনের মুখে যেন শ্রাবণের মেঘ এল থমথমে হয়ে। আর যোগেন গেয়ে চলল তেমনি একটা অসহ্য আর্ত-নাদের সুরে :

কাহারো হইলে পৌষ মাস,
অন্যের হয় সর্বনাশ,
সুখের পাখি নি জানে হায়
পোড়া ছ্যাশের ভাও,
ক্ষীর সন্দেশ খাও বাবুরা—

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে উঠে চলে গেল রামেন্দু। ডাক্তার বললেন, থাক। আর গাইতে হবে না যোগেন।

হিংস্র একটা হাসির সঙ্গে যোগেন বললে, গান ভালো নাগিলে বাবু? মৌজ নাগিলে তো?

ডাক্তার বললেন, হুঁ।

—জামাই বাবুর বইয়ে ত হামার গান ছাপা হেবে বাবু!

—জানি না। এখন তুমি এসো যোগেন।

যোগেন ডাক্তারের দিকে তাকালো, ডাক্তার তার দিকে তাকালেন। মাত্র মুহূর্তের জন্যে। তারপর আশ্চর্য শান্ত স্বরে যোগেন বললে, একটু জল খিলাইবা বাবু? বড় তিয়াস নাগিছে।

—আচ্ছা, আনাচ্ছি। ওরে, কেউ জল নিয়ে আয় তো এক ঘটি—

জল এল। নিয়ে এল আঠারো-উনিশ বছরের একটি সুদর্শনা তরুণী। ডাক্তারের মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে চলে গেল যোগেনের চোখ, মেয়েটির মুখের ওপর গিয়ে আটকে রইল রূপমুগ্ধ দৃষ্টি। স্নিগ্ধ স্বরে মেয়েটি বললে, জল নাও।

জল নাও। কথাটা যেন গানের মতো সুন্দর লাগল কানে। হঠাৎ যেন চটকা ভেঙে গেল যোগেনের। মনে হল তার এতক্ষণের উত্তাপটা ওই কণ্ঠস্বরে যেন শান্ত হয়ে গেল, মিটে গেল এতক্ষণে বুকের মধ্যে ক্রুদ্ধ তৃষ্ণার দুঃসহ জ্বালাটা। যোগেন তাকিয়েই রইল। এখানে এই মেয়েটি যেন অপ্রত্যাশিত—যেন অস্বাভাবিক।

ডাক্তার হঠাৎ গর্জে উঠলেন। ভেঙে পড়লেন বাজের আওয়াজের মতো।

—হাতে জল ঢেলে দে ওর। ও ব্যাটা মুচি, ঘটি ছোঁবে কেমন করে?

—মুচি?—মেয়েটি এগিয়ে আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল তিন পা।

আর পিছিয়ে গেল যোগেনও। তীব্র গলায় বললে, ভদ্দর নোকের ছোঁয়া জল হামরা খাই না বাবু, জাতি যায়,—তার-পরেই সোজা উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে।

পেছন থেকে ডাক্তারের একটা শাসানি ভেসে এল সাপের তর্জনের মতো : বড় বাড় বেড়েছে এই ছোট লোকগুলোর, হারামজাদারা মরবে এইবারে—

চোদ্দ

ট্যাং ট্যাং করে কাঁসর বাজছে, ডুম ডুম করে বাজছে ঢোল। সুবলের গড়া সরস্বতী শোভা পাচ্ছেন সগৌরবে। মূর্তির যা চেহারা হয়েছে, তাতে সরস্বতী বলে ঠাওর করা শক্ত। একটা জিনিস সুবল বর্মণ খুব নিষ্ঠাভরেই করেছে—সেটা হচ্ছে দেবীকে মেমসাহেব বানিয়ে তোলা। তার সঙ্গে নাকে একটি নথ জুড়ে দিয়ে মেমসাহেবকে খানিকটা ঘরোয়া করে তোলার চেষ্টাও হয়েছে। হাতের বীণাটি দেখে মনে হচ্ছে দেবী একটি গদা নিয়ে বসে আছেন, প্রতিপক্ষ কেউ সামনে এলেই গদাযুদ্ধ আরম্ভ করে দেবেন।

তা হোক, তাতে ভক্তির কমতি হয় না লোকের। ধূপের ধোঁয়াতে চারদিক প্রায় অন্ধকার করে তুলেছে। প্রাইমারী ইস্কুলের পোড়োরা সাজিয়ে দিয়েছে তাদের শিশুপাঠ আর নব ধারাপাত, গলায় দড়ি বাঁধা দোয়াতে দোয়াতে খাগের কলম আর দুধ। রাশি রাশি পলাশ ফুলে প্রতিমার প্রায় আধখানা ঢাকা পড়ে গেছে।

দুদিন থেকে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে পূজো নির্বিঘ্নে শেষ করেছে বংশী মাস্টার। পূজো করেছে সে নিজেই—মন্ত্রতন্ত্র কী যে পড়েছে ভগবানই তা জানেন। কিন্তু পূজো হয়েছে—প্রসাদ বণ্টনও শেষ হয়ে গেছে। তার সব্জি বাগানে অবশিষ্ট কপি মূলো যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তরকারী রান্না হয়েছে, রান্না হয়েছে খিচুড়ি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে পূজো দেখেছে মহিন্দর আর তার দলবল। রসিকতাও করেছে নিজেদের মধ্যে।

—ইটা ক্যামন দেবতা হে, মাছ মাংস খায় না!

—বৈষ্টম দেবতা।

—ই সব দেবতার পরসাদ খাই হামাদের প্যাট নি ভরে।

—হামাদের ভালো দেবতা হৈল্ কালী আর বিষহরী। পাঁঠা মারো, তাড়ি লি আইস, তো পূজা। ফুরতি না হেবে তো ক্যামন পূজা সিটা!

—ইসব চ্যাংড়া প্যাংড়ার পূজা—ইস্কুলের ছোয়া পোয়ার। হামাদের ভক্তি হয় না।

—হেবে, হেবে—তুমহাদেরও ভক্তি হেবে—কথাবার্তার গতিক লক্ষ্য করে আশ্বাস

দিয়েছে মহিন্দর : বড় একটা খাসি কাটিছু. তাড়িও আসোছে।

—তো সিটা আগে কহিবা হয়। অ্যাত্তক্ষণ প্যাটে চাপি রাখিছিলা ক্যানে ?

হাসির রোল উঠল একটা, স্বস্তির নিশ্বাসও পড়ল। সত্যি কথা, এসব নিরামিষাশী উঁচুদরের দেবতা সম্পর্কে কোনো মোহ নেই ওদের। ওদের কাছে যাঁরা প্রত্যক্ষ—তাঁদের প্রকাশ অতি বাস্তব এবং অতি উদগ্র। শিক্ষার মূল্য ওদের কাছে যেমন নগণ্য, শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শুভ্র জ্ঞানপদ্মে কিরণোজ্জ্বল আবির্ভাবের অলৌকিক আনন্দটাও তেমনিই অবাস্তব। ওদের দেবতারা আসেন কলেরার সর্বগ্রাসিনী কোপনা মূর্তিতে, দেখা দেন বসন্তের নিশ্চিত নিষ্ঠুর মহামারীতে। ওদের দেবতা পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে থাকেন উদ্যত ফণা তুলে ছোবল মারবার জন্যে। আর ওদের দেবতা আছেন ক্ষেত্রপাল, যিনি মঙ্গল হস্ত বুলিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ফলিয়ে তোলেন সোনার ফসল,—যাঁর কুপিত দৃষ্টি পড়লে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের ওপর আকালের মৃত্যুছায়া বিকীর্ণ হয়ে পড়ে।

এইসব উগ্র দেবতাদের উগ্রভাবেই প্রসন্ন করবার ব্যবস্থা। মদ, মাংস, মাতামাতি। বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণী দেবীর আতপ চাল আর নিরামিষ ভোজন ভট্টাচার্য-পাড়ার মতোই ওদের দৃষ্টি আর স্পর্শসীমার বাইরে, বৈদেশিক এবং অপরিচিত।

সুতরাং খাসি আর তাড়ির নামে রসনাগুলো সরস হয়ে উঠেছে, প্রসন্ন হয়ে গেছে মন। সেই নৃত্য-পরায়ণ বাসু আনন্দে নেচে নিয়েছে একবার : জয় মা সরস্সতী !

চিরাচরিতভাবে একটা ধমক দিয়েছে মহিন্দর : থামো হে, বুঢ়া বয়সে অমন নাচিবা ন হয়। কোমরত্ বাত ধরি যিবে।

বাসু চটে গিয়ে বলেছে, তুমহার মতো অমন বুঢ়া হই নাই, মনে এখনও ফুরতি আছে হে, বুঝিলা ? পূজা পরবে নাচিমু না তো ফের নাচিমু কখন ?

—তো নাচো। কিন্তু মাজা ভাঙিলে মজাটা টের পিবা।

ভারী প্রসন্ন মহিন্দরের মন। মানী লোক মহিন্দর—তারই উদ্যোগে এই পূজো। কিন্তু শুধু মানী লোক বলেই নয়—আর একটা নিবিড় অন্তর্নিহিত গর্বের অনুভূতিও তাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের সরস্বতী পূজোর কথা শুনে চট্টরাজ কুকুরের মতো কতকগুলো উঁচু উঁচু দাঁত বের করে হেসেছে বিশ্রীভাবে, বলেছে, অ্যাঁ—চামারে করবে সরস্বতী পূজো ! একেবারে বিদ্যের ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে মনু-পরাশর-বেদব্যাস হয়ে উঠবে। ওরে শালারা, যার কর্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। ও সব বুদ্ধি ছাড়্। ছোট-লোক, জুতোর তলায় থাকিস, জুতো সেলাই করে খাস। এসব না করে এক পাটি জুতোকে পূজো কর্, ওতেই তোদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বলে সে কি হাসি চট্টরাজের ! জীবনে এই প্রথম, নিষ্ঠুর অপমানের বিষাক্ত খোঁচার মতো সে হাসিটা এসে বেজেছে মহিন্দরের বুকে। এই প্রথম প্রশ্ন জেগেছে—এ অপমান কি

একান্তই প্রাপ্য, এর কোনো প্রতিকার নেই ?

ওখানেই থামেনি চট্টরাজ।- তেমনি হাসতে হাসতে বলেছে, আবার জুটেছে একটা নাপিত মাস্টার, সে ব্যাটা করবে পূজো ! ব্যাটা নর্মাল পর্যন্ত পড়েনি, সে উচ্চারণ করবে সংস্কৃতের মন্তর ! দম ফেটে যাবে যে। কালে কালে কতই দেখব। ওরে শালারা, ওসব না করে অক্ষয় পুণ্য অর্জন কর্, বেশ করে বামুনের পা টেপ্ দেখি—বলে কঁ্যাকলাশের মত সরু সরু ঠ্যাং দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের দিকে। কেন কে জানে জল এসেছে মহিন্দরের চোখে, মনে হয়েছে জুতো মেরে একটা টাকা দিলেই অপমানের উপশম হয় না। তারা পা টিপে দিচ্ছে, টেপাটা শেষ হয়ে গেলে নদীতে স্নান করে চামারের স্পর্শ-দোষ থেকে মুক্ত হবে চট্টরাজ। আর রাত্তিরে তার ঘরে যে ডোমের মেয়েটা আসে, তার খবরই বা কে না জানে ? এই হল ব্রাহ্মণত্ব।

তাই রোখের মাথায় পূজো করেছে মহিন্দর, মানী লোক শ্রীমহিন্দর রুইদাস এই প্রথম জানাতে চেয়েছে অপমানিত মনুষ্যত্বের একটা মৃদু প্রতিবাদ।

জ্বলজ্বলে চোখে মহিন্দর স্থির-দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণী দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

রাসু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, রাত্তিরে গান হেবে কহিলা না ?

—সি তো হেবে।

—কী গান হেবে ?—সমস্বরে প্রশ্ন হল। মহিন্দর বললে, আলকাপ।

—কে গাহিবে ?

—সিটা কহিবা পারি না।

বংশী মাস্টার যাচ্ছিল সুমুখ দিয়ে, ওরা গিয়ে ধরল তাকে : মাস্টার হে, ও মাস্টার ?

—কী বলছ ?

—গান কে গাহিবে ? কার দল ? কখন আসিবে ?

—রাত্রে দেখতে পাবে—রহস্যময়ভাবে হেসে বংশী মাস্টার চলে গেল।

বেলা পড়ে এসেছে, বিকেলের ছায়া নামছে চারদিকে। অত্যন্ত ক্লান্তভাবে নিজের ঘরের বাঁশের মাচাটায় এসে বসল বংশী। নাঃ—এ নয়। কী হবে এসব করে ? যেখানে সমস্ত দেশ ব্যাধিতে আর অসম্মানে জর্জরিত, সেখানে কী এর দাম ? আরো বড় কিছু করতে হবে। কিন্তু সে ভাষা জানা নেই বংশী মাস্টারের, সে ভাষা তাকে শেখায়নি অতুল মজুমদার। একমাত্র ভরসা যোগেন। তার একটুকরো সব্জি ক্ষেতের মতো তার ভাবনার প্রথম ফসল যার প্রাণের মধ্যে সে ফলিয়ে তুলতে পেরেছে। অতুল মজুমদাররা যা পারল না, তা পারবে যোগেনরাই। তারা কবি, তারা শিল্পী, তারা চারণ, তারা বৈতালিক।

কিন্তু তার নিজের ? নিজের দিক থেকে কতটুকু সে করতে পারল ? এই কি শাস্তির কাছে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ? এইখানেই কি দায়িত্ব শেষ, কর্তব্যের পরিসমাপ্তি ?

বাইরে আনন্দিত কোলাহল, ঢোল আর কাঁসর বাজছে। কিন্তু এখনো কেন এল না যোগেনের দল? সন্ধ্যার পরেই গান আরম্ভ হওয়ার কথা—একটা খবরও তো পাওয়া গেল না।

বংশী চিন্তিত অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বেলা ডুবে আসছে, টকটকে লাল আকাশ যেন রক্ত দিয়ে মাখানো।

…বাইরে মহিন্দরের দল বসেছে তাড়ি আর মাংস নিয়ে। এমন সময় খবর দিলে একটা লোক এসে। চোখে তার আতঙ্ক আর কৌতূহলের ছায়া।

—কে, মহিন্দর?

—ক্যানে ডাকোছ?

—কাছারীতে নায়েব আর দারোগা পুলিস লিই আসোছে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। এই আসিলে। তুমহাক ডাকি পাঠাছে।

—কী কহিছ তুমি? মহিন্দরের জিভ শুকিয়ে উঠেছে—চোখ উঠেছে কপালে: ক্যানে?

—কে জানে।

মহিন্দরের মাংস গলায় গিয়ে আটকালো, নাক দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে বেরিয়ে আসতে চাইল তাড়ির ঝাঁঝ। উঠে পড়ে বললে, চলো।

কানাঘুষোয় কথাটা বংশী মাস্টারেরও কানে গেল।

* * * *

যোগেন আসত না। শিল্পী চেয়েছিল নিজেকে নিয়েই পরিপূর্ণ হতে—নিজের মতো করে ঘর বাঁধতে। জীবনের বড় বড় সমস্যার চাইতে অনেক সত্য বলে মনে হয়েছিল তার মনের দাবি। ভেবেছিল পালিয়ে যাবে সুশীলাকে নিয়ে, দূর গ্রামে কোথাও ঘর বাঁধবে। আর কিছু তার প্রয়োজন নেই—রূপকথার রাজকন্যার ভোমরা-ওড়া চোখের রহস্যের মাঝখানে সে হারিয়ে যাবে একটা নিঃশেষ সম্পূর্ণতায়, ডুবে যাবে তার ঘন নিবিড় কালো চুলের অতলে, তার কোমল বুকের গভীরে আশ্রয় নিয়ে নতুন গান রচনা করে যাবে। কিন্তু তা হয়নি—জীবনে নিষ্ঠুরতম আঘাত তাকে দিয়েছে সুশীলা।

ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যোগেন, সুশীলা পালিয়ে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গে নয়—ধলাইয়ের সঙ্গে। গানের সুর তার কিশোরী মনকে ভুলিয়েছিল, কিন্তু যা ভুলিয়েছে তা বাঁশির ডাক।

সুরেন চিৎকার করেছে, দিয়েছে অশ্লীলতম ভাষায় গালাগালি। জ্বরের ধমকে কাঁপতে কাঁপতে যোগেনের মা কপালে হাত দিয়ে কেঁদেছে, পরের মেইয়াক ঘরত্ রাখি ক্যামন বদ্নামের ভাগী হৈনু হে হামি? অ্যাখন তোর শ্বশুরক্ মুখ দ্যাখামু ক্যামন করি?

সুরেন বলেছে, ধলাই হারামজাদাক্ পাইলে হামি উয়াক্ খুন করি ফেলিমু!

হারাণ—বাড়ির সব চাইতে অপদার্থ ছেলেটা—ফিরেছে কাল রাত্রে। সে হো-হো করে হেসে উঠেছে নির্বিকার মুখে: পালাছে তো কী হছে! জোয়ান মেইয়া জোয়ান পুরুষের সাথ পালাই যিবে ইয়াত্ এমন চিন্তাছ ক্যানে?

সুরেন চেঁচিয়ে বলেছে, তু থাম না শালা।

শুধু যোগেন কোনো কথা বলেনি। কী বলবে বুঝতে পারেনি সে। শুধু মনে হয়েছে, বুকের ভেতরে তার আর কিছুই নেই, সব ফাঁকা। তার নিশ্বাস আটকে এসেছে, দম আটকে এসেছে। তারপর—

তারপর নিশ্চিত দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে যোগেন. বংশী মাস্টারের জ্বলজ্বলে দুটো চোখ একটা জ্বলন্ত সূর্যের মতো তার মনের ভেতরে এসে পড়েছে। ভালোই হল—এ ভালোই হল। নিজের জীবনের কথা ভাববার আর কিছুই নেই। তার রাজকন্যার স্বপ্ন ভেঙে গেছে—এবার সম্মুখে পৃথিবী। বংশী মাস্টারের কথাই সত্যি। সে কবি, সে শিল্পী, সে চারণ। আজ সে তার প্রতিবাদ জানাবে সকলের বিরুদ্ধে, সমস্ত অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সে আঘাত করবে জমিদার, মহাজন, দারোগাকে; সে ক্ষমা করবে না মহিন্দর রুইদাসকে—যে অকারণে জাত-জ্ঞাতিদের মাঝখানে তাকে অপমান করেছে, ক্ষমা করবে না ধলাইয়ের মতো শয়তানকে—যে তার বুক থেকে সমস্ত সুখ, সমস্ত ভবিষ্যতের স্বপ্নকে হরণ করে নিয়ে গেল।

এখনি দলটাকে খবর দেওয়া দরকার। সন্ধ্যার মধ্যে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। মাস্টারকে কথা দেওয়া হয়েছে, খেলাপ করা চলবে না। জীবন যদি নাইই রইল যোগেনের, পৃথিবীর দাবি তো তার হারাবে না কোনোদিন। সে কবি, সে গুণী, সে চারণ।

* * * *

দারোগার দলটার সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা পরে ফিরল মহিন্দর। নাকে খত দিয়ে উড়ে গেছে নাকের ছাল, পিঠে জুতোর দাগ লাল টকটকে হয়ে আছে। সাময়িক উৎসাহে যতখানি ফেঁপে উঠেছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই ফেঁসে গেছে অবলীলাক্রমে। সত্যি কথাই বলেছিল চট্টরাজ—মুচির উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জুতোর তলা, বাড়াবাড়ি করলে যা হয় সেটা সুখের অবস্থা নয়। চর্মে এবং মর্মে কথাটা এখন ভালোভাবেই অনুভব করেছে মহিন্দর। অতুল মজুমদারকে তিনজন ভোজপুরিয়া নিয়ে ধরতে ভরসা হয়নি দারোগা সাহেবের। সাংঘাতিক লোক এই বিপ্লবীরা। দু হাতে দুটো রিভলভার তৈরি থাকে তাদের। তিনটি বিবির অধিকারী এবং কদম আলীর সুন্দরী বোনটির সম্ভাব্য অধিপতি দারোগা সাহেব এত সহজেই তিনটি মেয়েকে অনাথা করতে দ্বিধা বোধ করেছেন।

তাই মহকুমা শহর থেকে সশস্ত্র পুলিস আসা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এবং সেইখানেই হয়েছে ভুল। পূজামণ্ডপের কাছে আসতেই সেটা অনুধাবন করা গেল।

বংশী মাস্টার নেই। নেই তার সেই ছোট স্যুটকেসটা—যার ওপরে অনেকগুলো গোলাপ ফুলের ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত ছিল। পাখি পালিয়েছে। অতুল মজুমদার যাত্রা করেছে আবার কোনো নতুন পরিচয়ের পথে। চারদিকে লোক ছুটল। আর সেই ফাঁকে বাকি সব এসে দাঁড়াল আলকাপের আসরটা যেখানে পুরোদমে জমাট হয়ে উঠেছে, সেই-খানে। স্তম্ভিত বিবর্ণ মুখে মানুষগুলো ফিরে তাকাল—যোগেনের দিকে নয়, পুলিস আর চট্টরাজের দিকে।

মহিন্দর চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল: সরলার ব্যাটা! সরলার ব্যাটা কোন্ বুকের পাটায় এইঠে গান গাহিবা আসিলে! কে ডাকিলে উয়াক?

কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই দারোগা সাহেব গর্জন করে উঠলেন। গর্জে উঠলেন এতদিনের মুখোসটা খুলে ফেলে বীভৎস হিংস্র ভঙ্গিতে। এ কী গান ধরেছে যোগেন—এ কী সর্বনেশে গান! এতক্ষণ যে রসের পালা চলছিল তার সঙ্গে এর তো কোনো সাদৃশ্য নেই! শ্রোতাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। আর পুলিসের দলটার দিকে একবার বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে যোগেন সুর ধরল:

> মহাজন রক্ত চোষা
> জমিদার ফোঁস মনসা
> দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
> মোদের হৈল কাল।

চট্টরাজ বললেন, শুনুন, দারোগা সাহেব, শুনুন।

নিরাশা-ক্ষিপ্ত দারোগা চিৎকার করে উঠলেন, থাম্ হারামজাদা, ভারী যে বুকের পাটা বেড়েছে শালাদের?

যোগেনের বাজনদারেরা বাদ্যযন্ত্র ফেলে পালিয়েছে আসর থেকে। গড়াগড়ি যাচ্ছে হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই যোগেনের। সে চারণ, সে কবি, সে গুণী। তার তো থামলে চলবে না। সুশীলা তার ওপর যে অন্যায় করেছে সমস্ত পৃথিবীর ওপরেই সে তার প্রতিশোধ নেবে। একা আত্ম-বিস্মৃতের মতো গান গেয়ে চলেছে যোগেন:

> বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
> পরাণ হৈল ঝালাপালা,
> ওই তিনটা শালাক মারি খেদাও
> ঘুচুক্ এ জঞ্জাল—

দারোগা বললেন, ধর, ধর শালাকে। এ ব্যাটাও নির্ঘাৎ অতুল মজুমদারের লোক।

হাতে হাতকড়া পড়ল যোগেনের। আসর তখন একেবারে খালি, উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে সব। কিন্তু যোগেনের গান বন্ধ হয়নি। তেমনি তারস্বরে গেয়ে চলেছে :

হায় হায়রে, দ্যাশের এ কী হাল !

যোগেনের মুখের ওপর প্রকাণ্ড একটা ঘুষি পড়ল, আর্তনাদ করে বসে পড়ল যোগেন। কিন্তু ও গান তো থামতে দেওয়া চলে না। মানী মানুষ মহিন্দর রুইদাসকে ছাড়িয়ে আজ যোগেন বড় হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে সরলার ব্যাটা! নাকে খতের জ্বালাটা তখনো জ্বলছে, পিঠে টনটন করছে জুতোর দাগ। মহিন্দরের চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে উঠল, মনে পড়ল এক কালে তার গানও ছিল বিখ্যাত, যোগেনের চাইতে ঢের মিঠা গলা ছিল, তার গানের সুরে সরলার মতো মেয়েও ধরা দিয়েছিল তার বুকের ভেতরে !

না, হারলে চলবে না। হার মানলে চলবে না যৌবনের কাছে। ভূষণের বাড়িতে যে অপমানের লজ্জা তাকে বহন করে আসতে হয়েছিল, আজ সে তার জবাব দেবে। সরলার ব্যাটার কাছে ছোট হওয়া চলবে না তাকে, থামতে দেওয়া যাবে না এই গান।

যোগেনের মুখের ওপর হিংস্র ক্ষিপ্ত দারোগার কিল চড় পড়ছে, সর্বাঙ্গে পড়ছে চট্টরাজের লাথির পর লাথি। যোগেন তখন আর গান গাইতে পারছে না, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে যন্ত্রণার কাতর গোঙানির মতো অদ্ভুত আওয়াজ বেরুচ্ছে একটা। নাক আর গালের পাশ দিয়ে তার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। যোগেন তবু থামতে চায় না—পাগল হয়ে গেল নাকি ?

এক মুহূর্তে নির্নিমেষ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল মহিন্দর। আর সংশয় নেই, সমস্ত মন তার প্রস্তুত হয়ে গেছে। মানী লোক শ্রীমহিন্দর রুইদাস—সকলের আগে তার সব চাইতে বড় সম্মান প্রাপ্য। যোগেনের মতো সেদিনকার ছেলেকে, সেই সরলার ব্যাটাকে এ গৌরবের অধিকার দেওয়া যাবে না। কোনো মতেই না !

হঠাৎ বাঘের মতো শূন্য আসরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মহিন্দর। যোগেনের গানটাকে তুলে নিলে নিজের তীক্ষ্ণ দরাজ গলায় :

হায় হায়, দ্যাশের একি হাল,
এই তিনটা শালাক মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল !

একটা লাঠির ঘা যেন আকাশ ভেঙে পড়ল মহিন্দরের মাথায়। আর চড়াৎ করে ফেটে গেল খুলিটা, খানিকটা রক্ত ছুটে গিয়ে দেবী প্রতিমার শুভ্রতার ওপরে লালের ছোপ ধরিয়ে দিলে।

* * * *

আর একজন লোক দূরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখছিল সমস্ত কাণ্ডটা। ভয় পেয়ে

পালায়নি, নড়েনি এক'পাও। সে হারাণ। তার গলায় গান নেই, সে শুধু ঢোল বাজাতে পারে।

সে ঢোলের ছাউনি সে নিজের হাতে ফাঁসিয়েছে। এবার নতুন করে ঢোলে ছাউনি দেবে সে। যে গান গাইতে পারেনি, ঢোলের বুলিতে তাকে সে মুখরিত করে তুলবে। উপাস্যদের ঘর ভেঙে দেবার জন্যে নয়, নতুন করে আবার তাদের ঘর গড়ে তোলবার জন্যে॥

বীভৎস

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় কথাকার

শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর

করকমলে

ভূমিকা

এই বইয়ের সব কটি গল্পই নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে আহরিত।

'বীতংস' আমার প্রথম গল্পের বই। রচনাগুলির নির্বাচনে বন্ধুবর অধ্যাপক বীরেন লাহিড়ী এবং বান্ধবী আশা সান্যালের সহায়তা পেয়েছি—তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। আর যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও যত্নে 'বীতংস' আত্মপ্রকাশ করতে পারল, বইটি তাঁকেই নিবেদন করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য সানন্দে গ্রহণ করছি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বীতংস

সংসার-আশ্রমে থাকবার আর কোনো অর্থ হয় না।

সুন্দরলালের মোহ কেটে গিয়েছে অন্তত। আজ যে তোমার বন্ধু, সামান্য স্বার্থের জন্যে কাল সে তোমার গলা টিপে ধরতে পারে; বড আদরের যে সহোদর ভাইটিকে তুমি এক-দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারো না, এক ছটাক জমির জন্যে কাল হয়তো সে তোমার নামে এক নম্বর ফৌজদারী রুজু ক'রে দেবে; যে রূপবতী স্ত্রীর পায়ে যথাসর্বস্ব পণ ক'রে তুমি কাপড়ে গহনায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দিচ্ছ, একদিন ভোরবেলা হয়তো দেখবে গাঁয়ের ছট্টু তেওয়ারীর সঙ্গে সে রাতারাতি হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। সুতরাং মোহ-মুদ্গরের ভাষায় একদিন 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' ব'লে বেরিয়ে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এবং সুন্দরলাল বুদ্ধিমান লোক। তাই তিরিশ বছর না পেরোতেই সংসার ছেড়ে শুরু হয়েছে তার অগস্ত্য যাত্রা। কোনো বন্ধুই আজ আর তাকে পিছু টানে না। মহিষ চুরির ব্যাপার নিয়ে গাঁয়ের জমিদারের সঙ্গে এখন আর মামলা করতে হয় না। ছট্টু তেওয়ারীর সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে দিনরাত চোখ কান খাড়া ক'রে বসে থাকবার দরকার নেই। পাথরের মতো নির্মম রাঙা মাটিতে কঠিন পরিশ্রমে লাঙ্গল ঠেলে যদি ভালো গমের ফলন না করা যায়, তা হলেও এখন আর সম্বৎসরের ভাবনা ভাবতে হয় না।

এ জীবনের সঙ্গে তার কি তুলনা হয়? সামনে একখানা ছবির মতো নীল পাহাড়, তার সর্বাঙ্গে সাঁওতাল পরগণার অপূর্ব বনশ্রী। দুম্‌কা যাওয়ার রাস্তাটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে, সেখান থেকে একটুকুও পোড়া পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ এসে এখানকার আকাশ-বাতাসকে আবিল করে দেয় না। হর্নের বিকট শব্দে ভয়ত্রস্ত গোরুর পাল এখানে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় না, লাল রঙের বড বাসখানা থেকে এক টুকরো পোড়া সিগারেট বা রেশমী শাড়ির একটা চলতি ঝলক মুহূর্তের মধ্যে যে একটা চাঞ্চল্যকর জগতের সংবাদ দিয়ে যায়, তার প্রভাব থেকেও এ জায়গাটা একেবারেই মুক্ত।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে ডুম্‌ডুম ক'রে টিকারা বাজে। হাওয়ায় হাওয়ায় স্বপ্নের মতো শালের ফুল উড়ে যায়। যখন মহুয়া বন আকুল হয়ে ওঠে, ছোট ছোট গোলাপজামের মতো মহুয়ার সাদা ফুলগুলি তিক্তমধুর রসে টস্‌টস্‌ করতে থাকে, আর তার গন্ধে হরিয়ালের দল এসে ডালে পাতায় নাচানাচি করে তখন সুন্দরলালেরও যেন নেশা ধরে যায়। সত্যিকারের আনন্দ তো এইখানেই। মোতিহারীর আদালতে যারা ফৌজদারী মামলার তদ্বির করে, কিংবা সীতামারীর চিনির কলে আখের দালালী করেই যারা দিন কাটিয়ে যাচ্ছে, তারা এর মর্ম কী বুঝবে?

তারা না-ই বুঝল। কিন্তু সুন্দরলাল বুঝেছে। এখানকার সাঁওতালদের মনের ওপর রীতিমতো আসন গেড়ে বসেছে সে। তারা তাকে শ্রদ্ধা করে, হয়তো বিশ্বাসও করে আজকাল। সুন্দরলাল গেরুয়া নেয়নি বটে, তবু সে সন্ন্যাসী। দণ্ডী কিংবা ব্রহ্মচারী, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে সাঁওতালেরা কখনো ব্যগ্র হয়ে ওঠে না। সুন্দরলাল হাত দেখতে জানে, যা বলে তা নাকি হুবহু মিলে যায় সব। শিকড়-বাকড় সম্বন্ধেও তার প্রচুর জ্ঞান, বহু কঠিন রোগে তার ওষুধ নাকি অব্যর্থ ক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছে।

সে শৈব, না রামায়েৎ, না গাণপৎ এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু দেখা যায় তার কোনোটার ওপরেই বিদ্বেষ নেই। ব্যোম ভোলার নামে সে গাঁজার কলকিতে দম চড়িয়ে দেয়, সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। এখনো যারা "বোঙার" পূজোয় মুর্গী বলি দেয়, তাদের পূজোর প্রসাদ নিতে তাকে কখনো আপত্তি করতে দেখা যায় না। সময় তো মোটে দু'মাস, কিন্তু এর মধ্যেই সাধু সুন্দরলাল মহাপুরুষ সুন্দরলালে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম করছে।

আকাশে সন্ধ্যার রঙ। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের অরণ্যমণ্ডিত চূড়োয় চূড়োয় নিবিড় ছায়া সঞ্চারিত হতে লাগল। শাল বন ঘেরা দূরের উপত্যকাটা থেকে যে ছোট পথটা ঘুরে ঘুরে ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাকে দেখে মনে হয় যেন মৃত একটা বিশাল অক্টোপাশের প্রসারিত নিশ্চল বাহু। যেন মৃত্যুর আগে একবার ওই পাহাড়টাকে মুখের ভেতরে টেনে আনবার শেষ চেষ্টা করেছিল।......

পাহাড়ের গায়ে গায়ে ওই পথটা বেয়ে সুন্দরলালের ভুটানী খচ্চরটা নেমে এলো। এটা ওর সন্ন্যাসের সঙ্গী,—নাগা সন্ন্যাসীর লোটা চিমটার মতোই অপরিহার্য। সন্ন্যাসী হলেও সুন্দরলাল একেবারে বাবা ভোলানাথের মতো ছাই মেখে নিরঙ্কুশ হয়ে বেরিয়ে পড়েনি, অশন-বসনের দায়টা সে মানে। তাই ডেরা তুলতে হ'লে তার ছোট্ট গাঁট্‌রিটাকে খচ্চরের পিঠেই বেঁধে নিতে হয়। তা ছাড়া কেন কে জানে, অন্তত সপ্তাহে একবার তাকে শহর থেকে ঘুরে আসতে হয়, শিষ্য-সামন্তদের দর্শন দেবার জন্যেই হয়তো। সে কারণেও খচ্চরটাকে বাদ দিয়ে চলবার জো নেই।

ছোট ছোট পায়ে খট্ খট্ করে হাঁটতে হাঁটতে খচ্চরটা একেবারে সাঁওতাল পাড়ার মাঝখানে এসেই থামল। মাথার পাগড়ীটা খুলে এক পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সুন্দরলাল। কাঁচা চামড়ায় তৈরি পুরনো নাগরা জুতোটার কাঁটা লোহাগুলোতে একটা কর্কশ শব্দ বেজে উঠল, আর সেই শব্দটাকে ছাপিয়ে ময়লা চাপকানটার লম্বা পকেটে ঝন ঝন ক'রে সাড়া দিলে কয়েকটি ধাতু মুদ্রা।

বহু দূর থেকে আসতে হয়েছে। খচ্চরটারও পরিশ্রম হয়েছে খুব। ঘাড়ের ওপরকার ছোট ছোট খাড়া লোমগুলোর তলাটা ঘামে ভিজে গেছে, মুখের পাশে পাশে ফেনার

আভাস। দড়ির লাগামটা ধরে তাকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল সুন্দরলাল।

—কোথা থেকে এলে বাবাঠাকুর ?

প্রশ্ন শুনে সুন্দরলাল মুখ তুলে তাকালো। সামনে ঝড়ু সাঁওতাল। গ্রামের লোকে মোড়ল বলেই মান্য করে তাকে। পরনে বস্ত্রের বেশি বাহুল্য নেই, শুধু ছোট একটি ফালি নেংটির মতো ক'রে পরা। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে ঘিরে আর একটুকরো কাপড়, তার একপাশে গোটা তিনেক পালক গোঁজা। হাতে বাঁশের ছিলা দেওয়া কুচ্‌কুচে প্রকাণ্ড একটা ধনুক, আর সেই সঙ্গে গোটা কয়েক বাঁটুল।

—কে মোড়ল ? কী শিকার পেলি রে ?

—কিছু নয় বাবাঠাকুর। মহুয়া বনে গিয়েছিলুম হরিয়াল মারতে, কিন্তু বরাত খারাপ। তুমি কোথা থেকে এলে ?

—আমি ? প্রশান্ত হাসিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল সুন্দরলালের মুখ। এ হাসিটাকে আধ্যাত্মিক মনে করলে দোষ হয় না। সাধনার পথে সে যে কতখানি এগিয়ে গেছে, এ হাসি দেখে তার কিছুটা অনুমান করা চলে :

—আমি ? আমি গিয়েছিলুম ওপারের ওই গাঁয়ে। ওখানে একজনকে ভূতে ধরেছিল কিনা, এসে বড্ড কান্নাকাটি করছিল। তাই একবারটি ঝেড়ে দিয়ে আসতে হল।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ঝড়ু একবার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলে সুন্দরলালের। সত্যি কথা,—সন্ন্যাসের কোনো লক্ষণ নেই সুন্দরলালের শরীরে। চুলটি দিব্যি করে আঁচড়ানো, চাপকানের পকেট থেকে পিতলের ডিবে বের ক'রে তা থেকে মস্ত একটা খিলিপান মুখে পুরে দিলে। জর্দার চমৎকার গন্ধটা দস্তুরমতো লোভনীয়। চলার সঙ্গে সঙ্গে পকেটের টাকাগুলো ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠছে।

তবু সুন্দরলাল যে সাধু মোহান্ত, তাতে সন্দেহ করবার হেতু কী !

মুগ্ধ বিস্ময়ে ঝড়ু বললে, ভূত ছাড়ল ?

—ছাড়বে না ? চালাকি নাকি ? এ কি যে-সে মন্ত্র ! হিমালয়ের চূড়োয় পাঁচ শো বছর ধরে ধ্যান করছেন নাঙ্গা বাবা। ইয়া লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি, লুটিয়ে পড়েছে একেবারে পা পর্যন্ত। আর সে কী চেহারা, দাঁড়ালে তালগাছের মাথায় গিয়ে ঠেকে। সেবার আমি নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে ধ্যান করছি ব'সে। মাঝ রাত্তির, ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার—হঠাৎ যেন পূর্ণিমার চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তাকিয়ে দেখি ওই মূর্তি—পেছনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

সূর্য অস্ত গেছে। পায়ের তলায় মড়মড় করছে শুকনো শালের পাতা। ঝড়ু মোড়লের সারা গা ভয়ে ছমছম করে উঠল।

—তারপরে ?

—তারপরে আর কী? সুন্দরলালের কণ্ঠে গর্বের আভাস লাগল: নাঙ্গা বাবা বললেন, যা ব্যাটা, তোর হয়ে গেছে। আজ থেকে সিদ্ধিলাভ করলি তুই। ভূত-পিরেত-পিশাচ-দানো তোর ছায়া দেখলেও ছুটে পালাতে পথ পাবে না।

দুপাশের বন জঙ্গলগুলি সন্ধ্যার সঙ্গে আরো ঘন ক'রে ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। সুন্দর-লালের মুখ দেখা যায় না, তবু ঝড়ু একবার সে মুখখানাকে দেখবার চেষ্টা করলে। এমন একটা লোকের পাশে পাশে হেঁটে চলেছে, ভাবতেও সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

বনের পথটা পেরোতেই সামনে গ্রাম দেখা দিল। আকাশের এক কোণে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ এতক্ষণ কোথায় আত্মগোপন ক'রে ছিল কে জানে! জঙ্গলের আড়ালটা কেটে যেতেই কাঁকর বিছানো পথটার ওপর তার আলো ঝিলমিল ক'রে উঠল। সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের শব্দ। মহুয়ার গন্ধের সঙ্গে এই শব্দটার চমৎকার একটা ছন্দোগত ঐক্য আছে বোধ হয়।

ঝড়ু সবিনয়ে বললে, একবার নাচ দেখতে যাবে না বাবাঠাকুর?

—নাচ? আচ্ছা, চল্।

দুদিকে মাটির দেওয়াল গাঁথা ছোট ছোট নিচু বাড়ি। মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় বসেছে নাচের আসর। কষ্টিপাথরের তৈরি কালো চেহারার দুজন পুরুষ দুলে দুলে মাদলে ঘা দিচ্ছে, আর সেই মাদলের তালে তালে ঝুঁকে ঝুঁকে কয়েকটি মেয়ে নৃত্য করছে। পরস্পরের বাহুতে তারা আবদ্ধ, মুখে অস্ফুট গানের উচ্ছ্বাস। সে গানের ভাষা বোঝবার জো নেই, কিন্তু তার ধ্বনিটা একটা বিচিত্র গুঞ্জনের মতো বাজছে।

সুন্দরলালকে আসতে দেখে মাদল আর নাচ দুই-ই থেমে গেল। মেয়েদের কালো চোখে দেখা দিল কৌতুকের উজ্জ্বল আভা, পুরুষদের কণ্ঠে উঠল ভক্তিমুগ্ধ কলরব। কেউ কেউ উঠে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে, কেউ বা আবার কোণা থেকে কাঠের একটা চৌপাই টেনে নিয়ে এল।

যথোচিত মর্যাদা আর গাম্ভীর্য নিয়ে চৌপাইটাতে আসীন হল সুন্দরলাল। পুরুষেরা ঘিরে বসল তার চারপাশে। নাকের রুপোর আংটির ভেতর আঙুল দিয়ে মেয়েরা তাকিয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে।

সুন্দরলাল গম্ভীর হয়ে বললে, নাচ থামালি কেন? চলুক না।

ঝড়ু মোড়লের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হয়ে উঠল: হাঁ হাঁ, নাচ চলুক। ভালো করে নাচ দেখিয়ে দে বাবাঠাকুরকে।

আবার মাদলে ঘা পড়ল। শাল বনের ওপর দিয়ে চাঁদ তখন অনেকখানি উঠে এসেছে। মেয়েদের উজ্জ্বল চোখগুলিতে, সুঠাম সম্পূর্ণ দেহশ্রীর ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে পড়তে লাগল তরল লাবণ্যের মতো। সংসার-বিরক্ত সুন্দরলাল নিজের অজ্ঞাতেই

খানিকটা সংসক্ত হয়ে উঠল হয়তো। হয়তো বা রক্তের এই চাঞ্চল্যটা পুরোপুরি দার্শনিক ভাবেই অনুপ্রাণিত নয়।

দশ-বারোটি মেয়ে একসঙ্গে নাচছিল। তাদের ভেতর প্রায় প্রৌঢ়া থেকে নিতান্ত বালিকা পর্যন্ত সব স্তরের মেয়েই আছে। তবে যুবতীর সংখ্যাই বেশি। অথবা অল্পেতেই এরা বুড়িয়ে যায় না বলেই হয়তো এদের যৌবন সব সময়ে বয়সের হাত ধরে চলে না। সুন্দরলালের সংসারাশ্রমের কথা মনে পড়ে। তার স্ত্রীর বয়স তো এখনো কুড়ি পার হয়নি, কিন্তু—

চমক ভাঙল। এক ভাঁড় মহুয়ার মদ এসে গেছে। ঝড়ু বললে, পেসাদ করে দাও বাবাঠাকুর।

সুন্দরলাল আপত্তি করলে না। সন্ন্যাসের শেষ স্তরে উঠে সে নির্বেদ লাভ করেছে বলা চলে। মাটির পাত্রে ক'রে উগ্রগন্ধী মহুয়ার মদে গলা ভিজিয়ে নিলে সুন্দরলাল।

জ্যোৎস্নায় জোয়ার এসেছে ততক্ষণে। বাতাসে শাল ও ফুলের গন্ধ। এ দেশের লোক ও গন্ধটাকে স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে করে না, কিন্তু ওর সঙ্গে মহুয়ার তিক্ত মদিরতা মিশে গিয়ে আফিমের মতো একটা বিশাক্ত নেশায় যেন আচ্ছন্ন করছে চৈতন্যকে। কী কার্যকারণযোগে ওপাশের একটি তরুণী মেয়ের আন্দোলিত দেহবল্লরীর ওপর গিয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ল সুন্দরলালের দৃষ্টি। যেন মূর্ছিত হয়ে গেল বললেই ঠিক বলা হয়।

সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যপুষ্ট সম্পূর্ণতা। এমন মেয়ে এই অবাধ স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের দেশেও বিরল। সুন্দরলালের চোখ জ্বলতে লাগল।

—ওই মেয়েটা কে রে মোড়ল?

প্রশ্ন শুনে ঝড়ু সাঁওতাল কৃতার্থ হয়ে গেল যেন।

—ওই, ওর কথা বলছ? ও তো আমারি মেয়ে—বুধনী।

চাপকানের পকেটে হাত দিয়ে সুন্দরলাল টাকা-পয়সাগুলোকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে বৈরাগী, সে হিসাবে ধাতববস্তুর ওপরে তার যতটা অনাসক্তি থাকা উচিত তা নেই। সুন্দরলালের ভারী ভালো লাগে টাকা বাজানোর শব্দটা। ঠিক যেন গানের মতো কানে বাজে।

—বুধনী? বাঃ, বেশ নাম তো। ডাক্ তো ওকে।

বুধনী এগিয়ে এল। কতকটা বিস্ময়, কিছুটা কৌতুক। ভয়ও যে একেবারে না আছে তা নয়। সুন্দরলাল হাত দেখতে পারে, ভূত ছাড়াতে পারে, আরো কত কী জানে ঠিক নেই। তার সামনে এসে দাঁড়াতে বুক যে খানিকটা দুরদুর করবেই—এই তো স্বাভাবিক।

কয়েক মুহূর্ত বুধনীর মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে রইল সুন্দরলালের দৃষ্টি। গায়ের কাপড়টা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে সংযত হওয়ার চেষ্টা করলে বুধনী।

জামার পকেট থেকে দুটো টাকা বের ক'রে আনল সুন্দরলাল: এই নে, তোদের খেতে

দিলুম। আর—আর—

মুহূর্তে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। হয়তো মহুয়ার প্রভাবেই বিচিত্র রকমে গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর ঃ তুই কেন এখানে পড়ে আছিস বুধনী। তোর যে ভারী জোর বরাত। নাঙ্গা বাবার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে শহরে গিয়ে যে তোর কপাল ফিরে যাবে এ তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

সুন্দরলাল যেন দৈববাণী করছে। এ যেন সে নয়—যেন তার সত্তার ভেতর থেকে আর একজন কে আবির্ভূত হয়ে এল। সাঁওতালেরা জানে মাঝে মাঝে তার ওপরে ঠাকুর-দেবতার ভর হয়।

—চলে যা, চলে যা তুই। দেবতার নাম ক'রে বলছি তুই চলে যা। শাড়ি, চুড়ি, তেল—যা চাস সব পাবি।

ভয়ে বিস্ময়ে সর্দারের চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বিস্ফারিত হয়ে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। দেবতার নামে যা বলবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে সব। দেবতার একটি কুদৃষ্টিতে ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যান্ত মানুষ মরে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে—গ্রামের পর গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে পারে। ভীত চঞ্চল সাঁওতালেরা চার পাশে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো, এই সুযোগে নিজেদের ভাগ্যটাকে একবার যাচাই ক'রে নিলে হয়।

—শহর! শাড়ি—চুড়ি—তেল! একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক। বুধনীর চিন্তা আকস্মিক-ভাবে যেন খেই হারিয়ে ফেলছে।

সুন্দরলালের ওপর এখন পুরোপুরি ঠাকুরের আবির্ভাব। বুড়ো জেসা টুডুকে সে বাতলে দিচ্ছে হাঁপানির ওষুধ। দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে নির্মল চাঁদের আলো অসীম প্রীতি আর বিশ্বাসের মতো ঝরে পড়ছে—ছড়িয়ে যাচ্ছে যেন রজনীগন্ধার অসংখ্য ছিন্ন পাপড়ি। মহুয়ার গন্ধে শালফুলের বিষাক্ত নিশ্বাস চাপা পড়ে গেল।...শুধু অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ভুটানী খচ্চরটা। কী একটা অস্বস্তি অনুভব ক'রে খট খট শব্দে সে মাটির ওপর পা ঠুকতে লাগল।

খুব ভোরে ওঠা সুন্দরলালের অভ্যাস।

সূর্য সামনের পাহাড়টাকে ভালো ক'রে রাঙিয়ে তোলার আগেই সে ঘরের বাইরে দড়ির খাটিয়ায় এসে বসে। তারপর হয়তো সুর করে তুলসীদাস পড়া শুরু হয় তার ঃ

"ঘটহ্ বঢ়হ বিরহিনী দুখ দাই
গ্রসহ রাহু নিজ সন্ধিহি পাই,
কোক শোকপ্রদ পঙ্কজদ্রোহী,
অবগুণ বহুত চন্দ্রমা তোহি—"

কিন্তু সীতার বিরহ নিয়ে বেশিক্ষণ সময় কাটাবার জো নেই। সাঁওতালেরা তাকে গুরু বলে মানতে শুরু করেছে আজকাল, সব কিছু কাজেই তার পরামর্শ ছাড়া এখন আর চলে না।

পাহাড় থেকে হরিণের পাল নেমে গম খেয়ে যাচ্ছে, তার কি প্রতিকার? বড়কা সাঁওতাল কি এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে, অথচ সমাজের আইনে তাদের বিয়ে হতে পারে না, এর কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে? অমুকের পায়ের ঘা আজ তিন মাস ধরে সারছে না, কেউ কি তার কোনো অনিষ্ট করল?

এমন অনেক প্রশ্নের মীমাংসাই করতে হয় সুন্দরলালকে। কিন্তু নাঙ্গা বাবার আশীর্বাদের জোর আছে তার ওপরে। পশুপতিনাথের মন্দির থেকে লাভ করা সিদ্ধি—সহজ কথা নয়। তিরিশ বছর বয়েস পেরোনোর আগেই প্রাক্তন পুণ্যের বলে ইহলোক-পরলোকের সড়ক পাকা ক'রে নিয়েছে সে।

আজো সকালে তিলক সাঁওতাল এসে দেখা দিলে।

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে বাবাঠাকুর।

প্রকাণ্ড একটা ভাঙের গুলি মুখে পুরে দিয়ে সুন্দরলালের মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠল। "রামচরিত মানস" এক পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে, কী কথা?

তিলক সাঁওতাল গলার আওয়াজ নীচু ক'রে আনল: তুমি বাণ মারতে জানো?

—বাণ?—একটা বিচিত্র হাসিতে সুন্দরলালের চোখমুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল: আমি বাণ মারতে জানি নে? আমি জানি নে তো কে জানে শুনি?

তিলক সাঁওতাল অপ্রতিভ হয়ে বললে, তাই বলছিলুম।

—তাই বলছিলি? তাই আবার কি বলবি? সেবার আসামের চা-বাগানে এক সায়েবকে মেরে দিলুম না; তিনটা দিনও পেরোল না, মুখে রক্ত উঠে একেবারে—হুঁ হুঁ!

—কাবার হয়ে গেল?

—বিলকুল। খালি বাণ? ইচ্ছে হলে পিশাচ চালান করতে পারি।

তিলক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বাণ মারা—কী ভয়ানক! তুমি জানোও না—মাটিতে রেখা দিয়ে তোমার মূর্তি আঁকা হয়ে গেল, আর সেই মূর্তির বুকে মেরে দেওয়া হল মন্ত্রপূত তীর। নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন ক্ষেতে কাজ ক'রে সন্ধ্যেবেলায় তুমি বাড়ি ফিরেছ, হঠাৎ অসহ্য ব্যথা উঠল তোমার বুকে। তারপর কাশির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফুসফুস দুটো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল—সাতটা দিনের ভেতরেই তুমি পুরোপুরি নিকাশ হয়ে গেলে। আর পিশাচ! যে পিশাচসিদ্ধ, তার অসাধ্য কী আছে? এই সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে পাহাড়ে কত অশরীরী প্রেতাত্মা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় কে বলতে পারে? সন্ধ্যার কালো আবরণের তলায় যখন শালের বনগুলো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে,

তখন তাদের বড় বড় খসখসে পাতার মর্মরে সেই প্রেতাত্মারা নিশ্বাস ফেলে যায়। সে নিশ্বাস যার গায়ে লাগে, গোড়া কাটা লতার মতো শুকোতে শুকোতে একদিন শেষ আয়ুর বিন্দুটি অবধি তার মিলিয়ে যায়, বাষ্প হয়ে। যেদিন রাত্রে পাহাড়ের মাথায় মাথায় ঝড় ওঠে, মহুয়া গাছগুলো উপড়ে পড়ে, রাতচরা হরিণগুলো অবধি প্রাণের ভয়ে গমের ক্ষেতে নেমে আসে না—সে রাত্রিতে তারা উৎসব করে। সে-সময় যদি কেউ একবার ভুল ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলে পরের দিন তার হাড়-মাংসের একটি টুকরোও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত প্রেতাত্মা—এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পিশাচেরা সব সুন্দরলালের হাতধরা।

—কাকে মারতে হবে ?

তিলক চমকে উঠল। সুন্দরলাল হাসছে। হাসিটা মনোরম নয়—কী একটা অজ্ঞাত কারণে সমস্ত মনটাকে সংকুচিত, সন্ত্রস্ত ক'রে আনে।

ব্যগ্র কণ্ঠে তিলক বললে : ও গাঁয়ের ডোমন মাঝিকে। কিছুদিন থেকেই আমার পিছে লেগেছে। বললে বিশ্বাস করবে না বাবাঠাকুর, ওর তুক মন্তরের চোটেই গত মাসে আমার ছেলেটা মরে গেল। লাগড়া জোয়ান ছেলেটা। দেখতে দেখতে ছটফটিয়ে মরে গেল।

তিলকের চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

—হুঁ। গম্ভীর হয়ে গেল সুন্দরলাল : তোর কাজটা ক'রে দেব আমি—পিশাচ চালান দিয়ে দেব। পরশু শনিবার, কয়েকটা ফুল আর সিঁদুর নিয়ে আসবি, আমি তিনটে নরমুণ্ড যোগাড় করে রাখব। তাই দিয়ে পিশাচ পূজো করতে হবে। তা হলে কী হবে জানিস ?

তিলক ঘাড় নাড়ল।

—তা হলে রোজ রাত্তিরে সে যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন প্রকাণ্ড একটা কালো পিশাচ এসে চেপে বসবে তার গায়ের ওপর। তারপর সেই পিশাচটা তার মুখখানাকে নলের মতো ছুঁচলো ক'রে দিয়ে তার মাথার ভেতর থেকে চোঁ চোঁ করে রক্ত আর ঘিলু শুষে খাবে। তারপর—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে সুন্দরলাল হেসে উঠল। তার বলার ভঙ্গিতে এই সকালের আলোতেও তিলকের মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে আতঙ্কে। দৃশ্যটা সে মনের সামনে কল্পনা করতে লাগল।

—যা মাঝি, পরশু আসিস। ফুল আর সিঁদুর যেন মনে থাকে। আর একটা কথা। এর পরে কিন্তু ক'দিন তোকে গাঁয়ের বাইরে আর কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। ডোমনের রক্ত খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পিশাচটা আশেপাশে খুঁজে বেড়াবে তোকে। পেলে কিন্তু আর রক্ষা রাখবে না।

আর একবার তিলকের আপাদমস্তক নিদারুণ বিভীষিকায় চমকে উঠল।

তিলক চলে যাওয়ার পর সুন্দরলাল অনেকক্ষণ বসে রইল নীরবে। সামনে 'রামচরিত মানসে'র খোলা পাতাগুলো ফরফর ক'রে উড়ে যাচ্ছে। উড়ন্ত একরাশ কালো কালো পলাতক হরফের মাঝখানে গন্ধমাদনধারী হনুমানের একখানা বীরমূর্তি পলকের জন্যে উঁকি মেরে গেল—রূঢ় খানিকটা রঙের প্রলেপ। দূরে মাঠের ওপর চরছে একদল মহিষ, দুটির গলায় বাঁশের বড় বড় চোঙ্গা বাঁধা। আর সব কিছুর ওপর দিয়েই সকালের রোদ প্রসন্ন একটা দীপ্তিমণ্ডলের মতো উদ্ভাসিত।

তত্ত্ব চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেছে সুন্দরলালের মন। এমন ক'রে আর চলে না। দু'মাস—মাত্র দু'মাস সময়. অথচ এমন একটু একটু ক'রে এগোতে গেলে গোটা বছরই যে কাবার হয়ে যাবে। ওদিকে "সীজন টাইম" পেরিয়ে গেলে এ সবের কোনটারই কোনো অর্থ হয় না।

চেনা হাসির আকস্মিক একটা বন্যা শুধু কান নয়—সমস্ত মনের ওপরই যেন ভেঙে আছড়ে পড়ল। নদীর ঢেউয়ের মতো উচ্ছলিত চটুলতায় রাঙা কাঁকরের পথ বয়ে একদল মেয়ে এগিয়ে আসছে। দিকে দিকে বসন্তের বিহ্বল মদিরতা,—আর তার মাঝখানে এরা যেন পরিপূর্ণ পানপাত্র। হাতের ছোট ছোট ঝাঁপিগুলি ভরে মহুয়া কুড়িয়ে নিয়েছে, আর খোপায় জড়িয়েছে পত্রপল্লবে সমৃদ্ধ একগুচ্ছ নাগকেশরের ফুল।

সুন্দরলালকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো মেয়েরা। নিজেদের ভেতরে কিছুক্ষণ কি সতর্ক আলোচনা চলল তাদের। সুন্দরলালকে তারা ভয় করে, কিন্তু তার চারদিক দিয়ে অতীন্দ্রিয় রহস্যের যে ঘন একটা কুয়াশা ঘেরা, তাদের কৌতূহলী মন মাঝে মাঝে সেই কুয়াশার ভেতরে প্রচ্ছন্ন জগৎটাকে আবিষ্কার করতে চায়।

বুধনী ইতস্তত করছে, কিছু যেন একটা বলবার আছে তার। অত্যন্ত বিপন্ন মুখে আঙুল দিয়ে গলার রূপোর হাঁসুলিটা খুঁটতে লাগল সে। একটি মেয়ে আলগা ভাবে তাকে ধাক্কা দিলে—যেন তাদের সকলের কাছেই বুধনী কী একটা কৌতুক এবং কৌতূহলের বস্তু হয়ে উঠেছে।

সুন্দরলালের চোখে মুখে অতি-প্রকট তীক্ষ্ণতা:

—কিরে বুধনী?

কিন্তু বুধনীকে কিছু আর বলতে হল না। বাঁধ ভেঙে উচ্ছ্বসিত কলতরঙ্গে যেন বেরিয়ে এল জোয়ারের জল। হাসির দোলায় মেয়েদের পরিপূর্ণ অপরূপ তনুসৌষ্ঠব ছন্দোময় হয়ে উঠল—সুন্দরলালের মনে হল: কামনার যেন শাণিত খানিকটা কালো আগুন দেহ-প্রদীপগুলিতে উঠল শিখায়িত হয়ে।

—এত হাসছিস যে। সুন্দরলালের চোখ দুটো নির্লজ্জভাবেই ঘুরতে লাগল বুধনীর সর্বাঙ্গকে বিশ্লেষণ ক'রে। এ দৃষ্টি হয়তো শরীরের কেবল বাইরেটাকেই দেখছে না, হয়তো

তীক্ষ্ণ একটা সন্ধানী আলো ফেলে বুধনীর মনটাকেও দেখে ফিরছে। এ যোগীর দৃষ্টি—ভোগীর নয়।

বুধনীর সাহসের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সুন্দরলালের দ্বিতীয় প্রশ্নে তাও যেন মিলিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে। মেয়েদের হাসি দ্বিগুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই রূপের প্রখর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে তারা পথের ওপর দিয়ে এক ঝলক দখিনা বাতাসের মতো বয়ে গেল। সুন্দরলাল হাঁ ক'রে তাদের দিকে তাকিয়েই রইল।

দু'মাস মাত্র সময়—কিন্তু দু'টি দিন মাত্র বেশি দেরি হয়ে গেলে সত্যিই কি আর ক্ষতি হবে? বাগানে অনেক মেয়ে আছে, কিন্তু বুধনীর জুড়ি নেই। সুন্দরলালের দুটো চোখে যেন গোখরো সাপ উঁকি মারতে লাগল। সাহেব ভালমানুষের কদর বোঝে, দুদিন বিলম্ব তার কাছে কিছুই নয়।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সুন্দরলাল যে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাতে আর সন্দেহ কি?

সন্ন্যাসী মানুষ, ঘর ছেড়ে সেই কবে বেরিয়ে পড়েছে। বিষয় বাসনার কোনো প্রলোভনই নেই—সংসারে পরের উপকার ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। ঝড়ু সাঁওতাল একথা বিশ্বাস করে, বুধনীর সন্দেহমাত্র নেই, সুন্দরলালের মুখের দিকে তাকাতেও গা কেঁপে ওঠে তিলকের।

কিন্তু পশুপতিনাথের মন্দিরে পাওয়া সেই সিদ্ধমন্ত্র। তার বলে কি না সম্ভব হয়! সুন্দরলাল টাকা তৈরি করতে পারে নিশ্চয়। কারো দরকার পড়লে অযাচিতভাবেই সে কাঁচা করকরে টাকা বের ক'রে দেয়—নতুন টাকা—ঝকঝকে টাকা। হয়তো অনেকটা এই কারণেই সাঁওতালেরা এত বেশি ক'রে তার কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছে। ইচ্ছে করলে সে নাকি নুড়ি পাথরগুলোকে অবধি তাল তাল সোনা বানিয়ে দিতে পারে। জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব দেয় না—রহস্যময়ভাবে হাসে।

আরো কয়েকদিন পরে।

বিলি সাঁওতালনীর কি একটা মানসিক। শালবনের মাঝখানে সিঁদুর-মাখানো ওই যে বড় কালো পাথরটা—ওখানে শিং বোঙার পূজো। উপচার মুর্গী আর মহুয়ার মদ।

খচ্চরে চড়ে সুন্দরলাল এসে উপস্থিত হল।

তখন বলি শেষ হয়ে গেছে। পাথরটার চারপাশে ছিন্নকণ্ঠ মুর্গীর রক্ত। শালফুলের গন্ধে বাতাসটা কেমন ভারী—যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

মাদল বাজছে—তার সঙ্গে চলেছে নাচ। কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের মহুয়ামদির অসংযত নাচের দোলা এ নয়। সে নাচে রক্তে রক্তে একটা তরল নেশা ঘনিয়ে আসে, আর এ নাচ যেন মনের ওপর একটা অস্বস্তির আমেজ দেয়। পাহাড়ের কোল জুড়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে নিবিড়-নিবদ্ধ শালের বন—বড় বড় পাতা স্তরে স্তরে সূর্যকে আড়াল ক'রে সৃষ্টি

করেছে প্রায়ান্ধকার একটা নিভৃত লোক। সেই নিভৃত লোকের মাঝখানে অশরীরী শিং বোঙা যে কোনো মুহূর্তেই হয়তো বা দলবল নিয়ে সশরীরী হয়ে উঠতে পারে।

সুন্দরলাল আসতেই মদের পাত্র এগিয়ে এল। মহুয়ার সুরায় আকণ্ঠ পরিপূর্ণ ক'রে নিলে সুন্দরলাল। শিং বোঙার কালো পাথরটার গায়ে রক্ত আর সিঁদুর লেপা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পাথরটা যেন কার একখানা প্রসারিত মুখ—সত্যি সত্যিই যেন রক্ত খেয়েছে, যেন আরো রক্ত খাওয়ার জন্যে তাকিয়ে আছে তৃষ্ণার্ত চোখে।

সুন্দরলাল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। একবার স্থির রক্ত চোখ মেলে তাকালো সকলের দিকে। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে সোজা পাথরটার সম্মুখে আছড়ে পড়ল। পায়ে লোহার নালতোলা কাঁচা চামড়ার জুতা আর কুর্তার পকেটের টাকাগুলোয় মিলে উঠল একটা চকিত ঝুনঝুনি।

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার উঠে দাঁড়াল সে। জামায় খানিকটা ধুলোর দাগ। একটু আগেও পান খেয়েছিল, মুখের দুপাশে খানিকটা লাল রঙের গ্যাঁজলা বেরিয়ে রয়েছে বীভৎসভাবে। সকলের ওপর দিয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ সে তাণ্ডব তালে নাচতে শুরু করে দিলে।

সোৎসাহে মাদল বেজে উঠল—ডুম ডুম ক'রে উল্লাস জানালো নাগাড়া টিকারা। সুন্দরলালের ওপর ভর হয়েছে—শিং বোঙার ভর। সাঁওতালদের চেতনার ওপর চারিয়ে পড়ল ভয় আর আনন্দের একটা বিচিত্র অনুভূতি।

হেলেদুলে সুন্দরলাল নাচতে লাগল। মুর্গীর খানিকটা রক্ত সে হাতে মুখে মেখে নিয়েছে, এই মুহূর্তে তাকে পৈশাচিক বলে মনে হতে পারে। পায়ের কাঁচা চামড়ার জুতাটা দূরে ছিটকে পড়েছে—পকেটের টাকাগুলো সমান তালে বাজছে ঝন্ ঝন্ ক'রে।

আকস্মিকভাবে সুন্দরলাল থেমে দাঁড়ালো।

অপ্রকৃতিস্থ চোখ দুটো যেন রক্তে ভিজিয়ে আনা। তার কণ্ঠে সেই দৈববাণীর সুর:

—ঝড়ু সাঁওতাল, শুনছিস? আমি শিং বোঙা, তোদের ডাকছি—শুনছিস?

আরো জোরে জোরে টিকারা বাজতে লাগল, আকাশ চিরে উঠল মাদলের শব্দ। সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। ঝড়ু সাঁওতাল কাঁপা গলায় বললে, কী হুকুম বাবা?

—আমার কথা শোন্। তোদের গাঁয়ে মড়ক লাগবে 'হয়জা'র মড়ক! একটি প্রাণীও বাঁচবে না, মরে সব শেষ হয়ে যাবে। 'করম' দেবতার রাগ পড়েছে তোদের ওপর—তোদের কাউকে রাখবে না, কাউকেই নয়।

চমকে মাদলের শব্দ থেমে গেল—হাত থেকে নাগাড়া টিকারা খসে পড়ল। শালফুলের গন্ধে বাতাসের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

সাঁওতালেরা হাহাকার ক'রে উঠল। মেয়েদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল ভয়াতুর আর্তনাদ। একসঙ্গে কলরব উঠল : কী উপায় হবে আমাদের বাবাঠাকুর ?

সুন্দরলালের কণ্ঠে দৈববাণীর সুর আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঝড় ওঠবার আগে থম্‌থমে কালো মেঘে আবৃত ঈশান দিগন্তের মতো তার মুখ :

—উপায় আছে। নাঙা বাবার শিষ্য এই সাধু সুন্দরলালকে আঁকড়ে ধর। ও তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে তোরা উত্তরে চ'লে যা। সেখানে ঘর পাবি, জমি পাবি, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকবি।

আপত্তির ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলে ঝড়ু মোড়ল বললে, কিন্তু বাবা, ঘরবাড়ি সব ফেলে—

—ঘরবাড়ি, ঘরবাড়ি! বিকৃত ভ্রূকুটিতে সুন্দরলালের রক্তমাখা কুটিল মুখখানা প্রেতের মতো দেখাতে লাগল : ঘরবাড়ি আঁকড়ে থেকে সব মরবি তা হলে। করম বাবা তোদের কাউকে আস্ত রাখবে ভেবেছিস। হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে—মনে রাখিস। কুকুর বেড়ালের মতো মরবি সব।

সুন্দরলালের চোখ দুটো রক্তে ভিজিয়ে আনা। সেই দুটো চোখের ভেতর সাঁওতালেরা যেন ভাবী মহামারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল।

বনবাস ছেড়ে আবার সংসারের দিকে ফিরতেই হ'ল সুন্দরলালকে। উপায় নেই। 'করম' দেবতার কোপ থেকে এই নিরীহ সাঁওতালদের তার রক্ষা করতেই হবে। আর বিপন্নকে উদ্ধার না করলে তার কিসের সন্ন্যাস।

সকালের আলোয় সাঁওতাল পরগণার বনশ্রী অপরূপ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে বসন্ত যেন আনন্দের উল্লাসে তরঙ্গিত। ছোট ছোট গোলাপজামের মতো সাদা মহুয়ার ফুল তিক্ত মধুর রসে পরিপূর্ণ হয়ে টুপটুপ ক'রে খসে পড়ছে। ডালে ডালে সবুজের ছিট্ দেওয়া হরিয়ালের নাচ—ঘুঘুর একটানা করুণ ডাক।

গলার সামনে গাঁটরি-বাঁধা সুন্দরলালের ভুটিয়া খচ্চরটা টুকটুক্ শব্দে ক্ষুদে ক্ষুদে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। পেছনে মাদল বাজছে—একটা অস্ফুট গানের গুঞ্জন। সাঁওতাল পুরুষেরা ঘর ছাড়ার দুঃখ ভোলবার জন্যেই কেউ হয়তো বাঁশিতে সুর দিয়েছে। মেয়েদের মুখে কোনো ক্ষোভের ইঙ্গিত নেই। পথ চলবার আনন্দে তারা লীলায়িত, মাদলের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কালো চুলে সাদা ফুলের মঞ্জরীগুলি দুলে উঠছে। বুধনীর চোখে স্বপ্ন। শহর, চুড়ি, তেল আর শাড়ি! দেবতার হুকুম পেয়েছে সে।...

...আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কী যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে—আড়কাঠি সুন্দরলাল হিসেব করতে লাগল : বুধনীকে বাদ দিলে,

বেয়াল্লিশজন কুলিতে তার কমিশন পাওনা হয় কত !

সাঁওতাল পরগণার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত ক'রে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা। সকালের হাওয়া লেগে পাহাড়ী পথের ওপর কৃষ্ণচূড়ার একরাশ রাঙা পাপড়ি ঝুর ঝুর ক'রে ঝরে পড়ল।

হাড়

লোহার ফটকের ওপারে দুটো করালদর্শন কুকুর। যে দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকাচ্ছিল সেটা বন্ধুত্ববাচক নয়। এক পা এগিয়ে আবার তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

ফটকের বাইরে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফিরে যাব ? শ্যামবাজার থেকে এতদূরে পয়সা খরচ ক'রে এসে দুটো কুকুরের সঙ্গে দেখা ক'রেই ফিরে যাব ?

রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জি—ইন-ই তো বটে। কিন্তু ডাকি কাকে ? দরোয়ানের ঘরটা বন্ধ। ওদিকে বাগানের একপাশে যেখানে চমৎকার গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ফুটেছে, একটা মালী ঝাঁজরি হাতে সেখানে কী যেন কাজ করছিল। আমাকে একবারও তার চোখে পড়েছিল কিনা জানি না। না পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কী করি। চাকরির উমেদার। বহু কষ্টে পরিচয়পত্র মিলেছে একখানা—পিতৃবন্ধু বলে একটা কথাও শুনেছিলাম। রায়বাহাদুর একটা কলমের খোঁচা দিয়ে দিলেই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা। কাজেই এক সময়ে আমাকে দেখে হয়তো কারো কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়ে উঠবে, আপাতত সেই শুভ মুহূর্তেরই প্রতীক্ষা করা যাক। গেটের সামনে পায়চারি শুরু করে দিলাম।

প্রসারিত রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। মোটর-ট্রাম-মানুষের অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা। মাথার ওপর এরোপ্লেনের পাখার শব্দ—জাপানী-দস্যুর আক্রমণ আশঙ্কায় পাহারা দিচ্ছে। দি লায়ন হ্যাজ উইংস !

—গর্-র্-র্—

পেছনে ক্রুদ্ধ গর্জন। চমকে তাকিয়ে দেখি একটা মহাকায় কুকুর চলে এসেছে একেবারে গেট পর্যন্ত। আর লোহার রেলিঙের ভেতর দিয়ে বাইরে বের ক'রে দিচ্ছে ভোঁতা সিক্ত নাকটা। চোখ দুটোতে সোনালি আগুন জ্বলজ্বল করছে—ঝকে উঠছে দুটো নতুন গিনির মতো। কয়েকটা হিংস্র দন্ত বিকাশ ক'রে আবার বললে, গর্-র্-র্—

লক্ষণ সুবিধের নয়। 'শকটং পঞ্চহস্তেন'—শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় কুকুরের মহিমা টের পাননি তখনো। গেটের সামনে থেকে আরো দু পা দূরে এলাম। আশা ছাড়তে পারছি না। উমেদারের আশা অনন্ত।

একটু দূরে মনোহরপুকুর পার্ক। আপাতত মনোহর নয়—বুভুক্ষুর কলোনী বসেছে সেখানে। নগরীর নির্মল স্ফটিক জলে জোয়ারের টানে ভেসে আসা একরাশ দুর্গন্ধ আবর্জনা। চিৎকার করছে, কলহ করছে, পরস্পরের মাথা থেকে উকুন বাছছে, জানোয়ারের মতো ঝুঁকে পড়ে কালো জিভ দিয়ে খাচ্ছে হাইড্রেনের ময়লা জল। সহানুভূতি আসে না, বেদনা আসে না, শুধু একটা অহেতুক আশঙ্কায় মনটা শিউরে উঠে শিরশির করে। দেশ-জোড়া ক্ষুধা যেন মা-কালীর মতো রসনা মেলে দিয়েছে—এ ক্ষুধার আগুন কবে নিভবে কে জানে। একমুঠো ভাত আর একথাবলা বাজরাই কি যথেষ্ট এর পক্ষে? আরো বেশি—আরো বেশি—এমন কি রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের এই ছবির মতো বাড়িগুলো পর্যন্ত?

বাতাসে একটা গন্ধের তরঙ্গ এল। না, বুভুক্ষুদের নোংরা গন্ধ নয়, গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার উগ্র-মধুর এক ঝলক সুরভি। অ্যাসফল্টের চওড়া রাস্তা, কালো মার্বেল বাঁধানো সিঁড়ি, রঙীন কাচ দেওয়া জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনামাটির টবে কম্পমান অর্কিড।

—কাকে চাই আপনার?

মিষ্টি মধুর কণ্ঠ—ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধের সঙ্গে যেন তার মিল আছে। তাকিয়ে দেখি গেটের ওপারে কোথা থেকে একটি ষোড়শী এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দীর্ঘকায়া একটি গৌরাঙ্গী মেয়ে। ট্রাউজার পরা, সঙ্গে ছোট একটি সাইকেল। আবার প্রশ্ন হল: কী দরকার?—এই চুপ!

গর্জন বন্ধ করে শান্ত হয়ে দাঁড়াল কুকুরটা। মেয়েটির মুখের দিকে মুখ তুলে প্রসাদা-কাঙ্ক্ষীর মতো লুব্ধভাবে লেজ নাড়তে লাগল।

ভীত শুকনো গলায় বললুম, রায়বাহাদুর আছেন?

—বাবা? হাঁ আছেন বই কি।

—একটু দেখা করা সম্ভব হবে?

—আসুন।

লোহার ফটক খুলে গেল। অ্যাসফল্টের রাস্তায় এবার বিস্তৃত আমন্ত্রণ। উজ্জ্বল মসৃণ পথ—আমার তালি দেওয়া জুতোটার চাইতে অনেক পরিষ্কার।

সবুজ পর্দা সরিয়ে ভেতরের কার্পেটে পা দিলাম। নীল রঙের একটু স্নিগ্ধ আলোয় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেটির ওপর পা তুলে আধশোয়া অবস্থায় এক ভদ্রলোক কী পড়ছিলেন। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হল। ভদ্রলোক বললেন, বসুন। কী দরকার?

স্পন্দিত বুকে পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিয়ে আসন নিলাম।

রায়বাহাদুর খামখানা খুলে মনোনিবেশ করলেন চিঠিতে আর আমি মাঝে মাঝে ভীরু দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। ভারী গোল একখানা মুখ—টকটকে ফরসা ত্বকের

ভেতর দিয়ে যেন রক্ত-কণিকা বাইরে ফুটে বেরিয়ে পড়ছে। ব্লাড-প্রেশার কথাটার ডাক্তারী সংজ্ঞা জানি না, কিন্তু কথাটার বাংলা অর্থ যদি রক্তাধিক্য হয় তা হলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশারে ভুগছেন!

নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্ত। কোথায় একটা ঘড়ি টিক টিক করছে। হাওয়ায় উড়ছে রায়বাহাদুরের কিমানোর হাতাটা। বাঁ হাতের অনামিকায় অমন জ্বলজ্বল করছে কী ওটা? হীরাই নিশ্চয়।

চিঠি পড়া শেষ করে রায়বাহাদুর আমার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি শান্ত আর উদার। অবচেতন মন থেকে কেমন একটা আশ্বাস যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো হয়েও যেতে পারে চাকরিটা।

—প্রমথর ছেলে তুমি? আরে তা হলে তো তুমি আমার নিজের লোক। তোমার বাবা আর আমি—ফরিদপুরে ঈশান ইস্কুলে একসঙ্গেই পড়েছিলাম। প্রমথ? ও, হি ওয়াজ্ এ নাইস্ বয়!

আমি বিনয়ে মাথা নত করে রইলাম।

—তোমার বাবা যখন রেজিগ্নেশন দেয়, সে খবর আমি পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ও খুব স্পিরিটেড্, অন্যায় কখনও সইতে পারত না। নইলে এত সহজে অমন চাকরি ছেড়ে দিলে। অ্যান্ এক্সেপসনাল বয় হি ওয়াজ্!

নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর কী করা যায়। পিতৃ-প্রশংসায় বিনীত হয়ে থাকাই উচিত ভক্ত সন্তানের।

-তারপর, চাকরি পাচ্ছ না যুদ্ধের বাজারে? এম.এ. পাস করে কেরানীগিরির উমেদারী করছ? বী এ ম্যান ইয়াং ফ্রেণ্ড, বেরিয়ে পড়ো অ্যাডভেঞ্চারে। চাকরি নাও অ্যাক্টিভ সার্ভিসে, ভিড়ে পড়ো নেভিতে।

বললাম, নানারকম অসুবিধে আছে, অনেককে দেখাশোনা করতে হয়। তা ছাড়া একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে—

—অনিশ্চিত!—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়বাহাদুরের দৃষ্টি: জীবনটাই তো অনিশ্চিত হে ছোকরা। আমিও একদিন নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম অনিশ্চয়তার মধ্যে। সিঙ্গাপুরে কাটিয়েছি দশ বৎসর, ভেসে গেছি হাওয়াই, ম্যানিলা, তাহিতি, ফিলিপাইন, মিকাদোর দেশে জাপানে। পৃথিবীটাকে চোখ মেলে না দেখলে বাঁচবার অর্থ নেই কোনো।

—তা বটে।—আমি ক্লিষ্টভাবে হাসলাম। রায়বাহাদুরের কথাগুলো ভালো, অত্যন্ত মূল্যবান। অ্যাড্ভেঞ্চার নেই বলেই তো বাঙালীর সমস্ত প্রতিভা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু ভালো কথা জানলেই কি ভালো হওয়া যায়? যুদ্ধকে ভয় করি আমি, সাইরেনের শব্দে আমার বুকের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে ওঠে। ইউ-বোট বিক্ষিপ্ত ফেনিল সমুদ্রে

নিরুদ্দেশ-যাত্রা আমাকে কবি-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে না। তা ছাড়া পৈতৃক অর্থে প্রশান্ত মহাসাগরের স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়ানো, আর বোমারু ঈগলের মৃত্যু-চক্ষুর তলায় দুরবীনের শাণিত চোখ মেলে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট নিয়ে প্রতীক্ষা করা—আমার সন্দেহ হয় এ দুটোর মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গত ব্যবধান আছে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, কত জায়গাতে ঘুরেছি আমি। হাওয়াইয়ের সেই হুলাহুলা ডান্স, স্টিভেনশন ব্যালেণ্টাইনের প্রবাল-দ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা। বিচিত্র সব কালেকশান আমার, দেখবে?

কালেকশান দেখবার মতো মনের অবস্থা নয়। পঁচিশ টাকার প্রাইভেট ট্যুশন আছে একটা, এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরকে চটানো চলে না, তাঁর কলমের একটা আঁচড়েই হয়ে যেতে পারে চাকরিটা।

উঠে জোরালো একটা ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বাললেন রায়বাহাদুর। তারপর ঘরের এক কোণে একটা লোহার আলমারী খুললেন তিনি। তার ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে এল কালো ভেল্‌ভেটের একটা বাক্স, সেটা এনে রাখলেন আমার সামনে। ঢাকনাটা খুলে বললেন, দেখেছ?

দেখলাম, কিন্তু এ কী কালেকশান। কতগুলো ছোট বড় হাড়ের টুকরো। প্রত্যেকটার সঙ্গে একখানি করে নম্বরের ছোট লেবেল ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে বললাম, হাড় নাকি এগুলো?

—হাঁ, হাড় বই কি।—আমার মুখোমুখি হয়ে বসলেন রায়বাহাদুর: কিন্তু সাধারণ হাড় নয়। এদের প্রত্যেকের বিস্তৃত পরিচয় আছে, অমানুষিক সব গুণ আছে। সমস্ত প্যাসিফিক ঘুরে আমি এদের সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওয়ান মিনিট প্লীজ—সুষি মাদার?

সুষি ঘরে ঢুকল। সেই মেয়েটি।

—ডাকছ বাপী?

—আমাদের চা—

—বলছি এখুনি—নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত তনু দেহটিতে একটা দোলা দিয়ে সুষি বেরিয়ে গেল।

রায়বাহাদুর আবার আমার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। তারপর দামী দুর্লভ এক-খণ্ড হীরার মতো পরম যত্নে একটুকরো হাড় তুলে আনলেন বাক্স থেকে।

—বলতে পারো, কিসের হাড় এটা?

নিশ্চয়ই ভয়ানক একটা কিছুর। ভয়ে ভয়ে বললাম, গরিলা?

—নন্‌সেন্স্!—রায়বাহাদুর প্রচণ্ড একটা ধমক লাগালেন আমাকে: প্রশান্ত মহাসাগরে গরিলা থাকে শুনেছ কখনো? এটা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় কোনো আদি-মানবের

চোয়ালের হাড়।

—রোডেশিয়ান?

—হাঁ, রোডেশিয়ান।—রায়বাহাদুর স্পষ্ট অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন: রোডেশিয়ানের নাম জানো না? অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক গরিলা, মাত্র কয়েক শো বছর আগেও পৃথিবীতে অস্তিত্ব ছিল তাদের।

বোকার মতো বললাম, আজ্ঞে হাঁ, জানি বই কি।—অবচেতন মনের কাছে সুরটা যেন বাজলো মোসাহেবীর মতো। কিন্তু উমেদারী করতে হলে মোসাহেবী তো অপরিহার্য।

—এটা সেই রোডেশিয়ান ক্লাসের কোনো জীবের হাড়—মানুষেরও বলতে পারো। কোথায় পেয়েছি জানো? মিণ্ডানাও দ্বীপে কাটাবাটু বলে জায়গা আছে একটা। তারই কাছাকাছি একটা গাঁয়ের সর্দারের কাছ থেকে এই হাড় আমি কিনেছিলাম। কত দাম দিয়ে কিনেছিলাম বলতে পারবে?

ধমক খাওয়ার ভয়ে স্পষ্ট উত্তর দিতে সাহস হল না। বললাম, অনেক দাম হবে নিশ্চয়।

—নিশ্চয়। পাঁচ হাজার টাকা।

—পাঁ—চ হাজার টাকা!—রায়বাহাদুরের হাতের মেলোয় ওই বস্তুটির দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমি। ইঞ্চি তিনেক লম্বা, চ্যাপ্টা আকৃতির, অনেকটা ছুরির ফলার মতো দেখতে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়ায় হরিদ্রাভ রং ধরেছে, রায়বাহাদুরের বিকটকায় কুকুরগুলোর নোংরা দাঁতের মতো।

—খুব বেশি মনে হচ্ছে? মোটেই নয়। এর ইতিহাস শুনলে তুমি—

দূর থেকে একটা তীব্র কোলাহলে বাকি কথাগুলো উড়ে গেল মুহূর্তে। বাইরের পথে ট্রামের শব্দ, ঘরের ঘড়িটার টিকটিক করে ছন্দোবদ্ধ সুরঝঙ্কার—সব কিছুকে ছাড়িয়ে সেই কোলাহল কানে এসে আঘাত করে। কিন্তু কলরবটা অপরিচিত নয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে ক্ষুধার্ত জনতার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুরের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল: পার্কের ওই ডেস্টিচ্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমোনো যায় না। বোধ হয় খাবার-দাবার কিছু মিলেছে তাই এই চিৎকার। খেতে না পেলে চিৎকার করবে, খেতে পেলেও তাই।

সবুজ পর্দা সরিয়ে একটা ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। চা, খাবার। পিতৃদেবের বন্ধুত্বটা রায়বাহাদুর সত্যি সত্যিই মনে করে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। এ যাত্রা বোধ হয় হয়েই যাবে চাকরিটা।

রায়বাহাদুর বললেন, নাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা প্লেট কাছে টেনে নিলাম। ক্ষিদেও পেয়েছে বিলক্ষণ। বেলা এগারোটায় মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, বেলা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে এখন। এর মধ্যে এক কাপ চা খাইনি, একটা সিগারেট পর্যন্ত নয়।

দূরে আবার সেই বুভুক্ষুদের চিৎকার। ডাস্টবিন উল্টে ফেলে দিয়ে যেমন করে সচিৎকারে ঝগড়া করে কুকুরের দল। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ওরা গোগ্রাসে গিলছে, খিচুড়ির ডালা গলায় আটকে চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে ভেতর থেকে, অথচ আরো পাওয়ার জন্যে অবরুদ্ধ স্বরে আর্তনাদ করছে। আর আমরা এখানে চা খাচ্ছি কত মার্জিত, কত সংযত আর ভদ্রভাবে। মুখটা সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁতের কোণে কেক্ কাটছি—উদ্দেশ্যটা যেন খাওয়া নয়, ঘাসের শীষ চিবানোর মতো দাঁতের একটখানি বিলাসিতা মাত্র। চায়ের কাপে এমনভাবে চুমুক দিচ্ছি যে এতটুকু শব্দ হচ্ছে না—ঠোঁটের আগায় আলগাভাবে চুম্বনের মতো একটু ছোঁয়াচ লাগছে। গপ্‌গপ্ করে গেলা, হুস্ হাস্ করে শব্দ করা—জীবনের সমস্ত এস্থেটিক্ আনন্দ তাতে বিস্বাদ হয়ে যায়। খাওয়াটা যেমন স্থূল, তেমনি গ্রাম্য হয়ে ওঠে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, হাঁ, কী বলছিলাম ? এই হাড়খানা। বড় বিচিত্রভাবে সংগ্রহ করেছিলাম এটাকে। ওখানকার সর্দার এখানাকে পরত মুকুটে। কারণ যার মাথায় এই হাড় থাকবে সে হবে যুদ্ধে অজেয়—শত্রুর হাজার অস্ত্রাঘাতও তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। ওদের কোন এক যাদুকর পুরোহিত একে মন্ত্রসিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। অনেক কষ্টে আমি এটাকে যোগাড় করি, কিউরিয়োর অপূর্ব নমুনা হিসেবে। ওয়েল ইয়াং ম্যান, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করো তুমি ?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে। মনোহরপুকুর পার্ক থেকে অবিচ্ছিন্ন চিৎকার। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস করি বই কি। শস্যশ্যামল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলা—হরিবর্মদেব, শশাঙ্ক-নরেন্দ্রের তলোয়ার ঝলসিত বাংলা। কার মন্ত্রবলে সেই বাংলা থেকে উঠে এল এই প্রেতের দল ? মাঠভরা ফসল কার মন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, একটি কণাও পড়ে রইল না কোনখানে ? যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস না করে উপায় কী।

বললাম, হাঁ, ইয়ে—কত রকম ব্যাপারই তো আছে, বিজ্ঞান দিয়ে তার—

—দেয়ার ইউ আর—দু' নম্বরের হাড়খানা হাতে তুলে রায়বাহাদুর বললেন, আমিও সেই কথাই বলছি। স্টিভেনশনের সেইসব গল্পগুলো পড়োনি ? দেখতে দেখতে একটা সাধারণ মানুষ সাড়ে তিন শো হাত লম্বা হয়ে ওঠে, বড বড় পা ফেলে পার হয়ে যায় সমুদ্র, আর জলের তলায় নিমজ্জিত সব নাবিকদের কঙ্কালগুলো সেই অতিকায় পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে যায় মড মড় করে ? তাহিতির আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ রক্তের মতো রাঙা হয়ে ওঠে, ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হল্কা বয়ে যায়, আকাশ থেকে যে বৃষ্টির

ধারা নেমে আসে, তা জল নয়, টকটকে তাজা রক্তের ফোঁটা। আর কেমন করে হয় জানো? এইরকম—ঠিক এমনি একখানা হাড়ের গুণে।

ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমি সেই হাড়ের দিকে তাকালাম। অন্য সময় হলে এসব কথা গল্পিকার মহিমা-প্রসূত মনে হত কিন্তু সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন এই সমস্ত কাহিনীর জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে জ্বলছে জোরালো বিদ্যুতের আলো। গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা আর রায়বাহাদুরের পাইপ থেকে কড়া তামাকের গন্ধ। হাওয়ায় জানালার নীল পর্দাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের নীল তরঙ্গমালার মতো দোল খাচ্ছে। রায়বাহাদুরকে মনে হল যেন অপরিচিত দেশের সেই অদ্ভুতকর্মা যাদুকর—তাঁর হাতের হাড়ে মুহূর্তে ভেল্‌কি লাগতে পারে।

—পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় পূজো করে কুমারী মেয়েকে বলি দেয় ওরা। তারপর তাকে পুড়িয়ে হাড়গুলো যা থাকে তা মাটির তলায় পুঁতে দেয়। সাত বছর পরে মহা-সমারোহে সে হাড় তুলে আনা হয়, ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রে। সে হাড় যে জলের তলা থেকে তুলে আনতে পারে সে-ই হয় এই যাদুবিদ্যার মালিক। যত প্রেতাত্মা সব তার অনুচর হয় তখন, সে যা খুশি তাই করতে পারে। তাল তাল পাথর তার ক্ষমতায় সোনা হয়ে যায়, তার আদেশে লতাপাতাগুলো অজগর সাপ হয়ে ফণা তুলতে পারে—

আমি বসে রইলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। রায়বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলছে, হাতের হীরাটা জ্বলছে, জ্বলছে বলি-দেওয়া সেই কুমারী মেয়ের হাড়খানা, নীল পর্দাগুলো জ্বলছে, আগুনের মতো জ্বলছে অতি তীব্র শক্তির বৈদ্যুতিক আলোটা। সমস্ত ঘরটা যেন জ্বলন্ত। আর সেই জ্বলন্ত ঘরের মাঝখানে মিলিয়ে যাচ্ছে ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ, পাইপের তামাকের গন্ধ, ভেল-ভেটের বাক্স থেকে উঠে আসা কী একটা ঔষধ-গন্ধ। মনে হল যেন আমার সামনে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে, তার লকলকে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে একতাল কাঁচা মাংস—তামাটে ধোঁয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দগ্ধ মেদ আর চুলের অত্যুগ্র দুর্গন্ধ—যেন আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

—চাট্টি ভাত দাও মা—একটুখানি ফ্যান—

মোহ ভেঙে গেল মুহূর্তে। তাহিতি দ্বীপে মানুষ পুড়ছে না, পুড়ছে কলকাতায়। বুভুক্ষার লেলিহান শিখায়। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে বিরাম নেই ট্রাফিকের। ট্রাম চলছে, মোটর চলছে, চলছে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা'। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে ওই চিৎকার এসে ঘা দিচ্ছে কানে। কী অস্বাভাবিক গলার জোর, কী দানবীয় আর্তনাদ! মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওই রকম গগনভেদী হয়ে ওঠে!

রায়বাহাদুর আবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন বিরক্তিতে। শব্দটা তাঁরও কানে এসেছে। বড় বেশি প্রত্যক্ষ, বড় বেশি বাস্তব। মানুষের ক্ষুধাটা বড় বেশি নগ্ন। এক মুহূর্ত ভুলে যাওয়ার

জো নেই, তলিয়ে যাওয়ার উপায় নেই কোথাও। কোথায় তাহিতি-ম্যানিলা-হনোলুলুর যাদু-রাজ্য, আর কোথায়—

কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল তাঁর দরজায় দুটো করালদর্শন এবং করালদশন কুকুর। নতুন গিনির মতো ঝকঝকে পিঙ্গল চোখ মেলে তারা পাহারা দিচ্ছে, কোনো অনাহূত রবাহুতের সাধ্য নেই তাদের সতর্ক প্রহরী এড়িয়ে এ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে। এ যাদুমন্ত্রের দেশ। বাইরের পৃথিবীতে যত ক্ষুধাই উত্তাল হয়ে উঠুক না কেন, এখানকার ফুলের গন্ধ, রায়বাহাদুরের হাতের জ্বলজ্বলে হীরাখানা অথবা নীল পর্দার গায়ে বিদ্যুতের আলো—কোনোখানে তার এতটুকুও বৈলক্ষণ্য দেখা দেবে না।

—এই হাড়গুলো আমার বহু যত্নের কালেকশান। অনেক আছে, প্রত্যেকটারই এই-রকম সমস্ত গুণ। প্যাসিফিক ঘুরবার সময় এগুলো সংগ্রহ করাই 'হবি' ছিল আমার। ভাবছি এই নিয়ে বই লিখব একখানা।

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কেবলই মনে হচ্ছে একটা অমানুষিক গন্ধ আসছে নাকে, আগুনের গন্ধ, পোড়া মাংসের গন্ধ। পালাতে পারলে যেন বেঁচে যাই। কিন্তু চাকরিটা! রায়বাহাদুরের কলমের এক আঁচড়, মাত্র একটি আঁচড়েই সেটা হয়ে যেতে পারে।

—হাড় যোগাড় করেছি, কিন্তু মন্ত্রগুলো পাইনি। সেগুলো অনধিকারীকে শেখায় না ওরা। যদি পাওয়া যেত—রায়বাহাদুর হাসলেন—যদি পাওয়া যেত তা হলে এতদিনে কত কী অঘটন ঘটিয়ে বসতাম কে জানে। হয়তো সমস্ত পৃথিবীর চেহারাই বদলে যেত মন্ত্রবলে। আর এই যে ছোট্ট দাঁতটা দেখছ, এটা—

অস্থিরাজ্য থেকে যখন মুক্তি পেলাম, রাত তখন নটার কাছাকাছি।

উপসংহারে রায়বাহাদুর বললেন, ইয়াং ম্যান, কেন পঞ্চাশ-ষাট টাকার চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছ? বী কারেজিয়াস্! ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো, নাম লেখাও অ্যাক্‌টিভ্ সার্ভিসে! সামনে পড়ে রয়েছে সমুদ্র, পড়ে রয়েছে পৃথিবী। কেরানীগিরি করে কী হবে?

ক্লান্ত নিরাশ গলায় বললাম, তা বটে, কিন্তু চাকরিটা পেলে—

—ওই চাকরি চাকরি করেই উচ্ছন্ন গেল দেশটা।—রায়বাহাদুর উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন: তুমি প্রমথর ছেলে। তোমার বাবা, হোয়াট এ স্প্লেন্‌ডিড বয় হি ওয়াজ! বাপের নাম রাখতে হবে তোমাকে। একটা নগণ্য কলম-পেশার চাকরির মধ্যে নিজের সমস্ত ফিউচারকে নষ্ট করে দিয়ো না। আই উইশ ইউ অল সাক্‌সেস্ ইন্ লাইফ। আচ্ছা, গুড্ নাইট—

—নমস্কার—

ব্ল্যাক-আউটের আলোহীন পথ। উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করে ভারী পায়ে চললাম এগিয়ে। ট্যুশনিতে আজ আর যাওয়া হল না। ছাত্রের বাবা মহাজন লোক, পাই পয়সা বাজে খরচ করেন না। একদিনের মাইনে কেটে নেওয়া বিচিত্র নয়।

সামনে ডাস্টবিন। পাশের অবগুণ্ঠিত ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটা ছোট আলোকচক্র পড়েছে তার ওপর। তিন-চারজন অমানুষিক মানুষ তার ভেতর হাত ডুবিয়ে খুঁজছে খাদ্য। একটু দূরেই একটা কঙ্কালসার কুকুরের ছায়ামূর্তি—নতুন প্রতিযোগীদের কাছে ভিড়বার ভরসা পাচ্ছে না। কাঠির মতো হাত-পা আর বেলুনের মতো পেটওয়ালা একটা ছোট ছেলে দু'হাতে কী চুষছে প্রাণপণে। হাড়? হাঁ, হাড়ই তো।

আমি থমকে থেমে দাঁড়ালাম। কোথায় একটা সাদৃশ্য-বোধ—সেই বলি-দেওয়া কুমারী মেয়ের হাডখানার মতোই দেখতে। যার গুণে তাহিতির আকাশে রুধিরাক্ত মেঘ ভেসে ওঠে, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝাপ্টা বয়ে যায়, ঝর ঝর করে ঝরে তাজা রক্তের বৃষ্টি। কলকাতার আকাশেও কি মেঘ করেছে, ভালো করে তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না? ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধজড়িত মিঠে হাওয়ায় ঝড়ো আগুনের ঝলক লক্‌লক্ করে বয়ে যাবে কবে?

হাড় ওরা পেয়েছে, কেবল মন্ত্র পাওয়াটাই বাকি।

নীলা

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মানচিত্রটা খুলে ভাস্করের চোখে পড়েছিল উত্তর থেকে পূর্ব বাংলার বুক অবধি পৈতের মতো টানা রেখায় 'সুগার কেন' লাইন। আর উত্তর বাংলার এই সীতাগঞ্জ জায়গাটা তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আখ মাড়াইয়ের পর্ব শেষ হলেই দশমনী কড়াইতে গুড় জ্বাল শুরু হয় চারিদিকে আর সারা বছর সেই গুড় চালান হয় বাংলার নানা অঞ্চলে। শুধু পরিমাণই নয়, উৎকর্ষের দিক থেকেও এখানকার গুড়ের জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওপরটায় সুগন্ধি মধুর মতো তরলাংশ ভাসতে থাকে, তার তলায় মিছরির মতো দানাদার গুড় জমাট বাঁধে। রসটা শুকিয়ে নিলে সে গুড় জাভা চিনির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়।

মারোয়াড়ী ফিনান্সার প্রস্তাবটা শুনে লাফিয়ে উঠল। ভাস্করের ওপরে তার অখণ্ড বিশ্বাস। সারা ভারতবর্ষে তার মস্ত বড় কারবার, ধানের কল, পাটের কল, আমেদাবাদের এজেণ্ট। মানুষ চিনতে তার ভুল হয় না। বললে, বেশ তো, চটপট জমি ইজারা নিয়ে 'মিসিন' বসিয়ে দিন। আপনাকেই আমি ম্যানেজার করে পাঠাব।

অতএব একদিন কলকাতা থেকে সমস্ত বন্দোবস্ত করে নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে

রওনা হল ভাস্কর। জেলা স্টেশনের জংশনে গাড়ি বদল করে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনে ত্থ'ঘণ্টা মন্থর যাত্রা শেষ করে অত্যন্ত নগণ্য একটা স্টেশনে এসে সে নামল। দিন সাতেক ডাক-বাংলোয় কাটিয়ে গোরুর গাড়ি আর সাইকেলে ছুটোছুটি করে আর তাড়ায় তাড়ায় নোট বিলিয়ে সব ঠিক হয়ে গেল। সাইডিঙে তিন-চারটে লাইন বেরিয়ে গেল মিলের সাইট পর্যন্ত, এল ওয়াগন বোঝাই লোহা লক্কড় আর যন্ত্রপাতি, এল ক্রেন্। তারপর দেখতে দেখতে বিশাল চিনির কলের বিরাট লৌহমূর্তি উঠল আকাশের বুক বিদীর্ণ করে, বয়লারে জ্বলতে লাগলো আগুন। চেনে, চাকায়, স্ক্রু আর বল্টুতে, স্টিম ফার্নেসে, সীতাগঞ্জ আর মতিহারীর গাড়ি গাড়ি আখ হাজার হাজার মণ চিনিতে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল তার শুভ্রতা, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় একরাশ মুক্তো চূর্ণের মতো সে চিনি ঝলমল করতে লাগল।

ম্যানেজার ভাস্কর কিন্তু বাঙালী নয়। জাতে সে মাদ্রাজী, তার পুরো নাম ভাস্কর নটবাজন্।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী ছাত্র সে, স্ট্যাটিস্‌টিক্সে তার রেকর্ড। হীরালাল নাথমলের ফার্মে ঢুকেছিল মাঝারি গোছের একটা চাকরি নিয়ে। কিন্তু কয়েক বছর পরে মালিকের নেকনজর তার ওপর এসে পড়ল। তারপর থেকেই নিরবচ্ছিন্ন আরোহণের ইতিহাস এবং পরিশেষে বারোশো টাকা মাইনেতে এল সীতাগঞ্জ হীরালাল স্থগার মিলের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে।

ফাঁকা মাঠটা ইন্দ্রপুরী হয়ে গেছে। ইলেক্‌ট্রিকের আলো, বাবুদের কোয়ার্টার, কুলীদের শেড। পীচের রাস্তাটা মোটরের তেলে আরো চক্‌চকে যেন ইস্পাতের পাতের মতো জ্বলে উঠছে। লরী, ওয়াগন আর ট্রলীর সমারোহ।

সন্ধ্যার পরে কোয়ার্টারের দোতলায় একগাদা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে বসেছিল ভাস্কর। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল একজন পার্সোনাল সেক্রেটারীর। অ্যাপ্লাই উইথ ফটো। বলা বাহুল্য, মহিলা সেক্রেটারীই তার দরকার।

মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরছে পাখা। বিদ্যুতের আলোয় সে পাখাটার বিচিত্র চলচ্ছায়া ঘরময় খেলা করছে, মনে হচ্ছে কোথায় যেন উড়ছে প্রায় অশরীরী একটা বিরাট পতঙ্গ। ঠোঁটের কোণে পুড়ছে কড়া সিগার।

দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলো, দুটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছাড়া সবই বাঙালী মেয়ে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দরখাস্ত সে অযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ওই সম্প্রদায়ের মেয়েদের ওপরে তার একটা সহজাত বিতৃষ্ণা আছে আর বাঙালী মেয়েদের প্রতি আছে একটা স্বাভাবিক লোলুপতা আর কৌতূহল।

একরাশ ফটো। চকচকে উজ্জ্বল চোখ, তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুমন্ত চোখ। কোনোটা প্রগল্‌ভ

হাসিতে মুখর, কোনোটা নির্বোধ ভীতিতে নীরব। ভাস্কর লোভীর মতো তাকিয়ে রইলো। মোগল বাদশাদের মতো যদি এ যুগেও হারেমের বন্দোবস্ত করা যেত, তা হলে এদের সবগুলিকে এনেই জড়ো করত একসঙ্গে।

কাকে ছেড়ে কাকে নেওয়া যায়। মনে পড়ল মাদ্রাজের ছাত্রজীবনের কথা। খবরের কাগজে বেরোত বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে সব বিস্ময়কর সংবাদ। তাদের উজ্জ্বল কালো চোখে বাংলার শ্যামশ্রীর মেদুরতাই শুধু ছায়া ঘনিয়ে তোলে না, তাদের হাতের পিস্তল থেকে ঝাঁঝালো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে-সব খবর পড়তে পড়তে চমকে উঠতো বুকের রক্ত, ঝম ঝম করে উঠতো শরীর। মনের সামনে কল্পজগতের যে সমস্ত মায়ামূর্তি দেখা দিত তাদের কাছে মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যেত কঠিন চেহারার মাদ্রাজী মেয়েরা। আগ্নেয় শিলার মাটিতে পূর্বঘাট পাহাড়ের ছায়ায় যারা পূজো দিতে যায় মন্দিরে, সুদূর গঙ্গার পলিমাটিতে কোমল শান্ত বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে তাদের মনে হত খেলার পুতুল।

তারপর ভাস্কর এল কলকাতায়। বাঙালী বীরাঙ্গনাদের দেখা মিলল না বটে কিন্তু মোহ গেল না। ট্যাগোরের দেশে। 'রেড্ অলিণ্ডার্সে'র নন্দিনীকে এখানে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে! 'লাভার্স গিফট আর ক্রসিং'-এ যাদের কালো হরিণ চোখ তাকে আকুল করে দিয়েছিল তারা কি এই?

ব্যবসা ও টুকিটাকি প্রয়োজনের খাতিরে মেয়েদের সংস্রবে আসতে হয়েছে অবশ্য। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ ভাস্কর কখনও পায়নি। অথচ ট্রামে বাসে যখন দুটি ছেলে মেয়ে পাশাপাশি বসে আলাপ করেছে, তখন কি একটা তীব্র অস্বস্তিবোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে মন। বিলাতী সিনেমায় প্রজাপতির মতো রঙীন হয়ে দল বেঁধে এসেছে বাঙালীর মেয়েরা, ছবি দেখার চাইতে চকোলেট আর আইসক্রীম খেয়েছে বেশি আর ভাস্কর অভদ্র বিস্ফারিত চোখ মেলে যেন তাদের গিলে ফেলতে চেয়েছে।

এতদিনে মিলেছে সুযোগ। ফটোগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে একটা ছবিতে এসে দৃষ্টি নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে একটি মেয়ে। স্নিগ্ধ চোখ দুটি যেন লাবণ্যে ঢলঢল করছে। সমস্ত মুখে একটা অদ্ভুত করুণতা—এ শুধু বাঙালী মেয়েতেই সম্ভব, এই ট্যাগোরের দেশে, এই সবুজ ধান আর পদ্মার দেশে।

ভাস্করের মুখ দিয়ে বেরোলো—ইউনিক!

পরিচয়টা তলাতেই লেখা আছে। সবুজ কালিতে, সুঠাম বড় বড় হরফে। কুন্তলা রায়, অর্থনীতির অনার্স গ্রাজুয়েট।

কয়েক মুহূর্ত সে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ছবি আর হাতের লেখায় অপূর্ব সুর বাঁধা, যেন মেয়েটির সমস্ত পরিচয় স্পষ্টতর করে তুলেছে। নিবে যাওয়া চুরুটটাতে আর একবার মুখাগ্নি করলে, তারপর একটা প্যাড টেনে নিয়ে খস খস করে লিখতে

শুরু করলে : ডিয়ার ম্যাডাম, আই অ্যাম গ্ল্যাড টু ইন্‌ফর্ম ইউ—

ভোরের অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যেই মিলের লোহালক্কড়গুলো আর্তনাদ শুরু করে দেয়। চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হয় আকাশের দিকে। নিষ্পিষ্ট ইক্ষুস্তূপ থেকে ট্যাঙ্কে রস গড়িয়ে পড়ে, আর সেই রস যায় ভ্যাকুয়াম প্যানে, স্টিমে জ্বাল হয়ে বেরিয়ে আসে ধব্‌ধবে সাদা চিনি। বছরে ছ মাস কাজ চলে পূর্ণোদ্যমে, তারপর অফ্‌ সীজন। মিলের কাজ বন্ধ থাকলেও ওয়াগন বোঝাই চিনি নিয়মিত চালান যায় কলকাতার বাজারে।

কুন্তলা রায় এসে যোগ দিয়েছে ভাস্করের পার্সোনাল সেক্রেটারী হয়ে। একটা চিঠি ডিক্টেট করে চলেছে ভাস্কর আর কুন্তলার টাইপরাইটার প্রতিধ্বনি তুলছে খটাখট শব্দে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর টাইপরাইটারে চোখ রেখে কুন্তলা বললে, ইয়েস! তারপর!

—তারপর ? তারপর ?—ভাস্কর কথাটা যেন নিজের মনের মধ্যেই গুঞ্জন করতে লাগল। আস্তে আস্তে জবাব দিলে, থাক!

বিস্মিত চোখ তুলে কুন্তলা তাকাল ভাস্করের মুখের দিকে। ভাস্করের নির্নিমেষ চোখ দুটোও তারি ওপরে নিবদ্ধ। যেমন মুগ্ধ তেমনি মুখর। কুন্তলার কপালে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল।

—কী চমৎকার সকাল মিস রায়। শুধু কাজ করে এমন সকালটা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না। একটা রাইডে আপত্তি আছে তোমার ?

—রাইড ? কিন্তু চিঠিটা যে জরুরী, আজকের ডাকে—

—জরুরী ?—ভাস্কর যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল : বিচার করতে গেলে মানুষের প্রত্যেকটি মুহূর্তই জরুরী মিস্ রায়। সময়কে অত হিসেব করে খরচ করতে গেলে বাঁচাটা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

টাইপরাইটারের ওপর কনুই রেখে বক্র গ্রীবায় এবং উজ্জ্বল কটাক্ষে ভাস্করকে লক্ষ্য করতে লাগল কুন্তলা। শ্যামবর্ণ খর্ব চেহারা, অতিরিক্ত প্রশস্ত কপালটাতে চন্দনের তিলক-চিহ্ন। প্রতিভার দীপ্তিতে চোখ দুটো জলজ্বল করছে। ঠোঁটের কোণ দুটো চাপা আর দৃঢ়-সম্বদ্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞার কঠোরতায় মণ্ডিত। টেবিলের ওপরে রাখা কালো হাতের কব্জির হাড়টা অস্বাভাবিক চওড়া, ছোট ছোট মোটা আঙুলগুলো বাস্তবতার দ্যোতক।

অথচ ভাস্করের কণ্ঠে যা প্রকাশ পেল, তার চেহারার সাথে সে সুরের মিল নেই। একটা নিবিষ্ট আবেশ। মাদ্রাজের আগ্নেয়শিলা বাংলার পলিমাটির মতো কোমল আর শ্যামল হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর বললে, চলুন মিস্ রায়। চমৎকার মোটরের রাস্তা আছে, গ্রামের ভেতর থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। ফিরে এসে চিঠিটা শেষ করলেই চলবে।

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলল, চলুন।

বাইরে আকাশ-গলা শরতের রোদ। মিলের লৌহ-কঠিন দেহটা যেন সোনায় স্নান করছে। যন্ত্রের কলরব উঠছে আকাশে, নীরব হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে হাল্‌কা মেঘ ভেসে বেড়ানো নিঃসীম নীলিমতায়। বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলছে আগুন। কিন্তু আকাশ থেকে আজ আর দেবতার অভিশাপ নেমে আসছে না, একরাশ ঝরা শেফালীর মতো মুঠো মুঠো সোনালী রোদে যেন আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল ভাস্করের ঝকঝকে পন্টিয়াক। নতুন মডেলের আমেরিকান গাড়ি, পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী। সোফারের সীটে বসে ভাস্কর পাশের দরজাটা খুলে দিলে। বললে, এস।

কুন্তলা ইতস্তত করলে এক মুহূর্ত: আমি বরং পিছনের সীটে—

পরক্ষণেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল ভাস্করের কপাল।

—পেছনের সীটে বসলে গল্প করব কী করে? এসব ডেলিকেসি অর্থহীন।

এক টুকরো বঙ্কিম হাসি কুন্তলার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের রেখার মতো ঝলক দিয়ে গেল। শুধু সেক্রেটারী হিসাবে নয়, ভাস্কর তাকে পেতে চায় আরো কাছে, আরো নিবিড়ভাবে। তার উজ্জ্বল চোখ দুটো আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, তার কঠিন হাতের আঙুল-গুলো কাঁপছে ক্ষুধার্ত পুরুভুজের প্রসারিত বাহুগুলোর মতন। নিরুত্তরে কুন্তলা উঠে বসল তার পাশে, টেনে বন্ধ করে দিলে দরজাটা।

মসৃণ পীচের পথ দিয়ে নিঃশব্দে লঘুছন্দে এগিয়ে চলল মোটর। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কোম্পানি এই পথটাকে টেনে নিয়েছে জেলার শহর পর্যন্ত। রাইডের পক্ষে আদর্শ।

মোটরের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে নিচু গলায় ভাস্কর বললে, আমার পাশে বসতে অস্বস্তি লাগছে মিস্ রায়?

অপস্রিয়মাণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলে কুন্তলা। বললে, অস্বস্তি আর কিসের? আমি আমার 'বসে'র নির্দেশ পালন করছি।

—'বস্'?—ভাস্কর যেন অস্বস্তি বোধ করলে: শুধুই 'বস্'? Are we not friends, too?

—ফ্রেণ্ডস?—নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব এল: তা হবে।

ভাস্করের চোখ জ্বালা করতে লাগল, স্পন্দিত হতে লাগল ঠোঁট দুটো। কত বলবার আছে এর জবাবে, উদ্বেল কণ্ঠে, উচ্ছ্বসিত ভাষায়। ভাস্কর পড়েছে ট্যাগোরের রেড অলিণ্ডার্স, গার্ডেনার, পড়েছে লাভার্স গিফ্‌ট আর গীতাঞ্জলি। অঙ্কের ছাত্র হলেও কাব্যের প্রতি তার মোহ ছিল। সবুজ ধানের ক্ষেতে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ তাকে আকুল করে দিয়েছে, অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে সে খুঁজে ফিরছে কোন্ রঞ্জনাকে, যক্ষপুরীর দেশে নন্দিনীর হাতে জ্বলছে কোন্ মায়ামন্ত্রের প্রদীপ? সমস্ত মনটা টগবগ

করে ফুটতে লাগল, যেন বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা খানিকটা জমাট বাষ্পে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার।

ভাস্কর বললে, কেন ফ্রেণ্ড হতে আপত্তি আছে নাকি তোমার ?

কুন্তলার মুখ সূক্ষ্ম হাসিতে রেখায়িত হয়ে উঠল : অসম বন্ধুত্বের কোনো মূল্য নেই। তার চাইতে বাস্তব সম্বন্ধটাই ভালো।

—বাস্তব ?

—বাস্তব বই কি। আপনি তো প্র্যাকটিকাল মানুষ, কথাটা আপনিই ভালো বুঝবেন।

তীব্র প্রতিবাদে না-না করে উঠল মন, কিন্তু ভাস্কর কিছু বলতে পারল না। ট্যাগোরের কবিতা সে পড়েছে বই কি, কিন্তু স্ট্যাটিস্‌টিক্সের ভাষা ছাড়া তার প্রকাশ নেই। ঠোটের ওপর দাঁত রেখে ভাস্কর স্টিয়ারিঙে মনোনিবেশ করলে, ঘুরতে লাগল স্পীডোমিটারের কাঁটা।

পথে দুপাশে সোনার ধান আর আখের ক্ষেতে অনাবিল শরৎ। একদিকে রেললাইনের বাঁধ, তার তলায় ছোট ছোট ডোবাতে কলমী ফুল, শাদা আর রাঙা শালুকের মেলা বসেছে। কাশ দুলছে এখানে ওখানে, উড়ন্ত নীলকণ্ঠ পাখীর পাখার সঙ্গে আকাশের নীল রঙ যেন একছন্দে মিলে গেছে। ফুলগাছগুলোর মাথায় স্বর্ণলতার জল ছড়ানো, যেন সোনার ওড়না জড়িয়েছে তারা।

ছোট ছোট গ্রাম আর পাড়া দেখা দেয়, মিলিয়ে যায় আবার। পাড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল কুন্তলার কাছে। এই হচ্ছে সীতাগঞ্জের বিখ্যাত গুড় তৈরির অঞ্চল। কিন্তু তিন বছর মিলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সে অঞ্চল বানচাল হতে বসেছে। আখ মাড়াইয়ের 'ক্রাসার'গুলো মরচে ধরে কাত হয়ে আছে মাটিতে, দশমনী কড়াইগুলো উবুড় হয়ে আছে, রোদে জলে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। দাদন দিয়ে কতক জমির আখ কিনে নিয়েছে সুগার মিল, কতক জমির চাষারা আজকাল আর গুড় তৈরির পরিশ্রম করতে চায় না, বেশি দামে কোম্পানিকে আখ বেচে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। তা ছাড়া যারা মজুর হয়ে ঢুকেছে তাদের তো কথাই নেই। মিল থেকে মুঠো ভরে মাইনে পায় তারা, জীবনযুদ্ধের প্রশ্নটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

বাইরের দিকে কুন্তলার কৌতূহলী দৃষ্টি লক্ষ্য করলে ভাস্কর। বললে, গাড়ি থামাব ? মাঠে একটু বেড়াবে মিস রায় ?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুন্তলা বললে, দশটা কিন্তু বাজে।

—বাজুক না।—মোটরের ব্রেক কষলে ভাস্কর : সময় মূল্যবান মিস্‌ রায়, কিন্তু সেটা মিলে—এখানে নয়।

নিরুত্তরে হাসলে কুন্তলা। তেমনি ছোট, আর সংক্ষিপ্ত একটুকরো হাসি।

মোটর থামিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলল দুজনে। বাংলার চিরন্তন পল্লী। পচা ডোবা, জংলা আমের বন, দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের নখরাঙ্ক। আট মাইল দূরে সীতাগঞ্জ সুগার মিলের ঐশ্বর্যের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যটা অতি বেশি প্রকটিত। হাড় বের করা বলদ চলেছে ধুঁকতে ধুঁকতে। আশ্বিনের আবির্ভাবে শরৎলক্ষ্মী এসে আসন পাতেননি, ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে ম্যালেরিয়া। ভাঙা ঘরের বারান্দায় দড়ির খাটিয়াতে একটা লোক ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল।

এই কি সেই বাঙলা, ট্যাগোরের দেশ? এখানেই কি সবুজ ধানের ক্ষেতে কৃষ্ণকলির দেখা মিলবে? মুখ দিয়ে ভাবনার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল ভাস্করের: ইজ দিস্ বেঙ্গল?

ভাস্করের গলার অবজ্ঞার সুরটা তীরের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধল কুন্তলার কানে। চোখের তারা দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। স্পষ্ট মৃদুস্বরে জবাব দিলে, নো, দিস্ ইজ স্টার্ভিং বেঙ্গল।

ভাস্কর চমকে তাকাল কুন্তলার মুখের দিকে। এ তার টাইপিস্ট সেক্রেটারী কুন্তলার কথা নয়। জালালাবাদ পাহাড়ে যাদের অস্ত্রে আগুন জ্বলেছিল, এর মধ্যে কোথায় যেন তার স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়।

কুন্তলা সুমিষ্ট কণ্ঠে ডাকলে, মিস্টার নটরাজন্?

ভাস্কর আবার চমকে উঠল।

—সত্যিই আমরা আজ থেকে বন্ধু তো?

—নিশ্চয়, তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

—তা হলে বন্ধুর অনুরোধ রাখো। এই দরিদ্র বাঙ্গলা দেশকে যারা লুঠ করে নিচ্ছে তাদের হাত থেকে একে বাঁচাও তুমি।

স্থির হয়ে দাঁড়াল ভাস্কর। সমস্ত চেতনা মুহূর্তে মুখর আর চকিত হয়ে উঠেছে। কুন্তলার চোখ দুটি যেন সম্মোহিত করবার ভঙ্গিতে তার ওপর আবদ্ধ হয়ে আছে। সে চোখে আলো-ছায়ার মতো খেলা করে যাচ্ছে বিপ্লবী নায়িকার অগ্নিদীপ্তি আর কাঁপন-লাগা ঝাউবনের মাথায় শুকতারার স্নিগ্ধ আলোর ছটা।

মুগ্ধের মতো ভাস্কর বললে, আচ্ছা।

তারপর খানিকটা নীরবতা। পথ-চলতি গাঁয়ের লোক সভয়ে সেলাম করলে দুজনকে। মুরুব্বিগোছের যারা বড় সাহেবকে চিনত, সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। কিন্তু ভাস্করের কানের কাছে ক্রমাগত বাজতে লাগল বন্ধুর অনুরোধ। কুন্তলা একদিন তার কাছে আসবে হয়তো, কিন্তু তার সূচনাতেই যে প্রতিশ্রুতি তাকে দিতে হল, এ কি শুধু কথার কথাই? অথবা এর দাবি বেড়ে চলবে, বেড়েই চলবে, তারপর চরম মুহূর্ত যখন আসবে

তখন সে পূর্ণ মূল্যের পরিমাণটা দাঁড়াবে কতখানি? কুন্তলার কালো চোখে যে ছায়া আর আগুন সে দেখেছে তার কোনোটাই তো মিথ্যে হওয়ার কারণ নেই।

ফিরবার পথে আকস্মিকভাবে কুন্তলার একখানি হাত তার হাত স্পর্শ করতে ভাস্কর মুঠো করে আঁকড়ে ধরলে শুভ্র নরম আঙুলগুলো। কুন্তলা বাধা দিলে না, একটি কথা কইলে না, শিউরে উঠল না একবারও। শুধু কয়েক সেকেণ্ড পরে নিঃশব্দে হাতখানা সরিয়ে এনে শান্ত গলায় বললে, এখন নয়।

দিনের পর দিন। ভাস্কর আবিষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কুন্তলার মন তার প্রতি আর বিমুখ নয় এখন, এ সত্যটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে তার কাছে। কাজের অবসরে দু-চারটে বাজে কথা বললে কোনো প্রতিবাদ আসে না, বরং মাঝে মাঝে জবাব পাওয়া যায়। কোনো একটা ঘনীভূত অবকাশে হাতখানা নিজের কাছে নিয়ে এলে সরিয়ে নেয় না, বরং উষ্ণ কোমল স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঘাম জমে উঠতে থাকে। আর অন্ধবিদ্ বিজ্ঞানী ভাস্কর ক্রমেই মুখর হয়ে উঠছে, আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করছে ভালো করে কথা বলবার ক্ষমতা। দরকার হলে আগেই আস্তিন গুটিয়ে মেসিনের কাজে লেগে যেত, তিন দিন দাড়ি না কামালেও তার খেয়াল থাকত না। কিন্তু আজকাল ভাস্কর নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে পরিপূর্ণভাবে। প্রসাধন, জামা-কাপড়ের ক্রাজ, সব কিছু সম্পর্কেই সে পুরোপুরি সজাগ।

কাজ করতে করতে ভাস্কর আড়চোখে লক্ষ্য করছিল কুন্তলাকে। সুঠাম আঙুলগুলো যেন খেলা করে যাচ্ছে টাইপরাইটারের চাবিগুলোর ওপরে। গালে কপালে ছড়িয়ে আছে অলকগুচ্ছ। লাল টকটকে রঙের শাড়ি পরেছে একখানা, তার তীব্রতা যেন চোখকে আঘাত করে। কালো পাড়টা গায়ের ওপর দিয়ে সরীসৃপের মতো পড়ে আছে।

—মে আই কাম ইন স্যার্?

এমন মুহূর্তটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। জেনারেল ম্যানেজার ভাস্কর উঠল জেগে।

—কাম ইন।

ঘরে ঢুকল কেমিস্ট কান্তি সান্যাল। কুঞ্চন দেখা দিল ভাস্করের মুখে। এই লোকটাকে দু চোখে দেখতে পারে না সে। ভাস্করের কী একটা মন্তব্যে ভুল ধরেছিল একবার। সেই থেকেই কান্তির প্রতি তার একটা বিদ্বেষ ধূমায়িত হচ্ছে প্রত্যেক দিন। তা ছাড়া সব চাইতে আপত্তিকর এই যে কী একটা পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে কুন্তলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। দুজনে একসঙ্গে চা খায় মাঝে মাঝে, পড়াশুনো করে। তীব্র ঈর্ষার প্রেরণায় ভাস্কর ছিদ্র খুঁজছে কান্তির। কিন্তু কান্তি অত্যন্ত কাজের লোক, সরানো সহজ নয় তাকে।

কান্তির মুখে আধ-বোজা চোখ রেখে প্রশ্ন করলে, কী চাই আপনার?

—একটা নিবেদন আছে।

—বলুন। সংক্ষেপে সারতে হবে, আমার সময় কম।

—সংক্ষেপেই বলছি—ভাস্করের টেবিলটা ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল কান্তি সান্যাল। বললে, অত্যন্ত অবিচার হচ্ছে। আপনাকে ব্যবস্থা করতে হবে।

—আমি আপনার ডিক্টেশন চাচ্ছি না—ভাস্করের স্বরে উষ্ণতা প্রকাশ পেল : আপনি শুধু রিপোর্ট করতে পারেন।

—সে তো বটেই, ম্যানেজার আপনি!—কান্তি বিনীত হাসল : কথা হচ্ছে গ্রাম থেকে যারা আখ নিয়ে আসে, গাড়ির ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু গাড়ির ওজন বাদ দিতে গিয়ে তাদের আখের অর্ধেক ওজন বাদ দেওয়া হচ্ছে। এ গরীবের ওপর অত্যাচার।

টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে কুন্তলা তাকাল একবার। তারপর আবার মাথা নামিয়ে নিলে।

অন্যসময় হলে ভাস্কর হয়তো মন দিয়ে শুনত কথাটা, কিছু ব্যবস্থাও করত হয়তো। কিন্তু কান্তির কাছ থেকে কথাটা আসতেই সে অকারণে অধৈর্য হয়ে উঠল। দাঁতের কোণে চেপে ধরলে চুরুটটা। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, দ্যাট ইজ নট ইয়োর লুক-আউট। আপনি কেমিস্ট, ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে কিছু বলবার না থাকলে আপনি যেতে পারেন।

কান্তি সোজা হয়ে দাঁড়াল। পাঞ্জাবির আড়ালে প্রসারিত বুকখানা দেখাতে লাগল কঠিন একটা লোহার বর্মের মতো। স্থির গলায় বললে, আমার লুক-আউট না হতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

ভাস্কর পিঠ খাড়া করে বসল চেয়ারে। কঠিন খর্ব আঙুলগুলো শক্ত মুঠোয় একটা কাঁচের পেপার-ওয়েটকে আঁকড়ে ধরলে। বললে, সেজন্যে অন্য লোক আছে। তারা আমাকে জানাবে। আপনার অনধিকার-চর্চা করবার দরকার নেই।

—দরকার আছে বলেই বলছি। আপনার অন্য লোক সব 'করাপটেড', চুরির অংশীদার তারা।

আগ্নেয়শিলার মাটিতে পড়ল লোহার ঘা, জ্বলে উঠল আগুন। ভাস্কর রূঢ়স্বরে বললে, অত্যন্ত ইম্পার্টিনেন্স। আপনি চলে যেতে পারেন।

কান্তি একেবারে ঝুয়ে পড়ল ভাস্করের মুখের দিকে। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে জ্বলতে লাগল ক্ষুধার্ত বাঘের মতো : আমি আপনাকে ইন্‌সিস্ট করছি স্টেপ নেবার জন্যে। নইলে রেজাল্ট খারাপ হবে।

চেয়ার ছেড়ে ভাস্কর লাফিয়ে উঠল : ভয় দেখাচ্ছেন?

কান্তি এক পাও পিছিয়ে গেল না : যা মনে করেন।

—আই ডিসচার্জ ইউ। পনের দিনের নোটিশ দিলুম।

—থ্যাঙ্কস—বর্মা চটির শব্দ করে বেরিয়ে গেল কান্তি!

ভাস্কর বসল চেয়ারে। হাত-পা সমস্ত কাঁপছে। এই মিলের সে জেনারেল ম্যানেজার, তাকে ভয় দেখিয়ে যায় একজন কেমিস্ট! দ্রুত কম্পিত সে তৎক্ষণাৎ লিখলে কান্তির বিচ্যুতি-পত্র। বাকি পনেরো দিনের বেতনও কান্তি পাবে, ভাস্কর অবিবেচক নয়।

কুন্তলা নীরবে টাইপ করে চলেছে। চোখের সামনে এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল অথচ কোন কিছুর সঙ্গে যেন কিছুমাত্র সংযোগ নেই তার। তেমনি তার তনুদেহকে ঘিরে জ্বলছে লাল-শাড়ির দীপ্তি, তার গালে কপালে ছড়িয়ে আছে অলকগুচ্ছ, নাচের ভঙ্গীতে আঙুলগুলো খেলা করে যাচ্ছে টাইপরাইটারের চাবির ওপর।

রুদ্ধ কম্পিত স্বরে ভাস্কর বললে, মিস্ রায়?

—স্যার!

—এইটে টাইপ করে দাও এক্ষুনি।

লঘু চরণে কুন্তলা এগিয়ে এল। ভাস্করের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে মৃদুভাবে প্রশ্ন করলে, সত্যিই কি আপনি ডিসচার্জ করলেন ওঁকে?

—এর পরেও ডিসচার্জ করব না?

মুখের চুরুটটা ভাস্কর হিংস্রভাবে ছুঁড়ে ফেলল ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটার মধ্যেই: আমাকে ভয় দেখাতে আসে স্কাউণ্ড্রেল!

কুন্তলা নিরুত্তরে ফিরে গেল চেয়ারে। টাইপরাইটারের স্বর বাজতে লাগল একটানা। নিরাসক্ত আর নির্বিকার।

ফলাফলটা টের পাওয়া গেল পরের দিনই।

কান্তি সান্যাল কোন্ সুযোগে এতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কে বলবে। তাকে কাজে না নিলে স্ট্রাইক করবে মিলের অধিকাংশ—অবশ্য আখের দাম যারা চুরি করে তারা বাদে। গ্রাম থেকে আখ আর আসবে না। দিগন্তে নেমেছে যুদ্ধের ছায়া, ওয়াগন দুর্লভ, মোতিহারীর চালান প্রায় বন্ধ। গ্রামের লোকের ওপর অনেকখানি ভরসা, নইলে মিলের অর্ধেক কাজ আটকে পড়ে থাকবে।

খবর পেয়ে ভাস্কর জ্বলতে লাগলো মশালের মতো। স্ট্রাইক করবে! করুক না। সে-ও বন্ধ করে দেবে মিল। এক সপ্তাহ ভাতা না পেলেই সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে। আর গ্রামের লোক? সাতদিন আখ না কিনলে ক্ষিদের জ্বালায় এসে লুটিয়ে পড়বে, সেদিন কোনো কান্তি সান্যাল তাদের ভাতের থালা বেড়ে দেবে না। এমন ভাস্কর অনেক দেখেছে। তিন বছরের অনভ্যাসে গুড় জ্বাল দিতে ভুলে গেছে সীতাগঞ্জের লোক। তাদের দশমনী কড়াইগুলো ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে মাটিতে, ক্রাসারের চাকাগুলো আজ সহজে আর ঘুরবে না।

—মিস্টার নটরাজন্ ?

কুন্তলার গলার শব্দে চমকে উঠল ভাস্কর। পেছনের দরজা দিয়ে কখন ঘরে এসেছে। সেই লাল শাড়ি যেন নেশার মতো আচ্ছন্ন করে রয়েছে তাকে, তার প্রসাধন-উজ্জ্বল দেহটা যেন ডুব দিয়ে এসেছে লবণের সমুদ্রে। মিষ্টি গন্ধের একটা তরঙ্গ এসে ভাস্করের স্নায়ুকে যেন চকিত করে দিলে।

—এসো, এসো মিস্ রায়। বোসো এখানে।

কুন্তলা এসে বসল সোফাতে। বেশবাস আর রূপসজ্জায় দেখাচ্ছে তাকে মায়াবিনীর মতো। কালো চোখ দুটিতে অলিওার্সের নন্দিনীর স্বপ্নাভাস। এখন তার কাজের সময় নয়, তবু অসময়ে এসে দেখা দিয়েছে ভাস্করের প্রাইভেট চেম্বারে।

—তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন মিস্টার নটরাজন্! শরীর কি ভালো নেই ? —কুন্তলার স্বরে যেন মধু উপচে পড়ল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভাস্কর এগিয়ে এসে বসলো কুন্তলার পাশে।

—মিলের খবর তো শুনেছ। স্ট্রাইক করবে ওরা।

—স্ট্রাইক করবে ?—অত্যন্ত মধুরভাবে হাসল কুন্তলা : করুক না। তোমার মতো ম্যানেজার যখন আছে, তখন আর ভাবনা কি।

মুহূর্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল ভাস্করের মন। লোলুপ দৃষ্টি আশ্রয় খুঁজতে লাগল কুন্তলার মুখের ওপর : তুমি আমাকে সাহায্য করবে মিস্ রায় ?

—নিশ্চয় করব, কেন করব না! উই আর ফ্রেণ্ডস্। মোর দ্যান দ্যাট।

—মোর দ্যান দ্যাট!—ভাস্করের কাছে চকিতে মিথ্যে হয়ে গেল এই ফ্যাক্টরি, এই বিভ্রাট, কান্তি সান্যালের যা কিছু ধৃষ্টতা। রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিলে, মোর দ্যান দ্যাট ?

কুন্তলার গালের লালিমা আরো ঘন হয়ে উঠেছে। নীলার মতো জ্বলছে নীল চোখ, সে চোখে সমস্ত না-বলা কথাই অত্যন্ত স্পষ্ট আর প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কম্পিত আঙুলে ভাস্করের প্রসারিত বাহুতে মৃদু আঘাত দিয়ে বললে, বড্ড মাথা ধরেছে আমার। আমাকে একটা রাইড দেবে তুমি ?

শিরায় শিরায় রক্তের কলধ্বনি বেজে উঠল জোয়ারের জলের মতো। উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়তে লাগল দ্রুত। ভাস্কর মুখখানাকে আরো ঝুঁকিয়ে দিলে কুন্তলার দিকে : রাইড নিশ্চয় দেব, কিন্তু তুমি—

চকিতে নিজের মুখ সরিয়ে নিলে কুন্তলা। বললে, একটু পরে। রাইড থেকে ফিরবার পরে।

উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে সংযত করে নিলে ভাস্কর। বললে, বেশ, তাই চলো।

মোটর পথের ধারে রেখে দুজনে এগিয়ে চলল আলোর পথ দিয়ে। ধানের জমি শেষ

হয়েই খানিকটা জংলা মাঠ, এখানে-ওখানে ফুটেছে বনগোলাপ, লজ্জাবতীর বেগুনে রঙে আকীর্ণ হয়ে আছে মাটি। ছোট জলার ওপারে কাশের বন যেন আয়নায় মুখ দেখছে। বিকালের পড়ন্ত আলোয় ধূসর রঙের দুটো খরগোস কান খাড়া করে পালিয়ে গেল সুমুখ দিয়ে। উঁচু উঁচু টিবির ওপর ঘন শ্যামল ঘাসের মখমল বিছানো।

ভাস্কর বললে, এসো, বসা যাক।

দুজনে বসল একটা টিবির ওপর। পথচলতি কুন্তলা কোন্ সময় একটা বনগোলাপ তুলে নিয়ে পরেছে খোঁপায়। বাতাসে ভাসছিল তার লঘু সুরভি। গেরুয়া রঙের রোদে অপরূপ দেখাচ্ছে মুখখানা, লাল শাড়িটা জ্বলছে যেন একপাত্র বিলিতী মদ। চাঁপা ফুলের মতো হাতখানা কোলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে সুকুমার নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।

ভাস্কর কুন্তলার কাছে অত্যন্ত ঘন হয়ে বসল। সমস্ত মাঠটা বিস্ময়করভাবে নির্জন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। একদিকে আকাশটা রক্তে মাখা, অন্যদিকে গাছপালাগুলো সব কালো হয়ে আসছে—সমষ্টিভূত, অবয়বহীন ক্যামেরার সিলুয়েত ছবির মতন।

—মিস্ রায় ?

কুন্তলা কোনো উত্তর দিল না। শুধু প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখে তাকাল ভাস্করের মুখের দিকে। সে চোখে শরতের আকাশের নির্মল নীলিমা, বিকসিত শাপলা-শালুকের প্রসন্নতা। কৃষ্ণকলি আর নন্দিনী একাকার হয়ে গেল।

ওরা যখন মোটরে ফিরে এল, তখন রাত হয়েছে সামান্য। দিগন্তে দেখা দিয়েছে চাঁদের ফালি, বনগোলাপের মৃদু গন্ধ রাত্রির হাওয়ায় শরীরী হয়ে উঠেছে। জলার জলে জ্বলছে মাণিক। ভাস্করের সমস্ত চেতনা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রক্তের চাঞ্চল্য গেছে থেমে, কিন্তু শরীরের প্রান্তে প্রান্তে তখনো সেতারের মীড়ের মতো স্পন্দন বাজছে। কুন্তলা তার শেষ গানটার একটা কলি গুঞ্জন করছে তখনো : এঁকে যাব আমার গানের আলপনা—

মোটরটা চলেছে আস্তে আস্তে। এই রাত্রি, এই গান—প্রাণহীন যন্ত্রটাকেও যেন নিশি পেয়েছে।

সামনে সীতাগঞ্জের সুগার' মিল। ইলেক্‌ট্রিক আলো ঝলমল করছে। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বনগোলাপের গন্ধচঞ্চল আরণ্য পৃথিবী—মোহ জাগানো বনজ্যোৎস্না। ভাস্কর সরে বসল কুন্তলার পাশ থেকে।

বাজারটা পেরোতেই কুলি বস্তি। তার সামনে এসেই আটকে গেল মোটরটা। পথ বন্ধ। প্রকাণ্ড জনতা সামনেটা আটকে রয়েছে, সভা করছে। অসহিষ্ণু ভাস্কর হর্ন বাজাল।

কিন্তু লোকগুলো সরে গেল না, বরং হর্নের শব্দে তারা যেন উত্তাল হয়ে উঠল। একটা

কলরব ছড়িয়ে গেল চারদিকে : ম্যানেজার !

মুহূর্তে প্রায় পঞ্চাশজন লোক ঘিরে ধরল মোটরটাকে।

—হুজুর, বিচার চাই।

ঘা-খাওয়া সাপের মতো ফণা তুলল ভাস্কর। আচ্ছন্ন আঙুলগুলো চমকে উঠে নিষ্ঠুর ভাবে পড়ল স্টিয়ারিংয়ের লোহার ওপর : কিসের বিচার ?

—কান্তিবাবুকে আবার বাহাল করতে হবে। চাষীদের যারা ঠকায়, তাদের শাস্তি দিতে হবে।

জেনারেল ম্যানেজার শিখায়িত হয়ে উঠল। তীব্র কণ্ঠে কী একটা বলবার উপক্রম করতেই চমকে তাকাল পাশে কুন্তলার দিকে। কুন্তলা তাকে স্পর্শ করেছে।

দুজনের দৃষ্টি মিলল। কুন্তলার চোখে আলোছায়া খেলা করছে। চোখের তারা দুটো জ্বলছে নীলার মতো। কুন্তলা মধুর অলস গলায় বললে, আজকের সন্ধ্যাটাকে নষ্ট করে দিতে চাও তুমি ?

কী বলতে যাচ্ছিল, কী বলা উচিত, ভাস্করের মন থেকে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল তা। সম্মোহিতের মতো বললে, কী করব ?

—ওদের বলে দাও, কান্তিবাবুকে আবার কাজে নেবে তুমি। ওদের ওপর সুবিচার করবে।

তীব্র সংঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল মন। পরাজয় ! শেষকালে পরাজয় স্বীকার করতে হবে তাকে ! কিন্তু—কিন্তু কুন্তলার চোখ তখনো তার ওপরে স্থির হয়ে আছে। নিষ্পলক নীলার মতো উজ্জ্বল আর শাণিত।

মন্ত্রমুগ্ধ ভাস্কর প্রতিধ্বনি করে গেল : বেশ, কান্তিবাবুকে আবার কাজে নেব আমি। সকলেরই সুবিচার হবে।

আকাশ কাঁপিয়ে উঠল কোলাহল, উঠল জয়ধ্বনি। কিন্তু জয়ধ্বনি ভাস্করের নয়, কান্তির।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে ভাস্কর আবার মোটরে স্টার্ট দিলে। সামনে মিল। লোহায় লক্কড়ে যন্ত্রপাতিতে বিরাট এবং তর্কাতীত বাস্তবতা। পোড়া ক্রুড অয়েলের কড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কিন্তু এ কী করে বসল ভাস্কর ! এই যে দুর্বলতার প্রশ্রয় সে আজ দিল এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ! জনতার দাবি—সে দাবি তো হাতের মুঠোর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না। সে দাবি বেড়ে চলবে, বেড়েই চলবে। তারপর ত্রিপাদ বামনের মতো একদিন—

কুন্তলার প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল। দিস্ ইজ স্টার্ভিং বেঙ্গল—

তবে? তবে? ভাস্কর যেন বিদ্যুতের চমক খেল একটা। তবে কুন্তলা কি?—কিন্তু সংশয়টা স্পষ্ট রূপ নিতে গিয়েই আবার পরক্ষণে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেল। কুন্তলার নীলার মতো চোখ দুটো তখনো মোহিনী মায়ায় জ্বলছে। এই চোখ, এমনি চোখ আর একবার কোথায় দেখেছিল ভাস্কর? হাঁ—তার নিজের দেশেই, মাদুরা অঞ্চলের এক নটরাজের মন্দিরে। নটরাজের তৃতীয় নেত্রে এমনি একখণ্ড হীরা জ্বলছে, উজ্জ্বল, অপরূপ। কিন্তু সে হীরায় তীব্র বিষ সঞ্চারিত, স্পর্শ করলেই অপমৃত্যু।

প্রদীপ ও প্রজাপতি

গল্প লেখবার চেষ্টা করছিলাম।

সামনে ক্যাণ্ডল-স্ট্যাণ্ড থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মোম গ'লে পড়ছে নিচের প্লেটটার ওপর—মোমবাতির ঋজু দীর্ঘ দেহটা অতি ধীরে ধীরে হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে আসছে। বাইরে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি, সামনে বরেন্দ্রভূমি বা বারিন্দার প্রসারিত ধানের ক্ষেত—গরুর গাড়ির কঠিন চাকায় ক্ষত-বিক্ষত বর্ষা-পঙ্কিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা হাঁসমারির খাঁড়ির ওপারে জ্যোৎস্নার কুয়াশায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, দৃষ্টির অতীত ওই জ্যোৎস্নাময় পৃথিবীটা যেন এখানকার মত মৃৎপিণ্ডে তৈরি নয়, ওখানকার ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ বায়বীয়। যেন জ্বলন্ত নীহারিকার অবয়বহীন খানিকটা বাষ্পরূপ রাত্রির আকাশের তলা দিয়ে এক ঝাঁক সরালি হাঁস শীতলীর দীঘির দিকে চ'লে গেল, নিদ্রিত আকাশের তলায় বহুক্ষণ ধ'রে বাজতে লাগল অপস্রিয়মাণ পক্ষধ্বনির একটা দ্রুত তরঙ্গ।

এলোমেলো মুখ—টুকরো টুকরো ছবি। আধুনিক কবিতার মতো অচেতন সত্তা থেকে ভিড় ক'রে আসছে অসংলগ্ন চিন্তাধারা। 'সিলুট' ছবির মতো পলকে পলকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে ছায়াময় পরিচিত অপরিচিত অসংখ্য পটভূমিকা। কোনটাই স্পষ্ট ক'রে ধরা দেয় না, অগণিত সূচনার খণ্ড সুরগুলো সমষ্টিগত একটা ঐকতানের মধ্যে বার বার হারিয়ে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর কলমটা নামিয়ে রেখে, তারই একটা সূত্র ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

হঠাৎ বাইরে থেকে কি একটা পতঙ্গ উড়ে এল, ফরফর ক'রে পরিক্রমণ করতে লাগল মোমবাতির নীলাভ শুভ্র শিখাটাকে। তাকিয়ে দেখলাম, রাতচরা একটা বড় আকারের প্রজাপতি। বর্ণ-গৌরবে খুব চমৎকার নয়, অন্তত কবি-কল্পনাকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু নিরাভরণ এই অসুন্দর প্রজাপতিটার দিকে তাকিয়ে চকিতে একটা কাহিনী মনে প'ড়ে গেল। সত্যিকারের কাহিনী। অনাগত অস্বচ্ছ গল্পগুলোর ভিড় ঠেলে মনশ্চক্ষের সামনে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সত্তা নিয়ে উড়তে লাগল অনাহূত এই প্রজাপতিটার মতই!

ছুটিতে দেশে আসতে হয়েছিল।

দু-চার দিনের জন্য গ্রাম আমার মন্দ লাগে না। কখনও কখনও অলস-কল্পনার মুহূর্তে দস্তুরমত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি, উচ্ছল নাগরিকতার বাইরে পলাতক জীবন যাপন করবার স্পৃহা জাগে। ছেলেবেলায় সোনা-পিসীমাদের বাড়ি এদিক দিয়ে আমার আদর্শস্থল ছিল।

গ্রামের দক্ষিণ দিয়ে ছোট একটি খাল ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে এঁকেবেঁকে একেবারে সাহেবের চর স্টীমার-ঘাটের নিচে আড়িয়লখাঁয় গিয়ে নেমেছে। সেই খালের ওপরে নড়বড়ে বাঁশের চার বা সাঁকো পার হলেই সোনা-পিসীমার বাড়ি। ভাঁট ফুলের এলোমেলো জঙ্গল ছাড়িয়ে সুপুরির বাগান, ঘন ছায়ার তলা দিয়ে স্যাঁতসেঁতে কালো মাটির ভিজে পথ পায়ের দাগে দাগে চিহ্নিত হয়ে এগিয়ে গেছে মুখুজ্জে-বাড়ি পর্যন্ত। পথের আশে-পাশে চার-পাঁচটি মঠ বা চিতা, মুখুজ্জে-বাড়ির লোকান্তরিত প্রাক্-পুরুষদের স্মরণচিহ্ন। আমাদের পূর্ব-বাংলার গ্রামে প্রায়ই কোন নির্দিষ্ট শ্মশানভূমি থাকে না, নিজেদের জমির এলাকাতেই শবদাহ করবার নিয়ম।

সোনা-পিসীমারা এককালে খুব অবস্থাপন্ন ছিলেন। কিন্তু মামলা-মকদ্দমায় এবং ভূত-পূর্ব মুখুজ্জেদের আনুষঙ্গিক দোষে সে অবস্থায় ভাঁটা পড়েছে এখন। দোল-দুর্গোৎসব আজও হয়, কিন্তু এখন সে সব নিছক পূর্বপুরুষদের ক্রিয়াকাণ্ড রক্ষা করা মাত্র। চণ্ডী-মণ্ডপের অবস্থা জরাজীর্ণ, আগাগোড়াই হোগলার বেড়া বেঁধে দিতে হয়েছে। একবার বৈশাখের ঝড়ে নাটমন্দির উপড়ে পড়েছিল, তারপরেই রাতারাতি টিনগুলো যে কোথায় চালান হয়ে গেল, আজও তার হদিস মেলেনি। দোলমঞ্চটায় অসংখ্য ফাটল, বিষধর সাপের আস্তানা। তিন বছর থেকে দুর্গাপূজায় আর প্রতিমা তৈরি করা হয় না, ঘটের মাথায় ফুল-জল দিয়েই দেবীকে আহ্বান করা হয়। পিতৃপিতামহের ধারা, তাই একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া চলে না।

একেবারে অসচ্ছল অবস্থা এখনও বলা যায় না। তালুক থেকে সম্বৎসরের ধান চাল আসে, ছোট্ট সংসারটি চ'লে যায় অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং পরিপাটি ভাবে। আর সোনা-পিসীমার হাতের চিঁড়ের মোয়া সারা গ্রামে সুবিখ্যাত, আমার পক্ষে সেটাও একটা দুর্বার আকর্ষণ।

বাগান পেরিয়ে বাড়ির ভেতর পা দিতেই টুনু-বউদির সঙ্গে সর্বপ্রথম দেখা হয়ে গেল। উঠোনের একপাশে ছোট চালার নিচে ঢেঁকি বসানো। টুনু-বউদি চিঁড়েই কুটছিলেন বোধ করি। নোলক-পরা ছোট একটি প্রতিবেশিনী মেয়ে ঢেঁকির সামনে বসেছিল, নতুন মানুষ দেখে সে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাছকোমরটা খুলে নিয়ে ঘোমটার মতো ক'রে মাথায় তুলে দিলেন টুনু-বউদি। তারপর আমার দিকে একরকম ছুটে এলেন বললেই হয়। অ্যাঁ, রঞ্জন-ঠাকুরপো যে! গরিবের বাড়িতে পথ ভুলেই এলেন নাকি?

টুনু-বউদি সেই জাতের মানুষ, যার কেবলমাত্র উপস্থিতিটাই অকারণ প্রসন্নতায় মনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। স্বাস্থ্যপুষ্ট শ্যামল মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল, কপালে আর সীমন্তে সিঁদুরের রক্তরাগ। রুক্ষ চুলের নিচে প্রশস্ত ললাটের প্রান্তে প্রান্তে মুক্তাচূর্ণের মতো ঘামের বিন্দু জমে উঠেছিল।

বললাম, সত্যি, ক'দিন সময় পাইনি। তারপর সবাই ভাল তো?

টুনু-বউদির মুখের ওপর কেমন একটা ছায়া পড়ল। বললেন, না ভাই, ভাল আর কোথায়? মাকে নিয়েই বড্ড অশান্তিতে আছি।

—মাকে নিয়ে? পিসীমা? তাঁর আবার কি হয়েছে?

—ওঃ, আপনি জানেন না বুঝি?

বউদির চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল। বললেন, গত বছর কার্তিক মাসে খুব বেশি অসুখ হয়েছিল, কোন আশাই ছিল না। সেরে উঠেছেন, কিন্তু ডান দিকের সব অঙ্গগুলো একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। বয়স তো আর কম হল না। ঘরে চলুন না, দেখবেন।

ঘরে ঢুকতেই মুহূর্তে মনটা আড়ষ্ট এবং সংকুচিত হয়ে উঠল। সোনা-পিসীমাকে এ অবস্থায় দেখবার কল্পনা কোনদিন করতে পারিনি। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের সূর্য তার রক্তরশ্মি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, তারই খানিকটা অত্যন্ত করুণ হয়ে পিসীমার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। মুখখানা বাঁ দিকে অদ্ভুত রকমে বড়শির মতো বেঁকে এসেছে, ডান চোখটা ভীতিকরভাবে বিস্ফারিত, যেন তলার থেকে আর একটু ধাক্কা লাগলেই কোটর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। ঘরময় অস্বাস্থ্যকর একটা গন্ধ। যে অংশটায় আলো পড়েনি, সেখানে অস্বচ্ছ খানিকটা ছায়া জমাট বেঁধে রয়েছে অন্ধকারের মতো। কাঠের একটা বেঁটে টিপয়ের ওপর কতগুলি কবিরাজী শিশিপত্র, একটা সাদা কানা-ভাঙা চীনা-মাটির পাত্রে মলমজাতীয় খানিকটা সবুজ জিনিস। ঠিক বিছানার ওপরেই অপরিচ্ছন্ন একটা পিতলের পিকদানি। সবটা মিলিয়ে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর অতি প্রত্যক্ষ বিষনিঃশ্বাস যেন আমি অনুভব করলাম।

বউদি বললেন, মা, রঞ্জন-ঠাকুরপো এসেছেন।

পিসীমা উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর বাঁ চোখটা পরিচিত স্নেহ-কোমলতায় করুণ আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বললেন, কে, রঞ্জন? কতদিন পরে এলি বাবা! ভাল আছিস তো?

বললাম, ভালই আছি পিসীমা।

—বেঁচে থাক বাবা, রাজরাজ্যেশ্বর হয়ে থাক। বঙ্কুর কাছে শুনেছিলাম, বি. এ. পাস করেছিস তুই। শুনে কত যে খুশি হয়েছি, কি বলব। তা চাকরি-বাকরি কিছু কি জুটল?

—আপাতত কলকাতায় এম. এ. পড়ছি পিসীমা।

—কলকাতা? মুহূর্তে সোনা-পিসীমার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। জানলার ফাঁক দিয়ে বিকালের যে সোনালী আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই আলোতে তাঁকে অনেকখানি স্বতন্ত্র বলে মনে হল।

সোনা-পিসীমা যেন অনেকটা স্বগতোক্তি করলেন, বঙ্কুর ইচ্ছে বউমাকে কলকাতা নিয়ে যায়। মেসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে আপিস করতে ওর বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। আর আমি তো পাঠিয়েই দোব ভেবেছিলাম, কিন্তু অসুখে প'ড়েই—

টুনু-বউদি বাধা দিলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওসব কথা থাকুক মা। মালিশের তেলটা এনে দোব? কবিরাজমশাই তো বিকেলবেলাই মালিশ করতে বলে গেছেন।

সোনা-পিসীমা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাঁকা মুখখানার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হতে লাগল। মনে হ'ল, আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই কি একটা অলক্ষ্য বস্তুর হস্তস্পর্শ—এদের দুজনের মাঝখানে কোথায় বিচ্ছেদের একটা সূক্ষ্ম রেশমী যবনিকা দুলছে। কেউ যেন কারও কাছে স্পষ্ট করে ধরা দিতে চায় না। পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক পরিচয়ের আড়ালে অভিমান আর অবিশ্বাসের একটা ছায়ামূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে সোনা-পিসীমা বললেন, মালিশ একটু পরে করলেও চলবে। বিজয়ার পরে বঙ্কন এসেছে বউমা, দুটি চিঁড়ে মুড়কি দাও ওকে। যা বাবা, বাইরে বোস গিয়ে। রুগীর ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।

রোদের সোনালী রঙ ফিকে আর কালচে হয়ে আসছে। সোনা-পিসীমার বাঁ চোখটা বুজে এল, ডান চোখ তখনও অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। তাঁর ম্লান মুখের ওপর ছায়া ছড়াতে লাগল—ক্ষীয়মাণ পঙ্গু জীবন আর আভাসিত পাণ্ডুর মৃত্যু।

টুনু-বউদি বললেন, চলুন ঠাকুরপো, বাইরে চলুন। বেশি কথা কইলেই ওঁর অস্বস্তি বাড়ে।

দাওয়ায় একখানা হোগলা পেতে দিয়ে টুনু-বউদি আমার জন্যে এক থালা মোয়া আর নারকেলের সন্দেশ এনে হাজির করলেন।

অন্যমনস্কভাবে খেয়ে চলেছিলাম। ফাটল-ধরা দোলমঞ্চ আর জীর্ণ চণ্ডীমণ্ডপটার দিকে তাকিয়ে নানা অর্থহীন চিন্তা মনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাশেই চাটুজ্জেদের পোড়ো ভিটেতে একবুক জঙ্গল। আজ প্রায় বিশ বছর হতে চলল, কলকাতায় গিয়ে বাস্তু বেঁধেছে তারা। ভাঙাচুরো ভিটেগুলির ওপর উইয়ে-ধরা দুটো-একটা শালের খুঁটি, পচা বাঁশের টুকরো, ভাঙা মরচে-পড়া দু-একখানা টিন। গ্রামের লোকে দরজা-জানলা, কাঠ-বাশ যথা-সম্ভব সরিয়েছে, সাপের ভয়ে এখন আর এদিকে কেউ পা বাড়ায় না। একেবারে খালের পাশেই বহুকালের পুরনো যে হিজলগাছটা চারপাশে বুড়ির মতো জটা নামিয়ে দিয়েছে, তার

তলায় স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে যে শ্যাওলা-পড়া লম্বা বেদী, ওইটেই ছিল চাটুজ্জেদের কালী-খোলা। গভীর রাত্রে খাল দিয়ে চলবার সময় 'কেরায়া' নৌকোর মাঝিরা ওখানে নাকি অসম্ভব মূর্তি দেখতে পায়, শুনতে পায় অমানুষিক কান্না!

হঠাৎ চমক ভাঙল। আঁচলের কোণটা হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে টুনু-বউদি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, আপনি তো কলকাতায় থাকেন ঠাকুরপো, ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

বললাম, কে, বঙ্কুদা? হ্যাঁ, অনেক দিন আগে একবার পথে দেখা হয়েছিল বটে।

টুনু-বউদি অন্যমনস্কভাবে বললেন, এবার পূজোর সময় দেশে এসেছিলেন। বললেন, শরীরটা আদৌ ভাল যাচ্ছে না। মেসের খেয়ে দশটা-পাঁচটা আপিস করা, বুঝতেই তো পারেন।

না বোঝবার কথা নয়। বললাম, কলকাতায় বাসা করতে চান বুঝি?

—তাই তো বলছিলেন। কিন্তু মা'র এই অবস্থা, এখন ওঁকে ফেলে আর—

বললাম, তা ওঁকেও নিয়ে গেলে হয় না?

অপ্রসন্ন মুখে টুনু-বউদি চুপ ক'রে রইলেন। নীরবতার অর্থটা অত্যন্ত পরিষ্কার। মৃত্যু যেখানে অনিবার্য অথচ অকারণ বিলম্বিত, সেক্ষেত্রে নিষ্ফল সহানুভূতির বোঝা টানতে টানতে মানুষের ক্লান্তি আসবেই। শুশ্রূষায় তিক্ততা, সেবায় বিরক্তি।

বললেন, অঢেল খরচা, তা ছাড়া নাড়াচাড়া করতেও হাঙ্গামা আছে বিস্তর। আর একটা কথা কি, জানেন? মা কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে যাবেন না, যেতেও দিতে চান না। ওঁর ধারণা, ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল-পাকড়—এর চাইতে সুখ নাকি কোথাও নেই।

—তা এমন মন্দ কি?

টুনু-বউদির চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললেন, মন্দ কি? আপনিও তাই বললেন? মাছ-তরকারির সুখটা কি এতই বড় হ'ল? শরিকী হাঙ্গামা, চোরের উপদ্রব, দিনরাত একজনের জন্যে দুশ্চিন্তা।—আচ্ছা, আপনিই বলুন তো ঠাকুরপো, এতে লাভটা কি?

দৃষ্টির ভেতর দিয়ে টুনু-বউদির মনটা বেরিয়ে আসছিল। সায় দিয়ে বললাম, না, লাভ নেই।

বউদি আবার নীরব হয়ে রইলেন। সমস্ত উঠোনটার ওপর দিয়ে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানিমা। বাড়িটা বিচিত্রভাবে নির্জন, কেবল ঘরের ভেতর সোনা-পিসীমার কাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। বললাম, অন্ধকার হয়ে এল বউদি, এবারে চলি। যাওয়ার আগে আর একদিন আসব।

—বসুন না, তাড়া কিসের? আচ্ছা ঠাকুরপো, যদি সত্যিই এমন হয়, মানে—। একবার

দ্বিধা ক'রে বউদি বললেন, মানে, কলকাতায় যদি আমাদের বাসা হয়, তা হ'লে খোঁজখবর নেবেন তো ?

—বাঃ, নোব না !

টুনু-বউদির কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে স্বপ্নাতুর হয়ে আসছিল। সামনে সুপুরি-বাগানের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ভাবতে বেশ লাগে ঠাকুরপো, ছোট্ট একটি বাসা ক'রে আছি দুজনে। ছিমছাম গুছনো একটি সংসার। সন্ধ্যেবেলা উনি আপিস থেকে ফিরলে কড়ায় ক'রে খানকয়েক লুচি ভেজে দোব, চা ক'রে দোব। ছুটির দিনে দুজনে যাব আলিপুরের চিঁড়িয়াখানায়, কোনো দিন যাবো বায়োস্কোপ দেখতে। টকি আমার খুব ভাল লাগে ঠাকুরপো। মামার বাড়িতে থাকবার সময় দু-একবার দেখেছিলাম, তারপরে আর হয়নি।

—বেশ তো, কলকাতায় গেলে প্রাণ ভরে টকি দেখবেন।

—আর থিয়েটার ! ওঁর কোন্ এক বন্ধু নাকি থিয়েটারের পাস দেয় ওঁকে। ইচ্ছে করলেই উনি বিনা পয়সায় থিয়েটার দেখতে পারেন।

টুনু-বউদির বলবার আরও অনেক ছিল, কিন্তু আমার আর বসবার সময় ছিল না। দু-চার কথার পরে আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টুনু-বউদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কেবল অন্ধকার বাগানের পথ দিয়ে আসবার সময় সোনা-পিসীমার কাসির শব্দটা তীরের মতো এসে আমার কানে বিঁধতে লাগল।

আর কিছুদিন পরে খবর পেয়েছিলাম, সোনা-পিসীমা মারা গেছেন।

কাহিনীটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু প্রায় তিন বৎসর বাদে একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল বঙ্কুদার সঙ্গে।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে প্রণাম করছিলেন বঙ্কুদা। বগলে একগাদা বই নিয়ে লাইব্রেরি ওয়ার্কের পরে আমি ফিরে আসছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। হঠাৎ বঙ্কুদার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে হাতের সিগারেটটাকে জুতোর তলায় চালান ক'রে দিলাম। আমাকে দেখে বঙ্কুদা হাসলেন। বললেন, আরে, রঞ্জন যে, ভাল আছ ?

মাথা নেড়ে জানালাম, ভালই আছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, দেশের সব কুশল তো ?

—দেশ ? দেশে কে আছে আর ? মা মারা যাওয়ার পরে সবই তো এখানে তুলে এনেছি।

চকিতে বহুদিনের আগেকার একটি আসন্ন সন্ধ্যা মনে প'ড়ে গেল। চমকে বললাম, বউদিও এখানে ?

বঙ্কুদা সলজ্জ ভাবে হাসলেন।

—বাঃ রে, সেটা আগে বলতে হয়! ঠিকানা দাও, কালই দেখা ক'রে আসব।

বঙ্কুদা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও বলেছে অনেক দিন। তা তুমি যে সৃষ্টিছাড়া মানুষ ভায়া, তোমার পাত্তা কি সহজে মেলে! কয়েকবার খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু দেখা পাইনি।

বঙ্কুদা ঠিকানা দিলেন। বাগবাজারে কি এক হরিহর দাস বাই লেন। গলিটা কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।

—খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হবে। জায়গাটা কি বলে—একটু ইয়ে কিনা। ওই মদন মোহনের বাড়িটা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগোলেই। তা কবে যাচ্ছ?

বললাম, যাব একদিন সময় ক'রে। বউদিকে ব'লে রেখো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রাখব বইকি। আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি ভাই। আমার আবার টিউশনি আছে, দেরি হয়ে যাবে।

অত্যন্ত অমায়িকভাবে হেসে বঙ্কুদা চ'লে গেলেন। আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবির ছেঁড়া কাঁধটা তাঁর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, মুখে তিনদিনের না-কামানো দাড়ি, পুরনো ছাতাটার বর্ণসামঞ্জস্যহীন তালিগুলোতে দারিদ্র্যের নখর-চিহ্ন।

কয়েক দিন নানা কাজে নিঃশ্বাস ফেলবার জো ছিল না। বেনামীতে এক বইওয়ালাকে নোট লিখে দিয়েছিলাম, কণ্ট্রাক্টের টাকা কটা আদায়ের জন্য দিন কয়েক হাঁটাহাঁটির ব্যাপার ছিল। সেটা মিটে গেলে টুনু-বউদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

কলকাতার বহু গলির সঙ্গেই পরিচয় আছে। প্রাসাদপুরীর আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার পেছনে মানুষের গম্য-অগম্য অনেক অন্ধকার গহ্বরেই যাতায়াত করতে হয়েছে, তাই হরিহর দাস বাই লেনকেও আবিষ্কার করতে পারলাম। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কল্যাণে একটা বড় বাড়িকে ভেঙে অনেকটা জায়গা বার করা হয়েছে, সন্ধ্যা হ'লে সেখানকার চুন-সুরকির স্তূপের ওপর বিকৃতরূপা একদল মেয়ে বিফল প্রসাধন ক'রে খরিদ্দারের আশায় বসে থাকে, বিড়ি টানে, অশ্লীল ভাষায় ইয়ার্কি করে, একটু দূরে যে লোকটা লোহার উনুনে পেঁয়াজফুলরি ভাজছে তার সঙ্গে করে কলহ। ঠিক তারই পাশ দিয়ে ছোট্ট একটু কানা গলি—হরিহর দাস বাই লেন। সিউয়ার্ড ডিচের মতো দেড় হাত প্রশস্ত অন্ধকার পথ —দু পাশে নোনা-ধরা দেওয়ালগুলো গায়ের ওপর চেপে আসবার উপক্রম করে। পায়ের নিচে পচা ভাত আর মাছের কাঁটা, খবরের কাগজে মোড়া অকথ্য আবর্জনা।

ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বঙ্কুদার দেওয়া নম্বরটার কাছে এসে যখন পৌছলাম, তখন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কোনো ভদ্রলোক এমন জায়গায় বাস করতে পারে, এ কল্পনার অতীত। পুরনো একতলা বড় বাড়ি, চুন-সুরকি-খসা দেওয়ালে নগ্ন ইটগুলো কোণা বার করে রয়েছে। সদর দরজায় কবাট নেই, একটা

ছেঁড়া চট সেখানে পর্দার মতো ঝুলছিল।

কড়া নাড়বার জো নেই। গলা-খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম, বঙ্কুদা, বঙ্কুদা আছেন?

—কে গো?—নারীকণ্ঠে কর্কশভাবে প্রশ্ন এল, কাকে চাই? পরক্ষণেই ছেঁড়া চটের ফাঁক দিয়ে প্রৌঢ়ার একখানা তামাটে কুৎসিত মুখ বেরিয়ে এল। শকুনের মতো তীক্ষ্ণ চোখ আমার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সে মুখখানা আবার জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই মোশায়ের?

সসঙ্কোচে বললাম, বঙ্কিম মুখুজ্জে এখানে থাকেন কি?

খনখন ক'রে গলা বেজে উঠল, থাকেন না তো যাবেন কোন্ চুলোয়? তা এখন তো তাঁর পাত্তা মিলবে না, তাঁকে পাওয়া যাবে রাত দশটার পরে। তুমি কি পাওনাদার বাপু? তা হলে সোজা চ'লে যাও, তার চাকরি নেই এখন।

বললাম, না, পাওনাদার নই। আমি তাঁদের আত্মীয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করব।

—আত্মীয়? তা অত আদিখ্যেতার দরকার কি, আগে বললেই তো হ'ত। এস এস, ভেতরে এস। এ বাড়ি আমার, আমিই এখানকার বাড়ি-উলি।

ভেতরে ঢুকতেই প্রৌঢ়া বাঁ দিকে একখানা ঘর দেখিয়ে দিলে, ওই তাদের ঘর। আর কোনো দিকে যেয়ো-টেয়ো না বাপু, আমার অন্য ভাড়াটে আছে। তাদের আবার আব্রু বড্ড বেশি।

নির্দিষ্ট ঘরখানার দিকে এগোতেই ধোঁয়ায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। একটা টিনের তোলা উনুনে সবে আঁচ দেওয়া হয়েছে, নিবিড় কয়লার ধোঁয়ায় কোলের মানুষ দেখা যায় না। তবুও তার ভেতর দিয়ে ঘরের বারান্দায় আমি টুনু-বউদিকে দেখতে পেলাম।

বললাম, টুনু-বউদি, আমাকে চিনতে পেরেছেন?

টুনু-বউদি উঠে দাঁড়ালেন। হর্ষোচ্ছল গলায় বললেন, রঞ্জন ঠাকুরপো! এসেছেন?

কিন্তু টুনু-বউদির এ কী চেহারা! তিন বছর আগেকার সে মানুষটি আর নয়। এ তার একটা অস্থিচর্মসার কঙ্কালমাত্র। চোয়ালের হাড়ের ওপর একটা পাতলা চামড়ার আবরণ, কালো গর্তের ভেতর মলিন চোখ দুটো প্রায় ডুবে গেছে বললেই চলে। কাচের মার্বেলের মতো অসুস্থ একটা ঘোলাটে দৃষ্টি। যেন বহুদূর থেকে সে দৃষ্টি ভেসে আসছে।

ঘরের ভেতর থেকে ছেঁড়া একটা মাদুর এনে বউদি বারান্দায় পেতে দিলেন। বললেন, উঃ, কতদিন পরে দেখা হল আপনার সঙ্গে!

বললাম, কিন্তু আপনার এ কি শ্রী হয়েছে বউদি! একেবারে যে চেনাই যায় না!

টুনু-বউদি ক্লিষ্টভাবে বললেন, কমাস থেকেই শরীরটা ভারী খারাপ যাচ্ছে ঠাকুরপো। রাত্রে ঘুষঘুষে জ্বর হয়, আর সেই সঙ্গে কাসি। উনি কী একটা কবিরাজী ওষুধ নিয়ে

এসেছেন কদিন হ'ল, তাই খাচ্ছি একটু একটু।

স্থির দৃষ্টিতে আমি টুনু-বউদির মুখের দিকে তাকালাম। কোনো ভুল নেই। এ বাড়ির আবহাওয়ায় দিনের পর দিন যে মৃত্যুবীজেরা পুষ্ট ও লালিত হয়ে চলেছে, তাদেরই অলক্ষ্য ক্ষুধা টুনু-বউদিকে স্পর্শ করেছে এসে। বুকের প্রাণপিণ্ড দুটোকে মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশেষে কেটে কেটে খেয়ে চলেছে তারা।

সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি পড়ল উঠানের কলতলার দিকে।

তরল কাদা আর একরাশ উচ্ছিষ্ট। একটা কাক ডিমের খোলা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেল। তিন-চারটি মেয়ে কলতলায় প্রাণপণে বাসন মাজছে, একটির বক্ষোবাস অশোভন রকমে অসংযত। ছেঁড়া গামছা পরা একজন রোমশ পুরুষ একটু দূরে একটা তোবড়ানো টিনের মগ হাতে দাঁড়িয়ে, থেকে থেকে অসংবৃত-বসনা মেয়েটির দিকে তার চোখের তির্যক দৃষ্টি ঘুরে আসছে। ওদিকের বারান্দা থেকে কে খানিকটা পানের পিক ফেললে, জল-কাদার সঙ্গে মিশে পিকের লাল রঙটা উঠানের অনেকখানি অবধি প্রসারিত হয়ে গেল।

দুর্বল কণ্ঠে টুনু-বউদি বললেন, সত্যি, বড্ড কষ্টেই আছি। আপিসে একজন মাদ্রাজীকে নিলে, তাইতে চাকরি গেল, এখন দুটো টিউশনিই ভরসা। তবু তো দুবেলা ছুটোছুটির কামাই নেই। একটা ছেলে হয়েছিল জানেন বোধ হয়, মাস তিনেক আগে রক্ত-আমাশয়ে ম'রে গেল, একবার ডাক্তার অবধি ডাকতে পারলাম না। মাঝে মাঝে ভাবি, এর চাইতে গ্রামে থাকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত, কিন্তু ওঁকে এভাবে ফেলে কী ক'রে যাই?

একটু থেমে আবার বললেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, বায়োস্কোপে 'বাংলার মেয়ে' দেখেছেন আপনি?

টুনু-বউদির চোখ দুটো চকচক করতে লাগল, আশায় নয়—অশ্রুতে।

*　　　*　　　*

ভাবনায় ছেদ পড়ে গেল।

কলমে কালি ফুরিয়ে এসেছে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম, জ্বলতে জ্বলতে মোম-বাতিটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, আর ক্যাণ্ডল-স্ট্যাণ্ডের নিচের প্লেটখানার ওপর প'ড়ে আছে সেই প্রজাপতিটা,—মৃত্যুর স্পর্শে তার প্রসারিত ডানা দুটি নিশ্চল।

তৃণ

পর পর তিনখানা নৌকো সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘাটে এসে ভিড়ল। ঘস্-স্-স্। কাদার পাড় ঠেকেছে আর তার সঙ্গে মাথা তুলে বাধা দিয়েছে ডুবে যাওয়া ঘাসের বন।

ধাওয়াদের ডিঙি। সারাদিন বিলে মাছ ধরে এই সন্ধ্যায় ফিরল ঘরে। নৌকার

খোলের ভেতর বন্দী চিতলের লেজের ঝাপট শোনা যাচ্ছে, জলের মধ্যে থল থল করছে বোয়ালের ছানা। জালের গায়ে গায়ে কাঁটাওয়ালা চাঁদা মাছগুলো রূপোর চাকতির মতো আটকে রয়েছে।

কাদার মধ্যে লগি পুঁততে পুঁততে সৈফুদ্দিন বললে, দিনের পর দিন হল কী বিলের! সারাদিন জাল ফেলেও পাঁচ সের মাছ পাওয়া যায় না, এবার যে না খেয়ে মরতে হবে রে।

হাঁটু জলে নেমে জয়নাল ডিঙ্গিটাকে পাড়ে আনবার চেষ্টা করছিল। রুদ্ধশ্বাসে এবং রুদ্ধ আক্রোশে চাপা একটা গর্জন করলে সে। বললে, ওই শালা 'বিনে'র দল। বারো মাস ভেসাল নামিয়ে চুনোপুঁটিগুলো অবধি সব সাবড়ে নিলে মাছ কি আশমান থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে নাকি?

খোলের ভেতর হাতড়াতে হাতড়াতে সৈফুদ্দিন বললে, সত্যি। পশ্চিম থেকে এসে এই 'বিন' আর 'মালা'রাই আমাদের রুজি মারবার মতলব করেছে। ওদের না তাড়ালে আর—

—কী করে তাড়াবে। কতগুলো করে টাকা জমা দেয় ওরা, ওরা হালিম শাহুর ধর্ম-পুত্তুর যে।

তৃতীয় নৌকোর মাঝি বসির ধাওয়া কোনো কথা বললে না। বলবার কিছু নেই। অভাব অভিযোগ প্রত্যেক দিনের দুঃখ দুর্গতি, এর জন্যে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই কিছু। টাকায় এক সের চাল। লুঙ্গির দাম পাঁচ টাকা, আট গণ্ডা পয়সা দিয়েও এক লাটিম জালের সুতো পাওয়া যায় না। বিলের মাছগুলো দিনের পর দিন ফুরিয়ে আসছে বিস্ময়কর ভাবে, সে-ও এই দুর্ভাগ্যেরই অংশ মাত্র। আল্লা মালেক ছাড়া এর জন্যে দায়ী নয় কেউ। বিনেরা নয়, মালারা নয়, হাসানপুরের শাহুরাও নয়।

সামনে বিলের কালো জল। আকাশ ভরা তারায় সে জল ঝলমল করছে। অন্ধকারে উড়ছে ঘরে ফেরা গাংশালিক। একটু দূরেই বানের জলে একটা মরা ঘোড়া ভেসে এসেছে, দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত। সেটাকে নিয়ে কুকুরের কোলাহল।

ধাওয়ারা জাতিতে মুসলমান আর পেশায় জেলে। আদি নিবাস ছিল রাজশাহীর চলন বিলের ধারে, কিন্তু জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারে দিনাজপুর জেলার এই দক্ষিণাঞ্চলে এসে ঘর বেঁধেছে ওরা। মুসলমান সমাজে নাকি জাতিভেদ নেই, কিন্তু ধাওয়ারা প্রায় অস্পৃশ্যদের সামিল। নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা ওদের জল পান করতে দ্বিধা বোধ করেন, অন্য সম্পর্ক তো দূরের কথা। মৃত্যুর পরেও সেই জাতিভেদের হাত থেকে নিস্তার নেই, সাধারণ কবরখানায় ওদের প্রবেশ নিষেধ। বিলের ধারে গ্রামের শেষপ্রান্তে ওদের গোরস্থান।

সম্প্রদায়টা যেমন নিবিরোধ, তেমনি শান্তিপ্রিয়। সমাজ আর দারিদ্র্যের পেষণে প্রতিবাদের ক্ষীণতম ভাষাটুকুও কণ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। হাসানপুরের শাহু জমিদারেরা এই মধ্য বিংশ শতাব্দীতেও অষ্টাদশ শতকীয় ভঙ্গিতে জমিদারী করে চলেছে। ঘরে আগুন দেওয়া কিংবা জোর করে মেয়ে টেনে নিয়ে যাওয়াটা আজকাল বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে ধরে ধরে বেগার খাটানোটা এখনো আছে অব্যাহতভাবে। যখন-তখন ঝুড়ি ভরে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে মাছ তুলে নিয়ে যাওয়াটা এখনো তারা জমিদারীর অধিকার বলে মনে করে।

কিছু বলবার জো নেই। জবাব আসে: বাইরে থেকে ব্যবসা করতে এসে শালারা লাল হ'য়ে গেলি, দুটো মাছ নজর দিতে গা এমন করকর করে কেন?

লাল। লাল হওয়ার অর্থ যে কী শাহুরা নিজেরাও যে তা না জানে এমন নয়। বিন্নার ছাউনি দেওয়া ঘর বর্ষার জল আটকায় না; লজ্জা নিবারণের জন্যে দু'টুকরো 'ফতা' জোটে না ঘরের মেয়েদের। মাছের সের এই যুদ্ধের বাজারের কল্যাণে দু' আনা থেকে আট আনায় উঠেছে বটে, কিন্তু তা-ও বেশির ভাগ চলে যায় দেবতা এবং উপদেবতার উপচারে। ওদের অত্যাচার-জর্জর কালো মুখের দিকে তাকিয়ে বরেন্দ্রভূমির মাটি ঘৃণায় আর অপমানে সত্যি লাল হয়ে যায়।

সৈফুদ্দিন তাড়া দিয়ে বললে, বসির ভাই, চুপ করে বসে আছ যে! ঘরে যেতে হবে না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসির উঠে দাঁড়াল। মাছ সেও বেশি পায়নি, বরং সব চাইতে কম পেয়েছে। ছেঁড়া জালটা সারানো যাচ্ছে না কদিন থেকেই, অথচ এক লাটিম সুতোর দাম কমসে কম আট গণ্ডা পয়সা।

জালের সঙ্গে মাছগুলোকে জড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ল বসির। দু'চারজন খরিদ্দার খালুই নিয়ে বসে আছে বিকেল থেকেই। একটু পরেই আসবে থানার কনেস্টবল, দারোগার জন্যে দৈনন্দিন তোলা নিয়ে যাবে। তারপর সকালে বন্দরের বাজার।

বিলের থেকে কয়েক পা উঠে এসেই লালু চৌকিদারের তরমুজের বাগান। অন্ধকারে ফণীমনসার বেড়াগুলো যেন কালো কালো গোখরো সাপের মতো ফণা তুলে রয়েছে। কিন্তু লালু চৌকিদারের বাগানে তরমুজ নেই। শুধু তরমুজ কেন, লালু চৌকিদারও নেই। গত বছর বর্ষার সময় দিগদিগন্ত ছাওয়া বিলে মাছের সন্ধানে গিয়ে সে আর ফিরে আসেনি। কোথায় কোন্ অতলে দামঘাসের লতাবন্ধনে জড়িয়ে সে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে সে খবর কারো জানা নেই।

বসিরের মনটা ভারাতুর হয়ে উঠল। বিশ্বাস নেই বিলকে। মেঘ ওঠে না, অথচ ক্ষ্যাপা হাওয়ায় বিল নাচতে শুরু করে দেয় আপন খেয়ালে। আধ-ডোবা শ্যাওড়া গাছের মাথায় আলাদ গোখুর কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, বিন্নার শীষ দেখে যেখানে আধ হাত জল

মনে হয়, সেখানে দশ হাত লগি থই পায় না। ভাসমান পোড়া কাঠের গুঁড়িটা কোন্ মুহূর্তে যে কুমীর হয়ে উঠবে, আগে থেকে কেউ তা অনুমান করতে পারে না। বসিরের অত্যন্ত ভয় হয় মাঝে মাঝে। হয়তো এই বিল একদিন তাকেও—

অন্যমনস্ক চিন্তা চকিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। ওরা ধাওয়া পাড়ার মাঝখানে এসে পড়েছে। একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে করে রোসেনা সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, পাইকার এসেছে।

—পাইকার!—বসিরের ভারাতুর মনটা বিরক্তিতে বিস্বাদ হয়ে গেল।

মাছ কিনবার খরিদ্দার যারা ছিল তারা পছন্দমতো মাছ নিয়ে চলে গেল। নগদ দাম মিলল নামমাত্র। ধাওয়াদের কাছ থেকে নগদ পয়সা দিয়ে মাছ কিনতে গেলে ভদ্রলোকের চলে না। সাতদিন সতেরোবার হাঁটাহাঁটি করলে যে যা খুশি তুলে দেবে এই এখানকার রেওয়াজ। প্রতিবাদ নিষ্ফল, সে ঔদ্ধত্য হাসানপুরের শাহুরা ক্ষমা করবে না। বিদেশ থেকে এসে মাছের ব্যবসা করে যারা লাল হয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে এটুকু উপকারও পাবে না দেশের লোক? বাড়াবাড়ি করে যদি, চালা উপড়ে বিদায় করতে কতক্ষণ?

হালিম শাহুর খাস বরকন্দাজ পীরু মিঞা। বেঁটে খাটো চেহারা। ধমক ছাড়া কথা বলে না, ডেকে আনতে বেঁধে আনাটাই তার রীতি—বিশেষ করে ধাওয়াদের সম্পর্কে। সব চাইতে বড় বোয়ালটা জমিদারের নজরানা বলে সে কাঁধে তুলে নিলে।

নিরুপায় নৈরাশ্যে বসিরের বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। মাছটার ওপর অনেকখানি আশা ছিল তার—অন্তত দশ আনায় বিক্রি হত বাজারে। এক লাটিম জালের সুতো—

—ওটাই নিয়ে যাবে পীরু ভাই? ছোট দেখে একটা—

পীরু থেমে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে বললে, ছোট দেখে কেন?

—মাছ তো বেশি পড়েনি, তাই—

—তাই বলে হুজুরের মান-ইজ্জত সব যাবে নাকি? শহর থেকে মৌলানা সাহেব এসেছেন তার খবর রাখিস?

—কে মৌলানা সাহেব?

পীরু মিঞা বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে বললে, কে মৌলানা সাহেব! কোথাকার বেকুব লোক রে তুই! মস্ত বড় আলেম, তিন-তিনবার হজ করে এসেছেন। কাল সকালে ‘ওয়াজ’ হবে।

পীরু আর দাঁড়াল না।

চোখ ফেটে কান্না আসতে লাগল। সারাদিন মাথার উপরে ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলেছে ভাদ্রের রোদ। সেই কোন্ সকালে এক ছটাক পান্তা ভাত আর তিন সের জল খেয়ে বেরিয়েছিল, ক্ষিদেয় সমস্ত শরীরটা এলিয়ে পড়তে চাইছে। হাতে পায়ে কাঁটার আঁচড়গুলো জ্বলছে

বিছুটির জ্বালার মতো, যে সব জায়গায় জোঁকে ধরেছিল, সে সব জায়গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়াচ্ছে এখনো। অথচ সে প্রাণান্তিক পরিশ্রমের এই পারিশ্রমিক। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে দূরে রোহণপুর ইস্টিশানে চলে যায় কুলি খাটতে, রোজগার যাই হোক, তার ওপরে কেউ তোলা বসাতে আসবে না।

একমুখ হাসি নিয়ে সামনে পাইকার দেখা দিলে। একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লোক-টার। হাজার গালিগালাজ করলেও তার সে হাসির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, ভেতরের কী একটা অনুপ্রেরণায় সে যেন সব সময়েই চরিতার্থ হয়ে আছে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি পাইকার।

রহমতুল্লা কিংবা করমতুল্লা জাতীয় কী একটা নাম তার আছে, কিন্তু পাইকার নামেই তার প্রসিদ্ধি এবং পরিচিতি। ধানের সময় সে দালালী করতে আসে, পাটের মরশুমে তাকে ঘুরতে দেখা যায়, এমন কি সাগরদীঘির মেলায় খোপরাপটি বা গণিকাপল্লীর বিলি-বন্দোবস্ত করতেও সে হাঁটাহাঁটি করে বেড়ায়। এক কথায় তাকে বলা যায় সর্ববিশারদ। কোথায় তার বাড়ি কেউ জানে না। জিজ্ঞাসা করলে অভ্যস্ত হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দেয় প্রশ্নটা। এদিককার ইতর-ভদ্র সম্প্রদায় তাকে শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে খানিকটা, তার কাছ থেকে শহরের নানারকম সংবাদ মেলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নূতন পরওয়ানার সন্ধান সে রাখে। যুদ্ধের সব খবর সে মুখে মুখে শুনিয়ে দিতে পারে। আর জানে সিনেমার গান : মেরে ঝুলা ক্যায়সে ঝুলে।—

পাইকার বললে, কী বসির ভাই, খবর সব ভালো তো!

দাওয়ার ওপর বসে পড়ে বসির বললে, আল্লা যেমন রেখেছেন।

পাইকার ভ্রূকুটি করে বললে, আল্লা! আল্লা কী করবেন। মানুষের বদমায়েসী সব। চাল-ডাল-তেল-নুন-রেজগী আল্লা নিয়ে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই না?

ক্লান্ত নির্বোধ দৃষ্টিতে বসির তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাইকারের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগে না, কিন্তু মনের মধ্যে গিয়ে তলোয়ারের আগার মতো খোঁচা মারে। শিরায় শিরায় মাঝে মাঝে আগুন ধরে যায় যেন। মানুষ! মানুষের চাইতে বড় শত্রু মানুষের আর কে আছে!

পাইকার বললে, ইবলিসের বাচ্চা সব। কথা নেই বার্তা নেই, অত বড় মাছটা তুলে নিয়ে গেল! আর হালিম শাহ্‌ হরদম মদে ডুবে থেকে রাতারাতি পীর হয়ে উঠেছে আজকে। ওর বাড়িতে বসে মৌলানা সাহেব ওয়াজ করবেন—মরি মরি!

বসির চমকে উঠল।

—ওসব কথা বলো না পাইকার! জমিদারের গাঁয়ে থাকি! যদি শোনে তা হোলে—

—ওই জন্তেই তো জাহান্নামে গেলে।

বসির চুপ করে রইল। পাইকার সত্যিই তার হিতাকাঙ্ক্ষী। দুঃসময়ে কত যে সাহায্য করে বলবার নয়। এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যাওয়ার পথে যখন-তখন তার আতিথ্য নেয়, আর সেই সঙ্গে আনে চাল-ডাল-তেল--প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী। এমন কি রোসেনার জন্যে রঙ্গীন শাড়ি পর্যন্ত। বসিরের ঘরে আসবার পরে রোসেনা যে দু-একখানা শাড়ি পরেছে সে কেবল পাইকারের অনুগ্রহে। তা ছাড়া ছিন্ন মলিন দু'টুকরা ন্যাতাই তার সম্বল।

কিন্তু ঠিক এই জিনিসটাই বসির যেন কেমন বরদাস্ত করতে পারে না। রোসেনা তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রূপ এবং যৌবনের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, এমন একটি মেয়ে ধাওয়া পাড়ায় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর বসির নিজে কুৎসিত—অত্যন্ত কুৎসিত। বয়স তার যৌবনের সীমা ডিঙিয়ে গেছে অনেক দিন। সর্বাঙ্গে পড়েছে দারিদ্র্য আর ম্যালেরিয়ার দন্তচিহ্ন। কিন্তু তার সঙ্গে রোসেনার মন মরে যায়নি। চুলের কাঁটার প্রতি লোভ আছে, বন্দরের সরকারী ডাক্তারবাবুর কলেজে পড়া মেয়ে মাঝে মাঝে যখন গ্রামে বেড়াতে আসে, তখন তার রঙ-বেরঙের শাড়ির দিকে তাকিয়ে লোলুপ হয়ে ওঠে রোসেনার চোখ। তার গা থেকে আসা পাউডারের গন্ধ রোসেনাকে কোন একটা অনাস্বাদিত অপরিচিত জগতের সন্ধান এনে দেয়। ইউনিয়ন বোর্ডের ইঁদারায় জল আনতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রোসেনা, সারাদিন মাছ ধরে বসির যে এখন ঘরে ফিরবে সে কথা তার মনেও থাকে না।

এ সব কথা বসির জানে, ভালো করেই জানে। রোসেনাকে সে খুশি করতে পারেনি। সেইজন্যেই পাইকারের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ এবং সন্দেহে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তার। কেন সে এত অনুগ্রহ করে তাকে, কী এত স্বার্থ তার? বসিরের ভাঙা ঘরে রাত কাটাবার জন্যেই বা তার এজাতীয় আগ্রহ কেন? তা ছাড়া পাইকারের চেহারা দেখতে সত্যিই ভালো, ফর্সা রং, ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি পরে, সিল্কের লুঙ্গি। মিহি আর মিষ্টি গানের গলা, কখনো কখনো একটা বাঁশি বের করে তাতে ফুঁ দেয়। দরজার পাশে ঠুনঠুন করে ওঠে রোসেনার হাতের কাঁচের চুড়ি।

কালো মুখখানা আরো কালো করে একবার জিজ্ঞেস করেছিল রোসেনাকে, যখন তখন দরজার পাশে অমন করে দাঁড়াস কেন বল্ দেখি।

রোসেনা জবাব দিয়েছিল, কোথায় যাব শুনি! তোমার সাতমহলা বাড়ির কোন্ মহলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাকব।

বসির আর কিছু বলতে পারেনি। সাতমহলা বাড়ি—তা বটে। খোঁচা দিতে পারে বই কি রোসেনা। একটা ভাঙা ঘর, এক টুকুরো দাওয়া। ছয়টি ঋতু, আলো বাতাস আর বৃষ্টির অধিকার। বর্ষার রাত্রিতে ময়লা চটের বিছানা নিয়ে খুঁজে বেড়াতে হয় কোন্ দিকটাতে জল পড়ে কম। ঝুলধরা ঘরের চালে কাঁচপোকা উড়ে বেড়ায় মাকড়সা

শিকারের সন্ধানে। এখানে-ওখানে ছোট বড় গর্ত, এক দিক বুজিয়ে দিলে উঁকি মারে আর এক দিক থেকে। সাপ কিংবা ইঁদুরের আস্তানা কে বলবে।

তারপর থেকে সে রোসেনাকে কোনো কথা বলেনি। নিজের দীনতায়—নিজের সর্বাঙ্গীন দীনতায় বসির নীরব হয়ে গেছে। ঘোমটা টেনে রোসেনা পাইকারের সামনে ভাত বেড়ে দেয়, এগিয়ে দেয় পান। পাইকারের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কিছু একটা প্রকট হয়ে ওঠে কি! দাঁতের উপর দাঁত কঠিন হয়ে চেপে বসে বসিরের।

পাইকার বললে, আমার কথা শোনো। লাহিড়ীবাবুদের জমিদারীতে চলে যাও। ওখানেও এমনি বিল—বড় বিল, কৃষ্ণকালীর বিল। ওই বিন্ শালারা ওদেশে গিয়ে হানা দেয়নি এখনো। তা ছাড়া বাবুরাও লোক ভালো, কোনরকম জোর-জুলুম—

দীর্ঘ প্রসারিত দৃষ্টিতে বসির তাকিয়ে রইল পাইকারের মুখের দিকে। এমন প্রস্তাব আরো অনেকবার করেছে পাইকার। কিন্তু বিশ্বাস হয় না লোকটাকে। ভুলিয়ে নিয়ে কোন্ আঘাটায় ভিড়িয়ে দেবে কে জানে। হয়তো নাম লিখিয়ে দেবে পল্টনের দলে। লোকে বলে পাইকারের অসাধ্য কাজ নেই।

—ওসব বলে লাভ নেই পাইকার। ভিটে ছেড়ে আমি নড়ব না কোথাও। না খেয়ে মরলেও নয়।

পাইকারের চোখে দেখা দিল নীরব অনুকম্পা, মুখের ওপর ফুটল সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা—বেশ, তাই থাকো। কিন্তু আল্লাকে দোষ দিয়ো না।

পরদিন সকালে পাইকারই বসিরকে টেনে নিয়ে গেল মৌলানা সাহেবের দরবারে। তিন-তিনবার হজ করে এসেছেন তিনি, সাতটা জেলা ঘুরেও এত বড় আলেম লোক আর পাওয়া যাবে না। হালিম শাহুর বাড়ির সামনেই বসেছে দরবার। কাঠের একখানা ছোট জলচৌকিতে আসন নিয়েছে মৌলানা সাহেব। টকটকে ফরসা রঙ—গোল মুখখানা থেকে রক্ত যেন ফেটে বেরিয়ে পড়ছে। সমবেত জনতার দিকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ আর রূঢ় দৃষ্টি ক্ষেপণ করে একনিষ্ঠভাবে মালা জপ করে চলেছেন তিনি। তাঁর পাশেই বসেছে হালিম শাহু, ধাওয়া পাড়ার অধীশ্বর, এখানকার জমিদার। মৌলানা সাহেবের সাহচর্যে নিজেকে যতটা সম্ভব ধর্মপ্রাণ আর সৌম্যদর্শন করবার চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু তার আরক্ত চোখ আর জড়ানো কথার ভঙ্গি থেকে অনায়াসে বোঝা যায় যে, এই সাতসকালেই অন্তত একটি বোতল সে পার করে এসেছে।

হালিম শাহুই অভ্যর্থনা জানায় তার স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায়।

—কিরে ব্যাটা, তুই কী মনে করে?

তীক্ষ্ণ আর রুক্ষদৃষ্টি রুক্ষতর করে মৌলানা সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, কে এ?

—ধাওয়া। বসির ধাওয়া। বিলে মাছ ধরে।

—ধাওয়া?—ঘৃণায় মৌলানা সাহেবের ফরসা টুকটুকে মুখখানা বেগুনে হয়ে গেল।—মোছলমানের ব্যাটা হয়ে জেলের কাজ করিস? মরে যে তুই দোজখে যাবি।

বসির মাথা নত করে রইল। লজ্জায় এবং আতঙ্কে মৌলানা সাহেবের কড়া মুখের দিকে সে তাকাতে পারল না। বললে, কী করব জনাব, পেটের দায়ে—

—পেটের দায়ে! তাই বলে কাফের হয়ে যাবি? কাচ্ছু ধরিস?

—জালে পড়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু বেচি না জনাব, বিলিয়ে দিই।

—হুঁ, বিলিয়ে দিস না আরো কিছু! তোবা তোবা। মুখ দেখলেও গুনাহ্ হয় তোদের। বাইশ বাজারে নিয়ে গিয়ে তোকে পয়জার মারা উচিত।

বড় বোয়ালটার কথা বসিরের মনে এল। কিন্তু বলবার সাহস হল না।

ফিরে এসে সারাদিন চুপ করে বসে রইল বসির। সমাজ তাদের চায় না, ধর্ম তাদের অস্বীকার করে, দুঃখ আর দুর্গতির কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রত্যেক দিনের জীবন। কোনখানে কিছুমাত্র মর্যাদা নেই, মূল্য নেই এতটুকুও। কাফেরের কাজ করে, মাছ ধরে বিক্রি করে বাজারে। সেই অপরাধে জমায়েতের নামাজের সময় সকলের পেছনে চোরের মতো গিয়ে দাঁড়ায়, মস্‌জেদে ঢুকতে গেলে ইমাম সাহেবের চোখ মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত আর কুটিল হয়ে ওঠে।

রোসেনা জিজ্ঞাসা করলে, মাছ মারতে যাবে না?

বসির ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললে, আজ আর বেরোতে পারব না। বড় খারাপ লাগছে শরীরটা।

রোসেনা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কিন্তু কাল চলবে কী করে?

—চলবে না। মাদুরটা এনে পেতে দে তুই, আমি শুয়ে থাকব একটু।

পাইকার নীরবে লক্ষ্য করতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা। তারপর এক সময় অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কাছে এসে বসল।

—সেই জন্যই বলছিলুম। চলে যাও না এখান থেকে। মোছলমান যেখানে মোছলমানের ওপর এত জুলুম করে, সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে কিসের জন্যে?

বসির তেমনি দীর্ঘায়ত নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—এর চাইতে হিন্দুর গাঁও ভালো। তারা যাই করুক, ধর্মের ওপরে জুলুম করে না। মোছলমানের বাচ্ছা হয়ে এই বে-ইজ্জৎ সহ্য করে পড়ে থাকবে তুমি?

—মোছলমানের বাচ্ছা!—টগবগ করে উঠল রক্ত। চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল, ধকধক করে জ্বলে উঠল চোখ। পাইকারের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসির বললে, তাই যাব, আজই চলে যাব।

অত্যন্ত স্নেহভরে পাইকার তার হাত চেপে ধরলে। বললে, না, না, অত ব্যস্ত হতে

কে বলেছে। ভেবে ছাখো না দু'চারদিন।

কিন্তু দু'চারদিন ভেবে দেখবার আর দরকার হল না।

সন্ধ্যার দিকে আবির্ভাব ঘটল পীরু মিঞার। অসুস্থ মলিন রাত্রি দারিদ্র্যজীর্ণ পাড়াটার ওপরে ছায়া বিছিয়েছে। অন্ধকারে এখানে-ওখানে ঝুলছে ছেঁড়া জাল, মাছের আঁশটে গন্ধ। ভিজে কাঠ আর পোড়া পাতার ধোঁয়ায় অন্ধকারটা যেন কঠিন আর শরীরময় হয়ে উঠেছে। ধাওয়া পাড়ায় সন্ধ্যায় হাঁড়ি চড়েছে। হোগলার বেড়ার ফাঁকে দেখা দিচ্ছে রেড়ির তেলের টিমটিমে আলো।

পীরু হাঁক দিলে, বসির আছিস?

বসির উঠে বসল। ভারী আর আড়ষ্ট শরীরের ভেতর স্তিমিত হৃৎপিণ্ড দুটো চমকে উঠল তার। বললে, কী মতলবে? তোলা নিতে এসেছ? কিন্তু জাল আজকে ফাঁকা, বলে দিয়ো তোমার শাহুকে।

পীরু মিঞা থমকে দাঁড়াল। যতটা না অপমান বোধ করলে, বিস্ময় বোধ করলে তার চাইতে অনেক বেশি।

—খুব যে হাঁকডাক দেখছি। রাতারাতি নবাবী পেলি নাকি! কিন্তু মাছের কথা নয়, জরুরী ব্যাপার আছে।

—কী জরুরী ব্যাপার? ভিটেয় লাঙল দিয়ে সর্ষে বুনবার মতলব আছে?

পীরু মিঞা বিস্ফারিত চোখে বললে, দরকার হলে তা তো করতেই হবে। কিন্তু না শুনেই যে ষাঁড়ের মতো চ্যাচাচ্ছিস, হয়েছে কি তোর? ভয় নেই, খুব সুখবর! হুজুর মেহেরবানি করেছেন তোকে।

—আমাকে!

—হ্যাঁ, তোকেই।—গলার স্বর নামিয়ে আনল পীরু মিঞা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা একবার চালিয়ে দিলে হোগলার বেড়ার ফাঁকে, রোসেনাকে' চকিতের জন্যে চোখে পড়ে কিনা। তারপর এক নিশ্বাসে বলে গেল, তোর বিবি তো খুব খাপসুরুৎ। খেতে পরতে দিতে পারিস নে, ছেড়ে দে না ওটাকে। হুজুরের নজর পড়েছে, তিনি বলেছেন—

—শা—লা—বসিরের গলা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল একটা অমানুষিক চিৎকার।

চমকে তিন পা সরে গেল পীরু মিঞা।—এঃ, মেজাজ দেখ না। ইজ্জতে ঘা লেগেছে নাকি সাহেবের! অমন কত গণ্ডা—কানের ওপর দিয়ে শাঁ করে বিদ্যুতের মতো একটা দা বেরিয়ে গেল, একটু হলেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেত পীরুর মাথাটাকেও। আতঙ্কে আর্তনাদ করে পীর মিঞা পাশের বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে সমস্ত ধাওয়া পাড়াটা এসে জড়ো হয়ে গেল বসিরের ঘরের সামনে। ভুয়াল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে গর্জন করছে সে। তার চোখ দুটোর দৃষ্টি উন্মাদের মতো, তার কালো শীর্ণ দেহটা জিঘাংসার প্রতিরূপ

যেন :—শয়তান হারামীর বাচ্ছা—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে রাত নেমে এল। প্রগাঢ় শান্তির মধ্যে সমস্ত ধাওয়া পাড়াটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল নিবিড়তম সুপ্তির স্নেহচ্ছায়ায়। সারাদিন পরিশ্রম, বেঁচে থাকার দুঃসাধ্য সাধনা, তার ভেতরে যা কিছু সান্ত্বনা এইটুকুই। ভোরের রঙে আকাশ ফিকে হয়ে উঠবার আগেই খানিকটা নুন-পান্তা গিলে বেরিয়ে পড়তে হবে জীবিকার সন্ধানে।

বিলের দিক থেকে হু হু করে আসছে রাত্রির বাতাস। সেই বাতাসে ভেসে আসা মরা ঘোড়াটার গন্ধ। লালু চৌকিদারের তরমুজ ক্ষেতে মনসা কাঁটাগুলো খর খর করে শব্দ করছে। বিলের তলায় দাম-ঘাসের স্নেহালিঙ্গন থেকে এই রাতে লালু চৌকিদার মাঝে মাঝে উঠে আসে কি? ঠিক ঘরের পেছনেই কি শব ডাক শোনা যায়—ঘুমের মানুষ, হো ঘুমের মানুষ, জা—গো—

বিলের ওপারে উঠল কৃষ্ণা পঞ্চমীর চাঁদ। কুঞ্চিত কালো জলে কলমীর ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। মাথার ওপরে বুনো হাঁসের পাখা জ্যোৎস্নার রঙ মেখে ভেসে চলে গেল।

বসির, রোসেনা আর পাইকার এসে দাঁড়াল বিলের ঘাটে। সঙ্গে করে নেবার মতো বিশেষ কিছু নেই। একটা ছিন্ন মলিন বিছানা, একটা বদনা, ফুটো কলসী, একটা কড়াই আর একছড়া জাল। পাইকারের কথাই সত্যি। সন্ধ্যার ব্যাপারের পরে এ গ্রামে থাকবার আর অধিকার নেই ওদের। হালিম শাহুর ঊনবিংশ শতকীয় রাজ্যে এ অপরাধ চূড়ান্ত। হয়তো জেল খাটতে হবে—হয়তো—সর্বগ্রাসী দাবানলের সহস্র শিখার মাঝখানে শুকনো তৃণখণ্ড।

রোসেনা কাঁদছিল। কিন্তু বসির একটা কথাও বললে না, একটি দীর্ঘশ্বাসও নেমে এল না তার। মোছলমানের বাচ্ছা! শিরায় শিরায় হিংস্র রক্ত এখনও ফেনিয়ে উঠছিল। একটুর জন্য ফসকে গেল হাঁসুয়াটা। পীরু মিঞার মাথাটাকে নামিয়ে দিতে পারলে কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকত না আর।

একবার পিছন ফিরে তাকালো বসির। দুই পুরুষ আগে চলন বিলের পার থেকে জমিদারের অত্যাচারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। আজ আবার তারই পুনরভিনয় চলছে। সমাজ ওদের আশ্রয় দেয় না, ধর্মের ছত্রছায়া ওদের জন্যে নয়। ঢেউয়ের মুখে মুখে দ্বীপহীন কূলহীন ওরা জীবনের অতল সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়, চারদিক থেকে হিংস্র জন্তুর করাল মুখ জেগে ওঠে ওদের গ্রাস করবার জন্যে। মহামানবের মহাসাগরে ওরা ক্ষণবুদ্‌বুদ।

ধাওয়া পাড়া ঘুমিয়ে আছে শান্তিতে। শান্তি নয়, নেশার আচ্ছন্নতা। এ স্বপ্ন কতক্ষণ থাকবে? আজ যে দুর্ভাগ্যের দণ্ড ওদের মাথার ওপরে নেমে এসেছিল, কাল আবার সেটা কাকে অনুগ্রহ করবে কে জানে। হয়তো ঘুমের ঘোরে ওরা স্বপ্ন দেখছে যুদ্ধ গেছে থেমে;

ক্ষেতে তুলছে সোনার শীষ, মাছের ভারে জাল ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম করছে ; রোসেনার গায়ে উঠেছে রূপোর গয়না, পরনে রঙীন ডুরে শাড়ি। হাঁড়িতে জীইয়ে রাখা কই মাছগুলো হয়তো এমনি করেই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে।

বসির ঠেলে নৌকাটাকে বেশি জলে নামিয়ে নিলে, তারপর কালো জল ঠেলে এগিয়ে চলল ডিঙ্গি। ছল-ছল ছলাৎ। দাঁড়ের মুখে শাদা শাদা ফেনার ফুল জ্যোৎস্নায় জ্বলে উঠছে। দূরে মিলিয়ে এল হাসানপুরের বন্দর, ধাওয়া পাড়া আর লালু চৌকিদারের কাঁটা-ওয়ালা ফণীমনসার ক্ষেত। এখানে ওখানে বিনেদের ভেসাল মাথা উঁচু করে রয়েছে—দূর থেকে মনে হয় চাঁদের আলোয় লম্বা লম্বা ঠ্যাং ডুবিয়ে অতিকায় কতগুলো বক দাঁড়িয়ে আছে যেন। এই বিন্—এরাই ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। বসির নিরুদ্ধ আক্রোশে দাঁতে দাঁত নিষ্পেষণ করলে একবার।

রোসেনা চুপ করে বসে আছে কাপড়ের একটা ছোট পুটলির মতো। সেদিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে পাইকার বললে, মন খুব খারাপ করছে, না বসির ভাই ?

—মন খারাপ ?—নাঃ। দাঁড় টানতে টানতে চাপা স্বরে জবাব দিলে বসির। কার জন্যে খারাপ করবে মন, কিসের জন্যে ? মাটিতে যাদের শিকড় নেই, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শিমুল তুলোর মতো যাদের জীবন, কিসের মোহ তাদের ? চলনবিল, হাসানপুর, সেখান থেকে লাহিড়ীবাবুদের জমিদারী, কিন্তু সেখানেও আসবে দমকা হাওয়া, আবার এমনি করেই—

বিলের এখানে ওখানে ছোট বড় চর, কর্দমাক্ত মাটি আর শনের জঙ্গল সেখানে মাথা তুলে রয়েছে। দিনের বেলা ঘুরে বেড়ায় কাদাখোঁচা আর গাংশালিক। সেই সব চরের পাশ দিয়ে ছোট বড় নালার মতো রন্ধ্রপথে জল বেরিয়ে গেছে। পথ সংক্ষেপ করবার জন্যে লগির খোঁচা দিয়ে বসির নৌকাটাকে তারই একটা নালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

ঘ্যাস্ করে আটকে গেল ডিঙ্গি। তলায় কী একটা বাধা দিয়েছে। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল একটা মাছ ধরবার খাঁচা, এ দেশী ভাষায় 'ডারকিনা'। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল ডারকিনার ভেতরে প্রচণ্ড একটা ছপাছপ আওয়াজ, নিশ্চয় কোনো বড় মাছ আটকে পড়েছে। বিলের বড় বড় বোয়াল আর কালবোস এ সময়ে প্রায়ই ধরা পরে ডারকিনায়। বসির বললে, মস্ত মাছ আছে।

পাইকার জিজ্ঞেস করলে, তুলে নেবে নাকি ?

এক মুহূর্ত চিন্তা করলে বসির। পরের জিনিস তুলে নেওয়ার অর্থই চুরি করা। কিন্তু কী হবে চুরি করলে। যারা তার মুখের ভাত থেকে ঘরের ইজ্জৎ পর্যন্ত চুরি করতে চায়, তাদের জন্যে কী অত ভালোমন্দের বিচার করা ? রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল।

—তুমি নৌকাটা একটু হটিয়ে নাও পাইকার। আমি তুলে আনি মাছটাকে।

পাইকারের চোখ চকচক করে উঠল। অবগুণ্ঠিতা রোসেনা চুপ করে বসে আছে, তার মুখ দেখা যায় না। সুডোল হাতের ওপর কাঁচের চুড়িগুলোতে জ্যোৎস্না জ্বলছে। পাইকারের চিন্তায় যেন ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব চলছিল।.

বসির ঝুপ করে নেমে পড়ল জলে। আর সেই মুহূর্তেই লগির একটা খোঁচা দিয়ে পাইকার নৌকাটাকে নালা ছাড়িয়ে প্রায় বিলের মুখে সরিয়ে নিয়ে এল।

হঠাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল বসির।—মাছ নয় পাইকার, মস্ত বড় সাপ। আমাকে কামড়ে দিয়েছে। সব জলে গেল পাইকার, নিশ্চয় আলাদ গোখুর।

নিরুত্তরে পাইকার নৌকাটাকে আরো দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বসির চিৎকার করতে লাগল, পাইকার, শরীর জ্বলে গেল পাইকার, তুলে নাও আমাকে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না পাইকার।

রোসেনা কেঁদে উঠল, পাইকার, পাইকার।

নৌকাটা তখন বিলের অথই জলের মধ্যে এসে পড়েছে। দাম ঘাসের আগাগুলো মাথা তুলে আছে, হাওয়ায় দুলছে গোখরো সাপের কিলবিলে একরাশ ছানার মতো। বিলের জল ঝলমল করছে যেন বাঘের চোখ। পাইকার শান্ত স্বরে বললে, কেঁদে আর কী করবে বিবিজান, মানুষ তো আর চিরকাল বাঁচে না।

নিশাচর

পাশ দিয়ে একটা একচক্ষু ট্যাক্সি গেল বেরিয়ে। কালো কাগজে সে চোখটাও আচ্ছন্ন —তার ওপরে একরাশ বৃষ্টির বিন্দু জমে রয়েছে। জলে-ডোবা মানুষের পাণ্ডুর দৃষ্টি যেন। অন্ধকার চিৎপুর রোডের দু'পাশে স্প্রের মতো কাদা ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

দাড়িয়েছিলাম নিজেকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়েই। কিন্তু মোটরের কাদা বোমার স্প্লিন্টারের চাইতেও দ্রুতগামী এবং দূরগামী। বেশ অনুভব করলাম, ছেঁড়া র‍্যাপারটা অভিসিঞ্চিত হয়ে গেছে।

শীতার্ত জানুয়ারীর রাত্রি। আহিরীটোলা পেরিয়ে হু হু করে গঙ্গার হাওয়া আসছে। সে হাওয়াতে আর যাই থাক, জননী জাহ্নবীর করুণার আভাস নেই এতটুকুও। ঠাণ্ডায় হাত মুখ যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই পেটের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে খিধের আগুন।

সুদূর প্রাচীতে জাপানী বোমা অবতীর্ণ হয়েছে। সাইগন রেডিওতে এশিয়ার কল্যাণে অতি-মানবদের সাশ্রু শুভেচ্ছা। পীতবর্ণ কল্কি অবতারের আবির্ভাব হয়েছে জাপানের সমুজ্জ্বল দ্বীপে।

কলকাতায় ব্ল্যাক্ আউট। আলোগুলো এখনও সম্পূর্ণ নেভেনি, কালো ঠোঙার ফাঁকে ক্ষীণ আলোক-চক্র অসহায় পদচারীদের দিক্‌ভ্রান্তি ঘটাচ্ছে মাত্র। আর কলকাতার অসুস্থ আকাশ থেকে আলকাতরার মতো কালো বৃষ্টির ধারা গলে পড়ছে পথের ওপর—চিৎপুর রোড রৌরব নরকের পিতৃত্ব দাবি করতে পারে। তবু অন্ধকারে পথের কাদার স্বরূপটা দেখতে পাচ্ছি না, এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

কিন্তু কী করা যায়। এই শীতের রাত্রে অন্ধকারে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হলে নির্ঘাৎ বরফের মতো আমাকে জমে যেতে হবে। কিন্তু জমে যাওয়া চলবে না, অন্তত আজ রাত্রে কোনোমতেই নয়। পার্টির একরাশ অত্যন্ত জরুরী কাগজপত্র আছে সঙ্গে। সে কাগজ-গুলোকে যথাস্থানে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আমাকে বাঁচতেই হবে এবং নিজেকে বাঁচাতেই হবে শান্তিরক্ষকদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি থেকে।

টং করে ঘড়ির আওয়াজ কানে এল একটা। কটা বেজেছে কে জানে। হয়তো সাড়ে বারোটা কিংবা একটা-দেড়টা হওয়াও আশ্চর্য নয়। কলকাতার এই কুৎসিত পল্লীতেও অদ্ভুত স্তব্ধতা। আগে এ পাড়ায় সারারাত কুশ্রীতার উল্লাস চলত, বণিক্ সভ্যতার সমস্ত বর্বরতা মুক্তি পেত এইখানেই। কিন্তু জাপানী বোমার আসন্ন গর্জন কি মানুষের পশুত্বের দিকটাকেও রুদ্ধ করে দিয়েছে? মর্তে সত্যযুগের সত্যিই আবির্ভাব হল নাকি?

তীব্র হুইসিলের শব্দ শোনা গেল দূরে। জুতোর মচ্‌মচ্ শব্দে টালা থেকে টালীগঞ্জ অবধি প্রতিধ্বনিত করে এগিয়ে আসছে কেউ। পুলিস ছাড়া অমন বলদর্পিত পদভরে কে হাঁটতে পারে!

শুভদৃষ্টি হয়ে গেলে বঁধুয়ার হাত থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। লালবাজারেই মধুযামিনী যাপন করতে হবে। কিন্তু আপাতত মনের অবস্থা প্রিয়-সঙ্গমের অনুকূল নয়, তড়িদ্বেগে পাশের গলিতে ভিড়ে গেলাম।

বাঃ, চমৎকার! ডাইনে বাঁয়ে, মাটিতে অন্তরীক্ষে জীবসৃষ্টির আদিম অন্ধকার; এ গলিটা কখনো জীবনে আলোর মুখ দেখবে বলে আপাতত কোনো চূড়ান্ত আশাবাদীও আশা করতে পারে না। তবু মন্দের ভালো, ঠোঙ্গাপরা আলোগুলোর মতো ছলনা করে না, নিজেকে নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে দেওয়া যায় রাত্রির করুণার ওপরে। কিছুক্ষণ এখানে গা-ঢাকা দেওয়া চলতে পারে।

কিন্তু সময় আর কাটে না। সারাদিন পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি, ক্লান্তিতে সমস্ত শরীরটা ভেঙে পড়তে চায় মাটিতে। অসহ্য শীতে হাড়গুলো যেন রায়বেঁশে নাচ নাচতে শুরু করে দিয়েছে। মুখের ওপর এসে বিঁধছে সূচ্যগ্র বৃষ্টির বিন্দু। পায়ের আঙুলগুলো একটা একটা করে খসেই পড়বে হয়তো।

এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না—বাঁচতে আমাকে হবেই। আশ্রয় চাই, উত্তাপ

চাই। নিদ্রিত নগরীর ঘরে ঘরে উষ্ণ লেপের তলায় আর উষ্ণ নারীমাংসের উত্তাপে পূর্ণোদর মানুষ স্বপ্ন দেখছে এখন। নিয়মিত চাকুরি, নিভৃত নীড়, নিশ্চিন্ত প্রেম। বাইরে অন্ধকার কালো রাত্রির মধ্যে সহস্র বাহু প্রসারিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে পঙ্কিল কামনা, তীক্ষ্ণাগ্র হিংসা। আর—আর হয়তো অতন্দ্র হয়ে প্রহর কাটাচ্ছে নতুন প্রভাতের নতুন সূর্যের তপস্যা।···

খক্‌-খক্‌-খক্‌। খক্‌-খক্‌-খক্‌। পাশের একটা বাড়িতে কে যেন কাশছে। অনেকক্ষণ কাশছে। কাশছে একটানা ভাবে—শব্দটা সন্দেহজনক। নিভৃত নীড়ের নেপথ্যে কবোষ্ণ প্রেমই শুধু মদিরতা বিস্তার করছে না তাহলে। শীতজর্জর রাত্রির রাজপথে যে নিরাবরণ নগ্নমৃত্যু বিচরণ করছে, তার বিষাক্ত স্পর্শ অলক্ষ্য জীবাণুর আকারে ঐ সব সুখস্বর্গে গিয়েও হানা দিয়েছে।

একটা বিচিত্র ভয়ে সমস্ত মনটা যেন শিউরে উঠল। এই বিরাট মহানগরীর হৃৎপিণ্ড দুটোকেও বুঝি ওই বীজাণুগুলো অমনি নিঃশব্দে নিঃশেষ করে চলেছে—কালো বৃষ্টির কণায় বুঝি তার অন্তিম অশ্রু। পিতৃপুরুষের শতাব্দী সঞ্চিত পাপের বীজাণু—চূড়ান্ত অপমৃত্যু ছাড়া বুঝি নিস্তার নেই তার হাত থেকে।

অন্ধকারে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি। একটা গাড়িবারান্দা, একফালি রোয়াক, মাথার উপর খানিকটা ছাদের আবরণ। কিছু না থাক একটুখানি শুকনো জায়গা চাই অন্তত। পরের কথা ভাবা যাবে কাল সকালে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে লাফিয়ে উঠলাম। পায়ের নিচে মানুষের একটা দেহ। মড়া নয় তো!

কিন্তু আমার দুর্ভাবনা দূর করে দিয়ে মড়াটা কথা কয়ে উঠল। বেশ চড়া গলাতেই মড়ার সাড়া এল :

—গায়ের ওপর দিয়েই মাড়িয়ে যাচ্ছ যে? আচ্ছা লোক তো?

—মাপ করো ভাই, অন্ধকারে দেখতে পাইনি।

বিনয় বাক্যে লোকটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল।

—মাল গিলেছ কতটা?

এত দুঃখেও হাসি এল। বললাম, মাল গেলার পয়সা কোথায়? কিছু ধার দিতে পারো? লোকটা অন্ধকারের মধ্যে কর্কশ ভাবে হেসে উঠল।

—বাঃ, বেড়ে রসিক লোক তো। বোসো বোসো দোস্ত, বিড়ি খাও একটা।

বললাম, শীতে জমে যাচ্ছি যে। বসলে আর উঠতে পারব না।

—শীতে জমে যাচ্ছ?—লোকটার গলায় সহানুভূতির আমেজ এল : সে কথা আগেই বলতে হয়। পাশের গর্তটায় ভিড়ে যাও না, দিব্বি গরম আছে এখনো।

সবিস্ময়ে বললাম, গর্ত !

—হ্যা, হ্যাঁ, গর্ত। চটপট ঢুকে পড়ো, নইলে আর কেউ এসে দখল করে নেবে। মেড়ো ব্যাটারা অনেক রাত অবধি জিলিপি ভাজে, তাই ভেতরটা এখন খাসা গরম।

ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল এতক্ষণে। রাস্তার পাশে খাবারের দোকানের বিরাট উনুন। তারই গর্তের মধ্যে পেট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে শীতের রাত্রি যাপন করছে মানুষ। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

মাড়োয়ারীদের দয়া আছে বলতে হবে। উনুনে কি এই জন্যই বেশি কয়লা দেয় ওরা ? চর্বি মেশানো ঘি, সোপস্টোন মেশানো ময়দা আর তিসি মেশানো সর্ষের তেল। কিন্তু ধর্মশালার ধর্মচচায় এতটুকু ত্রুটি নেই ওদের।

একবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল। নিশ্ছিদ্র মেঘে আর নিদ্রিত নগরীর বিষাক্ত প্রশ্বাসে একেবারে গ্র্যানাইটের মতো কঠিন আর জমাট হয়ে রয়েছে। ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছে—পা দুটো যেন কাঠের তৈরি। আর সামনে উনুনের লোভনীয় আশ্রয়, কয়লার উত্তাপে রাতটা কেটে যাবে দেখতে দেখতে। সামনে সদর রাস্তায় বুটের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে এখনো।

পা দুটো চালিয়ে দিলাম গর্তে। একেবারে কোমর পর্যন্ত। ভেতরের ছাইগুলো গনগন করছে, দু-একটা তীক্ষ্ণ জ্বালারও অনুভূতি। কিন্তু বাইরের অসহ্য শীতের কাছে স্বর্গীয় আরাম বলতে হবে নিশ্চয়।

—ঢুকেছ তো ? ব্যাস, একটা বিড়ি ধরাও এইবারে।

ঘস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। আর তারই আলোয় চোখে পড়ল সঙ্গীর মুখখানা। মাথার ধুলোমাখা চুলগুলো জট পাকানো। সমস্ত মুখে ব্রণ অথবা বসন্তের গভীর ক্ষতাঙ্ক ; একটা রক্তাক্ত ক্ষতে নাকটা খসে পড়বার উপক্রম করছে, নিশ্চয়ই অকথ্য ব্যাধিতে। দুটো বড় বড় কীটদষ্ট দাঁত বেরিয়ে আছে ফাটা ঠোঁটের খোলা দরজা দিয়ে।

একটা বিড়ি এগিয়ে এল আমার দিকে : নাম্বার ওয়ান—চলবে ?

নাম্বার ওয়ান—কথাটা সাংকেতিক। বিড়িই বটে, কিন্তু তামাকের নয়, গাঁজার।

বললাম, না, চলবে না।

—ধেৎ দোস্ত, ভারী বেরসিক তুমি। বোতল টানতেই শিখেছ খালি।

চুপ করে রইলাম। বুকের কাছে কাগজগুলো খস খস করছে। একরাশ নিষিদ্ধ ইস্তাহার। জগতের বঞ্চিত জনগণ, জাগো তোমরা। হাতুড়ির মুখে পুঁজিবাদকে গুঁড়ো করে লুটিয়ে দাও মাটিতে। একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারাদের কিছু আর হারাবার নেই।...

টিপ টিপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে মুখে। গাঁজার ধোঁয়া আর পচা ঘায়ের গন্ধ যেন নিঃশ্বাস আটকে আনছে। বন্ধুর সংসর্গ লোভনীয় বোধ হচ্ছে না। গণ-দেবতার রূপ।

—তারপর খবর কী দোস্ত? নেশাভাঙ যে করো না, সে তো চেহারাতেই মালুম হচ্ছে। পুলিসের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ নয় তো?

বললাম, যা বোঝো।

—বেশ, বেশ, দলে এসো তা হলে।—লোকটা খুশি হয়ে উঠল : কী করেছিলে? খুন? চুরি? হাত দিয়েছিলে মেয়েমানুষের গায়ে? তা চুপচাপ পড়ে থাকো এখানে। শীতের রাত্তিরে কোন্ ব্যাটার সাধ্যি যে খুঁজে বার করবে তোমাকে।

সময় গড়িয়ে চলেছে। ফুটপাথের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে শুয়ে আছি, ছেঁড়া র‍্যাপার কান দুটোকে রক্ষা করছে হিমেল হাওয়ার আক্রমণ থেকে। শুধু মাঝে মাঝে দূরের সেই বাড়িটা থেকে ভেসে আসছে যক্ষ্মারোগীর কাশির শব্দ।

টিপ্-টিপ্-টিপ্। টপ্-টপ্-টপ্। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে, চারদিক থেকে কাদার বিন্দু ছিটকে আসছে গায়ে। ঝম ঝম শব্দে জোরালো বৃষ্টি নেমে এল।

আহত কুকুরের মতো সঙ্গী আর্তনাদ করে উঠল।

উনুনের ভেতর থেকে পা দুটোকে টেনে বের করে নিয়ে এলাম। এমন অসহায় ভাবে ভেজা চলবে না কোন মতেই। নিজের জন্যে নয়—কাগজগুলোকে অন্তত রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু রাত শেষ হবে কখন! নিদ্রিত কলকাতার বুকে এই বীভৎস অন্ধকার—এ যেন কত যুগ যুগ ধরে অনড় আর অটল হয়ে আছে। সন্ধ্যার ছদ্মবেশে মৃত্যু এসে যেন মহানগরীকে গ্রাস করেছে—এই ঘুম, প্রাসাদপুরীর এই অন্তিম তন্দ্রা আর কখনো ভাঙবে না।

কী অমানুষিক অন্ধকার! হোঁচট খাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে তীব্র একটা যন্ত্রণাবোধ।

অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের একটা তীক্ষ্ণ শিখা দিকে-দিগন্তে ভয়াল সরীসৃপের মতো খেলা করে গেল। প্রেত-রাজ্যের মতো তমসাচ্ছন্ন গলিটা মায়াপুরীর মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুহূর্তে। বজ্রের গর্জনে দুপাশের বাড়িগুলো ঝন ঝন করে কাঁপতে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

সামনে আলোকিত একটা রোয়াক। বারান্দায় কে যেন দাঁড়িয়ে। এই রাত্রে, এমন গলিতে এখনো মানুষ জেগে আছে নাকি? এখনো কি কেউ কারো জন্যে প্রতীক্ষা করে?

ভাববার আর সময় নেই। চুঁইয়ে বৃষ্টির জল ভেতরের কাগজপত্রগুলোকে সব ভিজিয়ে দেবার উপক্রম করছে। বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লাম আলোকিত রোয়াকে।

বিবর্ণ সবুজ রঙের স্কার্ফ-জড়ানো বিবর্ণতর একটি মেয়ে। মুখের খাঁজে খাঁজে শাদা পাউডারের প্রলেপ। সাদর আমন্ত্রণ জানালে, এসো এসো ভিতরে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই ভেতরে চলে এলাম।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটি আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। কেরোসিনের আলোয়

এতক্ষণে আমাকে সম্পূর্ণ দেখবার সুযোগ পেয়েছে সে। কোমর পর্যন্ত উনুনের ছাই। গায়ের ময়লা ছেঁড়া র‍্যাপারটা ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে।

মেয়েটার শ্রীহীন মুখ আশংকায় আরো বিশ্রী হয়ে উঠল। চেহারা দেখেই সহজাত সংস্কারবশে সে টের পেয়েছে আমি তার খদ্দের নই।

—কী চাই ?

জবাব না দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ঘরে খাট নেই। এক পাশে দুটো টিনের তোরঙ্গ, সামান্য জিনিসপত্র, আলনায় ছেঁড়া ময়লা শাড়ি। সমস্ত মেঝেটা জুড়ে অপরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা রয়েছে, তার মাঝখানে ফর্সা একটা তাকিয়া আর একটা হার্মোনিয়াম। এক কোণে এক জোড়া তবলা-ডুগি, ঘুঙুর।

নিরুত্তরে বিছানায় বসে পড়লাম। আর দাঁড়াতে পারছি না। ঘরের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ উত্তাপ, নেবা-উনুনের আগুন নয়। হাওয়াটা শুষ্ক এবং মধুর—দৈহিক উপস্থিতির নিবিড়তায় ঘনীভূত। শীতে শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে করছিল বিছানাটার ওপর গড়িয়ে পড়ি।

মেয়েটার মুখেও বোধ করি কথা যোগাচ্ছিল না। কালো এবং কুৎসিত। বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে হয়তো, হয়তো তার চাইতেও বেশি। জৈব-প্রেরণা কতখানি অত্যুগ্র হয়ে উঠলে যে মানুষ নিশীথ-নাট্যে এই মেয়েকে নায়িকা করতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন। সমস্ত চোখে-মুখে রেখা আর কালি—অসংখ্য লালায়িত সরীসৃপের গতিরেখায় যেন চিহ্নিত।

—কি চাও তুমি ?—জিজ্ঞাসু ভীত-দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রাত্রির আগন্তুকেরা সকলেই তার পায়ে প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদন করতে আসে না। মদের গ্লাসে তারা অলক্ষ্যে মিশায় স্ট্রিকনিনের গুঁড়ো ; নেশা বেশি ঘন হয়ে উঠলে গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়ে নির্বিবাদে সব কিছু নিয়ে সরে পড়ে। অবিশ্বাস আর অপমৃত্যুর কেন্দ্রবিন্দুতে টলমল করছে ওদের জীবন। পদ্মপাতায় শিশির।

বললাম, কিছুই নয়, খানিকক্ষণ আশ্রয় চাই শুধু।

—আশ্রয় !—মেয়েটার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঃ ফেরারী ? পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি ?

হাসলাম।

—কী করেছিলে ?

বললাম, বিশেষ কিছু নয়। সঙ্গে কতগুলো কাগজ আছে, তা ছাড়া আর কোন অপরাধ নেই।

দেখতে দেখতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এতক্ষণে সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেছে, একটা নিবিড় আন্তরিকতায় ছলছল করে উঠেছে ওর চোখ।

—স্বদেশী ?

—অনেকটা তাই।

—এই শীতের রাত্রে পথে পথে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ ভদ্রলোকের ছেলে! গায়ে একটা গরম জামা নেই, কিছুই নেই—

বললাম, রাত দশটার সময় হঠাৎ বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল, তাই পাঁচিল টপকে বেরিয়ে পড়েছি।

একটা গভীর উৎকণ্ঠা আর স্নেহের স্বর কানে এল : নাও, নাও, শুয়ে পড়ো ওখানে। এই লেপটাই জড়িয়ে নাও গায়ে। কোনো ভয় নেই।

বললাম, আর তুমি ?

—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

সত্যিই তো, সে ভাবনা ভেবে আমি কি করতে পারি। এই মুহূর্তে আমার লেপের প্রয়োজন, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমাকে বাঁচতে হবে, অন্তত কাল সকাল পর্যন্ত এই কাগজগুলোর দায়িত্ব বহন করতে হবেই। শুধু নিজের জন্যেই আজকে আমার জীবনের মূল্য নয়, বহুর জন্যে—বৃহত্তর পৃথিবীর, সমস্ত জগতের জন্যে।

লেপের আকর্ষণটা তীব্র মনে হচ্ছে। একবার তার কোমল স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে তলিয়ে গেলে সকাল আটটার আগে আর ঘুম ভাঙবে না। সমস্ত শরীরে যেন শতাব্দীর তন্দ্রা আর ক্লান্তি এসে ভেঙে পড়েছে। এই বারবণিতার ঘরে, অসংখ্য ব্যভিচারের স্মৃতি-কণ্টকিত এই শয্যায়, উজ্জ্বল দিবালোকেও আশ্রয় নেবার কথা ভাবলে দেহ-মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষাচঞ্চল এই শীতের রাত্রে আজ সব কিছুরই অর্থ বদলে গেছে। নিশীথ নগরীর এই ভয়ার্ত ক্লিন্ন রূপ, শ্বাসরোধী অপমৃত্যুর মতো নিষ্প্রদীপের অন্ধকার। সহস্র শতাব্দী ধরে যে গোপন ব্যাধিটা বিষাক্ত হয়ে উঠছিল, আজ তার চরম আত্মপ্রকাশ। এরই মাঝখানে আজ পারিপার্শ্বিক জগৎটা যেন প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে তার সত্য এবং আদিম অমার্জিত রূপে। আলো, প্রসাধন আর ঐশ্বর্যের প্রচ্ছদপটের নিচে রূপাজীবা নগরীর আসল চেহারা —নিভৃত মর্মজগৎ।

—নাও, শুয়ে পড়ো তুমি। আমাদের বিছানায় শুতে হয়তো ঘেন্না করবে, কিন্তু ফুট-পাথ কিংবা মিঠাইওলার উনুনের চাইতে খারাপ নয় নিশ্চয়ই।

মেয়েটি বিছানার একপাশে এসে বসল। তার বিবর্ণ বিকৃত চেহারায় দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি। সমস্ত চোখে মুখে যে ক্ষুধা তার প্রকট হয়ে উঠেছে সে ক্ষুধা অন্নের। জৈব-কামনা নয়, মদিরাক্ষী বারবধূর লাস্য-বিভ্রমও নয়। চকিতে মনে হল স্নেহে আর করুণায় তার দীপ্তিহীন চোখ দুটি উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু—সমস্ত ভাবনার ওপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। স্বার্থপরতা বই কি!

আজ রাত্রে খরিদ্দার না জুটলে কাল হয়তো তাকে উপবাস করতে হবে। ঘরের চারিদিকে যে দারিদ্র্য লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় আত্মপ্রকাশ করছিল, তার নগ্ন রিক্ততা যেন আমাকে আঘাত করতে লাগল। এখানে রাত্রিযাপন করবার অর্থ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।

বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। অনিচ্ছুক আড়ষ্ট পা দুটোকে একত্র করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। কিন্তু আশ্রয়দাত্রীর স্বরে প্রকাশ পেল ব্যগ্র উৎকণ্ঠা : উঠলে যে?

—নাঃ, যেতে আমাকে হবেই। তোমার উপকার ভুলব না কখনো—শ্লথ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বুকের কাছে খস্ খস্ করে উঠল রিপোর্ট আর ইস্তাহারগুলো।

—এই রাত্রে, এই ঠাণ্ডায় না গেলেই চলত না কি?

মুখ ফিরিয়ে হাসবার চেষ্টা করতে হল : বিপদে পড়লে আবার না হয় ফিরে আসব।

ক্ষণিকের একটা ছায়াছবির মতো দেখলাম আলোকিত দরজার পটভূমিতে বিবর্ণ স্কাফ-জড়ানো পণ্য নারীমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময় কতদিন দেখেছি দিদিকে দরজায় ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আবার সেই অন্ধকার আর গলির পথ। বাইরে হিমেল রাত্রির কবল থেকে কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম, পলাতক শিকারকে মুঠোর মধ্যে খুঁজে পেয়ে শীতের বাতাস যেন নিষ্ঠুর ভাবে দস্তুর হয়ে উঠেছে। দুটো বরফের টুকরো কানের ছিদ্র দুটোকে আটকে বসেছে, নাক দিয়ে খানিকটা রক্ত নেমে আসবার উপক্রম করছে বোধ হয়। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে দুঃসহ যন্ত্রণা।

আকাশে তারা দেখা দিয়েছে দু-চারটে। উজ্জ্বল নয়, হাল্কা মেঘ আর কুয়াশায় এখনো আচ্ছন্ন। লোহার রেলিংওলা একটা বড় বাড়ির গারগয়েলের মুখ দিয়ে ছড়্ ছড়্ করে জল আছড়ে পড়ছে। গেটের কাছে ঢাকনা দেওয়া একটা আলো; তারই অস্পষ্ট দীপ্তিতে দেখা যাচ্ছে ভেনাসের একটা নগ্ন মূর্তি, অযত্নে তার সর্বাঙ্গে পাতলা নীল শ্যাওলার একটা আস্তর পড়েছে। এই অন্ধকার গলির সঙ্গে অন্ধকার-মাখা শ্রীহীন বাড়িটা অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে গিয়েছে।

সামনে একটা বড় রাস্তা। শোভাবাজার স্ট্রীট নিশ্চয়। বড় বড় বাড়িগুলো যেন অন্ধকারের দুটো অসমতল কালো প্রাচীর খাড়া করে রেখেছে। বৃষ্টিতে ভেজা প্রশস্ত পথ ক্ষীণ আলোতে জ্বলজ্বল করছে।

ঝন্ ঝন্ করে একটা প্রবল শব্দ এল কানে। সমস্ত শরীরটা মুহূর্তে ছম্ ছম্ করে উঠল চকিত আশংকায়। নিদ্রিত কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বোধ হয় ছড়িয়ে গেল শব্দটা।

নিশাচরের মতো চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে দেখলাম এমন রোমাঞ্চকর নয় ব্যাপারটা। তিন-চারটে কুকুর একসঙ্গে বোধ হয় একটা ডাস্টবিনের ভেতর আশ্রয়

নেবার চেষ্টা করেছিল, তাদের সমবেত চেষ্টায় সেটা আছড়ে পড়েছে। পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তার উপর দিয়ে দু'তিনটে কি বড বড় দৌড়ে গেল এক পাশে, বোধ হয় ড্রেনের ঝাঁজির মধ্যে গিয়ে নামল। ইঁদুর।

দূরে চিৎপুর রোড দিয়ে একটা মোটর গ্রে স্ট্রীটের পথে বেরিয়ে গেল। হয়তো ডাক্তারের গাড়ি, হয়তো সোনাগাছি থেকে আনন্দ লুণ্ঠন করে ফিরলে কেউ, হয়তো—

দপ্ দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠল। একটা বাড়ির গাড়িবারান্দার নিচে। রাত্রির বুক চিরে যেন এক ঝলক টাটকা রক্ত পড়ল ছড়িয়ে। আগুনের আলোয় পাঁচ-সাতটা মাথা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—একদল ভিখারী। ওদের দিকেই এগিয়ে চললাম, হাত পা দুটোকে অন্তত সেঁকে নেওয়া চলবে।

চমৎকার আসর জমিয়েছে। গোল হয়ে আগুনটাকে ঘিরে বসেছে ওরা, ছেঁড়া কম্বল আর নোংরা কাপড়চোপড়ের বাইরে অনাবৃত অঙ্গগুলোকে আগুনে সেঁকে নিচ্ছে। আর হলদে ন্যাকড়া জড়ানো একটা ছোট কল্‌কে বৃত্তটির ভেতর পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

—আ যাও ভেইয়া, বৈঠে যাও। তাম্‌কু পিব?

বললাম, তাম্‌কু তো নেহি পিতা ভেইয়া, জারুকে লিয়ে থোড়া আগ্‌কা জরুরৎ—

—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। আগ্‌ তো হ্যায়ই হিঁয়াপর—

লোকগুলি আমার মুখের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোন প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করবার কিছু নেই। প্রতি রাত্রে এমনিতর অসংখ্য মানুষকে দেখেছে তারা, দেখেছে নিশীথ নগরীর রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য অভিনয়। শীতের রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে যারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, তারা যে স্তরের লোকই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে তাদেরই সগোত্র। দুঃখ এবং রিক্ততার পটভূমিতে সমস্ত মানুষ একাকার হয়ে গেছে; ভিক্ষুক আর ভবঘুরে, চোর আর বারবণিতা, গুণ্ডা আর কুলত্যাগিনী।

কোথা থেকে কাঠ-কুঠরো আর কাগজের টুকরো যোগাড় করেছে ওরাই জানে, আগুনটা জ্বলছে মন্দ নয়। হাত-পাগুলো সেঁকে নিলাম। র‍্যাপারটার জল গায়ের উপর অনেকটা প্রায় শুষে নিয়েছিল, বাকিটুকু আগুনে শুকিয়ে এল। পৌষের রাত্রে গাড়িবারান্দার তলায় ভিখারীদের এই অগ্নিকুণ্ডটা যেন গ্রেট্ ঈস্টার্ন হোটেল!

আগুনের আলোয় সকলের মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। অদ্ভুত সব মুখ—একটা থেকে আর একটার যেন পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। রাশি রাশি চুল দাড়ি, ঝুলে পড়া চামড়া, ঘোলা চোখ। মনে হল যেন যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান পার হয়ে গুহাবাসী একদল আদিম মানুষ এই গভীর রাত্রে কলকাতার ফুটপাথে এসে দেখা দিয়েছে; সেই আদি মানবের মতো আগুনের কুণ্ড জ্বেলে বসেছে ওরা; সামনে পুড়ছে নিহত শিকারের মাংস। সভ্যতার সমস্ত বিবর্তনকে অস্বীকার করে শ্রেণীহীন প্রথম সমাজ এসে আবির্ভূত হয়েছে

নিরঙ্কুশ বর্বরতায়।

চাপা স্বরে কী আলোচনা করছে ওরা। একটু উৎকর্ণ হয়ে উঠতেই কথাগুলো কানে এল। ভাবটা এই রকম :

—কলকাতায় বোমা তাহলে গিরবেই ?

—গিরবে বইকি। নইলে আর এত আন্ধার কেন চারদিকে ? হাওয়াই জাহাজ এসে বোমা ফেলে দিয়ে যাবে, ঘরবাড়ি বিলকুল উড়িয়ে দেবে।

—বিলকুল উড়িয়ে দেবে ? মনুমেণ্ট, চৌরিঙ্গী, সরকারী দপ্তর, লাটসাহেবের কোঠী —তামাম ?

—তামাম !

—উঃ, তবে তো ভয়ানক।

—আলিপুরের হাজতটা উড়িয়ে দেয় আগে ? আর টাঁকশাল ? আর ক্লাইভ ষ্ট্রীট ? এত্‌না এত্‌না রূপেয়াতে সব মরচে ধরে গেল, আর জিন্দা আদমি ভুখে মরে যাচ্ছে।

হাসি এল। টাকায় মরচে ধরে যাচ্ছে আর না খেয়ে মরচে ক্ষুধার্ত মানুষ। স্বর্ণকুলীন সভ্যতার এই-ই বাস্তব রূপ। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত বুভুক্ষুর আর্তনাদ এসে ধ্বনিত হয়েছে এই দুটি কথার মধ্যে। একথা কাউকে শোনাতে হয় না, বোঝাতে হয় না, এ গণদেবতার স্বতোৎসারিত বাণী। তাই রক্ত পতাকাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে দিকে দিকে কোটি বজ্রমুষ্টি।...

কিন্তু আর বসা উচিত নয় এক জায়গাতে। বঁধুয়ার কথা ভুললে চলবে না। ব্ল্যাক আউটের তমাল-কুঞ্জে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাধিকার সন্ধানে, চোখে চোখ মিললে আর নিস্তার থাকবে না। ভিখারীদের দলে যতই ভিড়ে যাই না কেন, তাঁর অভ্যস্ত দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারব না। তার উপর যে অভিজ্ঞান সঙ্গে বয়ে বেড়াচ্ছি, তাতে কতদিনের জন্য যে মিলন-বাসর রচনা হয়ে যাবে, সে সম্পর্কে আগে থেকে কিছু না ভাবাই ভালো।

বাঁশী শোনা গেল। প্রাণনাথ গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়েই আছেন। এই দারুণ শীত আর দুর্যোগেও তাঁর কর্তব্য-প্রেরণা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। পরক্ষণেই শুনতে পেলাম দূরে সেই টালা থেকে টালীগঞ্জ-প্রকম্পী দিগ্বিজয়ী পদধ্বনি।

উঠে পড়লাম। শরীরটাকে অনেকখানি চাঙ্গাবোধ করছি এখন। বরফে হিম হয়ে যাওয়া শিরা স্নায়ুগুলোর মধ্যে যেন আবার গরম রক্ত বইতে শুরু হয়েছে। পেটে অতি তীব্র ক্ষুধার অনুভূতিটা এখন আর কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না, সারা রাত পশুর মতো দাপাদাপি করে বোধ করি এখন সেটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। পা দুটো কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেয়েছে, এখন আবার কিছুটা পথ পাড়ি জমানো চলবে।

মসৃণ ফুটপাথটা কী অস্বাভাবিক শীতল। যেন বরফের তৈরি। কোথায় যেন হাইড্রান্ট,

দিয়ে গঙ্গার ময়লা জল উছলে উঠছে, অন্ধকারে শুনছি তার ঝির্ ঝির্ কল্ কল্ শব্দ। রাত বোধ করি আর বেশি নেই। আকাশের কালির রঙ জোলো হয়ে আসছে, রথতলা ঘাটের ওপার থেকে গঙ্গার স্পর্শ আরো সুতীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে। দু' পাশের বড় বড় বাড়িগুলোর ওপর দেখতে পাচ্ছি উড়িয়ে দেওয়া তুলোর মতো অস্পষ্ট কুয়াশার রাশি এসে জমছে, ম্লান প্রভাতের সূচনায় কালো ঠোঙায় অবগুণ্ঠিত শাদা আলোগুলোতে দেখা দিয়েছে লালাভা।

স্ট্র্যাণ্ড রোড। সামনে দিয়ে অপরিচ্ছন্ন রেল লাইন, একটু দূরেই দু'তিনটি মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাটগুদামের সঙ্গে একাকার হয়ে। তার ওপারে চিরকলতান উদার গঙ্গা, বয়ে চলেছে প্রায়ান্ধকারে, পোস্তার গায়ে শোনা যাচ্ছে জোয়ারের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। রথতলা ঘাটে কালো কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে পোর্ট কমিশনারের কুলি, রিক্শওয়ালা আর ভবঘুরে পশ্চিমার দল। স্টিমারের লাল-নীল আলো দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ ঘাটে।

—কোন্ হ্যায় রে—

চমকে উঠলাম। অন্ধকারে কে কাকে চ্যালেঞ্জ করছে। হয়তো গুম্‌টির গেটকীপার, হয়তো মালগুদামের পাহারাওয়ালা। রাজপ্রহরী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

দ্রুত এগিয়ে চললাম। নোংরা কর্দমাক্ত পথ। ছক্কড় লরী আর গোরুর গাড়ির কল্যাণে নুড়িগুলো মাথা তুলে রয়েছে, আহত বুড়ো আঙুলটায় বিলক্ষণ চোট লাগল একটা। গঙ্গার হাওয়ায় উত্তর মেরুর আত্মীয়তা।

কাশী মিত্রের ঘাট। একটা লাল শিখা আর মাংস-পোড়া হলদে ধোঁয়া প্রাচীরটাকে ছাড়িয়ে উঠছে। কার যেন নশ্বর দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে পঞ্চভূতে। যাক—বাকি রাতটুকুর জন্যে ভদ্ররকমের একটা আশ্রয় পাওয়া গেল। বিবাগীর পক্ষে শ্মশানের চাইতে ভালো জায়গা আর কী আছে!

কোন্ অনাত্মীয় দুর্ভাগা পুড়ছে কে বলবে। শ্মশানে জনমানব নেই। শুধু নিঃসঙ্গ একজন ডোম বাঁশ দিয়ে চিতাটাকে ঝেড়ে দিয়ে নিদ্রাজড়িত চোখে চলে গেল, মড়াটার আর বেশি বাকি নেই। সামনে এখনো অন্তত তিন ঘণ্টা রাত্রি—এ সময়টুকু সে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে কম্বলের উত্তপ্ত আরামের মধ্যে।

চিতাটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঠুঁটো হাত পা আর আকারহীন একটা বিকৃত বস্তু, মানুষ বলে চেনা যায় না; জ্বলন্ত কাঠকয়লার নিচে পোড়া শূয়োরের মতো দেখাচ্ছে। আচমকা মনে পড়ে গেল দক্ষিণ-সমুদ্রের নরখাদকেরা শ্বেতাঙ্গদের কায়দায় পেলে বড় শূয়োর বলে পুড়িয়ে খায়!

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে দগ্ধপ্রায় মৃতদেহ, শ্মশানের গন্ধ, গঙ্গার কলোচ্ছ্বাস। হঠাৎ চোখে পড়ল চিতাটার এক পাশেই একটা শূন্য দড়ির খাটিয়া। ওই

মড়াটাকে বয়ে আনা হয়েছিল নিশ্চয়।

জয় ভগবান। এতদিন ভদ্রলোককে ভুলেছিলাম, আজ তার অপার করুণা দেখে মনে নির্ঘাৎ আস্তিক-বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন চমৎকার আগুনের পাশে এমন রাজ-শয্যা! এ যে লাটসাহেবের গদিকেও লজ্জা দেয়। নির্জন এই শ্মশানে দাঁড়িয়ে মনে হল আমিই সম্রাট আলমগীর—আর এ হচ্ছে আমার মোতিমহল। 'হমেনস্ত্, হমেনস্ত্, ওয়া হমেনস্ত্!' জীবন্তের কলকাতাকে ভয় করি, কিন্তু মৃতের কলকাতার অসীম দাক্ষিণ্যকে অস্বীকার করবে কোন্ অকৃতজ্ঞ!

ছেঁড়া র‍্যাপারটা জড়িয়ে খাটিয়াটার ওপরে শুয়ে পড়লাম। চিতার উত্তাপটা কী চমৎকার লোভনীয়! মড়াপোড়া গন্ধটা যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করছে। আর এমন জায়গায় বঁধুয়ার পদার্পণও যে সহজে ঘটবে না, সঙ্গতভাবে এ আশা করা যায়। পাথরের মতো ভারী হয়ে দেহ আর চেতনার উপরে ঘুম নেমে এল।...

উগ্র হরিধ্বনিতে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অজস্র লোক আর দুটো মড়া এসে জমেছে। কড়া রোদে জাগ্রত জীবন্ত কলকাতা—কাশী মিত্রের ঘাটে স্নানার্থিনীর ভিড়। বেলা সাড়ে আটটার কম হবে না। এইবার মহানগরীর পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

সৈনিক

ডুম ডুম ট্রুম—

সাঁওতালদের নাগাড়া বেজে উঠল। বরেন্দ্রভূমির ঘুমন্ত আকাশে অনেক দিন পরে জাগরণের ছোঁয়া লেগেছে।

আশ্চর্য দেশ। বাংলা দেশই বটে, কিন্তু বর্তমানের নয়। মৃত বাংলার অস্থিকঙ্কাল রাশি রাশি ইট-কাঁকরে ভাঙা জাঙ্গাল আর মজা দীঘিতে ছড়িয়ে রয়েছে, একটা বিরাটের মহাশ্মশান যেন। চারদিকে ধূ ধূ করছে অনুর্বর মাঠ, বিরল-বসতি গ্রামগুলোর ওপর দারিদ্র্যের নগ্নতা; মাথার ওপর ক্ষুধার্ত চিল চিৎকার করে উড়ে যায়, আর লাল মাটির ছোট বড় অসংখ্য টিলার এখানে ওখানে বিরাটকায় শঙ্খিনী সাপ পেট টেনে টেনে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে।

ডুম ডুম ট্রুম ট্রু—সাঁওতালদের নাগাড়া বাজতে লাগল। যাযাবর। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে নতুন উপনিবেশের সন্ধানে। যেখানে মিলবে নির্জনতা, মিলবে খাদ্য। বিমুখ প্রকৃতিকে ওদের ভয় নেই এতটুকুও। মাটির বুক থেকেই ওরা ছিনিয়ে আনতে পারে প্রতিদিনের উপকরণ, বুনো ওল সেদ্ধ করেই ওদের এক বেলা চলে যায়, গো-সাপের পোড়া মাংসেই

ক্ষিধে মেটে। নাগাড়া বাজিয়ে ওরা বাঘ মারে আর যুদ্ধ করে, মাদল বাজিয়ে ওরা নাচে, আর বাঁশী বাজিয়ে ওরা ভালবাসে।

মৃত বাংলার বুকে বহুদিন পরে জীবন্ত মানুষের দল এসে দেখা দিয়েছে। এই শ্মশান ওদের ভালো লেগেছে, এখানেই ঘর বাঁধবে ওরা। মজে যাওয়া দীঘিতে ওদের চোখে পড়েছে কুমীরের ছায়া; ঘাস বনের ভেতর থেকে বুনো শূয়োরের গায়ের উগ্র গন্ধ ওদের নাকে লেগেছে; শিকড়ে শিকড়ে পাথর জড়ানো বট গাছের কোটরে ওরা দেখেছে লকলকে গো-সাপের জিভ।

সামনের বড় মাঠখানা পেরিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল এগিয়ে গেলে কুমারদহ গ্রাম। মুসলমান আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে এসে দেবীকোট রাজবংশের কে একজন এখানে আস্তানা নিয়েছিলেন। তাঁর উত্তর-পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী এখানকার জমিদার।

এই কাহিনীর যখন আরম্ভ, তখন চন্দ্র চৌধুরীর বয়স অতিক্রম করেছে পঞ্চাশের সীমারেখা। টকটকে লাল চেহারা, রক্তের চাপে সমস্ত মুখ যেন ফেটে পড়ছে। কপালের দু'পাশে শিরা দুটো অত্যন্ত স্ফীত। বাঁ-হাতে তিনটে আঙুল নেই। হিজলবনে একবার বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন তিনি—বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে যাওয়ায় বাঘের সঙ্গে কুস্তিতে লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শোনা যায় আছাড় মেরেই বাঘটাকে বধ করেছিলেন—এমনি শক্তিমান পুরুষ চন্দ্র চৌধুরী।

কিন্তু একক চন্দ্র চৌধুরী অসম্পূর্ণ। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটি প্রাণী জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য হয়ে—সে নীল বাহাদুর।

হাতী। কালবৈশাখীর জমাট ঘন-নীল মেঘের মতো তার চেহারা—নীল বাহাদুর নাম তার সার্থক। আসামের পাহাড়ে নিজের দলবলের মধ্যে সে ছিল গজেন্দ্র। শুঁড়ের টানে আকাশ-ছোঁয়া সরল গাছগুলোকে মড়মড় করে দেশলাইয়ের কাঠির মতো নামিয়ে দিত সে, ভরা বর্ষায় সানন্দে অবগাহন করত তরঙ্গ-মাতাল ব্রহ্মপুত্রের জলে। বসন্তে তার মদস্রাবের গন্ধে পাহাড়ে পাহাড়ে চঞ্চল হয়ে উঠত স্বেচ্ছাচারিণী হস্তিনীর দল।

তারপর যূথপতির পায়ে একদিন শৃঙ্খল পড়ল। তখন ফাল্গুন মাস। মহুয়ার গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে গেছে—সমস্ত দিন বপ্রক্রীড়া করেও এতটুকু স্বস্তি নেই নীল বাহাদুরের। স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরীর মতো সামনে এসে দেখা দিলে অপরিচিতা হস্তিনী, নীল বাহাদুর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। কয়েকদিন পরে যখন চমক ভাঙল তখন আর উপায় নেই—'কুনকি'র ছলনায় সে খেদার মধ্যে বন্দী।

অসহায় আক্রোশে কলা গাছগুলোকে উপড়ে, ধারালো দাঁতে মাটিকে বিদীর্ণ করে সে পাগলের মতো ছুটোছুটি করলে। তারপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে ধীরে ধীরে সমস্ত বীর-বিক্রম তার শান্ত হয়ে এল। নীল বাহাদুর আজ চন্দ্র চৌধুরীর বাহন। মাহুতের

নির্দেশে সে সসম্ভ্রমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, ডাঙসের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে তার মন। পায়ের নিচে পাহাড়ীদের গ্রামগুলোকে একদা দলে চুরমার করে দিয়েছে—সে সব এখন গত জন্মের স্মৃতি মাত্র।······

বাইরের দেউড়িতে তখন নীল বাহাদুরের পিঠে হাওদা কষা চলছিল। চন্দ্র চৌধুরী যাচ্ছেন মহালে। দেউড়ির সামনে জমেছে মাঝারি গোছের একটা ভিড়। ঠিক এমনি সময় মৃদু-গম্ভীর মাদল বেজে উঠল দূরে।

চন্দ্র চৌধুরী চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, শব্দটা কিসের ?

সদর নায়েব নৃসিংহ মুখুজ্জে খবরটা আগেই পেয়েছিলেন। বললেন, রাজমহলের গঙ্গা পেরিয়ে সাঁওতাল এসেছে একদল।

—সাঁওতাল ? কি চায় ওরা ?

—পালগ্রামে ঘর বেঁধে থাকবে, তারই অনুমতি চাইতে এসেছে।

—পালগ্রামে ? চন্দ্র চৌধুরীর চোখে মুখে বিস্ময় প্রকাশ পেল : সেখানে থাকবে—খাবে কি ? মাটিতে তো লাঙ্গল বসবে না।

—খাবে কী ? নৃসিংহ মুখুজ্জে হাসলেন : ওদের খাবার ভাবনা আছে নাকি হুজুর ? পালগাঁয়ের টিলায় তো আর সাপের অভাব নেই, তাই মেরেই পুড়িয়ে খাবে।

—সাপ খাবে ?

—খাবে বই কি। সাপ তো সাপ হুজুর, বাঘের মাংস পেলে তাও কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। বলে কী, জানেন ? বাঘে যখন আমাদের মাংস খাবে, তখন আমরাই বা বাঘকে ছেড়ে দেব কেন ?

অকৃত্রিম আনন্দে চন্দ্র চৌধুরী হেসে উঠলেন।

বললেন, এ একটা কথার মতো কথা বটে। হাঁ, এরাই পালগ্রামের যোগ্য বাসিন্দা।

সাঁওতালের দলটি তখন ছোটখাটো একটা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে বাজনা। তবে এবার আর নাগাড়াটিকারা নয়, মাদল। ধিতাং তাং ধিতাং তাং। এটা ওদের বিজয়োৎসবের আনন্দ উল্লাস। সাত-আটজন কাঁধে বাঁশ ঝুলিয়ে কী একটা মহাকায় জীবকে বয়ে আনছে।

সকৌতুকে এবং কৌতুহলে চন্দ্র চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন। মাদলের ধ্বনি ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। বাঁশের তূণে বোঝাই তীরের ঝকঝকে ফলা, গো-সাপের চামড়া দিয়ে বাঁধানো ধনুক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালো পাহাড়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্র্যানাইটের তৈরি কিরাতের দল।

বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে এনেছে সদ্যোনিহত প্রকাণ্ড একটা দাঁতালো শূয়োরকে। মহিষের শিঙের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণ দাঁত ঠেলে উঠেছে প্রসারিত নাকের তলা দিয়ে। গায়ের অপ্রচুর

ধূলিধূসর লোমগুলো দীর্ঘ এবং শাণিত। অপরিচ্ছন্ন কালো শরীরে আট-দশটা তীর শর-শয্যার মতো বিঁধে রয়েছে। সর্বাঙ্গে থকথকে গাঢ় রক্ত রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে আল-কাতরার মতো চট্‌চট করছে।

চন্দ্র চৌধুরীকে সামনে দেখে সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন জানাল।

—কি রে, কী চাই তোদের?

কালো মুখে শাদা শাদা দাঁত বের করে তারা হাসল। তার প্রজা হতে চায় তারা। সেই উপলক্ষ্যে শূয়োরটা তাদের উপঢৌকন।

—তাই বলে শূয়োর দিয়ে কী করব রে।

—খাবি বাবু।

—শূয়োর খাব? বলিস কি রে—তোদের মতো সর্বভুক পেলি নাকি? যা যা, ওটা তোরাই নিয়ে যা।

সাঁওতালেরা মলিন এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওদের শ্রেষ্ঠ উপচার ওরা জমিদারের জন্যই সাজিয়ে এনেছে। তাই প্রত্যাখ্যানের ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওদের চোখে মুখে।

—তবে তোকে আমরা কী দেব বাবু।

চন্দ্র চৌধুরী সস্নেহে বললেন, কিছু দিতে হবে না। পালগাঁয়ের জঙ্গল তোরা সাফ করে দিবি, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাঁওতালদের মাদল বাজতে লাগল সোৎসাহে। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ যেন কতকালের গভীর একটা আচ্ছন্নতার তলা থেকে জেগে উঠল নীল বাহাদুরের ঘুমন্ত চেতনা। এ সুর কতদিন সে শোনেনি। চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সে কুমীর শিকার করতে গেছে, ইকড় ঘাসের মধ্য থেকে সোনালী বাঘকে গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠতে দেখেছে আগুনের হলকার মতো। কিন্তু আসামের পাহাড়ে সেই উন্মত্ত যৌবন। হড়পা বান নেমে ব্রহ্মপুত্র হাজার হাজার হাতীর মতো গর্জে উঠছে। সে যেন জন্মান্তরের কথা।

জন্মান্তর? আজ এই মাদলের ধ্বনি যেন নীল বাহাদুরকে আবার জাতিস্মর করে তুলল। কোন ঝড়ের রাত্রে মর্মরিত অরণ্যের সুর। বানের জলে বড় বড় গাছ ভেসে চলেছে, পাথরের চাঙ্গাড় নামছে হুড় হুড় শব্দে। নদীর বুকের ওপর অনেকটা জুড়ে ফেনিল জলের বাষ্প-কুয়াশা, আর সেই কুয়াশায় রোদ পড়ে যেন ইন্দ্রধনুর মায়া জ্বলছে।

নীল বাহাদুরের ছোট ছোট চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল। চঞ্চল শুঁড়টা দুলতে লাগল বাজনার তালে তালে। উত্তেজনায় বেরিয়ে এল একটা প্রবল বৃংহণ ধ্বনি।

মাহুত বললে, এদের নাচ দেখে হাতীটার ভারী স্ফূর্তি হয়েছে হুজুর।

চন্দ্র চৌধুরী সকৌতুকে বললেন, হাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। গান গাইবারও চেষ্টা করছে।

সাঁওতালেরা কী বুঝলে কে জানে। কিন্তু নীল বাহাদুরকে ঘিরে ঘিরে তারা নাচতে লাগল। উষ্ণ একটা আভিজাত্যের অনুভূতিতে ঝিমিয়ে এল নীল বাহাদুরের চোখ। কত দিন পরে সে অনুভব করেছে, শুধু ডাঙ্গস্ খেয়ে দিন কাটানোই তার শেষ কথা নয়, সে গজেন্দ্র, সে যূথপতি। আর অরণ্যের প্রতিধ্বনি হয়ে আরণ্য-মানুষ এই লোকালয়েও বয়ে এনেছে তার যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।

পালগ্রামের মৃত সমৃদ্ধি কোন্ অলিখিত যুগের কাহিনী যে বহন করছে, ইতিহাস তার কোনো হদিস দিতে পারে না।

বাংলার পাল রাজাদের তলোয়ার একদিন সমস্ত উত্তর ভারতের আকাশে বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেছিল। দেবপাল, ধর্মপাল। চক্রবর্তী রাজাদের দুর্দান্ত প্রতাপে বাংলার সমৃদ্ধি উছলে উঠেছিল সহস্র ধারায়। হয়তো তারি কোনো বিস্মৃত বুদ্‌বুদ এই পালগ্রাম। মজে যাওয়া দীঘির শীতল কাদার তলার অজ্ঞাত শিলালেখন হয়তো বিস্মৃত ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার খুলে দিতে পারে। উত্তর বাংলার মাঠেঘাটে, বরেন্দ্রভূমির কাঁকরমেশানো রাঙা মাটিতে অতীতের চূর্ণ কঙ্কাল।

স্বাধীনতার শ্মশানে এসে নতুন করে বাসা বাঁধল স্বাধীন মানুষের দল। কুঁচিলার বিষ মাখানো তীরের ফলা। নাগাড়াটিকারার রণ-দুন্দুভি।

সময় গড়িয়ে চলল। ভাঙা পাথর আর গুঁড়ো ইটের তলা থেকে বেরিয়ে এল প্রকৃতির রসধারা—বর্ষার নতুন জলে লকলক করতে লাগল ধানের শীষ। তীর ছাপিয়ে কাঞ্চনের জল এসে নামল দুদিকের বিলে, সেই জলে টান ধরলে বোরোর ক্ষেতে যেন সোনা ফলতে লাগল। বনে জঙ্গলে এখন আর শূয়োর শিকার করতে হয় না, ভুট্টা আর আখের ক্ষেতে মাচা বেঁধে পাহারা দেয় সাঁওতালেরা। টুকরো টুকরো শাকের জমি চোখে স্নিগ্ধতার অঞ্জন বুলায়, ছোট ছোট তামাকের ক্ষেতে খসখসে পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপে। আর তারি মাঝ-খানে কলাবাগানে ঘেরা সাঁওতালদের গ্রাম। মাটি দিয়ে নিকানো পরিচ্ছন্ন দেওয়াল, বাবলার খুঁটি। বারান্দার খাঁচায় দোয়েল শিস দেয়, পচাইয়ের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বাঘের মতো তেজী কুকুর উঠোনে পড়ে ঝিমোয়।

ছবির মতো গ্রাম।

ঠুন-ঠুন-ঠুন। ঠুন ঠুন ঠুনাঠুন। হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ বহু দূর থেকে ভেসে এল। চক্ররেখার মাঠের ওপারে একটা হাতী দেখা দিয়েছে। নীল মেঘের মতো তার প্রকাণ্ড চেহারা। বিরাট দুটি দাঁত সামনের দিকে দুখানা তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এসেছে। শুঁড়ের সঙ্গে মস্ত একটা গাছের ডাল, মাঝে মাঝে সেটাকে মুখে পুরে দিয়ে চর্বণ চলছিল।

—জমিদার, জমিদার এসেছে।

মন্ত্রবলে যেন সাঁওতালপাড়া জেগে উঠল। ঢেঁকির কাজ ফেলে বেরিয়ে এল রূপোর

নথ পরা মেয়েরা, আদমের প্রথম পুত্রের মতো বোরোর জমি থেকে উঠে এল কর্দম-মলিন আধা উলঙ্গ পুরুষের দল। আধপোড়া ভুট্টা হাতে নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে রইল মূঢ় আগ্রহে।

স্তম্ভের মতো চারটে মস্ত মস্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে নীল বাহাদুর। গলায় বাজছে পিতলের ঘণ্টা। মাহুতের পেছনে হাওদার ওপর দেখা গেল চন্দ্র চৌধুরীর মূর্তি।

নিয়মিত পাদক্ষেপে নীল বাহাদুর এসে পাড়ায় ঢুকল। ক্ষুদে চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে যেন একবার সকলের কুশল সে জিজ্ঞাসা করে নিলে: পরিচিত, পুরাতন বন্ধুমণ্ডলী। নীল বাহাদুরের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের। কেবল নাচের তালেই ওরা নীল বাহাদুরকে সম্বর্ধনা করে না, তার সঙ্গে আছে কলামুলো ভুট্টার প্রীতি উপহার।

—বৈঠ্ বৈঠ্—

অঙ্কুশের তাড়া পড়ল মাথায়। বিশাল শরীরটাকে অতি কষ্টে সঙ্কুচিত করে পিছনের পা দুটো ভেঙে বসে পড়ল নীল বাহাদুর। তলোয়ারের মতো দাঁত দুটো মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে, পুরনো শ্লেটের মতো কালো গলার চামড়া ঝুলে পড়েছে নিচে। এ কথা আর অস্বীকার করার জো নেই যে, নীল বাহাদুরের বয়স বেড়েছে আগেকার চাইতে। গজেন্দ্রের চোখে তন্দ্রাবিলতা।

হাতী থেকে চন্দ্র চৌধুরী নামলেন। এই বারো বছরে তাঁকেও আর চেনা যায় না। বহুদিন জরাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, এতটুকু আমল দেননি। তাই জরা এসে যেদিন অধিকার বিস্তার করেছে, সেদিন এতটুকুও ফাঁক রাখেনি।

মাথার চুলগুলো শাদা। মুখটা অনবরত আপনা থেকেই নড়ছে। হাতের সিল্কের মতো পাতলা শাদা চামড়ার তলা থেকে ঠেলে উঠেছে মোটা মোটা নীল শিরা। তবুও ঈষৎ পিঙ্গল চোখের তারায় আজো সেদিনের সেই বহ্নিদৃষ্টি।

সাঁওতালেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

—ভালো আছিস্ তোরা সব?

ওদের মুখভরা কৃতার্থতার হাসি। ক্ষেতে কাজ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। সারা গায়ে জল আর কাদা, প্রকৃতির স্নেহ-নিবিড় স্পর্শ।

—ফসল কেমন রে এবার?

—খুব ভালো ফসল বাবু। তিন বছরে এমন বোরো হয়নি।

চার-পাঁচটা কাঠ আর বেতের আসন চারদিক থেকে এসে জড়ো হয়েছে তখন। চন্দ্র চৌধুরী জাঁকিয়ে বসলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, এবার তা হলে খাজনা দিবি আমাকে?

—খাজনা ? উদ্দীপনায় সাঁওতালদের চোখ জ্বলে উঠল একসঙ্গে : তোর যা খুশি তাই নে না বাবু। তুই চাইলে—

—থাক থাক, অত ভক্তি দেখাতে হবে না আর—চন্দ্র চৌধুরীর দুই চোখে পিতৃস্নেহ : তোরা পালগাঁয়ের পোড়ো জমিতে ফসল ফলিয়েছিস, এই আমার যথেষ্ট খাজনা। বাঘ আর ডাকাতের ভয়ে আগে তো এখান দিয়ে মানুষ চলতে পারত না। তোরা হচ্ছিস আমার নিজের লোক, আমার জঙ্গী পল্টন। তোদের কাছে আবার খাজনা কি রে!

গর্বে, আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় সাঁওতালদের উজ্জ্বল চোখগুলো ছলছল করে এল।

ওদিকে নীল বাহাদুরকে ঘিরে আর এক পর্ব চলছে তখন। শিশু, বালক আর মেয়ের দল এসে ব্যূহ রচনা করেছে তার চারপাশে। নীল বাহাদুর তার বিশাল শুঁড়টাকে ভিক্ষার্থী একখানা হাতের মতো বাড়িয়ে দিয়েছে, দৈনন্দিন নিয়মমতো খাদ্য প্রার্থনা করছে সকলের কাছে। ছেলেদের হাসি এবং আনন্দধ্বনির মাঝখানে একটা কলা অথবা একটা ভুট্টা এসে পড়ছে তার শুঁড়ের আগায়। আর নীল বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে নিজের মুখের ভিতর নিয়ে পুরে দিচ্ছে—আনন্দে তৃপ্তিতে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো বুজে এসেছে তার।

ফেরার পথে কেন কে জানে, অত্যন্ত অহেতুকভাবে উদাস আর আচ্ছন্ন হয়ে উঠল চন্দ্র চৌধুরীর মন। হাতীর পায়ে পায়ে পুরনো ইটের টুকরো মাঝে মাঝে ছিটকে পড়ছে দুপাশে। বিজয়ী বিধর্মী শত্রুর মশাল কবে একদিন সহস্র শিখায় পালগ্রামের মাথার ওপর জ্বলে উঠেছিল। বিদীর্ণ শবদেহ—লাঞ্ছিতা নারী। তারপরে স্তব্ধতা—সেদিনের মৃত্যু অতিক্রম করে এতটুকু আলো এপারে এসে পৌঁছোয় না। চন্দ্র চৌধুরীর মনে হল, বার বার মনে হল, সেদিনের পালগ্রাম আবার জেগে উঠেছে নীরবতার সঞ্জীবনীতে। অত্যাচারী রাজার একক প্রতাপে নয়—বহু মানুষের, বহু মাটির মানুষের লৌহকঠিন পেশীর শক্তিমুখে।

নীল বাহাদুরের গলার ঘণ্টাটা বাজতে লাগল ছন্দোময় দ্রুত তালে। ঠন-ঠন-ঠন। ঠন-ঠন-ঠনাঠন। নির্জন মাঠ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঘণ্টার শব্দে।

কিছুদিন পরে পাগলা ঘোড়া থেকে আছড়ে পড়ে চন্দ্র চৌধুরী মারা গেলেন।

তারপর ইতিহাসের এম. এ. ইন্দ্র চৌধুরী গ্রামে জমিদারী করতে এলেন। চন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রের কাছে জমিদারী করবার মতো দুঃসহ ব্যাপার আর কিছুই নেই, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখেই গ্রামে বাস করতে এলেন ইন্দ্র চৌধুরী।

পিলখানায় মোটা শিকলে বাঁধা নীল বাহাদুরের চোখে ঘুমের জড়তা। তার কোনো কাজ নেই এখন। মদস্রাবী গ্ল্যাণ্ডগুলো শুকিয়ে মরে গেছে তার—শ্লেটের মতো কালো

চামড়া আরো অনেকখানি ঝুলে নেমেছে। তলোয়ারের মতো দাঁত দুটো একটু বাড়লেই কেটে নেওয়া হয় আজকাল, সেই দাঁতের আঘাতে আসামের পাহাড়ে আকাশছোঁয়া শালগাছগুলো যে একদিন মড়মড় করে উঠত, সে কথা নীল বাহাদুরের মনেও পড়ে না।

তার জায়গা দখল করেছে ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্‌টিন। গ্রামের পথে বড় গাড়ি চালানো যায় না, কিন্তু দরকার হলে পাঁচ-সাতজনে মিলে অস্‌টিন ঠেলে নদী নালা পার করে দেওয়া যায়। পল্লীজীবনের নিঃসঙ্গ প্রবাসে অস্‌টিনই একমাত্র সান্ত্বনা।

পিলখানার সামনে দিয়েই মৃদু গর্জন করে বেরিয়ে যায় মোটরটা। কৌতুক এবং কৌতূহলে নীল বাহাদুর তাকিয়ে থাকে এই অদৃষ্টপূর্ব যানটার দিকে। পেট্রোলের গন্ধ ভারী বিচিত্র মনে হয় তার। শুঁড়টা সামনে বাড়িয়ে শব্দ করে নীল বাহাদুর, নাকের মধ্যে টেনে নেয় গন্ধটা—জীবটার প্রকৃতিনির্ণয়ে চেষ্টা করে।

মাঠের পথে, গোরুর গাড়ি চক্রবিদীর্ণ অসমতলের ওপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে বেবি অস্‌টিন এগিয়ে চলে। জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশোনা করবার চাইতে পথ-ঘাট বন জঙ্গলের প্রতিই ইন্দ্র চৌধুরীর কৌতূহল প্রবল। মুখের পাইপ থেকে কড়া বিলাতী তামাকের গন্ধ আসে, স্টিয়ারিঙের ওপরে রাখা স্থূল আঙুলে হীরের আংটি ঝকঝক করে, আদ্দির পাঞ্জাবি হাওয়ায় উড়তে থাকে। আর পেছনের আসনে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন নৃসিংহ মুখুয্যে—তাঁকে নইলে ইন্দ্র চৌধুরীর বেড়ানো হয় না। অথচ, মোটর জিনিসটা সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি আছে নৃসিংহের মনে। পাগলা ঘোড়ার চাইতেও এই কল-কব্জাগুলোকে তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হয়। ধরো, মোটর যদি উল্টে যায়? গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাই বা আশ্চর্য কি? গ্রামের যা পথ—পিছলে পুকুরে গিয়ে যদি পড়ে, তা হলে?

কিন্তু ইন্দ্র চৌধুরীর ভয় নেই। নৃসিংহের ভীরুতা ভারী উপভোগ্য মনে হয় তাঁর—জোর করেই অনেকটা তাঁকে তুলে আনেন তিনি। তা ছাড়া পাকা লোক নৃসিংহ। পথ-ঘাট নদী নালার খবর তাঁর চাইতে বেশি আর কে জানে?

ঘ্রাস-স-স—আচমকা শব্দ হল একটা। মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বেবি অস্‌টিন থেমে গেল। নৃসিংহ ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলেন—কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটল না তো?

কিন্তু দুর্ঘটনা কিছু নয়। চলতি মোটরকে হঠাৎ ব্রেক কষে থামিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্র চৌধুরী। দামী চশমার নিচে তাঁর ঐতিহাসিকের চোখ লোলুপ হয়ে উঠেছে।

পাশেই পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গা একটা। ভাঙা ইট, আর পাথরের টুকরোয় অলিখিত ইতিহাস। মজে যাওয়া দীঘির পারে তালের বীথি শন শন শব্দে মাথা নাড়ছে।

—এটা কোন্ জায়গা মুখুয্যে মশাই?

—পালগাঁয়ের টিলা।

পালগাঁয়ের টিলা! ইন্দ্র চৌধুরীর চোখে মুখে কৌতূহল প্রখর হয়ে উঠল: আমার

জমিদারীর ভেতর এমন একটা জায়গা যে থাকতে পারে সে তো ভাবতেই পারিনি।

নৃসিংহ বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন : আজ্ঞে এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ?

—বাঃ, বলেন কী ! টিলাটাকে দেখে কি মনে হয় না যে ওর তলায় পাহাড়পুরের মতো একটা প্রচ্ছন্ন বিহার কিংবা ওই রকম একটা বিরাট কিছু—

—আজ্ঞে ?

নৃসিংহের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্র চৌধুরী সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, চলুন, চলুন, ওই পাড়াটা একবার দেখে আসি।

সাঁওতালদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে মোটরটার চারপাশে। কড়া তামাকের একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে ইন্দ্র চৌধুরী তাদের ধমকে উঠলেন :

—যা যা, পালা সব। দেখছিস তো, মোটর গাড়ি ? চাপা দিয়ে একদম মেরে ফেলব, ভাগ।

মোটর গাড়ি, নীল বাহাদুর নয়।

বাড়ি ফিরে ইন্দ্র চৌধুরী নৃসিংহকে বললেন, ওই সাঁওতালগুলোকে তাড়িয়ে দিন।

নতুন জমিদারের ব্যবহার নৃসিংহের দুর্বোধ্য। চন্দ্র চৌধুরীর প্রায় সমবয়সী তিনি, এতটা বয়স পর্যন্ত প্রাণপণে জমিদারীর অন্ধি-সন্ধি আয়ত্ত করেছেন। দলিল জাল থেকে দাঙ্গার লাস গুম করা পর্যন্ত কোনো ব্যাপারে তাঁর বিচক্ষণতার অভাব হয়নি। কিন্তু—

—আজ্ঞে, ওদের তাড়াবেন কেন ?

অপ্রসন্ন মুখে ইন্দ্র বললেন, খাজনা তো দেয় না, পুষেই বা কী লাভ। কিন্তু সে সব ভাবছি না। দুশো টাকার জন্যে আমার হাহাকার নেই। কথা হচ্ছে, ওই টিলাটা আমি এক্সক্যাভেট করাব।

—আজ্ঞে ?

—এক্সক্যাভেট করার মানে, খোঁড়াব। দশ হাজার, বিশ হাজার—যা লাগে। কে জানে হয়তো—একটা আনন্দ ও উৎসাহের দীপ্তিতে ইন্দ্র চৌধুরী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন : হয়তো ওই টিলাটার তলা থেকে এমন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার বেরিয়ে পড়বে—যার ফলে বাংলার ইতিহাসই লিখতে হবে নতুন করে—কথার শেষ দিকটায় তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

উচ্ছ্বাসটা বুঝতে না পারলেও মূল ব্যাপার এতক্ষণে নৃসিংহের বোধগম্য হল।

—ওই টিলাটা খুঁড়তে হবে বুঝি ?

—হাঁ, এতক্ষণে বুঝেছেন।

নৃসিংহের কণ্ঠে সংশয় প্রকাশ পেল : কিন্তু ওদের তাড়ানো কি ঠিক হবে ?

—ঠিক হবে মানে ? উত্তেজনায় ইন্দ্র চৌধুরী সোজা হয়ে উঠে বসলেন : জানেন,

ইতিহাসের কত বড় একটা তথ্য, হয়তো ওই টিলাটার নীচে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে? হয়তো পাল রাজাদের মূল্যবান কোন তাম্রশাসন হয়তো তাঁদের দিগ্বিজয়ের—হয়তো কত কী—আমি আর ভাবতে পারছি না।

নৃসিংহও কিছু ভাবতে পারলেন না।—কিন্তু ওদের উচ্ছেদ করে দিন। এক মাস সময় —ফসল কাটা শেষ হয়ে যাবে। আর এর ভেতর কলকাতায় চিঠি লিখে সব ঠিক করে ফেলছি আমি। আমার কী ভেবে আনন্দ হচ্ছে জানেন?

নৃসিংহ মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি জানেন না।

—আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, হয়তো টিলাটা এক্সক্যাভেট করিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার নাম!

—তা বটেই তো।

কিন্তু নৃসিংহ কিছু বুঝতে পারলেন না। অতীতের ইতিহাস! অতীতেই যা শেষ হয়ে গেছে, মাটির তলায় যা আত্মগোপন করেছে, বাইরের আলোকে তাকে টেনে আনবার, উদ্ঘাটিত করবার সার্থকতা কোথায়। মৃত যে, তাকে মৃত্যুর মধ্যে শেষ করে দেওয়াই তো ভালো। আজ অতীতের ভাঙা কবরের ওপর নতুন যুগের মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে, ফলে-ফসলে তাকে জাগিয়ে তুলেছে নতুন প্রাণের মধ্যে। সেই জীবন্ত মানুষদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুর কঙ্কালকে পূজো করতে হবে—এ কোন্ দেশী খেয়াল?

যথাসময়ে খবর এল। সাঁওতালেরা অবাধ্য হয়ে উঠেছে—বেশি চাপ দিলে বিদ্রোহী হওয়াও আশ্চর্য নয়।

লাঙ্গলের ফলা দুমড়ে বন্ধ্যা মাটিকে উর্বরা করেছে তারা। তীরের আগায় নির্বংশ করেছে দাঁতালো শূয়োরের পাল! বল্লমের মুখে বিঁধে তুলেছে দীঘির পারে ঘুমন্ত কুমীরকে। এত সহজেই তারা ছেড়ে দেবে না তাদের ঘর-বাড়ি।

কথা শুনে ক্রোধে ইন্দ্র চৌধুরী পাংশু হয়ে উঠলেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারী চালানোর বাসনা তাঁর নেই, প্রজার ওপর জোর করে নিজের রাজমহিমা প্রচার করবার মনোভাবও তাঁর নয়। কিন্তু বাংলা দেশের বিস্মৃত ইতিহাস—জ্ঞান জগতের দাবি। এর চাইতে বড় কর্তব্য কী থাকতে পারে।

নৃসিংহ সবিনয়ে বললেন, কর্তামশাই ওদের বড় ভালোবাসতেন—

উগ্রস্বরে জবাব এল, তাইতেই তো মাথায় চড়েছে। যান আপনি।

নৃসিংহ চলে গেলেন। কিন্তু খুশি হয়ে গেলেন না।

দিনের পর দিন অবস্থাটা তিক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আকাশে বাতাসে খণ্ড যুদ্ধের আভাস। ইতিহাসের এম. এ. ইন্দ্র চৌধুরীর শিরা-স্নায়ুতে দেবীকোট রাজবংশের রক্ত ফেনিয়ে উঠেছে। কেবল ঐতিহাসিক জ্ঞান-লিপ্সাই নয়, শক্তিটাকেও একবার যাচাই

করা ভালো।

আর পিলখানায় তন্দ্রাতুর নীল বাহাদুর কী একটা সন্দেহ করে। মাহুত আর তাকে তেমন সেবাযত্ন করে না আজকাল। অপ্রচুর খাদ্যে পেট ভরে না, চারদিকের আবর্জনা আর দুর্গন্ধে তার সমস্ত মন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। ইন্দ্র চৌধুরীর আমলের সেই দিনগুলি। জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে মর্যাদাও সে সমান ভাবে ভাগ এবং ভোগ করে এসেছে। জমিদারকে দেখে পথের দু'ধার থেকে যারা সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়েছে, তাদের অভিবাদনের অনেকটা যে তারও উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে, এ কথা নীল বাহাদুর জানে।

কিন্তু এক বছরে কী পরিবর্তন। কী বিস্ময়কর ভাবে নিরর্থক হয়ে গেছে তার সমস্ত মূল্য। দিন কয়েক আগে দু'তিনজন লোক তাকে দেখতে এসেছিল। কী কথাবার্তা বলেছে কে জানে, কিন্তু তাদের সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চোখ নীল বাহাদুরের ভাল লাগেনি। কেন কে জানে তার সন্দেহ হয় এখানকার প্রয়োজন হয়তো তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা অশুভ সূচনার মতো মনে হয়, এখান থেকে হয়তো বিদায় নিতে হবে তাকে—সে অনাবশ্যক।

মৃদু গর্জন করে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা ছুটে যায় পিলখানার সম্মুখ দিয়ে। ইন্দ্র চৌধুরীর বেবি অস্টিন; কত ছোট—অথচ কী আশ্চর্য গতিবেগ। পোড়া পেট্রোলের গন্ধটা এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি শুঁড়ের ভেতর টেনে নেয় নীল বাহাদুর—ভারী বিচিত্র মনে হয় তার।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা যেন তার ঘুমন্ত চেতনাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করে তোলে। কেন করে কে জানে: সে বুঝতে পেরেছে ওই জানোয়ারটাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আসামের পাহাড়ে সেই হিংস্র মদমত্ত যৌবন যেন বহুদিন পরে ফিরে আসে নীল বাহাদুরের শিথিল শরীরে। মদস্রাবী গ্রন্থিতে দেখা দেয় চাঞ্চল্য। পায়ের নীচে খাশিয়াদের পাড়া সে দলে পিষে চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু সে কবে—সে কবে! এক আছাড়ে ওই জানোয়ারটাকে কি ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না?

ওদিকে ইন্দ্র চৌধুরী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন আর সমানভাবে বিপন্ন করে তুলেছেন নৃসিংহকে। ওই টিলা তাঁর চাই। মামলামোকদ্দমা করে নয়, আইনের আশ্রয় নিয়েও নয়। অবাধ্য কতগুলো বন্য প্রজাকে যদি বাহুবলেই বশীভূত না করা যায়, তা হলে কিসের জমিদারী।

কিন্তু সাঁওতালদের ভয় করেন নৃসিংহ। উত্তর বাংলার শান্ত নির্বিরোধ রাজবংশী নয় ওরা। গলায় তুলসীর মালা পরে না, কৃষ্ণের ইচ্ছার ওপরেই সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকে না। ওদের নাগাড়াটিকাড়া ওদের রণডঙ্কা। ঝড়ের মেঘের মন্দ্র জাগে তার নির্ঘোষে।

মুখের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে তুলে ইন্দ্র চৌধুরী বললেন, বেশ, আমিই ব্যবস্থা করব।

দেউড়ির সামনে পায়চারি করতে করতে তাঁর চোখে পড়ল নীল বাহাদুরের বিশাল অবয়ব। শিকলে বাঁধা এই অতিকায় প্রকাণ্ড জানোয়ারটি মূর্তিমান অপচয় মাত্র। হাতীটাকে বিক্রি করবার চেষ্টায় আছেন তিনি, কিন্তু খরিদ্দার মিলছে না। অথচ দিনের পর দিন হাতীটার ভোজ্য সংগ্রহ করতে—

মুহূর্তে মগজের মধ্যে চমৎকার একটা মতলব খেলে গেল।

পিলখানার সামনে এসে ইন্দ্র চৌধুরী দাঁড়ালেন। কী কুশ্রী কদাকার জানোয়ারটা—বিধাতার সৃষ্টিতে কী পরিমাণ অস্থি-মাংসের অপব্যবহার। সর্বাঙ্গে লোল স্থবিরত্ব। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে শারীরিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি।

হাতীটার ছোট ছোট চোখ দুটোর দিকে তিনি তাকালেন। মনে হল, এই নির্বোধ বিশাল জানোয়ারটার চোখে কী একটা কথা মুখর হয়ে উঠেছে—যেন একটা মর্মভেদী দৃষ্টি পাঠিয়ে সে তার নিভৃত অন্তরের সমস্ত সন্ধান জেনে নিয়েছে।

চকিতে হাতীটার চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তারপর মাহুতকে ডেকে আদেশ দিলেন, আজ থেকে তিন দিন হাতীটার খোরাক বন্ধ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নীল বাহাদুর অস্থির হয়ে উঠল। তিন দিন থেকে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেয় না তাকে। সমস্ত দেহে মনে তার বিপ্লব। এরা কি তাকে অনাহারেই মেরে ফেলবার মতলব করেছে? বার্ধক্যের শেষ শক্তি দিয়ে নীল বাহাদুর বাঁধন ছিঁড়বার চেষ্টা করে, লোহার শিকলের আংটাগুলো মটমট করে ওঠে, পাথরের স্তম্ভটা নুয়ে পড়তে চায়। ব্যর্থ ক্ষুধা আর ক্ষোভে চোখের দুই কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, থেকে থেকে বেরিয়ে আসে কাতর আর্তনাদের মতো এক-একটা বৃংহণ ধ্বনি। সেই পাহাড় গুঁড়োনো শক্তি আজ আর নেই—নীল বাহাদুর আজ স্থবির, মৃত্যুর পথিক।

তৃতীয় দিনে ইন্দ্র চৌধুরী আর নৃসিংহ এসে দাঁড়ালেন সামনে।

—আপনি হাতী নিয়ে বেরিয়ে যান মুখুয্যে মশাই, আমি মোটরে আসছি।

নৃসিংহের সমস্ত মুখ পাংশু এবং পাণ্ডুর।

—ব্যাপারটা একটু কেমন—

ইন্দ্র চৌধুরী কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, আর দেরি করবেন না, যান। তারপর বড় বড় পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

বহুদিন পরে নীল বাহাদুরকে আবার বাইরে বের করে আনা হল। দড়ির হাওদা কষা হতে লাগল তার পিঠে। অসহ্য ক্ষুধায় দৃষ্টি অভিভূত—রাশি রাশি জোনাকি উড়ছে শুধু। তবু ধৈর্য ধরে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। হাওদা কষা হচ্ছে, যাত্রার আগে নিশ্চয়ই খাদ্য মিলবে।

কিন্তু খাদ্য মিলল না। দুর্গানাম জপ করতে করতে ভয়ার্ত নৃসিংহ হাওদায় উঠে বসলেন আর পরক্ষণেই মাহুতের সুতীক্ষ্ণ ডাঙ্গস এসে বিঁধল নীল বাহাদুরের মাথায়।

ক্ষিপ্তের মতো নীল বাহাদুর চলতে শুরু করল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা তার অবলুপ্ত হয়ে গেছে—মাথার ওপর ডাঙ্গসের তীব্র অনুভূতি। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে—অস্পষ্ট, আর ছায়ায় আচ্ছন্ন। নীল বাহাদুরের নীল মেঘের মতোই মহা-বপুটা দুলতে লাগল—একসঙ্গে জেগে উঠেছে বুভুক্ষা আর বার্ধক্য। তবু আজ সমস্ত শক্তিকে শেষবার সংহত করে সে চলতে লাগল লক্ষ্যহীন অন্ধ চোখে। আর মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল, পিছনে বহু দূর সে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটার অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে—হাওয়ায় আসছে পোড়া পেট্রোলের বিচিত্র গন্ধ।

সামনে পালগাঁয়ের টিলা। কলাবনে ঢাকা সাঁওতালদের গ্রাম—মজে যাওয়া দীঘির পারে তালের বন বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। পুরনো পৃথিবীতে নতুন মানুষের সার্থক তপস্যা দেখা দিয়েছে ফলে ফসলে। নৃসিংহ মুখুয্যে ভাবতে লাগলেন: এদের নির্বাসিত করে প্রাচীনের কঙ্কালকে উদ্ধার করা—কী তার প্রয়োজন?

কিন্তু নীল বাহাদুর কিছু ভাবতে পারছে না। অসহ্য ক্ষুধায় সে যেন মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এমন সময় তার নাকে ভেসে এল অপূর্ব একটা সৌরভ।

অপূর্ব সৌরভ বই কি। মুহূর্তে দেহের শিরা-স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে তার। পাকা ফসলের গন্ধ—পরিপুষ্ট সোনালি ধানের গন্ধ। অন্ধ চোখ দুটো মেলতেই সে দেখল, সামনেই বিলের ধার দিয়ে বোরোর ধানে লক্ষ্মীর অজস্র করুণা। দু' পাশে যতদূর দেখা যায়, পাকা ধানের সানন্দ বিস্তার—মধুগন্ধী খাদ্যের আমন্ত্রণ।

তিন দিনের অভুক্ত নীল বাহাদুর পাগলের মতো ক্ষেতে গিয়ে পড়ল। মাহুত তাকে বাধা দিলে না, বরং আরো ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে গিয়েই নামিয়ে দিলে তাকে।

পিছনে সেই যান্ত্রিক জানোয়ারটা এসে থেমেছে। ইন্দ্র চৌধুরীর উত্তেজনা-কম্পিত কণ্ঠ-স্বর শোনা গেল: খাইয়ে দে সমস্ত ধান, দলে পিষে শেষ করে দে। জমি ছাড়বে না—রাম-রাজত্ব পেয়েছে।

—ডুম-ডুম-ট্র্যাম্।

সমস্ত সাঁওতাল পাড়াকে মুখর করে নাগাড়া বাজতে লাগল। পালগ্রামের টিলার ওপর সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন যুগের সৈনিকের দল। হাতে তাদের উদ্যত তীর আর ধনুক। সংশপ্তকের অস্ত্রের লক্ষ্য আজ বদলে গিয়েছে। জমিদারের হাতী এসে তাদের বুকের রক্তে ফলানো ধান নিঃশেষ করে দিয়ে যাচ্ছে—দলে দিয়ে যাচ্ছে সারা বছরের জীবন-সঞ্চয়।

নাগাড়ার সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ে আসতে লাগল: শাঁ-শাঁ-শাঁ। শাণিত দীর্ঘ

ফলাগুলো নির্মমভাবে বিঁধতে লাগল নীল বাহাদুরের সর্বাঙ্গে। একটা অস্ফুট চিৎকার করে নৃসিংহ মুখুয্যে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

ক্ষিপ্ত নীল বাহাদুর পাকা ধানের গোছাগুলো উপড়ে উপড়ে মুখে পুরতে লাগল। তার সমস্ত শরীরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই। দুই চোখের ওপর দিয়ে রক্ত নেমে আসছে—সারা গায়ে তীর বিঁধে রয়েছে সজারুর কাঁটার মতো। কিন্তু কোনো-টাতেই কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

দুম-দুম করে দুটো শব্দ হল বন্দুকের—দেবীকোট রাজবংশের শেষ প্রতাপ। আকাশ ফাটানো মানুষের কলবর জেগে উঠল। আর নীল বাহাদুরের সামনে অকস্মাৎ পৃথিবীটা একটা চাকার মতো ঘুরতে শুরু করে দিলে। তীরের ফলায় কুঁচিলা তার রক্তের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে—তীব্র আর্সেনিকের ক্রিয়া।

টলমল করে দুলতে লাগল যূথপতির দেহটা। শেষ শক্তিতে আর এক গুচ্ছ ধান মুখে পুরে দিয়ে সে টলতে টলতে পিছনে হটে এল, তারপর শুঁড়টাকে আকাশে তুলে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিস্ফোরণের মতো যান্ত্রিক জানোয়ারটার অন্তিম আর্তনাদ। নীল বাহাদুরের বিরাট শরীরের চাপে সেটা পাখির বাসার মতোই গুঁড়িয়ে গিয়েছে।